প্রথম অধ্যায় (প্রথম অংশ)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : প্রাথমিক ধারণা

২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ১০০ নম্বরের 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। উল্লেখ্য , নতুন সিলেবাসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় থাকলেও তথ্য প্রযুক্তি এবং কমপিউটার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কিত কোন Topic রাখা হয়নি। নিম্ন মাধ্যমিক থেকে যাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি আবশ্যিক তাদের জন্য এ বিষয়টির প্রয়োজন হবে না। কিন্তু বর্তমানে একাদশ শ্রেণিতে পড়তে আসা অনেকের এ বিষয়ে পূর্বজ্ঞান না থাকলে অসুবিধা হতে পারে। তাই তাদের কথা বিবেচনা করে 'প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অংশ' হিসেবে এখানে তথ্য প্রযুক্তি এবং কমপিউটার সম্পর্কে সিলেবাসের বাইরে অতিরিক্ত কিছু তথ্য সংযোজিত হলো।

এই অধ্যায়ে রয়েছে

তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা, তথ্য প্রযুক্তির অবদান, তথ্য প্রযুক্তির সাথে যোগাযোগ প্রযুক্তির একীভূতকরণ, তথ্য প্রযুক্তির উপাদান, কমপিউটার, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কমপিউটারের ব্যবহার, রেডিও, টেলিভিশন, স্যাটেলাইট, ইন্টারনেট, ই-মেইল, ডিজিটাল টেলিফোন, মোবাইল ফোন সম্পর্কে আলোচনা ছাড়াও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ : টেলিকনফারেন্সিং এবং ভিডিও কনফারেন্সিং সম্পর্কে আলোচনা।

প্রথম অধ্যায় (প্রথম অংশ)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : প্রাথমিক ধারণা

তথ্য প্রযুক্তি (Information Technology)

বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। তথ্য প্রযুক্তি বলতে সাধারণত তথ্য রাখা এবং একে ব্যবহার করার প্রযুক্তিকেই বোঝানো হয়। একে ইনফরমেশন টেকনোলজি (Information Technology – IT) বা আইটি নামে অভিহিত করা হয়। অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারিতে তথ্য প্রযুক্তিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে- "The branch of technology concerned with the dissemination, processing and storage of information, especially by means of computers".

তথ্য প্রযুক্তি মূলত একটি সমন্বিত প্রযুক্তি যা যোগাযোগ, টেলিযোগাযোগ, অডিও ভিডিও, কম্পিউটিং, সম্প্রচারসহ আরো বহুবিধ প্রযুক্তির সম্মিলনে দীর্ঘদিন ধরে চর্চার ফলে সমৃদ্ধি লাভ করে তথ্য প্রযুক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছে। সার্বিকভাবে বলতে গেলে **কম্পিউটার এবং টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, একত্রীকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিনিময় বা পরিবেশনের ব্যবস্থাকে তথ্য প্রযুক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়**। তথ্য প্রযুক্তির সাথে যোগাযোগ মাধ্যমের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। তাই বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তিকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Information and Communication Technology – ICT) বলা হয়।

তথ্য প্রযুক্তির অবদান (The Contribution of Information Technology)

আধুনিক সভ্যতার ক্রমবিকাশে তথ্য প্রযুক্তির প্রভাব অপরিসীম। কম্পিউটারের নির্ভুল কর্ম সম্পাদন, দ্রুতগতি, স্মৃতি, স্বয়ংক্রিয় কর্মসম্পাদন, নেটওয়ার্ক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে তথ্য আদান-প্রদান, যোগাযোগ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের জন্য তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগক্ষেত্র আজ সুবিস্তৃত। তথ্য প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য অবদান হলো–

১. অপচয় রোধ করে।
২. সময়সাশ্রয়ী হয়।
৩. তথ্যের প্রাপ্যতা সহজ হয়।
৪. তাৎক্ষণিক যোগাযোগ সম্ভব হয়। ফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, ই-মেইল, এসএমএস, এমএমএস প্রভৃতি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।
৫. প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের গতিকে ত্বরান্বিত করে।
৬. সর্বক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
৭. ব্যবসায়-বাণিজ্যে লাভজনক প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে।
৮. ই-কমার্সের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী পণ্যের বাজার সৃষ্টি করা যায়।
৯. ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে পছন্দের এবং প্রয়োজনীয় জিনিসের অর্ডার দেয়া যায়।
১০. শিল্প প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার মনুষ্যশক্তির অপচয় কমায়।
১১. মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটায়।
১২. শিক্ষার্থীরা এখন ঘরে বসেই অনলাইনে বিশ্বের বিভিন্ন নামী-দামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে।
১৩. ই-গভর্নেন্স চালুর মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের মধ্যে কাজের সমন্বয় ঘটানো যায়।
১৪. সিটিজেন চার্টারের মতো নাগরিক সুবিধাগুলো ঘরে বসেই পাওয়া যায়।
১৫. ঘরে বসেই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, ফোন বিলের মতো বিভিন্ন ইউটিলিটি বিলগুলো এখন মোবাইল ফোনেও দেয়া যায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণেই।

তথ্য প্রযুক্তির সাথে যোগাযোগ প্রযুক্তির একীভূতকরণ (Convergence of ICT)

তথ্য প্রযুক্তি বলতে সাধারণত তথ্য রাখা এবং একে ব্যবহার করার প্রযুক্তিকেই বোঝানো হয়। তবে বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তি আর এ সংজ্ঞার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। নতুন নতুন সব প্রযুক্তির সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে তথ্য প্রযুক্তি এক ভিন্ন রূপ লাভ করেছে। এক্ষেত্রে যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা সর্বাধিক। যোগাযোগ, টেলিযোগাযোগ, অডিও ভিডিও কম্পিউটিং, সম্প্রচারসহ আরো বহুবিধ প্রযুক্তি এর সাথে যুক্ত হয়েছে। ফলে তথ্য প্রযুক্তি বা আইটি এখন আইসিটি বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

রেডিওর আবিষ্কার যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। আগে রেডিওতে শুধু কথা শোনা যেত। এরপর টিভি আবিষ্কারের ফলে কথা ও ছবি একত্রে শোনা ও দেখা সম্ভব হয়। টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে রেডিও ও টেলিভিশন সম্প্রচার ব্যবস্থায় ঘটেছে দারুণ পরিবর্তন। তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেছে আধুনিক ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্স প্রযুক্তি। কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে আন্তঃমহাদেশীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা। এতে করে পৃথিবীর একপ্রান্তের একজন মানুষ ঘরে বসেই সরাসরি যোগাযোগ করতে পারছে অন্যপ্রান্তের মানুষের সাথে। পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্স প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা।

ইন্টারনেট আবিষ্কার নিঃসন্দেহে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। ইন্টারনেটের কল্যাণে এখন ঘরে বসেই বিশ্বকে পাওয়া যাচ্ছে হাতের মুঠোয়। প্রচলিত চিঠির বদলে এসেছে ই-মেইল এর ব্যবস্থা যার সাথে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টগুলো অ্যাটাচ করে পাঠিয়ে দেয়া যাচ্ছে বিশ্বের যেকোনো স্থানে। ইন্টারনেটের কল্যাণে এখন টেক্সট, ভয়েস ও ভিডিও চ্যাটিং, ব্রডকাস্টিং, ভিওআইপি, অনলাইন অডিও-ভিডিও স্ট্রিমিং প্রভৃতি কাজগুলো করা সম্ভব হচ্ছে। অনলাইন রেডিও, অনলাইন টিভির মতো সেবাগুলোও প্রসার লাভ করেছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কোটি কোটি ওয়েবসাইট তথ্যের প্রাপ্যতাকে আরও সহজ করেছে।

টেলিফোনের মাধ্যমে শব্দকে ইলেক্ট্রনিক ডেটায় রূপান্তরিত করে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ করা যায়। বর্তমানের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে শুধু শব্দ নয় লেখা, গ্রাফিক্স, স্থিরচিত্র ও চলচ্চিত্র সবকিছুকেই ডিজিটাল ফরমেটে নিয়ে ইলেক্ট্রনিক ডেটায় রূপান্তর করে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ করা যায়। মডেমের মাধ্যমে কম্পিউটারের সাথে টেলিফোন লাইনের সংযোগ দিয়ে ইন্টারনেট ব্রাউজ করা যায়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আরেক শক্তিশালী উদ্ভাবন হলো মোবাইল টেলিফোন। মুঠোয় ধরে রাখা এ ফোনের মাধ্যমে আজ বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে কথা বলা যাচ্ছে। যেকোনো স্থানে এ ফোন বয়েও বেড়ানো যাচ্ছে। আধুনিক স্মার্টফোনগুলো আরও বেশি সুবিধা দিচ্ছে। হ্যান্ডসেটেই ইন্টারনেট ব্রাউজিং, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সেবা গ্রহণ, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ছবি ও ভিডিও ধারণ করে তা ইন্টারনেটে সরাসরি তুলে দেয়ার কাজগুলো করা যাচ্ছে। এসএমএস বা ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্বের যেকোনো স্থানেই পাঠিয়ে দেয়া যাচ্ছে তথ্য। আর এমএমএস এর মাধ্যমে প্রেরণ করা যাচ্ছে মাল্টিমিডিয়া সম্বলিত তথ্য। শুধু তাই নয় জিপিএস বা গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম এর সেবাও নেয়া যাচ্ছে মোবাইল ফোনে। স্মার্টফোনগুলো আজ চলছে অপারেটিং সিস্টেমে। হ্যান্ডসেটগুলোতে আরও বেশি ইন্টারনেটনির্ভর সুবিধা নিয়ে এসেছে চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল প্রযুক্তি যার সফল বাস্তবায়ন হলো WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) এবং 3GPP LTE (Long Term Evolution) স্ট্যান্ডার্ড।

এতসব প্রযুক্তির সম্মিলনে তথ্য প্রযুক্তি এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি এসেছে সমকেন্দ্রিকতায়। এদের আর এখন আলাদা করে ভাববার কোনো অবকাশ নেই। তাই এখন এই দুই প্রযুক্তি মিলেমিশে একক একটি প্রযুক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে যাকে বলা হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

তথ্য প্রযুক্তির উপাদান (The elements of Information Technology)

তথ্য প্রযুক্তিতে বর্তমানে যেসব মৌলিক উপাদান ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলো হলো-

১. কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি (Computer and other devices)
২. কম্পিউটিং (Computing)
৩. রেডিও, টেলিভিশন, ফ্যাক্স (Radio, Television, Fax)
৪. অডিও ভিডিও (Audio Video)
৫. স্যাটেলাইট (Satellite)
৬. কম্পিউটার নেটওয়ার্ক (Computer network)
৭. ইন্টারনেট (Internet)
৮. আধুনিক টেলিযোগাযোগ (Modern Telecommunication)
৯. মডেম ইত্যাদি। (Modem etc.)

কম্পিউটার (Computer)

কম্পিউটার একটি অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্র। ল্যাটিন শব্দ Computare থেকে ইংরেজি Computer শব্দটির উৎপত্তি। Computer শব্দটির আভিধানিক অর্থ গণনাযন্ত্র বা হিসাবকারী যন্ত্র। পূর্বে কম্পিউটার দিয়ে শুধুমাত্র হিসাব-নিকাশের কাজই করা হতো। কিন্তু বর্তমান অত্যাধুনিক কম্পিউটার দিয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে জটিল হিসাব-নিকাশের কাজ নির্ভুলভাবে করা ছাড়াও বহু রকমের অনেক কাজ করা যায়। কম্পিউটার সেকেন্ডের মধ্যে কোটি কোটি হিসাব-নিকাশ করতে পারে। কম্পিউটারে কাজ করার গতি হিসাব করা হয় ন্যানোসেকেন্ড (NS) এ। ন্যানোসেকেন্ড হচ্ছে এক সেকেন্ডের একশত কোটি ভাগের একভাগ সময় মাত্র। কম্পিউটারের অভ্যন্তরে রয়েছে অনেক বর্তনী। ইলেকট্রন প্রবাহের মাধ্যমে কম্পিউটারের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালিত হয়। ইলেকট্রনিক সংকেতের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে কম্পিউটার ল্যাংগুয়েজ বা কম্পিউটারের ভাষা। কম্পিউটারের বোধগম্য এ ভাষার মাধ্যমে কম্পিউটারে যে নির্দেশ দেয়া হয় তারই ভিত্তিতে কম্পিউটার ফলাফল প্রদান করে। কম্পিউটারের এ নির্দেশাবলিকে বলা হয় প্রোগ্রাম। প্রোগ্রাম ছাড়া কম্পিউটার একটি জড় পদার্থ ভিন্ন আর কিছু নয়। উপযুক্ত প্রোগ্রামের ফলে কম্পিউটার জড় পদার্থ হতে গাণিতিক শক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিমান যন্ত্রে পরিণত হতে পারে। **কম্পিউটার একটি অত্যাধুনিক ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র, যা নিজস্ব স্মৃতিভাণ্ডারে সুনির্দিষ্ট এক বা একাধিক কাজের নির্দেশাবলি সংরক্ষণ করে রাখে। ব্যবহারকারী ডেটা বা উপাত্ত সরবরাহ করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম্পিউটার প্রক্রিয়াকরণ (প্রসেসিং) করে কাজের ফলাফল প্রদান করে।**

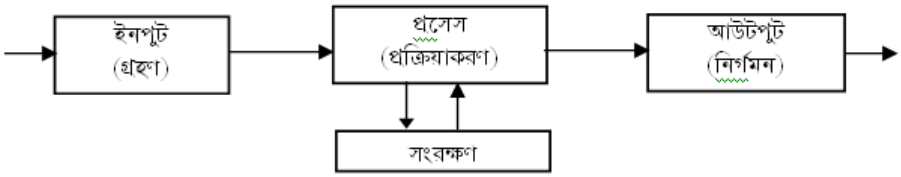

চিত্র : কম্পিউটারের কার্যনীতি

কম্পিউটারের কাজ (Functions of Computer)

কম্পিউটারের চারটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ব্যবহারকারী কর্তৃক তৈরি প্রোগ্রাম (Programs) কম্পিউটার গ্রহণ করে মেমোরিতে সংরক্ষণ করে এবং ব্যবহারকারীর নির্দেশে কম্পিউটার প্রোগ্রাম নির্বাহ (Execute) করে।
২. কী-বোর্ড, মাউস, জয়স্টিক, ডিস্ক ইত্যাদির মাধ্যমে কম্পিউটার ডেটা (Data) গ্রহণ করে।
৩. ডেটা প্রক্রিয়াকরণ (Process) করে।
৪. মনিটর, প্রিন্টার, প্লটার ইত্যাদির মাধ্যমে কম্পিউটার ফলাফল প্রকাশ করে।

কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Computer)

বিভিন্ন যন্ত্রের মতো কম্পিউটারেরও নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো :

১. দ্রুতগতি (High speed)
২. নির্ভুলতা (Correctness)
৩. সূক্ষ্মতা (Accuracy)
৪. বিশ্বাসযোগ্যতা (Reliability)
৫. ক্লান্তিহীনতা (Dilligence)
৬. স্মৃতিশক্তি (Memory)
৭. স্বয়ংক্রিয়তা (Automation)
৮. যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত (Logical decision)
৯. বহুমুখিতা (Versatility)
১০. অসীম জীবনীশক্তি (Endless life)

বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার (Application of Computer in various fields)

১. ওয়ার্ড প্রসেসিং বা লেখালেখির কাজে টাইপরাইটারের বিকল্প হিসেবে অফিস আদালতে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়।
২. ব্যাংকিং, শেয়ার বাজার ও ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে লেনদেনের হিসাব তৈরি ও সংরক্ষণের কাজে গতানুগতিক পদ্ধতি বাদ দিয়ে আজকাল কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়।
৩. অফিসের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার কাজে আজকাল কম্পিউটার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
৪. শিল্পক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণের কাজেও কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে।
৫. যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ি, জাহাজ, এ্যারোপ্লেন, ঘরবাড়ি, ব্রিজ ইত্যাদি ডিজাইন করার ক্ষেত্রে।
৬. শিক্ষাক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন ধরনের গবেষণামূলক কাজে।
৭. একস্থান থেকে অন্যস্থানে সংবাদ প্রেরণের ক্ষেত্রে।
৮. বিনোদনের ক্ষেত্রে যেমন টিভি দেখা, ভিডিও দেখা ও গান বাজানো ইত্যাদি।
৯. মুদ্রণশিল্পে প্রকাশনামূলক যে কোন কাজে।
১০. যোগাযোগ ব্যবস্থার টিকিট বিক্রি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের ট্রান্সপোর্টের ডিরেকশন ও গতি নির্ণয়ের কাজে।
১১. আধুনিক সামরিক বাহিনীতে নিরাপত্তা রক্ষী হিসেবে।
১২. আবহাওয়ার পূর্বাভাস পর্যবেক্ষণের কাজে।

কম্পিউটিং (Computing)

কম্পিউটিং হলো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সম্পৃক্ত কার্যাবলি যা কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়ে থাকে। অন্য কথায় এটি কম্পিউটারের মাধ্যমে কোন সুনির্দিষ্ট সমাধানে সংঘটিত কার্যাবলিকে নির্দেশ করে। হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার সিস্টেম ডিজাইন, তৈরি ও উন্নয়ন করা, বিভিন্ন ধরনের তথ্যকে সংগঠিত, ব্যবস্থাপনা ও প্রসেসিংকরণ, কম্পিউটার বিষয়ে কম্পিউটারের মাধ্যমে গবেষণা করা, কম্পিউটার সিস্টেমের বুদ্ধিমত্তার উন্নয়ন, যোগাযোগ ও বিনোদনমূলক মিডিয়া তৈরি ও তা কম্পিউটার ব্যবহার করে পরিচালনা করা এ সকল বিষয় কম্পিউটিং এর অন্তর্ভুক্ত। কম্পিউটিং এর ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন সিস্টেম এবং তথ্য প্রযুক্তি।

রেডিও (Radio)

রেডিও একটি গ্রাহকযন্ত্র। রিসিভারের মাধ্যমে বেতারতরঙ্গ ধারণ করে তাকে এমপ্লিফাই করে বাজিয়ে রেডিওতে শোনা যায়। দূরবর্তী স্থানে বেতার তরঙ্গ পাঠিয়ে শব্দ স্থানান্তরিত করা হয়। স্থানীয়ভাবে সম্প্রচারিত এএম (AM), এফএম (FM), আন্তর্জাতিকভাবে সম্প্রচারিত (শর্টওয়েভ) তরঙ্গ এ যন্ত্র দিয়ে গ্রহণ করা হয়। সম্প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে Amplitude Modulation বা AM কিংবা Frequency Modulation বা FM ব্যান্ডে এসব শব্দ বা অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচারিত হয় এবং

গ্রাহক যন্ত্রের (রেডিও এন্টেনার) মাধ্যমে গৃহীত হয়। এরপর গৃহীত সংকেত এমপ্লিফায়ারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে স্পিকারের দ্বারা শব্দ সৃষ্টি করা হয়। এভাবে রেডিওতে শব্দ শোনা যায়। বর্তমানে বহুল জনপ্রিয় হলো FM (Frequency Modulation) রেডিও। বাংলাদেশে বেশ কিছু এফএম রেডিও চ্যানেল রয়েছে। রেডিও টুডে, রেডিও স্ফূর্তি, রেডিও মেট্রোওয়েভ ইত্যাদি ব্যক্তি মালিকাধিন বাংলাদেশি এফএম রেডিও।

টেলিভিশন (Television)

টেলিভিশন ছবি ও শব্দ প্রেরণযন্ত্র। এটি একটি একমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা। এতে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রচার কেন্দ্র থেকে রেকর্ডকৃত অথবা ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে ধারণকৃত ইলেক্ট্রনিক সিগন্যাল পাঠানো হয় এবং উক্ত সম্প্রচার কেন্দ্রের চ্যানেলে সংযোগকৃত টেলিভিশন সেটে তথ্য, ছবি, শব্দ এবং লাইভ প্রোগ্রাম ইত্যাদি দেখা যায়। বিগত শতাব্দীর বিস্ময়কর আবিষ্কার টেলিভিশন বিশ্ব সমাজকে বদলে দিয়েছে। বর্তামনে পৃথিবীর চারপাশে শত শত স্যাটেলাইট স্থাপনের ফলে আমরা পাচ্ছি স্যাটেলাইট টেলিভিশনের অসংখ্য টেলিভিশনের অসংখ্য চ্যানেল। একটি সাধারণ টেলিভিশন ব্রডকাস্ট সিস্টেমের উপাদানসমূহ হলো-

- ইমেজ সোর্স। ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে ধারণকৃত ইলেক্ট্রনিক সিগন্যাল অথবা ভিডিও টেপ রেকর্ডার।
- সাউন্ড সোর্স। মাইক্রোফোনের ইলেক্ট্রনিক সিগন্যাল অথবা ভিডিও টেপ রেকর্ডার অথবা ফিল্ম এর অডিও আউটপুট।
- একটি ট্রান্সমিটার, যা রেডিও সিগন্যাল তৈরি করে এবং এগুলোকে পিকচার এবং সাউন্ডে এনকোড করে।
- সম্প্রচারিত সিগন্যাল গ্রহণ করার জন্য একটি এন্টিনা।
- একটি রিসিভার (টিউনার), যা ব্রডকাস্ট সিগন্যাল থেকে পিকচার এবং সাউন্ডকে ডিকোড করে।
- একটি ডিসপ্লে ডিভাইস, যা ইলেক্ট্রিক্যাল সিগন্যালকে ভিজুয়াল ইমেজে পরিণত করে।
- একটি অডিও এমপ্লিফাইয়ার এবং লাউডস্পিকার, যা ইলেক্ট্রিক্যাল সিগন্যালকে সাউন্ড ওয়েভ (কথা, গান এবং অন্যান্য সাউন্ড) এ পরিণত করে।

স্যাটেলাইট (Satellite)

পৃথিবীর চারদিকে প্রদক্ষিণ করে এমন স্থানে স্থাপিত বিশেষ ধরনের তারবিহীন রিসিভার/ট্রান্সমিটার হলো স্যাটেলাইট। বর্তমানে শত শত স্যাটেলাইট ((কৃত্রিম উপগ্রহ) কার্যত ব্যবহৃত হচ্ছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস, টেলিভিশন সম্প্রচার, অপেশাদার রেডিও যোগাযোগ, ইন্টারনেট যোগাযোগ এবং গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (Global Positioning System-GPS)এর মতো বিভিন্ন যোগাযোগমূলক কাজে স্যাটেলাইটের ব্যবহার হয়। যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত স্যাটেলাইটগুলোকে বলা হয় কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট। এই স্যাটেলাইটগুলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। টেলিযোগাযোগ, বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল তথ্য (টেক্সট, শব্দ, স্থির, সচল ছবি) সঞ্চালন, পৃথিবীর বাইরের নভোযান থেকে ভূপৃষ্ঠের সাথে যোগাযোগ, বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ইত্যাদির জন্য এই স্যাটেলাইটগুলো ব্যবহৃত করা হয়ে থাকে।

বহুসংখ্যক ট্রান্সপন্ডার থাকায় স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ ডেটা আদান-প্রদান করা সম্ভব। দূর-দূরান্তে বাস করা লোকজনের জন্য স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন খুবই উপকারী ভূমিকা পালন করে। কারণ এই পদ্ধতি সিগন্যাল গ্রহণ ও প্রেরণের ক্ষেত্রে খুবই শক্তিশালী লং ডিসটেন্স ট্রান্সমিশন সুবিধা প্রদান করে। ফলে পৃথিবীর একপ্রান্তের বসবাসকারী লোকজন অন্য প্রান্তে বসবাসকারী লোকজনের সংস্পর্শে থাকতে পারে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের গোপন মিশন পরিচালনা, জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত ক্ষেত্রগুলোতে স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ব্যবহার করা যায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়কালীন সময় যেখানে সব ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে তখন স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করা যায়।

একক কাজ : ব্যক্তিগতভাবে আমরা কি কি তথ্য প্রযুক্তি ডিভাইস ব্যবহার করি তার একটি তালিকা তৈরি কর।

ইন্টারনেট (Internet)

ইন্টারনেট হলো পৃথিবীজুড়ে বিস্তৃত অসংখ্য নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে গঠিত একটি বৃহৎ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা। ইন্টারনেটকে নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেটওয়ার্কও বলা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেকগুলো নেটওয়ার্কের সমন্বিত ব্যবস্থাই ইন্টারনেট। ইন্টারনেটের উপাদান হলো এর ব্যবহারকারী, তথ্য, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, কম্পিউটার প্রভৃতি। মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এর পত্তন ঘটে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ নেটওয়ার্ক হিসেবে ইন্টারনেটকে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কারণ বর্তমানে ইন্টারনেট সারা পৃথিবীকে গ্লোবাল নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছে। ইন্টারনেটে সংযুক্ত কোনো কম্পিউটার বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য সার্ভার ও কম্পিউটার থেকে তথ্য অ্যাকসেস করতে পারে।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা (Advantages of using Internet)

ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেসব সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় হলো–

১. ইন্টারনেট হলো তথ্যের বিশাল ভাণ্ডার। এমন কোন তথ্য নেই যা ইন্টারনেটে পাওয়া যায় না। ইন্টারনেটে যুক্ত হয়ে কাঙ্ক্ষিত তথ্যের নাম লিখে সার্চ করলেই বিশ্বের অসংখ্য সার্ভারে থাকা তথ্যগুলো প্রদর্শিত হয়।

২. ইন্টারনেটের মাধ্যমে মুহূর্তেই বিশ্বের যেকোন প্রান্তে ই-মেইল করে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়। ই-মেইলের সাথে এটাচ করে বড় ডকুমেন্ট বা ফাইল যুক্ত করে পাঠানো যায়।

৩. ইন্টারনেটের মাধ্যমে ফ্যাক্স সুবিধা পাওয়া যায়।

৪. VOIP এর মাধ্যমে প্রচলিত ফোনের চাইতে খুব কম খরচে বিশ্বের যেকোন প্রান্তে কথা বলা যায়।

৫. ইন্টারনেট টিভি ও ইন্টারনেট রেডিও চালুর ফলে ঘরে বসেই কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের টেলিভিশন ও রেডিও চ্যানেলের অনুষ্ঠান উপভোগ করা যায়।

৬. বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার, ফ্রিওয়্যার, বিনোদন উপকরণ ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে সংগ্রহ করা যায়।

৭. সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকার ইন্টারনেট সংস্করণ প্রকাশিত হবার ফলে এখন ঘরে বসেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পত্রপত্রিকা পড়া যায়।

৮. ইন্টারনেট ব্যবহার করে ই-কমার্সের সাহায্যে ঘরে বসেই পণ্য কেনা যায়।

৯. ঘরে বসেই বিশ্বের নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা গ্রহণ করা যায়।

১০. ইয়াহু মেসেঞ্জার, গুগল টক, স্কাইপি ইত্যাদি ইন্সট্যান্ট মেসেঞ্জারের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্বের যেকোন প্রান্তে থাকা যেকোন ব্যক্তির সাথে টেক্সট ও ভিডিও শেয়ার করা যায়।

১১. অনলাইনে চিকিৎসা সেবা নেয়া যায়।

১২. গুগল ম্যাপস এর মাধ্যমে বিশ্বের যেকোন স্থানের স্যাটেলাইট মানচিত্র দেখে ওই স্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। ওইসব স্থানের ছবি জুম করে বড় করে খুব কাছে থেকেও দেখা যায়।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা এবং অসুবিধা আলোচনা করবে।

ই-মেইল (E-mail)

ই-মেইল হলো কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা। ই-মেইল করে টেক্সট বার্তার সাথে কম্পিউটার ফাইলও পাঠানো যায়। লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সীমিত স্থানের মধ্যে এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বের যেকোন স্থানে ই-মেইল পাঠানো যায়। বিভিন্ন ই-মেইল প্রোগ্রাম ব্যবহার করে মেইল পাঠানো যায়। ই-মেইল প্রোগ্রামে ঢুকে ই-মেইল টাইপ করে প্রাপকের ঠিকানা নির্দিষ্ট করে ইন্টারনেটে যুক্ত হয়ে পাঠানো (Send) নির্দেশ দিলে ই-মেইল তথ্য সরাসরি প্রাপকের কম্পিউটারে না গিয়ে তার টার্মিনাল বা ওয়ার্কস্টেশন বা সার্ভারে গিয়ে জমা হয়। প্রাপক তার নামে কোন মেইল আসছে কিনা তা অনুসন্ধানের নির্দেশ দিলে

টার্মিনাল থেকে প্রাপকের কম্পিউটারে মেইলটি চলে আসে। একটি মেইল একই সঙ্গে অনেকের নিকট পাঠানো যায়। অন্য প্রোগ্রামে করা (যেমন, এমএস-ওয়ার্ড) ফাইলকে ই-মেইলের সাথে যুক্ত করে পাঠানো যায়। একে ফাইল এটাচমেন্ট (Attachment) বলা হয়। এটাচমেন্ট করে ভিডিও এবং অডিও ফাইলও পাঠানো যায়।

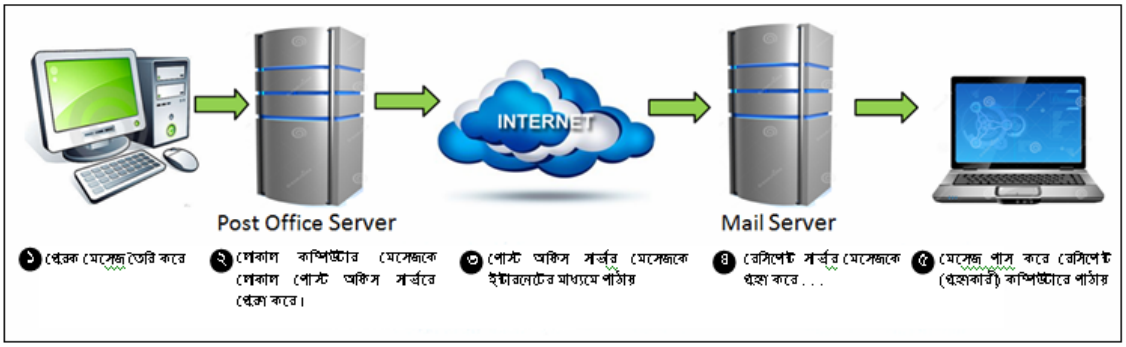

চিত্র ঃ ই-মেইল প্রক্রিয়া

ই-মেইলের সুবিধা (Advantages of E-mail)

১. ব্যবহার করা সহজ। সহজে পাঠানো যায় এবং গ্রহণ করা যায় এবং কম্পিউটারে সংরক্ষণ করে রাখা যায়।
২. সবচেয়ে দ্রুত। মুহূর্তেই পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে পাঠানো যায়।
৩. ই-মেইলের ভাষা সহজ।
৪. কোন গ্রুপ লোকজনের সাথে দ্রুত যোগাযোগ করা যায়।
৫. ই-মেইলের সাথে এটাচ করে অন্য প্রোগ্রাম বা ফাইল (লেখা, অডিও, ভিডিও) পাঠানো যায়।
৬. একই মেইল সিসি করে অনেকের কাছে পাঠানো যায়।
৭. কাগজের ব্যবহার হয় না বিধায় পরিবেশের জন্য সহায়ক।
৮. ই-মেইলের মাধ্যমে সহজেই খুব কম খরচে কোন প্রোডাক্ট মার্কেটিং করা যায়।
৯. সাধারণ প্রাপ্ত মেইলের বিপরীতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোন উত্তর পাঠানোর ব্যবস্থা করা যায়।

ডিজিটাল টেলিফোন (Digital Telephone)

আধুনিক ডিজিটাল সব সুবিধা নিয়ে তৈরি টেলিফোনকে ডিজিটাল টেলিফোন বলে। ডিজিটাল টেলিফোন ব্যবহার করে পরিপূর্ণ সুবিধা নিতে চাইলে টেলিফোনের নেটওয়ার্কটিও ডিজিটাল মানের হতে হয়। বর্তমানে অধিকাংশ ল্যান্ডফোনের নেটওয়ার্কই ডিজিটাল সিস্টেমের এবং সে সাথে এ সেবা গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত ফোনগুলোও ডিজিটাল হয়ে থাকে। Public Switched Telephone Network (PSTN) হলো ডিজিটাল টেলিফোন নেটওয়ার্কের একটি সাফল্যের ধারা। ডিজিটাল টেলিফোন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এখন একই ফোন লাইনে ভয়েস কলের পাশাপাশি ডেটাও প্রেরণ করা সম্ভব। এ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট, ভিওআইপি, এসএমএস ইত্যাদি সেবা পাওয়া যায়।

ডিজিটাল টেলিফোনের উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলো হলো :

১. কর্মদক্ষতার দিক থেকে এ ফোন অ্যানালগ ফোনের চেয়ে এগিয়ে।
২. অ্যানালগ ফোনের মতো ডায়াল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফোন নম্বর প্রবেশ করানোর পরিবর্তে বাটনে চেপেই ফোন নম্বর এন্ট্রি করা যায়।
৩. এ ফোনে অধিক নিরাপত্তা ও প্রাইভেসি পাওয়া যায়।
৪. খরচ অনেক কম।
৫. আন্তর্জাতিক ও ওয়াই এরিয়ার রোমিং সুবিধা বেশি।

মোবাইল ফোন (Mobile Phone)

চিত্র : বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোন

মোবাইল ফোন হলো একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা বেস স্টেশনের একটি সেলুলার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ফুল ডুপ্লেক্স দ্বিমুখী রেডিও টেলিকমিউনিকেশন্সকে ব্যবহার করে থাকে। এ ফোনকে মোবাইল, সেলুলার ফোন, সেলফোন নামেও ডাকা হয়ে থাকে। মোবাইল ফোনের কভারেজের আওতায় যেকোনো স্থানে এটি বয়ে বেড়ানো যায়। রোমিং সেবার আওতায় মোবাইল ফোনগুলো এক দেশ থেকে অন্য দেশে নিয়েও ব্যবহার করা যায়।

মোবাইল ফোনের সুবিধাসমূহ :

১. সাথে করে সহজে সব জায়গায় বহন করা যায় (পোর্টেবিলিটি বা মোবিলিটির সুবিধাসংবলিত) ও যে কোন স্থান থেকে যোগাযোগ করা যায়।
২. স্থান পরিবর্তন করা অবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ স্থাপন।
৩. কল ডাইভার্ট, হোল্ড রাখা কিংবা বাতিল করা।
৪. স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ, অডিও–ভিডিও কিংবা রেডিও–টিভির ব্যবহার।
৫. ইন্টারনেট সংযুক্ত করে ওয়েব ব্রাউজিং করা যায় এবং ই-মেইল ব্যবহার করা যায়।
৬. SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) সার্ভিস আদান-প্রদান।
৭. টাচ স্ক্রীন ও হাতের লেখা সনাক্ত করা।
৮. একই সেটে একাধিক সিম ব্যবহার।
৯. Global Positioning System (GPS) সুবিধা, কল ট্র্যাকিং বা ব্যবহারকারী ও তার অবস্থান সনাক্ত করা।
১০. Bluetooth, Infrared প্রভৃতি ওয়্যারলেস সিস্টেম।

টেলিকনফারেন্সিং (Teleconferencing)

টেলিফোন সংযোগ ব্যবহার করে কম্পিউটার অডিও-মডেম-ভিডিও যন্ত্রের সাহায্যে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কোন সভায় অংশগ্রহণ করার পদ্ধতি হচ্ছে টেলিকনফারেন্সিং। টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থান হতে সভা অনুষ্ঠান করে কার্যবিবরণী জানা, মতামত, রিপোর্ট পেশ করা, সিদ্ধান্ত নেয়া ইত্যাদি করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিকে টেলিকনফারেন্সিং বলা হয়। টেলিকনফারেন্সিং-এর সাহায্যে একই স্থানে না এসে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের একদল লোক সভায় মিলিত হতে পারে। কয়েকজনের একটি ছোট দল অথবা অনেক লোকের বড় দল এ সভায় মিলিত হতে পারেন। বাসায় বসে একাকী একজনও এ সভার সভাসদ হতে পারেন। টেলিকনফারেন্স কম্পিউটারাইজড কনফারেন্স অথবা সিসি নামে পরিচিত। ১৯৭৫ সালে মরি টারফ এ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের আমলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশাসকদের মধ্যে টেলিকনফারেন্স ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

চিত্র ঃ টেলিকনফারেন্সিং

কনফারেন্স সবার জন্য উন্মুক্ত হতে পারে (পাবলিক কনফারেন্স), নির্দিষ্ট পাসওয়ার্ড দিয়ে একদল লোক খুলতে পারে (ক্লোজড কনফারেন্স), অথবা এটি সীমিত হতে পারে যাতে যে কেউ কার্যবিবরণী দেখতে না পারেন; কিন্তু শুধু অংশগ্রাহী বার্তায় মন্তব্য জুড়ে দিতে পারেন (রিড-অনলি কনফারেন্স)। বুলেটিন বোর্ডের মতো সাধারণ টেলিকনফারেন্সিংয়ে একই সময়ে সকলকে সংযোগ রক্ষা করতে হয় না বিধায় এ প্রক্রিয়া অনেকটা ইলেকট্রনিক মেইলের মতো।

ভিডিও কনফারেন্সিং (Video Conferencing)

টেলিকনফারেন্সিংয়ের আরেকটি পদ্ধতির সাহায্যে অংশগ্রহণকারীরা পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে পারে। এমনকি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান হতেও এ সভায় অংশগ্রহণ করা যায়। এতে অন্যান্য যন্ত্রপাতির সাথে ভিডিও ক্যামেরা ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিকে ভিডিও কনফারেন্সিং বলা হয়। সহজভাবে বলতে গেলে **ভিডিও কনফারেন্সিং হলো এক সারি ইন্টারঅ্যাকটিভ টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি যেগুলো দুই বা ততোধিক অবস্থান হতে নিরবচ্ছিন্ন দ্বিমুখী অডিও এবং ভিডিও সম্প্রচারের মাধ্যমে একত্রে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ দেয়।** একে 'ভিজ্যুয়াল কোলাবোরেশন' নামেও কেউ কেউ অভিহিত করে থাকেন এবং এটি গ্রুপওয়্যারের একটি ধরন। তবে এটি ভিডিওফোনের চেয়ে ভিন্নতর। কারণ ভিডিওফোনের মাধ্যমে পৃথক পৃথকভাবে ভিডিও যোগাযোগ করা যায়। আর ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সকলে একত্রিত অবস্থায় পারস্পরিক আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতে পারেন। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত উপকরণগুলো প্রয়োজন–

১. মাল্টিমিডিয়া কম্পিউটার (Multimedia computer)
২. ওয়েবক্যাম (Webcam)
৩. ভিডিও ক্যাপচার কার্ড (Video capture card)
৪. মডেম (Modem)
৫. মাইক্রোফোন (Microphone)
৬. টেলিফোন সংযোগ (Telephone connection)
৭. ইন্টারনেট সংযোগ (Internet connection)
৮. প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারসমূহ (Required software)

চিত্র ঃ ভিডিও কনফারেন্সিং

এ পদ্ধতি যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন ধরনের সম্ভাবনা তৈরি করেছে। বর্তমানে ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবসায়-বাণিজ্য ছাড়াও শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে অনেক দূরে অবস্থানরত কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারের সাথে রোগী সরাসরি কথা বলতে পারেন যা টেলিমেডিসিন নামে পরিচিত। ভ্রমণ ভাড়া, থাকা, খাওয়া, সময় বাঁচিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য এটি একটি অত্যন্ত সহায়ক উপায়। মাইক্রোসফট নেটমিটিং একটি জনপ্রিয় ভিডিও কনফারেন্সিং সফটওয়্যার। ভিডিও কনফারেন্সিং এর ব্যাপক ব্যবহার ইদানিং বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতেও দেখা যাচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন টক শো তে ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে থাকা ব্যক্তিরা একইসাথে টক শো তে অংশগ্রহণ করতে পারে। অনেক সময়ই দেখা যায় বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি একই সাথে তাদের আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন যা আগে কল্পনাও করা যেত না। আর এর সবই তথ্য প্রযুক্তির অবদান।

Skype (স্কাইপি) : একটি ফ্রি ভিওআইপি [ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল] সফটওয়্যার। এই মেসেঞ্জার সফটওয়্যারটির মাধ্যমে এর ব্যবহারকারীগণ নিজেদের মধ্যে অডিও ভিডিও চ্যাটিং সুবিধার পাশাপাশি কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে বিনামূল্যে এবং কম্পিউটার থেকে প্রচলিত টেলিফোনে স্বল্পমূল্যে বিশ্বব্যাপী কথা বলতে পারেন। মেসেঞ্জারটি www.skype.com সাইট থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করে নেয়া যায়। ভিডিও কনফারেন্সিং করার জন্য এ সফটওয়্যারটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মাইক্রোসফট স্কাইপি ডিভিশন এ সফটওয়্যারটি ডেভলপ করে। sky এবং peer থেকে Skype শব্দটি হয়েছে।

একক কাজ : ভিডিও কনফারেন্সিং করার জন্য কি কি যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তার তালিকা তৈরি কর।

টেলিকনফারেন্সিং এবং ভিডিও কনফারেন্সিং এর মধ্যে পার্থক্য :

তুলনার বিষয়	টেলিকনফারেন্সিং	ভিডিও কনফারেন্সিং
১. মূল বৈশিষ্ট্য	সভা সমাবেশগুলো হয়ে থাকে টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে যা কথোপকথন এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।	সভা সমাবেশে উপস্থিত লোকজন একে অপরকে স্ক্রিনে দেখতে পারে।
২. যন্ত্রপাতি ও সফটওয়্যার	টেলিকনফারেন্সিং এ ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সফটওয়্যারগুলো তুলনামূলকভাবে কম শক্তিশালী হয়ে থাকে।	ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি যন্ত্রপাতি ও শক্তিশালী সফটওয়্যারের প্রয়োজন পড়ে।
৩. ব্যবহার	মূলত ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই বেশি ব্যবহৃত হয়।	ব্যবসায়-বাণিজ্যে, স্বাস্থ্যখাতের টেলিমেডিসিন সেবায়, শিক্ষাখাতে বেশি ব্যবহৃত হয়।

সার-সংক্ষেপ

তথ্য প্রযুক্তি (Information Technology) : কম্পিউটার এবং টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, একত্রীকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিনিময় বা পরিবেশনের ব্যবস্থাকে তথ্য প্রযুক্তি বলা হয়।

কম্পিউটার (Computer) : একটি অত্যাধুনিক ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র, যা নিজস্ব স্মৃতিভাণ্ডারে সুনির্দিষ্ট এক বা একাধিক কাজের নির্দেশাবলি সংরক্ষণ করে রাখে। ব্যবহারকারী ডেটা বা উপাত্ত সরবরাহ করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম্পিউটার প্রক্রিয়াকরণ (প্রসেসিং) করে কাজের ফলাফল প্রদান করে।

স্যাটেলাইট (Satellite) : পৃথিবীর চারদিকে প্রদক্ষিণ করে এমন স্থানে স্থাপিত বিশেষ ধরনের তারবিহীন রিসিভার/ট্রান্সমিটার হলো স্যাটেলাইট।

ইন্টারনেট (Internet) : ইন্টারনেট হলো পৃথিবীজুড়ে বিস্তৃত অসংখ্য নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে গঠিত একটি বৃহৎ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা। ইন্টারনেটকে নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেটওয়ার্কও বলা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেকগুলো নেটওয়ার্কের সমন্বিত ব্যবস্থাই ইন্টারনেট।

ই-মেইল (E-mail) : ই-মেইল হলো কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা।

মোবাইল ফোন (Mobile Phone) : মোবাইল ফোন হলো একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা বেস স্টেশনের একটি সেলুলার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ফুল ডুপ্লেক্স দ্বিমুখী রেডিও টেলিকমিউনিকেশনকে ব্যবহার করে থাকে। এ ফোনকে মোবাইল, সেলুলার ফোন, সেলফোন নামেও ডাকা হয়।

টেলিকনফারেন্সিং (Teleconferencing) : টেলিফোন সংযোগ ব্যবহার করে কম্পিউটার অডিও-মডেম-ভিডিও যন্ত্রের সাহায্যে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কোন সভায় অংশগ্রহণ করার পদ্ধতি হচ্ছে টেলিকনফারেন্সিং।

ভিডিও কনফারেন্সিং (Video Conferencing) : ভিডিও কনফারেন্সিং হলো একসারি ইন্টারঅ্যাকটিভ টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি যেগুলো দুই বা ততোধিক অবস্থান হতে নিরবচ্ছিন্ন দ্বিমুখী অডিও এবং ভিডিও সম্প্রচারের মাধ্যমে একত্রে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ দেয়।

অনুশীলনী-১ (১ম অংশ)

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশে কোনটির অবদান সবচেয়ে বেশি?
ক. রেডিও খ. টেলিফোন
গ. টেলিভিশন ঘ. কম্পিউটার

২. টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে সভা করাকে কী বলা হয়?
ক. টেলিকনফারেন্স খ. টেলিকমিউনিকেশন
গ. ভিডিও কনফারেন্স ঘ. ভিডিও চ্যাটিং

৩. রোগী দূরের ডাক্তারের কাছে থেকে সেবা পেতে পারে কোনটির মাধ্যমে?
ক. ভিডিও কনফারেন্স খ. অনলাইন চ্যাটিং
গ. টেলিকনফারেন্স ঘ. ভয়েস কল

৪. সাম্প্রতিক সময়ে কোনটির ব্যাপক প্রসার হয়েছে?
ক. টেলিভিশন খ. ইন্টারনেট
গ. কম্পিউটার ঘ. মোবাইল

৫. তথ্য প্রযুক্তি বলতে মূলত কী বুঝায়?
ক. তথ্য রাখা ও ব্যবহার করার প্রযুক্তি
খ. তথ্য বিক্রির প্রযুক্তি
গ. তথ্য বিকৃতির প্রযুক্তি ঘ. শুধুমাত্র তথ্য রাখার প্রযুক্তি

৬. স্কাইপি বলতে কী বুঝায়?
ক. ইলেকট্রনিক্স গুডস
খ. ভিডিও চ্যাটিং ব্যবস্থার মাধ্যম
গ. রেডিও স্টেশন ঘ. স্পেইস স্টেশন

৭. বর্তমান সময়ের আধুনিক সকল যোগাযোগ ও সম্প্রচার ব্যবস্থাই মূলত কী নির্ভর?
ক. স্যাটেলাইট খ. রেডিও
গ. টেলিভিশন ঘ. দৈনিক পত্রিকা

৮. টেলিভিশন একটি—
ক. প্রেরক যন্ত্র
খ. একমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা
গ. দ্বিমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা ঘ. টেলিকমিউনিকেশন

৯. কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভিন্ন স্থানে থেকেও মিটিং এর কাজ সম্পন্ন করা যায়?
ক. ই-মেইল খ. ফেইসবুক
গ. টেলিকনফারেন্সিং ঘ. টুইটার

১০. কোনটি আবিষ্কারের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়?
ক. কম্পিউটার খ. টেলিফোন
গ. কৃত্রিম উপগ্রহ ঘ. টেলিগ্রাফ

বহুনির্বাচনী প্রশ্নের উত্তর

১	ঘ	২	ক	৩	ক	৪	খ	৫	ক	৬	খ	৭	ক	৮	খ	৯	গ	১০	ক

■ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১১. ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারীরা—
i. একে অপরের ছবি দেখতে পারে
ii. প্রত্যেকে প্রত্যেকের কথোপকথন শুনতে পায়
iii. নিজেদের মধ্যে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতে পারে।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১২. চাকরিজীবীদের কাছে ইন্টারনেট ব্যবস্থা জনপ্রিয়, কারণ এ পদ্ধতিতে—
i. যাতায়াত খরচ কম হয়
ii. অতিরিক্ত উপার্জন করা যায়
iii. সময়ের সাশ্রয় হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii ও iii খ. i ও iii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৩ ও ১৪ প্রশ্নের উত্তর দাও :
আরমান তার কুয়েত প্রবাসী বোনের টেলিফোনে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। কিন্তু তার মা প্রবাসী মেয়ে ও দুই নাতির সাথে দেখে কথা বলার জন্য আরমানকে পিড়াপিড়ি করাতে সে একটা ব্যবস্থা নিতে সম্মত হয়।

১৩. আরমান মা-এর অনুরোধ পুরণে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে?
ক. টেলিকনফারেন্সিং খ. ই-মেইল
গ. ফ্যাক্স ঘ. ভিডিও কনফারেন্সিং

১৪. আরমানের মায়ের জন্য তার মেয়ে ও নাতির সাথে স্বউদ্যোগে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা—
i. ফেইসবুক ii. বিং
iii. স্কাইপি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৫ ও ১৬ প্রশ্নের উত্তর দাও :
আলম সাহেব একজন সফল ব্যবসায়ী। তিনি তাঁর ব্যবসা বাণিজ্যে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় কেনাবেচা করেন।

১৫. আলম সাহেবের ব্যবসা–বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গৃহীত পদ্ধতিতে প্রয়োজন হয় —
i. ক্রেডিট কার্ড বহন করা ii. ডেবিট কার্ড বহন করা
iii. নগদ টাকা–পয়সা বহন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও iii খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৬. আলম সাহেবের গৃহীত পদ্ধতি বাস্তবায়নে কোন প্রযুক্তিটি মুখ্য ভূমিকা পালন করছে?
ক. আধুনিক প্রযুক্তি খ. কৃত্রিম প্রযুক্তি
গ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ঘ. যন্ত্র প্রযুক্তি

বহুনির্বাচনী প্রশ্নের উত্তর

১১	ক	১২	ক	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	খ	১৬	গ				

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
সুমনের বড় ভাই যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য সুমনের কাছ থেকে জরুরিভাবে কিছু ডকুমেন্টের চাহিদা দিলে সুমন এটাচ করে ইলেক্ট্রনিক মেইল পদ্ধতি ব্যবহার করে দ্রুত পাঠিয়ে দেয়। সুমন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এপ্লাই করেছে ব্রাউজ করে সে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছে।
ক. অডিও কনফারেন্সিং কী? ১
খ. কথা বলার পাশাপাশি ছবিও দেখা যায়- বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে সুমন যে প্রযুক্তিটি ব্যবহার করে দ্রুত তথ্য প্রেরণ করে সুবিধা পেয়েছে কীভাবে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে দ্রুত যে কোন তথ্য পাওয়ার সুবিধা সম্পর্কে তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
আসাদ এখন ঘরে বসেই নিজের প্রয়োজনীয় সকল তথ্য তার ল্যাপটপে পেয়ে যাচ্ছে। এই প্রযুক্তির সহায়তায় সে তার বাবাকে ধানক্ষেতের ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ দমনে করণীয় সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে। উক্ত এলাকার চেয়ারম্যান মঞ্জুর এলাহী প্রতিমাসে ঢাকায় থাকা তার কয়েকজন পরিচিত ডাক্তার বন্ধুদের থেকে গ্রামের মানুষের জন্য সরাসরি স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের ব্যবস্থা করে দেন।
ক. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কী? ১
খ. ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পত্র আদান প্রদানের সুবিধা অনেক-বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকের আসাদ কোন ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণ করেছে? ব্যাখা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের গৃহীত ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে কতটুকু সহায়ক বিশ্লেষণ কর। ৪

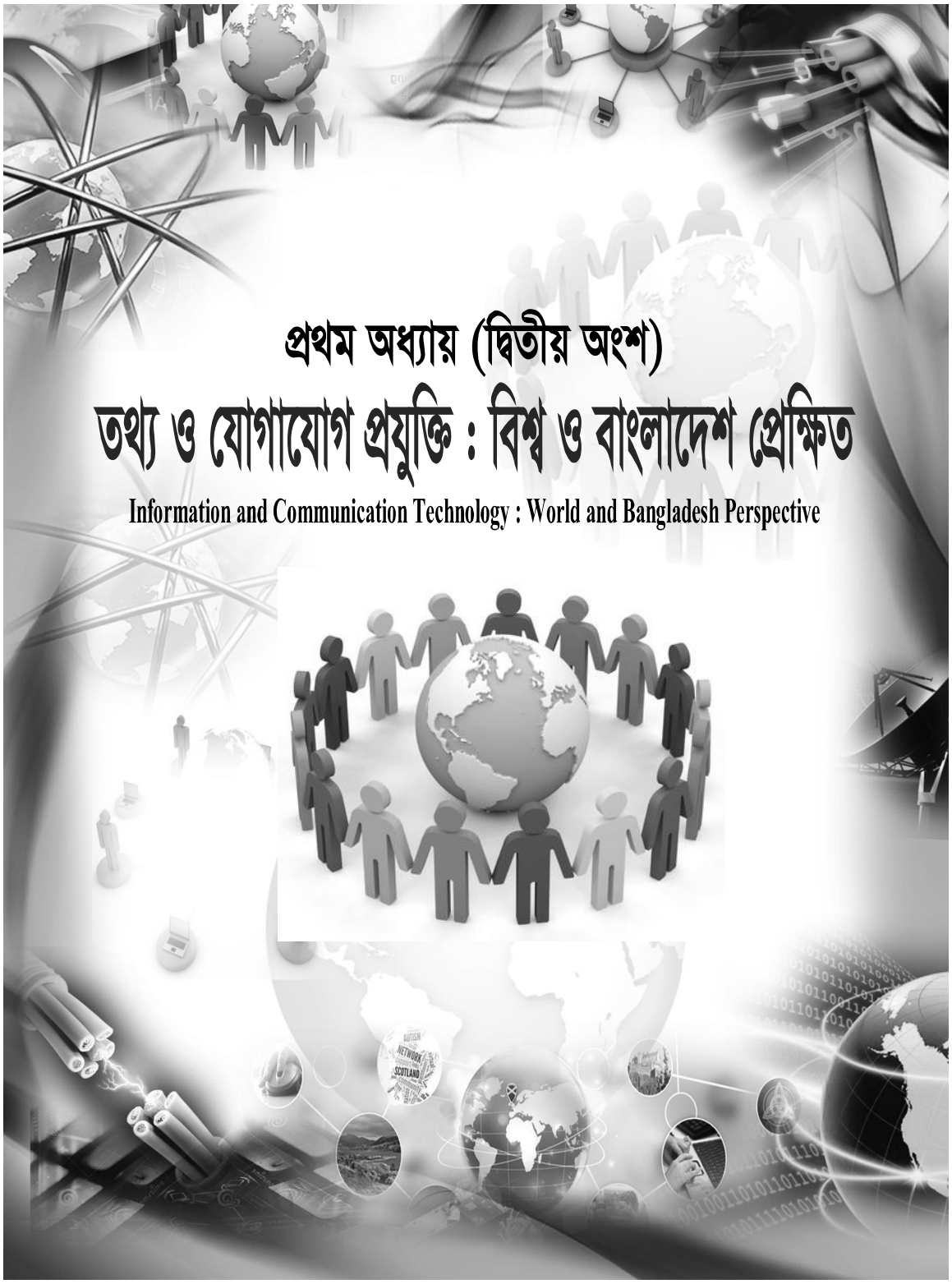

প্রথম অধ্যায় (দ্বিতীয় অংশ)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

Information and Communication Technology : World and Bangladesh Perspective

প্রথম অধ্যায় (দ্বিতীয় অংশ)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

Information and Communication Technology : World and Bangladesh Perspective

পিরিয়ড সংখ্যা : ১০

শিখনফল	বিষয়বস্তু
• বিশ্বগ্রামের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে • বিশ্বগ্রাম ধারণা সংশ্লিষ্ট প্রধান উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে। • বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান মূল্যায়ন করতে পারবে।	• বিশ্বগ্রামের ধারণা (Concept of global village) ○ যোগাযোগ ○ কর্মসংস্থান ○ শিক্ষা ○ চিকিৎসা ○ গবেষণা ○ অফিস ○ বাসস্থান ○ ব্যবসায়-বাণিজ্য ○ সংবাদ ○ বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ ○ সাংস্কৃতিক বিনিময়
• ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ধারণা বিশ্লেষণ করতে পারবে। বিশ্লেষণ করতে পারবে।	• ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (Virtual Reality) (Contemporary trends of ICT) ○ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) ○ রোবোটিক্স (Robotics) ○ ক্রায়োসার্জারি (Cryosurgery) ○ মহাকাশ অভিযান (Space Exploration) ○ আইসিটি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা (ICT Dependent Production) ○ প্রতিরক্ষা (Defense) ○ বায়োমেট্রিক্স (Biometrics) ○ বায়োইনফরমেটিক্স (Bioinformetics) ○ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic Engineering) ○ ন্যানো টেকনোলজি (Nanotechnology)
• তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারে নৈতিকতা বজায় রাখার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা
• সমাজ জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবে।	• সমাজজীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব
• অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে। • মূল্যবোধ বজায় রেখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হবে।	• তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন

১. বিশ্বগ্রামের ধারণা (Concept of Global Village)

Village বা গ্রাম হলো একটি ছোট গোষ্ঠি অথবা কতগুলো বাড়ির সমষ্টি। নির্দিষ্ট এলাকায় সীমিত আয়তনে একটি গ্রামের অবস্থান বিধায় গ্রামে বসবাসকারীরা সবাই সবাইকে চিনে। গ্রামে কোন তথ্য প্রকাশিত হলে মুহূর্তেই তা মুখে মুখে জানাজানি হয়ে যায়। গ্রামে যে কোন মুহূর্তে একজন আরেকজনের কাজে সহযোগিতা করে থাকে।

গ্লোবাল শব্দের অর্থ হলো বিশ্ব। গ্লোবাল ভিলেজ অর্থ বিশ্বগ্রাম। গ্লোবাল ভিলেজ হলো প্রযুক্তিনির্ভর একটি বিশ্ব যাতে অনেক দূরে অবস্থান করেও বিশ্বের সবদেশ সবজাতি একটি গ্রামের মতো সুবিধা পায়।

বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তেই গ্রামের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা হয়। কতকগুলো গ্রামের সমন্বয়ে শহর, কতকগুলো শহরের সমন্বয়ে একটি জেলা বা অঞ্চল এবং কতকগুলো জেলা ও অঞ্চলের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে একটি দেশ। আবার অসংখ্য দেশের সম্মিলিত ভৌগোলিক অবস্থানকে বিশ্ব বলে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে প্রযুক্তির কল্যাণে বিশ্বের পরিধি আজ ছোট হয়ে এসেছে। বৃহৎ প্রেক্ষাপটে সেই হিসেবে বিশ্বটাই হলো একটি গ্রাম।

বিশ্বগ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজ বলতে সাধারণত এমন একটি ধারণাকে বোঝানো হয় যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের লোকজন পরস্পরের সাথে সহজ যাতায়াত ও ভ্রমণ, গণমাধ্যম ও ইলেকট্রনিক যোগাযোগের (রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট প্রভৃতি) মাধ্যমে যুক্ত থাকে এবং ক্রমেই একটি একক কম্যুনিটিতে পরিণত হয়। বিভিন্ন ধরনের মিডিয়া বিশেষ করে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এর ব্যাপক ব্যবহার ও প্রভাবের কারণে আজ বিশ্বের কোনো এক দেশের এক প্রান্তের লোকজন অন্য প্রান্তের অন্য কোনো দেশের লোকের সাথে খুব সহজেই যোগাযোগ করতে পারছে। তথ্যের এই আদান প্রদান বিশ্বকে এতটাই কাছে নিয়ে এসেছে যে এটি এখন একটি গ্রাম বা ভিলেজ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ– বাংলাদেশে অবস্থানকারী কোনো ব্যক্তি এখন অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী কোনো ব্যক্তির সাথে তাৎক্ষণিকভাবে অনলাইনে যোগাযোগ করতে পারেন। টেলিফোন, টেলিভিশন, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট (মেসেঞ্জার, ই-মেইল, সোশ্যাল মিডিয়া) সহ আরও কিছু ইলেকট্রনিক মাধ্যম এক্ষেত্রে দূরত্বের ব্যবধানটি ঘুচিয়ে দিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

বিশ্বগ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজে আজকাল বিশ্বের একপ্রান্তের লোক অন্যপ্রান্তের লোকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। আজকের বিশ্বে আমরা মূলত একটি বিশ্বগ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজেই বসবাস করছি। যোগাযোগ, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষণা, অফিস, বাসস্থান, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সংবাদ, বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ এবং সাংস্কৃতিক উপাদান বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিশ্বগ্রামের বহুল প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের লোকজন এখন আন্তঃসংযুক্ত ও আন্তঃনির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

কানাডিয়ান দার্শনিক ও লেখক হারবার্ট মার্শাল ম্যাকলুহান (Herbert Marshall McLuhan) (July 21, 1911 – December 31, 1980) হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি বিশ্বগ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজ শব্দটিকে সকলের সামনে তুলে ধরে একে জনপ্রিয় করে তোলেন। ১৯৬২ সালে তাঁর প্রকাশিত 'The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man' এবং ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত 'Understanding Media: The Extensions of Man' বইয়ের মাধ্যমে এই বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করে।

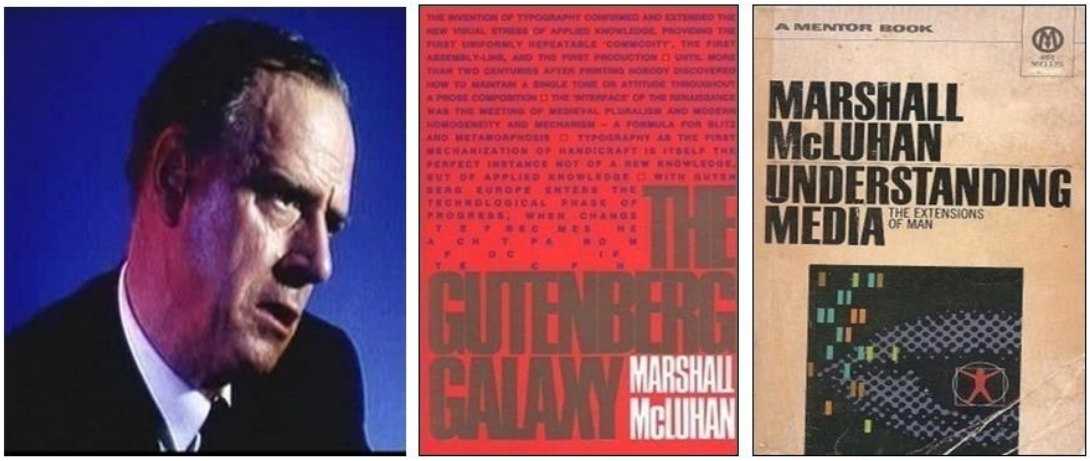

চিত্র : মার্শাল ম্যাকলুহান ও তাঁর লেখা বিখ্যাত দু'টি বই

দ্বিতীয় বইটিতে McLuhan বর্ণনা করেছেন কীভাবে বৈদ্যুতিক প্রযুক্তি এবং তথ্যের দ্রুত বিচরণ দ্বারা বিশ্ব একটি গ্রাম বা ভিলেজে রূপ লাভ করছে। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি সে সময় ছিল যুগান্তকারী যেখানে তিনি গ্লোবাল ভিলেজকে একটি ইলেকট্রনিক নার্ভাস সিস্টেম (মিডিয়া) হিসেবে অভিহিত করেছিলেন এবং এটি যে পৃথিবী নামক গ্রহটিকে দ্রুতই সমন্বিত করবে সেটি বুঝিয়েছিলেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যাপক উন্নয়ন এখন বিশ্বের সকল প্রান্তের মানুষকে পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।

গ্লোবাল ভিলেজ এর সংজ্ঞা

yourdictionary.com অনুযায়ী গ্লোবাল ভিলেজ হচ্ছে- "The definition of a global village is the idea that people are connected by easy travel, mass media and electronic communications, and have become a single community."
"গ্লোবাল ভিলেজ হলো একটি ধারণা যেখানে মানুষ সহজ যাতায়াত, গণমাধ্যম, ইলেক্ট্রনিক কমিউনিকেশন দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত এবং একটি একক কমিউনিটিতে পরিণত হয়।"

MacMillan dictionary অনুযায়ী গ্লোবাল ভিলেজ হচ্ছে-
"The modern world which all countries depend on each other and seem to be closer together because of modern communications and transport system."
"একটি আধুনিক দুনিয়া যেখানে সব দেশ একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল এবং আধুনিক যোগাযোগ এবং যাতায়াত ব্যবস্থার মাধ্যমে খুব বেশি কাছাকাছি মনে হয়।"

অক্সফোর্ড আমেরিকান ডিকশনারী অনুযায়ী গ্লোবাল ভিলেজ হচ্ছে- "The world considered a single community linked by telecommunications."

উপরের সব সংজ্ঞা অনুযায়ী বলা যায় **গ্লোবাল ভিলেজ হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর এমন একটি পরিবেশ যেখানে দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করেও পৃথিবীর সকল মানুষই একটি একক সমাজে বসবাস করার সুবিধা পায় এবং একে অপরকে সেবা প্রদান করে থাকে অর্থাৎ গ্লোবাল ভিলেজ হচ্ছে এমন একটি ধারণা যেখানে গোটা পৃথিবীটাকেই একটি গ্রাম হিসেবে বিবেচনা করা হয়।**

গ্লোবাল ভিলেজের সুবিধাসমূহ (Advantages of Global Village)

- বিভিন্ন দেশ এবং তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা যায়।
- ক্লিক করে মুহূর্তেই যে কোন দেশের তথ্য জানা যায়।
- মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের যে কোন স্থানের কোন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করা যায়।
- মানুষের কাজের দক্ষতা এবং গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- সহজেই বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল জানা যাচ্ছে।
- মুহূর্তেই বিশ্বের যেকোন প্রান্তে ই-মেইলের মাধ্যমে টেক্সট, অডিও এবং ভিডিও আদান-প্রদান করা যায়।
- বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার, ফ্রিওয়্যার, বিনোদন উপকরণ ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে সংগ্রহ করা যায়।
- বিভিন্ন শিক্ষামূলক সাইট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করে জ্ঞানার্জন করা যায়। অন-লাইনে যেকোন লাইব্রেরি থেকে বই পড়া যায় এবং ঘরে বসেই বিশ্বের নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা গ্রহণ করা যায়।
- টেলিমেডিসিন পদ্ধতিতে পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে বসে বিশ্বের নামকরা চিকিৎসকদের চিকিৎসা সেবা পাওয়া যায়।
- ইন্টারনেট টিভি ও ইন্টারনেট রেডিও চালুর ফলে ঘরে বসেই কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের টেলিভিশন ও রেডিও চ্যানেলের অনুষ্ঠান উপভোগ করা যায়।
- ঘরে বসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পত্রপত্রিকা পড়া যায়।
- ঘরে বসেই পণ্য কেনা বেচা করা যায়। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে এবং লেনদেন সহজ হচ্ছে।
- ওয়েবপেজে একটি বিজ্ঞাপন নিমেষেই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।
- স্যাটেলাইট টেলিভিশন, ইন্টারনেটনির্ভর অনলাইন সংবাদ মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের কোথায় কী ঘটছে সে খবরাখবর জানা যায়।
- ঘরে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আউটসোর্সিং করে উপার্জন করা যায়।

হারবার্ট মার্শাল ম্যাকলুহান এর জীবনী

হারবার্ট মার্শাল ম্যাকলুহান এ্যাডমন্টন শহরে এ্যালসি নাওমি ও হার্বার্ট এর্নেস্ট ম্যাকলুহান দম্পতির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন একজন মেথডিস্ট এবং এ্যাডমন্টন শহরে তার রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তার ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং ম্যাকলুহানের পিতা কানাডিয়ান আর্মিতে যোগদান করেন। অসুস্থতার কারণে ১৯১৫ সালে হার্বার্ট সেনাবাহিনী থেকে চাকরিচ্যুত হন এবং তারপর ম্যাকলুহান পরিবার ম্যানিটোবার উইনিপেগে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। মার্শাল সেখানেই বেড়ে ওঠেন এবং স্কুলে যাওয়া শুরু করেন। তিনি ইউনিভার্সিটি অব ম্যানিটোবা থেকেই ১৯৩৪ সালে ইংরেজিতে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি কেমব্রিজ থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং তাদের গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে প্রবেশ করেন। ১৯৩৯ সালে অভিনেত্রী Corinne Lewis কে বিয়ে করেন এবং তারা দু'জন ১৯৩৯-৪০ পর্যন্ত কেমব্রিজে অতিবাহিত করেন। সেখানে তিনি তার মাস্টার ডিগ্রি সম্পন্ন করে ডক্টোরাল থিসিসের কাজ শুরু করেন Thomas Nashe এবং ভার্বাল আর্টের উপর। ১৯৪০ এ ম্যাকলুহান সেইন্ট লুইস বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। ম্যাকলুহান ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত অনটারিও এর উইন্ডসোর শহরের অ্যাজামশান কলেজে শিক্ষকতা করেন। অতঃপর ১৯৪৬ এ ম্যাকলুহান টরেন্টোতে ফিরে যান এবং সেইন্ট মিশেল'স কলেজের ফ্যাকাল্টি হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫০ এর শুরুর দিকে ম্যাকলুহান কমিউনিকেশন এবং কালচারের উপর সেমিনার শুরু করেন যা ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত হতে থাকে। যেহেতু তার রেপুটেশন বাড়তে থাকে ফলে তিনি আরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কাজের অফার পেতে থাকেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ধরে রাখার জন্য ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠা করে সেন্টার ফর কালচার এন্ড টেকনোলজি। এ সময় তিনি তার প্রথম বড় কাজ : The Mechanical Bride (১৯৫১) প্রকাশ করেন যেটি ছিল সমাজ ও সংস্কৃতির উপর বিজ্ঞাপনের প্রভাবের উপর পরীক্ষামূলক একটি কাজ। এছাড়াও ১৯৫০ সাল জুড়ে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ জার্নাল এক্সপ্লোরেশন এডমন্ড কার্পেন্টারের সাথে মিলিতভাবে কাজ করে প্রকাশ করেন। ম্যাকলুহান ইউনিভার্সিটি অব টরেন্টোতে ছিলেন ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত এবং এর মধ্যে বেশীরভাগ সময় তিনি অতিবাহিত করেন সেন্টার ফর কালচার এন্ড টেকনোলজির প্রধান হিসেবে। মার্শাল এবং করোনি দম্পতির সন্তান সন্ততি ছিল ছয়টি, এরা হলেন এরিক, দুই জমজ মেরি এবং টেরসা, স্টেফানি, এলিজাবেথ এবং মাইকেল। বিশাল পরিবারের ব্যয় নির্বাহের জন্য ম্যাকলুহান বিজ্ঞাপনের কাজ শুরু করেন। এর পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন কর্পোরেট কোম্পানীতে যেমন আইবিএম এবং এটিএন্ডটিতে কনসাল্টিং এর কাজ শুরু করেন। ১৯৭৯ এর সেপ্টেম্বরে তিনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হন এবং ১৯৮০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ঘুমের মধ্যেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ম্যাকলুহানের বই The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man লেখা হয় ১৯৬১ সালে। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে কানাডাতে যা প্রকাশ করে ইউনিভার্সিটি অব টরেন্টো প্রেস। এই বইজুড়ে ম্যাকলুহান দেখিয়েছেন কীভাবে কমিউনিকেশন টেকনোলজি তথা আক্ষরিক লেখা, প্রিন্টিং প্রেস এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া বিভিন্ন দর্শনগত ভিত্তিকে প্রভাবিত করে এবং এর ফলশ্রুতিতে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো কত গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকে।

গ্লোবাল ভিলেজের অসুবিধাসমূহ (Disadvantages of Global Village)

- ইন্টারনেট হ্যাকিং করে তথ্য চুরি হওয়া।
- অসত্য তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে।
- জনগণ কোন কিছু পড়ে এর সূত্র যাচাই না করে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারে।
- নেটে বেশি সময় দেয়ার কারণে সত্যিকারের বন্ধুর চেয়ে ভার্চুয়াল বন্ধুর সংখ্যা বাড়তে পারে। এতে করে মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পেতে পারে।
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তথ্য চুরি করা। ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি।
- পর্ণোগ্রাফির মাধ্যমে সামাজিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হওয়া।
- সাইবার আক্রমণ সংঘটিত হওয়া।
- সহজে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ফলে কোন দেশের নিজস্ব সংস্কৃতির বিলুপ্তি ঘটা।
- প্রযুক্তির বেশি ব্যবহারের ফলে শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি হওয়া।

বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার উপাদানসমূহ (Elements for establishing Global Village)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদানে বিশ্বগ্রামের ধারণা সহজেই বাস্তবায়ন ও এর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। নিচে বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার প্রধান প্রধান উপাদানসমূহ উল্লেখ করা হলো।

১. হার্ডওয়্যার (Hardware);
২. সফটওয়্যার (Software);
৩. ইন্টারনেট সংযুক্ততা বা কানেকটিভিটি (Connectivity);
৪. ডেটা (Data); এবং
৫. মানুষের জ্ঞান বা সক্ষমতা (Capacity)।

১. **হার্ডওয়্যার (Hardware)** : বিশ্বগ্রামে যে কোনো ধরনের যোগাযোগ ও তথ্য আদান-প্রদানের জন্য সর্বপ্রথম যা প্রয়োজন তা হলো উপযুক্ত হার্ডওয়্যার সামগ্রীর। হার্ডওয়্যার বলতে এখানে কম্পিউটার আর এর সাথে যন্ত্রপাতি, মোবাইল ফোন, স্মার্ট ফোন, অডিও-ভিডিও রেকর্ডার, স্যাটেলাইট, রেডিও, টেলিভিশন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত ডিভাইসসমূহ।

২. **সফটওয়্যার (Software)** : বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার জন্য হার্ডওয়্যারের যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন সফটওয়্যারের। সফটওয়্যারের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের অপারেটিং সিস্টেম, ব্রাউজিং সফটওয়্যার, কমিউনিকেটিং সফটওয়্যার এবং প্রোগ্রামিং ভাষা।

৩. **ইন্টারনেট সংযুক্ততা বা কানেকটিভিটি (Connectivity) :** বিশ্বগ্রামের মেরুদণ্ড হলো নিরাপদভাবে রিসোর্স শেয়ার করার ইন্টারনেট সংযুক্ততা বা কানেকটিভিটি যার মাধ্যমে বিভিন্ন উপাত্ত ও তথ্য প্রতিটি মানুষের নিকট পৌঁছাতে পারে। নিরাপদ তথ্য আদান–প্রদানই হচ্ছে বিশ্বগ্রামের মূল ভিত্তি। নিরাপদ তথ্য প্রদানের জন্য প্রয়োজন নিরাপদ ইন্টারনেট সংযুক্ততা বা কানেকটিভিটি। এক্ষেত্রে টেলিকমিউনিকেশন, ব্রডকাস্টিং এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করে ইন্টারনেট কানেকশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

৪. **ডেটা (Data)** : ডেটা হচ্ছে অগোছালো বা এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু তথ্য বা **Information**। ডেটাকে প্রক্রিয়াকরণ বা প্রসেসিং করে ব্যবহারযোগ্য ইনফরমেশন বা তথ্যে পরিণত করা হয়। বিশ্বগ্রামে বসবাস করতে প্রয়োজন বিভিন্ন তথ্য যা ডেটা থেকে কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে পাওয়া যায়। বিশ্বগ্রামে ডেটা ও তথ্যকে মানুষ তার প্রয়োজনে একে অপরের সাথে বিনামূল্যে বা অর্থের বিনিময়ে শেয়ার করতে পারে।

৫. **মানুষের জ্ঞান বা সক্ষমতা (Capacity) :** বিশ্বগ্রামের উপাদানগুলোর মধ্যে মানুষের জ্ঞান বা সক্ষমতা অন্যতম। যেহেতু বিশ্বগ্রাম মূলত তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর তাই তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে মানুষের সচেতনতা ও সক্ষমতা ইত্যাদির উপর এর প্রয়োগ নির্ভর করছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবকাঠামো ব্যবহার করার জ্ঞান না থাকলে এর সুফল পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং বলা যায়– যে কোনো বিষয়ে জ্ঞান আহরণ বা বিতরণের জন্য এই প্রযুক্তিতে মানুষের জ্ঞান বা সক্ষমতা অত্যাবশ্যক।

বিশ্বগ্রামের ধারণা সংশ্লিষ্ট প্রধান উপাদানসমূহ (Related main elements of Global Village idea)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যাপক উন্নয়ন এখন বিশ্বের সকল প্রান্তের মানুষকে পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। বিশ্ব এখন গ্লোবাল ভিলেজে পরিবর্তিত হচ্ছে। গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্বগ্রাম ধারণার সাথে অনেক উপাদান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রধান প্রধান উপাদানগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো-

১. যোগাযোগ (Communication)
২. কর্মসংস্থান (Employment)
৩. শিক্ষা (Education)
৪. চিকিৎসা (Health care and treatment)
৫. গবেষণা (Research)
৬. অফিস (Office)
৭. বাসস্থান (Residence)
৮. ব্যবসায়-বাণিজ্য (Business)
৯. সংবাদ (News)
১০. বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ (Entertainment and Social communication)
১১. সাংস্কৃতিক বিনিময় (Cultural exchange)

১.১ যোগাযোগ (Communication)

তথ্য প্রযুক্তির ক্রমবিকাশের ফলে এখন তাৎক্ষণিক যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছে। ফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, ই-মেইল, অডিও-ভিডিও চ্যাটিং, এসএমএস, এমএমএস ইত্যাদি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অডিও এবং ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে ব্যবসায়িকসহ যেকোনো ধরনের কাজে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ– বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে অসংখ্য প্রতিনিধি একই সময়ে গ্রুপ কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারছেন। স্কাইপি বা অন্যান্য ভিডিও চ্যাটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে অনেক দূরে অবস্থানরত একজন আরেকজনের সাথে সরাসরি কথা বলা ও ছবি দেখার সুযোগ পান। এগুলো বিশ্বগ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজের একটি উৎকৃষ্ট নমুনা। রেডিওর মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে সম্প্রচারিত এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার রেডিও সার্ভিসের অনুষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে অজপাড়া গাঁয়ের কোনো ব্যক্তিও তাৎক্ষণিক বিভিন্ন ধরনের খবরাখবর পাচ্ছেন।

১.২ কর্মসংস্থান (Employment)

কর্মসংস্থানের বিশাল বাজার উন্মুক্ত করেছে ইন্টারনেট প্রযুক্তি। চাইলে এখন ঘরে বসেই অনলাইনে কাজ করা যায়। প্রচলিত ব্যবস্থায় কোনো কর্মীকে সশরীরে কর্মস্থলে গিয়ে কাজ করতে হয়। কিন্তু ইন্টারনেটের কল্যাণে এখন বিশ্বের যেকোনো দেশের যেকোনো কর্মী অন্য যেকোনো দেশের কর্মদাতার কাজ ঘরে বসেই করতে পারেন এবং তার কাজের পেমেন্ট অনলাইনেই গ্রহণ করতে পারেন। ফুল টাইম বা পার্ট টাইম যেকোনো ধরনের হাজার হাজার কাজ রয়েছে অনলাইনে। এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বায়ার এবং ওয়ার্কারগণ একই প্লাটফর্মে উপনীত হচ্ছেন। সৃষ্টি হচ্ছে বিশ্বময় এক যোগসূত্র। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বায়ারগণ তাদের কাজগুলো সস্তায় অন্য দেশের কর্মীদের মাধ্যমে অনলাইনে করিয়ে নিচ্ছেন। এই ধরনের কাজকে আউটসোর্সিং নামে অভিহিত করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে অনেক তরুণ-তরুণী আউটসোর্সিংয়ের কাজ করছে। এর মাধ্যমে হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে। দেশে আসছে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। গ্লোবাল আউটসোর্সিং মার্কেটপ্লেসগুলোর মধ্যে রয়েছে– ফ্রিল্যান্সার ডট কম, ওডেস্ক, ইলান্স, গুরু, ভিওয়ার্কার ইত্যাদি। বিশ্বগ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজ সৃষ্টিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

১.৩ শিক্ষা (Education)

বর্তমান যুগে বিভিন্ন অনলাইন লাইব্রেরি থেকে শিক্ষা সম্পর্কিত নানা ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা যায়। অনলাইনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা, পরীক্ষা দেয়া কিংবা শিক্ষামূলক বিভিন্ন ওয়েবসাইট হতে শিক্ষা লাভ করা যায়। শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ ও পেশাদারি দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়। কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট সংযোগ সুবিধা থাকলে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের শিক্ষার্থী তার শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। এ ধরনের জনপ্রিয় একটি শিক্ষামূলক সাইট হলো www.khanacademy.org। বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত আমেরিকা প্রবাসী সালমান খানের অনলাইনভিত্তিক এ একাডেমির শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক কোটিরও বেশি। একাডেমির নিজের ওয়েবসাইট ও ইউটিউবের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৩১০০ এর বেশি অনলাইন ভিডিও টিউটোরিয়াল নির্মাণ করে খান একাডেমি। অনলাইনভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাবার প্রয়োজন পড়ে না। এভাবে বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সাথে আন্তঃসম্পর্ক গড়ে তোলে যা গ্লোবাল ভিলেজের বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১.৪ চিকিৎসা (Health care and treatment)

কম্পিউটার ব্যবহার করে অনলাইন থেকেও চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণ করা যায়। অনলাইনে বিভিন্ন ডেটাবেস ফাইলে হাজার হাজার রোগীর অবস্থা (History), প্যাথলজিক্যাল রিপোর্ট এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের ব্যবস্থাপত্র সংরক্ষণ করা আছে। সেখান থেকে কোন অবস্থাভেদে পরামর্শ গ্রহণ করা যায়। বর্তমানে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ডাক্তার একই সময়ে এক দেশে বসে অন্য দেশের রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে পারেন। চিকিৎসা সেবাকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে ইন্টারনেট বিরাট ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন মোবাইল ফোন অপারেটররা টেলিমেডিসিন সার্ভিস দিচ্ছে। এভাবে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বটাই পরিণত হতে চলেছে বিশ্বগ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজে।

টেলিমেডিসিন (Telemedicine)

মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটের ব্যাপক প্রচলনের ফলে চিকিৎসা ক্ষেত্রেও এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করেও টেলিফোন এবং ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা যাচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে রোগীকে চাক্ষুস না দেখেও ওষুধ দেবার ব্যবস্থাই হলো টেলিমেডিসিন। এ সেবার মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থানরত ডাক্তারদের মধ্যে মতবিনিময়, চিকিৎসা শিক্ষা আদান-প্রদান, রোগীর চিকিৎসা সেবার তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা যায়। টেলিমেডিসিনের সুবিধা :

১. ডাক্তারের চেম্বার বা হাসপাতালে না গিয়ে ঘরে বসেই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সেবা পাওয়া যায়।
২. স্বল্প ব্যয়ে দ্রুত চিকিৎসা সেবা পাওয়া যায়।
৩. ডাক্তাররা অন্য অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারে।
৪. বিদেশে না গিয়েও বিদেশী কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসা ও পরামর্শ গ্রহণ করা যায়।
৫. সহজে রোগ বিশ্লেষণ করা যায়।
৬. রোগীদের সব তথ্য সংরক্ষণ করা যায়।

১.৫ গবেষণা (Research)

বৃহৎ কোনো গবেষণা প্রকল্পে আজকাল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নামকরা সব গবেষকরা একটি দলে মিলেমিশে কাজ করেন। বিশ্বের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এর ফলে এক দেশের গবেষকের গবেষণালব্ধ জ্ঞানের সাথে অন্য দেশের গবেষকের জ্ঞানের সম্মিলন ঘটে। জ্ঞানের এই আদান-প্রদানে পুরো প্রকল্পটিই অনেক সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বৈশ্বিক সামাজিকীকরণে এটি বিরাট ভূমিকা রাখে।

১.৬ অফিস (Office)

ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ কাজে লাগিয়ে অনেকেই অর্থ উপার্জন করছেন। আউটসোর্সিংয়ের কাজে আজকাল অনেক বায়ারই পূর্ণকালীন কর্মী নিয়োগ দিচ্ছেন। এসব কর্মী বাড়িতে বসেই প্রকৃত অফিস টাইমের মতোই পুরো সময়টি কাজ করছেন। বিশেষ ধরনের সফটওয়্যার ব্যবস্থা কর্মীর কাজের উপস্থিতিকে নিশ্চিত করছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের

একজন বায়ার সেখানে বসেই বাংলাদেশী কোনো ওয়ার্কারকে ভাড়া করতে পারছেন। এক্ষেত্রে ঘরই হলো ভার্চুয়াল অফিস যেখান থেকে যাবতীয় কাজগুলো করা হচ্ছে। বায়ারকে আলাদাভাবে অফিস ভাড়া করতে হচ্ছে না। এভাবে বিশ্বব্যাপী হাজার হাজার বায়ার তাদের কাজগুলো লক্ষ লক্ষ কর্মী দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে করিয়ে নিচ্ছেন। সকলের মধ্যকার এই বন্ধন সৃষ্টি করছে বিশ্বগ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজ।

১.৭ বাসস্থান (Residence)

মানুষ যেখানে বসবাস করে সেটিই তার বাসস্থান। কিন্তু গতানুগতিক এই ধারণা অনেকটাই বদলে যেতে শুরু করেছে। আধুনিক ইন্টারনেটের যুগে মানুষ এক দেশে বসেই অন্য দেশে ভার্চুয়ালি বিচরণ বা বসবাস করতে পারছেন। যেমন– চায়নায় বসে কেউ কানাডার কোনো আত্মীয়ের সাথে ভিডিও চ্যাটিং করছেন। উভয় প্রান্তের লোকগুলো একে অপরকে সামনাসামনি দেখছেন। ঠিক যেন তিনি চায়নায় না বসে কানাডায় উক্ত আত্মীয়ের বাড়িতে অবস্থান করছেন। সকলেই হয়ে উঠছেন ইন্টারনেটের অধিবাসী বা নেটিজেন। গ্লোবাল বিশ্বে মানুষ তৈরি করছে তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক আধুনিক বাসস্থান বা স্মার্ট হোম। স্মার্ট হোম হলো এমন একটি বাসস্থান যেখানে রিমোট কন্ট্রোলিং বা প্রোগ্রামিং ডিভাইসের সাহায্যে বাড়ির হিটিং সিস্টেম, কুলিং সিস্টেম, লাইটিং সিস্টেম এবং সিকিউরিটি কন্ট্রোল সিস্টেম ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। একটি স্মার্ট হোমে ব্যবহৃত বিভিন্ন ডিভাইস যেমন- টেলিভিশন, এসি, লাইটিং, ফ্যান, সিকিউরিটি ক্যামেরা ইত্যাদি ডিভাইসগুলো পরিচালনার জন্য আধুনিক প্রযুক্তিতে মোবাইল বা রিমোট কন্ট্রোলিং ডিভাইস ব্যবহার করে একটি কেন্দ্রিয় অবস্থান থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

বর্তমানে বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশে যেমন-চীন, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া ইত্যাদি দেশে গ্লোবাল রেসিডেন্স বা বৈশ্বিক বাসস্থান তৈরি করা হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে বিভিন্ন সুবিধা সংবলিত এসব বাসস্থানে বসবাসকারীরা সবাই কমন কিছু সুবিধা ভোগ করছে। যেমন, ওয়াই-ফাই প্রযুক্তিতে ইন্টারনেট ব্যবহার, ক্যাবল টিভি, ইন্টারকম, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, ব্যায়ামাগার, কমিউনিটি সেন্টার, লন্ড্রি, হেলথ ও অন্যান্য সার্ভিস। বাসস্থানের নিরাপত্তার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে আইপি ক্যামেরা। স্বয়ংক্রিয় পার্কিং ব্যবস্থা সংবলিত এসব বাসস্থানে প্রয়োজনীয় সব আসবাবপত্র সেটিং করা থাকে যাতে ব্যবহারকারীরা সহজেই আরামে বসবাস করতে পারে। গ্লোবাল রেসিডেন্সকে এমনভাবে সাজিয়ে তোলা হয় যাতে এর বসবাসকারীদের মধ্যে একটি পারিবারিক পরিবেশ বিরাজ করে।

তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক আধুনিক বাসস্থান বা স্মার্ট হোমে যেসব সুবিধা পাওয়া যায় সেগুলো হলো-

- ঘরে বসেই অফিসের কাজ, কনফারেন্স, উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কাজ করা যায়। ফলে সময়ের অপচয় হয় না এবং খরচ কম হয়।
- রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে গাড়ীর গ্যারেজ, ঘরের দরজা জানালা খোলা যায়।
- বাইরে থাকাকালীন সময়ে কোন মেহমান বাসায় আসলে সিকিউরিটি এলার্মের সাহায্যে মোবাইল ফোনে তা জানা যায়।
- কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত রোবোটের সাহায্যে চা বানানো, কাপড় ধোয়া, ঘরবাড়ি পরিষ্কার ও ময়লা নিষ্কাশন করা সম্ভব হচ্ছে।
- ঘরে বসেই ইন্টারনেটের সাহায্যে ডাক্তারের সাথে সাক্ষাত করে স্বাস্থ্য পরামর্শ নেয়া যায়।
- ট্র্যাকিং এবং সেন্সিং প্রযুক্তির ব্যবহার করে ঘরের গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেমন-চাবি, মানিব্যাগ ইত্যাদি সহজে খুঁজে বের করা যায়।

- টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, এসি, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ফ্যান, লাইট ইত্যাদি রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে বিছানায় শুয়েই পরিচালনা করা যায়।
- ঘরের কোথাও বিদ্যুৎ লাইন, গ্যাস লাইনের সমস্যা এবং আগুন লাগলে ডিটেক্টর এলার্মের মাধ্যমে জানিয়ে দেয় এবং মূল লাইনের সুইচ বন্ধ করে বিপদ থেকে রক্ষা করে।
- চোর, ডাকাত এবং সন্ত্রাসী কোন আক্রমণ আসলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুলিশকে অবহিত করে।

১.৮ ব্যবসায়-বাণিজ্য (Business)

ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিধি আজ বিশ্বময় বিস্তৃত। কয়েক দশক আগেও বিশ্বের এক দেশের সাথে অন্য দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডগুলো পরিচালনা করতে বিভিন্ন ধরনের জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। আর এখন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ছোঁয়ায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের পালে নতুন হাওয়া লেগেছে। প্রথাগত ব্যবসার বাইরে ই-কমার্স এর প্রচলন ঘটেছে। বিশ্বের এক প্রান্তের কোনো ক্রেতা তার ঘরে বসেই যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো পণ্যের অর্ডার দিতে ও তার অর্থ অনলাইনে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারছেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই উক্ত পণ্য ক্রেতার ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে। বিশাল পরিমাণ বাণিজ্যিক কার্যক্রম এখন অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে। সমগ্র বিশ্বের ক্রেতারাই এখন বিশ্বব্যাপী আন্তঃসংযুক্ত হয়ে পড়েছে। এভাবে গড়ে উঠছে বিশ্বগ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজ।

১.৯ সংবাদ (News)

প্রতি মুহূর্তেই বিশ্বে ঘটে চলেছে নানা ধরনের ঘটনা। আগে যেখানে এক দেশে সংঘটিত কোনো ঘটনা অন্য দেশের লোকের জানতে অনেক সময় লাগতো এখন তা সাথে সাথেই জানা সম্ভব হচ্ছে। স্যাটেলাইট টেলিভিশন, ইন্টারনেট নির্ভর অনলাইন সংবাদ মাধ্যমগুলো বিভিন্ন বিষয়ধর্মী খবরাখবর অবিরাম সরবরাহ করে চলেছে। এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের লোকজন পরস্পর সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারছে। সৃষ্টি হচ্ছে একটি অদৃশ্য সামাজিক বন্ধন যা দেশের সীমানায় আবদ্ধ থাকছে না। গড়ে উঠছে বিশ্বগ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজ।

১.১০ বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ (Entertainment and Social communication)

বর্তমান ইন্টারনেটের যুগে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে অনলাইন গেমিং অন্যতম জনপ্রিয় একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকাল ইন্টারনেটে টিভি ও রেডিও চালু হওয়ায় স্ট্রিমিং অডিও-ভিডিও প্রযুক্তির মাধ্যমে দূর-দূরান্তে বসেও টিভি ছাড়াই কম্পিউটারে টিভি দেখা যায়। শোনা যাচ্ছে রেডিও। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন সাইটে বন্ধুত্ব তৈরি করার পাশাপাশি ছবি ও ভিডিও শেয়ার করা যায়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইট যেমন– ফেসবুক, টুইটার, মাইস্পেস, ডিগ, ইউটিউব, ফ্লিকার ইত্যাদি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের জনগোষ্ঠীকে পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। সামাজিক বলয়ের গণ্ডী নিজ দেশের সীমানা ছাপিয়ে এখন বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হয়েছে। বিশ্বগ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজ এর রূপায়ণে এগুলো অত্যন্ত জোরালো ভূমিকা রাখছে।

১.১১ সাংস্কৃতিক বিনিময় (Cultural exchange)

তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে আজ শিল্প ও সাহিত্য ক্ষেত্রেও এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রকাশনার কাজগুলো আজকাল কম্পিউটার ও ইন্টারনেট প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থায় সম্পন্ন করা হচ্ছে। সংস্কৃতির নানা কর্মকাণ্ড ইন্টারনেট, রেডিও এবং টেলিভিশনের কল্যাণে মুহূর্তেই বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। এক দেশের লোক অন্য দেশের সংস্কৃতির সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত হবার বিরল সুযোগ লাভ করছে। এভাবে ঘটছে সংস্কৃতির আদান-প্রদান। এর ফলে সকলের মধ্যে গড়ে উঠছে এক বিনি সুতোর বন্ধন যা বিশ্বগ্রাম তথা গ্লোবাল ভিলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কাজ করছে।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে বিশ্বগ্রামের সুবিধা এবং অসুবিধা নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে।

বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান (Contribution of ICT for establishing global village)

তথ্য প্রযুক্তি বলতে সাধারণত তথ্য রাখা এবং একে ব্যবহার করার প্রযুক্তিকেই বোঝানো হয়। তবে বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তি আর এ সংজ্ঞার মধ্যে সীমিত নেই। নতুন নতুন সব প্রযুক্তির সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে তথ্য প্রযুক্তি এক ভিন্ন রূপ লাভ করেছে। এক্ষেত্রে যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা সর্বাধিক। যোগাযোগ, টেলিযোগাযোগ, অডিও ভিডিও কম্পিউটিং, সম্প্রচারসহ আরো বহুবিধ প্রযুক্তি এর সাথে যুক্ত হয়েছে। ফলে এটি এখন আইসিটি বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

রেডিওর আবিষ্কার যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। আগে রেডিওতে শুধু কথা শোনা যেত। এরপর টিভি আবিষ্কারের ফলে কথা ও ছবি একত্রে দেখা সম্ভব হয়। টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে রেডিও ও টেলিভিশন সম্প্রচার ব্যবস্থায় ঘটেছে দারুণ পরিবর্তন। তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে আধুনিক ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্স প্রযুক্তি। কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে আন্তঃমহাদেশীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা। এতে করে পৃথিবীর একপ্রান্তের একজন মানুষ ঘরে বসেই সরাসরি যোগাযোগ করতে পারছে অন্যপ্রান্তের একজন মানুষের সাথে। পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্স প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। সমগ্র বিশ্ব পরিণত হয়েছে একটি বিশ্বগ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজে।

ইন্টারনেট আবিষ্কার নিঃসন্দেহে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। ইন্টারনেটের কল্যাণে এখন ঘরে বসেই বিশ্বকে পাওয়া যাচ্ছে হাতের মুঠোয়। প্রচলিত চিঠির বদলে এসেছে ই-মেইল এর ব্যবস্থা যার সাথে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টগুলো অ্যাটাচ করে পাঠিয়ে দেয়া যাচ্ছে বিশ্বের যে কোনো স্থানে। ইন্টারনেটের কল্যাণে এখন টেক্সট, ভয়েস ও ভিডিও চ্যাটিং, ভিডিও কনফারেন্সিং, ব্রডকাস্টিং, ভিওআইপি, অনলাইন অডিও-ভিডিও স্ট্রিমিং, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং প্রভৃতি কাজগুলো করা সম্ভব হচ্ছে। অনলাইন রেডিও, অনলাইন টিভির মতো সেবাগুলোও প্রসার লাভ করেছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কোটি কোটি ওয়েব সাইট তথ্যের প্রাপ্যতাকে আরও সহজ করেছে।

টেলিফোনের মাধ্যমে শব্দকে ইলেক্ট্রনিক ডেটায় রূপান্তরিত করে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ করা যায়। বর্তমানের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে শুধু শব্দ নয় লেখা, গ্রাফিক্স, স্থিরচিত্র ও চলচ্চিত্র সবকিছুকেই ডিজিটাল ফরমেটে নিয়ে ইলেক্ট্রনিক ডেটায় রূপান্তরিত করে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ করা যায়। মডেমের মাধ্যমে কম্পিউটারের সাথে টেলিফোন লাইনের সংযোগ দিয়ে ইন্টারনেট ব্রাউজ করা যায়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আরেক শক্তিশালী উদ্ভাবন হলো মোবাইল টেলিফোন। মুঠোয় ধরে রাখা এ ফোনের মাধ্যমে আজ বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে কথা বলা যাচ্ছে। যেকোনো স্থানে এ ফোন বয়েও বেড়ানো যাচ্ছে। আধুনিক স্মার্টফোনগুলো আরও বেশি সুবিধা দিচ্ছে। হ্যান্ডসেটেই ইন্টারনেট ব্রাউজিং, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সেবা গ্রহণ, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ছবি ও ভিডিও ধারণ করে তা ইন্টারনেটে সরাসরি তুলে দেয়ার কাজগুলো করা যাচ্ছে। এসএমএস বা ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্বের যেকোনো স্থানেই পাঠিয়ে দেয়া যাচ্ছে তথ্য। আর এমএমএস এর মাধ্যমে প্রেরণ করা যাচ্ছে মাল্টিমিডিয়া সম্বলিত তথ্য। শুধু তাই নয় জিপিএস বা গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম এর সেবাও নেয়া যাচ্ছে মোবাইল ফোনে। স্মার্টফোনগুলো আজ চলছে অপারেটিং সিস্টেমে। এই এক মোবাইল ফোনই যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে রাখছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। হ্যান্ডসেটগুলোতে আরও বেশি ইন্টারনেটনির্ভর সুবিধা নিয়ে এসেছে চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল প্রযুক্তি যার সফল বাস্তবায়ন হলো WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) এবং 3GPP LTE (Long Term Evolution) স্ট্যান্ডার্ড।

এতসব প্রযুক্তির সম্মিলনে তথ্য প্রযুক্তি এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি এসেছে সমকেন্দ্রিকতায়। এদের আর এখন আলাদা করে ভাববার কোনো অবকাশ নেই। তাই এখন এই দুই প্রযুক্তি মিলেমিশে একক একটি প্রযুক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে যাকে বলা হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

২. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (Virtual Reality)

প্রকৃত অর্থে বাস্তব নয় কিন্তু বাস্তবের চেতনা উদ্রেককারী বিজ্ঞাননির্ভর কল্পনাকে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (VR) বা অনুভবে বাস্তবতা কিংবা কল্পবাস্তবতা বলে। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি মূলত কম্পিউটার প্রযুক্তি ও সিমুলেশন তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

"Technology that enables users to enter computer generated worlds and interface with them three dimensionally through sight, sound, and touch."

ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে ত্রি-মাত্রিক ইমেজ তৈরির মাধ্যমে অতি অসম্ভব কাজও করা সম্ভবপর হয়। কল্পনার পাখায় ভর করে ইচ্ছে করলে চাঁদের মাটিতে হেঁটে আসা, প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতম অঞ্চলে ঘুরে আসা, মানুষের মস্তিষ্কের নিউরাল সংযোগের উপর দিয়ে হাঁটা কিংবা জুরাসিক পার্কের সেই অতিকায় ডায়নোসরের তাড়াও খাওয়া যায়। **ভার্চুয়াল রিয়েলিটি একটি কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ যেখানে ব্যবহারকারী ঐ পরিবেশে মগ্ন হতে, বাস্তবের অনুকরণে সৃষ্ট দৃশ্য উপভোগ করতে, সেই সাথে বাস্তবের ন্যায় শ্রবণানুভূতি এবং দৈহিক ও মানসিক ভাবাবেগ, উত্তেজনা অনুভূতি প্রভৃতির অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন।** ব্যবহারকারীকে মাথায় হেড মাউন্টেড ডিসপ্লে (Head Mounted Display-HMD), হাতে একটি ডেটা গ্লোভ (Data Glove) বা একটি পূর্ণাঙ্গ বডি স্যুইট (Body Suit) পরতে হয় এবং ভার্চুয়াল রিয়েলিটি তাকে কোন রকম

শারীরিক ঝুঁকি বা বিপদ ছাড়াই বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রদান করে। সম্প্রতি গুগলও Lively নামে ভার্চুয়াল চ্যাটিং সার্ভিস চালু করেছে যেখানে একটি ভার্চুয়াল কক্ষ বা পরিবেশে যে কেউ তার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে প্রবেশ করতে পারে। সেখানে ইচ্ছেমত বস্তু দিয়ে সাজানো, বন্ধুদের সাথে মারামারি, নাচানাচি, আবেগের গ্রাফিক্যাল প্রকাশ ইত্যাদি সম্ভব।

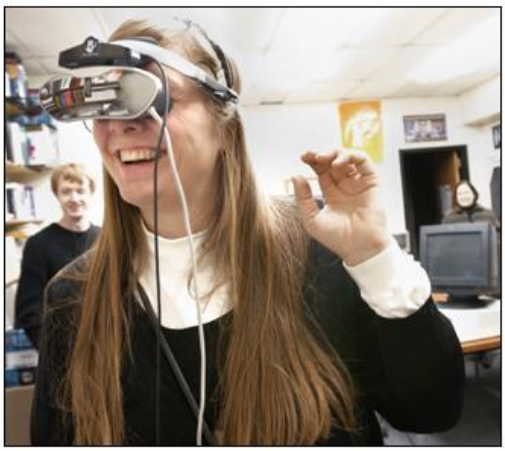

চিত্র : ভার্চুয়াল রিয়েলিটি

২.১ প্রাত্যহিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাব (Influence of Virtual Reality in everyday life)

শিশু শিক্ষায়

ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে শিশুদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে আকর্ষণীয়ভাবে শিক্ষা প্রদান করা যায়। বর্তমানে উন্নত বিশ্বে শিশুদের শিক্ষায় ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ

উন্নত বিশ্বে ডাক্তারদের আধুনিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদানে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে সার্জিক্যাল প্রশিক্ষণে 'এমআইএসটি ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ল্যাপরোস্কোপিক' প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ পদ্ধতিতে কম্পিউটার সিমুলেশন ব্যবহার করে ল্যাপরোস্কোপিক পরিচালনার বিভিন্ন কৌশল শেখানো হয়। শিক্ষানবীশ ডাক্তারগণ এর ফলে অত্যন্ত সহজে ও সুবিধাজনক উপায়ে বাস্তবে অপারেশন থিয়েটারে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

কার ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ

ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে ড্রাইভিংয়ের নানা নিয়ম-কানুন খুব সহজেই আয়ত্ত করা সম্ভব। ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে বাস্তবের মতো রাস্তায় গাড়ী চালিয়ে প্রশিক্ষণার্থী খুব সহজেই বাস্তবে গাড়ী চালানোর সাহস অর্জন করে দ্রুত গাড়ী চালনা শিখতে পারে। বাংলাদেশ পুলিশের মহিলা পুলিশদেরকে ড্রাইভিং শেখানোর জন্য ভার্চুয়াল কার ব্যবহার করা হয়।

বিমান চালনার প্রশিক্ষণ

উন্নত বিশ্বের বাণিজ্যিক বিমান সংস্থা কিংবা সামরিক বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে বিমান পরিচালনা প্রশিক্ষণে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করছে। এজন্য ফ্লাইট সিমুলেটর ব্যবহার করা হয়। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ফ্লাইট সিমুলেশনের ক্ষেত্রে স্বল্প খরচে বিমান চালকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়।

সেনাবাহিনীতে যুদ্ধ প্রশিক্ষণ

বিভিন্ন বিরূপ পরিবেশে শত্রুর সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করা হচ্ছে। অত্যাধুনিক অনেক যুদ্ধাস্ত্র সঠিকভাবে ব্যবহার, রাতে যুদ্ধ পরিচালনা, শত্রুর অবস্থান নির্ণয় ইত্যাদি কাজ নিখুঁতভাবে করার জন্য বর্তমানে অনেক দেশের সেনাবাহিনীতে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করা হচ্ছে।

ব্যবসায় বাণিজ্যে

বর্তমানে ব্যবসায় বাণিজ্যে বিভিন্নভাবে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন- ব্যবসায়িক কোন এনভায়রনমেন্টে ভার্চুয়াল ট্যুর, নতুন কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ, কোন প্রোডাক্টের প্রদর্শন ইত্যাদি। অনেক ব্যবসায়ে অনেক কম মূল্যে কোন প্রোডাক্ট ডেভলপমেন্ট এবং সার্ভিস প্রদানের জন্য ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন, কোন প্রোটোটাইপ টেস্ট করার ক্ষেত্রে।

মহাশূন্য অভিযানে

মহাশূন্য অভিযানের প্রতিটি পর্বেই রয়েছে নানা ধরনের ঝুঁকি। প্রস্তুতি পর্বের নানা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা নিরীক্ষা, নভোচারীদের কার্যক্রম, নভোযান পরিচালনা সম্পর্কিত যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রশিক্ষণে তাই ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। কাল্পনিক পরিবেশে মহাকাশে গবেষণা পরিচালনার বিষয়গুলো, মহাশূন্যে খাপ খাওয়ানোর মতো বিষয়গুলো পূর্বেই প্রশিক্ষণ নিতে পারছেন নভোচারীগণ।

গেমস তৈরি

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করে বর্তমানে বিভিন্ন আকর্ষণীয় গেমস তৈরি করা হচ্ছে। Xbox 360, PS2 এবং কম্পিউটারে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরনের ভার্চুয়াল রিয়েলিটি গেমস রয়েছে। লিনডেন ল্যাবস কর্তৃক সেকেন্ড লাইফ, নিনটেনডো এর Wii এবং ইলেক্ট্রনিক আর্টস এর The Sims ইত্যাদি।

নগর উন্নয়নে

নগর পরিকল্পনায় ত্রিমাত্রিক ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এর প্রয়োগ ঘটিয়ে নগর উন্নয়ন রূপরেখা, নগর যাতায়াত ব্যবস্থা ইত্যাদি সহজ ও আকর্ষণীয়ভাবে বর্ণনা করা যায়।

২.২ প্রাত্যহিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির নেতিবাচক প্রভাব (Negative Influence of VR in everyday life)

ইতিবাচক প্রভাবের পাশাপাশি ভার্চুয়াল রিয়েলিটির নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

চড়া দাম এবং জটিলতা

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি সরঞ্জামাদির দাম অনেক চড়ার কারণে সাধারণের মধ্যে এর প্রসার এবং জটিলতা নিয়ে বিজ্ঞানীরা উদ্বিগ্নতায় আছেন। অনেক সময় এর হ্যান্ডসেটের গতি ব্যবহারকারীর স্বাভাবিক গতির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে না।

স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এর ব্যবহার মানুষের জন্য ক্ষতিকারক। এটি মানুষের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির ক্ষতিসাধন করে।

কল্পনার জগতে বিচরণ

ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে মানুষ তার কল্পনার রাজ্যে ইচ্ছেমতো বিচরণ করতে পারবে। অনেক সময় ধরে কল্পনার জগতে থাকে তাহলে বাস্তবতা থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে যাবে। ফলে পৃথিবীতে বিপর্যয় নেমে আসবে।

মনুষ্যত্বহীনতা

ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে মানুষ বাস্তবিকের চেয়ে ভাল পরিবেশ ও মনের মতো সঙ্গী পাবে। ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ব্যাপক প্রসারের কারণে মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া হ্রাস পাবে এবং মনুষ্যত্বহীনতা বেড়ে যাবে। ফলে ক্রমেই মানব সমাজ বিলুপ্ত হতে থাকবে।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির সুফল এবং কুফল নিয়ে প্রেজেন্টেশন তৈরি করে শিক্ষককে দেখাবে।

৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতা (Contemporary trends of ICT)

বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সবধরনের কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। কার্য সম্পাদনের দ্রুততা, বিশ্বস্ততা, তথ্য সংরক্ষণ ক্ষমতা, সর্বোপরি নির্ভরযোগ্যতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কারণে কম্পিউটারের প্রয়োগক্ষেত্র ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। সময়ের সাথে সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে। বর্তমানে এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নেই। অতি সম্প্রতি অনেক বিষয়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। নিচে এরূপ কতকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলো।

৩.১ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence)

কম্পিউটারের নিজস্ব কোনো বুদ্ধি নেই। এটি শুধু নিজের কাছে সংরক্ষিত তথ্য এবং প্রোগ্রামের আলোকে কাজ করতে পারে। কোন সমস্যার আলোকে নিজ থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করতে পারে না। কম্পিউটারও যাতে কোন সমস্যা দেখা দিলে নিজ থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারে তার জন্য এর ভেতর অনেক সমস্যার সমাধান ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এটিকেই বলে আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। অর্থাৎ **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হলো মানুষের চিন্তাভাবনাগুলোকে কৃত্রিম উপায়ে কম্পিউটার বা কম্পিউটার প্রযুক্তিনির্ভর যন্ত্রের মধ্যে রূপ দেয়ার ব্যবস্থা**। এটি বর্তমানে কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এই শাখায় কম্পিউটারকে মানুষের মতো চিন্তাভাবনা করে অসম্পন্ন তথ্য ব্যবহার করে পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধান্তে পৌঁছবে, সমস্যার সমাধান করবে, পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে– সেই বিষয়গুলো নিয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণা চলছে। ১৯৫৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের MIT এর John McCarthy সর্বপ্রথম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স শব্দটি উল্লেখ করেন। ক্রমেই এটি বিস্তৃতি লাভ করছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ব্যবহার বেড়েই চলেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ফলে কম্পিউটারের চিন্তাভাবনাগুলো মানুষের মতই হয়। মানুষ একই সময়ে বিভিন্ন চিন্তাভাবনা করতে পারে না কিন্তু কম্পিউটারের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে একই সময়ে বিভিন্ন কাজ দ্রুত করতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ফলে যন্ত্রের মধ্যে যৌক্তিক চিন্তা, জ্ঞান, পরিকল্পনা, শিক্ষণ, যোগাযোগ, উপলব্ধি এবং যন্ত্র চলাচল করার সামর্থ্য পায়। প্রোগ্রামিং ভাষা LISP, PROLOG, C/C++ ইত্যাদি ব্যবহার করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করা হয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাস্তব প্রয়োগ হলো রোবট।

বুদ্ধিমান আচরণের স্বাভাবিক গুণ

কম্পিউটারভিত্তিক সিস্টেমগুলোতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিচের যোগ্যতাগুলোকে প্রতিলিপিকরণের চেষ্টা করে ঃ

- চিন্তা ও কারণ
- সমস্যা সমাধানে কারণগুলোকে ব্যবহার
- অভিজ্ঞতা থেকে শেখা বা বুঝা
- জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগ করা
- সৃষ্টিশীলতা ও কল্পনাশক্তির প্রদর্শন
- জটিল ও ধাঁধাঁময় পরিস্থিতিগুলোর সাথে কাজ করা
- নতুন পরিস্থিতিগুলোতে দ্রুত ও সাফল্যজনকভাবে সাড়া প্রদান
- কোনো পরিস্থিতিতে উপাদানগুলোর সম্পর্কের গুরুত্বকে সনাক্ত করা
- অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ কিংবা ত্রুটিপূর্ণ তথ্যকে মোকাবিলা করা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা জ্ঞানের ক্ষেত্রসমূহ (Domains of AI)

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারকে তিনটি প্রধান এলাকায় গ্রুপভুক্ত করা যায়। এগুলো হলো :

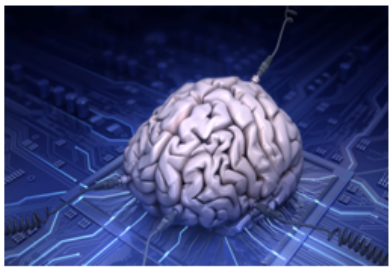

ক. বুদ্ধিবৃত্তিক বিজ্ঞান (Cognitive science)
   ১. এক্সপার্ট সিস্টেম (Expert System)
   ২. লার্নিং সিস্টেম (Learning System)
   ৩. ফাজি লজিক (Fuzzy Logic)
   ৪. নিউরাল নেটওয়ার্ক (Neural Network)
   ৫. জেনেটিক অ্যালগরিদম (Genetic algorithm)
   ৬. ইন্টেলিজেন্ট এজেন্ট (Intelligent Agent)

খ. রোবোটিক্স (Robotics)
   ১. ভিজ্যুয়াল পারসেপশন (Visual Perception)
   ২. ট্যাকটিলিটি (Tactility)
   ৩. ডেক্সটারিটি (Dexterity)
   ৪. লোকোমোশন (Locomotion)
   ৫. নেভিগেশন (Navigation)

গ. ন্যাচারাল ইন্টারফেস (Natural Interfaces)
   ১. ন্যাচারাল ল্যাংগুয়েজ (Natural Languages)
   ২. স্পিচ রিকগনিশন (Speech Recognition)
   ৩. মাল্টিসেন্সরি ইন্টারফেস (Multisensory Interfaces)
   ৪. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (Virtual Reality)

নিচে বুদ্ধিবৃত্তিক বিজ্ঞান এর ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

এক্সপার্ট সিস্টেম (Expert System) : এক্সপার্ট সিস্টেম হলো এক ধরনের সিদ্ধান্ত সমর্থন পদ্ধতি যা নির্দিষ্ট বিষয়ে মানুষের ন্যায় কৃত্রিম দক্ষতা নিয়ে তৈরি। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অনেকগুলো মাইক্রোপ্রসেসর ও চিপ ব্যবহার করে প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে কম্পিউটারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সৃষ্টি করা হয়। ব্যবহারকারীরা এ সিস্টেম থেকে প্রশ্ন করে উত্তর জানতে পারেন।

লার্নিং সিস্টেম (Learning System) ঃ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় লার্নিং হলো গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য। লার্নিং এজেন্ট চারটি প্রধান উপাদান নিয়ে গঠিত। এগুলো হলো : ১. লার্নিং এলিমেন্ট, ২. পারফরমেন্স এলিমেন্ট, ৩. ক্রিটিক এবং ৪. প্রবলেম জেনারেটর

ফাজি লজিক (Fuzzy Logic) ঃ ফাজি লজিক হলো এক ধরনের লজিক যা সাধারণ সত্য এবং মিথ্যা মানগুলোর চাইতেও বেশি কিছু সনাক্ত করতে পারে। ফাজি লজিক দিয়ে প্রশ্ন বা সমস্যাকে সত্য ও মিথ্যার মানে উপস্থাপন করা যায়।

নিউরাল নেটওয়ার্ক (Neural Network) ঃ নিউরাল নেটওয়ার্ক হলো এক ধরনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যা মানব মস্তিষ্ক যে উপায়ে কাজ করে তা নকল করার উদ্যোগ নেয়।

জেনেটিক অ্যালগরিদম (Genetic Algorithm) ঃ জেনেটিক অ্যালগরিদমের ব্যবহার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি বাড়ন্ত অ্যাপ্লিকেশন। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত এবং ব্যবসায়িক প্রক্রিয়াগুলোর মডেল তৈরিতে জেনেটিক অ্যালগরিদম সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার (Application of AI)

১. মানুষ্যবিহীন গাড়ি এবং বিমান চালনার ক্ষেত্রে।
২. জটিল গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে। যেমন-ম্যাকসিমা।
৩. ক্ষতিকর বিস্ফোরক শনাক্ত ও নিষ্ক্রিয় করার কাজে।
৪. চিকিৎসার ক্ষেত্রে। যেমন-মাইসিন।
৫. কাস্টমার সার্ভিস প্রদানে। যেমন-Automated online assistants.
৬. বিনোদনে ও গেম খেলায়। যেমন- দাবা খেলায়।
৭. অনেক বড়, কঠিন ও জটিল কাজে।
৮. স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে।
৯. পরিকল্পনা ও সিডিউল তৈরির ক্ষেত্রে।
১০. বিভিন্ন ডিভাইসের সূক্ষ্ম ত্রুটি শনাক্তকরণে।
১১. প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ খুঁজে বের করার কাজে। যেমন- প্রসপেটর।

মানব বুদ্ধিমত্তা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পার্থক্য (Difference between Human Intelligence and AI)

মানব বুদ্ধিমত্তা	কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
১. মানব বুদ্ধিমত্তা সরাসরি ইন্দ্রিয়সমূহের অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করে তার পারদর্শীতা প্রদর্শন করে।	১. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়সমূহের অভিজ্ঞতাকে সরাসরি ব্যবহারের সুযোগ থাকে না।
২. মানব বুদ্ধিমত্তা সৃষ্টিশীল।	২. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সৃষ্টিশীল নয়।
৩. মানব বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাকে খুব সহজে প্রতিরূপ তৈরি বা অন্যকে সরবরাহ করা যায় না।	৩. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মূলত বিশেষ ধরনের সফটওয়্যার প্রোগ্রাম যা খুব সহজেই প্রতিরূপ তৈরি ও অন্যদের কাছে সরবরাহ করা যায়।
৪. মানব বুদ্ধিমত্তা প্রকৃতগতভাবে প্রাপ্ত।	৪. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে প্রাপ্ত।
৫. মানব বুদ্ধিমত্তা চিরস্থায়ী নয়; কোনো কারণে এই বুদ্ধিমত্তার অবনতি ঘটতে পারে।	৫. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সাধারণত চিরস্থায়ী। কম্পিউটার পদ্ধতি ও প্রোগ্রাম বদল করা না হলে এর স্থায়িত্বের হেরফের হয় না।
৬. মানব বুদ্ধিমত্তা ক্রমেই বিকশিত হতে পারে।	৬. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার স্বাভাবিকভাবে বিকাশের কোনো সুযোগ নেই।
৭. মানব বুদ্ধিমত্তাকে লিখে রাখা সম্ভব নয়।	৭. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে প্রোগ্রাম কোড আকারে লিখে রাখা যায়।
৮. এক জাতীয় কাজ হলেও মানব বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহারের বিষয়টি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যয়বহুল।	৮. একই জাতীয় কাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার ততটা ব্যয়বহুল নয়।

এক্সপার্ট সিস্টেম (Expert System)

জটিল নির্দিষ্ট কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে আমরা ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হই। কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ঐ বিষয়ের উপর অনেক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, খুঁটিনাটি বিষয় ইত্যাদি সম্পর্কেও সম্যক ধারণা রাখেন। কম্পিউটার বিশাল তথ্য ধারণ করতে পারে এবং দ্রুততার সাথে বিশাল তথ্য থেকে যেকোনো তথ্য খুঁজে বের করতে পারে। কোনো বিষয়ের উপর বিশাল তথ্য সংরক্ষণ করে ঐ বিষয়ের উপর যেকোনো প্রশ্ন করে কম্পিউটার থেকে জেনে নেয়ার ব্যবস্থা করা যায়। অর্থাৎ কম্পিউটারকে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বা এক্সপার্ট করা যায়। কম্পিউটারে এ ধরনের ব্যবস্থাকে এক্সপার্ট সিস্টেম বলা হয়। এক্সপার্ট সিস্টেম হলো একটি প্যাকেজ সফটওয়্যার যা সুসংগঠিত তথ্য ব্যবহার করে কম্পিউটারকে কোন বিষয়ে দক্ষ বা বিশেষজ্ঞ করে তুলে। এক্সপার্ট সিস্টেম হলো এক ধরনের সিদ্ধান্ত সমর্থন পদ্ধতি যা নির্দিষ্ট বিষয়ে মানুষের ন্যায় কৃত্রিম দক্ষতা নিয়ে তৈরি। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অনেকগুলো মাইক্রোপ্রসেসর ও চিপ ব্যবহার করে প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে কম্পিউটারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সৃষ্টি করা হয়। ব্যবহারকারীরা এ সিস্টেম থেকে প্রশ্ন করে উত্তর জানতে পারেন। যেমন ঃ ডাক্তাররা চিকিৎসা সংক্রান্ত জটিল সমস্যার কথা ক্যাডুলাস (CADULAS) এবং মাইসিন নামক এক্সপার্ট সিস্টেম থেকে প্রশ্ন করে জেনে নিতে পারে, কম্পিউটার ডিজাইনাররা R1 নামক এক্সপার্ট সিস্টেমকে প্রশ্ন করে সাহায্য নিতে পারে, এক্সপার্ট সিস্টেমে কারিগরকে সাহায্য করতে পারে জটিল যন্ত্র সারিয়ে তুলতে, যুদ্ধের কৌশল শিক্ষা দিতে পারে সামরিক অফিসারকে। কম্পিউটার যতই দ্রুত হবে এক্সপার্ট সিস্টেমও তত বেশি এক্সপার্ট হতে পারবে। এক্সপার্ট সিস্টেম গঠনে সহায়তাকারী উপাদানগুলো হলো -নলেজ বেজ (Knowledge Base) এবং সফটওয়্যার রিসোর্স (Software Resources)

এক্সপার্ট সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য

১. এক্সপার্ট সিস্টেম একটি সফটওয়্যার যা কোনো সমস্যার সমাধান প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে।
২. এটি এক বা একাধিক মানুষের দক্ষতার সমতুল্য হয়ে কনসালটিং প্রদান করতে পারে তবে তা মানুষের বিকল্প হতে পারে না।
৩. এক্সপার্ট সিস্টেমগুলো সাধারণত নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধানভিত্তিক হয়ে থাকে।
৪. প্রথাগত এপ্লিকেশন হলেও এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি অংশ।
৫. এক্সপার্ট সিস্টেম দক্ষ হলেও তা মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন।

এক্সপার্ট সিস্টেমের সুবিধাসমূহ

১. একজন এক্সপার্টের উপর নির্ভরশীলতাকে হ্রাস করে।
২. হারিয়ে যাবার আগেই বিশেষজ্ঞের জ্ঞান ও দক্ষতাকে করায়ত্ত করে।
৩. পুনঃপুনঃ ঘটে এরূপ সিদ্ধান্ত, প্রক্রিয়া ও কাজগুলোর জন্য সঙ্গতিপূর্ণ উত্তর সরবরাহ করে।
৪. তথ্যের তাৎপর্যপূর্ণ স্তরগুলোকে ধারণ ও দেখভাল করে।
৫. ত্রুটি ও অস্থিরচিত্ততাকে হ্রাস/দূরীভূত করে।
৬. জ্ঞানকে ভাগাভাগি করে।
৭. অনভিজ্ঞদেরকে বৈজ্ঞানিকভাবে সমর্থনযোগ্য সমাপ্তিতে পৌঁছার সুযোগ দেয়।
৮. অর্গানাইজেশনগুলোকে তাদের সিদ্ধান্ত-গ্রহণের যুক্তিকে সুস্পষ্ট করতে উৎসাহিত করে।
৯. মানুষের মতো কখনই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে ভুলে যায় না।
১০. ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করতে পারে।
১১. ব্যবহারকারী দ্বারা আরও নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
১২. একটি মাল্টি-ইউজার এক্সপার্ট সিস্টেম একই সময়ে বহু সংখ্যক ব্যবহারকারীর কাজগুলো করতে পারে।

এক্সপার্ট সিস্টেমের অসুবিধাসমূহ

১. কিছু কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যে ধরনের সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন পড়ে অনেক সময়েই তার ঘাটতি থাকে।
২. অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মানব বিশেষজ্ঞদের মতো সৃষ্টিশীল সাড়া প্রদান করতে পারে না।
৩. ডোমেইন এক্সপার্টগণ সব সময় তাদের যুক্তি ও কারণগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারে না।
৪. নলেজ বেজে ত্রুটির উদ্ভব ঘটতে পারে এবং তা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেতৃত্ব দিতে পারে।
৫. নলেজ বেজকে পরিবর্তন না করা পর্যন্ত পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না।

এক্সপার্ট সিস্টেম ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ

১. উঁচু মাপের ইন্টারঅ্যাকটিভ বা আলাপচারিতামূলক অ্যাপ্লিকেশনসমূহে যেমন– ইন্টারঅ্যাকটিভ ভয়েস রেসপন্স, ভয়েস সার্চার, চ্যাটারবট ইত্যাদিতে।
২. ফল্ট ডায়াগনোসিস ও মেডিকেল ডায়াগনোসিস এর ক্ষেত্রে।
৩. জটিল সিস্টেম, প্রসেস কন্ট্রোল, ইন্টারঅ্যাকটিভ ইউজার গাইডে সিদ্ধান্ত সমর্থনে।
৪. শিক্ষামূলক ও টিউটোরিয়াল সফটওয়্যারে।
৫. মেশিন বা সিস্টেমের লজিক সিমুলেশনে।
৬. নলেজ ম্যানেজমেন্টে।
৭. বার বার পরিবর্তিত হয় এরূপ সফটওয়্যারে।

৩.২ রোবোটিক্স (Robotics)

রোবোটিক্স হলো প্রযুক্তির একটি শাখা যেটি রোবটসমূহের ডিজাইন, নির্মাণ, কার্যক্রম ও প্রয়োগ নিয়ে কাজ করে। পাশাপাশি এটি রোবটসমূহের নিয়ন্ত্রণ, সেন্সরি ফিডব্যাক এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য কম্পিউটার সিস্টেমগুলোর জন্যও কাজ করে। এসব প্রযুক্তি অটোমেটেড মেশিনগুলোর সাথে কাজ করে যা বিপজ্জনক পরিবেশ বা উৎপাদন প্রক্রিয়াসমূহে মানুষের স্থান দখল করে কিংবা মানুষের উপস্থিতি, আচরণ ইত্যাদির সাথে মিল থাকে। আজকের দিনের অধিকাংশ রোবটই 'বায়ো-ইন্সপায়ার্ড রোবোটিক্স' ক্ষেত্রটির দ্বারা উৎসাহিত হয়ে তৈরি। সহজভাবে বলতে গেলে রোবোটিক্স এর সাধারণ বিষয়গুলো হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মনোবিদ্যা। এই প্রযুক্তিটি কম্পিউটার বুদ্ধিমত্তা সংবলিত এবং কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত রোবট মেশিন তৈরি করে যেগুলো আকৃতিগত দিক থেকে অনেকটাই মানুষের মতো হয় এবং অনেকটা মানুষের মতোই দৈহিক ক্ষমতাসম্পন্ন থাকে। এই ক্ষেত্রটিতে তাই রোবটকে

যেসব বৈশিষ্ট্য দেয়ার চেষ্টা করা হয় সেগুলো হলো ঃ

১. দৃষ্টিশক্তি বা ভিজ্যুয়াল পারসেপশন (Visual Perception)
২. স্পর্শ বা স্পর্শ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সক্ষমতা (Tactile Capabilities)
৩. নিয়ন্ত্রণ ও ম্যানিপুলেশনের ক্ষেত্রে দক্ষতা বা নিপুণতা (Dexterity)
৪. যেকোনো স্থানে দৈহিকভাবে নড়াচড়ার ক্ষমতা বা লোকোমোশন (Locomotion)
৫. কোনো একটি গন্তব্যে কারও যাবার পথকে যথাযথভাবে খুঁজে বের করার বুদ্ধিমত্তা বা নেভিগেশন (Navigation)

রোবোটিক্স শব্দটি এসেছে 'রোবট' শব্দ হতে যা প্রবর্তিত হয় চেক লেখক ও নাট্যকার কারেল কাপেক (Karel Čapek) এর একটি নাটক হতে যেটি ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়। Robot শব্দটি মূলত এসেছে স্লাভিক শব্দ Robota হতে যার অর্থ হলো 'শ্রমিক'। অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি অনুযায়ী 'রোবোটিক্স' শব্দটি সর্বপ্রথম প্রিন্টে ব্যবহার করা হয় 'আইজাক অসিমভ' এর ছোট সায়েন্স ফিকশন গল্প 'লায়ার' এ যা ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। আজকের দিনে রোবোটিক্স হলো দ্রুত বর্ধনশীল একটি ক্ষেত্র। প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে সাথে গবেষণা, নকশা এবং নতুন নতুন রোবট তৈরির ফলে বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে– তা সে ঘরোয়া, বাণিজ্যিক বা সামরিক কাজই হোক না কেন সব কাজেই রোবটকে ব্যবহার করা যায়।

রোবোটিক্স এর মূল বিষয়টিই হলো রোবটকে ঘিরে। রোবট হলো কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র বা যন্ত্রমানব যা মানুষের অনেক দুঃসাধ্য ও কঠিন কাজ করতে পারে। এর কাজের ধরন দেখে মনে হবে এর ভেতর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রয়েছে। রোবট মানেই যে মানুষের মতো যন্ত্র হতে হবে তা নয়। রোবট এমন একটি যন্ত্র যা কখনো সম্পূর্ণরূপে বা অংশত মানুষকে নকল করবে; কখনো চেহারায়, কখনো কাজের মধ্য দিয়ে, কখনো আবার দু'ভাবেই। অবশ্য এতে এমনভাবে প্রোগ্রাম বেঁধে দেওয়া আছে যা প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন করে বেঁধে দেওয়া যায়। কিছু কিছু রোবট শুধু প্রোগ্রাম অনুসারেই কাজ করে আবার অনেকগুলোকে দূর থেকে লেজার রশ্মি বা রেডিও সিগন্যালের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যানবাহন ও গাড়ির কারখানায়, বিপজ্জনক যেমন– বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়করণ কাজে, শিল্পক্ষেত্রে কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের কাজ, গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনায় নিরাপত্তার কাজে, ঘরের প্রাত্যহিক অনেক কাজকর্ম এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে জটিল সব অপারেশনে সার্জনদের নানা ধরনের কাজে রোবট সহায়তা করে।

রোবটের বিভিন্ন উপাদান বা অংশ (Different parts of Robot)

একটি রোবটে সাধারণত নিম্নলিখিত উপাদান বা অংশগুলো থাকতে পারে। যথা:

মুভেবল বডি (Movable Body): স্থানান্তরিত হবার জন্য একটি রোবটে চাকা, যান্ত্রিক সংযোগসম্পন্ন পা কিংবা অন্য কোন ধরনের নড়াচড়া করাতে সক্ষম যন্ত্রপাতি যুক্ত থাকে।

অ্যাকচুয়েটর (Actuator): রোবটের শরীরের বিভিন্ন অংশ নড়াচড়া করানোর জন্য একাধিক বৈদ্যুতিক মোটর, হাইড্রোলিক সিস্টেম ও নিউমেটিক সিস্টেমের সমন্বয়ে তৈরিকৃত বিশেষ ব্যবস্থাটি অ্যাকচুয়েটর হিসেবে পরিচিত। এককথায় এটিকে মানুষের মতো রোবটের হাত-পায়ের পেশী হিসেবেও অভিহিত করা যায়।

বৈদ্যুতিক উৎস বা পাওয়ার সিস্টেম (Power Source/System): অ্যাকচুয়েটরকে কার্যকর করার জন্য রোবটের প্রয়োজন বৈদ্যুতিক সংযোগ এবং এর জন্য ইলেকট্রিক রোবটসমূহ সাধারণত লেড এসিড ব্যাটারি বা এক্সটেনসন কর্ড ব্যবহার করে। এই ধরনের ব্যাটারি রিচার্জেবল হয়ে থাকে এবং রোবটকে কাজ করার পর বা কাজ করার পূর্বে ব্যাটারি রিচার্জ করার প্রয়োজন হয়। তবে হাইড্রোলিক রোবটের ক্ষেত্রে রিচার্জের পরিবর্তে এর হাইড্রোলিক ফ্লুয়িডকে প্রেসারাইজ করার জন্য পাম্প এর প্রয়োজন হয় এবং নিউম্যাটিক রোবটের রিচার্জের জন্য এয়ার কমপ্রেশার প্রয়োজন হয়।

ইলেকট্রিক সার্কিট (Electric Circuit): ইলেকট্রিক সার্কিট বৈদ্যুতিক রোবটের মোটরসমূহে বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদান করে। একই সাথে হাইড্রোলিক ও নিউমেটিক সিস্টেমের রোবটকে নিয়ন্ত্রণকারী সলেনয়েড বা ভালভ্‌সমূহকেও এটি বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদান করে।

প্রোগ্রামকৃত মস্তিষ্ক বা কম্পিউটার (Reprogramable Brain or Computer): রোবটের মধ্যে স্থাপিত প্রোগ্রামকৃত মস্তিষ্ক বা কম্পিউটার এর সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। যদি কোন কারণে রোবটের আচরণ পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে এর ভেতরে থাকা কম্পিউটারটি রিপ্রোগ্রাম করা হলেই চলবে।

অনুভূতি (Sensing): অনুভূতি রোবটের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মানুষের যেমন যে কোন উদ্দীপনায় সাড়া দেবার অনুভূতি থাকে তেমন অনুভূতি রোবটের মধ্যেও তৈরি করা যায় যা বিভিন্ন উদ্দীপনার প্রতি সাড়া দিতে সক্ষম। যেমন- রোবটের হাত বা পা যে কোন জায়গা স্পর্শ করলে সেই জায়গা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য নেওয়ার ক্ষমতা রোবটের থাকতে পারে। মানুষের চোখের ন্যায় রোবটে স্থাপিত ক্যামেরা দিয়ে সামনে বা পেছনের দৃশ্য গ্রহণ করা সম্ভব। ফলে কাজের প্রয়োজনে রোবটকে ৩৬০° ডিগ্রি এঙ্গেলে ঘোরানো যেতে পারে।

পরিবর্তন বলা (Manipulation): রোবটের হাত-পা এর সাহায্যে এর আশেপাশের বস্তুগুলোর অবস্থান পরিবর্তন বা বস্তুটি পরিবর্তন করার পদ্ধতিকে ম্যানুপুলেশন বলা হয়। রোবট তার হাতে থাকা আঙ্গুলসমূহের সাহায্যে কোন বস্তুকে ধরতে বা উঠাতে পারবে। একই সাথে রোবট তার পায়ের সাহায্যে সামনে বা পিছনে, ডানে বা বামে চলাচল করতে পারবে।

রোবোটিক্স এর ব্যবহার (Application of Robotics)

রোবোটিক্স এর উল্লেখযোগ্য ব্যবহারগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. **ম্যানুফ্যাকচারিং এ :** কম্পিউটার-এইডেড ম্যানুফ্যাকচারিং (ক্যাম) এ রোবোটিক্স ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে যানবাহন ও গাড়ির কারখানায় রোবট ব্যবহৃত হয়।

২. **বিপজ্জনক কাজে :** যে সমস্ত কাজ করা স্বাভাবিকভাবে মানুষের জন্য বিপজ্জনক যেমন– বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়করণ, ডুবে যাওয়া জাহাজের অনুসন্ধান, খনির অভ্যন্তরের কাজ ইত্যাদির ক্ষেত্রে রোবোটিক ডিভাইস বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়।

৩. **ভারী শিল্প কারখানায় :** কারখানায় কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত রোবটের সাহায্যে নানা রকম বিপজ্জনক ও পরিশ্রমসাধ্য কাজ যেমন– ওয়েল্ডিং, ঢালাই, ভারী মাল ওঠানো বা নামানো, যন্ত্রাংশ সংযোজন ইত্যাদি করা হয়।

৪. **পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষার কাজে :** রোবট অতিক্ষুদ্র মাইক্রোসার্কিটের উপাদান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবিশ্বাস্যভাবে পরীক্ষা করতে পারে যা করা মানুষের পক্ষে কঠিন এবং অসম্ভব।

৫. **মেইল ডেলিভারির কাজে :** বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে বিল্ডিংসমূহ জুড়ে বিভিন্ন মেইল স্টেশনে মেইল ডেলিভারির কাজে বিশেষ ধরনের রোবট ব্যবহার করা হয়। আলট্রা ভায়োলেট পেইন্ট দিয়ে মার্ক করা রুটগুলোকে এসব রোবট অনুসরণ করে।

৬. **ঝুঁকিপূর্ণ কাজে :** পারমাণবিক কেন্দ্রে ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয়ায় যে সব কর্মী কাজ করেন তাদের ঝুঁকি অনেক। এসব ঝুঁকিপূর্ণ কাজে রোবট মানুষের বদলে কাজ করতে পারে।

৭. **নিরাপত্তার কাজে :** উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনায় নিরাপত্তার জন্য রোবট ব্যবহৃত হয়। মাইক্রোওয়েভ ভিশনের মাধ্যমে যেকোনো অধাতব দেয়ালের অপর পাশে কি আছে তা দেখতে পারে, অন্ধকারে কয়েকশ ফুট দূর থেকেও আগন্তুককে দেখতে পায় নিরাপত্তার জন্য তৈরি করা রোবট। তাই এগুলো গুরুত্বপূর্ণ অনেক ভবন পাহারায় ব্যবহার করা হয়।

৮. **পুলিশের সাহায্যকারী হিসেবে :** বিশ্বের বহু দেশে পুলিশ বিপজ্জনক পরিস্থিতি মোকাবেলায় রোবটকে ব্যবহার করে। যেমন– জিম্মি মুক্ত করা, গোলাগুলি ইত্যাদির মতো পরিস্থিতিতে গুলি করতে, দরজা খুলতে, সামনে গিয়ে পরিস্থিতি অবলোকন করতে বা ক্যামেরার সাহায্যে জানালায় নজর রাখতে ঘটনাস্থলে রোবটকে ব্যবহার করা হয়।

৯. **সামরিক ক্ষেত্রে :** সামরিক ক্ষেত্রেও রোবটের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। বোমা নিষ্ক্রিয় করা, ভূমি মাইন সনাক্ত করা, সামরিক নানা সরঞ্জামাদি বহন এবং অন্যান্য মিলিটারি অপারেশনে রোবট ব্যবহার করা হয়।

সামরিক কাজে রোবট

গাড়ি নির্মাণে রোবট

মঙ্গল গ্রহে নাসার কিউরিসিটি রোবট

১০. **ঘরোয়া কাজে :** কিছু কিছু রোবট হাঁটতে পারে এবং মানুষের সাথে কথা বলতে পারে। রুটিনমাফিক ঘরের প্রাত্যহিক অনেক কাজকর্ম; যেমন– কফি তৈরি করা, ঘর পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজে রোবটকে ভৃত্যের মতো ব্যবহার করা যায়।

১১. **চিকিৎসায় :** চিকিৎসাক্ষেত্রে জটিল সব অপারেশনে সার্জনদের নানা ধরনের কাজে রোবট সহায়তা করে।

১২. **মহাকাশ গবেষণায় :** মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে রোবটের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। মানুষের পরিবর্তে মহাকাশ অভিযানে এখন বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বলিত রোবট ব্যবহৃত হচ্ছে। সম্প্রতি মঙ্গলগ্রহে যুক্তরাষ্ট্রের নাসা কর্তৃক 'কিউরিসিটি' নামের একটি রোবট পাঠানো হয়েছে যেটি মঙ্গলের পরিবেশ, প্রকৃতি ইত্যাদি হতে তথ্য নিয়ে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করে পৃথিবীতে পাঠাচ্ছে।

যেকোনো সমস্যায় নিজ থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করার জন্য মানুষের মতো রোবটে কৃত্রিম বুদ্ধি দিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে। এর ফলে রোবট অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেদের কর্মপদ্ধতিও বদলাতে পারে।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে রোবট ব্যবহারের সুফল এবং কুফল নিয়ে আলোচনা করবে।

৩.৩ ক্রায়োসার্জারি (Cryosurgery)

ক্রায়োসার্জারি হলো এমন একটি চিকিৎসা পদ্ধতি যার মাধ্যমে অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রায় শরীরের অস্বাভাবিক বা রোগাক্রান্ত কোষগুলোকে ধ্বংস করা যায়। গ্রিক শব্দ 'ক্রায়ো' (বরফের মতো ঠাণ্ডা) এবং 'সার্জারি' (হাতের কাজ) শব্দ দুটি হতে ক্রায়োসার্জারি শব্দটি এসেছে। ঐতিহাসিকভাবেই বেশ কিছু রোগের চিকিৎসার জন্য ক্রায়োসার্জারিকে ব্যবহার করা হতো যাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিপজ্জনক চর্ম সংক্রান্ত সমস্যাও রয়েছে। খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ সালের দিকে মিশরীয়রা ত্বকের বিভিন্ন ধরনের ক্ষত ও প্রদাহের চিকিৎসায় শীতল তাপমাত্রার ব্যবহার করতো। জেমস আরনট কর্তৃক মাইনাস ২০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় লবণ পানিকে বরফে জমাকৃত করে ব্যবহার করার পদ্ধতি বর্ণিত হওয়ার মাধ্যমে ১৮৪৫ সালে ইংল্যান্ডে প্রথম ক্রায়োসার্জারির ব্যবহার শুরু হয়। ১৯২০ সালের দিকে ক্রায়োসার্জারিতে তরল অক্সিজেনের ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৫০ সালে ড. রে এলিংটন ক্রায়োসার্জারিতে তরল নাইট্রোজেন প্রয়োগ করেন। পরবর্তীতে অন্যান্য ক্রায়োজনিক এজেন্ট যেমন-নাইট্রাস অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, আর্গন, ইথাইল ক্লোরাইড এবং ফ্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন ব্যবহার করে ক্রায়োসার্জিক্যাল চিকিৎসার আরো উন্নতি সাধন করা হয়।

যে তাপমাত্রায় বরফ জমাট বাঁধে দেহকোষে তার চাইতেও নিম্ন তাপমাত্রার ধ্বংসাত্মক শক্তির সুবিধাকে গ্রহণ করে ক্রায়োসার্জারি কাজ করে। এতে নিম্ন তাপমাত্রায় দেহকোষের অভ্যন্তরস্থ বরফ ক্রিস্টালগুলোর বিশেষ আকার বা বিন্যাসকে ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে দেয়া যায়। ক্রায়োসার্জারির ক্ষেত্রে সাধারণত পৃথক পৃথকভাবে তরল নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইডের তুষার, আর্গন এবং সমন্বিতভাবে ডাইমিথাইল ইথার ও প্রোপেন এর মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়। এদের কোনো কোনোটি –41°C তাপমাত্রার উদ্ভব ঘটায়।

চিত্র : তরল নাইট্রোজেন স্প্রে করার জন্য ব্যবহৃত ক্রায়োগান

ক্রায়োসার্জারির ব্যবহার (Application of Cryosurgery)

১. ওয়ার্ট, মোল, স্ক্রিন ট্যাগ, সোলার কেরাটোস, মর্টনস নিউরোমা এবং ছোটখাট চর্ম ক্যান্সারসমূহের জন্য ক্রায়োসার্জিক্যাল চিকিৎসা দেয়া হয়।

২. বেশ কিছু অভ্যন্তরীণ শারীরিক ব্যাধি যেমন– লিভার ক্যান্সার, প্রোস্টেট ক্যান্সার, লাং ক্যান্সার, ওরাল ক্যান্সার, সার্ভিক্যাল ব্যাধিসমূহের চিকিৎসায় ক্রায়োসার্জারি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

৩. মানবদেহের কোষকলার কোমল অবস্থা যেমন– প্ল্যান্টার ফ্যাসিলিটিস এবং ফিবরোমাকে ক্রায়োসার্জারির মাধ্যমে চিকিৎসা করা যায়।

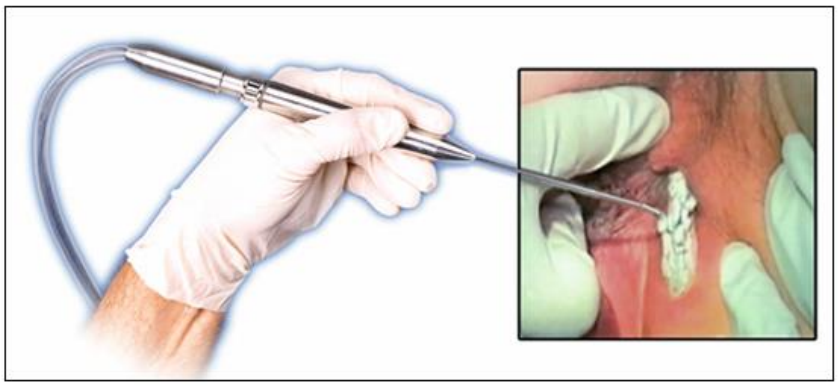

ক্রায়োসার্জারি ও রেডিওথেরাপির মধ্যে পার্থক্য (Difference between Cryosurgery and Radiotheraphy)

পার্থক্যের বিষয়	ক্রায়োসার্জারি	রেডিওথেরাপি
১. শারীরিক ধকল	এই থেরাপির ক্ষেত্রে রোগীকে তুলনামূলকভাবে কম ধকল সহ্য করতে হয়।	এই থেরাপির ক্ষেত্রে রোগীকে অনেক বেশি ধকল সহ্য করতে হয়।
২. পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া	এটি অনেক নিরাপদ পদ্ধতি ও প্রায় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত।	এই থেরাপিতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে।

চিকিৎসায় ক্রায়োসার্জারি প্রয়োগ (Application of Cryosurgery in Treatment)

চিকিৎসায় ক্রায়োসার্জারি প্রয়োগের সুবিধাসমূহ ঃ

১. যে তাপমাত্রায় বরফ জমাট বাঁধে দেহকোষে তার চাইতেও নিম্ন তাপমাত্রার ধ্বংসাত্মক শক্তির সুবিধাকে গ্রহণ করে ক্রায়োসার্জারি বা ক্রায়োথেরাপি কাজ করে। এত নিম্ন তাপমাত্রায় দেহকোষের অভ্যন্তরস্থ বরফ ক্রিস্টালগুলোর বিশেষ আকার বা বিন্যাসকে ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে দেয়া যায়।

২. ক্রায়োসার্জারি চিকিৎসা পদ্ধতিটিতে প্রচলিত শল্য চিকিৎসার মতো অতটা কাঁটাছেঁড়া করার প্রয়োজন হয় না।

৩. এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে।

৪. এই পদ্ধতিটি ধীরে ধীরে কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি এবং অস্ত্রোপচার চিকিৎসার জায়গা দখল করে নিচ্ছে। ফলে ক্যান্সার ও নিউরো রোগীদের কাছে দিন দিন এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫. সকল ধরনের ক্যান্সার চিকিৎসায় এই পদ্ধতি চিকিৎসকদের বাড়তি সুবিধা এনে দিয়েছে। নিউরোসার্জারি এবং টিউমার বা ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় ক্রায়োথেরাপি পদ্ধতি বিশেষভাবে কার্যকর।

৬. ওয়ার্ট, মোল, স্ক্রিন ট্যাগ, সোলার কেরাটোস, মর্টনস নিউরোমা এবং ছোটখাটো চর্ম ক্যান্সারসমূহের জন্য ক্রায়োসার্জিক্যাল চিকিৎসা দেয়া হয়।

৭. বেশ কিছু অভ্যন্তরীণ শারীরিক ব্যাধি যেমন– লিভার ক্যান্সার, প্রোস্টেট ক্যান্সার, লাং ক্যান্সার, ওরাল ক্যান্সার, সার্ভিক্যাল ব্যাধিসমূহের চিকিৎসায় ক্রায়োসার্জারি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

ক্রায়োসার্জারিতে আইসিটির ব্যবহার (Using ICT in Cryosurgery)

ক্রায়োসার্জারিতে সুঁইয়ের মতো লম্বা ক্রায়োপ্রোব যন্ত্রের সাহায্যে আক্রান্ত টিউমারে নাইট্রোজেন ও আর্গন গ্যাস সরবরাহ করা হয়। ক্রায়োপ্রোব সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য এবং পাশের সুস্থ কোষ যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেজন্য কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত আলট্রাসাউন্ড অথবা এমআরআই (MRI-Megnetic Resource Imaging) ব্যবহার করা হয়। ব্রায়মিল হলো পৃথিবীর মধ্যে নাম্বার ওয়ান হ্যান্ডহ্যান্ড লিকুইড নাইট্রোজেন ক্রায়োসার্জিক্যাল এবং ক্রায়োস্প্রে ডিভাইস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। তারা তাদের পণ্যের উৎপাদন ব্যবস্থায় কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছে। ক্রায়োসার্জারি উৎপাদনে কাঁচামাল সংগ্রহ, ব্যবহার ইত্যাদি থেকে শুরু করে পণ্য উৎপাদন, বিপণন সর্বত্রই তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

৩.৪ মহাকাশ অভিযান (Space Exploration)

পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্যের রহস্য আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে চালিত অনুসন্ধান বা অভিযানকে মহাকাশ অভিযান বলা হয়। পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্যে সম্পূর্ণ নতুন একটি মহাজাগতিক বিশ্বের আবিষ্কার সকলের মনকেই আন্দোলিত করে। প্রতিনিয়ত মহাবিশ্বকে জানার অবিরাম চেষ্টা চলছে। হচ্ছে বিস্তর গবেষণা। আজ মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে যতটুকু সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া কখনই অর্জন করা সম্ভব হতো না। একবিংশ শতাব্দিতে মহাকাশ আবিষ্কারে আরও বেশি গবেষণার জন্য প্রযুক্তির সহায়তা নিতে হচ্ছে। মহাকাশে মানুষ এবং রোবটিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই বিশ্ব এবং এতে বসবাসকারী লোকজনের জন্য তা বিরাট সুফল বয়ে এনেছে। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে ডেটা ও ডেটা পণ্যসমূহের প্রক্রিয়াকরণ, ট্রান্সমিশন, সংরক্ষণ এবং বিতরণের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে ডেটা ও ডেটা পণ্যসমূহের প্রক্রিয়াকরণ, ট্রান্সমিশন, সংরক্ষণ এবং বিতরণের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে ঃ

- চাঁদের মাটিতে অবতরণ
- স্পেস স্টেশন (যেমন– ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন)
- অন্যান্য গ্রহে মিশন প্রেরণ (যেমন– মঙ্গল গ্রহ)
- পৃথিবীর উপর গবেষণা

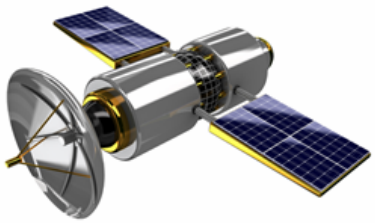

মহাকাশ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিবর্তনশীল বস্তু বা পরিমাণ ব্যবহার করে জটিল জটিল সব গণনার কাজ করার প্রয়োজন হয়। এগুলোকে বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ এবং অন্যান্য অংশের জন্য জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত তথ্যে প্রয়োগ করা হয়। পাশাপাশি মহাকাশযান ও প্রোবগুলোর গতি ও পরিভ্রমণ নিয়েও কাজ করতে হয়। পৃথিবীর ক্ষেত্রে ভূমি কিংবা আকাশে ভ্রমণ করাটা মানুষের পক্ষে তুলনামূলকভাবে সাধারণ যানবাহনের মাধ্যমে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তবে মহাকাশের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ত্রুটি বা ভুল গণনা মারাত্মক সব সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে যেগুলোকে খুব সহজে শুধরে নেয়া সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে কম্পিউটারগুলো একটি মিশনের পরিকল্পনা তৈরি এবং মিশন চলাকালীন প্যারামিটারগুলোকে বিশ্লেষণে ডেটার উপর দ্রুততর এবং আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রদান করে। কম্পিউটার ছাড়া কার্যকরভাবে মহাকাশ আবিষ্কারের বিষয়টি প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার। বিজ্ঞান ও যেকোনো ক্ষেত্রে যেখানে বিরাট কোনো সাফল্য এসেছে সেখানে সব সময়ই কম্পিউটার জড়িত হয়েছে। জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে এটি বৃহৎ যেসব আবিষ্কারগুলো ঘটেছে সেগুলো টেলিস্কোপ এবং কম্পিউটার ব্যবহার করেই এসেছে।

মহাশূন্যে বসে গবেষণাকার্য পরিচালনার জন্য পৃথিবীর কক্ষপথে স্পেস স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পৃথিবী থেকে গবেষকদের একটি দল এই স্টেশনে গিয়ে অবস্থান করেন এবং আধুনিক সব প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে দূর নক্ষত্রসমূহের উপর গবেষণাকার্য পরিচালনা করেন। স্পেস স্টেশনের কিছু কিছু যন্ত্রাংশ বিকল হয়ে গেলে তাদের অনেককেই স্পেস স্টেশনের বাইরে এসে সেগুলো সারিয়ে নিতে হয়। জীবনের মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে তারা এসব কাজ করে থাকেন। এসব ক্ষেত্রে তারা পুরো কার্যক্রমই পরিচালনা করেন কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন রোবটিক ব্যবস্থা, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ও নিজেদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে। পৃথিবীর বাইরে সৌরজগতের অন্য কোনো গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা সেটি জানার জন্য বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের মিশন পরিচালনা করতে রোবট ব্যবহার করেন।

মহাকাশ অভিযানের গুরুত্ব (Importance of Space Exploration)

১. কৃত্রিম ভূ–উপগ্রহ এবং রোবোটিক মহাকাশযানের মাধ্যমে সৌরজগৎ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করছেন।
২. কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে কণ্ঠস্বর ছবি এবং তথ্য মুহূর্তে পাঠানো যায়।
৩. কৃত্রিম ভূ–উপগ্রহের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য দ্বারা বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর ব্যবহার পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করেছেন।
৪. বায়ুমণ্ডল এবং আবহাওয়া সম্পর্কিত সকল তথ্যই কৃত্রিম ভূ–উপগ্রহ ব্যবহার করে সংগ্রহ করা হয়।
৫. পৃথিবীর অনেক দেশ তাদের দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পৃথিবী পর্যবেক্ষণকারী স্যাটেলাইটগুলোর সহায়তা নিচ্ছে যা নৌ, বিমান ও সেনা বাহিনীর মতই গুরুত্বপূর্ণ।
৬. কৃত্রিম ভূ–উপগ্রহ এবং রোবোটিক মহাকাশযানের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা সৌরজগৎ সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেন। অন্য কোন গ্রহ থেকে এ পৃথিবীর নিরাপত্তার জন্য মহাকাশ অভিযান করা হচ্ছে।

মহাকাশ অভিযানের কতিপয় ঘটনা

১. ৩ অক্টোবর ১৯৪২ সালে জার্মান বিজ্ঞানীরা রকেট "ভি–২" পরীক্ষামূলকভাবে মহাশূন্যে পাঠান।
২. ৪ অক্টোবর ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর প্রথম উপগ্রহ "স্পুটনিক–১" মহাকাশে প্রেরণ করে।
৩. "ভস্টক–১" বিশ্বের প্রথম মানুষ বহনকারী মহাকাশযান। ১২ এপ্রিল ১৯৬১ রাশিয়ান মহাকাশযাত্রী ইউরি গ্যাগারিন মহাশূন্য ভ্রমণ করেন। পৃথিবীর চারপাশের কক্ষপথ একঘণ্টা চল্লিশ মিনিটে একবার আবর্তন করে।
৪. যুক্তরাষ্ট্র জন গ্লেনের কক্ষপথীয় মহাকাশযান "মারকিউরি–এটলাস–৬" মহাশূন্যে প্রেরণ করে ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ সালে।
৫. ১৬ জানুয়ারি ১৯৬৩ সালে বিশ্বের ১ম মহিলা ভ্যালেনটিনা তেরেশকোভা "ভস্টক–৬" এ করে আটচল্লিশবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেন।
৬. "এপোলো–১১" তে করে ২০ জুলাই ১৯৬৯ সালে সর্বপ্রথম নিল আর্মস্ট্রং ও এডউইন অলড্রিন চাঁদে অবতরণ করেন।
৭. শুক্রগ্রহে ১৯৭০ সালে 'ভেনেরা–৭" অবতরণ করে সরাসরি সেখান থেকে ২৩ মিনিট যাবৎ পৃথিবীতে তথ্য প্রেরণ করে। মঙ্গল গ্রহ থেকে ১৯৭১ সালে "মার্স–৩" মিশনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম সরাসরি পৃথিবীতে ২০ সেকেন্ড যাবৎ তথ্য প্রেরণ করে।

স্পেস স্টেশন (Space Station)

মহাশূন্যে বসে গবেষণাকার্য পরিচালনার জন্য পৃথিবীর কক্ষপথে স্পেস স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পৃথিবী থেকে গবেষকদের একটি দল এই স্টেশনে গিয়ে অবস্থান করেন এবং আধুনিক সব প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে দূর নক্ষত্রসমূহের উপর গবেষণাকার্য পরিচালনা করেন। স্পেস স্টেশনের কিছু কিছু যন্ত্রাংশ বিকল হয়ে গেলে তাদের অনেককেই স্পেস স্টেশনের বাইরে এসে সেগুলো সারিয়ে নিতে হয়। জীবনের মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে তারা এসব কাজ করে থাকেন। এসব ক্ষেত্রে তারা পুরো কার্যক্রমই পরিচালনা করেন কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন রোবটিক ব্যবস্থা, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ও নিজেদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে।

অন্যান্য গ্রহে মিশন পরিচালনা

পৃথিবীর বাইরে সৌরজগতের অন্য কোনো গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা সেটি জানার জন্য বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের মিশন পরিচালনা করছেন। ইতোমধ্যে মঙ্গল গ্রহে প্রাণের খোঁজে পরিচালিত হয়েছে বেশ ক'টি মিশন। এদের মধ্যে সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞানীরা পাঠিয়েছেন 'কিউরিসিটি' নামের একটি অত্যাধুনিক রোবটসহ মহাকাশযান। এটি মঙ্গলগ্রহে পৌঁছে মঙ্গলের মাটিতে অবতরণ করে তার কাজ শুরু করে দিয়েছে। বিভিন্ন ধরনের ছবি তুলে এটি প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে পাঠাচ্ছে। পাশাপাশি মঙ্গলের বুকে বিভিন্ন বস্তুকে সনাক্ত করে সেগুলোকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রাপ্ত ফলাফলগুলোও পাঠাচ্ছে। এই বিপুল কর্মযজ্ঞে কম্পিউটার তথা তথ্য প্রযুক্তি এবং সেই সাথে টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

৩.৫ আইসিটি-নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা (ICT Dependent Production System)

আজকের বিশ্বের শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা প্রায় পুরোটাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর। যেকোনো পণ্য তৈরির একেবারে শুরু থেকে ডিজাইন, কাঁচামাল সংগ্রহ, ব্যবহার, পণ্য উৎপাদন, বিপণন পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে কোনো না কোনোভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্পৃক্ততা রয়েছে। শিল্প কারখানায় কম্পিউটার মানুষের প্রধান সহযোগী। দ্রব্যাদি বা যন্ত্রপাতির নকশা, যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার যথেষ্ট সাফল্য এনে দিয়েছে।

উৎপাদন ব্যবস্থায় টেলিযোগাযোগ সেবা ঃ টেলিযোগাযোগ ছাড়া আজকাল কোনো শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থা কল্পনাই করা যায় না। বৃহৎ, মাঝারি কিংবা ক্ষুদ্র শিল্পগুলোতে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন পড়ে যাদের মধ্যে পণ্যের কাঁচামাল সরবরাহকারী থেকে শুরু করে পণ্যের ক্রেতা পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে জড়িত ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন। উৎপাদন ব্যবস্থায় সমন্বয় সাধনে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বহু শিল্প কারখানায় অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য ওয়্যারলেস সেবা চালু আছে।

উৎপাদন ব্যবস্থায় ইন্টারনেট ঃ ইন্টারনেট ছাড়া শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা আজ অচল। বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাথে মেইল চালাচালির ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হয়। কোনো কোম্পানির একাধিক উৎপাদন প্ল্যান্ট থাকলে সেগুলোর সাথে উৎপাদন বিষয়ক সমন্বয় সাধনে ইন্টারনেটনির্ভর বিভিন্ন ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়। এমন অনেক গ্রুপ অব কোম্পানি রয়েছে যাদের প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত এমনকি সেগুলো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে কোম্পানির মালিক থেকে শুরু করে পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দের পক্ষে সব সময় সবগুলো স্থানে স্বশরীরে গিয়ে তদারকি করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে দূরত্বকে ঘুচিয়ে দিয়ে প্রতিষ্ঠানের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বজায় রাখতে ইন্টারনেট নির্ভর প্রযুক্তিগুলো সহায়তা করে।

চিত্র : ক্যামেরা সার্ভিল্যান্স সিস্টেম

চিত্র : ভিডিও কনফারেন্সিং

ক্যাড/ক্যাম এর ব্যবহার ঃ কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন (ক্যাড)-এর ব্যবহার পণ্যকে প্রত্যক্ষ করতে এবং ডিজাইন তথ্যসমূহের সাথে যোগাযোগে ব্যবহৃত প্রচলিত স্কেচ ও প্রকৌশলিক ড্রয়িংগুলোকে অপসারণ করেছে এবং সেই স্থানে কম্পিউটার গ্রাফিক্সকে প্রতিস্থাপন করেছে। অন্যদিকে কম্পিউটার এইডেড ম্যানুফ্যাকচারিং (ক্যাম)-এর মাধ্যমে কম্পিউটার ব্যবহার করে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইনগুলোকে ফিনিশড প্রোডাক্টে রূপান্তর করা হয়। কম্পিউটার এইডেড ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে কম্পিউটার বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন কার্যক্রমকে অটোমেটেড করার মাধ্যমে ম্যানেজার, ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ার এবং উৎপাদন কর্মীদের সহায়তা করে থাকে।

উপাত্ত সংগ্রহ ঃ শিল্প কলকারখানার উৎপাদন কাজের উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার নানা তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়। যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন মোটরের গতি, কম্পাঙ্ক, তাপমাত্রা, ব্যবহৃত তরল ও রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ, এদের প্রবাহ, ঘনত্ব ইত্যাদিসহ আরও বিভিন্ন ধরনের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে তা কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।

পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ঃ কল কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের মান যথাযথ হচ্ছে কি না তা কম্পিউটার দিয়ে তথ্য উপাত্তকে যাচাই করে বের করা যায়। এছাড়াও উৎপাদন কাজে যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে তা ঠিকমতো কাজ করছে কি না তার সুষ্ঠু তদারকিতে কম্পিউটার ব্যবহার করা যায়। বিভিন্ন রকম রাসায়নিক কারখানা, ইস্পাত কারখানা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদিতে কম্পিউটারের সাহায্যে যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এসব কেন্দ্রে বিভিন্ন যন্ত্রের চাপ ও তাপমাত্রা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজন হয়। কম্পিউটারে এসকল ভৌত রাশি পরিমাপ করে এবং তার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।

শিল্পক্ষেত্রে রোবটের ব্যবহার ঃ কম্পিউটার-এইডেড ম্যানুফ্যাকচারিং (ক্যাম) এ রোবোটিক্সকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। শিল্পক্ষেত্রে কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের, অধিক ঝুঁকিপূর্ণ, বিপজ্জনক ও জটিল কাজগুলো রোবটের সাহায্যে করা হয়। বিশেষ করে গাড়ি ও যানবাহন তৈরির কারখানা, খনি শ্রমিক, ঢালাইয়ের কারখানা, ভারী মাল ওঠানো বা নামানো, কোন যন্ত্রাংশ সংযোজন ইত্যাদি কাজে রোবটের ব্যবহার লক্ষণীয়।

৩.৬ প্রতিরক্ষা (Defence)

প্রতিরক্ষা শিল্প হলো বহু দেশেরই অন্যতম অর্থনৈতিক ইউনিট। এটি যুদ্ধাস্ত্র এবং বিশেষ যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈরি করে। কিছু কিছু দেশ তাদের প্রতিরক্ষা শিল্পকে এতটাই উন্নত ও বর্ধিত করেছে যে এখন ঐ সমস্ত যুদ্ধাস্ত্র অন্যান্য দেশে তারা রপ্তানি করছে। আইসিটি এবং প্রতিরক্ষা শিল্প বা ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী আন্তঃসম্পর্ক। এদের উভয়েরই একে অপরের সাথে রয়েছে একটি সরাসরি ও ইতিবাচক সম্পর্ক। আইসিটিতে ক্রমোন্নতি ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রির উন্নয়নে বহুবিধ সুবিধা নিয়ে এসেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার প্রতিরক্ষায় যেসব সুবিধা দিয়েছে তাহলো-

১. অত্যন্ত কার্যকর ও অধিক লক্ষ্যভেদী মারণাস্ত্র তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

২. আশেপাশের এলাকাকে ধ্বংস না করেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুকে নির্ভুল আঘাত হানার ক্ষমতাপ্রাপ্তি সম্ভব হয়েছে। কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় বর্তমানকালের যুদ্ধাস্ত্রগুলো আগের চেয়ে ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন।

৩. বহুদূর থেকে লক্ষ্যবস্তু চিহ্নিতকরণ সম্ভব হয়েছে।

৪. ক্ষিপ্রগতিতে তথ্য আদান–প্রদান।

৫. স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ডিভাইস যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে কমান্ডার ও সৈন্যদের মধ্যবর্তী যোগাযোগ ব্যবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৬. স্যাটেলাইটগুলোর মাধ্যমে স্থলভূমি, মহাসাগর, আবহাওয়া, শত্রুদেশের গুরুত্বপূর্ণ মিলিটারি স্থাপনা ইত্যাদি অনেক সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব।

৭. সেনাবাহিনী, ক্ষেপণাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, ট্যাংক, রাডার ব্যবস্থা, জঙ্গী বিমান ও যুদ্ধজাহাজ ইত্যাদি দক্ষভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে।

৮. সকল বাহিনীর মধ্যে অর্থাৎ স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনীর মধ্যে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করা সহজ হয়েছে।

৯. শত্রুপক্ষের দিকে নিজস্ব বাহিনীর অগ্রসরমানতাকে মনিটর করা, যুদ্ধ ময়দানে তাদের পজিশন, হতাহতদের সংখ্যা, যুদ্ধ সরঞ্জামাদি সরবরাহের পর্যায় ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে।

১০. যুদ্ধ ময়দান থেকে যুদ্ধের দৃশ্যাবলি রিয়েলটাইমে কমান্ড সেন্টারে বসে প্রত্যক্ষ করা যায়। লক্ষ্যবস্তু এবং তাদের অবস্থানের মধ্যবর্তী সীমাকে নিখুঁতভাবে গণনা, এক পয়েন্ট থেকে অন্য পয়েন্টে গমনে কী পরিমাণ সময় লাগবে তা নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যায়।

১১. গোপন খবরাখবর প্রেরণ এবং মিসাইল ছুঁড়ে লক্ষ্যবস্তুকে ধ্বংস করার চালকবিহীন 'ড্রোন' বিমান তৈরি করা হয়েছে।

১২. স্যাটেলাইটভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এর ফলে নিজ পক্ষের প্রতিটি সৈনিকের অবস্থান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্যের পাশাপাশি তার সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে।

১৩. দীর্ঘ পাল্লার রাডার, ব্যাটেলফিল্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস), মিসাইল অ্যাকটিভ গাইড সিস্টেম প্রভৃতি প্রতিরক্ষাবিষয়ক সফটওয়্যার ব্যবহার করে প্রতিরক্ষাকে জোরাল করা হচ্ছে।

৩.৭ বায়োমেট্রিক্স (Biometrics)

ধরা যাক, একটি বড় প্রতিষ্ঠানের গেটে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর লাগানো আছে। প্রতিষ্ঠানটিতে কারা কারা ঢুকতে পারবে আগে থেকেই তাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে কম্পিউটারে বিশেষ নিরাপত্তা সফটওয়্যারের ডেটাবেজে সংরক্ষিত করে রাখা আছে। গেটে আগত প্রবেশকারী তার আঙুল দিয়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরের বিশেষ স্থানে চাপ দিবে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট তৈরি হয়ে তা কম্পিউটারে যাবে এবং কম্পিউটারে রক্ষিত ফিঙ্গারপ্রিন্টের সাথে মিলিয়ে দেখবে। যদি মিল পায় তাহলে ওকে সিগনাল আসবে এবং কম্পিউটারের সাথে ইন্টারফেস করা গেটটি খুলে যাবে। আর যদি না মিলে তাহলে গেট বন্ধ থাকবে। এখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট হলো একটি বায়োলজিক্যাল ডেটা। ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা আঙুলের ছাপ হলো ইউনিক আইডেনটিটি। একজনের আঙুলের ছাপের সাথে আরেকজনের আঙুলের ছাপ মিলবে না। এখানে আঙুলের ছাপকে ব্যবহার করে কম্পিউটার সফটওয়্যার নির্ভর যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে তা-ই হলো বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি।

গ্রীক শব্দ "bio" (life) ও "metric" (to measure) থেকে উৎপত্তি হয়েছে বায়োমেট্রিক্স (Biometrics)। **বায়োমেট্রিক্স হলো বায়োলজিক্যাল ডেটা মাপা এবং বিশ্লেষণ করার বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি।** তথ্য প্রযুক্তিতে বায়োমেট্রিক্স সেই প্রযুক্তি যা মানুষের দেহের বৈশিষ্ট্য (যেমন: ডিএনএ, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, চোখের রেটিনা এবং আইরিস, কণ্ঠস্বর, চেহারা এবং হাতের মাপ ইত্যাদি) মেপে এবং বিশ্লেষণ করে বৈধতা নির্ণয় করে। কম্পিউটার পদ্ধতিতে নিখুঁত নিরাপত্তার জন্য বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে মানুষের বায়োলজিক্যাল ডেটা কম্পিউটারের ডেটাবেজে সংরক্ষিত করে রাখা হয় এবং পরবর্তীতে এসব ডেটা নিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিলিয়ে দেখা হয়। ডেটা মিল পেলে বৈধ বলে বিবেচিত হয় এবং অনুমতি প্রাপ্ত হয়।

বায়োমেট্রিক্স এর প্রকারভেদ (Classification of Biometrics)

দেহের গঠন ও আচরণগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যথা-

ক. দেহের গঠন ও শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি

১. মুখ (Face) : মুখ বা চেহারার বৈশিষ্ট্য (facial characteristics) বিশ্লেষণ করা।
২. ফিঙ্গারপ্রিন্ট (Fingerprint) : প্রত্যেকের আলাদা একক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হাতের ছাপ বিশ্লেষণ করা।
৩. হ্যান্ড জিওমেটরি (Hand Geometry) : হাতের গঠন (shape) এবং আঙুলের দৈর্ঘ্যের মাপ বিশ্লেষণ করা।
৫. আইরিস (Iris) : চোখের মণির চারিপার্শ্বে বেষ্টিত রঙিন বলয় (colored ring) বিশ্লেষণ করা।
৬. রেটিনা (Retina) : চোখের পিছনের অক্ষিপটের (রেটিনার) মাপ বিশ্লেষণ করা।
৭. শিরা (Vein) : হাত এবং কব্জির শিরার প্যাটার্ন বিশ্লেষণ করা।

খ. আচরণগত বৈশিষ্ট্যের বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি

১. কণ্ঠস্বর (Voice) : প্রত্যেকের কণ্ঠের ধ্বনির বৈশিষ্ট্য, সুরের উচ্চতা, সুরের মূর্ছনা, স্পন্দনের দ্রুততা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা।

২. সিগনেচার (Signature) : হাতের দস্তখত বিশ্লেষণ করা।

৩. টাইপিং কী স্ট্রোক (Typing Keystroke) : নির্দিষ্ট কোন পাসওয়ার্ড যা টাইপ করে এন্ট্রি করা হয় এবং বিশ্লেষণ করা।

বায়োমেট্রিক্স এর ব্যবহার (Application of Biometrics)

বর্তমানে নিরাপত্তার কাজে বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ প্রযুক্তি সাধারণত দুই ধরনের কাজে ব্যবহৃত হয়। যথা–

১. কোন ব্যক্তি সনাক্তকরণ (Identification) কাজ

২. সত্যতা যাচাই (Verification) কাজ

ক. ব্যক্তি সনাক্তকরণ (Identification) কাজ : ব্যক্তি সনাক্তকরণ কাজে প্রচলিত সনাতনী পদ্ধতিতে ভোটার আইডি, পাসপোর্ট অথবা ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি টোকেন নির্ভর এবং ইউজার নেম, পাসওয়ার্ড বা পিন নাম্বার ইত্যাদি জ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এতে জালিয়াতির সুযোগ থাকে। তাই বর্তমানে মানুষের নিজস্ব একক কোন বৈশিষ্ট্যের আলোকে অর্থাৎ বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতিতে সনাক্তকরণের কাজ করা হয়। এটি অনেক বেশি নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য।

খ. সত্যতা যাচাই (Verification) কাজ : এ পদ্ধতিতে কম্পিউটারে রক্ষিত বায়োলজিক্যাল ডেটার তুলনা করে ভেরিফিকেশন করা হয়।

নিম্নে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিডার (Fingerprint Reader)

বর্তমানে আঙুলের ছাপ (Fingerprint) নিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা একটি জনপ্রিয় বায়োমেট্রিক সিস্টেম। এ পদ্ধতিতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট অপটিক্যাল স্ক্যানারের মাধ্যমে আঙুলের ছাপের ইমেজ নেয়া হয়। ইনপুটকৃত ইমেজের অর্থাৎ আঙুলের ছাপের বিশেষ কিছু একক বৈশিষ্ট্যকে ফিল্টার করা হয় এবং এনক্রিপ্টেড বায়োমেট্রিক কী হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়। ফিঙ্গারপ্রিন্টের ইমেজকে সংরক্ষণ না করে সংখ্যার সিরিজ (বাইনারি কোড) কে ভেরিফিকেশনের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। ফিঙ্গারপ্রিন্ট সিস্টেমের এ্যালগরিদম এই বাইনারি কোডকে ইমেজে পুনঃরূপান্তর করতে পারে না। তাই কেউ ফিঙ্গার প্রিন্টকে নকল (ডুপ্লিকেট) করতে পারে না। বায়োমেট্রিক্স ডিভাইস, যেমন ফিঙ্গার স্ক্যানারে থাকে একটি রিডার অথবা স্ক্যানিং ডিভাইস এবং সফটওয়্যার যা স্ক্যান করা তথ্যকে ডিজিটাল ফর্মে রূপান্তর করে এবং ম্যাচিং পয়েন্টগুলো তুলনা করে।

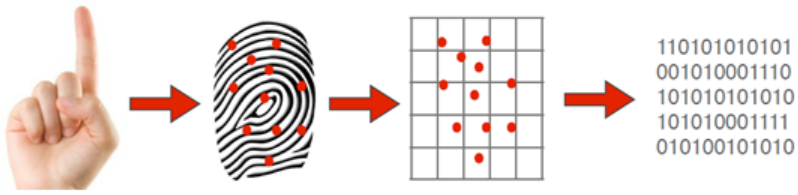

চিত্র ঃ ফিঙ্গারপ্রিন্ট বায়োমেট্রিক্স সিস্টেম

ফেইস রিকগনিশন (Face recognition)

মানুষের চেহারায় ভিন্ন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একজনের চেহারার সাথে আরেকজনের চেহারা মিলে না। ফেইস রিকগনিশন পদ্ধতিতে মুখ বা চেহারার বৈশিষ্ট্য (facial characteristics) বিশ্লেষণ করে সনাক্তকরণ করা হয়। দুই চোখের মধ্যকার দূরত্ব, নাকের দৈর্ঘ্য বা ব্যাস, চোয়ালের কৌণিক মাপ ইত্যাদি পরিমাপের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে সনাক্ত করা যায়। সম্প্রতি ল্যাপটপ,নোটবুক এবং পিডিএ-তে লগইন করতে বায়োমেট্রিক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।

হ্যান্ড জিওমেট্রি (Hand Geometry)

মানুষের হাতের আকৃতি ও জ্যামিতিক গঠনে ভিন্নতা রয়েছে। হ্যান্ড জিওমেট্রি রিডারের সাহায্যে হাতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ডেটা কম্পিউটারের ডেটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে আবার হ্যান্ড জিওমেট্রি রিডারের সাহায্যে হাতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ডেটা ইনপুট নিয়ে আগের ডেটার সাথে মিলিয়ে শনাক্তকরণ করা হয়।

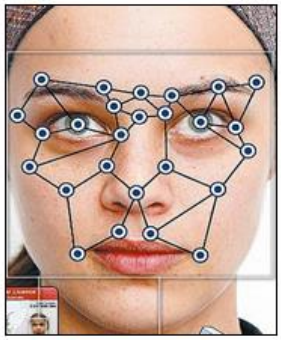

আইরিস এবং রেটিনা স্ক্যান (Iris and Retina Scan)

আইরিস শনাক্তকরণ পদ্ধতিতে চোখের তারার রঙিন অংশকে পরীক্ষা করা হয় এবং রেটিনা স্ক্যান পদ্ধতিতে চোখের মণিতে রক্তের লেয়ারের পরিমাণ পরিমাপ করে মানুষকে শনাক্ত করা হয়।

ভয়েস রিকগনিশন (Voice Recognition)

এ পদ্ধতিতে কণ্ঠস্বরকে ডেটায় রূপান্তর করে কম্পিউটারের ডেটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে ভয়েস ইনপুট নিয়ে আগের সংরক্ষিত ভয়েসের সাথে মিলিয়ে দেখে শনাক্তকরণ করা হয়।

একক কাজ : কোন কোন ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক্স এর ব্যবহার করা যায় তার তালিকা তৈরি করে তুলনা কর।

৩.৮ বায়োইনফরমেটিক্স (Bioinformatics)/ জৈবতত্ত্ববিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক এবং গবেষকরা মানুষের কল্যাণার্থে আবিষ্কারের জন্য তাদের সারাজীবন ব্যয় করে থাকেন। তাদের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তৈরি হয় মূল্যবান অনেক তথ্য। সর্বদাই সমৃদ্ধ হচ্ছে এ তথ্যভাণ্ডার। অনেক সময় না জানার কারণে একই গবেষণার পুনরাবৃত্তি করে অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। গবেষকদের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের গবেষণার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক তৈরির টুল প্রয়োজন হয়। ফলে নতুন কোন বিষয়ে গবেষণা দ্রুত হয়। বায়োইনফরমেটিক্স এক্ষেত্রে তথ্য ইন্টারলিঙ্কিং করতে সহায়তা করে দ্রুত ফলাফল প্রদান করে। সময়ের সাথে সাথে কিভাবে জৈবতথ্যের পরিমাণ বাড়ছে। এক হিসেবে দেখা যায় প্রতি পনের মাসে ডেটাবেজে জৈবতথ্য দ্বিগুণ হচ্ছে। তাই এই বিপুল পরিমাণের তথ্য বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি। জীববিজ্ঞানে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ হলো বায়োইনফরমেটিকস। **জীববিজ্ঞানের সমস্যাগুলো যখন কম্পিউটার প্রযুক্তি কৌশল (কম্পিউটেশনাল টেকনিক) ব্যবহার করে সমাধান করা হয়, তখন সেটাকে বলা হয় বায়োইনফরমেটিক্স।**

Ask.com অনুসারে বায়োইনফরমেটিক্স-এর সংজ্ঞা — **"বায়োইনফরমেটিক্স হলো বিজ্ঞানের সেই শাখা, যা বায়োলজিক্যাল ডেটা এনালাইসিস করার জন্য কম্পিউটার প্রযুক্তি, ইনফরমেশন থিয়োরি এবং গাণিতিক জ্ঞানকে ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে ডেটা অন্তর্ভুক্ত করে ডিএনএ, জীন, এমিনো এসিড এবং নিউক্লিক এসিডসহ অন্যান্য বিষয়কে।"**

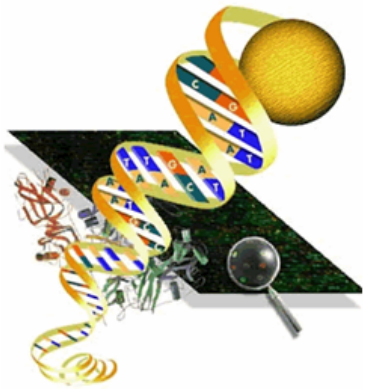

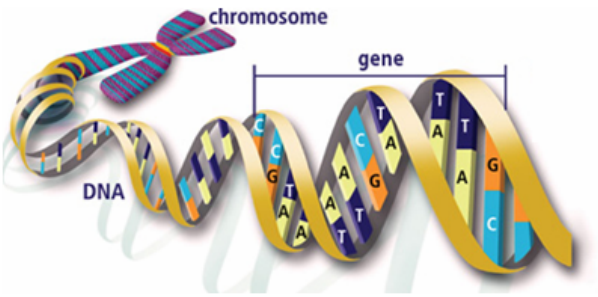

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যখন ডিএনএ-র গঠন জানা গেল, বোঝা গেল ডিএনএ-র গুরুত্ব, ক্রমাগত বাড়তে থাকলো জৈবতথ্য নিয়ে গবেষণা। বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি যেমন ডিএনএ সিকোয়েন্সিং উদ্ভাবনের ফলে দ্রুত বাড়তে থাকলো এই জৈবতথ্যের সমাহার। তাই জীববিজ্ঞানে বাড়তে থাকলো গণকবিদ্যা বা কম্পিউটেশনাল টেকনিক, তথ্যবিদ্যা বা ইনফরমেটিক্সের প্রয়োজন। জন্ম নিলো বায়োইনফরমেটিক্স। কম খরচে, পরিবেশের কম ক্ষতি করে বেশি উৎপাদনের পদ্ধতি খুঁজে বের করার জন্য বিজ্ঞানীরা দ্বারস্থ হচ্ছেন বায়োটেকনোলজির। এখন পৃথিবীতে জয়জয়কার বায়োটেকনোলজির (জৈব প্রযুক্তির)। উৎপাদন খাতে বায়োটেকনোলজি দুনিয়াকে নেতৃত্ব দেবে।

বায়োইনফরমেটিক্স-এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জৈবিক পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা। আর এ ধারণা লাভ করার জন্য অনেক হিসাব-নিকাশ করা হয়। যে পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করে হিসাব-নিকাশ করা হয়, তার মধ্যে রয়েছে প্যাটার্ন রিকগনিশন, ডেটা মাইনিং, যান্ত্রিক শিক্ষা ইত্যাদি।

বায়োটেকনোলজির প্রাসাদে ঢুকতে দুইটি দরজা লাগে। একটি হলো মলিকুলার বায়োলজি বা অনুপ্রাণবিজ্ঞান এবং আরেকটি হলো বায়োইনফরমেটিক্স। অণুপ্রাণবিজ্ঞান কাজ করে মূলত ডিএনএ, আরএনএ, প্রোটিন ইত্যাদি নিয়ে। বায়োইনফরমেটিক্স-এর প্রধান গবেষণাধীন এরিয়া হলো :

- Sequence analysis
- Genome annotation
- Computational evolutionary biology
- Literature analysis
- Analysis of gene expression
- Analysis of regulation
- Analysis of protein expression
- Analysis of mutations in cancer
- Comparative genomics
- High-throughput image analysis

বায়োইনফরমেটিক্স সময় অনেক কমিয়ে অর্থ সাশ্রয় করে। যেমন– কোন একটি ভাইরাসের বিরুদ্ধে পেপটাইড ভ্যাক্সিন তৈরি করা হবে। এই ভাইরাসের জন্য হয়তো একশটি পেপটাইড সম্ভব। পেপটাইড হলো এমিনো এসিডে সরলরৈখিক সিকোয়েন্স। কিন্তু এদের মধ্যে হয়তো দুইটি থেকে পাঁচটি পেপটাইড ভ্যাক্সিন হিসেবে কাজ করবে, বাকিগুলো করবে না। এখন এই একশটি এক্সপেরিমেন্ট ওয়েটল্যাবে (গবেষণাগারে বিভিন্ন রাসায়নিক রিএজেন্ট ব্যবহার করে পরীক্ষা) করতে গেলে বিশাল খরচ, পরিশ্রম এবং সময় লাগবে। এক্ষেত্রে বায়োইনফরমেটিক্স সহায়তা করে। যখন জৈবতথ্য নিয়ে কম্পিউটারের মধ্যে গবেষণা করা হয়, তখন তাকে বলে ড্রাইল্যাব। এখানে রিএজেন্ট (এক প্রকার রাসায়নিক বস্তু)

প্রয়োজন হয় না। ড্রাইল্যাবে বিজ্ঞানীরা তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় নানা ধরনের বিশ্লেষণ করে, ত্রিমাত্রিক মডেলিং, সিমুলেশন বিশ্লেষণ করে যারা কাজ করতে পারে সম্ভাব্য এমন দশটা পেপটাইড বের করে আনতে পারেন। অত:পর ওয়েটল্যাবে একশতটি পেপটাইড নিয়ে কাজ না করে এই দশটি মাত্র পেপটাইড নিয়ে কাজ করে কাঙ্ক্ষিত সফলতা পেতে পারেন। এভাবে বায়োইনফরমেটিক্স দশভাগ কাজ, সময়, পরিশ্রম ও অর্থ কমিয়ে দেয়।

ধান, পাট, গমসহ নানাবিধ ফসলের উন্নত জাত উদ্ভাবন মিউটেশন ব্রিডিং বা সংকরায়ন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। সংকরায়ন পদ্ধতিতে কাঙ্ক্ষিত এক বা একাধিক গুণাবলি নির্ভর কয়েকটি জিনকে কোন একটি জাতের মধ্যে আনা হয়। আর জন্সি এ কাজটি সহজ করে দেয় বায়োইনফরমেটিক্স। তাই খাদ্য চাহিদা মেটাতে কৃষিতে বায়োটেকনোলজির গুরুত্ব অপরিসীম।

বায়োইনফরমেটিক্স-এ ব্যবহৃত সফটওয়্যার টুলস

১. বায়োইনফরমেটিক্স-এ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটা মাইনিং, সফট কম্পিউটিং, ইমেজ প্রসেসিং, সিমুলেশন অ্যালগরিদম ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

২. সফটওয়্যার টুলস হিসেবে এতে Java, C#, XML, Python, Perl C, C++, R, SQL, CUDA, MATHLAB, Spreadsheet analysis ইত্যাদি এপ্লিকেশন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৩. ওপেনসোর্স বায়োইনফরমেটিক্স সফটওয়্যার হিসেবে Bioconductor, Bioperl, Biojava, Bioruby, Bioelipse, EMBOSS, Taverne workbench, UGENE ইত্যাদি এবং ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়।

বায়োইনফরমেটিক্স-এর ব্যবহার (Application of Bioinformatics)

১. মলিকিউলার মেডিসিন (Molecular medicine)
২. পার্সোনালাইজড মেডিসিন (Personalised medicine)
৩. প্রিভেনটেটিভ মেডিসিন (Preventative medicine)
৪. জিন থেরাপি (Gene therapy)
৫. ঔষধ উন্নয়ন (Drug development)
৬. মাইক্রোবায়াল জিনোম এপ্লিকেশন (Microbial genome applications) সিমুলেশন অ্যালগরিদম
৭. ওয়াস্ট ক্লিনআপ (Waste cleanup)
৮. আবহাওয়া পরিবর্তন শিক্ষা (Climate Change Studies)
৯. বিকল্প শক্তি উৎস (Alternative energy sources)
১০. বায়োটেকনোলজি (Biotechnology)
১১. এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স (Antibiotic resistance)
১২. মাইক্রোবেস-এর ফরেনসিক বিশ্লেষণ (Forensic analysis of microbes)
১৩. বায়ো-অস্ত্র উৎপাদন (Bio-weapon creation)
১৪. বিবর্তন শিক্ষা (Evolutionary studies)
১৫. শস্য উন্নয়ন (Crops improvement)
১৬. কীট প্রতিরোধ (Insect resistance)
১৭. পুষ্টির মান উন্নয়ন (Improve nutritional quality)
১৮. খরা প্রতিরোধ উন্নয়ন (Development of Drought resistance varieties)
১৯. ভেটেরিনারি বিজ্ঞান (Veterinary Science)

৩.৯ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic Engineering)

কোন জীব থেকে একটি নির্দিষ্ট জিন (Gene) বহনকারী DNA (Deoxyribonucleic acid) পৃথক করে ভিন্ন একটি জীবে স্থানান্তরের কৌশলকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-কে জেনেটিক মডিফিকেশন (genetic modification/manipulation-GM) ও বলা হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং মূলত ট্রান্সজেনিক (উন্নত বৈশিষ্ট্যধারী) উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টিতে কাজ করে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সমস্ত প্রাণির বিকাশের মূলে নিহিত রয়েছে এর ডিএনএ-এর জেনেটিক কোড। ডিএনএ হলো জীবদেহের নীলনকশা (ব্লুপ্রিন্ট)। ডিএনএ-তে সংরক্ষিত তথ্যের উপর জীবদেহের জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে। জীবদেহের ডিএনএ-এর বিভাজিত একক বৈশিষ্ট্যকে জিন বলা হয়। ১৯৭০ সালে আণবিক কাঁচি নামে সমাদৃত রেস্ট্রিকশন এনজাইম (যা দিয়ে ডিএনএ অণু কাঁটা যায়) আবিষ্কারের পর মূলত জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর যাত্রা শুরু হয়।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ যে কৌশল অবলম্বন করে এক জীবের কোষ থেকে অন্য জীবে স্থানান্তর করা হয় তাদেরকে একত্রে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি বলে। এ প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে DNA সূত্রের কাঙ্ক্ষিত খণ্ড বা অংশ ক্ষুদ্র এককোষী আবাদি জীব তথা ব্যাকটেরিয়া থেকে মানবদেহে, উদ্ভিদকোষ থেকে প্রাণীদেহে এবং প্রাণীকোষ থেকে উদ্ভিদদেহে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে। আর এ কাজ সফল করতে কোন এক জীবের DNA (জেনেটিক পদার্থ)-কে এমনভাবে পরিবর্তিত করা হয়, যাতে তার নিজস্ব জিনের কাজ করার ক্ষমতা লোপ পায় কিংবা ভিন্ন কোন জীবের জেনেটিক পদার্থের সাথে মিশে নতুন জিন বা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। উন্নত বিশ্বের অনেক দেশেই অসংখ্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও ঔষধ কোম্পানি রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি সফলভাবে প্রয়োগ করে বাণিজ্যিক সুবিধাদি গ্রহণ করছে। উদাহরণস্বরূপ মানবদেহের ইনসুলিন তৈরির জিনকে ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবিষ্ট করে বাণিজ্যিকভাবে ইনসুলিন তৈরি করা হচ্ছে। তাছাড়া রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ফসল উদ্ভিদের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করা হচ্ছে। এসব জাতকে ট্রান্সজেনিক (Transgenic) উদ্ভিদ বলে। ১৯৭২ সালে Paul Borg বানরের ভাইরাস SV40 ও lambda virus-এর ডিএনএ-এর সংযোগ ঘটিয়ে বিশ্বের প্রথম রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ অণু তৈরি করেন। ১৯৭৩ সালে E.coli ব্যাকটেরিয়ার প্লাসমিডের মধ্যে এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্ট জিন প্রবেশ করানোর মাধ্যমে Herbert Boyer এবং Stanley Cohen সর্বপ্রথম ট্রান্সজেনিক জীব তৈরি করেন।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির ধাপসমূহ (Stages of Recombinant DNA technology)

১. **DNA নির্বাচন :** উদ্ভিদের কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য বহনকারী DNA কে নির্বাচন করা হয়।

২. **DNA-এর বাহক নির্বাচন :** নির্বাচিত DNA-কে বহন করার জন্য বাহক হিসেবে E.coli কে নির্বাচন করা হয়। এই বাহকের প্লাজমিডকে DNA-র সাথে যুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। ব্যাকটেরিয়ার দেহে সাধারণ DNA অণু ছাড়াও অতিরিক্ত স্বনিয়ন্ত্রিত বৃত্তাকার যে DNA থাকে তাকে প্লাজমিড বলে।

৩. **DNA খণ্ড কর্তন :** নির্দিষ্ট রেস্ট্রিকশন এনজাইম ব্যবহার করে নির্বাচিত DNA হতে সুবিধামত DNA অংশটি কেটে নিতে হয়।

৪. **কর্তনকৃত DNA খণ্ড প্রতিস্থাপন :** কর্তনকৃত DNA খণ্ডে লাইগেজ এনজাইম প্রয়োগ করে প্লাজমিড DNA -র যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করা হয়। পরিবর্তনকৃত প্লাজমিড DNA-কে রিকম্বিনেন্ট বলে।

৫. **পোষকদেহে রিকম্বিনেন্ট DNA স্থানান্তর :** রিকম্বিনেন্ট DNA অণুকে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে পোষক ব্যাকটেরিয়া দেহে প্রবেশ করানো হয়। এ DNA গ্রহণকারী ব্যাকটেরিয়াকে ট্রান্সফর্মড ব্যাকটেরিয়া বলে।

৬. **রিকম্বিনেন্ট DNA-র সংখ্যা বৃদ্ধি ও মূল্যায়ন :** রিকম্বিনেন্ট DNA ব্যাকটেরিয়াকে কালচার মিডিয়ামে রেখে সংখ্যা বৃদ্ধি করানো হয়। এ সময় কাঙ্ক্ষিত জিনবাহী প্লাজমিডও পোষক কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এভাবে পোষকদেহে অধিক রিকম্বিনেন্ট DNA সৃষ্টি হয়।

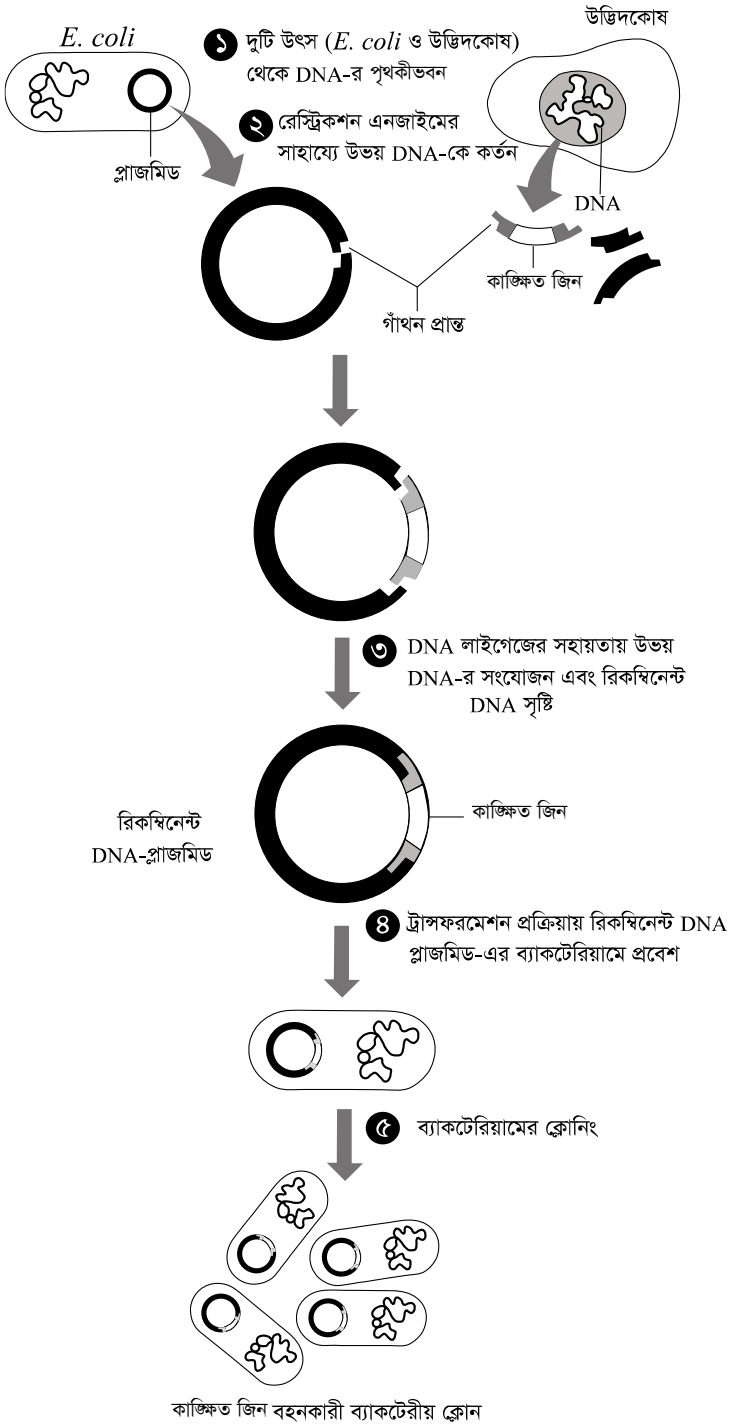

চিত্র : রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির ধাপসমূহ

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ব্যবহারের উদাহরণ

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পরিবেশ টমেটো উৎপাদনের জন্য প্রতিকূল। এই পরিবেশে টমেটোর ফলন কম হয়। অন্যদিকে মাছ অনেক ঠাণ্ডা পরিবেশে স্বাচ্ছন্দ্যে টিকে থাকতে পারে। বিজ্ঞানীরা কোন জিনের কারণে মাছ অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রতিরোধ করতে পারে, তা শনাক্ত করে জেনেটিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে টমেটোতে এই এন্টি-ফ্রিজ (ঠাণ্ডা প্রতিরোধক) জিনকে সন্নিবেশিত করে নতুন জাতের টমেটো আবিষ্কার করছে। এভাবে প্রচণ্ড শীতের প্রতিকূল পরিবেশেও টমেটোর ফলন বাড়ানো যায়। আমাদের দেশের কৃষকরা পাট চাষ করে। বর্তমানে কৃষিতে উন্নত জাতের ফলনের জন্য জেনেটিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের হাইব্রিড ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং একটি জটিল প্রযুক্তি। এ প্রযুক্তিতে অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে হয় এবং তথ্য সংরক্ষণ করতে হয়। এ প্রযুক্তির বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার হয়।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ব্যবহার (Use of Genetic Engineering)

বর্তমান বিশ্বে বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য উৎপাদন, শিল্প উৎপাদন, পরিবেশ রক্ষাসহ মানবজীবনের নানান চাহিদা মেটাতে কাজ করছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি। মেডিক্যাল সায়েন্স এবং ফার্মাসিউটিক্যালস্ ও কসমেটিক ইন্ডাস্ট্রির জীবন রক্ষাকারী ওষুধ উৎপাদন, এনজাইম ও হরমোন উৎপাদনে এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তির ফলনের জন্য জেনেটিক প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিচে সংক্ষেপে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ব্যবহার আলোচনা করা হলো-

ইনসুলিন তৈরি : মানবদেহের ইনসুলিন তৈরির জিনকে ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবিষ্ট করে বাণিজ্যিকভাবে ইনসুলিন উৎপাদন হলো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সবচেয়ে বড় সুফল। ইনসুলিন ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসায় প্রয়োজন হয়।

উন্নতমানের ফসল উৎপাদন : ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন-সয়াবিন, ভুট্টা, তুলা, তেল বীজ, টমেটো, পেঁপে ইত্যাদির জিন বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে এগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধি, পোকা–মাকড় ও অন্যান্য উদ্ভিদনাশক ছত্রাক ও ভাইরাস প্রতিরোধি করা যাচ্ছে। জেনেটিক্যালি পরিবর্তিত ফসল অধিক খরা ও ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে।

রোগের চিকিৎসা : জিন থেরাপি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটি সুফল। জিন থেরাপির মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা এবং ত্রুটিপূর্ণ মানুষের জিন পরিবর্তন করে সুস্থ করে তোলা যায়।

ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য উৎপাদন : নির্দিষ্ট জিনের ক্লোনিং দ্বারা নতুন অনেক sophisticated ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য উৎপাদন করা হয়।

হরমোন তৈরি : শিল্পজাত ব্যাকটেরিয়া থেকে উৎপাদিত হিউম্যান গ্রোথ হরমোন বামনত্ব (বেঁটে) রোধ করে এবং পোড়া ত্বক, ফেটে যাওয়া হাঁড় এবং খাদ্যনালীর আলসারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

ভাইরাসনাশক : জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে তৈরি Interferon (মানব কোষ থেকে নিঃসৃত এক ধরনের রস) ভাইরাসনাশক (Anti viral) হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

টিকা ও জ্বালানি তৈরি : জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ফলে জৈব কারখানায় প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও এনজাইম উৎপাদন করা যায়। এগুলো প্রচুর সংখ্যায় Tryptophan-এর মতো টিকা ও সম্পূরক তৈরি করা সম্ভব। এছাড়া জ্বালানি তৈরিতেও এগুলো ব্যবহৃত হয়।

মৎস্য উন্নয়ন : স্যামন মাছের জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে মাগুর, কার্প, তেলাপিয়া মাছের আকৃতি অনেক বড় করা সম্ভব হয়েছে।

পরিবেশ সুরক্ষা : বিজ্ঞানীরা জিন প্রকৌশলের উপর গবেষণা করে নতুন ব্যাকটেরিয়া তৈরি করেছেন, যা পরিবেশ সুরক্ষায় অবদান রাখছে।

জেনেটিক ত্রুটিসমূহ নির্ণয় : গর্ভবতী মহিলাদের Fetuses দেখে সন্তানের জেনেটিক ত্রুটিসমূহ নির্ণয় করা যায়। পিতা–মাতা ও ডাক্তার মিলে শিশুর জন্মের পূর্বেই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

একক কাজ : জেনেটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এর সুবিধাদি লিখে শিক্ষককে দেখাও।

৩.১০ ন্যানো টেকনোলজি (Nanotechnology)

Nano শব্দটি গ্রীক Nanos থেকে এসেছে যার আভিধানিক অর্থ Dwarf (বামন বা জাদুকরী ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষুদ্রাকৃতির প্রাণি) কিন্তু এটি মাপের একক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এক মিটারের ১০০ কোটি ভাগের এক ভাগ হলো এক ন্যানোমিটার (১ ন্যানোমিটার= $১০^{-৯}$ মিটার)। আর এ ন্যানোমিটার স্কেলের সাথে যে সমস্ত টেকনোলজি সম্পর্কিত সেগুলোকেই ন্যানো টেকনোলজি বলা হয়। ন্যানো টেকনোলজি হলো এমন বিজ্ঞান, প্রকৌশল এবং প্রযুক্তি, যা পরিচালিত হয় ন্যানো স্কেলে, যেটি ১ থেকে ১০০ ন্যানো মিটার হয়ে থাকে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে অণু-পরমাণুকে ভাঙিয়ে বা জোড়া লাগিয়ে আগামী দিনে অনেক কিছু করা সম্ভব।

অনলাইন ডিকশনারি Merriam-Webster অনুসারে ন্যানো টেকনোলজি হলো-

"the science of manipulating materials on an atomic or molecular scale especially to build microscopic devices (as robots) "

অর্থাৎ **ন্যানো প্রযুক্তি হলো পারমাণবিক বা আণবিক স্কেলে অতিক্ষুদ্র ডিভাইস (যেমন- রোবট) তৈরি করার জন্য ধাতব ও বস্তুকে সুনিপুণভাবে কাজে লাগানোর বিজ্ঞান।**

আমেরিকান পদার্থবিদ রিচার্ড ফেম্যান (Richard Feynman) ১৯৫৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর তার "There's Plenty of Room at the Bottom" আলোচনায় ন্যানো টেকনোলজি সম্পর্কে সর্বপ্রথম ধারণা দেন।

যদি একটি মার্বেল এক ন্যানোমিটার হয় তাহলে পৃথিবীর সাইজ হবে এক মিটার। ন্যানোসায়েন্স এবং ন্যানো টেকনোলজি হলো একক অণু-পরমাণু দেখা এবং নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য। ন্যানো প্রযুক্তির ফলে কোন উপকরণকে এতটাই ক্ষুদ্র করে তৈরি করা যায় যে, এর থেকে আর ক্ষুদ্র করা সম্ভব নয়। এই পৃথিবীর সব কিছু যা আমরা খাই, যা আমরা পরি, ঘরবাড়ি যাতে আমরা বাস করি, আমাদের দেহের সব কিছু পরমাণু দিয়ে গঠিত। কিন্তু পরমাণু এতো ছোট যে খালি চোখে তা দেখা যায় না। ১৯৮০ সনে IBM-এর গবেষকরা প্রথম আবিষ্কার করেন STM (Scanning Tunneling Microscope) এই যন্ত্রটি দিয়ে অণুর গঠন পর্যন্ত দেখা সম্ভব। এই যন্ত্রটির আবিষ্কারই ন্যানো প্রযুক্তিকে বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে। এতে ছোটখাট একটা পিঁপড়াকে মনে হবে একটা ডাউনোসর।

ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহার চিকিৎসাক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করবে। যেমন- ক্যান্সার চিকিৎসায় রেডিয়েশন দিলে আক্রান্ত কোষ ছাড়াও আশেপাশের আরও অনেক ভাল কোষও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে বিকলাঙ্গতা দেখা দিতে পারে। ন্যানো প্রযুক্তি কাজে লাগানো গেলে শুধুমাত্র আক্রান্ত কোষগুলোতেই রেডিয়েশন দেয়া যাবে। ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহার চিকিৎসাবিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক্স, শক্তি উৎপাদনসহ বহু ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে। একুশ শতাব্দীতে এসে আইটি নিয়ে যতটা কথা শোনা যাচ্ছে, ততোটাই শোনা যাচ্ছে এই ন্যানো প্রযুক্তি নিয়ে। জাপানের জাতীয় গবেষণা বাজেটের সিংহভাগই ব্যবহৃত হচ্ছে ন্যানো প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে। ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, কোরিয়া ইত্যাদি

রিচার্ড ফিলিপ্স ফাইনম্যান (১১ই মে, ১৯১৮ - ১৫ই ফেব্রু, ১৯৮৮) একজন নোবেল বিজয়ী মার্কিন পদার্থবিজ্ঞানী, যিনি তার কোয়ান্টাম বলবিদ্যার পাথ ইন্টিগ্রাল ফর্মুলেশন, কোয়ান্টাম তড়িৎ-গতিবিজ্ঞান তত্ত্ব এবং অতিশীতলকৃত তরল হিলিয়ামের চরম প্রবহমানতা ক্রিয়াকৌশল ব্যাখ্যা করেছেন ও কণা পদার্থবিজ্ঞানে তার কাজের জন্য (তিনি প্যাট্রন মডেল প্রস্তাব করেন) খ্যাত। কোয়ান্টাম তড়িৎ-গতিবিজ্ঞানে তার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬৫ সালে ফাইনম্যান মার্কিন বিজ্ঞানী জুলিয়ান শুইঙ্গার এবং জাপানি বিজ্ঞানী সিন-ইতিরো তোমোনাগার সাথে যৌথভাবে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। ফাইনম্যান উপপারমাণবিক কণাসমূহের আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী গাণিতিক প্রকাশের বহুল ব্যবহৃত একটি চিত্ররূপ প্রদান করেন, যা ফাইনম্যান রেখাচিত্র নামে পরিচিত। জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরেও ফাইনম্যান পৃথিবীর অন্যতম জনপ্রিয় ও বিখ্যাত বিজ্ঞানী হিসেবে বিবেচিত। ফাইনম্যান ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। ১৯৪২ সালে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের পর অন্যান্য অনেক তরুণ পদার্থবিদের সাথে নিউ মেক্সিকোর লস আলামোসে পারমাণবিক বোমা তৈরিতে সাহায্য করেন। যুদ্ধশেষে প্রথমে তিনি কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরবর্তীকালে ক্যালটেকে শিক্ষকতা করেন। তাকে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং ন্যানো প্রযুক্তির (আণবিক স্তরে যন্ত্রপাতি তৈরি) ধারণার জনক বলা হয়। ফাইনম্যান তার বিভিন্ন বই ও লেকচারের মাধ্যমে পদার্থবিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার কাজ করেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১৯৫৯ সালে ন্যানো প্রযুক্তির ওপর প্রদত্ত ভাষণ দেয়ার্স প্লেনটি অফ রুম অ্যাট দা বটম এবং দ্য ফাইনম্যান লেকচার্স অন ফিজিক্স। ফাইনম্যান তার আধা-আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ সিওরলি ইউ আর জোকিং, মি. ফাইনম্যান! এবং হোয়াট ডু ইউ কেয়ার হোয়াট আদার পিপল থিংক? ইত্যাদির জন্যেও খ্যাত। তিনি ছিলেন মুক্তচিন্তার অধিকারী একজন সুরসিক ব্যক্তি। পদার্থবিজ্ঞান ছাড়াও তার জীববিজ্ঞান, চিত্রকলা, মায়ান ক্রিপ্ট এবং সেফক্রাকিং-এ আগ্রহ ছিল।

দেশগুলো ন্যানোপ্রযুক্তির উপর ব্যাপক গবেষণা করছে। কেন ন্যানোপ্রযুক্তি নিয়ে সবার এত আগ্রহ? তার একটা সহজ উত্তর হলো, সামনের দিন হবে ন্যানো প্রযুক্তির যুগ। হৃদরোগ হয়েছে? ন্যানো রোবট শরীরের ভিতরে ঢুকে হার্টের সব সমস্যা মেরামত করে দেবে। হাতের ঘড়িটি হয়ে যাবে কমপিউটার। ন্যানো টেকনোলজির কল্যাণে বিভিন্ন জিনিস হবে অনেক ছোট এবং হালকা।

ন্যানো টেকনোলজির মাধ্যমে অণু-পরমাণুকে ভেঙে কিংবা জোড়া লাগিয়ে আগামী দিনে অনেক কিছুই করা সম্ভব হবে। ন্যানো টেকনোলজির ক্ষেত্রে দুটি প্রক্রিয়া আছে। একটি হলো উপর থেকে নিচে (Top to Bottom) ও অপরটি হলো নিচ থেকে উপরে (Bottom to top)। টপ টু ডাউন পদ্ধতিতে কোন জিনিসকে কেটে ছোট করে তাকে নির্দিষ্ট আকার দেয়া হয়। এই ক্ষেত্র সাধারণত Etching প্রক্রিয়াটি সম্পর্কিত। আর বটম টু টপ হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারের ছোট জিনিস দিয়ে বড় কোন জিনিস তৈরি করা। আমাদের বর্তমান ইলেক্ট্রনিক্স হল, টপ টু ডাউন প্রযুক্তি। আর ন্যানো টেকনোলজি হলো, বটম টু টপ প্রযুক্তি। ন্যানো প্রযুক্তির সাহায্যে ন্যানোমিটার স্কেলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর উপাদান দিয়ে কাঙ্ক্ষিত কোন বস্তু তৈরি করা যায়।

বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রনিক্স, খাদ্য, প্যাকেজিং, ক্লথিং, ফুয়েল ক্যাটালিস্ট, গৃহ-সামগ্রি, ঔষধ ইত্যাদিতে ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০১১-এর মার্চে এক সমীক্ষায় প্রায় ১৩০০ আইটেমে ন্যানো টেকনোলজির ব্যবহার দেখা গেছে। কমপিউটারের প্রসেসরের ভেতরে রয়েছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ন্যানোমিটার স্কেলের সার্কিট। আর তাতে ব্যবহৃত হচ্ছে ন্যানো টেকনোলজি। ইন্টেল প্রসেসরে সিলিকন-এর উপর প্যাটার্ন করে সে সার্কিট বানানো হয় তার বর্তমান সাইজ হলো ৩০ ন্যানোমিটার। ভবিষ্যতে আরো ছোট সাইজে নিয়ে আসলে প্রসেসর-এর আকার অনেক ছোট হয়ে আসবে। সেই দিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন আমাদের মোবাইল ফোনটি কাজ করবে কম্পিউটারের মত। (বর্তমানেই এই ধরনের কিছু মোবাইল ফোন বাজারে এসেছে)। এছাড়া রয়েছে কমপিউটারের হার্ডডিস্ক। এই হার্ডডিস্কের তথ্য সংরক্ষণের ক্ষমতা দিন দিন বাড়ছে। এই হার্ডডিস্কেও ব্যবহৃত হচ্ছে ন্যানো টেকনোলজি। এখন বাজারে টেরাবাইটের হার্ডডিস্ক পাওয়া যাচ্ছে। ন্যানো টেকনোলজির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গবেষণা, পরীক্ষা ও প্রয়োগের সকল ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

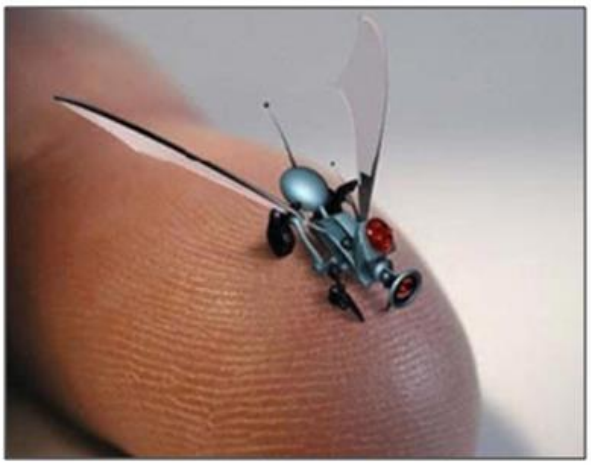

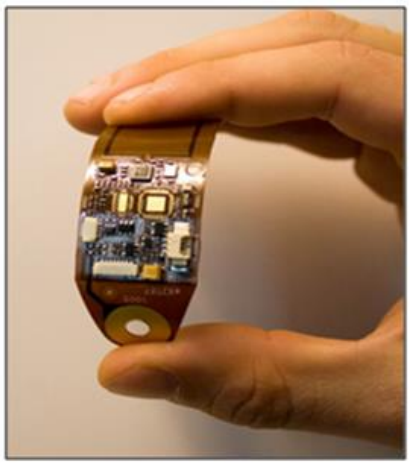

চিত্র ঃ ন্যানো টেকনোলজি ডিভাইস

ন্যানো প্রযুক্তির প্রয়োগক্ষেত্র (Application fields of Nano Technology)

বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট তৈরিতে ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। নিম্নে কতিপয় প্রয়োগক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো :

কম্পিউটার হার্ডওয়্যার তৈরি : কম্পিউটারের মেমোরি, গতি, দক্ষতা ইত্যাদি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন হার্ডওয়্যার এবং ভিডিও গেমস কনসোল তৈরিতে ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহৃত হয়।

ন্যানো রোবট : ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতি ক্ষুদ্র রোবট তৈরির গবেষণা চলছে। এ ধরনের রোবট মানবদেহের অভ্যন্তরে অস্ত্রোপচার করতে সক্ষম হবে।

ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি : বিদ্যুৎ খরচ, ওজন এবং আকৃতি কমিয়ে কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি তৈরিতে ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহৃত হয়।

জ্বালানি : কম খরচে নিম্নমানের কাঁচামালের মাধ্যমে জ্বালানি তৈরি এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যাটারি ও হাইড্রোজেন আয়নের জন্য ফুয়েল সেল তৈরিতে ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহৃত হয়।

প্যাকেজিং ও প্রলেপ তৈরি : খাদ্যজাত দ্রব্য প্যাকেজিং-এর সিলভার তৈরির কাজে এবং বিভিন্ন জিনিসের প্রলেপ তৈরির কাজে এ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

ঔষধ তৈরি : ঔষধ তৈরির আণবিক গঠনে, যাতে রোগাক্রান্ত সেলে সরাসরি ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

ক্যান্সার নির্ণয় ও নিরাময় : ন্যানোসেন্সর ব্যবহার করে মানবদেহের রক্তের ভেতরে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপাদান বায়োমার্কার সম্পূর্ণভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। ন্যানো সুচ ব্যবহার করে সূক্ষ্মভাবে শুধুমাত্র ক্যান্সার আক্রান্ত কোষে ঔষধ প্রয়োগ করে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করা যায়।

খেলাধুলার সামগ্রী : টেনিস বলের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য, বাতাসে গলফ বলের পজিশন ঠিক রাখার জন্য, র‍্যাকেটের শক্তি ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও খেলোয়াড়দের জুতা, মোজা, ট্রাউজার প্রভৃতির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি ও আরামপ্রদ করার জন্য ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহৃত হয়।

বাতাস পরিশোধন : শিল্পকারখানা হতে নির্গত ক্ষতিকারক ধোঁয়াকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে অক্ষতিকারক গ্যাসে রূপান্তরের মাধ্যমে বাতাস পরিশোধন করতে পারে।

মহাকাশ অভিযান : মহাকাশ অভিযানে ব্যবহৃত বিভিন্ন নভোযানকে হালকা করে তৈরি করে জ্বালানির পরিমাণ কমাতে ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহৃত হয়।

বস্ত্র শিল্প : বস্ত্র শিল্পে কাপড়ের ওজন ও ঘনত্ব উন্নতিকল্পে ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহৃত হয়।

কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি : ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহার করে অনুভূতিসম্পন্ন কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি করা সম্ভব।

টিটানিয়াম ডাই-অক্সাইড তৈরি : সানস্ক্রিন-এ ব্যবহৃত টিটানিয়াম ডাই-অক্সাইড তৈরির কাজে ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহৃত হয়।

ন্যানো প্রযুক্তির অসুবিধা/ক্ষতিকারক দিক (Disadvantages/Negative aspects of Nano Technology)

১. ন্যানোটেকনোলজি গবেষণা এবং প্রয়োগ অনেক ব্যয়সাপেক্ষ।
২. প্রচলিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং ফার্মে এ প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে অনেকে কর্মহীন হয়ে যাবে।
৩. অনেক ন্যানো প্রডাক্টস মানুষের মস্তিস্ক এবং ফুসফুসের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।
৪. ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার করে মারাত্মক যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করা সম্ভব বিধায় যুদ্ধক্ষেত্রে আরো ভয়াবহতার আশংকা করা হচ্ছে।
৫. ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পানি এবং বায়ু দূষণ হতে পারে যা মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণিদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।
৬. ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাইক্রোস্কোপিক রেকর্ডিং ডিভাইস তৈরি করা যাবে যা সাধারণ চোখে দেখা যাবে না। এতে করে মানুষের প্রাইভেসি এবং সিকিউরিটি বিঘ্নিত হবে।
৭. এ প্রযুক্তির ভুল ব্যবহার বিরাট ক্ষতি করতে পারে।

৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা

(Ethics while using Information and Communication Technology)

নৈতিক মূল্যবোধ হলো সুনির্দিষ্ট কিছু নৈতিক ধারণা, যা মানুষ নিজের ভেতর ধারণ করে এবং এগুলো কারো সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবিত হয়। বর্তমান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগে নৈতিকতার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিরাট ক্ষেত্রটিতে প্রায় সর্বত্রই কম্পিউটার প্রযুক্তির সংশ্লিষ্টতা লক্ষ

করা যায়। আর তাই কম্পিউটার এথিকস বা কম্পিউটার নীতিশাস্ত্র নামে ব্যবহারিক দর্শনশাস্ত্রের একটি শাখার সৃষ্টি হয়েছে – যেটি পেশা ও সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কম্পিউটিং প্রফেশনালদের কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে সে বিষয়টি আলোচনা করে। বোলিং গ্রিন স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. ওয়াল্টার ম্যানার সর্বপ্রথম কম্পিউটার এথিকস টার্মটির সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট অ্যাপ্লিকেশনসমূহে কম্পিউটার এথিকস একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বেশ কিছু সংখ্যক প্রশ্ন রয়েছে যেগুলো কম্পিউটার এথিকস-এর অধীনে বিস্তারিত আলোচিত হয়ে থাকে। ইন্টারনেটের উত্থানের ফলে বর্তমান সময়ে উদীয়মান কিছু সমস্যা কিংবা যেগুলো নতুন রূপ পেয়েছে যেমন– "হ্যাকিং"-এর বিষয়ে নৈতিকতার প্রশ্ন জড়িত। এখন অন্যের সম্পর্কে তথ্য পাওয়ায় বহু উপায় রয়েছে, যেগুলো ব্যাপক মাত্রায় কম্পিউটার প্রচলনের আগে সহজলভ্য ছিল না। 'ইনফরমেশন স্টোরেজ অ্যান্ড রিট্রাইভাল' ইস্যুটি এক্ষেত্রে সামনে চলে আসে। বিশাল ডেটাবেজে থাকা ব্যক্তিগত ডেটা কীভাবে সুরক্ষিত রাখা যায় সে বিষয়টিও রয়েছে। সফটওয়্যারের কপিরাইট লঙ্ঘনের বিষয়টি সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে, বিশেষ করে ফাইল শেয়ারিং প্রোগ্রামগুলো সম্পর্কে যেমন– ন্যাপস্টার। টরেন্ট সাইটগুলোর মাধ্যমে অবাধে সফটওয়্যার ও কপিরাইটের বিষয়বস্তু বিনামূল্যে বিতরণের মাধ্যমে কপিরাইট আইন লঙ্ঘিত হচ্ছে। নৈতিকতার প্রশ্নটি এখানে এসে যাচ্ছে যে, সফটওয়্যার, মিউজিক বা মুভি কপি করাটা কি উচিত না অনুচিত? ইন্টারনেটের ব্যবহার ভায়োলেন্সের একটি হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। শিশু পর্ণগ্রাফি, অন্যকে সমস্যার মধ্যে ফেলা ইত্যাদি বিষয় বিভিন্ন ধরনের নৈতিক প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। তাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে পেশাদার লোকদের জন্য এসব প্রশ্নের উত্তর এবং এক্ষেত্রে করণীয় বিষয়গুলো জানা আবশ্যিক হয়ে পড়েছে।

১৯৯২ সালে 'কম্পিউটার এথিকস ইন্সটিটিউট' কম্পিউটার এথিকস-এর বিষয়ে দশটি নির্দেশনা তৈরি করে। নির্দেশনাগুলো র‍্যামন সি. বারকুইন তার "In Pursuit of a 'Ten Commandments' for Computer Ethics" গবেষণাপত্রে উপস্থাপন করেছিলেন। এই দশটি নির্দেশনা হলো ঃ

১. অন্যের ক্ষতি করার জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করো না।
২. অন্যের কাজের ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য কম্পিউটার প্রযুক্তিকে ব্যবহার করো না।
৩. অন্যের কম্পিউটারের ডেটার উপর নজরদারি করো না।
৪. তথ্য চুরির উদ্দেশ্যে কম্পিউটার ব্যবহার করো না।
৫. কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে মিথ্যা তথ্য রটানোর কাজে সম্পৃক্ত না হওয়া বা সহযোগিতা না করা।
৬. যেসব সফটওয়্যার-এর জন্য তুমি অর্থ প্রদান করো নি, সেগুলো ব্যবহার বা কপি করো না।
৭. অনুমতি ব্যতিরেকে অন্যের কম্পিউটার রিসোর্স ব্যবহার করো না।
৮. অন্যের বুদ্ধিদীপ্ত বা গবেষণালব্ধ ফলাফলকে নিজের মালিকানা বলে দাবি করো না।
৯. প্রোগ্রাম লেখার পূর্বে সমাজের উপর তা কী ধরনের প্রভাব ফেলবে সেটি চিন্তা করো।
১০. যোগাযোগের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহারের সময় সহকর্মী বা অন্য ব্যবহারকারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সৌজন্যতা প্রদর্শন করা।

ইনফরমেশন এথিকস (Information Ethics)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নৈতিকতার মাত্রাগুলোকে বুঝার আরেকটি উপায় হলো মৌলিক নৈতিকতার ইস্যুগুলোকে বিবেচনা করা– যা তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ এবং বিতরণের জন্য এর ব্যবহারকালে চলে আসে। তথ্য প্রযুক্তির নৈতিক ও সামাজিক মাত্রাগুলোর প্রধান কয়েকটি রূপ রয়েছে, যা নিচের চিত্রে দেখানো হলো। মনে রাখা প্রয়োজন, এখানে প্রদর্শিত প্রতিটি অঞ্চলের জন্য সমাজে তথ্য প্রযুক্তির একটি ইতিবাচক এবং একটি নেতিবাচক প্রভাব থাকতে পারে।

প্রাইভেসি ইস্যুসমূহ

তথ্যের অননুমোদিত ব্যবহার মারাত্মকভাবে ব্যক্তির প্রাইভেসিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রাইভেসি ইস্যুর মধ্যে রয়েছে ঃ

- **কম্পিউটার মনিটরিং** ঃ তথ্য প্রযুক্তির একটি বিস্ফোরনুখ নৈতিকতার বিষয় যা সকলকে শঙ্কিত করে তা হলো কাজের মানকে কম্পিউটার মনিটরিং করা। এটি কেবল ব্যক্তির কাজকেই মনিটর করে না বরং পাশাপাশি সেই ব্যক্তিটিকেও মনিটর করে। আর এই প্রক্রিয়াটি ক্রমাগত চলতে থাকে যা ক্রমেই কর্মীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও প্রাইভেসিকে লঙ্ঘন করে।
- **প্রাইভেসির লঙ্ঘন** ঃ ব্যক্তির ব্যক্তিগত ই-মেইল, কথোপকথন ও কম্পিউটার রেকর্ডগুলো অ্যাকসেস করা এবং ইন্টারনেট ওয়েবসাইট ও নিউজগ্রুপগুলোতে ভিজিট করার সময় ব্যক্তি সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ ও ভাগাভাগি করা।
- **কম্পিউটার ম্যাচিং** ঃ মার্কেট অ্যাডিশনাল বিজনেস সার্ভিসগুলোতে ভোক্তার তথ্যকে ব্যবহার করা।
- **অননুমোদিত ব্যক্তিগত ফাইলসমূহ** ঃ টেলিফোন নম্বর এবং অন্যান্য আরও তথ্যাদি সংগ্রহ করে পৃথক পৃথক কাস্টোমার প্রোফাইল তৈরি করা।
- **কলার আইডেন্টিফিকেশন** ঃ কল করতে বা কলারের তথ্য যোগাড় করতে অটোমেটেড যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা।

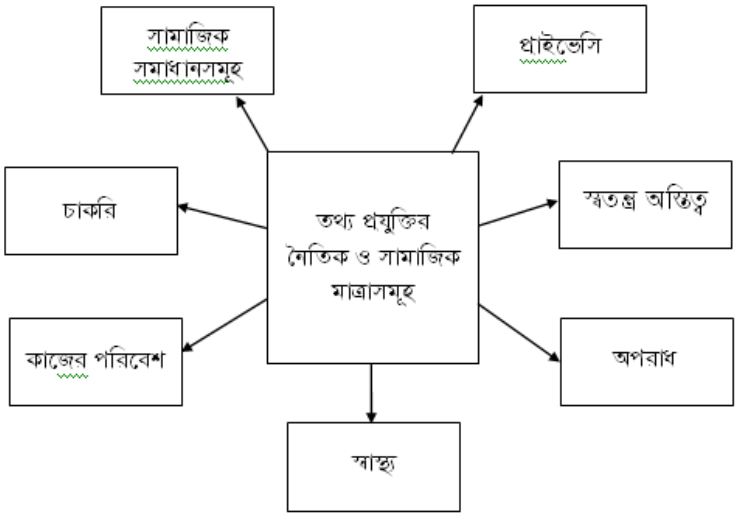

কমপিউটার ক্রাইম (Computer Crime)

কমপিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির নানামুখী ব্যবহারের কার্যক্রমকে ব্যাহত করতে বিভিন্ন ধরনের কমপিউটার অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে। নিচে কিছু কমপিউটার ক্রাইমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

হ্যাকিং (Hacking)

প্রোগ্রাম রচনা ও প্রয়োগের মাধ্যমে কোন কমপিউটার সিস্টেম বা নেটওয়ার্কের ক্ষতিসাধন করাকে হ্যাকিং বলা হয়। ইন্টারনেটের ব্যাপক প্রচলনের ফলে যেমনি তথ্যের আদান-প্রদান বেড়ে গেছে বহুগুণ, ঠিক তেমনি তথ্য গায়েব, তথ্য চুরি এবং পথিমধ্যে তথ্য বিকৃতি ঘটানোর নজিরও লক্ষ করা যায়। আর এ কাজটি যারা করছে মূলত তাদেরকে হ্যাকার বলে অভিহিত করা হয়। হ্যাকারদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে হ্যাকিং বলে অভিহিত করা হয়।

স্পুফিং ও স্নিফিং (Spoofing and Sniffing)

ভুয়া ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আর্থিক তথ্যাদি হাতিয়ে নেয়ার একটি সাধারণ পদ্ধতি হিসেবে ক্রমেই 'স্পুফিং' জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। স্পুফড সাইট হলো প্রকৃত সাইটের প্রায় কাছাকাছি একটি মিরর ইমেজ। যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো ব্যবহারকারী স্পুফকে খুব কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি এর উপস্থিতি বুঝতে পারেন না। অসতর্ক মুহূর্তে ব্যবহারকারীরা গুরুত্বপূর্ণ নানা ব্যক্তিগত ও আর্থিক তথ্য এতে দিয়ে দেন। অন্যদিকে ট্রান্সমিশন লাইন দিয়ে তথ্য যাবার সময় তথ্যকে তুলে নেয়ার একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি হলো 'স্নিফিং'। সাধারণত শক্ত তার বা তারবিহীন ব্যবস্থাতে স্নিফিং করা হয়ে থাকে। স্নিফিং সনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব। তাই এর বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য ডেটা এনক্রিপশন হলো একমাত্র পথ।

ডেনিয়াল অব সার্ভিস অ্যাটাক্স (Denial of Service Attacks)

ডেনিয়াল অব সার্ভিস অ্যাটাক্স হলো এমন একটি উদ্যোগ, যার মাধ্যমে একটি কমপিউটার বা নেটওয়ার্ক রিসোর্সকে এর বৈধ ব্যবহারকারীদের কাছে দুষ্প্রাপ্য করে রাখা হয়। এর মাধ্যমে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে কোনো ইন্টারনেট সাইট বা সেবা হতে আংশিক বা পুরোপুরি অথবা সাময়িকভাবে বঞ্চিত রাখা হয়। ফলে ই-মেইল, ওয়েবসাইট, অনলাইন অ্যাকাউন্ট (ব্যাংকিং) বা অন্যান্য সেবাসমূহে অ্যাকসেস করা যায় না।

স্প্যামিং (Spamming)

অনাকাঙ্ক্ষিত বাল্ক মেসেজসমূহ ব্যাপকভাবে প্রেরণে ইলেকট্রনিক মেসেজিং সিস্টেমসমূহের ব্যবহার হলো স্প্যাম তথা স্প্যামিং। এর মাধ্যমে একাধিক মেইলিং লিস্ট, পৃথক পৃথক ব্যক্তি বা নিউজগ্রুপগুলোতে অনাকাঙ্ক্ষিত মেসেজসমূহ প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এসব মেসেজ প্রায় সময়ই বাণিজ্যিক ধাঁচের হয়। এগুলোকে জাঙ্ক মেইল নামেও অভিহিত করা হয়। বিজ্ঞাপনের মোড়কে স্প্যামগুলো অনেক সময়ই আইডেন্টি থেফট বা অন্য কোনো ধরনের ইন্টারনেট জালিয়াতির উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

সাইবার-আক্রমণ (Cyber-attack) বা সাইবার ওয়ারফেয়ার

সাইবার-আক্রমণ হলো কোনো কমপিউটারের নিয়ন্ত্রণ অর্জনের প্রচেষ্টা এবং কোনো ব্যক্তি বা গ্রুপের অনুমতি ছাড়াই তাদের সমগ্র গতিবিধিকে ট্র্যাক করা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেমন সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো নানা ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনা করে, ঠিক তেমনি আজকাল বিভিন্ন দেশ ও গোষ্ঠীও ইন্টারনেটের মাধ্যমে সাইবার সন্ত্রাস চালিয়ে থাকে।

সাইবারথেফট (Cybertheft)

অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য কিংবা অন্যান্য অবৈধ ব্যবহারের জন্য কমপিউটার ব্যবহার করে ব্যবসায়িক এবং/অথবা ব্যক্তিগত তথ্যাদি চুরি করাই হলো সাইবারথেফট। সাইবারথেফট প্রধানত দুই ধরনের হয়। এগুলো হলো-ডেটা থেফট (Data Theft) এবং আইডেন্টিটি থেফট (Identity Theft).

ক্ষতিকারক সফটওয়্যার ঃ ভাইরাস, ওয়র্ম, ট্রোজান হর্স এবং স্পাইওয়্যার

কমপিউটার ভাইরাস একটি ক্ষতিকারক প্রোগ্রাম। কমপিউটার ভাইরাস বাইরের উৎস থেকে কমপিউটারের মেমোরিতে প্রবেশ করে মেমোরিতে গোপনে বিস্তার লাভ করে মূল্যবান প্রোগ্রাম, তথ্য নষ্ট করা ছাড়াও অনেক সময় কমপিউটারকে অচল করে দেয়।

সফটওয়্যার পাইরেসি (Software Piracy)

সফটওয়্যার পাইরেসি বলতে প্রস্তুতকারীর বিনা অনুমতিতে কোন সফটওয়্যার কপি করা, বিতরণ করা, আংশিক পরিবর্তন করে নিজের নামে চালিয়ে দেয়া ইত্যাদি কার্যক্রমকে বুঝায়। অন্যের জিনিস চুরি করার মতো সফটওয়্যার পাইরেসি করাও একটি অপরাধ। সফটওয়্যার পাইরেসির কারণে সফটওয়্যার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হার্ডওয়্যার চুরি (Hardware Theft)

মাইক্রোকম্পিউটার-এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশ মূল্যবান, কিন্তু সহজে বহনযোগ্য বিধায় চুরির মত ঘটনা বেশি ঘটে থাকে। মূল্যবান একটি ল্যাপটপকে একটি ব্রিফকেসের মধ্যে নিয়ে সহজেই স্থানান্তর করা যায়। হার্ডওয়্যার চুরির ফলে ব্যবহারকারীর তৈরি প্রোগ্রাম এবং হার্ডডিস্কে সংরক্ষিত মূল্যবান ডেটাও হাতের বাইরে চলে যায়। ফলে ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে।

ডেটা চুরি (Data theft)

সরকারি গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিংবা ব্যবসা ক্ষেত্রে ডেটা চুরি হবার ঘটনা খুবই স্পর্শকাতর একটি বিষয়। ডেটা চুরি হলে একটি প্রতিষ্ঠানের অনেক গোপন তথ্য প্রকাশিত হয়ে পড়তে পারে বা এমন কারো হাতে যেতে পারে যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হতে পারে। এ কারণে যাতে করে ডেটা চুরি না হয় সেই দিকটি দেখা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

প্লেজিয়ারিজম (Plagiarism)

যে কোন উৎসের লেখা সংযোজন করা হোক না কেন তাতে মূল লেখক বা মূল কর্মের স্রষ্টার নাম অবশ্যই সংযোজন করা উচিত। এটিই বিধান। এর ব্যতিক্রম হলে তা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। এ ধরনের অপরাধই হলো প্লেজিয়ারিজম (Plagiarism)। তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও প্লেজিয়ারিজমের প্রচলন লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে অন্যের ধ্যানধারণা, গবেষণা, কৌশল, প্রোগ্রামিং কোড, গ্রাফিক্স, কথা, লেখা, ডেটা, ছবি, শব্দ, গান ইত্যাদির উৎস অনেক ক্ষেত্রেই উল্লেখ না করে নিজের নামে চালিয়ে দেয়া হয়।

৫. সমাজজীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব

(Influence of Information and Communication Technology in Social life)

বর্তমান বিশ্ব তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর এক আধুনিক বিশ্বে পরিণত হয়েছে। উন্নত দেশের সমাজব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তি আজ অভাবনীয় পরিবর্তন এনেছে। সে অনুপাতে উন্নয়নশীল দেশের সমাজব্যবস্থায় এর প্রভাব পড়লেও ব্যাপকতা লাভ করে নি। তবে এটাও ঠিক যে, সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা যে তালে দ্রুত এগিয়ে চলছে তার সাথে তত দ্রুত কোন সমাজব্যবস্থাই তাল মেলাতে পারছে না। এতে দু'টি বিষয়ের মধ্যে ব্যবধান তৈরি হচ্ছে। অবশ্য ব্যবধান যতই প্রসার লাভ করুক না কেন তথ্য প্রযুক্তির প্রভাব যে সমাজের রূপরেখা পাল্টে দিতে শুরু করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আজকের দিনে তথ্য প্রযুক্তির সাথে জড়িত বিষয়গুলো (যোগাযোগ, টেলিযোগাযোগ, কম্পিউটার, অডিও-ভিডিও প্রভৃতি) ছাড়া জীবন অচল। যেকোন কাজের জন্য চাই উপাত্ত। টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট মাধ্যম আজ তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করেছে। বিশ্বের যেকোন প্রান্ত থেকে এর ফলে তথ্য আদান-প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। বেতার, টেলিভিশনে ছবিসহ শব্দ সম্প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে, যা সমাজের উপর প্রভাব ফেলছে। এ সমস্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হওয়ায় তথ্য নিয়ে কাজ করাটা সহজ হয়ে পড়েছে। আজ সমাজের মানুষ স্বাধীন ও উন্মুক্ত।

স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ আজ তথ্যকে মানুষের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। ফাইবার অপটিক ক্যাবল তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ ও গ্রহণের গতিকে করেছে আরও গতিশীল ও বহুমুখী। তথ্য প্রযুক্তির অন্যতম এবং শীর্ষস্থানীয় হাতিয়ার কম্পিউটার রাখছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। মানুষ আজ শত চেষ্টা করলেও অন্যের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারছে না। কম্পিউটারনির্ভর ইন্টারনেট প্রযুক্তি আজ জালের মতো দেশ হতে দেশান্তরের মানুষকে এক বাঁধনে আটকে ফেলেছে। আজ যেকোন কিছুই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কম্পিউটার দ্বারা। ফলে সমাজেও স্বাভাবিকভাবে কম্পিউটার তথা তথ্য প্রযুক্তি প্রভাব ফেলছে।

অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসাক্ষেত্র, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প, বিনোদন, খেলাধুলা, যোগাযোগব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সর্বত্রই ব্যবহৃত হচ্ছে কম্পিউটার বা কম্পিউটারনির্ভর পদ্ধতি। এতে কাজ কর্মে এসেছে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা। পুরনো ধ্যান-ধারণা ফেলে দিয়ে মানুষ এখন নতুন প্রযুক্তিকে গ্রহণ করছে। সব ধরনের প্রযুক্তির সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার হচ্ছে নিশ্চিত। উৎপাদনমুখী, সেবামূলক এবং অর্থনৈতিক উন্নতি এতে ত্বরান্বিত হচ্ছে। পারিবারিক জীবনেও প্রভাব ফেলছে তথ্য প্রযুক্তি। রেডিও, টেলিভিশন, ভিডিও ইত্যাদির স্থান দখল করেছে মাল্টিমিডিয়া। আজকাল ব্যক্তিগত কাজকর্ম, পারিবারিক যাবতীয় কাজ-কর্মে ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হচ্ছে কম্পিউটার।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজেই তার বসবাস। তবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বদৌলতে মানুষ এখন ক্ষুদ্র গণ্ডিতে নয়, বরং বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত বৃহত্তর সমাজের অধিবাসী হয়ে উঠেছে। আর তাই বিশ্বটাকে বলা হচ্ছে 'গ্লোবাল ভিলেজ' বা 'বিশ্বগ্রাম'।

বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটের কল্যাণে এখন মানুষ পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকছে। ফেসবুক, টুইটার, গুগল প্লাস, মাইস্পেস, লিঙ্কডইন, ডিগ-এর মতো আরও অনেক সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইট; ইউটিউব-এর মতো ভিডিও শেয়ারিং সাইট; ফ্লিকার এর মতো আরও কিছু ফটো শেয়ারিং সাইট; নানা বিষয়ধর্মী বিভিন্ন ধরনের ব্লগ প্রভৃতি হয়ে উঠেছে সমাজজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মানুষ তার সামাজিক রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা, ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা সবই শেয়ার করছে এসব সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটে। কোনো একটি ঘটনা বা অনুভূতি সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটগুলোর মাধ্যমে মুহূর্তেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন সমাজ ও জনগোষ্ঠীর কাছে তাৎক্ষণিকভাবে লেখা, ছবি ও ভিডিওসহ পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে। অনলাইন সমাজের অন্যান্য অধিবাসীরাও ঐসব অনুভূতি ও ঘটনার পাশাপাশি নিজেদের অবস্থান, মতামত ও ভাবনাগুলোকে সমন্বিত করে এগুলোকে তুলে ধরতে পারছেন। সমাজের সকলের মধ্যে যে পারস্পরিক বন্ধন তা জোরালো করা, সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলা, জনমত গঠন, সামাজিক প্রচারণা, বিভিন্ন ইভেন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটগুলো তাদের অনবদ্য অবদান রেখে চলেছে। স্কাইপ, বিভিন্ন ধরনের মেসেঞ্জারের মাধ্যমে লোকজন এখন বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নিকটজন বা পরিচিতদের সাথে টেক্সট, অডিও-ভিডিও চ্যাটিং, ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদি কাজগুলো করতে পারছেন। বিভিন্ন ধরনের সাইটের মাধ্যমে এক দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশের কাছে সহজেই তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে। এতে সামাজিক সংমিশ্রণ ঘটছে। সমাজ হয়ে উঠছে চিন্তা, চেতনা ও মননে আরও বেশি সমৃদ্ধ।

৫.১. সমাজে তথ্য প্রযুক্তির সুফল/অবদান
(Contribution/good effect of Information Technology in society)

তথ্য প্রযুক্তি মানুষের সামাজিক ক্ষেত্রে যেসব সুফল বয়ে এনেছে সেগুলো হলো-

অপচয় কমায় : তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার যেকোন ধরনের অপচয় রোধ করে। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন ধরনের ব্যয়কে সংকুচিত করে আর্থিক সাশ্রয় ঘটিয়ে থাকে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঘরে বসেই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, ফোন বিলের মতো বিভিন্ন ইউটিলিটি বিলগুলো এখন মোবাইল ফোনেও দেওয়া যায়।

সময় বাঁচায় : তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে যেকোনে কাজে আগের চাইতে কম সময় লাগে অর্থাৎ এর মাধ্যমে সময় সাশ্রয়ী ব্যবস্থা তৈরি করা যায়।

দক্ষতা বৃদ্ধি : তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার ও চর্চার ফলে ক্রমান্বয়ে সর্বক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ব্যবস্থাপকরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং দক্ষতার সাথে পরিচালনার মাধ্যমে ব্যবসায়-বাণিজ্যে লাভজনক প্রক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেন।

তথ্যের প্রাচুর্য : তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের কারণে যেকোন তথ্যের প্রাপ্যতা এখন সহজ হয়ে গেছে। বিশেষ করে ইন্টারনেটের মতো প্রযুক্তির কল্যাণে এখন বিশ্বটাকেই পাওয়া যাচ্ছে হাতের মুঠোয়। নেটে সার্চ দিয়ে প্রয়োজনীয় যে কোন তথ্য মুহূর্তেই দেখা যায়।

দ্রুত যোগাযোগ : তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষতার কারণে এখন তাৎক্ষণিক যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছে। ফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, ই-মেইল, এসএমএস, এমএমএস প্রভৃতি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ভিডিও কনফারেন্সিং : কম্পিউটারনির্ভর তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে দূর-দূরান্তে অবস্থিত ব্যক্তিবর্গ সময় এবং অর্থ খরচ কমিয়ে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে মতামত আদান-প্রদান করতে পারে।

ব্যবসায়-বাণিজ্যে : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ছোঁয়ায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের পালে নতুন হাওয়া লেগেছে। প্রথাগত ব্যবসার বাইরে ই-কমার্স এর প্রচলন ঘটেছে। বিশ্বের এক প্রান্তের কোনো ক্রেতা তার ঘরে বসেই কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো পণ্যের অর্ডার দিতে ও তার অর্থ অনলাইনে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারছেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই উক্ত পণ্য ক্রেতার ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে। বিশাল পরিমাণ বাণিজ্যিক কার্যক্রম এখন অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে।

মনুষ্যশক্তির অপচয় কমায় : শিল্প প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার মনুষ্যশক্তির অপচয় কমায়। কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত রোবট ব্যবহার করে নানা রকম বিপজ্জনক ও পরিশ্রমসাধ্য কাজ যেমন– ওয়েল্ডিং, ঢালাই, ভারী মাল ওঠানো বা নামানো, যন্ত্রাংশ সংযোজন ইত্যাদি করা হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে : শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। অনলাইনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা, পরীক্ষা দেয়া কিংবা শিক্ষামূলক বিভিন্ন ওয়েবসাইট হতে শিক্ষা লাভ করা যায়। কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট সংযোগ সুবিধা থাকলে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের শিক্ষার্থী তার শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

ই-গভর্নেন্স : তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর ই-গভর্নেন্স চালুর মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের মধ্যে কাজের সুসমন্বয় ঘটানো যায়। ই-গভর্নেন্স-এর বাস্তবায়ন সরকারি কর্মকাণ্ডকে দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছ করে দ্রুততার সাথে সিদ্ধান্ত প্রদান, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমায় এবং সরকারের সঙ্গে জনগণের স্বয়ংক্রিয় সেতুবন্ধন গড়ে তোলে।

যোগাযোগ ব্যবস্থায় : সড়কপথ, রেলপথ, জলপথ এবং আকাশপথের যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে করেছে সহজতর, দ্রুত, নিরাপদ এবং আরামদায়ক।

চিকিৎসায় : বর্তমানে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে চিকিৎসক এক দেশে বসে একই সময়ে অন্য দেশের রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে পারেন। চিকিৎসাক্ষেত্রে জটিল সব অপারেশনে সার্জনদের নানা ধরনের কাজে রোবট সহায়তা করে।

কর্মসংস্থান : কর্মসংস্থানের বিশাল বাজার উন্মুক্ত করেছে ইন্টারনেট প্রযুক্তি। ইন্টারনেটের কল্যাণে এখন বিশ্বের যেকোনো দেশের যেকোনো কর্মী অন্য যেকোনো দেশের কর্মদাতার কাজ ঘরে বসেই করতে পারেন এবং তার কাজের পেমেন্ট অনলাইনেই গ্রহণ করতে পারেন।

বিনোদনক্ষেত্রে : ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন ফেইসবুক, মাইস্পেস, ইউটিউব, অরকুট ইত্যাদি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ও ভিডিও আপলোডিং সাইটে বন্ধুত্ব তৈরি করার পাশাপাশি ছবি ও ভিডিও শেয়ার করা যায়। আজকাল ইন্টারনেটে টিভি ও রেডিও চালু হওয়ায় স্ট্রিমিং অডিও-ভিডিও প্রযুক্তির মাধ্যমে দূর দূরান্তে বসেও টিভি ছাড়াই কম্পিউটারে টিভি দেখা যায়।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় : বিভিন্ন যুদ্ধে শত্রুদেশের লক্ষ্যবস্তুতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাতে আজ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। আধুনিক সেনাবাহিনীর সব শক্তির মূলেই রয়েছে তথ্য প্রযুক্তি। সমরাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, সব ধরনের ব্যবস্থাপনা, চালকবিহীন ক্রুজ, টোমা হক, স্কার্ড প্রভৃতি ক্ষেপণাস্ত্র নির্ভুলভাবে শত্রুর এলাকায় নিক্ষেপ করতে ব্যবহৃত হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি।

৫.২ সমাজে তথ্য প্রযুক্তির কুফল

(Bad effect of Information Technology in society)

তথ্য প্রযুক্তি মানুষের সামাজিক ক্ষেত্রে যেমন সুফল বয়ে এনেছে, তেমনি সাথে করে নিয়ে এসেছে বেশ কিছু কুফল।

অপরাধপ্রবণতা ঃ স্যাটেলাইটের মধ্যমে এখন বহির্বিশ্বের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল ঘরে বসেই দেখা যাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে হানাহানি, মারামারির মতো সাংস্কৃতিক উপাদানও রয়েছে যা অন্য দেশের সমাজকেও প্রভাবিত করছে। ভায়োলেন্সপূর্ণ কম্পিউটার গেমস দেখে শিশুরা ক্রমেই সহিংস হয়ে উঠতে পারে বলে সমাজবিজ্ঞানীদের অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এছাড়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতির মতো ঘটনাও হরহামেশাই ঘটছে।

অশ্লীলতা ঃ ইন্টারনেটে এমন কিছু অশ্লীল সাইট রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে মানুষের নৈতিক স্খলন ঘটতে পারে। এসব সাইটে অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক অনুপযোগী বিভিন্ন ছবি ও ভিডিও থাকে, যা নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটাতে পারে। এতে সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টির ঝুঁকি রয়েছে।

তথ্যের গোপনীয়তা প্রকাশ ঃ তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে এখন প্রযুক্তিগত সুবিধা এতটাই বেড়েছে যে এর অপব্যবহার করে ব্যক্তির গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে পড়ছে। হ্যাকারের আক্রমণে কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি চুরি হয়ে যাওয়া, মুছে যাওয়া, পাসওয়ার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের নম্বর চুরি হওয়ার মাধ্যমে তথ্যের গোপনীয়তা আর থাকছে না।

বেকারত্ব সৃষ্টি ঃ তথ্য প্রযুক্তির উপর অধিক নির্ভরশীলতার কারণে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই এখন অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর। আর তাই এসব ক্ষেত্রে কম মানবসম্পদের প্রয়োজন পড়ায় কর্মী ছাঁটাইয়ের কারণে অনেক সময়েই বেকারত্বের হার বেড়ে যাচ্ছে।

শারীরিক সমস্যা : টেলিভিশন, ইন্টারনেট বা কম্পিউটার ব্যবহারকারী সারাক্ষণ মনিটরের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। একনাগাড়ে কম্পিউটারে কাজ করার মাধ্যমে কোমর, হাত, কব্জিতে ব্যথা, ভিডিও গেমের মাধ্যমে শিশুদের মানসিক আসক্তি, অধিকক্ষণ মোবাইল ফোন ব্যবহারের মাধ্যমে হৃদপিণ্ড, কান ও মস্তিষ্কে নানা ধরনের অসুখ হতে পারে।

বুদ্ধিমত্তার ক্ষতিগ্রস্ততা : তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে মৌলিক গবেষণা থেকে মানুষ দূরে থাকবে। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে প্রায় সব ধরনের সমস্যার সমাধান সহজে পাওয়ার কারণে চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে নতুন কিছু আবিষ্কার হতে দূরে থাকবে। ফলে আমাদের সমাজ ও জাতি মেধাবী প্রজন্ম হতে বঞ্চিত হবে।

মিথ্যা প্রচারণা : তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজেই মিথ্যা প্রচারণা করা যায়। ফেসবুক, ওয়েবসাইট, ব্লগ সাইটে কারো ব্যক্তিগত তথ্য .ছবি, সংবাদ এডিট করে মিথ্যা ছবি বা তথ্য প্রকাশ করে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন বা মানহানি করা যায়। এসব কাজের মাধ্যমে ভয়াবহ দাঙ্গা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও দেশের সার্বভৌমত্বের হুমকি, রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়।

ডিজিটাল ডিভাইড : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা ভোগকারী এবং এসব সুযোগ হতে বঞ্চিত কিংবা কম সুবিধা ভোগকারী লোকদের মধ্যকার ব্যবধানই হলো ডিজিটাল ডিভাইড। উন্নত দেশগুলো সর্বাধুনিক সব ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। অপরদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলো অনেক ক্ষেত্রে সেসব সুবিধা পায় না কিংবা তাদের ব্যবহৃত প্রযুক্তিগুলো পুরনো। এর ফলে বিশ্বায়নের যুগে পৃথিবীর দুই প্রান্তে বসবাসকারী লোকজনের মধ্যে এক বিশাল ব্যবধান তৈরি হচ্ছে।

৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন (ICT and Economic Development)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিকাশের ফলে সারাবিশ্ব এই প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এসেছে নতুন নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনা। বর্তমানে কৃষি থেকে শুরু করে ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, অফিস-আদালত দেশের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি তার স্পর্শ রাখে নি। এর ছোঁয়ায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দিন দিন বেড়েই চলেছে। নিচে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১. **বিনিয়োগ :** ব্যবসায় বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অর্থনৈতিক লেনদেন সহজে ও দ্রুত সম্পন্ন করা যাচ্ছে। মানুষের বিনিয়োগ ক্ষমতা ও সুযোগ বেড়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে কমসময়ে বিনিয়োগ করা এবং অপরদিকে বিনিয়োগ সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে।

২. **কর্মসংস্থান :** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিকাশের ফলে নতুন ধরনের পেশা ও সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষত আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে অনেক শিক্ষিত তরুণের কর্মসংস্থান হচ্ছে। ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

৩. **আউটসোর্সিং :** কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা এখন দেশের শিক্ষিত সমাজের জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এখন এসব মার্কেটপ্লেসে নিজের পছন্দসই কাজগুলো খুঁজে নিচ্ছে। ফ্রিল্যান্সিং পেশায় এসে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে দেশের লাখ লাখ শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতী এখন বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে শুরু করেছে।

৪. **ব্যবসায় উদ্যোগ :** অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নতুন উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ। একটি উদ্যোগ বদলে দিতে পারে একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি। তথ্য প্রযুক্তির সফল ব্যবহার উদ্যোক্তা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। মোটকথা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নতুন উদ্যোগের অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

৫. **উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি :** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে কম জনশক্তি দিয়ে অধিক কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে কর্মীপ্রতি ব্যয় কমেছে, তদুপরি কর্মীদের কাছ থেকে অনেক বেশি কাজ পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। বিনিয়োগ কম লাগছে এবং কর্মী ব্যবস্থাপনা সহজ হয়েছে। এতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রভূত ভূমিকা রাখছে।

৬. **ক্ষুদ্র ব্যবসায় :** অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ভূমিকা ব্যাপক। বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবা নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নতুন নতুন ব্যবসার দ্বার উন্মোচন হচ্ছে। ব্যবসায়ের ধরন অনলাইন কিংবা অফলাইন যে কোনোটাই হতে পারে।

৭. **যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন :** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে যোগাযোগ ক্ষেত্রে। পূর্বে যোগাযোগের জন্য হয়তো মাসের পর মাস লেগে যেত, সেটা এখন নিমেষেই করা সম্ভব হচ্ছে। বড় বড় ফাইল এখন মুহূর্তের মধ্যেই ট্রান্সফার করা সম্ভব হচ্ছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ গ্রাম ও শহরের ব্যবধান কমিয়ে এনেছে। সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়ে এসেছে গতিশীলতা, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

৮. **শিক্ষা বিস্তার :** শিক্ষা হলো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি তথ্যকে মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে গেছে। ডিজিটাল ক্লাশরুমে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করছে। অনলাইনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা, পরীক্ষা দেয়া কিংবা শিক্ষামূলক বিভিন্ন ওয়েবসাইট হতে শিক্ষা লাভ করা যায়।

৯. **ই-গভর্নেন্স :** তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে সরকারি সেবাসমূহ কম্পিউটারাইজড ও অনলাইনভিত্তিক হচ্ছে। এতে সরকারের নাগরিক সুবিধা জনগণ সহজেই নিতে পারছে এবং সরকারের জবাবদিহিতা বাড়ছে। দেশের উন্নয়নের জন্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর ই-গভর্নেন্স চালুর মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের মধ্যে কাজের সুসমন্বয় ঘটানো যায়।

১০. **ই-কমার্স :** ই-কমার্স হচ্ছে অনলাইন যোগাযোগ ব্যবস্থার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনাময় দিক। পণ্য কেনাবেচা ও আর্থিক লেনদেনের ইলেকট্রনিক্স সংস্করণ-এর ফলে অর্থনৈতিক লেনদেন ও বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় উদ্যোগের পথ সুগম হচ্ছে। ব্যাপক বাণিজ্যিক কার্যক্রম এখন অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে।

১১. **ই-কৃষি :** কৃষি উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। কৃষি বিষয়ে তথ্য, গবেষণা ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে তথ্য প্রযুক্তি বিশেষ ভূমিকা রাখছে। আবহাওয়া, ফসল বপন ও পরিচর্যা, সার ও কীটনাশক প্রয়োগের তথ্য, রোগবালাই দমন ইত্যাদি কৃষিতথ্য অনলাইনের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে কৃষকরা জানতে পারছে। কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকরা সচেতন হচ্ছে, যা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সহায়তা করছে।

১২. **ই-ব্যাংকিং :** একটি দেশের আর্থিক কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি ব্যাংক ব্যবস্থা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে ব্যাংকিং খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও লেনদেন তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর হওয়ায় ব্যাংকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বেড়েছে পরিসেবার আওতা। ব্যাংকগুলো ব্যাংকিং সেবা অনলাইনে ও এটিএম বুথের মাধ্যমে দিনরাত ২৪ ঘণ্টা দিতে পারছে। ফরেন রেমিটেন্স পাঠানোর ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি এনে দিয়েছে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন। অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসবই বড় ধরনের ভূমিকা রাখছে।

১৩. **মোবাইল ব্যাংকিং :** দেশে মোবাইল ফোননির্ভর ব্যাংকিং সেবা চালু হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী যাদের স্বাভাবিক ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের সুযোগ নেই, তাদের জন্য সেই সেবার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। নিরাপদ ও সহজ আর্থিক লেনদেন সুবিধার কারণে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। অর্থ প্রেরণ ও গ্রহণের ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে পরিণত হয়েছে।

১৪. **নারী উন্নয়ন :** তথ্য প্রযুক্তি নারী উন্নয়নে রাখছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে ঘরে ঘরে তথ্য পৌঁছে যাচ্ছে। ফলে ঘরে বসেই নারীরা বিভিন্ন বিষয় জানতে পারছে, যা তাদেরকে অধিকার বিষয়ে সচেতন করে তুলছে। সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে নতুন কর্মসংস্থানের।

১৫. **পরিবেশ সংরক্ষণ :** পরিবেশ সংরক্ষণ ছাড়া কোনো উন্নয়নই টেকসই হয় না। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে পরিবেশের বিষয়টিও বিবেচনা করতে হয়। তথ্য প্রযুক্তি পরিবেশ সংরক্ষণেও অবদান রাখছে। তথ্য প্রযুক্তি পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন উদ্যোগেরও সুযোগ সৃষ্টি করছে তথ্য প্রযুক্তি।

ই-কমার্স (E-Commerce)

ইলেকট্রনিক কমার্সকেই সাধারণ অর্থে ই-কমার্স (e-commerce or eCommerce) বলা হয়। ইন্টারনেট বা অন্য কোনো কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয়ের কাজটিকেই ই-কমার্স বলে। পণ্য বা সেবার উপাদান, মার্কেটিং, ডেলিভারি, সার্ভিসিং, মূল্য পরিশোধের অনলাইন প্রক্রিয়াকে সামগ্রিকভাবে ইলেকট্রনিক কমার্স বলে। ইন্টারনেটের বিস্তৃতির সাথে সাথে ইলেকট্রনিক উপায়ে বাণিজ্যের পরিমাণও দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। আজকাল নানা ধরনের বাণিজ্যের কাজকর্ম এই উপায়েই সেরে ফেলা হচ্ছে। ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ইন্টারনেট মার্কেটিং, অনলাইন ট্রানজেকশন প্রসেসিং, ইলেকট্রনিক ডেটা ইন্টারচেইঞ্জ (ইডিআই), ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং অটোমেটেড ডেটা কালেকশন সিস্টেমসমূহের উদ্ভাবন ও ব্যাপক প্রচলনের ফলে ই-কমার্সের প্রসারও ঘটছে দ্রুত। আধুনিক ইলেকট্রনিক কমার্স মূলত ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবকেই ব্যবহার করছে। অন্ততঃপক্ষে অর্থ লেনদেনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে ই-কমার্সের উপর লোকজন অনেকটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

ই-কমার্সের সুবিধা (Advantages of E-commerce)

১. দ্রুত ক্রয়/বিক্রয় পদ্ধতি, সহজে পণ্য খুঁজে পাওয়া যায়।
২. ব্যবসা পরিচালনায় খরচ কমায়।
৩. ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে সহজেই ক্রেতার কাছে পৌঁছা যায়।
৪. পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন করে।
৫. কম খরচে উন্নত সেবা প্রদান করে।
৬. বাহ্যিক সেটআপ ছাড়াই ব্যবসা করা যায়।
৭. সহজেই ব্যবসা শুরু করা যায় এবং ব্যবস্থাপনা করা যায়।
৮. ক্রেতা দৈহিকভাবে না গিয়ে বিভিন্ন প্রোভাইডারদের প্রোডাক্ট নির্বাচন করতে পারে।

ই-কমার্সের অসুবিধাসমূহ (Disadvantages of E-Commerce)

ই-কমার্সের সুবিধার তুলনায় অসুবিধাসমূহ অত্যন্ত নগণ্য। তারপরও কতগুলো অসুবিধার বিষয় মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। নিচে এসব অসুবিধাসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

১. দক্ষ লোকবলের অভাব
২. উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ ব্যয়বহুল
৩. মাত্রাতিরিক্ত অর্ডার সরবরাহের সমস্যা
৪. দূরবর্তী স্থানের অর্ডার ক্ষেত্রবিশেষে ব্যয়বহুল
৫. আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ সমস্যা
৬. লেনদেনের নিরাপত্তা সমস্যা

ই-কমার্সের প্রকারভেদ

পণ্য লেনদেনের প্রকৃতি ও ধরন অনুসারে ই-কমার্সকে সাধারণত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো ঃ

১. ব্যবসা থেকে ভোক্তা (Business to Consumer – B2C)
২. ব্যবসা থেকে ব্যবসা (Business to Business – B2B)
৩. ভোক্তা থেকে ভোক্তা (Consumer to Consumer – C2C)
৪. ভোক্তা থেকে ব্যবসা (Consumer to Business – C2B)

ব্যবসা থেকে ভোক্তা (Business to Consumer – B2C)

একে অনেক সময় বিজনেস-টু-কাস্টোমার নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে ভোক্তা সরাসরি কোনো ব্যবসায়ী বা উৎপাদনকারীর কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করে থাকে। ভোক্তা পণ্য বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান বা রিটেইলারের ওয়েব সাইট থেকে পণ্য ক্রয় করে লেনদেনের কাজ সম্পন্ন করে।

ব্যবসা থেকে ব্যবসা (Business to Business – B2B)

এ জাতীয় ই-কমার্সের কার্যক্রম সাধারণত একাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পন্ন হয়। যেমন ঃ কোনো উৎপাদক ও হোলসেলার কিংবা হোলসেলার ও রিটেইলার-এর মধ্যকার ব্যবসা। ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েই এক্ষেত্রে যৌথভাবে ব্যবসায় যুক্ত থাকে। প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পাইকারি কেনাবেচার ক্ষেত্রে বি-টু-বি খুবই কার্যকর একটি বাণিজ্য পদ্ধতি।

ভোক্তা থেকে ভোক্তা (Consumer to Consumer – C2C)

এ ধরনের ই-কমার্সে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে কোনো মধ্যস্থতাকারী থাকে না। এক ক্রেতা সরাসরি অন্য ক্রেতার পণ্য কিনে থাকেন। পুরনো কোনো পণ্য বিক্রির জন্য এই ধরনের ই-কমার্স খুবই উপযোগী।

ভোক্তা থেকে ব্যবসা (Consumer to Business – C2B)

এমন ধরনের কিছু ব্যবসা রয়েছে, যা ভোক্তাদের কাছ থেকে ব্যবসায়ীরা গ্রহণ করে থাকেন। ভোক্তারা তাদের পণ্য ও সেবা কোম্পানিগুলোর কাছে পেশ করে এবং উক্ত পণ্য বা সেবা ওই কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত হলে কোম্পানি ভোক্তাকে অর্থ প্রদান করে।

আউটসোর্সিং (Outsourcing)

অনলাইন মার্কেটপ্লেসের হাজার হাজার কাজ থেকে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোনো কাজ খুঁজে নেয়া ও সেটি সম্পাদন করার পর বায়ারের কাছ থেকে তার পেমেন্ট গ্রহণ করার মাধ্যমে যে উন্মুক্ত পেশা বা ফ্রিল্যান্সিং কাজের সৃষ্টি হয়েছে সেটিকে আউটসোর্সিং বলে। বর্তমান শতাব্দীর গ্লোবালাইজেশনের ফলে একটি দেশের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অন্যতম নিয়ামকের ভূমিকা পালন করছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির হাতিয়ার হচ্ছে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট। আইসিটি উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে জন্ম নিয়েছে নতুনতর এক অর্থনীতি, যার নাম জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি বা নলেজ ইকোনোমি। জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি বিকাশের সাথে সাথে আমেরিকা, ইউরোপ কিংবা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে বিপুল পরিমাণ ডেটা প্রসেসিংয়ের। যার ফলে উন্নয়নশীল দেশসমূহ আইসিটি এনাবল্ড সার্ভিসকে কাজে লাগিয়ে অর্জন করছে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। শুধু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন নয়, এর ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে দেশের

বিপুল সংখ্যক প্রশিক্ষিত বেকার দক্ষ জনগোষ্ঠীর। আউটসোর্সিং এখন একটি শিল্পে পরিণত হয়েছে। আউটসোর্সিং শিল্পকে কাজে লাগিয়ে আমাদের দেশের শিক্ষিত বিরাট জনগোষ্ঠী এখন অর্থ উপার্জন করতে পারছে। আউটসোর্সিং এখন অনেকেরই পেশা হিসেবে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ প্রতি বছর আউটসোর্সিং হতে কয়েক মিলিয়ন ডলার আয় করে। শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর অনেকেই এই শিল্পকে কাজে লাগিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। উন্নত বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও অনেকে এই খাতে বিনিয়োগ করছেন। ফলে বহু লোক সম্পৃক্ত হচ্ছে বিভিন্ন কাজে, সৃষ্টি হচ্ছে কর্মসংস্থান।

আউটসোর্সিং-এ বাংলাদেশের সম্ভাবনা

আউটসোর্সিং-এ বাংলাদেশের সম্ভাবনার কারণ হিসেবে যে বিষয়গুলো দেখা যায়, সেগুলো হলো ঃ

১. ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ ১২ ঘণ্টা টাইম জোনে অন্তর্ভুক্ত। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে বা ইউরোপে যখন রাত থাকে তখন বাংলাদেশে দিন থাকে। ফলে ২৪ ঘণ্টাই কাজ করার সুবিধা বাংলাদেশের রয়েছে।

২. আমাদের রয়েছে বিপুল সংখ্যক প্রশিক্ষিত তথ্য প্রযুক্তিবিদ এবং ইংরেজি ভাষা জানা এক ঝাঁক উদ্যমী তরুণ-তরুণী, যারা ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম।

৩. বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশের শ্রমের বাজার মূল্য অত্যন্ত কম।

৪. সাধারণত একটি শিল্প গড়তে যে পরিমাণে বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় আইসিটি এনাবল্ড সার্ভিসের যেকোনো সেক্টরে এই বিনিয়োগের পরিমাণ সেটির চার ভাগের এক ভাগ। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও স্থিতিশীল কর্ম-পরিবেশ গড়ে তোলা গেলে আউটসোর্সিং-এর বিশাল বাজারে আধিপত্য বিস্তার করতে বাংলাদেশের তেমন কোনো সমস্যা হবে না।

সার-সংক্ষেপ

বিশ্বগ্রাম (Global Village) : গ্লোবাল ভিলেজ হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর এমন একটি পরিবেশ, যেখানে দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করেও পৃথিবীর সকল মানুষই একটি একক সমাজে বসবাস করার সুবিধা পায় এবং একে অপরকে সেবা প্রদান করে থাকে।

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (Virtual Reality) : প্রকৃত অর্থে বাস্তব নয়, কিন্তু বাস্তবের চেতনা উদ্রেককারী বিজ্ঞাননির্ভর কল্পনাকে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বা অনুভবে বাস্তবতা কিংবা কল্পবাস্তবতা বলে। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি মূলত কম্পিউটার প্রযুক্তি ও সিমুলেশন তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

রোবটিক্স (Robotics) : রোবটিক্স হলো প্রযুক্তির একটি শাখা, যেটি রোবটসমূহের ডিজাইন, নির্মাণ, কার্যক্রম ও প্রয়োগ নিয়ে কাজ করে।

ক্রায়োসার্জারি (Cryosurgery) : ক্রায়োসার্জারি হলো এমন একটি চিকিৎসা পদ্ধতি, যার মাধ্যমে অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রায় শরীরের অস্বাভাবিক বা রোগাক্রান্ত কোষগুলোকে ধ্বংস করা যায়।

বায়োমেট্রিক্স (Biometrics) : গ্রীক শব্দ "bio" (life) ও "metric" (to measure) থেকে উৎপত্তি হয়েছে বায়োমেট্রিক্স (Biometrics)। বায়োমেট্রিক্স হলো বায়োলজিক্যাল ডেটা মাপা এবং বিশ্লেষণ করার বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি।

বায়োইনফরমেটিক্স (Bioinformatics) : জীববিজ্ঞানের সমস্যাগুলো যখন কম্পিউটার প্রযুক্তি কৌশল (কম্পিউটেশনাল টেকনিক) ব্যবহার করে সমাধান করা হয়, তখন তাকে বলা হয় বায়োইনফরমেটিক্স।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic Engineering) : কোন জীব থেকে একটি নির্দিষ্ট জিন (Gene) বহনকারী DNA খণ্ড পৃথক করে ভিন্ন একটি জীবে স্থানান্তরের কৌশলকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলে।

ন্যানো টেকনোলজি (Nanotechnology) : ন্যানো প্রযুক্তি হলো পারমাণবিক বা আণবিক স্কেলে অতিক্ষুদ্র ডিভাইস (যেমন- রোবট) তৈরি করার জন্য ধাতব ও বস্তুকে সুনিপুণভাবে কাজে লাগানোর বিজ্ঞান।

ই-কমার্স (E-Commerce) : ইলেকট্রনিক কমার্সকেই সাধারণ অর্থে ই-কমার্স (e-commerce or eCommerce) বলা হয়। ইন্টারনেট বা অন্য কোনো কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয়ের কার্যটিকেই ই-কমার্স বলে।

অনুশীলনী-১ (২য় অংশ)

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

বিশ্বগ্রামের ধারণা

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বিশ্বগ্রাম ধারণার প্রবক্তা কে?
ক. মার্শাল ম্যাকলুহান খ. টিম বার্নারসলী
গ. মার্ক জুকার বার্গ ঘ. ই এফ কড

২. ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসে কর্মসংস্থানের সুযোগকে কি বলা হয়?
ক. ই-কমার্স খ. ই-মার্কেটিং
গ. ই-বিজনেস ঘ. আউটসোর্সিং

৩. ফ্রিল্যান্সিং কী?
ক. দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তিতে কাজ করা
খ. নিয়ম মাফিক ১০টা - ৫ টা অফিস করা
গ. স্বাধীনভাবে যে কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করা
ঘ. সুনির্দিষ্ট কাজের লাইসেন্স নিয়ে কাজ করা

৪. গ্লোবাল ভিলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিচের কোন উপাদানটির ভূমিকা সবচেয়ে বেশি?
ক. ইন্টারনেট খ. রেডিও
গ. টেলিভিশন ঘ. টেলিফোন

৫. ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা বিশ্বগ্রামে কোনটি?
ক. E–Commerce System খ. E–Cashback System
গ. E–Business System ঘ. E–Payment System

৬. কোনো বিজ্ঞাপন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে হলে কী করতে হবে?
ক. সাইনবোর্ডে টাঙাতে হবে খ. পত্রিকায় দিতে হবে
গ. ওয়েবসাইটে দিতে হবে
ঘ. রেডিওতে প্রচার করতে হবে

৭. হারবার্ট মার্শাল ম্যাকলুহান নিচের কোন দেশটির অধিবাসী ছিলেন?
ক. জার্মানি খ. ফ্রান্স
গ. গ্রিস ঘ. কানাডা

৮. কোনটির মাধ্যমে এক দেশের লোক অন্য দেশের লোকের সাথে ভিডিও চ্যাট করেন?
ক. স্কাইপি খ. মাই স্পেস
গ. টুইটার ঘ. ইউটিউব

৯. অনলাইনের মাধ্যমে ব্যবসা–বাণিজ্য করাকে বলা হয়—
ক. ই–মেইল খ. ই–বুক
গ. ই–গভর্নেন্স ঘ. ই–কমার্স

১০. www.khanacademy.org কী সংক্রান্ত ওয়েবসাইট?
ক. চিকিৎসা সংক্রান্ত ওয়েবসাইট
খ. বিনোদন সংক্রান্ত ওয়েবসাইট
গ. ব্যবসা সংক্রান্ত ওয়েবসাইট
ঘ. শিক্ষা সংক্রান্ত ওয়েবসাইট

১১. কোনটির অবদান বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি?
ক. টেলিফোন খ. ইন্টারনেট
গ. টেলিভিশন ঘ. স্যাটেলাইট

১২. কোনটির কল্যাণে ঘরে বসেই বিশ্বকে হাতের মুঠোয় পাওয়া যাচ্ছে?
ক. ইন্টারনেট খ. টেলিভিশন
গ. টেলিফোন ঘ. মোবাইল ফোন

১৩. দূরবর্তী কোনো বস্তু বা ব্যক্তির সাথে যোগাযোগের সময় কোনটির সুদৃঢ় নেটওয়ার্ক থাকার প্রয়োজন হয়?
ক. ইন্টারনেট খ. ক্রায়োসার্জারি
গ. গ্লোবাল ভিলেজ ঘ. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি

১৪. বহুল ব্যবহৃত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কোনটি?
ক. facebook খ. my space
গ. Twitter ঘ. Yahoo

১৫. দেশের অর্থনীতির চাকাকে কোরবান করার ক্ষেত্রে নিচের কোনটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে?
ক. ফেইসবুক খ. আউটসোর্সিং
গ. গুগল ঘ. সংবাদপত্র

১৬. বর্তমানে ঘরে বসে অর্থ উপার্জন করার বাস্তব উপায় কি?
ক. আউটসোর্সিং খ. ভার্চুয়াল চাকরি
গ. অনলাইন হ্যাকিং ঘ. ভার্চুয়াল ব্যবসা

১৭. অর্থ প্রেরণ ও গ্রহণের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে পরিণত হয়েছে?
ক. মোবাইল ব্যাংকিং খ. কুরিয়ার সার্ভিস
গ. তফসিলি ব্যাংক ঘ. পোস্ট অফিস

১৮. কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় বেচাকেনাকে সাধারণভাবে কী বলা হয়?
ক. ই–কমার্স খ. ই–মার্কেট
গ. ই–মেইল ঘ. ই–বিজনেস

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১	ক	২	ঘ	৩	গ	৪	ক	৫	ঘ	৬	গ	৭	ঘ	৮	ক	৯	ঘ
১০	ঘ	১১	খ	১২	ক	১৩	ক	১৪	ক	১৫	খ	১৬	ক	১৭	ক	১৮	ক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৯. হারবার্ট মার্শাল ম্যাকলুহান-এর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম হলো–
i. **The Gutenberg Galaxy :** The Making of Typographic Man
ii. Understanding Media iii. The C Programming Languae
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii খ. i ও ii
গ. iii ঘ. i ও iii

২০. দূরশিক্ষণ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা—
i. বাড়ির কাজ ইন্টারনেটের সহায়তায় জমা দিতে পারবে
ii. বিভিন্ন রকম অনলাইন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে
iii. শিক্ষকের লেকচার নোটগুলো ওয়েবসাইটে দেখতে পারবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

২১. অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশু শ্রেণিতে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে লেকচারসমূহ প্রচার করা যেতে পারে—
i. টেলিভিশনের মাধ্যমে ii. ফ্যাক্স মেশিনের মাধ্যমে
iii. মোবাইল ফোনের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

২২. আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি নতুন শিক্ষাব্যবস্থা হচ্ছে—
i. ওয়েবভিত্তিক ii. ইন্টারনেটভিত্তিক
iii. মাল্টিমিডিয়াভিত্তিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i, ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i ও ii

২৩. **E–Commerce**-এর সাথে সম্পর্কিত শব্দ হলো—
i. ক্রেডিট কার্ড
ii. ডেবিট কার্ড
iii. আইডেন্টিটি কার্ড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও iii খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৪. বিশ্বগ্রাম ধারণার প্রেক্ষাপটে যেকোনো সভা অফিসে করতে হলে প্রয়োজন হবে—
i. ভিডিও কনফারেন্সিং সফটওয়্যার
ii. অডিও কনফারেন্সিং সফটওয়্যার
iii. সিমুলেশন সফটওয়্যার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. iii
গ. ii ঘ. i ও iii

২৫. সামাজিক যোগাযোগ ওয়েবসাইট —
i. বিং ii. ফেসবুক
iii. টুইটার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii ও iii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৬ ও ২৭ প্রশ্নের উত্তর দাও :
শরীফ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির সুযোগ পাওয়ার বিষয়টি 3G ফোনে Text লিখে দেশে-বিদেশে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু বান্ধবকে জানায়। তাদের কেউ কেউ ভিডিও কল এবং কেউ কেউ ফেইসবুক-এর মাধ্যমে শরীফকে অভিনন্দন জানায়।

২৬. শরীফের খবরটি পাঠানো হয়েছিল যেভাবে-
ক. ফ্যাক্স খ. এস.এম.এস
গ. পোস্টাল ঘ. এম.এম.এস

২৭. শরীফ তার ব্যবহৃত প্রযুক্তির সাহায্যে যে সকল সুবিধা নিতে পারে–
i. অন-লাইন ব্যাংকিং ii. আউট সোর্সিং
iii. ভার্চুয়াল ড্রাইভিং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৮. কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনলাইনে সবচেয়ে কার্যকরী উপায়ে সভার কাজ সম্পন্ন করা যায়?
ক. ই-মেইল খ. ফেইসবুক
গ. টেলি কনফারেন্সিং ঘ. ভিডিও কনফারেন্সিং

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৯–৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ শফিক সাহেব একটি শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন, যেখানে তথ্য প্রযুক্তির নানা শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর বাংলা ভাষায় প্রায় অর্ধশতাধিক ভিডিও আপলোড করা হয়েছে বিনামূল্যে ব্যবহারের জন্য। তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষার্থী ও অনুরাগীদের নিকট ক্রমেই ওয়েবসাইটটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২৯. শফিক সাহেবের উদ্যোগটি বিশ্বগ্রামের ফলে উদ্ভূত কোন ধারণাটির সাথে সম্পর্কিত?
ক. ই-কমার্স খ. ই-লার্নিং
গ. ই-মেডিসিন ঘ. ই-গভর্নেন্স

৩০. শফিক সাহেবের ওয়েব সাইটটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবার কারণ-
i. সাইটটি বাংলা ভাষার বিধায় এখান থেকে যে কেউ তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে পারছে
ii. ছাত্র-ছাত্রীরা বিনামূল্যে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারছে
iii. অডিও ও ভিডিও ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির বিষয়গুলোর আকর্ষণীয় উপস্থাপন সম্ভব হচ্ছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i ও ii

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১৯	খ	২০	খ	২১	গ	২২	খ	২৩	খ	২৪	ক	২৫	খ
২৬	খ	২৭	ক	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	খ				

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩১. বাস্তব নয়, কিন্তু বাস্তবের চেতনা উদ্রেককারী বিজ্ঞাননির্ভর কল্পনাকে কী বলে?
ক. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি খ. ভার্চুয়াল ফাংশন
গ. ভার্চুয়াল পাস্ট ঘ. ভার্চুয়ালিটি

৩২. কোন তত্ত্বের উপর ভার্চুয়াল রিয়েলিটি প্রতিষ্ঠিত?
ক. মরগানতত্ত্ব খ. সিমুলেশন তত্ত্ব
গ. কম্পিউটারতত্ত্ব ঘ. ভার্চুয়াল তত্ত্ব

৩৩. ভার্চুয়াল রিয়েলিটির জন্য হাতে যে জিনিসটি পরতে হয় তা হলো–
ক. HMD খ. Data glove
গ. Body Suit ঘ. Head set

৩৪. সিমুলেশনে যখন কোনো বিস্তুর শারীরিক উপস্থিতির আবহ প্রদান করা হয় তখন তাকে কী বলে?
ক. ভার্চুয়াল ভিলেজ খ. ভার্চুয়াল হাউজ
গ. ভার্চুয়াল সোসাইটি ঘ. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি

৩৫. নিচের কোনটি ভার্চুয়াল রিয়েলিটি তৈরি করে?
ক. বাস্তবভাবে কৃত্রিম জগৎ খ. কৃত্রিমভাবে বাস্তব জগৎ
গ. বাস্তবভাবে কাল্পনিক জগৎ ঘ. কাল্পনিকভাবে কৃত্রিম জগৎ

৩৬. ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে ছবিগুলোকে জীবন্ত দেখানোর জন্য কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়?
ক. ত্রিমাত্রিক খ. দ্বিমাত্রিক
গ. একমাত্রিক ঘ. চতুর্মাত্রিক

৩৭. ভার্চুয়াল রিয়েলিটির সাহায্যে সামরিক প্রশিক্ষণের সময়–
ক. প্রাণহানির আশঙ্কা কমে যায়
খ. প্রাণহানির কোনো আশঙ্কা থাকে না
গ. প্রাণহানির আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়
ঘ. প্রাণহানি হওয়া-না হওয়ার আশঙ্কা সমান

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৮. বিশেষ হেলমেট, বিশেষ গ্লোভস ও পায়ে বিশেষ যন্ত্রপাতিসম্পন্ন জুতো পরতে হয়—
i. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ উপলব্ধি করতে
ii. ভার্চুয়াল রিয়েলিটির অনুভূতি বন্ধ করতে
iii. ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ঝুঁকি হতে মুক্ত থাকতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. i ও iii ঘ. iii

৩৯. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহারের ফলে মানুষ —
i. কানে কম শুনতে পারে
ii. বাস্তবতাবিবর্জিত হয়ে উঠতে পারে
iii. মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪০–৪১নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
বিলুর মামা কম্পিউটার বিজ্ঞানী। বিলু একদিন তার ল্যাবে বেড়াতে গেলে মামা তার শরীরে নানা যন্ত্রপাতি লাগিয়ে দিতেই বিলু দেখতে পেল সে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে বসে আছে। বিলু হাত দিয়ে পানি স্পর্শ করে দেখল সত্যি তার হাত পানিতে ভিজে যাচ্ছে।

৪০. বিলুর হাতে পানির অনুভূতি সৃষ্টি করছে নিচের কোনটি?
ক. HMD খ. ডেটা গ্লোভস
গ. ডেটা ডিভাইস ঘ. বিশেষ ধরনের চশমা

৪১. বিলু সমুদ্র সৈকত ভ্রমণের শারীরিক অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, কেননা বিলুর মামা ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করে —
i. সমুদ্র সৈকতের একটি সিমুলেশন তৈরি করেছেন
ii. বিভিন্ন সেন্সরের সাহায্যে তার অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন
iii. বাস্তবে কক্সবাজারে নিয়ে গেছেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. i, ii ও iii ঘ. ii ও iii

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪২. কৃত্রিম উপায়ে মানুষের চিন্তা–ভাবনাগুলো কম্পিউটারের মধ্যে রূপ দেয়াকে কী বলে?
ক. কৃত্রিম ভাবনা খ. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
গ. কৃত্রিম প্রোগ্রাম ঘ. কৃত্রিম তথ্য

৪৩. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংযোজন করা হয়েছে কোন প্রজন্মের কম্পিউটারে?
ক. পঞ্চম খ. চতুর্থ
গ. তৃতীয় ঘ. ষষ্ঠ

৪৪. 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স' শব্দটির সাথে সর্বপ্রথম সকলকে পরিচয় করিয়ে দেন কে?
ক. Jack Williamson খ. Marshall Mcluhan
গ. John McCarthy ঘ. Karel Capek

৪৫. মানব মস্তিষ্কের উপায় অবলম্বন করে কাজ করে তা নকল করার উদ্যোগ নেয় বুদ্ধিবৃত্তিক বিজ্ঞানের কোন ক্ষেত্র?
ক. লার্নিং সিস্টেম খ. ফাজি লজিক
গ. এক্সপার্ট সিস্টেম ঘ. নিউরাল নেটওয়ার্ক

৪৬. বুদ্ধিবৃত্তিক বিজ্ঞানের কোন ক্ষেত্র ব্যবহার করে প্রশ্ন বা সমস্যাকে সত্য ও মিথ্যার মাঝামাঝি কোনো মানে উপস্থাপন করা যায়?
ক. জেনেটিক অ্যালগরিদম খ. লার্নিং সিস্টেম
গ. ফাজি লজিক ঘ. নিউরাল নেটওয়ার্ক

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

৩১	ক	৩২	খ	৩৩	খ	৩৪	ঘ	৩৫	খ	৩৬	ক	৩৭	খ	৩৮	খ
৩৯	ঘ	৪০	খ	৪১	খ	৪২	খ	৪৩	ক	৪৪	গ	৪৫	ঘ	৪৬	গ

৪৭. এক্সপার্ট সিস্টেম কি?
ক. অ্যাপ্লিকেশন খ. যন্ত্র
গ. রোবট ঘ. নিউরাল নেটওয়ার্ক

৪৮. নিচের কোনটি কম্পিউটারের নেই?
ক. নিজস্ব বুদ্ধি খ. তথ্য সম্ভার
গ. সফটওয়্যার ঘ. কী-বোর্ড

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪৯. আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স পদ্ধতির প্রয়োগ রয়েছে–
i. সূত্রের প্রতিপাদন ও সমস্যা সমাধানে
ii. জ্ঞানের উপস্থাপনে
iii. মনুষ্য অনুভূতি সৃষ্টিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫০. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের প্রধান ক্ষেত্র—
i. ন্যাচারাল ইন্টারফেস ii. বুদ্ধিবৃত্তিক বিজ্ঞান
iii. ক্রায়োসার্জারি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫১. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সৃষ্টিতে কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়—
i. ইলেকট্রনিক চিপ
ii. উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মাইক্রোপ্রসেসর
iii. রাউটার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. iii
গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫২–৫৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
কলি সময় পেলেই কম্পিউটারে দাবা খেলে থাকে এবং কম্পিউটারের সাথে দাবা খেলায় কদাচিৎ সে জিততে সক্ষম হয়। অবশ্য অনেক সময় কলি লক্ষ করেছে কম্পিউটার তার প্রদত্ত চালের বিপক্ষে ছোটোখাটো ভুলও করে থাকে।

৫২. কলির কম্পিউটারে থাকা দাবা খেলার প্রোগ্রামটি নিচের কোন ধারণাটি ব্যবহার করে তৈরি?
ক. রোবটিক্স খ. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি
গ. আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ঘ. ন্যানো টেকনোলজি

৫৩. কলির চালের বিপক্ষে কম্পিউটারও অনেক সময় চাল দিতে ভুল করে। কেননা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় —
i. তথ্য ও অভিজ্ঞতার আলোকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়
ii. দাবা খেলা সম্ভব নয়
iii. লার্নিং সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও iii খ. i ও ii
গ. i, ii ও iii ঘ. ii ও iii

রোবোটিক্স

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫৪. নিচের কোনটি রোবট শব্দের অর্থ প্রকাশ করে?
ক. ভিনগ্রহবাসী খ. কৃত্রিম যন্ত্র
গ. যন্ত্রমানব ঘ. উন্নততর জীব

৫৫. নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা নেই কোনটির?
ক. ভাইরাস খ. পিঁপড়া
গ. রোবট ঘ. মানুষ

৫৬. নিচের কোন পদ্ধতি দ্বারা কোনো রোবটের আশপাশের বস্তুগুলোর অবস্থান পরিবর্তন বা বস্তুটি পরিবর্তন করার কাজটি করা হয়?
ক. Cryosurgery খ. Encryption
গ. Emulate ঘ. Manipulation

৫৭. রোবটের হাত ও পা নড়াচড়া করার জন্য সেটির মধ্যে থাকে—
ক. বৈদ্যুতিক জেনারেটর খ. ধাতব স্প্রিং
গ. বৈদ্যুতিক মোটর ঘ. লেড এসিড ব্যাটারি

৫৮. কোন ক্ষেত্রটি দ্বারা উৎসাহিত হয়ে বর্তমানকালের অধিকাংশ রোবট হয়ে তৈরি?
ক. বায়োইনগ্রাম জেনেটিক
খ. বায়োইন্সপায়ার্ড রোবোটিকস
গ. বায়োইন্সপায়ার্ড বায়োমেট্রিক্স
ঘ. বায়োইনফরমেটিক্স

৫৯. রোবোটিক্স-এ সাধারণ বিষয়গুলো কোনটি?
ক. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইঞ্জিনিয়ারিং, মনোবিদ্যা
খ. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
গ. ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ. মনোবিদ্যা

৬০. রোবোট শব্দটি মূলতঃ কোন ভাষা থেকে এসেছে?
ক. স্প্যানিশ খ. গ্রীক
গ. স্লাভিক ঘ. ল্যাটিন

৬১. রোবোটের নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাবার জন্য পথ খুঁজে বের করার বুদ্ধিমত্তাকে কি বলা হয়?
ক. Dexterity খ. Manipulation
গ. Locomotion ঘ. Navigation

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

৪৭	ক	৪৮	ক	৪৯	ঘ	৫০	ক	৫১	ক	৫২	গ	৫৩	ক	৫৪	গ
৫৫	গ	৫৬	ঘ	৫৭	গ	৫৮	খ	৫৯	ক	৬০	গ	৬১	ঘ		

৬২. সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নাসা কর্তৃক মঙ্গলগ্রহে পাঠানো রোবট এর নাম কী—
ক. কিউরিসিটি খ. অ্যাপোলো
গ. ভেরেনা ঘ. ভস্টক

৬৩. কোনটি সামরিক ক্ষেত্রে রোবটের ব্যবহার প্রকাশ করে?
ক. ডুবে যাওয়া জাহাজের অনুসন্ধান
খ. খনি অভ্যন্তরের কর্মসম্পাদন
গ. ভূমি মাইন শনাক্তকরণ ঘ. যন্ত্রাংশ সংযোজন

৬৪. কোন সায়েন্স ফিকশন রাইটার সর্বপ্রথম রোবোটিক্স শব্দটি ব্যবহার করেন?
ক. কারেল কাপেক খ. আইজ্যাক অসিমভ
গ. জ্যাক উইলিয়ামসন ঘ. জুলেভার্ন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৬৫. রোবট তৈরি —
i. ব্যয়বহুল ii. কষ্টসাধ্য
iii. সহজ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও iii খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৬. রোবটের বৈশিষ্ট্য–
i. এটি নিখুঁত কর্মক্ষম
ii. এটি ক্লান্তিহীন
iii. এটি ধীরগতিসম্পন্ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও iii খ. i, ii ও iii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

৬৭. কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত রোবটের সাহায্যে বড় বড় কারখানায় করা হয়—
i. পরিশ্রমসাধ্য কাজ ii. সহজ কাজ
iii. বিপজ্জনক কাজ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

৬৮. রোবট ব্যবহৃত হয় যে সব কাজে —
i. কলকারখানার জিনিসপত্র পরিবহনে
ii. যন্ত্রাংশ সংযোজনে
iii. যুদ্ধযানে ড্রাইভারের বিকল্প হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii খ. i, ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. iii

৬৯. সামরিক ক্ষেত্রে রোবট ব্যবহৃত হয় —
i. স্থল মাইন অপসারণ করতে
ii. গোপন নজরদারি করতে
iii. যুদ্ধযানে ড্রাইভারের বিকল্প হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii খ. i, ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৭০–৭২নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
সনিয়ার বাবা জাপান প্রবাসী একজন প্রকৌশলী। তিনি দেশে ফেরার সময় গৃহস্থালির কাজে সহায়তা করতে সক্ষম এমন একটি রোবট এনেছেন। সনিয়া দেখল ঘর পরিষ্কারের সময় রোবটটি নিখুঁতভাবে চারদিকে ঘুরে ঘরের সব কোনা থেকে ময়লা অপসারণ করতে পারছে। তার বাবা রোবটটিতে কিছু পরিবর্তন করতেই সেটি ঘরের বাইরে পাহারার কাজে নিযুক্ত হলো।

৭০. সনিয়ার বাবা রোবটটির কি পরিবর্তন করার ফলে এটি পাহারাদার রোবটে পরিণত হয়েছে?
ক. প্রোগ্রাম খ. গঠন
গ. ম্যানিপুলেশন ঘ. লোকোমোসান

৭১. রোবটটি চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নিখুঁতভাবে ময়লা পরিষ্কার করতে পারছে। কেননা এতে —
i. মানুষের চোখের ন্যায় ক্যামেরা রয়েছে
ii. যান্ত্রিক পা রয়েছে
iii. ৩৬০° ঘুরতে পারার ব্যবস্থা রয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও iii খ. i ও ii
গ. i, ii ও iii ঘ. i , ii ও iii

৭২. উদ্দীপকের বর্ণনা অনুসারে রোবটটিতে নিচের যে এলিমেন্টগুলো নিশ্চিতভাবে যুক্ত থাকবে—
i. মুভেবল বডি ii. লেড এসিড ব্যাটারি
iii. ম্যানিপুলেশন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও iii খ. i ও ii
গ. i, ii ও iii ঘ. ii ও iii

ক্রায়োসার্জারি

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৭৩. নিচের কোনটি 'Cryo' শব্দের অর্থ প্রকাশ করে?
ক. খুবই গরম খ. চিকিৎসা
গ. অসুস্থতা ঘ. বরফের মতো ঠাণ্ডা

৭৪. অত্যধিক ঠাণ্ডায় অস্বাভাবিক বা রোগাক্রান্ত টিস্যুর উপর নিচের কোনপদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়?
ক. ক্রোমোসার্জারি খ. ক্রায়োসার্জারি
গ. হোমোসার্জারি ঘ. বায়োসার্জারি

৭৫. কত তাপমাত্রায় ক্রায়োসার্জারি সেলগুলোকে ধ্বংস করার কাজ করে?
ক. – 41°C খ. – 19°C
গ. 0°C ঘ. – 58°C

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

৬২	ক	৬৩	গ	৬৪	খ	৬৫	খ	৬৬	গ	৬৭	ঘ	৬৮	খ	৬৯	খ
৭০	ক	৭১	ঘ	৭২	ক	৭৩	ঘ	৭৪	খ	৭৫	ক				

৭৬. নিচের কোন রোগের জন্য ক্রায়োসার্জারি ব্যবহৃত হয়?
ক. চর্মরোগ খ. মস্তিষ্কের রোগ
গ. পেটের রোগ ঘ. দন্তরোগ

৭৭. কোনো টিউমারকে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা তাপমাত্রায় গলানো হয় কোন সার্জিকাল পদ্ধতির মাধ্যমে?
ক. বায়োসার্জারি খ. হোমোসার্জারি
গ. ক্রায়োসার্জারি ঘ. ক্রোমোসার্জারি

৭৮. ক্রায়োপ্রোব ব্যবহার করে শরীরের টিউমার গলানো হয় কোন ক্ষেত্রে?
ক. টিউমারটি শরীরের অভ্যন্তরে হলে
খ. টিউমারটি শরীরের বাইরে হলে
গ. টিউমারটি হাতে হলে
ঘ. টিউমারটি গলায় হলে

৭৯. ক্রায়োপ্রোব বলতে কী বুঝায়?
ক. বায়োসার্জারিতে ব্যবহৃত সুতার মতো যন্ত্র
খ. ক্রায়োসার্জারিতে ব্যবহৃত মোমের মতো যন্ত্র
গ. ক্রায়োসার্জারিতে ব্যবহৃত ছোট কাঠির মতো যন্ত্র
ঘ. ক্রায়োসার্জারিতে ব্যবহৃত পেন্সিলের মতো যন্ত্র

৮০. ক্রায়োসার্জারিতে এমআরআই ব্যবহার করা হয় কেন?
ক. আক্রান্ত কোষকে ধ্বংস করার জন্য
খ. আক্রান্ত কোষের সঠিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য
গ. আক্রান্ত কোষে তরল নাইট্রোজেন প্রয়োগের জন্য
ঘ. আক্রান্ত কোষে শীতল তাপমাত্রা প্রয়োগের জন্য

৮১. ক্রায়োসার্জারিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি উৎপাদন ও বিপণনে কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়?
ক. যোগাযোগ প্রযুক্তি খ. ইন্টারনেট প্রযুক্তি
গ. বায়ো প্রযুক্তি ঘ. তথ্য প্রযুক্তি

৮২. ক্রায়োসার্জারিতে নাইট্রোজেনের কোন অবস্থা প্রয়োগ করা হয়?
ক. কঠিন খ. বায়বীয়
গ. আয়নিত ঘ. তরল

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৮৩. ক্রায়োসার্জারি করতে হয় যে চিকিৎসায়—
i. স্তন ক্যান্সারের চিকিৎসায়
ii. প্রোস্টেট ক্যান্সারের চিকিৎসায়
iii. লিভার ক্যান্সারের চিকিৎসায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও iii খ. iii
গ. i ঘ. i, ii ও iii

৮৪. শরীরের টিউমার অপসারণের দক্ষতা নির্ভর করে—
i. ক্রায়োপ্রোবের সাইজের উপর
ii. ক্রায়োপ্রোবের অবস্থানের উপর
iii. ক্রায়োপ্রোবের তাপমাত্রার উপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii ও iii খ. i ও iii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৮৫. ক্রায়োসার্জারির ক্ষেত্রে পৃথক পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয়—
i. কার্বন ডাইঅক্সাইডের তুষার
ii. তরল নাইট্রোজেন iii. নিয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i, ii ও iii খ. ii ও iii
গ. i ও ii ঘ. i ও iii

৮৬. ক্রায়োসার্জারির ক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে ব্যবহৃত হয়—
i. প্রোপেন ii. অ্যালকোহল
iii. ডাইমিথাইল ইথার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii খ. i ও iii
গ. i ও iii ঘ. iii

৮৭. ক্রায়োসার্জিক্যাল চিকিৎসা প্রদান করা হয়—
i. সোলার কেরাটোস রোগের চিকিৎসায়
ii. মর্টনস নিউরোমা রোগের চিকিৎসায়
iii. স্কিন ট্যাগ রোগের চিকিৎসায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii খ. iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮৮. ক্রায়োসার্জারির আদিরূপ হলো —
i. ক্ষত ও প্রদাহের চিকিৎসায় শীতল তাপমাত্রার প্রয়োগ
ii. লবণ ও পানির বরফ জমাট মিশ্রণের সাহায্যে চিকিৎসা
iii. তরল নাইট্রোজেনের মাধ্যমের ত্বকের রোগের চিকিৎসা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও iii খ. iii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৮৯. ক্রায়োসার্জারি আধুনিক ও উন্নত হয়ে ওঠে —
i. তরল নাইট্রোজেন ব্যবহারের ফলে
ii. তরল অক্সিজেন ব্যবহারের ফলে
iii. বিভিন্ন ক্রায়োজেনিক এজেন্ট ব্যবহারের ফলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii ও iii খ. i ও iii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৯০. ক্রায়োথেরাপি রেডিও থেরাপির তুলনায় ভালো। কেননা —
i. এতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম
ii. রোগীর ধকল কম
iii. এটি বেশি নিরাপদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii ও iii খ. i ও iii
গ. i, ii ও iii ঘ. iii

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

৭৬	ক	৭৭	গ	৭৮	ক	৭৯	ঘ	৮০	খ	৮১	ঘ	৮২	ঘ	৮৩	ঘ
৮৪	খ	৮৫	গ	৮৬	খ	৮৭	ঘ	৮৮	গ	৮৯	খ	৯০	গ		

৯১. ক্রায়োসার্জারির সুবিধা হলো —
i. এতে রোগীর ঝুঁকি কম
ii. ব্যাথানাশক ব্যবহৃত হয় না
iii. কাঁটাছেঁড়ার প্রয়োজন কম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii খ. iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৯২–৯৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
গলার অভ্যন্তরে টিউমার সদৃশ কিছু ধরা পড়ার পর চিকিৎসকরা জলিল সাহেবের টিউমারটি অপসারণ করতে বিশেষ ধরনের একটি পদ্ধতি ব্যবহার করলেন। জলিল সাহেব দেখলেন একটি সূচালো যন্ত্রের সাহায্যে ডাক্তাররা তার গলার অভ্যন্তরে বেশ কিছুক্ষণ চিকিৎসা চালালেন। জলিল সাহেব চিকিৎসা চলাকালে গলার অভ্যন্তরে কয়েকবার ঠান্ডা ও গরমের অনুভূতি পেলেন।

৯২. উদ্দীপকের জলিল সাহেবের টিউমার অপসারণে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে?
ক. ক্রায়োথেরাপি খ. রেডিওথেরাপি
গ. ক্রায়োসার্জারি ঘ. কেমিওথেরাপি

৯৩. জলিল সাহেব গলায় ঠাণ্ডা ও গরমের অনুভূতি পাবার কারণ—
i. শীতল তাপমাত্রায় গলায় আক্রান্ত টিউমারকে জমাটবদ্ধ করা হয়েছে
ii. জমাটবদ্ধ আক্রান্ত কোষের তাপমাত্রা বাড়িয়ে একে ধ্বংস করা হয়েছে
iii. একই সাথে শীতল ও উষ্ণ ক্রায়োজনিক এজেন্ট প্রয়োগ করা হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও iii খ. i ও ii
গ. i, ii ও iii ঘ. i , ii ও iii

মহাকাশ অভিযান

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯৪. 'কিউরিসিটি' নামক মহাকাশযান কোন গ্রহে পাঠানো হয়েছে?
ক. মঙ্গল খ. বুধ
গ. বৃহস্পতি ঘ. শনি

৯৫. কোথায় স্পেস স্টেশন স্থাপিত হয়েছে?
ক. সূর্যের কক্ষপথে খ. মঙ্গলগ্রহে
গ. পৃথিবীতে ঘ. পৃথিবীর কক্ষপথে

৯৬. চন্দ্রে অবতরণকারী প্রথম মনুষ্যবাহী মহাকাশযানের নাম—
ক. অ্যাপোলো–১১ খ. স্পুটনিক–২
গ. স্পুটনিক–১ ঘ. লুনা–৯

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯৭. মহাকাশযানগুলো বর্তমানে ব্যবহৃত হয় যে কাজে—
i. স্পেস স্টেশনে মালামাল পৌঁছানোর কাজে
ii. কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের কাজে
iii. মঙ্গল গ্রহে অভিযানের কাজে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

৯৮. মহাশূন্যে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত স্পেস স্টেশনগুলোর কার্যক্রম পরিচালিত হয়—
i. কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত রোবটের দ্বারা
ii. বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে
iii. টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সাহায্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও iii খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

আইসিটি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯৯. কোন সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে বিশ্বমানে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা হয়?
ক. Simulation Software খ. ERP Software
গ. Application Software ঘ. Package Software

১০০. 'ক্যাড' বলতে কি বোঝায়?
ক. কম্পিউটার এইডেড ডিরেকশন
খ. কন্ট্রোল এইডেড ডিজাইন
গ. কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন
ঘ. কন্ট্রোল এইডেড ডিরেকশন

১০১. কোনটি নতুন পণ্যের ডিজাইন তৈরিতে প্রয়োজন?
ক. CAD খ. MICR
গ. ATM ঘ. CCTV

১০২. নিচের কোনটি আইসিটি থেকে আইটির পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য নির্দেশক—
ক. সম্পূর্ণ কম্পিউটার নির্ভর
খ. অপটিক্যাল ফাইবার নির্ভর
গ. ইন্টারনেট নির্ভর
ঘ. টেলিযোগাযোগ নির্ভর

■ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১০৩. প্রকৌশলগত নকশা তৈরি ও বাস্তবায়নে ব্যবহৃত হয় —
i. কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন
ii. কম্পিউটার এইডেড ডিরেকশন
iii. কম্পিউটার এইডেড ম্যানুফ্যাকচারিং

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

৯১	গ	৯২	গ	৯৩	খ	৯৪	ক	৯৫	ঘ	৯৬	ক	৯৭	খ	৯৮	ঘ
৯৯	খ	১০০	গ	১০১	ক	১০২	ঘ	১০৩	ঘ						

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

১০৪. উৎপাদন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে —
i. টেলিপোর্ট সেবা
ii. টেলিযোগাযোগ সেবা
iii. ইন্টারনেট সেবা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও iii খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১০৫. আইসিটি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার উদাহরণ হলো —
i. কম্পিউটারের সাহায্যে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ
ii. ঝুঁকিপূর্ণ কাজে রোবটের ব্যবহার
iii. স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন ব্যবস্থাপনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও iii খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

বায়োমেট্রিক্স ও বায়োইনফরমেটিক্স

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১০৬. কোন ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়?
ক. কৃষিক্ষেত্রে খ. শিক্ষাক্ষেত্রে
গ. নিরাপত্তাক্ষেত্রে ঘ. বিনোদনক্ষেত্র

১০৭. বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি হলো—
ক. ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিডার খ. ফিঙ্গার আইডেনটিটি
গ. ফিঙ্গার ইনপুট ডেটা
ঘ. ফিঙ্গার বায়োলজিক্যাল ডেটা

১০৮. তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে শনাক্ত করাকে কী বলে?
ক. বায়োমেট্রিক্স খ. বায়োইনফরমেটিক্স
গ. বায়োটেকনোলজি ঘ. বায়োমিড

১০৯. কোনটি বায়োমেট্রিক্স–এ ব্যবহৃত হয়?
ক. সেন্সর খ. ডিজিটাল মিটার
গ. ওয়েট মিটার ঘ. থার্মোমিটার

১১০. তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে জৈব রসায়ন ব্যবহার করে জীববিজ্ঞানের সমস্যার সমাধানকে কী বলা হয়?
ক. ন্যানো টেকনোলজি খ. বায়োমেট্রিক্স
গ. বায়োটেকনোলজি ঘ. বায়োইনফরমেটিক্স

১১১. কম্পিউটারের মধ্যে জৈবতথ্য নিয়ে গবেষণা করাকে কী বলে?
ক. ড্রাইল্যাব খ. বায়োল্যাব
গ. ওয়েটল্যাব ঘ. এক্সল্যাব

১১২. কোনটি বায়োইনফরমেটিক্স এর মূল উদ্দেশ্য?
ক. জৈবিক পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা
খ. কম্পিউটার বিজ্ঞানের তথ্যমালা বিশ্লেষণ করা
গ. জীববিদ্যার তথ্যমালা সংরক্ষণ করা
ঘ. অজৈবিক পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা

১১৩. কোন প্রযুক্তির সাহায্যে প্রোটিন গঠনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়?
ক. বায়োটেকনোলজি খ. বায়োমেট্রিক্স
গ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ. ন্যানো টেকনোলজি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১১৪. মানুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–
i. চোখের মণি ii. আঙুলের ছাপ
iii. DNA
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

১১৫. বায়োমেট্রিক্স সিস্টেমে শনাক্তকরণে বিবেচিত বায়োলজিক্যাল ডেটাসমূহ—
i. হ্যান্ড জিওমেট্রির ii. আইরিস
iii. সিগনেচার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

১১৬. বায়োইনফরমেটিক্স এর সঙ্গে জড়িত—
i. জীববিদ্যা ii. পরিসংখ্যান
iii. কম্পিউটার বিজ্ঞান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii খ. i, ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. iii

১১৭. বায়োইনফরমেটিক্স এর প্রধান গবেষণার বিষয়গুলো হলো—
i. ইমেজ বিশ্লেষণ ii. জিন এর সূত্র বিশ্লেষণ
iii. ধারা বিশ্লেষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং ১১৮ ও ১১৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

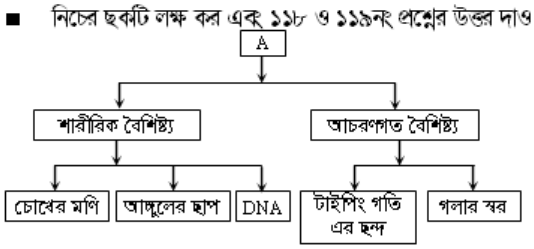

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১০৪	গ	১০৫	ঘ	১০৬	গ	১০৭	ঘ	১০৮	ক	১০৯	ক	১১০	ঘ	১১১	ক
১১২	গ	১১৩	ক	১১৪	খ	১১৫	খ	১১৬	খ	১১৭	খ				

১১৮. ছকে প্রদত্ত 'A' পদ্ধতিটি কোন কাজে ব্যবহৃত হয়?
ক. পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে
খ. ড্রাইভিং লাইসেন্স এর সত্যতা যাচাইকরণে
গ. জীবের বিবর্তন রহস্য নির্ণয়ে
ঘ. নতুন জীবের বীজ উদ্ভাবনে

১১৯. ছকে 'A' পদ্ধতিটি সম্পাদনকালে—
i. আঙুলের ছাপের বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে ফিল্টার করা হয়
ii. অপটিকাল স্ক্যানারের মাধ্যমে আঙুলের ছাপের ইমেজ নেয়া হয়
iii. আঙুলের ছাপের ইমেজকে সংরক্ষণ করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii ও iii খ. i ও ii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১২০. কোন পদ্ধতি ক্যান্সারের কারণ নির্ণয়ের গবেষণায় প্রয়োগ করা হয়?
ক. বায়োমেট্রিক্স খ. ন্যানো টেকনোলজি
গ. বায়োইনফরমেটিক্স ঘ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

১২১. GMO-বলতে কি বোঝায়?
ক. Genetic Modified Organism
খ. Genetic Modical Organism
গ. Genetically Modified Organism
ঘ. Genetic Modified Organic

১২২. কিসের মাধ্যমে DNA-সমূহ প্রাণীর কোষের নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করানো হয়?
ক. মিনি ইনজেকশন খ. সেমিমাইক্রো ইনজেকশন
গ. মাইক্রো ইনজেকশন ঘ. সেন্টিমাইক্রো ইনজেকশন

১২৩. কোনটির মাধ্যমে বিভিন্ন রকম হরমোন তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে?
ক. ন্যানো টেকনোলজি খ. বায়োইনফরমেটিক্স
গ. বায়োমেট্রিক্স ঘ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

১২৪. কোন পদ্ধতি পাউরুটিতে ব্যবহৃত ইস্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়?
ক. ন্যানো টেকনোলজি খ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ. বায়োইনফরমেটিক্স ঘ. বায়োমেট্রিক্স

১২৫. কোনটি জীবদেহে পরিবর্তন আনার জন্য প্রয়োজন?
ক. বায়োইনফরমেটিক্স খ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ. বায়োমেট্রিক্স ঘ. ন্যানো টেকনোলজি

১২৬. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বাণিজ্যিকভাবে কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে?
ক. শিল্পক্ষেত্র খ. গবেষণা ক্ষেত্রে
গ. শিক্ষাক্ষেত্রে ঘ. কৃষিক্ষেত্রে

১২৭. একটি নির্দিষ্ট জিন বহনকারী কোনো জীব থেকে DNA খণ্ড পৃথক করে ভিন্ন একটি জীবে স্থানান্তরের কৌশলকে কী বলে?
ক. বায়োমেট্রিক্স খ. ন্যানো টেকনোলজি
গ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ. বায়োইনফরমেটিক্স

১২৮. ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টিতে কাজ করে কোনটি?
ক. বায়োমেট্রিক্স খ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ. ন্যানো টেকনোলজি ঘ. বায়োইনফরমেটিক্স

১২৯. নিচের কোনটি জীবদেহের ডিএনএ-এর বিভাজিত একক বৈশিষ্ট্য নির্দেশক?
ক. সেন্ট্রিওল খ. কোষ
গ. জিন ঘ. ক্রোমাটিড

১৩০. যে কৌশল অবলম্বন করে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং–এ এক জীবের কোষ থেকে অন্য জীবে স্থানান্তর করা হয় তাদেরকে একত্রে কী বলে?
ক. রিকম্বিনেন্ট RNA খ. রেস্ট্রিকশন DNA
গ. রেস্ট্রিকশন RNA ঘ. রিকম্বিনেন্ট DNA

১৩১. সাধারণ DNA অণু ছাড়াও ব্যাকটেরিয়ার দেহে অতিরিক্ত স্বনিয়ন্ত্রিত বৃত্তাকার যে DNA থাকে তাকে কী বলে?
ক. প্লাজমিড খ. নিউক্লিওলাস
গ. ক্রোমোজোম ঘ. রিকম্বিনেন্ট DNA

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৩২. রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে–
i. ডিএনএ অণু কাটা যায়
ii. এক জীবের কোষ থেকে DNA অংশ অন্য জীবে স্থানান্তর করা যায়
iii. এক জীবের DNA অংশ অন্য জীবের DNA অংশের সাথে লাগানো যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৩৩. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সফলভাবে প্রয়োগ হচ্ছে—
i. শিল্পক্ষেত্রে ii. চিকিৎসাক্ষেত্রে
iii. কৃষিক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

১৩৪. রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির ধাপগুলো হলো—
i. DNA নির্বাচন ii. DNA এর বাহক নির্বাচন
iii. DNA খণ্ড কর্তন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii ও iii খ. i ও iii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১১৮	খ	১১৯	খ	১২০	ঘ	১২১	গ	১২২	গ	১২৩	ঘ	১২৪	খ	১২৫	খ	১২৬	ঘ
১২৭	গ	১২৮	খ	১২৯	গ	১৩০	ঘ	১৩১	ক	১৩২	ক	১৩৩	খ	১৩৪	ঘ		

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৩৫–১৩৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
ফজল মিঞা কৃষিকাজ করেন। সমস্যা হলো তার এলাকাটি বন্যা প্রবণ এবং তার উৎপাদিত ধান প্রায়শঃই বন্যায় তলিয়ে যায়। কৃষি বিভাগ এ বছর উক্ত অঞ্চলের কৃষকদের জন্য বিশেষ ধরনের ধানের বীজ সরবরাহ করেছে, যা থেকে উৎপাদিত ধানগাছগুলো বেশ লম্বা হবার কারণে সেগুলো সে বছর বন্যায় তলিয়ে গেলো না। শস্যের উৎপাদনও হলো প্রচুর।

১৩৫. উদ্দীপকে বর্ণিত বিশেষ ধরনের ধানবীজ উদ্ভাবনে কোন পদ্ধতির সহায়তা নেওয়া হয়েছে?
ক. বায়োইনফরমেটিক্স খ. বায়োটেকনোলজি
গ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ. বায়োমেট্রিক্স

১৩৬. উদ্দীপকে উল্লিখিত ধানবীজের জিনে—
i. লম্বা বৈশিষ্ট্যের ধান গাছের ডিএনএ সংযুক্ত করা হয়েছে
ii. উচ্চ ফলনশীলতার বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত করা হয়েছে
iii. ডুবে না যাবার বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত করা হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও iii খ. i ও ii
গ. i, ii ও iii ঘ. i , ii ও iii

ন্যানো টেকনোলজি

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৩৭. এক ন্যানোমিটার সমান কত মিটার?
ক. 10^{-6} মিটার খ. 10^{-9} মিটার
গ. 10^{-8} মিটার ঘ. 10^{-7} মিটার

১৩৮. আণবিক পর্যায়ে পদার্থকে পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করার বিদ্যাকে বলা হয়—
ক. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খ. নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং
গ. বায়োইনফরমেটিক্স ঘ. ন্যানোটেকনোলজি

১৩৯. কাকে ন্যানো প্রযুক্তির জনক বলা হয়?
ক. জোহান্স মেন্ডেল খ. লুই পাস্তুর
গ. রিচার্ড ফাইনম্যান ঘ. মার্শাল ম্যাকলুহান

১৪০. কোন প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের ভোগ্যপণ্য ছোট হতে থাকে?
ক. ট্রানজিস্টর প্রযুক্তি খ. বায়ো প্রযুক্তি
গ. লিকুইড ক্রিস্টাল প্রযুক্তি ঘ. সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তি

১৪১. সংক্ষেপে ন্যানো টেকনোলজি বা ন্যানো প্রযুক্তিকে কী বলে?
ক. ন্যানোটেল খ. ন্যানোমিটার
গ. ন্যানোটেক ঘ. ন্যানোওয়েব

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৪২. ন্যানো টেকনোলজির ব্যবহারিক ক্ষেত্র হলো—
i. রসায়ন ii. পদার্থবিজ্ঞান
iii. মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

১৪৩. ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহার যেসব ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে—
i. চিকিৎসাবিজ্ঞান ii. ইলেকট্রনিক্স
iii. শক্তি উৎপাদন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

কম্পিউটার অপরাধ

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৪৪. ইন্টারনেট ব্যবহার করে অন্যের কম্পিউটারে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করাকে কী বলে?
ক. ব্লগিং খ. প্রোগ্রামিং
গ. চ্যাটিং ঘ. হ্যাকিং

১৪৫. হ্যাকার বলা হয় কাদেরকে?
ক. যারা সংবাদপত্র বাজারজাত করে
খ. যারা পণ্য বাজারজাত করে
গ. যারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কম্পিউটারে অবৈধভাবে প্রবেশ করে
ঘ. যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৪৬. **Computer Crime** এর অন্তর্ভুক্ত হলো—
i. কপিরাইট ভঙ্গ করে বই–পুস্তক ব্যবহার
ii. অশ্লীল চলচ্চিত্রের প্রচার
iii. নতুন ব্যাংক একাউন্ট খোলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও iii খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৪৭. হ্যাকারদের কাজ হলো—
i. কম্পিউটারের প্রয়োজনীয় ফাইল নষ্ট করা
ii. অনলাইন প্রতারণার মাধ্যমে টাকা–পয়সা চুরি
iii. নতুন নতুন সফটওয়্যার তৈরি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii ও iii খ. i ও iii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

১৪৮. কম্পিউটার অপরাধের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো—
i. সফটওয়্যার পাইরেসি ii. প্লেজিয়ারিজম
iii. ডেটা চুরি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i, ii ও iii
গ. iii ঘ. ii

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১৩৫	গ	১৩৬	খ	১৩৭	খ	১৩৮	ঘ	১৩৯	গ	১৪০	ঘ	১৪১	গ	১৪২	খ
১৪৩	খ	১৪৪	ঘ	১৪৫	গ	১৪৬	খ	১৪৭	গ	১৪৮	খ				

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

আলতাফ কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে ঘরে বসে বিশেষ পদ্ধতিতে কাজ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে। তার বড় ভাই মিজান ব্যবসার পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য নিজস্ব ওয়েবসাইট ও ই-মেইল একাউন্ট খুলে পণ্য-দ্রব্যের বিজ্ঞাপন দিয়ে অল্প সময়ে ব্যবসায় উন্নতি ও খ্যাতি অর্জন করে।

ক. ভিডিও কনফারেন্সিং কী? ১

খ. পৃথিবী একটি একক পরিবার – ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মিজানের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "বাংলাদেশের যুব সমাজের বেকারত্ব দূরীকরণে আলতাফ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত"-উক্তিটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

২. **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

ইলিয়াস সাহেব নিজের ল্যাপটপ ব্যবহার করেই বহির্বিশ্বের বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখেন এবং আমেরিকা প্রবাসী ছেলের সাথে প্রতিদিন কথা বলেন। ইলিয়াস সাহেবের ছেলে ইমরান ল্যাপটপের মাধ্যমেই বিদেশি লাইব্রেরি ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে এবং ঘরে বসেই একটি বিদেশি ডিগ্রি অর্জন করে।

ক. ইলেকট্রনিক মেইল বা ই-মেইল কী? ১

খ. টেলি-মেডিসিন এক ধরনের সেবা – বুঝিয়ে বল। ২

গ. উদ্দীপকে ইলিয়াস সাহেবের ক্ষেত্রে বিশ্বগ্রামের ধারণা সংশ্লিষ্ট কোন উপাদানটি প্রতিফলিত হয়েছে তার বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. আমাদের দেশের শিক্ষায় ইমরানের কর্মকাণ্ডের প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩. **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

সাব্বির সিঙ্গাপুরে বেড়াতে গেলে তার চাচা তাকে নিয়ে সায়েন্স পার্কে যায়। সেখানে প্রবেশের জন্য গেটে আঙ্গুল ব্যবহৃত হয়। এরপর তারা আরেকটি স্থানে গিয়ে দেখল, সেখানে প্রবেশের জন্য চোখ ব্যবহৃত হয়। অতঃপর তারা সায়েন্স পার্কের প্লে জোনে গিয়ে বিশেষ ধরনের হেলমেট ও চশমা পরে অনেক্ষণ মজা করে ড্রাইভিং করে।

ক. ন্যানোটেকনোলজি কী? ১

খ. তথ্য প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতায় ডায়াবেটিস রোগীরা কীভাবে উপকৃত হচ্ছে? ২

গ. উদ্দীপকের প্লে জোনে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের গেটে এবং আরেকটি স্থানে ব্যবহৃত প্রযুক্তির মধ্যে কোনটি অধিকতর ব্যবহৃত হচ্ছে—বিশ্লেষণপূর্বক তোমার মতামত দাও। ৪

৪. **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

১ম বর্ষের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে অধ্যক্ষ মহোদয় বললেন, "নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হতে হবে। একজনের উপস্থিতি যেন অন্য কেউ দিতে না পারে, তার জন্য বিশেষ যন্ত্র আছে। শুধু তাই নয়, ক্লাসে উপস্থিত না হলে অভিভাবক তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাথে সাথে জেনে যাবেন।"

ক. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কী? ১

খ. "প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদে প্রাক্ ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ সম্ভব"— কীভাবে? ২

গ. কলেজে নিয়মিত উপস্থিতি নির্ণয়ের পদ্ধতিটি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. "তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব"—উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা কর। ৪

৫. **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

কৃষি গবেষক ড. ফয়সাল আবিস্কৃত বীজ চাষ করে একজন কৃষক পূর্বের ফলনের চেয়ে অধিক ফলন ঘরে তুলল। ড. ফয়সাল একবার ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হন এবং চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। ডাঃ জামিল ও তাঁর দল অপারেশনের পূর্বে বিশেষ ধরনের হেলমেট পরে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তির মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন। এই ধরনের জটিল ব্রেন টিউমার অপারেশন এ দেশে এর আগে আর হয়নি।

ক. ক্রায়োসার্জারি কী? ১

খ. বায়োইনফরম্যাটিক্সে ব্যবহৃত ডেটা বলতে কী বোঝ? ২

গ. ড. ফয়সালের গবেষণায় কোন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ডাঃ জামিলের কার্যক্রমের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৬. **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

রাজিব শিক্ষা সফরে ঢাকা এসে বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার পরিদর্শনে যায়। সেখানে সে কৃত্রিম পরিবেশে সৌর দৃশ্যাবলি অবলোকন করে। রাজিব মহাকাশ ভ্রমণরত একজন নভোচারীর মত রোমাঞ্চকর অনুভূতি অনুভব করল। পরবর্তীতে রাজিব তার বন্ধুদের সাথে তার অভিজ্ঞতা বিনিময় করে এবং তারা একটি মহাকাশ জ্ঞানচর্চা নামে ক্লাব গড়ে তোলে।

ক. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কী? ১

খ. বায়োমেট্রিক্স একটি আচরণীক বৈশিষ্ট্যনির্ভর প্রযুক্তি কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কোন প্রযুক্তিটি ব্যবহার করা হয়েছে তার বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. রাজিবের ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির প্রভাব যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৭. **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

দৃশ্যকল্প-১ : আসিফ কুয়াকাটা বেড়াতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে ঢাকায় অবস্থানরত একজন চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তিনি আসিফকে দ্রুত হাসপাতালে যেতে পরামর্শ দিলেন। পরে হাসপাতালের চিকিৎসক ঢাকার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তাকে ঢাকার হাসপাতালে প্রেরণ করে।

দৃশ্যকল্প-২ : কম্পিউটার প্রশিক্ষিত সুমি → ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে চাকুরী → স্বাবলম্বী → দেশের উন্নয়ন

ক. ই-মেইল কী? ১

খ. নিরাপত্তায় বায়োমেট্রিক্স প্রযুক্তির অবদান বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন প্রযুক্তির উল্লেখ করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর প্রবাহ চিত্রের আলোকে তথ্য প্রযুক্তির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮. **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

সাভারের রানা প্লাজা ধ্বসে নিহত বহু পোশাক শ্রমিকের পরিচয় প্রাথমিক অবস্থায় শনাক্ত করা যাচ্ছিল না। পরবর্তীতে সরকারের সদিচ্ছায় উচ্চ প্রযুক্তির মাধ্যমে অধিকাংশ লাশ শনাক্ত করা সম্ভব হয়।

ক. ন্যানো টেকনোলজি কী? ১

খ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কীভাবে মানুষকে সহায়তা দিচ্ছে? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের লাশ শনাক্তকরণের জন্য গৃহীত পদ্ধতি চিহ্নিত করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ঝুঁকি কমিয়ে আনা সম্ভব— বিশ্লেষণ কর। ৪

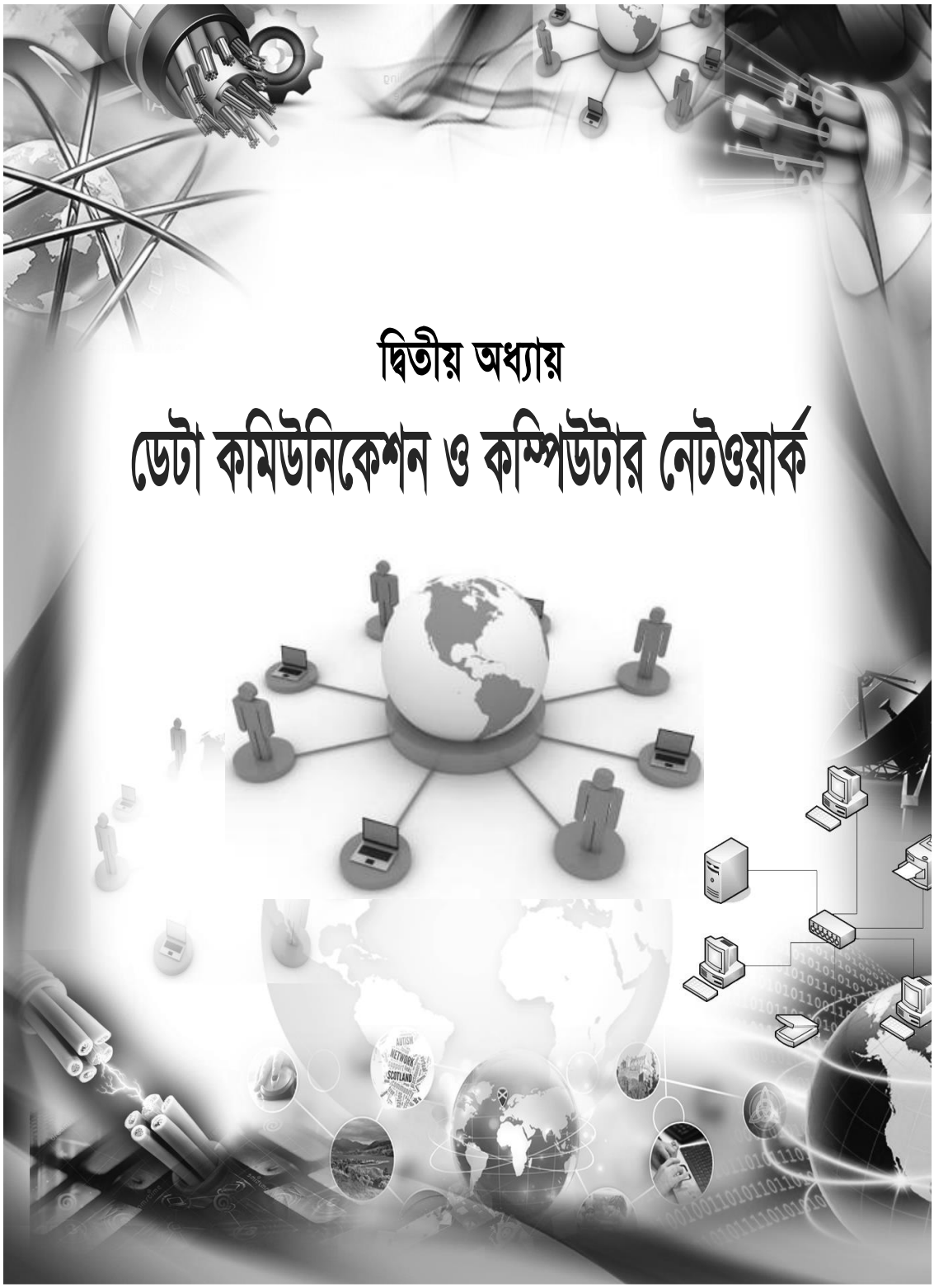

দ্বিতীয় অধ্যায়

ডেটা কমিউনিকেশন ও কম্পিউটার নেটওয়ার্ক

দ্বিতীয় অধ্যায়

ডেটা কমিউনিকেশন ও কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং

Data Communication and Computer Networking

পিরিয়ড সংখ্যা : ১৫

শিখনফল	বিষয়বস্তু
• কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে। • ডেটা কমিউনিকেশনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • ডেটা কমিউনিকেশন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে পারবে। • ডেটা ট্রান্সমিশন মোডের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবে।	• ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম ○ কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা ○ ডেটা কমিউনিকেশনের ধারণা ○ ব্যান্ডউইথ (Bandwidth) ○ ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড ○ ডেটা ট্রান্সমিশন মোড
• ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যমসমূহের মধ্যে তুলনা করতে পারবে। • ডেটা কমিউনিকেশনে অপটিক্যাল ফাইবারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।	• ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম (Medium of data communication) ○ তার মাধ্যম (Wired) ■ কো–এক্সিয়াল ক্যাবল ■ টুইস্টেড পেয়ার (Twisted pair) ■ অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল (Optical fiber cable) ○ তারবিহীন মাধ্যম (Wireless) ■ রেডিও ওয়েভ ■ মাইক্রোওয়েভ ■ ইনফ্রারেড
• ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের বিভিন্ন মাধ্যমসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে।	• ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম (Wireless Communication System) ○ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের প্রয়োজনীয়তা ○ ব্লু–টুথ (Bluetooth) ○ ওয়াই–ফাই (Wi–fi) ○ ওয়াই–ম্যাক্স (Wi–Max)
• বিভিন্ন প্রজন্মের মোবাইল ফোনের ডেটা কমিউনিকেশন পদ্ধতির মধ্যে তুলনা করতে পারবে। • তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করতে পারবে।	• মোবাইল যোগাযোগ (Mobile Communication) ○ মোবাইল ফোন প্রজন্ম
• নেটওয়ার্কের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • নেটওয়ার্কের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। • বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করতে পারবে। • নেটওয়ার্ক টপোলজি ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং (Computer Networking) ○ নেটওয়ার্কের ধারণা (Concept of Network) ○ নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য (Objectives of Network) ○ নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ/ কার্যাবলি (Types of Network /Activities) ○ নেটওয়ার্কের ডিভাইস (Network Devices) মডেম, হাব, সুইচ, রাউটার, গেটওয়ে, রিপিটার, ব্রিজ ○ নেটওয়ার্কের কাজ (Functions of Network) • নেটওয়ার্ক টপোলজি (Network Topology)
• ক্লাউড কম্পিউটিং–এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • ক্লাউড কম্পিউটিং–এর সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• ক্লাউড কম্পিউটিং (Cloud Computing) ○ ক্লাউড কম্পিউটিং–এর সংজ্ঞা ○ ক্লাউড কম্পিউটিং–এর সুবিধা

১. ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম (Data Communication System)

১.১ কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা (Concept of Communication System)

এক পক্ষ হতে অন্য পক্ষে কোনো মাধ্যমের দ্বারা তথ্য প্রবাহের প্রক্রিয়াকে কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ বলা হয়। কমিউনিকেশন হলো মেসেজ প্রেরণ ও গ্রহণের ক্ষমতা। যে ব্যক্তি নিজের চিন্তাভাবনা ও আইডিয়াগুলোকে অন্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য তাদের কাছে তথ্যকে পাঠিয়ে দিলেন তিনি হলেন সেন্ডার বা প্রেরণকারী (প্রথম পক্ষ)। যে ব্যক্তি প্রেরণকারীর কাছ থেকে তথ্যটি গ্রহণ করলেন এবং সে অনুযায়ী সাড়া দিলেন ও তাকে ফিডব্যাক পাঠালেন তাকে রিসিভার বা গ্রহণকারী বলা হয় (দ্বিতীয় পক্ষ)। কমিউনিকেশন বা যোগাযোগের প্রক্রিয়ায় বক্তা যা বলেছে হুবহু সে তথ্যটিকে অবশ্যই গ্রহণকারীর কাছে পৌঁছতে হয়। গ্রহণকারী যদি বক্তার প্রতি কোনো ধরনের ফিডব্যাক দিতে ব্যর্থ হয়, তবে সে কমিউনিকেশন বা যোগাযোগকে অকার্যকর ও অসম্পূর্ণ বলে গণ্য করা হয়।

বিভিন্ন ধরনের কমিউনিকেশন সিস্টেম (Different types of Communication System)

যোগাযোগের ধরন অনুযায়ী কমিউনিকেশনকে নিম্নোক্তভাগে ভাগ করা যায়–

ক. **বায়োলজিক্যাল কমিউনিকেশন বা জৈবিক যোগাযোগ :** সকল ধরনের কমিউনিকেশন যেখানে শরীরের বিভিন্ন অংশ যেমন– মস্তিষ্ক, স্বরযন্ত্র, কান, বাহু এবং হাত ইত্যাদি ব্যবহার করে মেসেজসমূহকে সঞ্চালন ও গ্রহণ করা হয়।

খ. **গ্রাফিক কমিউনিকেশন :** সকল ধরনের কমিউনিকেশন যেখানে ছবি ও চিহ্নের মাধ্যমে মেসেজসমূহকে ভিজ্যুয়ালি প্রেরণ ও গ্রহণ করা হয়।

গ. **ওয়েভ কমিউনিকেশন :** সকল ধরনের কমিউনিকেশন যা মেসেজকে একটি শক্তির উৎস দ্বারা বহন করে– যেটি বায়ু, পানি, মহাশূন্যে কিংবা ইথারে বিচরণ করে।

ঘ. **টেলিকমিউনিকেশন :** দূরবর্তী স্থানে যোগাযোগের পদ্ধতি। যেমন– টেলিফোন, মোবাইল ফোন, টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদি। যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কমিউনিকেশন সিস্টেম বলতে মূলত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকেই বুঝানো হয়। ব্যক্তি ও বস্তুর নিরিখে কমিউনিকেশনকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি
২. ব্যক্তি থেকে যন্ত্র
৩. যন্ত্র থেকে ব্যক্তি
৪. যন্ত্র থেকে যন্ত্র

দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে কমিউনিকেশন সিস্টেম পাঁচ ধরনের। যথা–

১. **অপটিক্যাল কমিউনিকেশন সিস্টেম (Optical Communication System) :** এ পদ্ধতিটি অপটিক্যাল বা আলোর উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে ট্রান্সমিটারটি তথ্যকে একটি আলোক সংকেতে রূপান্তর করে এবং তারপর সিগন্যালটি গ্রহণকারীর কাছে যায়। গ্রহণকারী তখন সিগন্যালটিকে ডিকোড করে সে অনুযায়ী সাড়া দেয়।

২. **রেডিও কমিউনিকেশন সিস্টেম (Radio Communication System) :** এ সিস্টেমটি একটি ট্রান্সমিটার ও একটি রিসিভার–এর সহায়তায় কাজ করে, যাদের উভয়টিতেই এন্টেনা যুক্ত থাকে। এন্টেনার সহায়তায় ট্রান্সমিটারটি সিগন্যাল তৈরি করে রেডিও ক্যারিয়ার ওয়েভের মাধ্যমে বাহিত হয়। অন্যদিকে রিসিভারটিও তার এন্টেনার মাধ্যমে সিগন্যালটিকে গ্রহণ করে।

৩. **ডুপ্লেক্স কমিউনিকেশন সিস্টেম (Duplex Communications System) :** ডুপ্লেক্স কমিউনিকেশন সিস্টেমে দু'টি যন্ত্র একে অন্যের সাথে উভয় দিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে যোগাযোগ করতে পারে।

৪. **হাফ ডুপ্লেক্স কমিউনিকেশন সিস্টেম (Half Duplex Communication System) :** এ ক্ষেত্রে কোন প্রান্ত একই সময়ে কেবল ডেটা গ্রহণ অথবা প্রেরণ করতে পারে, কিন্তু গ্রহণ এবং প্রেরণ একই সময়ে করতে পারে না।

৫. **ট্যাকটিক্যাল কমিউনিকেশন সিস্টেম (Tactical Communication System) :** এ মোডে চারপাশের পরিবেশের অবস্থা এবং অন্যান্য পরিস্থিতির পরিবর্তনের উপর কমিউনিকেশন নির্ভর করে।

উপরের সবগুলো কমিউনিকেশন মোডই সাধারণ একটি উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে, আর তা হলো তথ্যকে একপক্ষ হতে অন্যপক্ষে প্রেরণ করা। কমিউনিকেশন সিস্টেমের বিভিন্ন মোডগুলো আমাদেরকে তথ্য প্রবাহের রুটটিকে বুঝতে সহায়তা করে, যা প্রেরকের কাছ থেকে কিছু মাধ্যমের দ্বারা গ্রাহকের কাছে পৌঁছে।

১.২ ডেটা কমিউনিকেশনের ধারণা (Conception of Data Communication)

এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে কিংবা এক ডিভাইস থেকে অন্য কোনো ডিভাইসে (মোবাইল, স্মার্টফোন, পার্সোনাল ডিজিটাল অ্যাসিসটেন্ট, জিপিএস নেভিগেটর ইত্যাদি) তথ্য আদান-প্রদান তথা তথ্য বিনিময়কে বলা হয় ডেটা কমিউনিকেশন (Data Communication) বা ডেটা স্থানান্তর। ডেটা কমিউনিকেশনের কোনো না কোনো পর্যায়ে সরাসরি কম্পিউটার জড়িত থাকে। আধুনিক ডেটা কমিউনিকেশনের প্রধান উপাদান বা কম্পোনেন্ট দু'টো হচ্ছে কম্পিউটার এবং ডেটা ট্রান্সমিশন সিস্টেম। কম্পিউটারকে বলা হয় ডেটা প্রসেসিং (Data Processing) ডিভাইস। কম্পিউটার কর্তৃক উৎপন্ন বা প্রসেসকৃত ডেটা এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছে যাওয়ার প্রক্রিয়াই হলো ট্রান্সমিশন সিস্টেম। ট্রান্সমিশন সিস্টেমের উপাদানগুলো হচ্ছে মডেম, ট্রান্সমিটার, সুইচ, রিসিভার ইত্যাদি।

ডেটা কমিউনিকেশনের উপাদান (Components of Data Communication) :

একটি ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম সাধারণত পাঁচটি উপাদান নিয়ে গঠিত হয়।

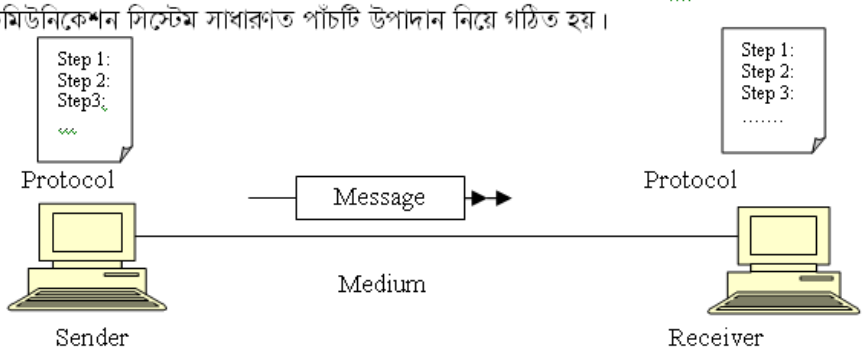

চিত্র : ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমের পাঁচটি উপাদান

১. **মেসেজ (Message) :** যা পাঠানো হয়। মেসেজ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন– টেক্সট, ছবি, অডিও/সাউন্ড, ভিডিও ইত্যাদি।

২. **প্রেরক (Sender) :** প্রেরক হলো এক ধরনের ডিভাইস, যা ডেটা/ম্যাসেজ প্রেরণ করে। বিভিন্ন ধরনের প্রেরক ডিভাইস হতে পারে। যেমন– কম্পিউটার,ওয়ার্কস্টেশন, টেলিফোনসেট ইত্যাদি।

৩. **প্রাপক (Receiver) :** প্রাপক হলো এমন এক ধরনের ডিভাইস, যা বার্তা গ্রহণ করে। বিভিন্ন ধরনের প্রাপক ডিভাইস হতে পারে। যেমন– কম্পিউটার, ওয়ার্কস্টেশন টেলিফোনসেট ইত্যাদি।

৪. **মাধ্যম (Medium) :** মাধ্যম হচ্ছে পাথ (physical or wireless), যার মাধ্যমে প্রেরক ডিভাইস থেকে প্রাপক ডিভাইসে ডেটা পাঠানো হয়। যেমন– টুইস্টেড পেয়ার, কো–এক্সিয়াল ক্যাবল, ফাইবার অপটিক ক্যাবল বা রেডিও ওয়েভ ইত্যাদি।

৫. **প্রোটোকল (Protocol) :** প্রোটোকল হচ্ছে নিয়মকানুন যা কমিউনিকেটিং ডিভাইসগুলো মেনে চলে।

কম্পিউটার হলো ডেটা প্রসেসিং ডিভাইস। কম্পিউটার কর্তৃক প্রসেসকৃত ডেটা ট্রান্সক্রিপট সিস্টেম–এর মাধ্যমে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে যায়। ডেটা ট্রান্সক্রিপট সিস্টেম–এর উপাদান হলো–মডেম, ট্রান্সমিটার, সুইস, রিসিভার ইত্যাদি।

১.৩ ব্যান্ডউইথ (Bandwidth)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন চ্যানেল দিয়ে যে পরিমাণ ডেটা স্থানান্তরিত হয় তার পরিমাণকে ব্যান্ডউইথ হিসেবে পরিমাপ করা হয়। ডেটা ট্রান্সমিশন–এর একককে bps (bit per second)-এ হিসাব করা হয়। অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ ডেটা বিট স্থানান্তরিত হয় তাকে bps বলে। এটিকে Band বা Bandwidth বলা হয়। বিভিন্ন ধরনের ইন্টারনেট সার্ভিসের স্পিড বুঝাতে ব্যান্ডউইথ হিসাব ব্যবহৃত হয়। উচ্চ-ব্যান্ডউইথ হলে দ্রুতগতির সার্ভিস পাওয়া যায়। ডায়াল-আপ ইন্টারনেট সার্ভিস হলো কম–ব্যান্ডউইথ (low-bandwidth) কানেকশন। ব্রডব্যান্ড যেমন : ডিএসএল, ক্যাবল এবং স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সার্ভিস হলো উচ্চ–ব্যান্ডউইথ (high-bandwidth) কানেকশন। অনেক ডিএসএল সার্ভিস প্রোভাইডাররা উচ্চ–ব্যান্ডউইথ যেমন ৭৬৮ কেবিপিএস বা তার চেয়েও বেশি অফার করে। ক্যাবল ইন্টারনেট সার্ভিস শুরু হয় ১ এমবিপিএস দিয়ে এবং ৩০ এমবিপিএস পর্যন্ত স্পিড দিয়ে থাকে। উচ্চ ব্যান্ডউইথ ইন্টারনেট কানেকশন থাকলে অনেক বেশি ডেটা দ্রুত সময়ে ডাউনলোড ও আপলোড করা যায়, ইন্টারনেটে স্বাচ্ছন্দ্যে ভিডিও দেখা যায় এবং অডিও শোনা যায়।

ব্যান্ডউইথ একক হিসাব (Units of Bandwidth Measurement)

প্রতি সেকেন্ডে বিট ডেটা স্থানান্তরিত হওয়ার হারকে bps বলে। তথ্যের ক্ষুদ্রতম একক হলো বিট (Bit)। Bit এর পুরো নাম Bynary Digit । এক বিট সমান বাইনারি তথ্য 0 বা 1 । ৮ বিটে এক বাইট (Byte) সমান এক ক্যারেক্টার।

- bps অর্থ হলো bit per second (1 বিট = 1 বা 0)
- kbps হলো kilobits per second (1024 বিটে =1 কিলোবিট)
- Mbps হলো megabits per second (1024 কিলোবিট =1 মেগাবিট)
- Gbps হলো gigabits per second (1024 মেগাবিট =1 গিগাবিট)
- Tbps হলো Terabits per second (1024 গিগাবিট =1 টেরাবিট)

সমস্যা ঃ একটি চ্যানেল দিয়ে 3 সেকেন্ডে 8100 বিট স্থানান্তরিত হলে তার ব্যান্ডউইথ কত?

সমাধান ঃ 3 সেকেন্ডে স্থানান্তরিত হয় 8100 বিট
1 সেকেন্ডে স্থানান্তরিত হয় 8100 ÷ 3 = 2700 বিট
সুতরাং, ব্যান্ডউইথ = 2700 bps.

কমিউনিকেশন গতির শ্রেণিবিভাগ

ডেটা ট্রান্সফার গতির উপর ভিত্তি করে কমিউনিকেশন গতিকে তিন ভাগে ভাগ হয়। যথা–

১. ন্যারোব্যান্ড (Narrowband)
২. ভয়েসব্যান্ড (Voiceband)
৩. ব্রডব্যান্ড (Broadband)

ন্যারোব্যান্ড (Narrowband)

ন্যারোব্যান্ড সাধারণত ৪৫ থেকে ৩০০ bps পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই ব্যান্ড ধীর গতিসম্পন্ন ডেটা ট্রান্সমিশন–এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত টেলিফোনির ক্ষেত্রে এই ব্যান্ডটির ব্যবহার অধিক লক্ষ করা যায়। টেলিফোনির ক্ষেত্রে ন্যারোব্যান্ড সাধারণত ৩০০ থেকে ৩৪০০ হার্টজ (Hz) ফ্রিকুয়েন্সি প্রদান করে থাকে।

ভয়েসব্যান্ড (Voiceband)

ভয়েসব্যান্ডের গতি সাধারণত 9600 bps পর্যন্ত হয়ে থাকে। এটি সাধারণত টেলিফোনে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। টেলিফোন লাইনে এই ব্যান্ডে সাধারণত 200 থেকে 3600 হার্টজ ফ্রিকুয়েন্সিতে তথ্য স্থানান্তর করা যায়। টেলিফোনির ক্ষেত্রে ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং এ সাধারণত 4 কিলোহার্টজ ক্যারিয়ার স্পেসিং ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কম্পিউটার থেকে প্রিন্টারে অথবা কার্ড রিডার থেকে কম্পিউটারে ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রেও ভয়েসব্যান্ড ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ব্রডব্যান্ড (Broadband)

উচ্চ গতিসম্পন্ন ডেটা স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় ব্রডব্যান্ড ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ব্রডব্যান্ডে বিস্তৃত ব্যান্ডউইথ এবং অধিক তথ্য বহনের ক্ষমতা থাকে। এ ব্যান্ডের গতি 1 mbps (মেগাবিট/সেকেন্ড) বা এর চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। সাধারণত ডিজিটাল সাবস্ক্রাইবার লাইন বা ডিএসএল, রেডিওলিঙ্ক, অপটিক্যাল ফাইবার, মাইক্রোওয়েভ এবং স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে ডেটা স্থানান্তরে এ ব্যান্ড ব্যবহার করা হয়।

১.৪ ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড (Methods of Data Transmission)

ডেটা ট্রান্সমিশন হচ্ছে ডেটা পরিবহন বা ডেটা স্থানান্তর। **যে পদ্ধতিতে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে ডেটা ট্রান্সমিট হয় তাকে ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড বলা হয়।** ডেটা ট্রান্সমিশন হওয়ার সময় প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে এমন একটি সমঝোতা দরকার যাতে সিগন্যাল বিটের শুরু ও শেষ বুঝতে পারে। বিটের শুরু ও শেষ বুঝতে না পারলে প্রাপক কম্পিউটার সে সিগন্যাল থেকে ডেটা পুনরুদ্ধার করতে পারবে না। এ সিগন্যাল পাঠানোর সময় বিভিন্ন বিটের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিকে বলা হয় বিট সিনক্রোনাইজেশন। বিট সিনক্রোনাইজেশনের উপর ভিত্তি করে ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলোকে ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড বলে। যথা–

১. অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Asynchronous Transmission)
২. সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Synchronous Transmission)
৩. আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Isochronous Transmission)

অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Asynchronous Transmission)

যে পদ্ধতিতে প্রেরক কম্পিউটার হতে ডেটা গ্রাহক কম্পিউটারে ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ট্রান্সমিট হয় তাকে অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন বলে। এক্ষেত্রে প্রেরক কম্পিউটার ডেটা ট্রান্সমিট করার ঠিক আগের মুহূর্তে ডেটা ক্যাবল বা মিডিয়াতে একটি একক স্টার্ট (Start) বিট ছেড়ে দেয়। প্রাপক কম্পিউটার যে মুহূর্তে স্টার্ট বিটের উপস্থিতি টের পায়, তখন সে তার অভ্যন্তরীণ ঘড়িটি (Clock) চালু করে দেয়। প্রেরক কম্পিউটার থেকে কোন প্রকার স্টপ বিট না পাওয়া গেলে এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। অ্যাসিনক্রোনাস পদ্ধতিতে ৮ বিটের ক্যারেক্টার ডেটাকে ট্রান্সমিশনের পূর্বে তার সম্মুখে একটি স্টার্ট বিট এবং শেষে একটি বা দু'টি স্টপ বিট সংযুক্ত হয়ে প্রতিটি ক্যারেক্টার ১০ অথবা ১১ বিটের ডেটায় রূপান্তরিত হয়ে ট্রান্সমিট হয়। অল্প করে ডেটা পরিবহণের দরকার পড়ে এমন পরিবেশে যেমন, ইন্টারনেটে এ পদ্ধতি বেশি উপযোগী। এতে প্রেরকের কোন প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয় না। পর পর দুটি ক্যারেক্টার ট্রান্সমিটের মাঝের বিরতি সময় সমান হয় না।

স্টার্ট বিট	৮ বিট ক্যারেক্টার	স্টপ বিট

চিত্র : অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে একটি ক্যারেক্টার পাঠানোর জন্য সিগন্যাল

অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের বৈশিষ্ট্যাবলি/ সুবিধাসমূহ (Features/Advantages of Asynchronous Transmission)

১. কাছাকাছি কম করে ডেটা ট্রান্সমিশনে দরকার পড়ে এমন পরিবেশে যেমন, ইন্টারনেটে এই পদ্ধতি বেশি উপযোগী।
২. এতে প্রেরক যেকোন সময় ডেটা পাঠাতে পারে এবং গ্রাহক তা গ্রহণ করতে পারে।
৩. প্রেরকের কোন প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয় না।
৪. ইন্সটলেশন খরচ অত্যন্ত কম এবং জটিল সার্কিট ছাড়াই বাস্তবায়ন করা যায়।

অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের অসুবিধা (Disadvantages of Asynchronous Transmission)

১. প্রতিটি বর্ণের সাথে একটি স্টার্ট বিট ও একটি স্টপ বিট প্রেরণ করতে হয়।
২. একবারে বেশি ডেটা পাঠানো যায় না।
৩. এতে অতিরিক্ত বিট ব্যবহার করা হয় বলে এটি সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের চেয়ে কম দক্ষ।
৪. এতে ডেটা ট্রান্সমিশনের গতি কম।
৫. ডেটা স্থানান্তরের কাজ বন্ধ থাকা অবস্থায় এটির ট্রান্সমিশন মাধ্যমটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে।
৬. ডেটা চলাচল বন্ধ থাকার সময় মাধ্যমটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে।

অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের ব্যবহার (Application of Asynchronous Transmission)

১. কম্পিউটার হতে প্রিন্টারে ডেটা স্থানান্তরে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।
২. কিবোর্ড হতে কম্পিউটারে ডেটা স্থানান্তরে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।
৩. স্যাটেলাইট বা মাইক্রোওয়েভের ক্ষেত্রে ট্রান্সমিশন বন্ধ থাকলে তা ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে।
৪. পাঞ্চকার্ড রিডার হতে কম্পিউটারে এবং কম্পিউটার হতে কার্ড পাঞ্চারে ডেটা স্থানান্তরে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Synchronous Transmission)

যে পদ্ধতিতে প্রথমে প্রেরক স্টেশনের প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইসে ডেটাকে সংরক্ষণ করা হয় এবং অতঃপর ডেটার ক্যারেক্টরসমূহকে ব্লক (যাকে প্যাকেটও বলা হয়) আকারে ভাগ করে সমান বিরতিতে প্রতিবারে একটি করে ব্লক ট্রান্সমিট করা হয় তাকে সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন বলে। প্রতিটি ব্লকে কমপক্ষে ৮০ থেকে ১৩২টি ক্যারেক্টর থাকে। এ পদ্ধতিতে প্রেরক কম্পিউটার ডেটা প্যাকেটের সাথে কতিপয় টাইমিং সিগন্যাল জুড়ে দেয়। ডেটা ক্যাবলের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে যদি কোন ক্রমের মধ্যে কোন ত্রুটি সৃষ্টি হয় বা মান অক্ষুণ্ন না থাকে তাহলে ঐ টাইমিং সিগন্যালের (ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চিহ্ন) রূপ পরিবর্তিত হয়। এর মাধ্যমে ক্যাবলের মধ্য দিয়ে চলাচলকারী ডেটার মান নিশ্চিত করা হয়। স্টার্ট ও স্টপ বিট না থাকায় এবং অনবরত চলতে থাকায় এর গতি অনেক দ্রুত হয়। প্রতিটি ব্লক ডেটার শুরুতে একটি হেডার ইনফরমেশন ও শেষে একটি টেইলর ইনফরমেশন সিগন্যাল পাঠানো হয়।

সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের বৈশিষ্ট্যাবলি/সুবিধা (Features/Advantages of Synchronous Transmission)

১. প্রতিটি ক্যারেক্টারের শুরু ও শেষে স্টার্ট এবং স্টপ বিটের প্রয়োজন না হওয়ায় প্রতিটি ক্যারেক্টারের পর টাইম ইন্টারভেলেরও প্রয়োজন হয় না। একবারে অনেক তথ্য পাঠানো যায়।
২. স্টার্ট ও স্টপ বিট না থাকায় এবং অনবরত চলতে থাকায় এর ট্রান্সমিশন গতি অনেক দ্রুত হয়।
৩. এর দক্ষতা অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের চেয়ে বেশি।
৪. সময় তুলনামূলক কম লাগে।

সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের অসুবিধা (Disadvantages of Synchronous Transmission)

১. প্রেরক স্টেশনে প্রেরকের সাথে একটি প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয়।
২. এটি তুলনামূলক ব্যয়বহুল।
৩. সার্কিট বেশ জটিল হয়।

সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের ব্যবহার (Application of Synchronous Transmission)

১. কম্পিউটার হতে কম্পিউটারে ডেটা কমিউনিকেশনে সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।
২. একস্থান থেকে দূরবর্তী কোন স্থানে ডেটা স্থানান্তরে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
৩. এক কম্পিউটার হতে একই সময়ে অনেকগুলো কম্পিউটারে ডেটা ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে এটি একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি।

অ্যাসিনক্রোনাস ও সিনক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশন সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্য

অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন	সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন
১. এ পদ্ধতিতে প্রেরক কম্পিউটার হতে ডেটা গ্রাহক কম্পিউটারে ক্যারেক্টার–বাই–ক্যারেক্টার ট্রান্সমিট হয়।	১. এ পদ্ধতিতে প্রথমে প্রেরক স্টেশনের প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইসে ডেটাকে সংরক্ষণ করা হয় এবং অতঃপর ডেটার ক্যারেক্টারসমূহকে ব্লক আকারে ভাগ করে প্রতিবারে একটি করে ব্লক ট্রান্সমিট করা হয়।
২. এতে অতিরিক্ত বিট ব্যবহার করা হয় বলে এই ট্রান্সমিশনের দক্ষতা কম।	২. এর দক্ষতা অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের চেয়ে বেশি।
৩. এতে ডেটা ট্রান্সমিশনের গতি কম।	৩. ডেটা ট্রান্সমিশনের গতি অনেক দ্রুত হয়।
৪. প্রেরকের কোন প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয় না।	৪. প্রেরক স্টেশনে প্রেরকের সাথে একটি প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয়।
৫. ইন্সটলেশন খরচ অত্যন্ত কম।	৫. এটি তুলনামূলক ব্যয়বহুল।
৬. এ পদ্ধতিতে ট্রান্সমিট সময় বেশি লাগে।	৬. এ পদ্ধতিতে ট্রান্সমিট সময় কম লাগে।
৭. এ পদ্ধতিতে প্রতিটি ক্যারেক্টারের শুরু ও শেষে স্টার্ট এবং স্টপ বিটের প্রয়োজন হয়।	৭. এ পদ্ধতিতে স্টার্ট এবং স্টপ বিটের প্রয়োজন পড়ে না। প্রতি ব্লক ডেটার শুরুতে একটি হেডার ইনফরমেশন এবং শেষে একটি টেইলর ইনফরমেশন থাকে।

আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Isochronous Transmission)

এ পদ্ধতিতে প্রেরক ও প্রাপক স্টেশনের মধ্যে ডেটা ট্রান্সমিশন ডিলে সর্বনিম্ন রাখা হয়। অর্থাৎ পর পর দুটি ব্লকের ডেটা ট্রান্সফারের সময় প্রায় ০ (শূন্য) একক সময় করবার চেষ্টা করা হয়। আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশনকে সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের উন্নত সংস্করণও বলা যেতে পারে। সাধারণত রিয়েল টাইম এপ্লিকেশনের ডেটা ট্রান্সফারে এই পদ্ধতি বেশি ব্যবহৃত হয়।

সিরিয়াল ও প্যারালাল ট্রান্সমিশন (Serial and Parallel Transmission)

প্রতিবারে একসাথে কতটি বিট ডেটা পাঠানো যাবে তার উপর ভিত্তি করে ডেটা ট্রান্সমিশন দুই ধরনের। যথা–

১. **সিরিয়াল ট্রান্সমিশন (Serial Transmission) :** এ ধরনের ট্রান্সমিশনে প্রতিবারে সাত বিটের তথ্য পাঠানো হয়। উৎস থেকে গন্তব্যের দূরত্ব বেশি হলে এ পদ্ধতি বেশি ব্যবহার করা হয়।

২. **প্যারালাল ট্রান্সমিশন (Parallel Transmission) :** এ পদ্ধতিতে অনেকগুলো তার দিয়ে একসাথে অনেকগুলো বিট ডেটা পাঠানো হয়। দূরত্ব বেশি হলে খরচ বেশি হয়।

১.৫ ডেটা ট্রান্সমিশন মোড (Data Transmission Mode)

কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে ডেটা কমিউনিকেশন–এর সময় প্রেরক থেকে প্রাপকে ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ডেটার প্রবাহের দিককে ডেটা ট্রান্সমিশন মোড হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ডেটা স্থানান্তরের প্রবাহের উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ দিকের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ডেটা ট্রান্সমিশন মোডকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

ক. সিমপ্লেক্স (Simplex)

খ. হাফ–ডুপ্লেক্স (Half–Duplex)

গ. ফুল–ডুপ্লেক্স (Full–Duplex)

ক. সিমপ্লেক্স (Simplex)

ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ডেটার একদিকে প্রবাহকে সিমপ্লেক্স মোড বলা হয়। এ পদ্ধতিতে একটি প্রেরক কম্পিউটার সবসময় অন্য কম্পিউটারে ডেটা পাঠায় এবং প্রাপক ডেটা গ্রহণ করে। যেমন– নিচের চিত্রে ক হতে খ–এর দিকে ডেটা প্রেরণ করা যাবে, কিন্তু খ হতে ক–এর দিকে ডেটা প্রেরণ করা যাবে না। উদাহরণ– PABX সিস্টেম, রেডিও, টিভি ইত্যাদি।

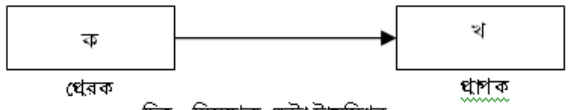

চিত্র : সিমপ্লেক্স ডেটা ট্রান্সমিশন

খ. হাফ–ডুপ্লেক্স (Half–Duplex)

এ পদ্ধতিতে ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে প্রেরক ও প্রাপক উভয়দিক থেকে ডেটা প্রেরণ করা যায়, তবে একই সময়ে তা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে প্রেরক ও প্রাপকের কোন প্রান্ত একই সময়ে শুধু ডেটা গ্রহণ অথবা প্রেরণ করতে পারে, কিন্তু ডেটা গ্রহণ এবং প্রেরণ একই সময়ে করতে পারে না। যেমন– নিচের চিত্রে 'ক' হতে 'খ'–এর দিকে ডেটা প্রেরণ করা যাবে এবং খ হতে ক–এর দিকে ডেটা প্রেরণ করা যাবে, কিন্তু একই সময়ে তা করা যাবে না। ক–এর প্রেরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে খ ডেটা প্রেরণ করতে পারবে এবং ঐ সময়ে ক শুধু ডেটা গ্রহণ করতে পারবে। উদাহরণ–ওয়াকিটকি।

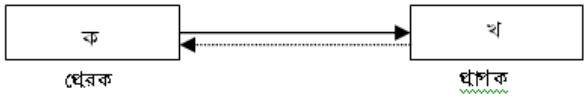

চিত্র : হাফ–ডুপ্লেক্স ডেটা ট্রান্সমিশন

গ. ফুল–ডুপ্লেক্স (Full–Duplex)

এ পদ্ধতিতে ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে প্রেরক ও প্রাপক উভয় দিক থেকে একই সময়ে ডেটা প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়। এক্ষেত্রে যে কোন প্রান্ত একই সময়ে ডেটা প্রেরণ করার সময় ডেটা গ্রহণও করতে পারে। যেমন– নিচের চিত্রে ক হতে খ এর দিকে ডেটা প্রেরণ করা যাবে এবং খ হতে ক–এর দিকে ডেটা প্রেরণ করা যাবে । উদাহরণ– টেলিফোন, মোবাইল।

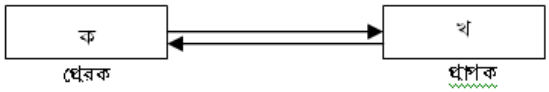

চিত্র : ফুল–ডুপ্লেক্স ডেটা ট্রান্সমিশন

হাফ ডুপ্লেক্স এবং ফুল ডুপ্লেক্স এর মধ্যে পার্থক্য (Difference Between Half Duplex and Full Duplex)

হাফ ডুপ্লেক্স	ফুল ডুপ্লেক্স
১. কোন প্রান্ত একই সময়ে কেবল ডেটা গ্রহণ কিংবা প্রেরণ করতে পারে, কিন্তু গ্রহণ এবং প্রেরণ একই সময়ে একসাথে করতে পারে না।	১. এ পদ্ধতিতে ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে উভয় দিক থেকে একই সময়ে ডেটা প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়।
২. কারিগরিভাবে অসমৃদ্ধ পদ্ধতি।	২. কারিগরিভাবে সমৃদ্ধ পদ্ধতি। এতে চার জোড়া টুইস্টেড ক্যাবল ব্যবহার করা হয়, যার দুই জোড়া ডেটা গ্রহণ এবং দুই জোড়া ডেটা পাঠানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।
৩. ব্যবহার তুলনামূলক জটিল।	৩. ব্যবহার তুলনামূলক সহজ।
৪. উদাহরণ– ওয়াকিটকি	৪. উদাহরণ– টেলিফোন, মোবাইল।

প্রাপকের সংখ্যা ও ডেটা গ্রহণের অধিকারের উপর ভিত্তি করে ডেটা ট্রান্সমিশন মোড তিন প্রকার। যথা–

১. ইউনিকাস্ট (Unicast)
২. ব্রডকাস্ট (Broadcast)
৩. মাল্টিকাস্ট (Multicast)

১. ইউনিকাস্ট (Unicast)

যে ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে একজন প্রেরক থেকে একজন প্রাপকের মধ্যে ডেটা আদান–প্রদান হয়ে থাকে; তাকে ইউনিকাস্ট ট্রান্সমিশন মোড বলা হয়। অনেক প্রাপক এক সাথে ডেটা গ্রহণ করতে পারে না। যেমন–পেজার। ইউনিকাস্ট ট্রান্সমিশনে সিমপ্লেক্স, হাফ–ডুপ্লেক্স, ফুল–ডুপ্লেক্স মোড হয়ে থাকে।

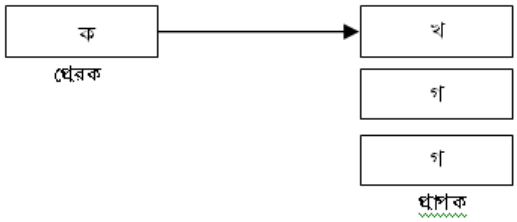

২. ব্রডকাস্ট (Broadcast)

এ ট্রান্সমিশন ব্যবস্থায় নেটওয়ার্কভুক্ত কোন প্রেরক কম্পিউটার (বা নোড) হতে ডেটা ট্রান্সমিট হলে ওই নেটওয়ার্কভুক্ত সকল নোডই (প্রাপক) তা গ্রহণ করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে টেলিভিশন, রেডিও সম্প্রচারের কথা বলা যেতে পারে। টেলিভিশনে কোন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হলে তা সকল টেলিভিশন বা গ্রাহকযন্ত্র একই সাথে গ্রহণ করতে পারে। চিত্রে ক হতে প্রেরিত ডেটা খ, গ এবং ঘ সকল নোডই গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। ব্রডকাস্ট ট্রান্সমিশন শুধুমাত্র সিমপ্লেক্স হয়ে থাকে। যেমন : রেডিও, টিভি।

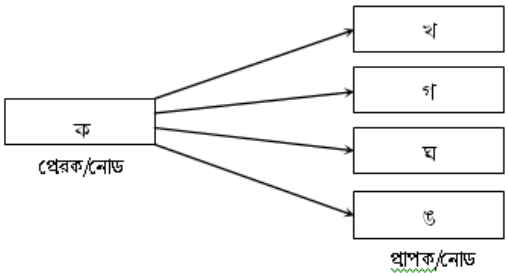

চিত্র : ব্রডকাস্ট সিস্টেম

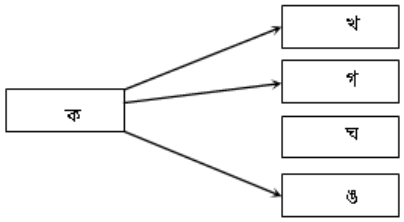

চিত্র : মাল্টিকাস্ট সিস্টেম

৩. মাল্টিকাস্ট (Multicast)

নেটওয়ার্কভুক্ত এটি এমন একটি ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি, যেখানে প্রেরক কম্পিউটার (বা নোড) হতে ডেটা ট্রান্সমিট হলে তা গ্রুপভুক্ত কেবল অনুমোদিত নোড বা নোডসমূহই (প্রাপক) গ্রহণ করতে পারবে। নেটওয়ার্কভুক্ত যেকোন নোডকে এ ব্যবস্থায় ডেটা গ্রহণ হতে বাদ দেয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে টেলিকনফারেন্সিং এবং ভিডিও কনফারেন্সিং–এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। টেলিকনফারেন্সি–এ অংশগ্রহণরত ব্যক্তিদের মধ্যে কেবল নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি ছাড়া অন্যরা এতে অ্যাকসেস করার সুযোগ পায় না। যেমন নিচের চিত্রে ক হতে প্রেরিত ডেটা খ, গ এবং ঙ এর কাছে যাবে, কিন্তু ঘ এর কাছে যাবে না কেবল সে অননুমোদিত হওয়ার ফলে। মাল্টিকাস্ট ট্রান্সমিশনে হাফ–ডুপ্লেক্স, ফুল ডুপ্লেক্স হয়ে থাকে। যেমন: মোবাইলে SMS প্রেরণ, কম্পিউটারে টেক্সট ও ভিডিও চ্যাটিং।

২. ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম (Data Communication Medium)

যার মধ্য দিয়ে উৎস থেকে গন্তব্যে ডেটা ট্রান্সমিশন বা স্থানান্তরিত হয় তাকে ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম বলা হয়। যখন কেউ যোগাযোগ করে বা করতে চায় তখন তাকে কোন না কোন ট্রান্সমিশন মাধ্যমের সাহায্য নিতে হয়।

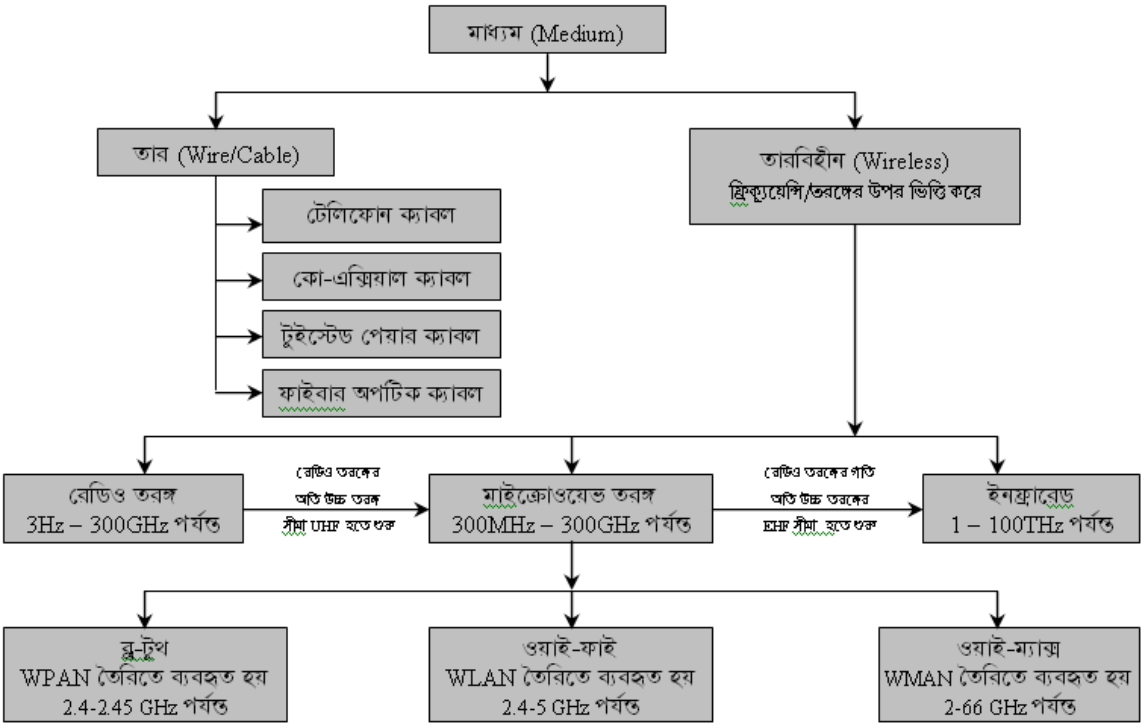

বহুল ব্যবহৃত হয় এমন ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম দুই ধরনের। যথা–

১. **তার মাধ্যম (Wire Medium) :** ক্যাবল/তার, টেলিফোন লাইন, ফাইবার অপটিক লাইন ইত্যাদি।

২. **তারবিহীন বা বেতার মাধ্যম (Wireless Medium) :** বেতার তরঙ্গ, মাইক্রোওয়েভ, ইনফ্রারেড ইত্যাদি।

২.১ ক্যাবল বা তার মাধ্যম (Cable or Wire Medium)

ডেটা কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো ক্যাবল বা তার। ক্যাবল সাধারণত তামা (কপার) ও কাচ (বা স্বচ্ছ প্লাস্টিক) দিয়ে তৈরি হয়। যার মধ্যে দিয়ে ডেটা সিগন্যালগুলো উৎস থেকে গন্তব্যে গমন করতে পারে। স্বল্প দূরত্বের নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে ডেটা স্থানান্তরে ক্যাবল ব্যবহৃত হয়। তবে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (ওয়ান) এর ক্ষেত্রে হাইস্পিড ডেটা কমিউনিকেশনেও ক্যাবল ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারের ধরনভেদে বিভিন্ন নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ক্যাবল বা তার ব্যবহার করা হয়।

ক্যাবল মাধ্যমের প্রকারভেদ (Types of Cable Medium)

নিম্নলিখিত বহুল ব্যবহৃত ক্যাবলগুলো হলো–

ক. কোএক্সিয়াল ক্যাবল (Coaxial Cable)
খ. টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল (Twisted-Pair Cable)
গ. ফাইবার অপটিক ক্যাবল (Fiber Optic Cable)

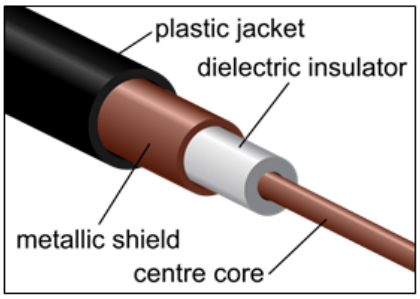

কোএক্সিয়াল হলো এমন এক ধরনের ক্যাবল যার কেন্দ্র দিয়ে থাকে একটি সলিড (Solid) কপার তার এবং তারকে ঘিরে জড়ানো থাকে অপরিবাহী প্লাস্টিক ফোমের ইনস্যুলেশন (Insulation)। ইনস্যুলেশন ফোমের চারপাশ জাল বা নেট আকৃতির তার (metalic shield) দ্বারা সাজানো থাকে এবং বাইরে প্লাস্টিকের জ্যাকেট দিয়ে ঢাকা থাকে। মেটালিক শিল্ডটি তড়িৎ-চুম্বকীয় বাধা থেকে ডেটা সিগন্যালকে রক্ষা করে থাকে। এ ক্যাবল ব্যবহার করে এক কি.মি. পর্যন্ত দূরত্বে ডিজিটাল ডেটা প্রেরণ করা যায়। তবে ডেটা ট্রান্সফার রেট তারের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। কোএক্সিয়াল ক্যাবলের ডেটা ট্রান্সফার রেট 200 Mbps পর্যন্ত হতে পারে এবং ট্রান্সমিশন লস অপেক্ষাকৃত কম। কোএক্সিয়াল ক্যাবল দু'প্রকার। যথা– থিননেট (Thinnet) এবং থিকনেট (Thicknet)

ক. **থিননেট (Thinnet) :** এ ক্যাবলের ব্যাস ০.২৫ ইঞ্চি এবং রিপিটার ছাড়া ১৮৫ মিটার পর্যন্ত দূরত্বে ডেটা পাঠাতে পারে। একে 10 base 2 বলা হয়। এখানে ১০ হল ব্যান্ডউইথ (10 Mbps) এবং ২ ক্যাবলের দৈর্ঘ্য (২০০ মিটার)।

খ. **থিকনেট (Thicknet) :** রিপিটার ছাড়া ৫০০ মিটার পর্যন্ত দূরত্বে ডেটা ট্রান্সফার করতে পারে। একে 10 base 5 বলা হয়। এক্ষেত্রে ডেটা ট্রান্সফার রেট 100 Mbps হতে 2Gbps পর্যন্ত হতে পারে।

কোএক্সিয়াল ক্যাবলের সুবিধা (Advantages of Coaxial Cable)

১. ইউটিপি বা এসটিপি ক্যাবলের তুলনায় সিগন্যাল এটিনিউয়েশনের পরিমাণ কম।
২. ডেটা স্থানান্তর গতি বেশি হয়।
৩. ৫০০ MHz ফ্রিক্যুয়েন্সিতে ডিজিটাল ও অ্যানালগ ডেটা পাঠানো যায়।
৪. টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের চাইতে অধিক দূরত্বে তথ্য পাঠানো যায় এবং সিগন্যাল এটিনিউয়েশনের পরিমাণ কম।
৫. ট্রান্সমিশন লস অপেক্ষাকৃত কম হয়।
৬. ক্যাবল TV নেটওয়ার্কে বেশি ব্যবহৃত হয়।
৭. ফাইবার অপটিক ক্যাবলের তুলনায় দামে অনেক সস্তা।

কোএক্সিয়াল ক্যাবলের অসুবিধা (Disadvantages of Coaxial Cable)

ডেটা ট্রান্সফার রেট নির্ভর করে তারের দৈর্ঘ্যের উপর।

১. রিপিটার ছাড়া ১ KM বেশি দূরত্বে ডেটা পাঠানো যায় না।
২. এই ক্যাবলের সাহায্যে নেটওয়ার্ক ডিভাইসের মধ্যে সংযোগ স্থাপন বেশ কঠিন।
৩. এই ক্যাবল টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের চেয়ে ব্যয়বহুল।

টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল (Twisted–pair Cable)

টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলে মোড়ানো দুটি কপার তার থাকে এবং তার দু'টিকে পৃথক রাখার জন্য মাঝে অপরিবাহী পদার্থ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ ক্যাবলে সাধারণত ৪ জোড়া তার একসাথে থাকে এবং প্রতি জোড়া একটি কমন রঙের (সাদা) হয় এবং বাকি তারগুলো হয় ভিন্ন রঙের। তারগুলো সংযোজনের সময় ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ নম্বরের ভিত্তিতে সংযোগ দিতে হয়। প্রতি জোড়া তার দু'টির এক একটির পুরুত্ব হয় ০.৪ মিঃমিঃ থেকে ০.৯ মিঃ মিঃ। এ ক্যাবলে ডেটা ট্রান্সমিশন লস অত্যন্ত বেশি এবং ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ 5 MHz। এর ব্যান্ডউইথ 10 Mbps থেকে 1 Gbps। টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল দু'প্রকার। যথা :

ক. আবরণহীন টুইস্টেড পেয়ার বা ইউটিপি (UTP – Unshielded Twisted Pair)
খ. আবরণযুক্ত টুইস্টেড পেয়ার বা এসটিপি (STP – Shielded Twisted Pair)

ক. ইউটিপি (UTP) : ইউটিপি ক্যাবল মূলত একাধিক জোড়া টুইস্টেড পেয়ারের সমষ্টি, যা আবার প্লাস্টিক আবরণে মোড়ানো থাকে। তারের মধ্য দিয়ে যখন সিগন্যাল অতিক্রম করতে থাকে তখন এর শক্তি বা মান ক্রমান্বয়ে লোপ পেতে থাকে। মোচড়ের দৈর্ঘ্য ৫ থেকে ১৫ cm, LAN এ ইউটিপি CAT-6 বেশি ব্যবহৃত হয়। এটি ১০ Mbps, ১ Gbps রেটে থেকে ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারে। বর্তমানে বাজারে যে সকল ইউটিপি ক্যাবল পাওয়া যাচ্ছে তা যথেষ্ট উন্নতমানের। Radiated Noise এবং EMI (Electromagnetic Interference) দ্বারা ইউটিপি ক্যাবলে সিগন্যাল অপেক্ষাকৃত কম বাধাগ্রস্ত হয়। এ ধরনের ক্যাবলে ১০০ মিটারের বেশি দুরত্বে ডেটা পাঠানো যায় না।

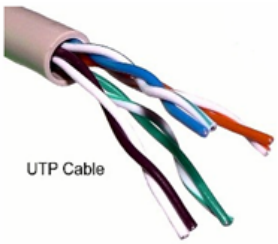
UTP Cable

খ. এসটিপি (STP) : এসটিপি ক্যাবলের বাইরে জ্যাকেট বা প্লাস্টিক আবরণ থাকে এবং প্রতিটি প্যাঁচানো জোড়া তারের মধ্যে একটি শিল্ড (Shield) বা শক্ত আবরণ থাকে। এ আবরণটি সাধারণত অ্যালুমিনিয়াম বা পলিস্টার দ্বারা তৈরি, যা এসটিপি ক্যাবলকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারফেরেন্সের হাত থেকে রক্ষা করে। এই ক্যাবল মোটা ও শক্ত হওয়ায় নড়াচড়া অসুবিধাজনক। এ ক্যাবল দিয়ে ১৬ Mbps থেকে ৫০০ Mbps রেটে ডেটা ট্রান্সমিট হতে পারে।

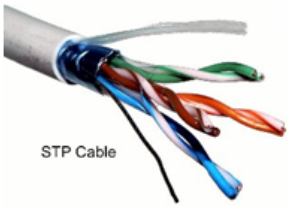
STP Cable

টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের সুবিধা (Advantages of Twisted-pair Cable)

১. কম দূরত্বে যোগাযোগ ক্যাবল হিসেবে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
২. বর্তমানে টেলিফোন লাইনে সর্বপ্রথম টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল ব্যবহৃত হয়।
৩. এটি অন্যান্য ক্যাবলের চেয়ে দামে সস্তা।
৪. সহজে স্থাপন করা যায়।

টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের অসুবিধা (Disadvantages of Twisted-pair Cable)

১. ডেটা ট্রান্সমিশন ডিলেটাইম অন্যান্য ক্যাবলের চেয়ে বেশি।
২. বেশি দূরত্বে ডেটা পাঠানোর জন্য ২ কি.মি. পরপর রিপিটার ব্যবহার করতে হয়।
৩. ট্রান্সমিশন লসও অপেক্ষাকৃত বেশি।

ফাইবার অপটিক ক্যাবল (Fiber Optic Cable)

ফাইবার অপটিক বা অপটিক্যাল ফাইবার হলো অত্যন্ত সরু এক ধরনের কাচের তন্তু। ডাই-ইলেকট্রনিক অন্তরক পদার্থ দিয়ে তৈরি কাচের তন্তুর মধ্যে দিয়ে আলোর গতিতে ডেটা আদান-প্রদান করা যায়। ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবল অত্যন্ত দ্রুত ডেটা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে অপটিক্যাল ফাইবার কাজ করে। এ ক্যাবলের বিশেষত্ব হলো, এটি ইলেকট্রনিক্যাল সিগন্যালের পরিবর্তে আলোক বা লাইট সিগন্যাল ট্রান্সমিট করে। আর এ কাজে ব্যবহৃত হয় ফাইবারের অভ্যন্তরে গ্লাস বা প্লাস্টিক কোর। এ ক্যাবলের মাধ্যমে ডেটা আদান-প্রদানের জন্য লেজার রশ্মি ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশেই অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একে অন্যের সাথে সংযুক্ত হয়ে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। বিপুল পরিমাণ ডেটা পরিবহনে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে আন্তঃমহাদেশীয় ফাইবার অপটিক্যাল স্থাপিত হয়েছে। এ ধরনের ফাইবারকে সাবমেরিন ক্যাবল বলা হয়।

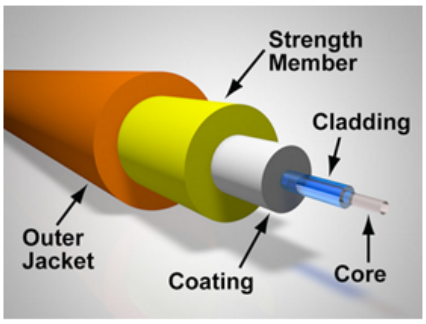

চিত্র : ফাইবার অপটিক ক্যাবল

ফাইবার অপটিক ক্যাবল–এর গঠন (Structure of Fiber Optic Cable)

অপটিক্যাল ফাইবারের ৩টি স্তর থাকে। যথা–

১. কোর (Core)
২. ক্ল্যাডিং (Cladding)
৩. জ্যাকেট (Jacket)

১. **কোর (Core) :** কোর হলো সবচেয়ে ভিতরের স্তর, যার মধ্য দিয়ে আলোক সিগন্যাল সঞ্চালন করে। এটি সিলিকা মাল্টিকম্পোনেন্ট কাচ বা স্বচ্ছ প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। কোরের ব্যাস ৮ থেকে ১০০ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। [১ মাইক্রোমিটার/মাইক্রোন = $১০^{-৬}$ মিটার]

২. **ক্ল্যাডিং (Cladding) :** কোরকে ঘিরে থাকা বাইরের স্তরটি হচ্ছে ক্ল্যাডিং, যা কাচের তৈরি। এটি কোর থেকে নির্গত আলোকরশ্মি প্রতিফলিত করে তা পুনরায় কোরে ফেরত পাঠায়। এ স্তরটি ক্ল্যাডিং নামে পরিচিত। ক্ল্যাডিং–এর ব্যাস ১২৫ মাইক্রোমিটার।

৩. **জ্যাকেট (Jacket) :** প্রতিটি ক্ল্যাডিং–এর উপর প্লাস্টিক দিয়ে মোড়ানো আবরণটিকে জ্যাকেট (Jacket) বলা হয়। এটি ফাইবার অপটিক তারকে ঘর্ষণ, মরিচা, জলীয় বাষ্প থেকে রক্ষা করে।

ফাইবার অপটিক ক্যাবল–এর প্রকারভেদ (Classification of Fiber Optic Cables)

ফাইবারের গাঠনিক উপাদানের প্রতিসরাঙ্কের উপর নির্ভর করে ফাইবার অপটিককে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. **স্টেপ–ইনডেক্স ফাইবার (Step–Index Fiber) :** কোরের প্রতিসরাঙ্ক সর্বত্র সমান থাকে এবং ব্যাস বেশি।
২. **গ্রেডেড–ইনডেক্স ফাইবার (Graded–Index Fiber) :** কোরের প্রতিসরাঙ্ক কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি এবং ব্যাসার্ধ বরাবর কমতে থাকে।
৩. **মনোমোড ফাইবার (Monomode Fiber) :** Single wavelength এ লাইট ক্যারি করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

কোরের ব্যাস অনুযায়ী ফাইবার অপটিককে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. **মাল্টিমোড ফাইবার (Multimode Fiber) :** কোর সাইজ ৬২.৫/১২৫ মাইক্রোন। এই ফাইবার দিয়ে বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি পাঠানো যায় এবং একসাথে একাধিক ট্রান্সমিশন হতে পারে।
২. **সিঙ্গেলমোড ফাইবার (Singlemode Fiber) :** কোর সাইজ ৮/১২৫ মাইক্রোন। শুধুমাত্র একটি ট্রান্সমিশন ঘটতে পারে।

ফাইবার অপটিক ক্যাবলের বৈশিষ্ট্য (Features of Fiber Optic Cables)

১. এর গতি আলোর গতির সমান।
২. একসাথে একাধিক তথ্য প্রেরণ করা যায়।
৩. শক্তির অপচয় হয় না বলা চলে।
৪. রাসায়নিক নিষ্ক্রিয়তা।

ফাইবার অপটিক ক্যাবলের সুবিধা (Advantages of Fiber Optic Cables)

১. আলোর গতিতে ডেটা ট্রান্সমিট হয় বলে সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিসম্পন্ন।
২. উচ্চ ব্যান্ডউইডথ সম্পন্ন।
৩. নেটওয়ার্ক ব্যাকবোন হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
৪. ডেটা পরিবহনে কম শক্তি ক্ষয় করে
৫. মানের অবনতি বা এন্টিনিউয়েশন ঘটে না।
৬. পরিবেশের তাপ চাপ ইত্যাদি ডেটা চলাচলের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।
৭. আকারে ছোট এবং ওজন অত্যন্ত কম।
৮. বিদ্যুৎ চৌম্বক প্রভাব হতে মুক্ত (EMI নেই)।
৯. ডেটা সংরক্ষণের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বেশি।

ফাইবার অপটিক ক্যাবলের অসুবিধা (Disadvantages of Fiber Optic Cables)

১. U আকৃতিতে বাঁকানো যায় না।
২. ফাইবার অপটিক অত্যন্ত দামি।
৩. ফাইবার অপটিক ক্যাবল ইনস্টল করা অন্যান্য ক্যাবলের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কঠিন।

ফাইবার অপটিক ক্যাবলের গঠন উপাদান

ফাইবার তৈরির অন্তরক পদার্থ হিসেবে সিলিকা এবং মাল্টি কম্পোনেন্ট কাচ বহুলভাবে ব্যবহার করা হয়। এসব অন্তরক পদার্থের গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো– অতি স্বচ্ছতা, রাসায়নিক সুস্থিরতা বা নিষ্ক্রিয়তা এবং সহজ প্রক্রিয়াকরণযোগ্যতা। ফাইবার তৈরির জন্য সোডা বোরো সিলিকেট, সোডা লাইম সিলিকেট, সোডা অ্যালুমিনা সিলিকেট ইত্যাদি মাল্টি কম্পোনেন্ট কাচগুলো বেশি ব্যবহৃত হয়। কখনও কখনও ফাইবারের ক্ল্যাডিং হিসেবে প্লাস্টিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্তমানে পূর্ণ প্লাস্টিক ফাইবারের ব্যবহারও পরিলক্ষিত হচ্ছে।

অপটিক্যাল ফাইবার যোগাযোগ ব্যবস্থা (Optical Fiber Communication System)

ফাইবার অপটিক ক্যাবলের উদ্ভব বিপুল পরিমাণ তথ্যের আদান–প্রদানকে প্রচণ্ড গতিশীল করে তুলেছে। ফলে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থায় এসেছে অভাবনীয় সাফল্য। আজকাল বিপুল পরিমাণ উপাত্ত পরিবহণে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে আন্তঃমহাদেশীয় ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপিত হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ করতে এ ব্যবস্থাতেও টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থার মতো তিনটি অংশ রয়েছে। এগুলো হলো– প্রেরক যন্ত্র, প্রেরণ মাধ্যম এবং গ্রাহক যন্ত্র। প্রেরক যন্ত্রের মাধ্যমে অ্যানালগ বা ডিজিটাল সংকেতকে প্রয়োজনীয় মডুলেশন করে আলোক তরঙ্গ হিসেবে রূপান্তর করা হয় এবং ফাইবার অপটিকে তা প্রেরণ করা হয়। ফাইবার অপটিকে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে তা গ্রাহকযন্ত্রে পৌঁছায়। গ্রাহকযন্ত্রে ফটো ডিটেক্টর এবং প্রসেসিং ইউনিট নামে দু'টো অংশ থাকে। এর মধ্যে ফটো ডিটেক্টরটি ফাইবার অপটিক থেকে ডেটাকে উদ্ধার করে। আর প্রসেসিং ইউনিট ডেটাকে অ্যাম্প্লিফিকেশন, ফিল্টারেশন, ডিমডুলেশন করে ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে দেয়।

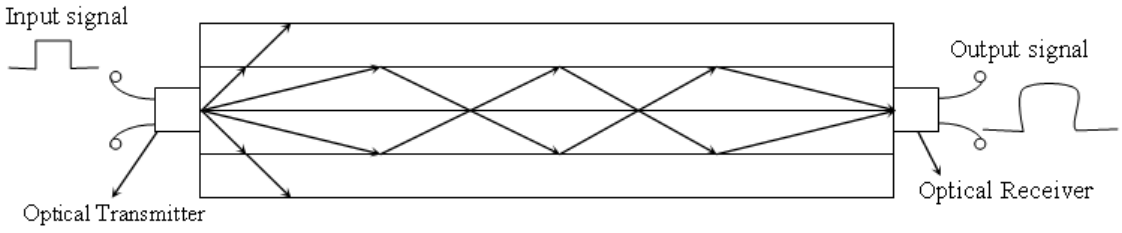

চিত্র : অপটিক্যাল ফাইবারের কমিউনিকেশন ব্যবস্থা

বিভিন্ন ধরনের ক্যাবলের তুলনামূলক বিবরণ

ক্যাবলের ধরন	মূল্য	সিগন্যাল বহনের সর্বোচ্চ দূরত্ব	নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত সর্বোচ্চ নোড সংখ্যা	ব্যবহারের ধরন ও ডেটা পরিবহণ গতি
ইউটিপি	সস্তা	১০০ মিটার	১০২৪	স্টার নেটওয়ার্ক ২ থেকে ১৫৫ এমবিপিএস
এসটিপি	ইউটিপি'র চেয়ে দামি	১০০ মিটার	২৭০	আইবিএম টোকেন রিং ৪–১৬ এমবিপিএস
থিননেট	এসটিপি বা ইউটিপি'র চেয়ে কম	১৮৫ মিটার	৩০ প্রতি সেগমেন্টে	থিননেট ইথারনেট ২–১০ এমবিপিএস
থিকনেট	থিননেটের চেয়ে দামি	৫০০ মিটার	১০০ প্রতি সেগমেন্টে	থিকনেট ইথারনেটে ২ – ১০ এমবিপিএস
ফাইবার অপটিক	সবচেয়ে দামি	২০ কিলোমিটার	অসীম	এফডিডিআই ১০০এমবিপিএস থেকে ২ জিবিপিএস

একক কাজ : ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যমসমূহের তালিকা তৈরি কর।

২.২ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন মাধ্যম (Wireless Communication Medium)

আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্যাবল (তার)–এর মাধ্যমে ডেটা আদান-প্রদান ও যোগাযোগ করা সম্পর্কে জেনেছি। তারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সীমায় ডেটা আদান-প্রদান সম্ভব। কিন্তু দূরবর্তী ও দুর্গম স্থানে এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহে ডেটা ট্রান্সমিশনে তার মাধ্যম ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তারবিহীন বা ওয়্যারলেস মাধ্যমে ডেটা আদান-প্রদান করা হয়। মোবাইল ডিভাইসের মধ্যে ডেটা কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে বেতার মাধ্যম বেশি উপযোগী। **কোন প্রকার তার ব্যবহার না করে একাধিক ডিভাইসের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান তথা যোগাযোগ করার পদ্ধতিকে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম বলা হয়।** ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের সাহায্যে বিশ্বের যে কোন প্রান্তে অবস্থান করে একে অন্যের সাথে কথা বলা, টেক্সট ম্যাসেজিং, চ্যাটিং ইত্যাদি কাজ কম খরচে খুব সহজে দ্রুত করা যায়। ওয়্যারলেস মাধ্যমে ডেটাকে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আকারে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে সঞ্চালন করা হয়। ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন বিভিন্ন ধরনের ফিক্সড, মোবাইল এবং পোর্টেবল টু-ওয়ে রেডিও, সেলুলার টেলিফোনসমূহ, পার্সোনাল ডিজিটাল অ্যাসিস্টেন্টস (পিডিএ) এবং ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কিং প্রভৃতিকে নিয়ে হয়ে থাকে। ওয়্যারলেস প্রযুক্তির অন্যান্য উদাহরণের মধ্যে আছে জিপিএস ইউনিট, গ্যারেজ ডোর ওপেনার এবং গ্যারেজ ডোরসমূহ, ওয়্যারলেস কম্পিউটার মাইক, কিবোর্ড ও হেডসেটসমূহ, স্যাটেলাইট টেলিভিশন এবং কর্ডলেস টেলিফোনসমূহ।

চিত্র : ওয়্যারলেস সিস্টেম

চিত্র : বিভিন্ন ধরনের ওয়্যারলেস ডিভাইস

ওয়্যারলেস অপারেশনগুলো বিভিন্ন ধরনের সেবা যেমন-দীর্ঘ দূরত্বের যোগাযোগের মতো ক্ষেত্রগুলোতে বিশেষভাবে কাজে লাগে। অধিক দূরবর্তী স্থানে স্বাভাবিক তার ব্যবহার করে যেখানে যোগাযোগের ব্যাপারটি অসম্ভব, সেখানে ওয়্যারলেস পদ্ধতিতে খুব সহজেই যোগাযোগ করা যায়। তারের ব্যবহার ছাড়াই তথ্য স্থানান্তরে টেলিকমিউনিকেশন্স সিস্টেমগুলোকে (যেমন– রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি, ইনফ্রারেড রশ্মি, লেজার রশ্মি, দৃশ্যমান রশ্মি, শব্দশক্তি, অ্যাকুস্টিক এনার্জি প্রভৃতি) ব্যবহার করা হয় এবং রেডিও ওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ, ইনফ্রারেড মিডিয়া হিসেবে কাজ করে। ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন বাস্তবায়নে পয়েন্ট টু পয়েন্ট কমিউনিকেশন, পয়েন্ট টু মাল্টি পয়েন্ট কমিউনিকেশন, ব্রডকাস্টিং, সেলুলার নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য তারবিহীন নেটওয়ার্ক সম্পৃক্ত থাকে।

ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশন মিডিয়া (Wireless Transmission Media)

ওয়ারলেস ট্রান্সমিশন মিডিয়া তিন ধরনের হয়ে থাকে। যথা–

১. রেডিও ওয়েভ (Radio wave)
২. মাইক্রোওয়েভ (Microwave)
৩. ইনফ্রারেড (Infrared)

নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

১. রেডিও ওয়েভ (Radio wave)

১০ কিলোহার্জ থেকে ১ গিগাহার্জের মধ্যে সীমিত তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ (ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম)–কে বলা হয় রেডিও ওয়েভ। রেডিও ওয়েভ হলো এক ধরনের ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশন মিডিয়া, যা রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি (RF) সিগন্যালের মাধ্যমে ডেটা ট্রান্সমিট করে থাকে। রেডিও ওয়েভ সিগন্যাল অনেক দূরের বা কাছের রেঞ্জে হতে পারে এবং পাহাড় বা বিল্ডিংকে ভেদ করতে পারে। এর ব্যান্ডউইথ ২৪ kbps. এটি ICT-এর একটি শক্তিশালী মাধ্যম। রেডিও ওয়েভের জন্য ট্রান্সমিটার, রিসিভার, এন্টেনা এবং উপযুক্ত টার্মিনাল যন্ত্রপাতি থাকতে হয়।

২. মাইক্রোওয়েভ (Microwave)

মাইক্রোওয়েভ হলো হাই–ফ্রিকুয়েন্সি রেডিও ওয়েভ। 1 GHz বা তার চেয়ে বেশি ফ্রিকুয়েন্সিতে পাঠানো বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গকে বলা হয় মাইক্রোওয়েভ। দূরপাল্লায় ডেটা ট্রান্সমিশন-এ মাইক্রোওয়েভ অত্যন্ত জনপ্রিয় পদ্ধতি। মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম মূলত দু'টো ট্রান্সসিভার (Transceiver) নিয়ে গঠিত। এর একটি সিগন্যাল ট্রান্সমিট (Transmit) এবং অন্যটি রিসিভ (Receive) করে। দুটি ট্রান্সসিভার–এর মাঝে মাইক্রোওয়েভের এন্টিনা (Antenna) থাকে, যাতে সিগন্যাল বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে এবং পথিমধ্যে কোন বস্তু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে। মাইক্রোওয়েভ বাঁকা পথে চলাচল করতে পারে না এবং প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে কোন বাধা থাকলে ডেটা স্থানান্তর সম্ভব হয় না। মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ দু'ধরনের হতে পারে। যথা–

১. টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ (Terrestrial Microwave)
২. স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ (Satellite Microwave)

১. টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোয়েভ (Terrestrial Microwave)

এ প্রযুক্তিতে ভূ-পৃষ্ঠেই ট্রান্সমিটার ও রিসিভার বসানো হয়। এতে মেগাহার্জ সীমার নিচের দিকে ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করা হয়। ট্রান্সমিটার ও রিসিভার মুখোমুখি (LOS– Line Of Sight) যোগাযোগ করে থাকে এবং সিগন্যাল বাধা অতিক্রম করতে পারে না এবং বক্রপথে যেতে পারে না। তরঙ্গের সিগন্যাল ঠিক রাখার জন্য 10 KM থেকে 100 KM দূরত্বের মধ্যে রিপিটার স্থাপন করতে হয়। স্বল্প দূরত্বের মধ্যে অধিক ফ্রিকুয়েন্সিতে ডেটা আদান-প্রদানের জন্য টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করা হয়।

২. স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ (Satellite Microwave)

এ প্রযুক্তিতে যোগাযোগে স্যাটেলাইটের (উপগ্রহের) সহায়তা নিতে হয়। রকেটের মাধ্যমে বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্যাটেলাইটকে পৃথিবী থেকে (৩৬০০০ কি.মি.) ২২,২৩০ মাইল উপরে জিওসিনক্রোনাস অরবিটে স্থাপন করা হয়। স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশন ব্যবহৃত হয় যেখানে ক্যাবলের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব নয়। স্যাটেলাইটে ট্রান্সমিটার, রিসিভার, শক্তিশালী রিসিভার ট্রান্সমিটার অ্যান্টেনা VSAT (Very Small Aperture Terminal), সোলার পাওয়ার থাকতে হয়। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে খুব তাড়াতাড়ি কম খরচে যোগাযোগ করা যায়। টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর বিশ্বময় সরাসরি সম্প্রচার এবং আন্তঃমহাদেশীয় দূরবর্তী টেলিফোন কলের জন্য স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়।

স্যাটেলাইটের ব্যবহার (Using of Satellite)

১. পৃথিবীর জলবায়ু এবং আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করার কাজে।
২. টেলিভিশন সম্প্রচার কাজে।
৩. অপেশাদার রেডিও যোগাযোগের ক্ষেত্রে।
৪. প্রতিরক্ষা কাজে।
৫. ইন্টারনেট যোগাযোগের ক্ষেত্রে।
৬. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে।
৭. দূরের গ্রহ, গ্যালাক্সি এবং মহাশূন্যের বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ কাজে।
৮. গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (Global Positioning System—GPS) এর মতো বিভিন্ন অবস্থান নির্ণয় কাজে ।

স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেমের সুবিধা (Advantages of Satellite Communication)

১. বিপুল পরিমাণ ডেটা আদান—প্রদান করা সম্ভব।
২. পৃথিবীর এক প্রান্তে বসবাসকারী লোকজন অন্য প্রান্তে বসবাসকারী লোকজনের কাছাকাছি থাকতে পারে।
৩. প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
৪. প্রাকৃতিক বিপর্যয়কালীন সময় যখন সব ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে তখন স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।
৫. আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব।
৬. ভয়েস কলিং, ভিডিও কলিং, রেডিও, টেলিভিশন চ্যানেল, ইন্টারনেট, ফ্যাক্স ইত্যাদি সেবা পাওয়া যায়।
৭. একটি মূল্য সাশ্রয়ী ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে লং ডিসটেন্স কল করা যায়।

স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেমের অসুবিধা (Disadvantages of Satellite Communication)

১. স্যাটেলাইট প্রযুক্তিটির বাস্তবায়ন ও তদারকির বিষয়টি ব্যয়বহুল।
২. স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে সিগন্যাল ডিলে একটি অসুবিধা হিসেবে আবির্ভূত হয়।
৩. ভ্রমণরত অবস্থায়, খারাপ আবহাওয়ায় কিংবা সানস্পট—এর কারণে বিভিন্ন সেবা বাধাগ্রস্ত হতে পারে।
৪. ডেটার অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ প্রতিরোধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

দলীয় কাজ : স্যাটেলাইট এবং সাব মেরিন ক্যাবলের ব্যবহারের পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা কর।

স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ এর সাথে টেরেস্টিয়াল মাইক্রোওয়েভের পার্থক্য :

স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ পদ্ধতি	টেরেস্টিয়াল মাইক্রোওয়েভ পদ্ধতি
১. স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ পদ্ধতিতে উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবী থেকে প্রায় ২২,২৩০ মাইল উপরে জিওসিনক্রোনাস অরবিটে ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার বসানো বা স্থাপন করা হয়।	১. টেরেস্টিয়াল মাইক্রোওয়েভ পদ্ধতিতে ভূ—পৃষ্ঠেই ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার বসানো বা স্থাপন করা হয়।
২. এক সঙ্গে একাধিক দেশে কভারেজ প্রদান করা যায়।	২. এই পদ্ধতিতে শুধুমাত্র একটি দেশেই কভারেজ প্রদান করা সম্ভব।
৩. এই পদ্ধতিতে ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার—এর মধ্যে বাধা তৈরি হওয়া সম্ভব নয় বলে সিগন্যাল বাধাপ্রাপ্ত হয় না।	৩. এই ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার—এর মধ্যে কোন বাধা তৈরি হলে সিগন্যাল বাধাপ্রাপ্ত হয়।

৩. ইনফ্রারেড (Infrared)

ইনফ্রারেড হলো এক ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ, যার ফ্রিকুয়েন্সি সীমা টেরাহার্জ (THz) হয়ে থাকে। খুবই কাছাকাছি ডিভাইসের মধ্যে ডেটা কমিউনিকেশনে ইনফ্রারেড ব্যবহার করা হয়। এ প্রযুক্তিতে দু'প্রান্তে ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার থাকে। সিগন্যাল ট্রান্সমিট করার কাজটি LED (Light Emitting Diode) বা ILD (Interjection Laser Diode) –এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এবং ফটো ডায়োড সিগন্যাল রিসিভ বা গ্রহণ করে। ইনফ্রারেড সিগন্যালের অসুবিধা হলো এটি ঘরের দেয়াল বা শক্ত বস্তুভেদ করে অপর প্রান্তে যেতে পারে না।

৩. ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম (Wireless Communication System)

৩.১ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম–এর প্রয়োজনীয়তা

১. ক্যাবলের মাধ্যমে সম্ভব নয়, এমন স্থানে যোগাযোগ ও ডেটা ট্রান্সমিশনে ব্যবহৃত হয়।
২. নেটওয়ার্ক কভারেজের মধ্যে চলমান অবস্থায় যোগাযোগ স্থাপন করা যায়।
৩. দুর্যোগ বা যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য বেশি উপযোগী।
৪. গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।
৫. রেডিও, টিভির ব্রডকাস্টি-এ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন ব্যবহৃত হয়।
৬. যে কোন স্থান থেকে সরাসরি ভিডিও সম্প্রচারে এবং ইন্টারনেট সুবিধা পেতে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।
৭. ওয়্যারলেস এনার্জি ট্রান্সফারে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

৩.২ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেমের প্রকারভেদ (Different types of Wireless Communication System)

ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেমকে সাধারণত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. ওয়্যারলেস প্যান (Wireless Personal Area Network– WPAN)
২. ওয়্যারলেস ল্যান (Wireless Local Area Network– WLAN)
৩. ওয়্যারলেস ম্যান (Wireless Metropolitan Area Network– WMAN)
৪. ওয়্যারলেস ওয়ান (Wireless Wide Area Network– WWAN)

১. **ওয়্যারলেস প্যান (Wireless Personal Area Network– WPAN)** : অপেক্ষাকৃত কম দূরত্বে (হাতের নাগালে) অবস্থিত বিভিন্ন ডিভাইসগুলোর তারবিহীন নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাকে ওয়্যারলেস পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা WPAN বলে। এক্ষেত্রে কম দূরত্ব বলতে বুঝায় একজন ব্যক্তির স্থান। মোবাইল ফোন, পিডিএ, নোটবুক, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, মাউস, প্রজেক্টর, হ্যান্ডসেট ইত্যাদি ডিভাইস নিয়ে গঠিত কমিউনিকেশন ব্যবস্থাই হলো WPAN এর উদাহরণ।

২. **ওয়্যারলেস ল্যান (Wireless Local Area Network– WLAN)** : একটি নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে অবস্থিত দুই বা ততোধিক ডিভাইসের মধ্যে তৈরিকৃত তারবিহীন নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাকে বলা হয় ওয়্যারলেস লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা WLAN। WLAN সংযোগের জন্য সংযোগকারী ডিভাইসগুলোতে ওয়াই–ফাই (Wi–Fi) প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে ছোট প্রতিষ্ঠান এবং বাসা–বাড়িতে ওয়্যারলেস ল্যান অত্যন্ত জনপ্রিয়।

৩. **ওয়্যারলেস ম্যান (Wireless Metropolitan Area Network– WMAN)** : সাধারণত শহরের নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে বিস্তৃত তারহীন নেটওয়ার্ক হলো ওয়্যারলেস মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক বা WMAN । উদাহরণ : ওয়াইম্যাক্স (WiMAX) প্রযুক্তি।

৪. **ওয়্যারলেস ওয়ান (Wireless Wide Area Network– WWAN)** : বৃহৎ বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে তারহীন নেটওয়ার্ক হলো ওয়্যারলেস ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক বা WLAN। এই ধরনের নেটওয়ার্ক প্রধানত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বা পাবলিক ইন্টারনেট অ্যাকসেস সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়।

ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন প্রযুক্তির উদাহরণ

রেডিও কমিউনিকেশন সিস্টেম, কর্ডলেস টেলিফোন, সেলুলার নেটওয়ার্ক, শর্ট রেঞ্জ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট কমিউনিকেশন: ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন, রিমোট কন্ট্রোল, ওয়্যারলেস ইউএসবি, ওয়্যারলেস সেন্সর নেটওয়ার্ক, পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, ব্লুটুথ, ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক, Wi-Fi ইত্যাদি।

৩.৩ ব্লুটুথ (Bluetooth)

ধরা যাক, তোমার বন্ধুর মোবাইলে একটি ছবি আছে। ইন্টারনেট ব্যবহার না করে ছবিটিকে তোমার মোবাইলে আনতে চাও। এক্ষেত্রে যদি উভয়ের মোবাইলে ব্লুটুথ থাকে তাহলে ব্লুটুথ ব্যবহার করে ছবিটিকে আনা যাবে। **ব্লুটুথ হলো স্বল্প দূরত্বের (১০ মিটারের কাছাকাছি) ভেতর ডেটা আদান-প্রদানের জন্য বহুল প্রচলিত ওয়্যারলেস প্রযুক্তি।** এটি তারবিহীন পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (PAN) প্রটোকল, যেখানে উঁচু মানের নিরাপত্তা বজায় থাকে। টেলিকম ভেন্ডর কোম্পানি এরিকসন ১৯৯৪ সালে এটি উদ্ভাবন করে। ডেনমার্কের রাজা হ্যারোল্ড ব্লুটুথ (Harald Bluetooth) এর নামানুসারে ব্লুটুথ নামকরণটি করা হয়েছে।

বর্তমানে মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে ল্যাপটপ, ট্যাব, পিডিএ, মেডিক্যাল ডিভাইস এবং বাসাবাড়ির বিনোদনের অনেক ডিভাইসে ব্লুটুথ প্রযুক্তিটি ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্লুটুথ প্রযুক্তির মাধ্যমে যে নেটওয়ার্ক তৈরি হয় তাকে পিকোনেট বলে। দুইটি পাশাপাশি পিকোনেট একটি সাধারণ স্লেভ নোডের মাধ্যমে যুক্ত হলে এই দু'টি পিকোনেটকে এক সাথে স্কাটারনেট বলে।

ব্লুটুথ নেটওয়ার্ক

ব্লুটুথ ডঙ্গল

ব্লুটুথ হেডসেট

মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ডিজিটাল ক্যামেরা এবং ভিডিও গেম কনসোলগুলোকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করতে এবং তথ্য বিনিময় করতে ব্লুটুথ একটি নিরাপদ উপায় সরবরাহ করে থাকে।

ব্লুটুথ–এর ব্যবহার (Application of Bluetooth)

১. ফোনের সাথে হ্যান্ডস ফ্রি হেডসেটের সংযোগ ঘটিয়ে সাউন্ড বা ভয়েস ডেটা স্থানান্তরে ব্লুটুথ ব্যবহৃত হয়।
২. ফোন থেকে কম্পিউটারে ফাইল স্থানান্তরে এ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।
৩. কম্পিউটারের সাথে অন্যান্য ডিভাইসের সংযোগ ঘটানো যায় এবং তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।
৪. পিসির ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসগুলোর সাথে তারবিহীন যোগাযোগে ব্লুটুথ ব্যবহৃত হয়।
৫. জিপিএস রিসিভার, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, বারকোড স্ক্যানার ও ট্রাফিক কন্ট্রোল ডিভাইসগুলোতে ব্যবহৃত হয়।
৬. ডেডিকেটেড টেলিহেলথ ডিভাইসগুলোতে হেলথ সেন্সর ডেটাগুলোর শর্ট রেঞ্জ ট্রান্সমিশনে ব্লুটুথ ব্যবহৃত হয়।
৭. প্রায়ই ইনফ্রারেড ব্যবহৃত হয়, এমন স্থানে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্লুটুথ ব্যবহৃত হয়।

ব্লুটুথের বৈশিষ্ট্য/সুবিধা (Characteristics/Advantages of Bluetooth)

১. কাছাকাছি দুটি ডিভাইসের মধ্যে ডেটা স্থানান্তরে ব্লুটুথ ব্যবহৃত হয়।
২. ২.৪ গিগাহার্টস ফ্রিকুয়েন্সিতে সিগন্যাল আদান-প্রদান করে। এর ব্যান্ডউইথ ১ Mbps.
৩. ১০ – ১০০ মিটারের মধ্যে তারবিহীন ডিভাইসের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে এবং দেয়াল বা অন্য কোন বাধা ডেটা ট্রান্সমিশনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না।
৪. ব্লুটুথ হলো মাস্টার-স্লেভ কাঠামোসহ একটি প্যাকেট-ভিত্তিক প্রটোকল।
৫. মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ডিজিটাল ক্যামেরা এবং ভিডিও গেম কনসোলগুলোকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করতে এবং তথ্য বিনিময় করতে ব্লুটুথ ব্যবহৃত হয়।
৬. একটি পিকোনেটে মোট ২৫৫টি স্লেভ নোড থাকে, তবে সাতটি স্লেভের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং অবশিষ্ট নোডগুলো নিষ্ক্রিয় থাকে।
৭. ব্লুটুথ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কনফিগার করতে পারে।

ব্লুটুথ–এর অসুবিধা (Disadvantages of Bluetooth)

১. ১০০ মিটারের বেশি দূরত্বে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়।
২. ডেটা ট্রান্সফার রেট তুলনামূলকভাবে কম।
৩. মোবাইল ফোনের ব্লুটুথ অপশনটি অন করা থাকলে ব্যাটারির চার্জ খরচ হতে থাকে।
৪. ব্লুটুথ ইন্টারনেট গতি অনেক কম।
৫. ব্লুটুথ–এর মাধ্যমে ডেটা ট্রান্সফারে সিকিউরিটি কম।

৩.৪ ওয়াই-ফাই (Wi-Fi / Wireless Fidelity)

Wi-Fi শব্দের পূর্ণ অর্থ হলো Wireless Fidelity। কম্পিউটার/ডিজিটাল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিগুলোকে তারবিহীন উপায়ে ইন্টারনেটে সংযুক্ত করার একটি প্রযুক্তি হলো ওয়াই-ফাই (Wi-Fi)। ওয়াই-ফাই হলো জনপ্রিয় একটি ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কিং প্রযুক্তি, যেটি তারবিহীন উচ্চগতির ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্ক সংযোগে বেতার তরঙ্গকে ব্যবহার করে থাকে। এটি একটি ওয়্যারলেস বা তারবিহীন LAN স্ট্যান্ডার্ড যা প্রযুক্তিগতভাবে IEEE 802.11নামে পরিচিত। ওয়াই-ফাই অ্যানাবল্ড ডিভাইস যেমন– ল্যাপটপ, ভিডিও গেম কনসোল, স্মার্টফোন কিংবা ডিজিটাল অডিও প্লেয়ার প্রভৃতি একটি ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক অ্যাকসেস পয়েন্টের মাধ্যমে ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত হতে পারে। ইন্টারনেট অ্যাকসেসের জন্য Wi-Fi নেটওয়ার্কভুক্ত এলাকাকে Hotspot বলা হয়। এর ডেটা কমিউনিকেশন গতি খুবই কম এবং সিকিউরিটি ব্যবস্থাও দুর্বল।

ওয়াই-ফাই এর বৈশিষ্ট্য/সুবিধা (Characteristics/Advantages of Wi-Fi)

- ওয়াই-ফাই এর কভারেজ সীমিত পরিসর থেকে নিয়ে বিস্তৃত পরিসরেও পাওয়া সম্ভব।
- এর ব্যান্ডউইথ 10 Mbps – 50 Mbps.
- ওয়াই-ফাই LAN-এর চেয়ে সস্তা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিনামূল্যে সেবা দিয়ে থাকে।
- যে কোন মানের Wi-Fi বিশ্বের যে কোন জায়গায় কাজ করবে।
- Wi-Fi LAN এর সাথে সংযুক্ত হবার জন্য কম্পিউটারকে একটি ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কন্ট্রোলার সংবলিত হতে হয়।
- রাউটারের সাথে একটি ডিজিটাল সাবস্ক্রাইবার লাইন মডেম এবং একটি ওয়াই-ফাই অ্যাকসেস পয়েন্টকে যুক্ত করায় এর আওতার মধ্যে থাকা সকল ডিভাইসগুলোতে ইন্টারনেট অ্যাকসেস সুবিধা পায়।
- Wi-Fi এবং WiBro (Wireless Broadband) একটি পোর্টেবল ওয়াই-ফাই রাউটার–এর মাধ্যমে খুব সহজেই নিজস্ব ওয়াই-ফাই হটস্পট তৈরি করে যেটি সেলুলার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইন্টারনেটে সংযুক্ত হয়।
- আইফোন, অ্যান্ড্রয়েড, বাদা এবং সিম্বিয়ান অপারেটিং সিস্টেম চালিত ফোনগুলো ওয়্যারলেস সংযোগ তৈরি করতে পারে।
- ক্লায়েন্ট-টু-ক্লায়েন্ট সংযোগগুলোর জন্য রাউটার ছাড়াও এড-হক মোডে ওয়াই-ফাই ডিভাইসগুলোকে সংযুক্ত করা যায়।

Wi-Fi–এর অসুবিধা (Disadvantages of Wi–Fi) :

- ডেটা স্থানান্তর বেশ ধীরগতিসম্পন্ন।
- নির্দিষ্ট এলাকা ছাড়া কভারেজ পাওয়া কঠিন।
- নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ঝুঁকি থাকে।

ওয়াই-ফাই–এর ব্যবহার (Application of Wi-Fi)

- বাসাবাড়ি এবং অফিস-আদালত ছাড়াও ওয়াই-ফাই হটস্পটসমূহের পাবলিক স্পেসেও সেবা প্রদান করে।
- ওয়াই-ফাই হটস্পটগুলো বিনামূল্যে কিংবা বাণিজ্যিকভাবে স্থাপিত হয়ে থাকে। বিমানবন্দর, হোটেল, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি স্থানে বিনামূল্যে ওয়াই-ফাই এর সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

- বিশ্বের বহু শহরেই আজ সিটি-ওয়াইড ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক রয়েছে।
- বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ওয়াই-ফাই এর আওতায় আনা হচ্ছে, যার ফলে শিক্ষার্থীরা খুব সহজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বসেই তাদের ল্যাপটপ বা স্মার্টফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে।

ওয়াই-ফাই হটস্পট (Wi-Fi Hotspot)

ওয়াইফাই হটস্পট হলো এক্সেসেবল ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কের সাপোর্ট সমৃদ্ধ কোন একটি এলাকা, যেখান থেকে সংশ্লিষ্ট ডিভাইসের সাহায্যে খুব সহজেই ইন্টারনেট এক্সেস করা যায়। এই ধরনের ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক সিস্টেম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাবলিক প্লেসগুলোতে ব্যবহৃত হয় যেমন এয়ারপোর্ট কিংবা কফিশপ প্রভৃতি। এদের কোন কোনটি ফ্রি ব্যবহার করা যায়, আবার কোন কোনটি ব্যবহারের জন্য অর্থ প্রদানের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু যে কোন ক্ষেত্রেই এটি ব্যবহার করা খুবই সহজ এবং কার্যকর একটি পদ্ধতি। এমনকি যে কেউ তার সেলফোন কিংবা এমন কোন এক্সটার্নাল ডিভাইস যা সেলুলার নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হতে পারে তা ব্যবহার করে নিজের মোবাইলেও এরকম মোবাইল হটস্পট তৈরি করতে পারে এবং নিজের বাড়িতেও খুব সহজেই ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক সেটআপ করতে পারে।

কেউ যদি পাবলিক ওয়াই-ফাই হটস্পট কিংবা হোম বেজ ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কের সুবিধা গ্রহণ করতে চায়, সে ক্ষেত্রে প্রথমেই তাকে নিশ্চিত হতে হবে যে তার কম্পিউটারটিতে এর জন্য সঠিক ডিভাইস এবং সিস্টেম সাপোর্ট রয়েছে কিনা। বর্তমানকালের নতুন ল্যাপটপ বা ডেস্কটপগুলোতে সাধারণত বিল্ট ইন ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটার যুক্ত থাকে এবং প্রায় সকল মোবাইল ডিভাইসগুলোই ওয়াই-ফাই সাপোর্টেড হয়ে থাকে। তবে যদি কোন কম্পিউটারে এই ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটারের সুবিধাটি না থাকে, তবে তার জন্য পৃথকভাবে ওয়্যারলেস এডাপ্টার কিনে নেয়া যেতে পারে। ল্যাপটপ বা পিসিতে পিসিআই কার্ড বা ইউএসবি পোর্টের মাধ্যমে সংযুক্ত করে খুব সহজেই ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক ব্যবহারের সুবিধা গ্রহণ করা যাবে। কোন কম্পিউটারে একবার ওয়্যারলেস এডাপ্টারটি সংযুক্ত করা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় ড্রাইভার ইনস্টল করার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এটি যে কোন এক্সিস্টিং ওয়্যারলেস বা ওয়াই–ফাই নেটওয়ার্ককে শনাক্ত করে নেয়। অর্থাৎ এডাপ্টার সমৃদ্ধ কম্পিউটারটি যদি কোন ওয়াই–ফাই হটস্পট জোনের ভেতরে থাকে তবে পিসিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে জানিয়ে দেবে যে এর ইউজার একটি ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কের ভেতরে রয়েছে এবং সে এই নেটওয়ার্কে যুক্ত হতে ইচ্ছুক কিনা তা জানতে চাইবে।

ওয়াই-ফাই হটস্পট তৈরি করা (Creation of Wi-fi Hotspot)

ওয়াই-ফাই ডিভাইস আছে এমন ল্যাপটপ বা ডেস্কটপকে ওয়াই-ফাই হটস্পট বানানো যায় খুব সহজেই। ফলে ল্যাপটপ বা ডেস্কটপের ইন্টারনেট সংযোগ ওয়াই-ফাই এর মাধ্যমে অন্যান্য ওয়াই-ফাই আছে এমন ডিভাইসে ব্যবহার করা যায়। যেমন : ল্যাপটপে ইন্টারনেট ব্যবহার করা হচ্ছে। এখন চাইলে ওয়াই-ফাই আছে এমন মোবাইলে, ডেস্কটপে, ট্যাবলেটে বা অনান্য ডিভাইসে সহজেই ল্যাপটপের ইন্টারনেট শেয়ার করা যাবে। এর জন্য বিভিন্ন টুলস্ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ভার্চুয়াল রাউটার প্লাস অন্যতম এটি ফ্রিওয়্যার এবং পোর্টেবল। সফটওয়্যারটি পোর্টেবল বিধায় ইনস্টল করার প্রয়োজন নেই। ১৫০ কিলোবাইটের এই সফটওয়্যারটি উইন্ডোজ ৭, উইন্ডোজ ৮, উইন্ডোজ সার্ভার ২০০৮ এবং উইন্ডোজ সার্ভার ২০১২ অপারেটিং সিস্টেমে কাজ করবে।

১. প্রথমে সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করে আনজিপ করে চালু করতে হবে।
২. এবার VirtualRouterPlus.exe চালু করে নেটওয়ার্কের নাম, পাসওয়ার্ড এবং কোন ল্যানের ইন্টারনেট শেয়ার হবে তা নির্ধারণ করে Start Virtual Router Plus বাটনে ক্লিক করতে হবে।
৩. অন্য ওয়াই–ফাই ডিভাইস থেকে ওয়াই–ফাই সার্চ করে নেটওয়ার্কের নাম দেখা যাবে; এখন পাসওয়ার্ড দিয়ে কানেক্ট করে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যাবে।

একক কাজ : তোমার স্মার্ট ফোন দিয়ে কিভাবে একটি হটস্পট থেকে ওয়াই-ফাই ব্যবহার করবে তার প্রক্রিয়া দেখাও।

৩.৫ ওয়াইম্যাক্স (WiMAX)

ওয়াইম্যাক্স (WiMAX) প্রযুক্তি হলো বর্তমান সময়ের সর্বাধুনিক উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট প্রটোকল সার্ভিস, যা তারবিহীন ব্যবস্থায় ১০ থেকে ৬০ কি.মি. পর্যন্ত ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করে। ওয়াইম্যাক্স–এর পূর্ণ অর্থ হলো Worldwide Interoperability for Microwave Access. এটি প্রচলিত DSL (Digital Subscriber Line) প্রযুক্তি এবং তারযুক্ত ইন্টারনেটের পরিবর্তে দ্রুতগতির তারবিহীন ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করে। ওয়াইম্যাক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডেটা আদান-প্রদান করা ছাড়াও VOIP (Voice Over Internet Protocol)–এর মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোন দেশে কম খরচে কথাও বলা যায়। ওয়াইম্যাক্স দু'ধরনের হতে পারে। যথা– ফিক্সড ওয়াইম্যাক্স এবং মোবাইল ওয়াইম্যাক্স। ওয়াইম্যাক্সের মাধ্যমে অনেক বেশি ব্যবহারকারী বহুদূর এলাকা পর্যন্ত উচ্চগতিতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা পেয়ে থাকে। প্রত্যন্ত অঞ্চল যেখানে সাধারণত ব্রডব্যান্ড সেবার কথা কল্পনাও করা যায় না, সেখানেও বিনা–তারে ব্রডব্যান্ড সেবা দেয়া যাচ্ছে ওয়াইম্যাক্সের মাধ্যমে। ওয়াইম্যাক্স পদ্ধতির প্রধানত দু'টি অংশ রয়েছে :

১. **বেজ স্টেশন :** ইনডোর ও আউটডোর টাওয়ার নিয়ে গঠিত। বেজ স্টেশনগুলো একটি ওয়াইম্যাক্স হাবের সাথে যুক্ত থেকে নেটওয়ার্ক তৈরি করে এবং ইন্টারনেট সার্ভিস দেয়।

২. **ওয়াইম্যাক্স রিসিভার :** এর সঙ্গে একটি এন্টেনা থাকে এবং একে কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত করে দিতে হয়। এটির ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক কভারেজ এরিয়া ১০ – ৬০ কি.মি. হয়ে থাকে। খুব অল্পসংখ্যক টাওয়ার স্থাপন করে বহু দূর পর্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ইন্টারনেটে সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে।

ওয়াইম্যাক্স–এর বৈশিষ্ট্য (Features of WiMAX)

১. ওয়াইম্যাক্স 2-66 GHz ফ্রিকুয়েন্সিতে কাজ করে।
২. ডেটা স্থানান্তরের গতি অনেক। 80 Mbps।
৩. কার্যক্ষমতা/এলাকা ১০ থেকে ৬০ কি.মি. পর্যন্ত।
৪. শক্তিশালী এনক্রিপশন থাকায় ডেটা নিরাপত্তা বেশি।
৫. ওয়াইম্যাক্স–এর স্ট্যান্ডার্ড হলো IEEE 802.16 ।
৬. Wimax নেটওয়ার্ক–এর ব্যান্ডউইথ 30 Mbps থেকে 75 Mbps।
৭. TDD (Time Division Duplexing) এবং FDD (Frequency Division Duplexing) সমর্থন করে।

ওয়াইম্যাক্সের মাধ্যমে প্রাপ্ত সার্ভিসসমূহ (The Services available through Wi-max)

ওয়াইম্যাক্সের মাধ্যমে যেসব সার্ভিস পাওয়া যায়, তা হলো–

১. ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল (ভিওআইপি)
২. ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিভিশন (আইপিটিভি)
৩. ওয়াইফাই–এর হটস্পট
৪. মোবাইল টেলিফোন সার্ভিস এবং মোবাইল ডেটা টিভি
৫. মোবাইল ইমার্জেন্সি রেসপন্স সার্ভিস এবং
৬. ফাইবার অপটিক ক্যাবলের বিকল্প পন্থা হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

ওয়াইম্যাক্স–এর সুবিধা (Advantages of WiMAX)

১. একক একটি বেজ স্টেশনের মাধ্যমে হাজার হাজার ব্যবহারকারীকে ইন্টারনেট সেবা দেয়া যায়।
২. তারবিহীন উপায়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট অ্যাকসেস করা যায়।
৩. এই নেটওয়ার্ক বাস্তবায়ন অনেক দ্রুত সময়ে করা সম্ভব।
৪. প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সেবা পাওয়া যায়।
৫. ওয়াইম্যাক্সের মাধ্যমে ওয়াই-ফাই হটস্পটে ইন্টারনেট সেবা দেয়া যায়।
৬. তথ্য ও টেলিযোগাযোগ সেবাগুলো (VOIP, IPTV) প্রদান করা যায়।
৭. নিরাপদ ইন্টারনেট সংযোগ সুবিধা প্রদান করা যায়।
৮. বহনযোগ্য সংযোগ প্রদান করা যায়।
৯. অন্যান্য নেটওয়ার্কের তুলনায় খরচ কম।

ওয়াইম্যাক্স–এর অসুবিধা (Disadvantages of WiMAX)

১. একই টাওয়ারের অধীনে অনেক ব্যবহারকারী একই সময়ে ইন্টারনেট অ্যাকসেসের চেষ্টা করলে মারাত্মক ট্র্যাফিকের সমস্যা দেখা দেয় এবং ব্যান্ডউইথ কমে যায়।
২. অধিক দূরত্বে সংযোগের জন্য লাইন-অফ-সাইট এর প্রয়োজন হয়।
৩. ডেটা রেট অত্যন্ত ধীরগতির।
৪. খারাপ আবহাওয়া যেমন ঝড় বৃষ্টির কারণে এর সিগন্যালে বিঘ্ন ঘটতে পারে।
৫. অন্যান্য ওয়্যারলেস যন্ত্রপাতিতে বাধার সৃষ্টি।
৬. বেশি বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন হয়।
৭. বাস্তবায়ন ও পরিচালনা অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

ওয়াই-ফাই এবং ওয়াইম্যাক্স–এর মধ্যে পার্থক্য (Difference between Wi-Fi and WiMAX)

ওয়াই–ফাই	ওয়াইম্যাক্স
১. এটি স্বল্পপাল্লার ওয়্যারলেস প্রযুক্তি যা প্রধানত বাড়ির অভ্যন্তরে বা সীমিত পরিসরে ব্যবহার করা হয়।	১. এটি দূরপাল্লার ওয়্যারলেস প্রযুক্তি, যা বহুদূর পর্যন্ত ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড সেবা প্রদান করে থাকে।
২. এর কভারেজ ঘরের ভিতর ৩২ মিটার এবং বাহিরে ১০০ মিটার।	২. এর কভারেজ প্রায় ৫০ কি.মি. এলাকা জুড়ে।
৩. হাফ-ডুপ্লেক্স মোড ব্যবহার করা হয়।	৩. ফুল-ডুপ্লেক্স মোড ব্যবহার করা হয়।
৪. ওয়াই-ফাই হলো IEEE 802.11 স্ট্যান্ডার্ড এর।	৪. ওয়াইম্যাক্স হলো IEEE 802.16 স্ট্যান্ডার্ড এর।
৫. গতি কম। প্রায় ১০ – ৫০ Mbps.	৫. গতি অতি দ্রুত (সাধারণত ৭৫ Mbps হতে 1 Gbps হতে পারে)।
৬. Wi-Fi নেটওয়ার্কে খরচ কম।	৬. Wi-MAX নেটওয়ার্কে খরচ বেশি।

৪. মোবাইল যোগাযোগ (Mobile Communications)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেমের উৎকর্ষতার ফসল হলো মোবাইল কমিউনিকেশন। ক্যাবল ছাড়াই যোগাযোগ করার নেটওয়ার্ক হলো মোবাইল যোগাযোগ। মোবাইল কমিউনিকেশনে একাধিক চলনশীল ডিভাইস অথবা একটি চলনশীল ও অন্যটি স্থির ডিভাইসের মধ্যে ডেটা/তথ্য আদান–প্রদান হয়ে থাকে। চলনশীল ডিভাইসকে মোবাইল ইউনিট/মোবাইল স্টেশন (মোবাইল সেট) এবং স্থির ডিভাইসকে ল্যান্ড ইউনিট/বেজ স্টেশন হিসেবে গণ্য করা হয়। মোবাইল সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান মোবাইল যোগাযোগ প্রযুক্তি GSM/CDMA, বেজ স্টেশন (এন্টেনাসহ ছোট অফিস) ও নেটওয়ার্ক কভারেজ এরিয়ার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে থাকে। এর প্রয়োগ হলো মোবাইল ফোন। মোবাইল যোগাযোগ প্রযুক্তি হলো GSM এবং CDMA। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীকে কথা বলা, মেসেজ সুবিধা, ইন্টারনেট ব্রাউজ করা ও ই–মেইল আদান–প্রদান করে থাকে। মোবাইল ফোনই যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে রাখছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। হ্যান্ডসেটগুলোতে আরও বেশি ইন্টারনেটনির্ভর সুবিধা নিয়ে এসেছে চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল প্রযুক্তি, যার সফল বাস্তবায়ন হলো WiMAX।

সেলুলার টেলিফোন (Cellular Telephone)

সেলুলার ফোন এক বিশেষ ধরনের ফোন, যা ঐ সেলের আওতায় স্থাপিত ট্রান্সমিটারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে কাজ করে। ট্রান্সমিটারের কভারেজের স্প্যানকে সেল (cell) বলা হয়। যেহেতু সেলুলার টেলিফোন ব্যবহারকারী এক সেল বা কভারেজ এরিয়া হতে অন্যান্য সেল বা কভারেজ এরিয়াতে চলাচল করে, তাই টেলিফোনটি কার্যকরভাবে স্থানীয় সেল ট্রান্সমিটারের মধ্য দিয়ে যায়। মোবাইল ফোন হলো একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস, যা বেজ স্টেশনের একটি সেলুলার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ফুল–ডুপ্লেক্স দ্বিমুখী রেডিও টেলিকমিউনিকেশনকে ব্যবহার করে থাকে। কথা বলা ছাড়াও সেলুলার বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে টেক্সট মেসেজ প্রদান, মাল্টিমিডিয়া মেসেজ সার্ভিস, ই–মেইল, ইন্টারনেট, গেম এবং ফটোগ্রাফি সেবা পাওয়া যায়। বর্তমানে স্মার্ট মোবাইল ফোনে উন্নত কম্পিউটিং সুবিধা পাওয়া যায়।

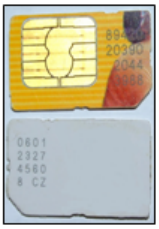

চিত্র : SIM Card

সিম কার্ড (SIM card)

জিএসএম (GSM – Global System for Mobile Communications) মোবাইল ফোনগুলোর জন্য একটি ক্ষুদ্র মাইক্রোচিপের প্রয়োজন পড়ে, যেটিকে সিম কার্ড (Subscriber Identity Module or SIM Card) বলে। সিম কার্ড আকারে ছোট ডাকটিকিটের মতো। সাধারণত মোবাইল ফোনের ব্যাটারির নিচে এটি স্থাপন করতে হয়। প্রতিটি মোবাইল ফোনের সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব ব্র্যান্ডের সিম কার্ড সরবরাহ করে। এদের একটি অপরটি থেকে আলাদা হয়ে থাকে। সিম–এর অভ্যন্তরে সুরক্ষিত উপায়ে service–subscriber key (IMSI) সংরক্ষিত থাকে, যা উক্ত মোবাইল ফোনের ব্যবহারকারীকে শনাক্ত করতে পারে। একই সিম কার্ড ভিন্ন ভিন্ন হ্যান্ড সেটে লাগিয়ে ব্যবহার করা যায়।

সেলুলার ফোনের প্রকারভেদ (Classification of Cellular Phone)

গঠনগত দিক থেকে সেলফোনগুলোকে সাধারণত নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. বেসিক ফোন (Basic Phone)
২. ক্যামেরা ফোন (Camera Phone)
৩. মিউজিক/এমপিথ্রি ফোন (Music/MP3 Phone)
৪. ভিডিও ফোন (Video Phone)
৫. স্মার্টফোন (Smart Phone)
৬. পিডিএ ফোন (PDA Phone)

চিত্র : বেসিক ফোন

চিত্র : ক্যামেরা ফোন

বেসিক ফোন (Basic Phone)

বেসিক ফোনগুলো প্রধানত স্বল্প বাজেটের ফোন। মোবাইল ফোনের বেসিক ফাংশনগুলো এসব ফোনে পাওয়া যায়। কথা বলা, এসএমএস করা, এফএম রেডিও প্রভৃতি সুবিধা এসব ফোনে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

ক্যামেরা ফোন (Camera Phone)

ক্যামেরা ফোনগুলোর মূল্য বেসিক ফোনের চাইতে বেশি। বিভিন্ন মানের ক্যামেরা ফোন বাজারে পাওয়া যায়। যে ক্যামেরা ফোনের মেগাপিক্সেল যত বেশি, তার মূল্য তত বেশি। অধিক মেগা পিক্সেলসম্পন্ন ক্যামেরা ফোনের মাধ্যমে ভালো মানের ছবি ও ভিডিও ধারণ করা যায়। আজকাল বেসিক ফোন ছাড়া অন্য প্রায় সকল সেলুলার ফোন তথা মোবাইল ফোনেই বিভিন্ন মানের ক্যামেরা সংযোজিত থাকে।

মিউজিক/এমপিথ্রি ফোন (Music/MP3 Phone)

এসব ফোনে সেলুলার ফোনের অন্যান্য সুবিধার পাশাপাশি মিউজিক উপভোগের ব্যবস্থা থাকে। মূলত সঙ্গীত পিপাসুদের জন্যই মিউজিক/এমপিথ্রি ফোনগুলো বিশেষভাবে তৈরি। বিভিন্ন ফরমেটের অডিও ফাইল চালানোর জন্য এগুলোর মধ্যে অডিও প্লেয়ার থাকে। তবে এমপিথ্রি ফরমেটই বেশি সমর্থিত। এসব ফোনে ভিডিও প্লেয়ারও থাকে। ফলে ভিডিও ফাইল চালানো যায়। এছাড়া এফএম রেডিও, ক্যামেরা ইত্যাদিসহ আরও উন্নত কিছু সুবিধা এতে পাওয়া যায়। এসব ফোনে সাধারণত অভ্যন্তরীণ মেমোরির ধারণ ক্ষমতা বেশি হয়ে থাকে। এছাড়া মাইক্রো এসডি কার্ড সংযুক্ত করে এদের মেমোরি বাড়িয়ে নেয়া যায়।

চিত্র : মিউজিক/এমপিথ্রি ফোন

চিত্র : ভিডিও ফোন

চিত্র : স্মার্ট ফোন

ভিডিও ফোন (Video Phone)

ভিডিও ফোনগুলোও এক ধরনের ক্যামেরা ফোন। সাধারণত যেসব ক্যামেরা ফোনের মাধ্যমে স্থির ছবি গ্রহণের পাশাপাশি ভিডিও ধারণ করা যায় সেগুলোকে ভিডিও ফোন বলে। সাধারণত থ্রিজি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ভিডিও কল করা সম্ভব হয়। বাজারে বিভিন্ন মানের ও দামের ভিডিও ফোন রয়েছে।

স্মার্ট ফোন (Smart Phone)

স্মার্ট ফোন হলো আরও উন্নত কম্পিউটিং ও কানেকটিভিটির সুবিধাসম্পন্ন মোবাইল ফোন। স্মার্ট ফোনগুলোতে উন্নত নানা অ্যাপ্লিকেশন ইন্সটল ও রান করা যায়। এজন্য স্মার্ট ফোনগুলোতে মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম থাকে, যা প্ল্যাটফর্ম নামে পরিচিত। স্মার্ট ফোনগুলো সবদিক থেকে বেশ শক্তিশালী হয়ে থাকে। এগুলোর প্রসেসর ও মেমোরি উন্নত ধরনের হয়। জাভার সমর্থনসহ আরও বহুবিধ সুবিধা এতে থাকে। এগুলো টুজি, থ্রিজি ইত্যাদি বিভিন্ন নেটওয়ার্কের উপযোগী হয়ে থাকে। উন্নত সব সুবিধার পাশাপাশি এগুলোতে উন্নত ক্যামেরা, ডিসপ্লে, এসএমএস, এমএমএস, ইমেইল, পুশ ইমেইল, ব্রাউজার প্রভৃতিসহ বহু ফিচার থাকে।

মোবাইল ফোনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Mobile Phone)

- সকল GSM ফোনে একটি সিম কার্ড ব্যবহার করা হয়।
- সকল মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীকে কথা বলার ও মেসেজ সুবিধা প্রদান করে।
- সব মোবাইল সেটের একটি রিচার্জেবল ব্যাটারি থাকে, যা ফোনের পাওয়ার সরবরাহ করে।
- সেটের কী প্যাড ব্যবহার করে ইনপুটের কাজ করা হয়। বর্তমানের আধুনিক অনেক সেটে টাচ স্ক্রিন ব্যবহার করে ইনপুট করা যায়।
- সব সেট ডিভাইসের একটি IMEI (International Mobile Equipment Identity) থাকে। এর ফলে ট্র্যাকার সিস্টেমের মাধ্যমে চুরি হওয়া সেট পুনরুদ্ধার সম্ভব।
- সকল মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীকে কথা বলার ও মেসেজ সুবিধা প্রদান করে।
- সব মোবাইল সেটের একটি রিচার্জেবল ব্যাটারি থাকে, যা ফোনের পাওয়ার সরবরাহ করে।
- সেটের কী প্যাড ব্যবহার করে ইনপুটের কাজ করা হয়। বর্তমানের আধুনিক অনেক সেটে টাচ স্ক্রিন ব্যবহার করে ইনপুট করা যায়।
- সব সেট ডিভাইসের একটি IMEI (International Mobile Equipment Identity) থাকে। এর ফলে ট্র্যাকার সিস্টেমের মাধ্যমে চুরি হওয়া সেট পুনরুদ্ধার সম্ভব।
- সকল মোবাইল ফোন ডিভাইসগুলোর একটি একক IMSI (International Mobile Subscriber Identity) নম্বর থাকে, যা অন্যান্য নেটওয়ার্কের সাথে ইন্টারকানেক্ট হওয়ার জন্য যে কোন মোবাইল নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত হয় ।

মোবাইল ফোনের সুবিধা (Advantages of Mobile Phone)

আধুনিক সুবিধা হিসেবে মোবাইলে যেসব সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো হলো–

১. এর মাধ্যমে দেশ বা বিদেশের যেকোনো মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর কাছে এসএমএস বা ক্ষুদেবার্তা প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়।
২. এর মাধ্যমে দেশ বা বিদেশের যেকোনো মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর কাছে মাল্টিমিডিয়া মেসেজ বা এমএমএস প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়।
৩. এর মাধ্যমে ই–মেইল গ্রহণ ও প্রেরণ করা যায়।
৪. ভিডিও কল করা যায়।
৫. ভয়েস ও ভিডিও চ্যাটিং করা যায়।
৬. গান শোনা ও ভিডিও দেখা যায়।
৭. অডিও ও ভিডিও রেকর্ড করা যায়।
৮. ব্লুটুথ ও ইনফ্রারেড প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য আদান–প্রদান করা যায়।
৯. ইন্টারনেট ব্রাউজ করা যায়।
১০. গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম বা জিপিএস–এর সুবিধা উপভোগ করা যায়।

পিডিএ ফোন (PDA Phone)

পার্সোনাল ডিজিটাল অ্যাসিস্টেন্ট এর সুবিধাসম্পন্ন ফোনগুলো পিডিএ ফোন। প্রযুক্তির দিক দিয়ে বর্তমান সময়ে এটি সবচেয়ে সেরা ফোন। পিডিএগুলো ক্ষুদ্রাকৃতির কম্পিউটারও বটে। আজকাল পিডিএগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা পাওয়া যায় এবং প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সুবিধা যুক্ত হচ্ছে। পিডিএগুলোতে যেসব সুবিধা পাওয়া যায় তাহলো–

১. সেলফোন সার্ভিস
২. ইন্টারনেট কানেকটিভিটি
৩. ই–মেইল
৪. টেক্সট মেসেজিং
৫. ফটো স্টোরেজ ও ট্রান্সমিশন
৬. ডিজিটাল ক্যালেন্ডার
৭. ডিজিটাল ও ইলেকট্রনিক ফাইল স্টোরেজ
৮. ভিডিও কনফারেন্সিং
৯. ভিডিও ট্রান্সমিশন
১০. ভিডিও ভিউয়িং প্রভৃতি।

চিত্র : পিডিএ ফোন

জিএসএম (GSM)

জিএসএম বা গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল কমিউনিকেশন্স (Global System for Mobile Communications বা GSM) হলো মোবাইল টেলিফোনি সিস্টেমের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় স্ট্যান্ডার্ড। একে দ্বিতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোন সিস্টেম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের মধ্যে রোমিং চুক্তি থাকার ফলে বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে যেকোনো ব্যক্তি জিএসএম এর আওতায় থাকা অবস্থায় নিজের মোবাইল ফোনটি ব্যবহার করতে পারেন। স্বল্প মূল্যের শর্ট মেসেজ সার্ভিস (এসএমএস) এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও জিএসএম পথিকৃৎ। GSM, TDMA (time–division multiplex access) ব্যবহার করে যেসব মোবাইল ফোন সার্ভিস দিয়ে থাকে তাহলো :

১. এসএমএস (SMS)
২. কল ফরওয়ার্ডিং (Call forwarding)
৩. আউটগোয়িং কল বেরিং (Barring of Outgoing Calls)–আউটগোয়িং কলকে নিয়ন্ত্রণ করা।
৪. ইনকামিং কল বেরিং (Barring of Incoming Calls)–ইনকামিং কলকে নিয়ন্ত্রণ করা।
৫. এডভাইস অব চার্জ (Advice of Charge –AOC)–অপারেটরের সাহায্য ছাড়াই কলের খরচ জানা।
৬. কল হোল্ডিং (Call Holding)
৭. কলার আইডি (caller ID)
৮. কলার ওয়েটিং (Caller Waiting)
৯. মাল্টিপার্টি সার্ভিস (Multiparty Service)
১০. ক্লোজড ইউজার গ্রুপ (Closed User Group –CUG).
১১. Explicit Call Transfer (ECT)–এই সার্ভিসে ব্যবহারকারী দুইটি কলের সাথে একত্রে সংযুক্ত হতে পারে।
১২. ফ্যাক্স সার্ভিস (Facsimile Services)
১৩. কম্পিউটারের সাথে সংযোগ (Connection with Computer)
১৪. মাল্টিপার্টি কনফারেন্সিং (Multiparty Conferencing)

জিএসএম এর বৈশিষ্ট্য (Features of GSM)

১. স্বল্প মূল্যের এসএমএস এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও জিএসএম পথিকৃৎ।
২. সেলুলার নেটওয়ার্ক বিধায় নির্দিষ্ট এলাকাতে মোবাইল ফোনগুলো জিএসএম এর সাথে সংযুক্ত হয়।
৩. সর্বোচ্চ দূরত্ব হলো ৩৫ কিলোমিটার।
৪. জিএসএম স্ট্যান্ডার্ডটি ইনডোর কভারেজকেও সমর্থন করে।

৫. অধিকাংশ টুজি জিএসএম নেটওয়ার্কগুলো 900 MHz বা 1800 MHz ব্যান্ডে পরিচালিত হয়।
৬. হ্যান্ডসেটের ট্রান্সমিশন ক্ষমতা ২ বা ১ ওয়াট।
৭. নিরাপত্তার জন্য বেশ কিছু ক্রিপ্টোগ্রাফিক অ্যালগরিদম ব্যবহার করে।

জিএসএম এর সুবিধা (Advantages of GSM)

১. এটি একটি দক্ষ প্রযুক্তি যার ফলে শক্তিশালী ফিচারসহ অনেক বেশি স্থায়ী নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়।
২. দালানের অভ্যন্তরে সিগন্যালের অবনতির হার কম।
৩. রিপিটারসমূহ ব্যবহারে সক্ষম।
৪. ট্রান্সমিশনের পালস স্বভাবের কারণে টকটাইম সাধারণত বেশি হয়ে থাকে।
৫. এটি মোবাইল টেলিফোনি সিস্টেমের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় স্ট্যান্ডার্ড।
৬. বিশ্বব্যাপী জিএসএম এর ব্যাপক কভারেজ রয়েছে।
৭. এক দেশের তৈরি জিএসএম হ্যান্ডসেট অন্য দেশে সাধারণত কোনো সমস্যা ছাড়াই ব্যবহার করা যায়।
৮. বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে ব্যবহার করা যায় বলে এক্ষেত্রে রোমিং কোনো সমস্যা হয়ে দেখা দেয় না।

জিএসএম এর অসুবিধা (Disadvantages of GSM)

১. এই প্রযুক্তিতে একাধিক ব্যবহারকারী একই ব্যান্ডউইথকে শেয়ার করে থাকে। তাই ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেশি হলে সম্প্রচারের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটে।
২. জিএসএম এর ফিক্সড সেল সাইট রেঞ্জ হলো সর্বোচ্চ ৩৫ কিলোমিটার যার কারিগরি সীমাবদ্ধতা রয়েছে।
৩. জিএসএম একটি পালস-ট্রান্সমিশন প্রযুক্তি ব্যবহার করে বলে কিছু কিছু ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের উপর এটি প্রভাব ফেলতে পারে। যেমন-পেস মেকার ও হিয়ারিং এইড ডিভাইসসমূহ। তাই বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে হাসপাতাল ও বিমানের অভ্যন্তরে সাধারণত সেল ফোন বন্ধ রাখা হয়।

সিডিএমএ (CDMA)

সিডিএমএ এর পুরো অর্থ হলো– 'কোড ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাকসেস' (CDMA– Code Division Multiple Access)। এটি একটি চ্যানেল অ্যাকসেস মেথড যা কিনা বিভিন্ন ধরনের রেডিও কমিউনিকেশন প্রযুক্তির দ্বারা বাস্তবায়িত হয়। সিডিএমএ প্রযুক্তিতে ভয়েস এবং ডেটা অ্যাপ্লিকেশনে অনেক ব্যান্ডউইথ পাওয়া যায়। সিডিএমএ তে এখন ২জি এবং থ্রিজি উভয় প্রযুক্তিই ব্যবহৃত হচ্ছে। সিডিএমএ পদ্ধতিতে বেতার তরঙ্গ ব্যান্ডকে কতগুলো ক্যারিয়ারে বিভক্ত করা হয় যা ১.২৫ মেগাহার্টজ প্রশস্ত। প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য আলাদা কোড দেয়া হয় এবং এই কোড পুরো ক্যারিয়ারের মধ্যে বিস্তৃত করা হয়।

সিডিএমএ এর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of CDMA)

১. এটি একটি চ্যানেল অ্যাকসেস মেথড যা বিভিন্ন ধরনের রেডিও কমিউনিকেশন প্রযুক্তির দ্বারা বাস্তবায়িত হয়।
২. এই প্রযুক্তিতে ভয়েস এবং ডেটা অ্যাপ্লিকেশনে অনেক ব্যান্ডউইথ পাওয়া যায়।
৩. এতে ২জি এবং থ্রিজি উভয় প্রযুক্তিই ব্যবহৃত হচ্ছে।
৪. বেতার তরঙ্গ ব্যান্ডকে কতগুলো ক্যারিয়ারে বিভক্ত করা হয় যা ১.২৫ মেগাহার্টজ প্রশস্ত।
৫. প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য আলাদা কোড দেয়া হয় এবং এই কোড পুরো ক্যারিয়ারের মধ্যে বিস্তৃত করা হয়।

সিডিএমএ এর সুবিধা (Advantages of CDMA)

১. এই প্রযুক্তি ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ, ক্রস-টক এবং ইন্টারফিয়ারেন্সকে ফিল্টার করে থাকে।
২. অত্যন্ত নিখুঁত মানের ভয়েস, অনেক বেশি প্রাইভেসি এবং অত্যন্ত সমৃদ্ধ মানের কল সুবিধা পাওয়া যায়।
৩. সিডিএমএ এর বিস্তৃত স্পেকট্রাম সিগন্যাল অনেক বেশি কভারেজ প্রদান করে।
৪. পরিচালনা ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম ।
৫. নেটওয়ার্কগুলো স্ট্যান্ডার্ড আইপি প্যাকেট ডেটা প্রটোকলসমূহ দিয়ে তৈরি।
৬. হ্যান্ডসেটগুলো সাধারণত স্বল্প শক্তিতে ট্রান্সমিট হয়। ফলে ব্যাটারির আয়ু বেড়ে যায়, দীর্ঘ টক টাইম ও স্ট্যান্ডবাই টাইম পাওয়া যায়।
৭. এই প্রযুক্তিতে একই রেডিও ফ্রিকুয়েন্সিকে বিপুল সংখ্যক গ্রাহক ভাগাভাগি করতে পারে।
৮. জিএসএম এর চাইতে এর কল কস্ট তুলনামূলকভাবে কম।

সিডিএমএ এর অসুবিধা (Disadvantages of CDMA)

১. সিডিএমএ নেটওয়ার্কটি জিএসএম এর মতো ততটা পরিপক্ব নয়।
২. সিডিএমএ তে আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধা পাওয়া যায় না ।
৩. সীমিত সংখ্যক অপারেটর এই প্রযুক্তিটি ব্যবহার করে বলে বিশ্বব্যাপী এর বিস্তৃতি কম।
৪. সিডিএমএ সার্ভিসের জন্য বিভিন্ন হ্যান্ডসেট পাওয়া গেলেও এক্ষেত্রে খুব বেশি বৈচিত্র্য নেই।
৫. প্রোপ্রায়েটরি স্বভাবের কারণে সিডিএমএ এর সকল ত্রুটি ইঞ্জিনিয়ারিং কমিউনিটির কাছে অজ্ঞাত থাকে।

জিএসএম (GSM) ও সিডিএমএ (CDMA) এর মধ্যে পার্থক্য

জিএসএম (GSM)	সিডিএমএ (CDMA)
১. GSM এ ব্যান্ডউইথ এর উত্তম সদ্ব্যবহারের জন্য ব্যান্ডউইথকে টাইম স্লটে বিভক্ত করা হয়।	১. CDMA তে প্রতিটি ব্যবহারকারীর জন্য আলাদাভাবে একটি ইউনিক কোড ও ব্যান্ডউইথ বরাদ্দ করা হয়।
২. এটি অনেক বেশি পরিণত একটি প্রযুক্তি যার ফলে শক্তিশালী ফিচারসহ অনেক বেশি স্থায়ী নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়।	২. CDMA তুলনামূলকভাবে নতুন একটি প্রযুক্তি এবং এর নেটওয়ার্কটি GSM এর মতো ততটা পরিপক্ব নয়।
৩. ফিক্সড সেল সাইট রেঞ্জ হলো সর্বোচ্চ ৩৫ কিলোমিটার যার কারিগরি সীমাবদ্ধতা রয়েছে।	৩. CDMA এর বিস্তৃত স্পেকট্রাম সিগন্যাল অনেক বেশি কভারেজ প্রদান করে।
৪. বিশ্বের শতকরা ৮০ ভাগ ব্যবহারকারী GSM স্ট্যান্ডার্ডটি ব্যবহার করে।	৪. সীমিত সংখ্যক অপারেটর CDMA প্রযুক্তিটি ব্যবহার করে।
৫. এর কলের খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি।	৫. এর কলের খরচ জিএসএম এর চাইতে কম।
৬. আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধা পাওয়া যায়।	৬. আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধা পাওয়া যায় না।
৭. GSM হ্যান্ডসেটগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি শক্তিতে ট্রান্সমিট হয়। ফলে ব্যাটারির আয়ু কম থাকে, টক টাইম ও স্ট্যান্ডবাই টাইম কমে আসে।	৭. CDMA হ্যান্ডসেটগুলো সাধারণত স্বল্প শক্তিতে ট্রান্সমিট হয়। ফলে ব্যাটারির আয়ু বেড়ে যায়, দীর্ঘ টক টাইম ও স্ট্যান্ডবাই টাইম পাওয়া যায়।
৮. বাজারে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বিভিন্ন ব্র্যান্ডের GSM হ্যান্ডসেট পাওয়া যায় ।	৮. CDMA সার্ভিসের জন্য বিভিন্ন হ্যান্ডসেট পাওয়া গেলেও এক্ষেত্রে খুব বেশি বৈচিত্র্য নেই।

রোমিং (Roaming)

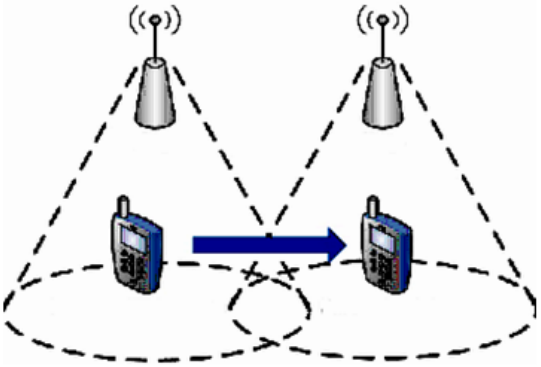

যে মোবাইলটি ব্যবহার করা হচ্ছে সেটির কভারেজ এরিয়ার বাইরে গিয়েও অনবরত ডেটা সার্ভিস পাওয়াকে রোমিং বলা হয়। ইন্টারন্যাশনাল রোমিং সার্ভিসের মাধ্যমে বিদেশে গিয়ে বিদেশি অপারেটরের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে নিজের মোবাইলফোন নম্বর ও হ্যান্ডসেট ব্যবহার করা যায়। যে অপারেটরের ফোন ব্যবহার করা হচ্ছে সে অপারেটর এবং বাইরে যেখান থেকে রোমিং সুবিধা পাওয়া যাবে সেখানকার অপারেটরদের পারস্পরিক চুক্তি ও হ্যান্ডসেটের ওপর রোমিং সার্ভিস নির্ভর করে। এক দেশ থেকে আরেক দেশে অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ফোন কলে যে টাকা বিল আসে রোমিং এ তার চেয়ে অনেক কম বিল আসে। সাধারণ মোবাইল কলের সাথে অতিরিক্ত টাকা যুক্ত হয়ে রোমিং চার্জ নির্ধারিত হয়। বাইরের যে অপারেটরের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হচ্ছে সে অপারেটর অতিরিক্ত এ বিলটি প্রদান করা হয়। শুধু বিদেশে নয় দেশের ভিতরেও এক অপারেটরের সাথে আরেক অপারেটর চুক্তি করে অভ্যন্তরীণ রোমিং সার্ভিস দিতে পারে। এর ফলে দেশের অভ্যন্তরে যেখানে কোন অপারেটরের নেটওয়ার্ক নেই সেই অপারেটরের গ্রাহক অন্য অপারেটরের রোমিং সার্ভিস ব্যবহার করে সহজেই সর্বত্র সংযুক্ত থাকতে পারে।

৪.১ মোবাইল ফোনের প্রজন্ম (Mobile Phone Generation)

চিত্র : অ্যানালগ Motorola DynaTAC 8000X অ্যাডভান্সড মোবাইল ফোন সিস্টেম

মোবাইল ফোনের উন্নয়ন ও বিকাশ লাভের জন্য অনেকগুলো ধাপ বা পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছে। অতিক্রমের একেকটি ধাপ বা পর্যায় হলো মোবাইল ফোন প্রজন্ম বা জেনারেশন। একেকটি প্রজন্ম পরিবর্তনের সময় কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হয় এবং পুরনো বৈশিষ্ট্যগুলোর বিলুপ্তি ঘটে। মোবাইল ফোনের প্রজন্মকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা–

১. প্রথম প্রজন্ম (1st Generation – 1G)
২. দ্বিতীয় প্রজন্ম (2nd Generation – 2G)
৩. তৃতীয় প্রজন্ম (3rd Generation – 3G)
৪. চতুর্থ প্রজন্ম (4th Generation – 4G)

প্রথম প্রজন্ম (1st Generation – 1G) : সেলুলার নেটওয়ার্ক (১৯৭৯ – ১৯৯০)

আশির দশকে প্রথম প্রজন্মের মোবাইল ফোন ছিল সেলুলার নেটওয়ার্কনির্ভর এবং এগুলো এনালগ সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে কাজ করে। ১৯৭৯ সালে জাপানের এনটিটি প্রথম বাণিজ্যিকভাবে অটোমেটেড সেলুলার নেটওয়ার্ক চালু করার মাধ্যমে 1G এর সূচনা করে। নব্বইয়ের দশকের আগ পর্যন্ত এ প্রজন্মের সিস্টেম চলতে থাকে। উদাহরণ : AMPS (Advanced Mobile Phone System),

প্রথম প্রজন্মের মোবাইল সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য :

১. অ্যানালগ পদ্ধতিতে রেডিও সিগন্যাল ব্যবহৃত হতো।
২. সেলুলার নেটওয়ার্কের প্রবর্তন।
৩. বেজ স্টেশন ও মোবাইল ফোন দুটি ভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করে।
৪. অর্ধপরিবাহী মেমোরি এবং মাইক্রোপ্রসেসরের ব্যবহার।
৫. প্রথম দিকে মোবাইল ফোনগুলোর ওজন বেশি হলেও ধীরে ধীরে হালকা মোবাইল ফোন তৈরি হতে থাকে।
৬. চ্যানেল এক্সেস পদ্ধতি হল FDMA।
৭. আকার তুলনামূলকভাবে বড় এবং ওজন বেশি।
৮. কথপোকথন চলা অবস্থায় ব্যবহারকারীর অবস্থানের পরিবর্তন হলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
৯. আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধা না থাকা।

দ্বিতীয় প্রজন্ম (2nd Generation – 2G) : ডিজিটাল নেটওয়ার্ক (১৯৯১ – ২০০০)

১৯৯০ সালে GSM স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করে দ্বিতীয় প্রজন্মের (2G) মোবাইল সিস্টেমের যাত্রা শুরু হয়। এতে ডিজিটাল ট্রান্সমিশন সিস্টেমের ব্যবহার চালু হয় এবং ভয়েস ও ডেটা প্রেরণ সম্ভব হয়। এ প্রজন্মের মোবাইলে এসএমএস টেক্সট মেসেজিং করা যায়। উদাহরণ : Digital AMPS GSM 850 / 900 / 1800 / 1900|

দ্বিতীয় প্রজন্মের মোবাইল সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য :

১. এ প্রজন্মের ট্রান্সমিশন সিস্টেম ডিজিটাল পদ্ধতিতে ডেটা ও Noise মুক্ত।
২. ডেটা আদান–প্রদানে ত্রুটি নির্ণয় ও ত্রুটি সংশোধন হতে থাকে।
৩. ভয়েস প্রেরণের সুবিধা চালু হয়।
৪. চ্যানেল একসেস পদ্ধতি হল– FDMA, TDMA, CDMA
৫. মোবাইল ফোনেই পেমেন্ট সিস্টেমের প্রবর্তন।
৬. MMS (Multimedia Message Service), SMS সেবা চালু হয়।
৭. সীমিতভাবে আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধা চালু হয়।
৮. মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার সুবিধা।
৯. ডেটার নিরাপত্তার জন্য এনক্রিপশন ব্যবস্থা।

তৃতীয় প্রজন্ম (3rd Generation – 3G) : হাইস্পিড আইপি ডেটা নেটওয়ার্ক (২০০১ – ২০০৮)

মূলত ডেটা সার্ভিসের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলস্বরূপ সূচনা ঘটে মোবাইলের তৃতীয় প্রজন্ম বা 3G এর। ২০০১ সালে জাপানে এনটিটি ডোকোমো WCDMA প্রযুক্তি ব্যবহার করে 3G নেটওয়ার্ক চালু করে। এ দশকে থ্রিজি প্রযুক্তির মোবাইল টেলিফোনি কমিউনিকেশন্স প্রটোকল High–Speed Downlink Packet Access (HSDPA) চালু হয়। ফলে তৃতীয় প্রজন্মটি ভাগ হয়ে 3.5G, 3G+ বা turbo 3G নামে পরিচিতি পায়। WCDMA পদ্ধতি পরবর্তীতে UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) নামে পরিচিত। 3G তে উচ্চগতির ডেটা ট্রান্সফার ও মাল্টিমিডিয়া ডেটা ব্যবহারসহ CDMA ও GPRS (General Packet Radio Service) স্ট্যান্ডার্ডের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়।

উদাহরণ : EDGE, HSPA.

তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য

১. ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য সার্কিট স্যুইচিংয়ের বদলে প্যাকেট স্যুইচিংয়ের প্রবর্তন।
২. ভয়েস ও ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য ডিজিটাল সিস্টেমের ব্যবহার।
৩. সেল সিগন্যাল এনকোডিং বা চ্যানেল একসেস পদ্ধতি হল TD – CDMA
৪. উচ্চগতির ডেটা স্থানান্তর (২ Mbps বা সার্বিক)
৫. আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধা।
৬. WCDMA,CDMA2000 1xEV–DO, HSPA, HSDPA, UMTS প্রযুক্তির ব্যবহার বিকাশ লাভ করেছে।
৭. খুব দ্রুত ছবি ও ভয়েস আদান–প্রদান করা যায়।
৮. ভিডিও কলের প্রচলন শুরু।

চিত্র : একইসাথে 2G এবং 3G নেটওয়ার্কে চলার উপযোগী কয়েকটি মোবাইল ফোন

তৃতীয় প্রজন্ম প্রযুক্তির সুবিধা (Advantages of 3G)

১. ব্যান্ডউইথ, নিরাপত্তা এবং বিশ্বস্ততা বেশি।
২. সর্বদা অনলাইনে থাকে তাই যে কোন সময় ব্রাউজ করা যায়, ইমেইল করা এবং তথ্য ডাউনলোড করা যায়।
৩. ভিডিও কনফারেন্সিং করা যায়।
৪. সবসময় ইন্টারনেট সংযোগ থাকে, আলাদা করে সংযোগের প্রয়োজন হয় না।
৫. সমৃদ্ধ মাল্টিমিডিয়া সার্ভিস পাওয়া যায়।
৬. সার্ভিস প্রোভাইডারের মাধ্যমে ইন্টারঅপারেবিলিটি সেবা দেয়।
৭. নির্দিষ্ট (fixed) বা বিভিন্ন রেটে পাওয়া যায়।

তৃতীয় প্রজন্ম প্রযুক্তির অসুবিধা (Disadvantages of 3G)

১. ভিন্ন হ্যান্ডসেটের প্রয়োজন হয়।
২. সেলুলার অবকাঠামো, বেজ স্টেশন আপগ্রেডিং উচ্চ মূল্যের।
৩. বিদ্যুৎ খরচ বেশি।
৪. রোমিং এবং ডেটা/ভয়েস একত্রে কাজ করা এখনো বাস্তবায়ন করা হয় নি।
৫. স্পেকট্রাম লাইসেন্স খরচ, নেটওয়ার্ক ডিপ্লয়মেন্ট খরচ অনেক বেশি।

চতুর্থ প্রজন্ম (4th Generation – 4G) : উদীয়মান (২০০৯ – বর্তমান)

ভালো মানের থ্রিজি কভারেজের অভাব থেকেই শুরু হয় চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা। ইন্টারনেটনির্ভর মোবাইল ফোন সিস্টেমে আল্ট্রা–ব্রডব্যান্ড গতির ইন্টারনেট ব্যবহার করা যাবে। দ্রুত চলনশীল ডিভাইসে ডেটা স্থানান্তর গতি ১০০ Mbps এবং স্থির ডিভাইসে ১ Gbps। 4G এর প্রযুক্তি LTE (Long Term Evolution) স্ট্যান্ডার্ড। ব্যবহারকারীগণ খুব সহজেই যে কোন জায়গায় যে কোন সময় পূর্বের প্রজন্মের তুলনায় দ্রুতগতিতে ডেটা, ভয়েস এবং মাল্টিমিডিয়া আদান–প্রদান করতে পারবে। উদাহরণ : WiMAX2.

চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য

১. এ প্রজন্মে সার্কিট স্যুইচিং বা প্যাকেট স্যুইচিং–এর পরিবর্তে ইন্টারনেট প্রটোকল (IP) নির্ভর নেটওয়ার্ক ব্যবহার।
২. ডেটা ট্রান্সফার রেট হবে সবচেয়ে বেশি।
৩. 4G এর গতি 3G এর চেয়ে প্রায় ৫০ গুণ বেশি।
৪. উচ্চ গতির ফ্রিকুয়েন্সি।
৫. ত্রি-মাত্রিক ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা।
৬. বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে পরিবর্তনের সময় নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ থাকবে।
৭. উন্নতমানের মোবাইল টেলিভিশন দেখার উপযোগী হবে।

৪.২. মোবাইলে ইন্টারনেট (Internet in Mobile Phone)

GPRS, EDGE, WAP ইত্যাদি প্রযুক্তির মাধ্যমে এখন মোবাইল ফোনেও ইন্টারনেট ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এখন মোবাইলে ফোনেই ই–মেইল আদান–প্রদান, ওয়েব ব্রাউজিং, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং, টিভি দেখা ইত্যাদিসহ বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি এক নিমিষেই পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হলে উপযুক্ত হ্যান্ডসেট ব্যবহার করতে হয়। কারণ সকল ধরনের হ্যান্ডসেট ইন্টারনেট ব্যবহারে সক্ষম হয় না। এক্ষেত্রে খানিকটা উঁচু মানের হ্যান্ডসেট ও স্মার্টফোন ব্যবহার করে ইন্টারনেট অ্যাকসেস করা যায়। বর্তমানে বাজারে স্বল্পমূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহারের উপযোগী বিভিন্ন ধরনের মোবাইল ফোন কিনতে পাওয়া যায়।

মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা (Advantages of Mobile Internet)

১. সাশ্রয়ী বিভিন্ন ইন্টারনেট সার্ভিস নিয়ে ইচ্ছে অনুযায়ী ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায়।
২. কভারেজের আওতাভুক্ত যেকোনো স্থান থেকে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায়।
৩. সার্বক্ষণিক ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত থাকা যায়।
৪. যখন তখন যেকোন স্থান থেকে ইমেইল চেক ও প্রেরণ করা যায়।
৫. দূর দূরান্তে অবস্থানরত বন্ধু–বান্ধবদের সাথে চ্যাটিং করা যায়।
৬. বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে মোবাইলে ভয়েস কল করা যায়।
৭. থ্রিজি প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভিডিও কল করা যায়।
৮. স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন অ্যাপস ব্যবহার করে টেলিভিশন দেখা যায়।
৯. উন্নতমানের মোবাইল ফোনে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (GPS) ব্যবহার করা যায়।
১০. দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় নানা ধরনের অ্যাপস ডাউনলোড করে স্মার্টফোনে সেগুলো ব্যবহার করা যায়।

১১. ইন্টারনেটে সার্চ করে প্রয়োজনীয় নানা তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে সংগ্রহ করা যায়।
১২. ব্লুটুথ বা ডেটা ক্যাবলের সাহায্যে মোবাইল ফোনকে কম্পিউটারের সাথে যুক্ত হওয়া যায়।
১৩. বিভিন্ন সামাজিক নেটওয়ার্কিং ও ভিডিও শেয়ারিং সাইট যেমন– ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।
১৪. স্মার্টফোনগুলোর মাধ্যমে বিনামূল্যের ওয়াইফাই হটস্পটগুলোতে ইন্টারনেট অ্যাকসেস করা যায়।

মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহারের অসুবিধা (Disadvantages of Mobile Internet)

১. শুধুমাত্র বিশেষ পর্যায়ের হ্যান্ডসেটগুলোতেই ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায়।
২. স্মার্টফোনগুলো ছাড়া অন্যান্য মোবাইল ফোনগুলোতে ইন্টারনেট ব্যবহার করা অনেকটাই ঝামেলাপূর্ণ।
৩. মোবাইলের স্ক্রিনের সাইজ ছোট হওয়ায় ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে টেক্সট ও গ্রাফিক্স পড়তে সমস্যা হয়।
৪. ওয়েব সাইট ব্রাউজের সময় পুরো পেইজটি একসাথে দেখা সম্ভব হয় না। ব্যবহারকারীকে স্ক্রল করে পেইজ ভিজিট করতে হয় যা বিরক্তির কারণ। আধুনিক টাচস্ক্রিনের মোবাইলে এই ঝামেলা অনেকটাই দূর হয়েছে।
৫. লো কনফিগারেশনের মোবাইল ফোনগুলো ফ্ল্যাশ ও অন্যান্য ভারী কনটেন্টগুলোকে লোড করতে পারে না।
৬. মেসেজ বা ই–মেইল টাইপ করতে বেশি সময়ের প্রয়োজন পড়ে।
৭. ওয়েব সাইটে থাকা পিডিএফ, ভিডিও ইত্যাদি ফাইলগুলো খোলা ও দেখার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে থাকে। স্মার্টফোনগুলোর ক্ষেত্রে এই সমস্যা কম হয়ে থাকে।
৮. সব হ্যান্ডসেট সকল ধরনের ফরমেটকে সমর্থন করে না।
৯. ইন্টারনেটের স্পিড কম হলে পেইজ লোড হতে দেরি হয় যা সময় অপচয়ী ও বিরক্তির কারণ হয়।
১০. ইন্টারনেটের খরচ বেশি হয়ে থাকে।

জিপিআরএস (GPRS)

জেনারেল প্যাকেট রেডিও সার্ভিসেস বা জিপিআরএস (General Packet Radio Service– GPRS) হলো একটি প্যাকেট ওরিয়েন্টেড মোবাইল ডেটা সার্ভিস যা সাধারণত ২জি সেলুলার মোবাইল কম্যুনিকেশন সিস্টেমের ব্যবহারকারীদের জন্য পাওয়া যায়। জিপিআরএস এর মাধ্যমে মোবাইল টেলিফোন নেটওয়ার্ক জুড়ে তথ্য আদান প্রদান করা যায়। এর মাধ্যমে মোবাইল নেটওয়ার্কে অনেক বেশি ব্যান্ডউইডথ পাওয়া যায়।

জিপিআরএস এর সুবিধা (Advantages of GPRS)

১. নেট সার্ফিং, ই-মেইল গ্রহণ ও প্রেরণ করা যায়।
২. দ্রুতগতিতে টেক্সট ডকুমেন্ট, স্প্রেডশিট, ফটোগ্রাফ ও ইলাস্ট্রেশন, স্থির ও চলমান ইমেজ, অডিও, করপোরেট ই-মেইল প্রভৃতি ট্রান্সমিশন করা যায়।
৩. Point–to–Point (P2P)
৪. Point–to–Multiple (P2M) সুবিধা গ্রহণ।
৫. মোবাইল চ্যাটিং করা যায়।
৬. অনলাইনে গেম খেলা যায়।
৭. সার্বক্ষণিক ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত থাকা যায়।

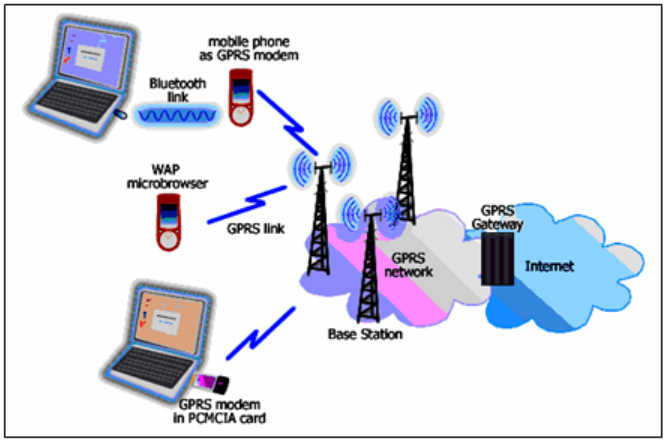

জিপিআরএস এর বৈশিষ্ট্য (Features of GPRS)

১. 2G সিস্টেমে GPRS প্রতি সেকেন্ডে 56–114 kbit ডেটা রেট প্রদান করে।
২. গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য গ্রহণ ও প্রেরণের ক্ষেত্রে GPRS বিশেষ সুযোগ দিয়ে থাকে।
৩. ওয়েব ব্রাউজিং থেকে চ্যাট পর্যন্ত ডেস্কটপে যেসব অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করা হয় তার সবগুলোর সাথেই GPRS কাজ করে।
৪. এমএমএস, সেলুলারের মাধ্যমে পুশ টু টক, ইন্সট্যান্ট মেসেজিং, ওয়্যারলেস অ্যাপ্লিকেশন প্রটোকল (WAP), পয়েন্ট–টু–পয়েন্ট (P2P) সার্ভিস প্রভৃতি সেবা GPRS এর মাধ্যমে পাওয়া যায়।
৫. জিপিআরএস এর মাধ্যমে এসএমএস পাঠানোর ক্ষেত্রে তা প্রতি মিনিটে ৩০টি এসএমএস পাঠাতে সক্ষম।
৬. GPRS কে অনেক সময় 2.5G নামেও ডাকা হয় যা কিনা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল টেলিফোনি প্রযুক্তির মাঝামাঝি একটি প্রযুক্তি।

জিপিআরএস এর অসুবিধা/সীমাবদ্ধতা (Limitations of GPRS)

- কেবল সীমিত রেডিও রিসোর্স পাওয়া যায়।
- জিপিআরএস এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ 171.2 kbps গতি পাওয়ার কথা বলা হলেও বাস্তবিকভাবে এই গতি পাওয়া যায় না। এটি এখনও ধীর গতির একটি প্রযুক্তি হিসেবে বিবেচিত।

ইডিজিই (EDGE)

জিপিআরএস এর চাইতে উন্নত মোবাইল ফোন প্রযুক্তি হলো ইডিজিই। EDGE এর পুরো অর্থ হলো Enhanced Data rates for GSM Evolution। এটি Enhanced GPRS (EGPRS) বা IMT Single Carrier (IMT–SC) কিংবা Enhanced Data rates for Global Evolution নামেও পরিচিত। স্ট্যান্ডার্ড জিএসএম নেটওয়ার্কে উন্নত ডেটা ট্রান্সমিশন রেট প্রদান করে EDGE। ২০০৩ সালের শুরুতে জিএসএম নেটওয়ার্কে EDGE কে চালু করা হয়।

ইডিজিই এর বৈশিষ্ট্য (Features of EDGE)

১. এটি স্ট্যান্ডার্ড GPRS এর চাইতে চারগুণ বেশি ট্রাফিক বহন করতে পারে।
২. থ্রিজি নেটওয়ার্কের জন্য ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন্স ইউনিয়ন এর চাহিদাগুলো EDGE পূরণ করেছে ।
৩. ৯টি মডুলেশন ও কোডিং স্কিম ব্যবহার করে।
৪. বৃহৎ চিপ ভেন্ডরদের দ্বারা GSM এবং WCDMA/HSPA উভয়টির জন্যই বর্তমানে EDGE সমর্থনকৃত।

ইডিজিই এর সুবিধা (Advantages of EDGE)

১. যেকোনো প্যাকেট সুইচড অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যেমন– ইন্টারনেট সংযোগের জন্য EDGE ব্যবহার করা যায়।
২. ভিডিও সার্ভিস এবং মাল্টিমিডিয়া সুবিধাদি প্রদানের মতো হাই–স্পিড ডেটা অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে EDGE ডেটার ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে।
৩. EDGE এর মাধ্যমে মোবাইল ফোনে বা কম্পিউটারে দ্রুতগতিতে নেট সার্ফিং, ই–মেইল গ্রহণ ও প্রেরণ করা যায়।
৪. দ্রুতগতিতে টেক্সট ডকুমেন্ট, স্প্রেডশিট, ফটোগ্রাফ ও ইলাস্ট্রেশন, স্থির ও চলমান ইমেজ, অডিও, করপোরেট ই-মেইল প্রভৃতি ট্রান্সমিশন করা যায়।
৫. মোবাইল চ্যাটিং করা যায় এবং অনলাইনে গেম খেলা যায়।
৬. মোবাইল ডিভাইসে স্ট্রিমিং অডিও এবং ভিডিও উপভোগ করা যায়।

৫. কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং (Computer Networking)

৫.১ নেটওয়ার্ক এর ধারণা (Concept of Network)

কমপিউটার নেটওয়ার্ক বলতে বুঝায় দুই বা ততোধিক কমপিউটারের মধ্যে আন্তঃসংযোগ ব্যবস্থা। যার ফলে কমপিউটারসমূহের সহজে তথ্য বিনিময় এবং রিসোর্স (Resource) শেয়ার করতে পারে। নেটওয়ার্কিং–এর ফলে কমপিউটারগুলো একে অপরের সাথে অত্যন্ত দক্ষতা ও দ্রুততার সাথে ডেটা বিনিময় করতে পারে। কম্পিউটার প্রযুক্তির সর্বাধুনিক বিকাশ হচ্ছে বিশ্বব্যাপী কম্পিউটার নেটওয়ার্ক প্রসারিত করা। ইন্টারনেট হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম কম্পিউটার নেটওয়ার্ক। কম্পিউটার নেটওয়ার্কর মাধ্যমে ডেটা আদান-প্রদান, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, ই-মেইল, অনলাইন ব্যাংকিং ইত্যাদি কাজ করা যায়।

৫.২ কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ব্যবহার/উদ্দেশ্য (Use of Computer Network)

১. **তথ্য বিনিময় (Information Sharing) :** নেটওয়ার্কভুক্ত এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে সহজেই তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।

২. **হার্ডওয়্যার রিসোর্স শেয়ারিং (Hardware Resource Sharing) :** কম্পিউটারের সাথে যুক্ত অন্যান্য যন্ত্রপাতি যেমন- প্রিন্টার, মডেম ইত্যাদি অন্য কম্পিউটার থেকে ব্যবহার করা যায়। এতে করে খরচ বেঁচে যায়।

৩. **সফটওয়্যার রিসোর্স শেয়ারিং (Software Resource Sharing) :** নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারের মধ্যে থাকা বিভিন্ন সফটওয়্যার এবং ফাইল অন্যান্য কম্পিউটার থেকে শেয়ার করা যায়।

৪. **তথ্য সংরক্ষণ (Information Preservation) :** নেটওয়ার্কিং সুবিধা কাজে লাগিয়ে একটি কেন্দ্রীয় স্টোরেজ মিডিয়া বা সার্ভারে নেটওয়ার্ক ক্লায়েন্ট যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে। এতে করে ডেটা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে না।

৫. **ম্যাসেজ আদান–প্রদান (Exchanging Message) :** নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারগুলো নিজেদের মধ্যে বার্তা আদান-প্রদান করতে পারে। এভাবে নেটওয়ার্ক স্থাপন করে কাগজবিহীন অফিস প্রতিষ্ঠা করা যায়।

৬. **দূরবর্তী স্থান থেকে ব্যবহার (Remote Using) :** কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এ সংযুক্ত হয়ে ঘরে বসে অফিসের অনেক কাজ করা যায়।

৭. **ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট (Database management) :** কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এর ফলে কোন প্রতিষ্ঠানের সকল ডেটা নেটওয়ার্কভুক্ত সার্ভারে স্টোর করে কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যাকআপ রাখা ইত্যাদি কাজ করা যায়।

৮. **অফিস অটোমেশন (Office Automation) :** কম্পিউটার নেটওয়ার্ক করে একটি বড় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান, আপডেটকরণ, লেনদেন, রিপোর্ট তৈরিকরণ ইত্যাদি কাজ করা যায়।

৯. **নিরাপত্তা (Security) :** পাসওয়ার্ড দিয়ে এক্সেস কন্ট্রোল করা যায়। ফলে অঅনুমোদিত ব্যবহারকারী নেটওয়ার্কে প্রবেশ করতে পারে না।

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক স্থাপনের অসুবিধা

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এর সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধাও রয়েছে। যেমন–

১. নেটওয়ার্ক সিস্টেম বাস্তবায়নে অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়।
২. যথাযথভাবে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকলে ভাইরাস আক্রমণ এবং ডেটা হ্যাকিং এর ফলে নেটওয়ার্ক সিস্টেমে সমস্যার সৃষ্টি হয়।
৩. নেটওয়ার্ক সিস্টেম বাস্তবায়নের পর এর রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়।

৫.৩ কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ (Classification of Computer Network)

বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ করা যায়। নিচে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এর প্রকারভেদ/শ্রেণিবিভাগ ছকের সাহায্যে দেখানো হলো :

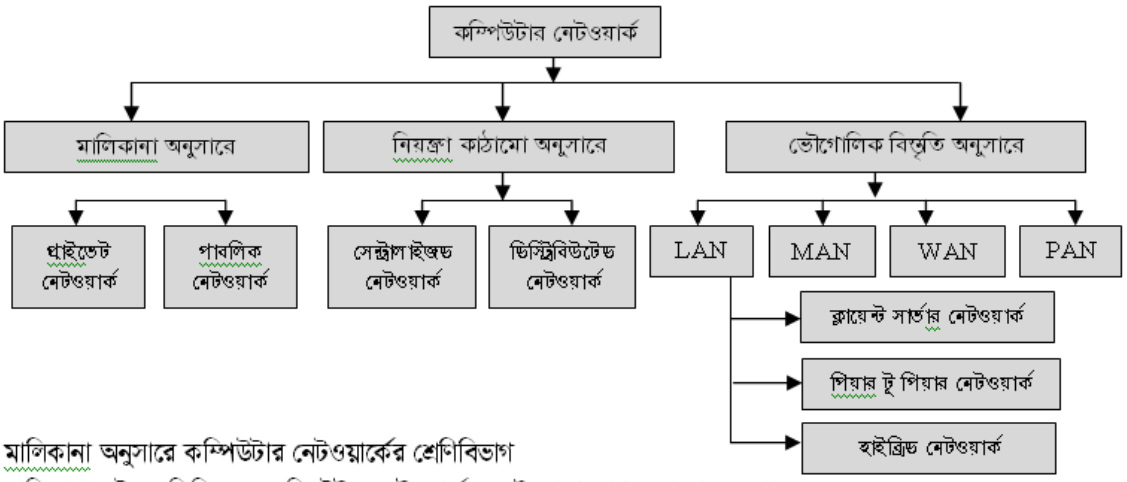

মালিকানা অনুসারে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের শ্রেণিবিভাগ

মালিকানার উপর ভিত্তি করে কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. **প্রাইভেট নেটওয়ার্ক :** কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের একক মালিকাধীন নেটওয়ার্ককে প্রাইভেট নেটওয়ার্ক বলা হয়। এই ধরনের নেটওয়ার্ক কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে বলে যে কেউ ইচ্ছে করলেই এই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারে না। ব্যবহারকারী সীমিত বলে এতে ট্রাফিক কম থাকে বিধায় ডেটা ট্রান্সফার দ্রুত গতির হয়। বিভিন্ন ব্যাংকের এটিএম ব্যবস্থা এই নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত।

২. **পাবলিক নেটওয়ার্ক :** এই নেটওয়ার্ক কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের একক মালিকাধীন নয়। যে কেউ ইচ্ছে করলেই এই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারে। ব্যবহারকারী অসংখ্য বলে এতে ট্রাফিক বেশি থাকে বিধায় ডেটা ট্রান্সফার কম গতির হয়। এ ধরনের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে সাধারণত ব্যবহারকারীকে নির্ধারিত ফি দিতে হয়। যেমন– ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন ইত্যাদি এক একটি পাবলিক নেটওয়ার্ক।

পাবলিক নেটওয়ার্ক	প্রাইভেট নেটওয়ার্ক
১. পাবলিক নেটওয়ার্ক কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের একক মালিকাধীন নয়।	১. প্রাইভেট নেটওয়ার্ক কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের একক মালিকাধীন হয়ে থাকে।
২. যে কেউ এ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারে।	২. যে কেউ এ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারে না।
৩. কম নিরাপদ।	৩. অধিক নিরাপদ।
৪. ইহা কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়।	৪. ইহা ব্যক্তি মালিকাধীন নিয়ন্ত্রিত হয়।
৫. ট্রাফিক কম।	৫. ট্রাফিক বেশি।
৬. ডেটা ট্রান্সফার দ্রুত গতির হয়।	৬. ডেটা ট্রান্সফার কম গতির হয়।
৭. উদাহরণ : ব্যাংকের এটিএম।	৭. উদাহরণ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট এর নিজস্ব নেটওয়ার্ক

নিয়ন্ত্রণ কাঠামো অনুসারে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের শ্রেণিবিভাগ

নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ও সার্ভিসের উপর ভিত্তি করে কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. **সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্ক :** একটি প্রধান কম্পিউটার বা হোস্ট কম্পিউটার এবং কিছু টার্মিনাল নিয়ে গঠিত হয় সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্ক। হোস্ট কম্পিউটার সকল প্রসেসিং এর কাজ এবং নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণের কাজ করে থাকে।

হোস্ট হিসেবে সাধারণত মেইনফ্রেম অথবা অন্য কোন শক্তিশালী সার্ভার কম্পিউটার এবং টার্মিনাল হিসেবে কী বোর্ড ও মনিটর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। টার্মিনালের সাহায্যে ব্যবহারকারী হোস্ট কম্পিউটারে সংযুক্ত হয়ে থাকে। টার্মিনাল দু'ধরনের হয়ে থাকে। যথা–

ক. **ডাম্ব টার্মিনাল :** এর কোন মেমোরি, প্রসেসিং ক্ষমতা ও স্টোরেজ থাকে না।

খ. **ইন্টিলিজেন্ট টার্মিনাল :** সীমিতভাবে মেমোরি, প্রসেসিং ক্ষমতা ও স্টোরেজ থাকে।

২. **ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক :** যে নেওয়ার্কে নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারসমূহ এমনভাবে বিন্যস্ত যাতে অনেকগুলো প্রসেসর (সিপিইউ) বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো মেশিনে থাকে, কিন্তু প্রয়োজনে যেগুলো আলাদাভাবে অথবা সংযুক্তভাবে কাজ করতে পারে তাকে ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক বলা হয়।

৩. **হাইব্রিড নেটওয়ার্ক :** সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্ক ও ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্কের সংমিশ্রণে তৈরি নেটওয়ার্ককে হাইব্রিড নেটওয়ার্ক বলা হয়। এই নেটওয়ার্কে হোস্ট কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রণ ও প্রসেসিং এর পাশাপাশি ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্কের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে।

ভৌগোলিক বিস্তৃতি অনুসারে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের শ্রেণিবিভাগ

ভৌগোলিক বিস্তৃতি অনুসারে কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে মূলত চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Personal Area Network – PAN)
২. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Local Area Network – LAN)
৩. মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (Metropoliton Area Network – MAN)
৪. ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (Wide Area Network – WAN)

নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

১. পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Personal Area Network – PAN)

পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা প্যান হলো এমন একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক যেটি পার্সোনাল কম্পিউটার ডিভাইসসমূহের মধ্যে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্যানের ব্যাপ্তি সাধারণত ১০ মিটারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

প্যান এর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of PAN)

১. পার্সোনাল কম্পিউটার ডিভাইসসমূহের মধ্যে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়।
২. খরচ তুলনামূলকভাবে কম।
৩. দ্রুত ডেটা আদান-প্রদান করতে পারে।
৪. এ ধরনের নেটওয়ার্ক যেকোন জায়গায় তৈরি করা যায়।
৫. ব্যাপ্তি সাধারণত কয়েক মিটারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।
৬. কম্পিউটার বাসসমূহ যেমন– ইউএসবি বা ফায়ারওয়্যার এর মাধ্যমে তার দ্বারা যুক্ত থাকতে পারে।
৭. ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি দ্বারা একটি ওয়্যারলেস পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা WPAN তৈরি করা সম্ভব।

২. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN– Local Area Network)

একটি নির্দিষ্ট ভবন বা ক্যাম্পাসে একটি ভবনের একই তলায় অবস্থিত অথবা একই ভবনের কাছাকাছি ফ্লোরের কম্পিউটারগুলো ল্যানভুক্ত হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে কম্পিউটারগুলোকে থাকতে হবে। এ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি সহজসাধ্য ও ব্যয়বহুল নয়।

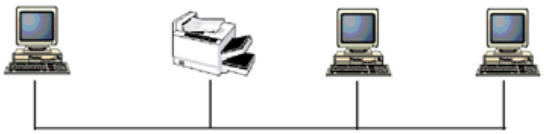

চিত্র : খুব সাধারণ মানের একটি ল্যান

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের বৈশিষ্ট্য

১. সীমিত দূরত্বের মধ্যে এর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ।
২. শ্রেণি সংযোগের মাধ্যমে কম্পিউটারগুলো সংযুক্ত হয়।
৩. ডেটা স্থানান্তরের হার সাধারণত ১০ মেগাবিট/সেঃ থেকে ১০০০ মেগাবিট/সেঃ।
৪. এই নেটওয়ার্ক স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি সহজ ও খরচ কম।
৫. ব্যবহার করা সহজ।
৬. এই নেটওয়ার্কে কম্পিউটারসমূহ তার বা তারবিহীন সংযোগ প্রদান করা যায়।

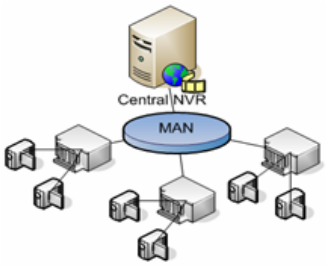

চিত্র : MAN এর একটি উদাহরণ

৩. মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (MAN– Metropoliton Area Network)

MAN এর পুরো অর্থ হলো Metropoliton Area Network. কোন বড় শহরের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে বিস্তৃত কম্পিউটারসমূহের মধ্যে স্থাপিত নেটওয়ার্ককে মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক বলা হয়। এ নেটওয়ার্কের বৈশিষ্ট্য :

১. MAN এর বিস্তৃতি ১০ থেকে ৩০ কি.মি পর্যন্ত হতে পারে।
২. LAN এর চাইতে দ্রুত গতির।
৩. খরচ তুলনামূলকভাবে কম।
৪. বেশি পরিমাণ তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।
৫. MAN এর মালিকানা সাধারণত কোনো অর্গানাইজেশনের হয়ে থাকে।

LAN ও MAN এর মধ্যে পার্থক্য

ল্যান (LAN)	ম্যান (MAN)
১. এর পুরো অর্থ হলো Local Area Network.	১. এর পুরো অর্থ হলো Metropoliton Area Network.
২. এক্ষেত্রে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট ভবন বা ক্যাম্পাসে একদল কমপিউটার নেটওয়ার্কভুক্ত হয়।	২. MAN হলো কতগুলো ল্যান এর সমন্বয় যা একটি পুরো শহর বা বড় আকারের কোন এলাকাব্যাপী বিস্তৃত।
৩. LAN এর মালিকানা সাধারণত কোনো একক ব্যক্তি বা কিছু সংখ্যক লোকের একটি গ্রুপের হতে পারে।	৩. MAN এর মালিকানা সাধারণত কোনো অর্গানাইজেশনের হয়ে থাকে।
৪. LAN এর গতি কম।	৪. LAN এর চাইতে MAN দ্রুত গতির।

৪. ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (WAN-Wide Area Network)

ওয়ান বা ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক হচ্ছে কতকগুলো কম্পিউটার বা ল্যানের নেটওয়ার্ক যারা বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা। ইন্টারনেট হলো ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক। এ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ই–মেইল আদান-প্রাদান করা, বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্রাউজ করা, ফাইল ডাউনলোড, অনলাইন শপিং ইত্যাদি করা যায়। ওয়ানের আওতায় কম্পিউটারগুলো কেবল একটি শহরেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে, অথবা এগুলো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়েও থাকতে পারে। তবে ওয়ানের পুরো বিষয়টি নির্ভর করছে ফিজিক্যাল লাইন, ফাইবার অপটিক ক্যাবল, স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশন এবং মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিশনের উপর।

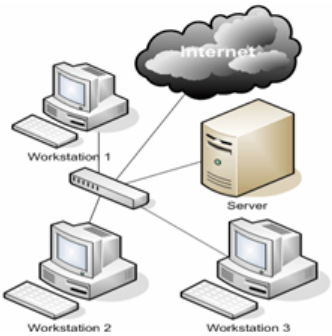

চিত্র : ওয়ানের একটি উদাহরণ

ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কের সুবিধা (Advantages of Wide Area Network)

১. বিভিন্ন তথ্য, পত্র-পত্রিকা, বই, চলচ্চিত্র প্রভৃতি সংগ্রহ ও ব্যবহার করা যায়।
২. বিশ্বের যেকোন স্থানে ইমেইল প্রেরণ করা যায়।
৩. ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে বুলেটিন বোর্ড গঠন করা যায়।
৪. অনলাইন শপিং করা যায়।
৫. ক্লাউট কম্পিউটিং সুবিধা পাওয়া যায়।
৬. কম খরচে বিশ্বের যে কোন স্থানে ভয়েস ও ভিডিও যোগাযোগ করা হয়।
৭. সর্বোপরি, সমগ্র নেটওয়ার্ক বিশ্বকে টেবিলে বসে প্রত্যক্ষ করা যায়।

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এবং ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক এর মধ্যকার পার্থক্য

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান)	ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (ওয়ান)
১. ল্যানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ডিভাইসের মধ্যে সর্বোচ্চ দূরত্বের একটি সুনির্দিষ্ট সীমা থাকে।	১. ওয়ান হচ্ছে কতকগুলো ল্যানের বৃহত্তম নেটওয়ার্ক যারা বিভিন্ন ভৌগোলিক দূরত্বে অবস্থিত বিধায় দূরত্বের কোন সীমা থাকে না।
২. বাসা বা অফিসে হাব বা সুইচের সাহায্যে সংযুক্ত একাধিক কম্পিউটার ল্যানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।	২. ইন্টারনেট ওয়ানের একটি উদাহরণ।
৩. সাধারণত ফাইল, ফোল্ডার, প্রিন্টার জাতীয় রিসোর্স শেয়ার করার জন্য ল্যান তৈরি করা হয়।	৩. বড় আকারের ডকুমেন্ট আদান প্রদান, ইন্টারনেট, ই-মেইল ইত্যাদি সুবিধা সৃষ্টি করা হয়।
৪. ল্যানের সাথে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার কোন সংশ্লেষ নেই।	৪. ওয়ানের একটি অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে টেলিযোগাযোগ সিস্টেম।
৫. ল্যানে কখনও মডেম ব্যবহার করা হয় না।	৫. ওয়ান প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের মডেম ব্যবহৃত হতে পারে।
৬. ল্যানের ডেটা ট্রান্সমিশন ওয়ানের তুলনায় অনেক বেশি।	৬. ওয়ানের ব্যান্ডউইথ (Bandwidth) সীমিত বলে ল্যানের তুলনায় ডেটা ট্রান্সমিশন গতি কম।

LAN-এর শ্রেণিবিভাগ

নিয়ন্ত্রণ কাঠামো এবং সার্ভিস প্রদানের ধরনের উপর ভিত্তি করে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে প্রকারভেদ

নিয়ন্ত্রণ কাঠামো এবং সার্ভিস প্রদানের ধরনের উপর ভিত্তি করে নেটওয়ার্ককে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. ক্লায়েন্ট–সার্ভার নেটওয়ার্ক (Client–Server Network)
২. পিয়ার–টু–পিয়ার নেটওয়ার্ক (Peer to Peer Network)
৩. মিশ্র বা হাইব্রিড নেটওয়ার্ক (Hybrid Network)

১. ক্লায়েন্ট–সার্ভার নেটওয়ার্ক (Client–Server Network)

এক বা একাধিক ডেডিকেটেড সার্ভারের সমন্বয়ে এ ধরনের নেটওয়ার্ক গঠিত হয়। এ ডেডিকেটেড সার্ভার ক্লায়েন্ট পিসি'র জন্য প্রয়োজনীয় সার্ভিস প্রদান করে। সার্ভিসসমূহের আওতায় প্রধানত যা থাকে তা হলো ফাইল, প্রিন্ট মেসেজ, ডেটাবেজ, এ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদি।

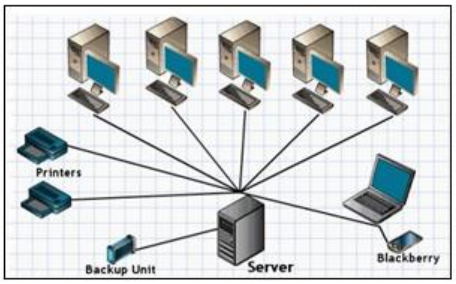

চিত্র : ক্লায়েন্ট–সার্ভার নেটওয়ার্কের একটি উদাহরণ

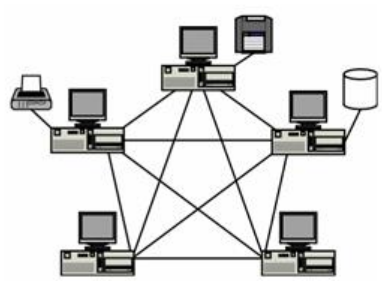

চিত্র : পিয়্যার–টু–পিয়্যার নেটওয়ার্কের একটি উদাহরণ

২. পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক (Peer to Peer Network)

এ প্রকারের নেটওয়ার্কে প্রতিটি পিসি রিসোর্স (Resource) শেয়ারিং–এর ক্ষেত্রে সমান ভূমিকা পালন করে থাকে। এখানে কোন ডেডিকেটেড সার্ভার থাকে না, ফলে এখানে পিসিগুলোর মধ্যে গুরুত্বের দিক থেকে কোন শ্রেণিবিন্যাসও নেই। প্রতিটি পৃথক পিসি তার ডেটার নিরাপত্তা বিধানে নিজেই দায়ী থাকে। পিসি'র ব্যবহারকারী এ ক্ষেত্রে নির্ধারণ করে দেন তার কোন ফাইল বা ডেটা নেটওয়ার্কে অন্যান্যদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

৩. মিশ্র বা হাইব্রিড নেটওয়ার্ক (Hybrid Network)

মিশ্র বা হাইব্রিড নেটওয়ার্ক মূলত ক্লায়েন্ট-সার্ভার ও পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্কের একটি সমন্বয়। সাধারণত হাইব্রিড নেটওয়ার্কে ক্লায়েন্ট–সার্ভার অংশের প্রাধান্য থাকে। তবে এর পাশাপাশি এখানে স্বল্প পরিসরে পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্কের অংশ জোড়া দেয়া হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় কম্পিউটার বা নোডগুলোকে সরাসরি কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত না করে বিশেষ স্থানে স্থাপন করা হয় ও তারপর গতিশীল সংযোগ পথ দ্বারা সংযুক্ত করা হয়।

৫.৪ নেটওয়ার্কিং এর মৌলিক উপাদান/নেটওয়ার্ক স্থাপনে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

(Main Elements of Networking/Important Tools or Instruments for Installing Network)

নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড (Network Interface Card)

নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড/ল্যানকার্ড/নেটওয়ার্ক এডাপ্টার হলো একটি প্লাগ-ইন কার্ড যা কম্পিউটারকে নেটওয়ার্কভুক্ত করে। নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত এক ডিভাইস থেকে আরেক ডিভাইসে ডেটা পাঠাতে বা গ্রহণ করতে ল্যান কার্ডের প্রয়োজন হয়। এটি ইন্টারপ্রেটারের ন্যায় সিগন্যাল আদান–প্রদানের কাজটি সমন্বয় করে থাকে। বর্তমানে বাজারে পাওয়া যায় এমন প্রায় সব কম্পিউটার বা ল্যাপটপ বা আইসিটি যন্ত্রের মাদারবোর্ডের সাথেই নিক বা ল্যান কার্ড সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। আলাদা করে মাদারবোর্ডের স্লটের মধ্যে কার্ড বসানো যায়। প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে বর্তমানে তারবিহীন (Wireless) ল্যান কার্ড খুবই সাধারণ।

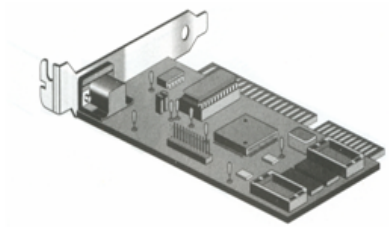

চিত্র : নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড

মডেম (Modem)

Modulation শব্দের 'Mo' এবং Demodulation শব্দের 'Dem' নিয়ে 'Modem' শব্দটি গঠিত হয়েছে। নেটওয়ার্কিং-এ তথ্যাবলি আদান–প্রদানের ক্ষেত্রে মডেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যখন কম্পিউটার হতে ইনফরমেশন মডেমে যায় তখন এটি ইনফরমেশনকে ডিজিটাল বিট হতে এনালগ সিগন্যালে রূপান্তরিত করে। আর যখন রূপান্তরিত এনালগ সিগন্যাল অপর প্রান্তে অন্য কম্পিউটারে যুক্ত মডেমে পৌঁছে তখন তা কম্পিউটারের বোধগম্য ডিজিটাল বিটসে রূপান্তর করে। এভাবেই দু'টি কম্পিউটারের মধ্যে মডেমের মাধ্যমে কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। প্রথম দিককার মডেমগুলো মূলত টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে ইন্টারনেটে যুক্ত থাকার জন্য ব্যবহৃত হতো। ডায়াল-আপ মডেম নামে পরিচিত এ মডেমগুলোর ডেটা ট্রান্সফার রেট কম বিধায় এগুলো আর ব্যবহৃত হয় না। বর্তমানে এগুলোর পরিবর্তে দ্রুতগতির ডিএসএল এবং ওয়াই-ফাই মডেম ব্যবহৃত হচ্ছে। মডেম দুই প্রকার। যথা–

ইন্টারনাল মডেম (Internal Modem) : ইন্টারনাল মডেম মূলত একটি কার্ড বিশেষ। এই কার্ড পিসির মাদারবোর্ডের এক্সপানশান স্লটে লাগানো থাকে অথবা ডিফল্ট যুক্ত থাকে।

এক্সটারনাল মডেম (External Modem) : যে মডেম তারের সাহায্যে অথবা তারবিহীনভাবে কম্পিউটারের বাইরে থেকে কাজ করে তাকে এক্সটারনাল মডেম বলা হয়।

চিত্র : এক্সটারনাল মডেম

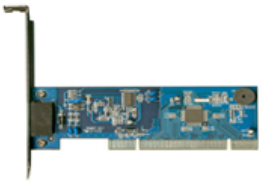

চিত্র : ইন্টারনাল মডেম

মডেমের কাজ/ব্যবহার (Function/Uses of Modem)

মডেম টেলিফোন লাইন, কো–এক্সজিয়াল ক্যাবল, ফাইবার অপটিকস ইত্যাদির মাধ্যমে ডেটা আদান–প্রদান করে। কোন কম্পিউটার হতে আগত তথ্যকে মডেম ডিজিটাল বিট হতে অ্যানালগ সিগন্যালে রূপান্তরিত করে। এই কাজটিকে মডুলেশন

বলে। আবার অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তর করার কাজকে ডিমডুলেশন বলে। সিগন্যালকে মডুলেশন ও ডিমডুলেশন করাই হলো মডেমের কাজ।

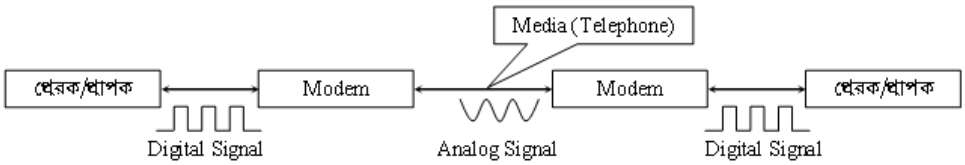

চিত্র : ডেটা প্রেরণে মডেমের কাজ বা ব্যবহার

হাব (Hub)

হাব হলো নেটওয়ার্কের ডিভাইসসমূহের জন্য একটি সাধারণ কানেকশন পয়েন্ট। ল্যানের সেগমেন্টগুলো কানেক্ট করার জন্য সাধারণভাবে হাব ব্যবহৃত হয়। হাবের মধ্যে অনেকগুলো পোর্ট থাকে। ডেটা প্যাকেট একটি পোর্টে আসলে এটি অন্য পোর্টে কপি হয় যাতে ল্যানের সব সেগমেন্ট সব প্যাকেটসমূহ দেখতে পারে। স্টার টপোলজির ক্ষেত্রে হাব হচ্ছে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী ডিভাইস। হাবের দাম তুলনামূলকভাবে কম।

চিত্র : হাব

হাবের সুবিধা (Advantages of Hub)

১. একই ধরণের অন্যান্য ডিভাইসের তুলনায় দাম কম।
২. বিভিন্ন মিডিয়ামকে সংযুক্ত করতে পারে।

হাবের অসুবিধা (Disadvantages of Hub)

১. নেটওয়ার্ক ট্রাফিক বৃদ্ধি পায়।
২. ডেটা আদান প্রদানে বাধার সম্ভাবনা থাকে।
৩. ডেটা ফিল্টারিং সম্ভব হয় না।

সুইচ (Switch)

এক ধরনের নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি ডিভাইস যা মিডিয়া সেগমেন্টগুলোকে একটি কেন্দ্রীয় অবস্থানে এনে একত্রিত করে। হাবের সাথে সুইচের পার্থক্য হলো সুইচ প্রেরক প্রান্ত থেকে প্রাপ্ত ডেটা প্রাপক কম্পিউটারের সুনির্দিষ্ট পোর্টটিতে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু হাব ঐ ডেটা সিগনাল প্রাপক কম্পিউটারের সবগুলো পোর্টেই পাঠায়।

সুইচের সুবিধা (Advantages of Switch)

১. ডেটা আদান–প্রদানের ক্ষেত্রে বাধার সম্ভাবনা কমায়।
২. ভার্চুয়াল LAN ব্যবহার করে ব্রডকাস্ট নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

চিত্র : সুইচ

সুইচের অসুবিধা (Disadvantages of Switch)

১. হাবের তুলনায় মূল্য কিছুটা বেশি।
২. ডেটা ফিল্টারিং সম্ভব নয়।
৩. কনফিগারেশন তুলনামূলকভাবে জটিল।

হাব এবং সুইচের মধ্যে পার্থক্য (Difference Between Hub and Switch)

হাব (Hub)	সুইচ (Switch)
১. ডেটা সিগন্যাল প্রাপক কম্পিউটারের সবগুলো পোর্টে পাঠায়।	১. প্রেরক প্রান্ত থেকে প্রাপ্ত ডেটা প্রাপক কম্পিউটারের সুনির্দিষ্ট পোর্টটিতে পাঠিয়ে দেয়।
২. সময় বেশি লাগে।	২. সময় কম লাগে।
৩. মূল্য কম।	৩. তুলনামূলকভাবে মূল্য বেশি।
৪. পোর্ট কম থাকে।	৪. পোর্ট বেশি থাকে।

রাউটার (Router)

এটি একটি বুদ্ধিমান ইন্টারনেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি ডিভাইস যা লজিক্যাল এবং ফিজিক্যাল এড্রেস ব্যবহার করে দুই বা ততোধিক নেটওয়ার্ক সেগমেন্টের মধ্যে ডেটা আদান–প্রদানের ব্যবস্থা করে। রাউটার উৎস কম্পিউটার থেকে গন্তব্য কম্পিউটারে ডেটা প্যাকেট (ডেটার সমষ্টি) পৌঁছে দেয়। রাউটার বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক যেমন ইথারনেট, টোকেন, রিং ইত্যাদিকে সংযুক্ত করতে পারে।

চিত্র : রাউটার

রাউটারের সুবিধা (Advantages of Router)

১. ডেটা ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে বাধাঁর সম্ভাবনা কমায়।
২. ডেটা ফিল্টারিং সম্ভব হয়।
৩. বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক যেমন ইথারনেট, টোকেন, রিং ইত্যাদিকে সংযুক্ত করতে পারে।
৪. একাধিক নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করে সম্প্রসারিত করতে পারে।

রাউটারের অসুবিধা (Disadvantages of Router)

১. রাউটারের দাম বেশি।
২. রাউটার একই প্রোটকল নেটওয়ার্ক ছাড়া সংযুক্ত হতে পারে না।
৩. কনফিগারেশন তুলনামূলক জটিল।
৪. রাউটার ধীর গতিতে ডেটা প্রেরণ করে।

চিত্র : গেটওয়ে

গেটওয়ে (Gateway)

গেটওয়ে একটি নেটওয়ার্ককে আরেকটি নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করে। এটি একটি নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি ডিভাইস যা বিভিন্ন কমিউনিকেশন প্রোটোকল ট্রান্সলেট করে অর্থাৎ এক প্রোটোকলকে অন্য আরেক ধরনের প্রোটোকলের সাথে সংযুক্ত করে।

গেটওয়ের সুবিধা (Advantages of Gateway)

১. ডেটা ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে বাধার সম্ভাবনা কম।
২. বিভিন্ন প্রটোকলবিশিষ্ট নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করতে পারে।

গেটওয়ের অসুবিধা (Diadvantages of Gateway)

১. এটি ধীরগতিসম্পন্ন।
২. কনফিগারেশন করা তুলনামূলক জটিল।
৩. অন্যান্য ডিভাইসের চেয়ে ব্যয়বহুল।

চিত্র : রিপিটার

রিপিটার (Repeater)

তথ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত এক ধরনের ডিভাইস বিশেষ। কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ক্যাবলের মাধমে যুক্ত কম্পিউটারটি যদি দূরে হয় তাহলে এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ডেটা সিগনাল দুর্বল হয়ে যায়। এ দুর্বল সংকেতকে সবল করা এবং গন্তব্য স্থানের দিকে প্রেরণ করার জন্য রিপিটার ব্যবহার করা হয়। নেটওয়ার্ক সংযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কম্পিউটারের মধ্যে দূরত্ব বাড়ানোর জন্য রিপিটার ব্যবহার করা হয়।

রিপিটারের সুবিধা (Advantages of Repeater)

১. নেটওয়ার্ক সংযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কম্পিউটারের মধ্যে দূরত্ব বাড়ানোর জন্য রিপিটার ব্যবহার করা হয়।
২. নেটওয়ার্ক ট্রাফিক বৃদ্ধি না করে ডেটা অ্যামপ্লিফাই বা শক্তিশালী করে সামনের দিকে প্রেরণ করা যায়।

রিপিটারের অসুবিধা (Diadvantages of Repeater)

১. ডেটা ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে বাধার সম্ভাবনা রয়েছে।
২. সীমিত সংখ্যক কম্পিউটার যুক্ত করতে পারে।

চিত্র : ব্রিজ

ব্রিজ (Bridge)

তথ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত এক ধরনের নেটওয়ার্ক ডিভাইস বিশেষ। এ ডিভাইস একাধিক ল্যানের ভেতর সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়। ব্রিজকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে এগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. **লোকাল ব্রিজ (Local Bridge)** : এটি সরাসরি LAN এর সাথে যুক্ত থাকে।
২. **রিমোট ব্রিজ (Remote Bridge)** : এক ধরনের নেটওয়ার্ক ডিভাইস বিশেষ যা দু'টি ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থানের দু'টি ল্যান সেগমেন্টকে সংযুক্ত করে।
৩. **ওয়্যারলেস ব্রিজ (Wireless Bridge)** : একাধিক LAN যুক্ত করা অথবা LAN এর দূরবর্তী স্টেশনকে সংযুক্ত করার জন্য ওয়ারলেস ব্রিজ ব্যবহৃত হতে পারে।

দলীয় কাজ : মার্কেটে খোঁজ নিয়ে দশটি নেটওয়ার্ক ডিভাইসের মডেল, মূল্য, স্পেসিফিকেশন তালিকা তৈরি করে শিক্ষককে দেখাও।

৬. নেটওয়ার্ক টপোলজি (Network Topology)

একটি নেটওয়ার্কের ফিজিক্যাল ডিভাইস বা কম্পোনেন্ট (Component) যেমন– ক্যাবল, পিসি, রাউটার ইত্যাদি যেভাবে নেটওয়ার্কে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে তাকে বলা হয় টপোলজি। নেটওয়ার্ক টপোলজি মূলত নেটওয়ার্কের ফিজিক্যাল লে–আউট (Layout) বর্ণনা করে থাকে। কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং–এর জন্য মূলত ছয় ধরনের টপোলজি ব্যবহৃত হয়। এগুলো হচ্ছে :

১. বাস টপোলজি (Bus Topology)
২. রিং টপোলজি (Ring Topology)
৩. স্টার টপোলজি (Star Topology)
৪. ট্রি টপোলজি (Tree Topology)
৫. হাইব্রিড টপোলজি (Hybrid Topology)
৬. মেশ টপোলজি (Mesh Topology)

১. বাস টপোলজি (Bus Topology)

যে টপোলজিতে একটি মূল তারের সাথে সবকটি ওয়ার্কস্টেশন বা কম্পিউটার সংযুক্ত থাকে তাকে বাস টপোলজি বলা হয়। বাস টপোলজির প্রধান ক্যাবলটিকে বলা হয় ব্যাকবোন (Backbone)। সিগন্যাল যখন ব্যাকবোনে চলাফেরা করে তখন শুধু প্রাপক কম্পিউটার সিগন্যাল গ্রহণ করে, বাকিরা একে অগ্রাহ্য করে। এ টপোলজি ছোট আকারের নেটওয়ার্কে ব্যবহার খুব সহজ, সাশ্রয়ী ও এটি বিশ্বস্ত। এই সংগঠনে কোন কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ সিস্টেম নষ্ট হয়ে যায় না।

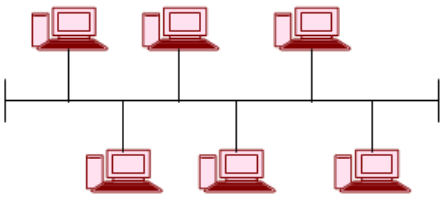
চিত্র : বাস টপোলজি

বাস টপোলজি এর সুবিধা (Advantages of Bus Topology)

১. এই টপোলজি ছোট আকারের নেটওয়ার্কে ব্যবহার খুব সহজ ও এটি বিশ্বস্ত ।
২. এই টপোলজিতে সবচেয়ে কম ক্যাবল প্রয়োজন হয়, ফলে এতে খরচও সাশ্রয় হয়।
৩. প্রয়োজনে রিপিটার ব্যবহার করে নেটওয়ার্কের ব্যাকবোন সম্প্রসারণ করা যায়।
৪. এই সংগঠনে কোন কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ সিস্টেম নষ্ট হয়ে যায় না।
৫. এই সংগঠনে কোন কম্পিউটার বা যন্ত্রপাতি যোগ করলে বা সরিয়ে নিলে পুরো নেটওয়ার্কের কার্যক্রম ব্যাহত হয় না।

বাস টপোলজি এর অসুবিধা (Disadvantages of Bus Topology)

১. নেটওয়ার্কে কম্পিউটার সংখ্যা বেশি হলে ডেটা ট্রান্সমিশন বিঘ্নিত হয়।
২. ডেটা ট্রান্সমিশনের গতি কম।
৩. নেটওয়ার্কে সৃষ্ট সমস্যা নির্ণয় তুলনামূলক বেশ জটিল।
৪. মূল ক্যাবেলের একটিমাত্র স্থানে সৃষ্ট ত্রুটি পুরো নেটওয়ার্ককে অচল করে দিতে পারে।

২. রিং টপোলজি (Ring Topology)

রিং টপোলজিতে প্রতিটি কম্পিউটার তার পার্শ্ববর্তী কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত থাকে। এভাবে রিংয়ের সর্বশেষ কম্পিউটারটি প্রথমটির সাথে যুক্ত থাকে। এ ব্যবস্থায় কোন কম্পিউটার ডেটা পাঠালে তা বৃত্তাকার পথে কম্পিউটারগুলোর মধ্যে ঘুরতে থাকে যতক্ষণ না নির্দিষ্ট কম্পিউটার ডেটা গ্রহণ করে। এ ব্যবস্থায় কোন কেন্দ্রীয় কম্পিউটার থাকে না। এতে প্রতিটি কম্পিউটারের গুরুত্ব সমান।

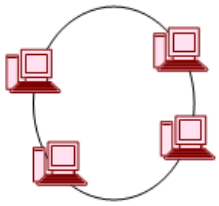

চিত্র : রিং টপোলজি

রিং টপোলজি ব্যবহারের সুবিধা (Advantages of Ring Topology)

১. এই পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় কোন কম্পিউটার বা সার্ভারের প্রয়োজন হয় না।
২. নেটওয়ার্কে অবস্থিত প্রতিটি কম্পিউটারের গুরুত্ব সমান।
৩. নেটওয়ার্কে কম্পিউটার সংখ্যা বাড়লেও এর দক্ষতা খুব বেশি প্রভাবিত হয় না।

রিং টপোলজি ব্যবহারের অসুবিধা (Disadvantages of Ring Topology)

১. নেটওয়ার্কের একটিমাত্র কম্পিউটার সমস্যায় আক্রান্ত হলে পুরো নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়ে।
২. রিং টপোলজির নেটওয়ার্কে সমস্যা নিরূপণ বেশ জটিল।
৩. নেটওয়ার্কে কোন কম্পিউটার যোগ করলে বা সরিয়ে নিলে তা পুরো নেটওয়ার্কের কার্যক্রম ব্যাহত করে।

৩. স্টার টপোলজি (Star Topology)

যে টপোলজী একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী কম্পিউটার বা হোস্ট কম্পিউটারের সাথে অন্যান্য কম্পিউটার সংযুক্ত করে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে তাকে স্টার টপোলজি বলা হয়। এক্ষেত্রে একটি কম্পিউটার কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের মাধ্যমে তথ্য আদান–প্রদান করে থাকে। এ সংগঠনে কোন একটি কম্পিউটারে নষ্ট হয়ে গেলে বাকি নেটওয়ার্কে তার প্রভাব পড়ে না। খুব সহজেই থেকে সমস্যায় আক্রান্ত কম্পিউটারটি সরিয়ে নেয়া যায়।

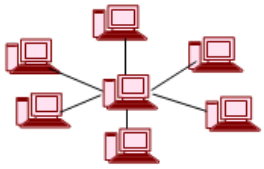

চিত্র : স্টার টপোলজি

স্টার টপোলজি ব্যবহারের সুবিধা (Advantages of Star Topology)

১. নেটওয়ার্কে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করেই স্টারে নতুন কম্পিউটার যোগ করা সম্ভব।
২. কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য নেটওয়ার্কের সমস্যা নিরূপণ সহজ। ইনটেলিজেন্ট হাব ব্যবহার করলে তার সাহায্যে নেটওয়ার্কের কর্মকাণ্ড তথা ওয়ার্কলোড মনিটরিং করা যায়।
৩. এই সংগঠনে কোন একটি কম্পিউটারে নষ্ট হয়ে গেলে বাকি নেটওয়ার্কে তার প্রভাব পড়ে না। খুব সহজেই থেকে সমস্যায় আক্রান্ত কম্পিউটারটি সরিয়ে নেওয়া যায়।
৪. একই নেটওয়ার্কে বিভিন্ন ধরনের ক্যাবল ব্যবহার করা যায়।

স্টার টপোলজি ব্যবহারের অসুবিধা (Disadvantages of Star Topology)

১. কেন্দ্রীয় অবস্থানে থাকা হাবে কোন প্রকার সমস্যা হলে তা পুরো নেটওয়ার্ককে অকেজো করে দেয়।
২. স্টার টপোলজিতে পরিমাণে বেশি ক্যাবল ব্যবহৃত হয় বিধায় এটি একটি ব্যয়বহুল পদ্ধতি।

৪. ট্রি টপোলজি (Tree Topology)

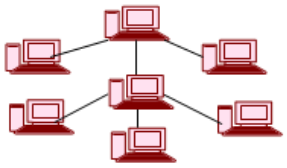
চিত্র : ট্রি টপোলজি

যে টপোলজিতে কম্পিউটারগুলো পরস্পরের সাথে গাছের শাখা–প্রশাখার মতো বিন্যস্ত থাকে তাকে ট্রি টপোলজি বলা হয়। এ টপোলজিতে এক বা একাধিক স্তরের কম্পিউটার হোস্ট কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকে। অর্থাৎ প্রথম স্তরের কম্পিউটারগুলো দ্বিতীয় স্তরের কম্পিউটারগুলোর হোস্ট হয়। একইভাবে দ্বিতীয় স্তরের কম্পিউটারগুলো তৃতীয় স্তরের কম্পিউটারগুলোর হোস্ট হয়। অফিস ব্যবস্থাপনার কাজে এ নেটওয়ার্ক টপোলজি খুবই উপযোগী। শাখা–প্রশাখা সৃষ্টির মাধ্যমে ট্রি টপোলজির নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা সহজ।

ট্রি টপোলজি ব্যবহারের সুবিধা (Advantages of Tree Topology)

১. অফিস ব্যবস্থাপনার কাজে এই নেটওয়ার্ক টপোলজি খুবই উপযোগী।
২. শাখা প্রশাখা সৃষ্টির মাধ্যমে ট্রি টপোলজির নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা সহজ।
৩. নতুন কোন নোড সংযোগ বা বাদ দিলে নেটওয়ার্কের স্বাভাবিক কাজকর্মের কোন অসুবিধা হয় না।

ট্রি টপোলজি ব্যবহারের অসুবিধা (Disadvantages of Tree Topology)

১. এই টপোলজি কিছুটা জটিল ধরনের।
২. রুট বা সার্ভার কম্পিউটারে ত্রুটি দেখা দিলে ট্রি নেটওয়ার্কটি অচল হয়ে যায়।

৫. হাইব্রিড টপোলজি (Hybrid Topology)

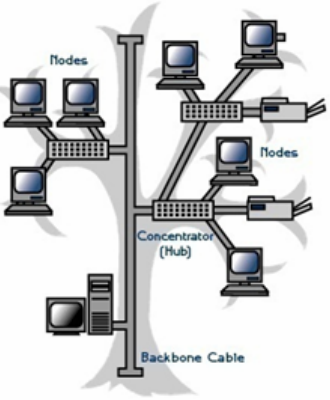

চিত্র : হাইব্রিড টপোলজি

বাস, স্টার, রিং ইত্যাদি টপোলজির সমন্বয়ে গঠিত নেটওয়ার্ক টপোলজিকে বলা হয় হাইব্রিড টপোলজি। উদাহরণস্বরূপ ইন্টারনেটকে এ ধরনের টপোলজি হিসেবে অভিহিত করা যায়। কেননা ইন্টারনেট হলো বৃহৎ পরিসরের একটি নেটওয়ার্ক যেখানে সবধরনের টপোলজির মিশ্রণ দেখা যায়। এ টপোলজিতে প্রয়োজনানুযায়ী নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে। কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব হয়। কোন এক অংশ নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক নষ্ট না হয়ে অংশবিশেষ নষ্ট হয়ে যায়।

হাইব্রিড টপোলজি ব্যবহারের সুবিধা (Advantages of Hybrid Topology)

১. এই টপোলজিতে প্রয়োজনানুযায়ী নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে।
২. কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব হয়।
৩. কোন এক অংশ নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক নষ্ট না হয়ে অংশবিশেষ নষ্ট হয়।

হাইব্রিড টপোলজি ব্যবহারের অসুবিধা (Disadvantage of Hybrid Topology)

এই টপোলজিতে ব্যবহৃত হাবসমূহ সর্বদা সচল রাখতে হয়।

৬. মেশ টপোলজি (Mesh Topology)

যদি কোন নেটওয়ার্কে ডিভাইস বা পিসিসমূহের মধ্যে অতিরিক্ত সংযোগ থাকে তাহলে তাকে বলা হয় মেশ টপোলজি। অধিকাংশ মেশ টপোলজি নেটওয়ার্ক সত্যিকারের মেশ নেটওয়ার্ক নয়। এরা আসলে হাইব্রিড (Hybrid) মেশ নেটওয়ার্ক। এতে শুধু কয়েকটি অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় লিংক থাকে। এতে ডেটা কমিউনিকেশনে অনেক বেশি নিশ্চয়তা থাকে এবং নেটওয়ার্কের সমস্যা খুব সহজে সমাধান করা যায়।

মেশ টপোলজি ব্যবহারের সুবিধা (Advantages of Mesh Topology)

১. সহজে নেটওয়ার্কে খুব বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয় না।
২. এতে ডেটা কমিউনিকেশনে অনেক বেশি নিশ্চয়তা থাকে।
৩. নেটওয়ার্কের সমস্যা খুব সহজে সমাধান করা যায়।

মেশ টপোলজি ব্যবহারের অসুবিধা (Disadvantages of Mesh Topology)

১. এই টপোলজিতে নেটওয়ার্ক ইনস্টলেশন ও কনফিগারেশন বেশ জটিল।
২. নেটওয়ার্কে অতিরিক্ত লিংক স্থাপন করতে হয় বিধায় এতে খরচ বেড়ে যায়।

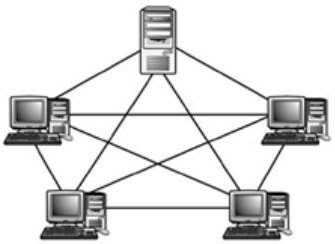

চিত্র : মেশ টপোলজি

একক কাজ : চারটি কম্পিউটারের মধ্যে ল্যান তৈরি করার জন্য কি কি ডিভাইস দরকার? তৈরি করার প্রক্রিয়া লিখে দেখাও।

৭. ক্লাউড কম্পিউটিং (Cloud Computing)

ধরা যাক, তোমাদের ঘরে ২০ জনের খাবার রান্না করার মতো হাড়ি-পাতিল এবং খাবার খাওয়ার জন্য থালা-বাসন এবং বসার জন্য চেয়ার টেবিল রয়েছে। তোমাদের বাসায় ১৫০ জন মেহমান আসবে। এজন্য তোমরা কি বাকি ১৩০ জনের জন্য হাড়ি-পাতিল, ১৩০ টি থালা এবং ১৩০ টি চেয়ার কিনবে? এতগুলো জিনিস কেনার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। এছাড়া এগুলো রাখার জন্য অনেক জায়গার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে এত টাকা খরচ না করে নিকটস্থ কোন ডেকোরেটর থেকে এসব জিনিস যত সময়ের জন্য দরকার তত সময়ের জন্য ভাড়ায় আনা হয়। এতে করে নিজের প্রয়োজনও মিটে এবং অনেক টাকা খরচও বেঁচে যায়। ঠিক তদ্রুপ প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ফি এর বিনিময়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কমপিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ব্যবহার করা যায়। এ পদ্ধতিকে ক্লাউড কম্পিউটিং বলা হয়।

ইন্টারনেট–নির্ভর কম্পিউটিং হচ্ছে ক্লাউড কম্পিউটিং। **ক্লাউড কম্পিউটিং এমন একটি কম্পিউটিং প্রযুক্তি যা ইন্টারনেট এবং কেন্দ্রীয় রিমোট সার্ভার ব্যবহারের মাধ্যমে ডেটা এবং এপ্লিকেশনসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম।** এতে ওয়েবে সকল ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যবহারকারীকে ক্লায়েন্ট হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ধরা যাক একটি কোম্পানির ছয়টি সার্ভার দরকার। এগুলো ক্রয় করে সেটআপ করা এবং মেইনটেনেন্স করতে অনেক খরচ হবে। সবসময় এগুলোর ব্যবহার না হলেও খরচ কমানো যাবে না। কিন্তু কোম্পানিটি যদি ক্লাউড কম্পিউটিং সুবিধা নেয় (আমাজন ডট কমের ক্লাউডে m1.medium মেশিন ভাড়া নেয়) তাহলে ঘণ্টা হিসেবে বিল দিতে হলে অনেক কম খরচ হবে। যতক্ষণ ব্যবহার করা হবে ততক্ষণের বিল দিতে হবে। পাওয়ারফুল মেশিন চালাবার জন্য অতিরিক্ত বিদ্যুৎ খরচ বা মেশিন রুম ঠাণ্ডা রাখার দরকার নেই। লো–কনফিগারেশনের কিছু মেশিন রাখলেই হবে, আর থাকতে হবে দ্রুতগতির ইন্টারনেট। অফিসের এ লো–পাওয়ার কমপিউটারগুলো দিয়ে ক্লাউডের ভার্চুয়াল মেশিনগুলোকে এক্সেস করতে পারবে। যেহেতু মেশিনগুলো আমাজনের সার্ভারে, তাই সেগুলোর মেইন্টেনেন্সের ঝামেলা নেই, খরচও নেই।

চিত্র : ক্লাউড কম্পিউটিং

৭.১ ক্লাউডের সংজ্ঞা (Defination of Cloud Computing)

ক্লাউড কোনো নির্দিষ্ট প্রযুক্তি নয়, বরং এটা একটা ব্যবসায়িক মডেল। অর্থাৎ ক্লাউড কমপিউটিং এ বেশকিছু নতুন পুরানো প্রযুক্তিকে বিশেষভাবে বাজারজাত করা হয় বা ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। যেসব ক্রেতার অল্প সময়ের জন্য কমপিউটার দরকার বা তথ্য রাখার জায়গা দরকার, কিন্তু এ অল্প সময়ের জন্য কম্পিউটার কেনার পেছনে অজস্র টাকা খরচের ইচ্ছা নেই, তারা ক্লাউডের মাধ্যমে ক্লাউড সেবাদাতার কাছ থেকে কমপিউটার বা স্টোরেজ স্পেস ভাড়া নেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং (NIST) অনুসারে ক্লাউড কম্পিউটিং এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ– ক্লাউড কম্পিউটিং হলো ক্রেতার তথ্য ও বিভিন্ন এপ্লিকেশনকে কোনো সেবাদাতার সিস্টেমে আউটসোর্স করার এমন একটি মডেল যাতে ৩টি বৈশিষ্ট্য থাকবে–

১. **রিসোর্স স্কেলেবিলিটি :** ক্রেতা যতো চাবে, সেবাদাতা ততোই অধিক পরিমাণে সেবা দিতে পারবে।
২. **অন–ডিমান্ড সেবা :** ক্রেতা যখন চাবে, তখনই সেবা দিতে পারবে। ক্রেতা তার ইচ্ছেমত যখন খুশি তার চাহিদা বাড়াতে–কমাতে পারবে।
৩. **পে–অ্যাজ–ইউ–গো :** ক্রেতাকে আগে থেকে কোনো সার্ভিস রিজার্ভ করতে হবে না। ক্রেতা যা ব্যবহার করবে, তার জন্যই কেবল পয়সা দেবে।

তাহলে এক বাক্যে বলা যায়– **কম্পিউটার ও ডেটা স্টোরেজ সহজে, ক্রেতার সুবিধামতো চাহিবামাত্র এবং ব্যবহার অনুযায়ী ভাড়া দেয়ার সিস্টেমই হলো ক্লাউড কম্পিউটিং।** ক্লাউড কম্পিউটিং এর ক্ষেত্রে ক্রেতারা সাধারণত ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্লাউড সার্ভিস প্রোভাইডারের ক্লাউডের সাথে যুক্ত হন। নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম আঁকার সময়ে ক্রেতা ও সার্ভারের মাঝের ইন্টারনেটের অংশটিকে অনেক আগে থেকেই মেঘের ছবি দিয়ে বোঝানো হতো। সে থেকেই ক্লাউড কম্পিউটিং কথাটি এসেছে।

ক্লাউড কম্পিউটিং এর ইতিহাস (History of Cloud Computing)

১৯৬০ সালে জন ম্যাক ক্যার্থি ক্লাউড কম্পিউটিং সম্পর্কে মতামত দেন এভাবে, "কম্পিউটেশন একদিন সংগঠিত হবে পাবলিক ইউটিলিটি হিসেবে।" তবে প্রকৃতপক্ষে এ ধারণা ভিত্তি লাভ করেছে ১৯৯০ সালের দিকে। নব্বই এর দশকের শেষে বড় বড় কোম্পানিরা ইন্টারনেটে ব্যবসার আশায় বিশাল বিনিয়োগ করে ডেটা সেন্টার আর নেটওয়ার্কে। ২০০০ সাল নাগাদ হঠাৎ করে পুরা ব্যবসাটাই ধ্বসে যায়, ফলে অনেকে দেউলিয়া হয়ে পড়ে। তাদের ডেটা সেন্টারের মাত্র ৫% এর মতো ব্যবহৃত হচ্ছিল এবং বাকিটা সময়ে সিস্টেম অলস হয়ে বসে থাকতো। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া দিয়ে অলস বসে থাকা কম্পিউটারগুলোকে কাজে লাগানোর বুদ্ধি থেকেই শুরু হয় ক্লাউড কম্পিউটিং যুগের। ২০০৫ সাল থেকে আমাজন ডট কম ইলাস্টিক কম্পিউট ক্লাউড বা EC2 শুরু করে। এর পর আর পেছনে তাকাতে হয়নি ক্লাউড কম্পিউটিংকে। আইবিএম, মাইক্রোসফ্ট, গুগল থেকে শুরু করে প্রচুর কোম্পানি এখন ক্লাউড কম্পিউটিং ব্যবসার সাথে জড়িত।

ক্লাউডের মডেল (Model of Cloud Computing)

ক্লাউড কী সেবা দিচ্ছে, তার ভিত্তিতে ক্লাউডকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. Infrastructure–as–a–Service (IaaS) বা অবকাঠামোগত সেবা
২. Platform–as–a–Service (PaaS) বা প্ল্যাটফর্মভিত্তিক সেবা
৩. Software–as–a–Servoce (SaaS) বা সফটওয়্যার সেবা

IaaS : Infrastructure–as–a–Service (অবকাঠামোগত সেবা)

অবকাঠামো ভাড়া দেয়ার সার্ভিস। যেমন, আমাজন ইলাস্টিক কম্পিউট ক্লাউড (EC2) এর উদাহরণ। EC2তে ডেটা সেন্টারের প্রতি সার্ভারে ১ থেকে ৮টি ভার্চুয়াল মেশিন চলে, ক্লায়েন্টরা এগুলো ভাড়া নেন। ভার্চুয়াল মেশিনে নিজের ইচ্ছেমতো অপারেটিং সিস্টেম বসানো চলে। এতে সুবিধা হলো, সবকিছু ইউজার নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। আর অসুবিধা হলো, সবকিছুর ব্যবস্থা ইউজারকে নিজেকেই করতে হয়।

PaaS : Platform–as–a–Service (প্ল্যাটফর্মভিত্তিক সেবা)

এখানে সরাসরি ভার্চুয়াল মেশিন ভাড়া না দিয়ে ভাড়া দেয়া হয় প্ল্যাটফর্ম, যার উপরে এপ্লিকেশন তৈরি করতে পারেন ইউজারেরা। যেমন, গুগলের অ্যাপএঞ্জিন এর উদাহরণ। এ সার্ভিস ব্যবহার করলে গুগল তাদের এপিআই ব্যবহার করতে দেবে, সেটার সুবিধা অ্যাপ্লিকেশন বানাতে পারবে। এ অ্যাপ্লিকেশন চলবে গুগলের ক্লাউডে।

SaaS : Software–as–a–Service (সফটওয়্যার সেবা)

সফটওয়্যার এজ এ সার্ভিস হলো ক্লাউডভিত্তিক এমন একটা সেবা, যেখানে ইউজারেরা ক্লাউডের উপরে চলছে এমন রেডিমেইড সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারবে। যেমন, Google Docs। গুগল ডক দিয়ে মাইক্রোসফট অফিসের প্রায় সব কাজই করা যায় (ডকুমেন্ট, স্প্রেডশিট, প্রেজেন্টেশন)

ক্লাউডের ডিপ্লয়মেন্ট মডেল

ক্লাউডের ব্যবহারকারী কারা, তার উপরে ভিত্তি করে কয়েক রকমের মডেল চালু আছে। নিচে এগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো।

পাবলিক ক্লাউড (Public Cloud)

পাবলিক ক্লাউড হলো এমন ক্লাউড যা সাধারণ জনগনের জন্য উন্মুক্ত। যে টাকা দিবে, সেই সার্ভিস পাবে, এমন ক্লাউডকে বলা হয় পাবলিক ক্লাউড। যেমন আমাজনের EC2। এসব ক্লাউডে সুবিধা হলো যে কেউ এর সেবা নিতে পারে। আর অসুবিধাটা হলো একই জায়গায় একাধিক ক্লায়েন্টের আনাগোনার ফলে নিরাপত্তার সমস্যা হতে পারে।

কমিউনিটি ক্লাউড (Community Cloud)

কমিউনিটি ক্লাউডও শেয়ার করা হয় অনেকের মাঝে, পাবলিক ক্লাউডের মতো যে টাকা দেয়, সেই সার্ভিস পায়। তবে পার্থক্য হলো একটি ক্ষুদ্রতর কমিউনিটির লোকজনই এর সুবিধা নিতে পারে। ধরা যাক, ঢাকার কল্যাণপুর কলোনির লোকজনের চাহিদা মেটানোর জন্য একটা ক্লাউড বসানো হলো, কেবল কল্যাণপুর কলোনিবাসীই এর সার্ভিস নিতে পারবে। তাহলে সেটা পাবলিক ক্লাউড না হয়ে হবে প্রাইভেট ক্লাউড। কারণ এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ঐ এলাকার লোকজনেই এটা ব্যবহার করতে পারছে। সুবিধা হলো, কমিউনিটির মধ্যে ইউজার সীমাবদ্ধ থাকে বলে এখানে অনেক সমস্যা যেমন সিকিউরিটির সমস্যাগুলা নাই। আর অসুবিধা হলো এখানে ক্লায়েন্টের সংখ্যা সীমিত বলে খরচ বেড়ে যাবে।

প্রাইভেট ক্লাউড (Private Cloud)

প্রাইভেট ক্লাউডকে ক্লাউড বলা চলে কিনা এই নিয়ে মতভেদ আছে। এই রকম ক্লাউড হলো কোনো বড় সংস্থার নিজের নানা সার্ভিস চালাবার জন্য নিজের ডেটা সেন্টারকেই ক্লাউড মডেলে ব্যবহার করা।সমস্যা হলো, এতে করে কিন্তু খরচ অনেক হচ্ছে, নিজস্ব ডেটা সেন্টার বসাতে হচ্ছে, ম্যানেজ করার জন্য লোক রাখা লাগছে। তবে বড সংস্থার ক্ষেত্রে সুবিধাও আছে, কোনো বড় কোম্পানিতে ১০টা ডিপার্টমেন্ট থাকলে ১০টা ডেটা সেন্টার না বসিয়ে ১টাকেই ক্লাউড মডেলে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করা যাচ্ছে। ধরা যাক, বাংলাদেশ সরকার তার নানা মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার ব্যবহারের খরচ কমাতে চায়। সেক্ষেত্রে একটা সরকারী প্রাইভেট ক্লাউড ভালো সমাধান হতে পারে।

হাইব্রিড ক্লাউড (Hybrid Cloud)

হাইব্রিড ক্লাউড হলো পাবলিক আর প্রাইভেটের সংমিশ্রণ। এখানে প্রাইভেট ক্লাউড দিয়ে প্রাথমিক চাহিদা মেটানো হয়, আর প্রাইভেট ক্লাউডের ধারণক্ষমতা অতিক্রান্ত হয়ে গেলে পাবলিক ক্লাউডের সাহায্য নেয়া হয়। পাবলিক ক্লাউডের চাইতে হাইব্রিড ক্লাউডের খরচ বেশি, কারণ স্থানীয় স্থাপনাতো বানাতেই হচ্ছে এখানে। তবে স্থানীয়ভাবে কাজ করিয়ে নেয়ার সুবিধাগুলো থাকছে, তার সাথে অতিরিক্ত চাহিদা মেটানোরও একটা ব্যবস্থা এখানে থাকছে পাবলিক ক্লাউডে পাঠানোর মাধ্যমে।

৭.২ ক্লাউড কম্পিউটিং এর সুবিধা (Advantages of Cloud Computing)

ক্লাউড ব্যবহার করে নানা রকমের অনলাইন সার্ভিসে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন–

১. **অপারেটিং খরচ কমানো :** ক্লাউড ব্যবহার করে অপারেটিং খরচ (Operating cost) যথেষ্ট পরিমাণ কমানো সম্ভব।

২. **প্রায় সীমাহীন স্টোরেজ সুবিধা :** ক্লাউডে স্টোরেজ নিয়ে কোন চিন্তা নেই। যখন যত দরকার সুলভ মূল্যে তখন তত স্টোরেজ সুবিধা পাওয়া যাবে। এখানে প্রায় সীমাহীন স্টোরেজ সুবিধা রয়েছে।

৩. **স্বয়ংক্রিয়ভাবে সফটওয়্যার আপডেট ও রক্ষণাবেক্ষণ :** ক্লাউডে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সফটওয়্যার আপডেট ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা থাকে বিধায় সার্ভিস গ্রহণকারী গ্রাহকের এসব বিষয় নিয়ে কোন চিন্তা করতে হয় না।

৪. **সহজে তথ্য প্রবেশাধিকার :** ক্লাউডে রেজিস্ট্রিকৃত গ্রাহকরা তার ডেটাবেজে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোন অবস্থান থেকে যে কোন সময় ডেটা একসিস করতে পারে।

৫. **সফটওয়্যার খরচ কম :** ক্লাউড কম্পিউটিং এর গ্রাহক সফটওয়্যার সার্ভিসসহ সার্ভিস নিলে প্রয়োজন অনুযায়ী সফটওয়্যারও সুলভে ব্যবহার করতে পারবে।

৬. **সহজপ্রাপ্যতা (Flexibility) :** ক্লাউড কম্পিউটিং এর গ্রাহক তার প্রয়োজন অনুযায়ী সার্ভিস নিতে পারে। শুরুতে একটি সার্ভার ভাড়া নিয়ে প্রয়োজনে যে কোন সময় একশটি সার্ভারও ভাড়া নিতে পারবে। ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে বিল দিতে হবে। কম ব্যবহার করলে কম বিল দিতে হবে।

৭. **নিরাপত্তা :** ক্লাউড কম্পিউটিং সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কারিগরি দক্ষতা, ব্যাকআপ ক্যাপাসিটি অনেক বেশি। তাই কোন ছোট প্রতিষ্ঠানের স্থাপিত নিজস্ব সেটআপের চেয়ে সেগুলো বেশি নিরাপদ।

৮. **ছোট ও প্রাথমিক উদ্যোক্তাদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ :** একটি ছোট বা মাঝারি মানের প্রতিষ্ঠানের জন্য কয়েক লাখ টাকা দিয়ে একটি সার্ভার কেনা, তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভালো বেতনে দক্ষ লোক রাখা, সফটওয়্যার কেনা কঠিন। ক্লাউড কম্পিউটিং এ খরচ ও ঝামেলা অনেকাংশে কমিয়ে এনে সে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে।

৯. **বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী/গবেষকদের সুবিধা :** অনেকসময় বিজ্ঞানীদের গবেষণার জন্য সাময়িকভাবে বিশাল কম্পিউটিং সুবিধা প্রয়োজন হয় যা প্রতিষ্ঠা করা অনেক ব্যয়সাপেক্ষ। এক্ষেত্রে ক্লাউড সুবিধা নিয়ে কাজ করতে পারে।

১০. **সহজ পরিবর্তন :** প্রচলিত প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা কঠিন। কারণ এতে অনেক লোকবল ও অর্থনৈতিক বিষয় জড়িত থাকে। কিন্তু ক্লাউড কম্পিউটিং এ এ ধরনের কোন সমস্যা নেই।

ক্লাউড কম্পিউটিং এর অসুবিধা (Disadvantages of Cloud Computing)

১. **নিরাপত্তা :** সম্পূর্ণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না বিধায় তথ্যের নিরাপত্তা তুলনামূলকভাবে কম।

২. **সার্ভার ডাউন :** মেইনটেন্যান্স বা প্রাকৃতিক বা হ্যাকিং অথবা অন্য কোন কারণে সার্ভার ডাউন হলে সম্পূর্ণ কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

৩. **ফি প্রদান :** নির্ধারিত সময় অন্তর নির্ধারিত ফি দিতে হয়। না দিলে এ সার্ভিস বন্ধ করে দিলে কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

৪. **ব্যবহারকারীর নিয়ন্ত্রণ :** প্রোগ্রাম বা এপ্লিকেশনের উপর ব্যবহারকারীদের নিয়ন্ত্রণ কম বা থাকে না।

৫. **প্রশিক্ষণ :** সাধারণত কর্মীদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়।

৬. **ইন্টারনেটের উপর নির্ভরশীলতা :** যেহেতু এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ ইন্টারনেটভিত্তিক। তাই ইন্টারনেট কানেকশনে কোন সমস্যা হলে অথবা গতি স্লো হলে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু লোকাল কম্পিউটারে এ ধরনের কোন সমস্যার সম্ভাবনা নেই।

৭. **স্টোরেজ লিমিট :** অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্টোরেজের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকে।

৮. **স্লো স্পিড :** বড় ফাইল আপলোড বা ডাউনলোড ধীর গতির হতে পারে।

দলীয় কাজ : ক্লাউট কম্পিউটারের সুবিধা এবং অসুবিধা সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত কর।

কয়েকটি জনপ্রিয় ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন

Google Apps : গুগল অ্যাপস অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন। ডকুমেন্ট তৈরি করা, স্প্রেডশিট তৈরি, স্লাইড শো তৈরি, ক্যালেন্ডার মেইনটেন্স, পার্সোনাল ইমেইল ইত্যাদি সার্ভিস দিয়ে থাকে।

Evernote : বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নোটসমূহ খুব সহজে কন্ট্রোল করা, ব্যবহার করা, যেকোনো স্থানে নোটসমূহ ব্যবহার করাতে Evernote খুবই উপকারি।

Quickbooks : এটি একটি একাউন্ট সার্ভিস। এর মাধ্যমে অনলাইনে ক্যাশ নিয়ন্ত্রণ করা, বাজেট তৈরি, বিজনেস রিপোর্ট তৈরি করা যায়।

Toggl : এটি একটি জনপ্রিয় টাইম ট্র্যাকিং অ্যাপ্লিকেশন। প্রোজেক্ট কন্ট্রোল এবং টাইমিং এর জন্য এটা ব্যবহার করা হয়।

Box.net : খুবই চমৎকার একটি সার্ভিস। এতে রাখা যেকোনো ফরমেটের ফাইল যেকোনো স্থানে বসে দেখা যায় বা ব্যবহার করা যায়। Box এর মাধ্যমে এমপ্লয়ীরা নিরাপত্তার সাথে কাস্টমার এবং পার্টনারদের সাথে যে কোন ডিভাইস দ্বারা যে কোন স্থান থেকে টীমের সাথে কাজ করতে পারে।

OneDrive : মাইক্রোসফট এর একটি প্রয়োজনীয় সার্ভিস। আগে এটি স্কাইড্রাইভ নামে পরিচিত ছিল। ভার্চুয়াল হার্ডডিস্কও বলা যেতে পারে। এর মাধ্যমে যে কোন ধরনের ফাইল রাখা এবং তা পিসি থেকে কন্ট্রোল বা অন্যের সাথে খুব সহজে শেয়ার করা যায়।

সার-সংক্ষেপ

উপাত্ত স্থানান্তর : এক কম্পিউটার থেকে অন্য একটি কম্পিউটারে বা কেন্দ্রীয় কম্পিউটার থেকে ওয়ার্কস্টেশনে উপাত্তের বিনিময় ব্যবস্থাকে উপাত্ত স্থানান্তর বলে।

নেটওয়ার্ক: দুই বা ততোধিক বস্তুকে কোন কিছুর মাধ্যমে সমন্বয় করার প্রক্রিয়াকে নেটওয়ার্ক হিসেবে অভিহিত করা হয়।

ক্যাবল : সীমাবদ্ধ স্থানে কম্পিউটার যোগাযোগ বা নেটওয়ার্কিং-এর জন্য এটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন ধরনের ক্যাবল মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

কো-এক্সিয়াল তার : দুটি পরিবাহী ও অপরিবাহী বা পরাবৈদ্যুতিক পদার্থের সাহায্যে এ তার তৈরি করা হয়। ভেতরের পরিবাহীকে আচ্ছাদিত করে বাইরের পরিবাহী এবং এদের মধ্যে থাকে অপরিবাহী পদার্থ।

অপটিক্যাল ফাইবার : বিভিন্ন উপাদানে তৈরি কাচ বা SiC_2 দ্বারা এই আঁশ তৈরি করা হয়। এতে দু'টি রশ্মি পরিবাহী থাকে। ভেতরের পরিবাহীকে কোর (Core) ও বাইরের পরিবাহীকে ক্ল্যাডিং (Clading) বলে।

মডেম : Modulation শব্দের 'Mo' এবং Demodulation শব্দের 'Dem' নিয়ে 'Modem' গঠিত হয়েছে। মোডেম হচ্ছে একটি বৈদ্যুতিক ডিভাইস। নেটওয়ার্কিং-এ তথ্যাবলি আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে মোডেম ভূমিকা পালন করে।

ডেটা কমিউনিকেশনের উপাদান : ডেটা কমিউনিকেশন ব্যবস্থা চারটি উপাদান নিয়ে গড়ে উঠে। যথাঃ উপাত্তের উৎস, উপাত্ত প্রবাহের মাধ্যম, উপাত্তের গ্রাহক, ফেরত সংকেত।

নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ : কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক এবং ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক।

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক: সীমাবদ্ধ এলাকায় অবস্থিত এক বা একাধিক ভবনের কম্পিউটারসমূহের মধ্যে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়, তাকে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বলে।

মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক: কোন নির্দিষ্ট এলাকার (সর্বোচ্চ ৮০ কিলোমিটার) কম্পিউটারসমূহকে টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে, মডেম ব্যবহার করে সংযুক্ত করার পদ্ধতিতে মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক বলে।

ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক: বিশাল পরিসরে (যেমন ঃ দেশ, মহাদেশ বা সমগ্র পৃথিবী) কম্পিউটারসমূহকে নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসার জন্যে এই নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয়। মডেম, টেলিফোন সংযোগ, কৃত্রিম উপগ্রহ প্রভৃতির সমন্বয়ে এ নেটওয়ার্ক গঠিত হয়।

টপোলজি : ল্যানে কম্পিউটারসমূহের সংযুক্তির মানচিত্রকে টপোলজি বলা হয়। এই টপোলজি চার ধরনের।

বাস টপোলজি : সংশ্লিষ্ট কম্পিউটার তথা নোড (Node) গুলোকে একটি মাত্র উপাত্ত পরিবাহীর মাধ্যমে যুক্ত করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় প্রতিটি নোড একই বার্তা একই সাথে গ্রহণ করে।

রিং টপোলজি : এই টপোলজিতে নোডগুলো পরিবাহকের মাধ্যমে চক্রাকারে সংযুক্ত থাকে। কোন্ নোডে সংকেত পাঠালে তা ঐ সংকেত গ্রহণ করার পর প্রয়োজনে পরবর্তী নোডে পাঠাতে পারে।

স্টার টপোলজি : এই টপোলজিতে নোডগুলো একটি কেন্দ্রীয় কম্পিউটার বা সার্ভারের সঙ্গে যুক্ত থেকে নেটওয়ার্কভুক্ত হয়। এই সংযুক্তির আকৃতি অনেকটা তারার মতো বলে এর নামকরণ এরূপ হয়েছে।

অনুশীলনী–২

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম

■ সাধারণ নির্বাচনি প্রশ্ন :

১. কোনটি ট্রান্সমিশন সিস্টেমের উপাদান?
ক. ডিভাইস খ. জিপিএস
গ. রিসিভার ঘ. পার্সোনাল ডিজিটাল

২. ট্রান্সমিশন সিস্টেম থেকে ডেটা সিগন্যাল গ্রহণ করা কার কাজ?
ক. সেন্ডারের কাজ খ. রিসিভারের কাজ
গ. ডিভাইসের কাজ ঘ. সিগন্যালের কাজ

৩. ডেটা ট্রান্সমিশনের একককে নিচের কোনটি দ্বারা হিসেব করা হয়?
ক. Spb খ. Kbps
গ. bps ঘ. Mbps

৪. অ্যাসিনক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশনের সুবিধা কোনটি?
ক. ব্লক আকারে ডেটা ট্রান্সমিট হয়
খ. বেশি ডেটা ট্রান্সমিট হয়
গ. প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন নেই
ঘ. বিরতিহীনভাবে ডেটা ট্রান্সমিট করে

৫. কোনটি একমুখী ডেটাপ্রবাহ?
ক. সিনক্রোনাস খ. হাফ-ডুপ্লেক্স
গ. আইসোক্রোনাস ঘ. সিমপ্লেক্স

৬. নিচের কোন পদ্ধতিতে প্রেরক কম্পিউটার হতে ডেটা গ্রাহক কম্পিউটারে ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ট্রান্সমিট হয়?
ক. সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন খ. অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন
গ. আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন ঘ. ট্রান্সমিশন

৭. নিচের কোন বৈশিষ্ট্যটি অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের বেলায় প্রযোজ্য?
ক. ইন্সটলের খরচ অত্যন্ত বেশি
খ. প্রতিটি বর্ণের সাথে একটি স্টার্ট বিট গ্রহণ করতে হয়
গ. প্রেরকের প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয়
ঘ. ডেটা ট্রান্সমিশনের গতি কম

৮. হাফ-ডুপ্লেক্স উদাহরণ কোনটি?
ক. রেডিও খ. মোবাইল
গ. টিভি ঘ. ওয়াকিটকি

৯. ব্যান্ডউইথ কী?
ক. ডেটা প্রবাহের হার খ. ডেটা প্রবাহের মাধ্যম
গ. ডেটা প্রবাহের দিক ঘ. ডেটা প্রবাহের পদ্ধতি

১০. কোর, ক্লেডিং ও জ্যাকেট দিয়ে নিম্নের কোনটি তৈরি হয়?
ক. কো-এক্সিয়াল খ. অপটিক্যাল ফাইবার
গ. টুইস্টেড পেয়ার ঘ. রাউটার

১১. ভয়েস ব্যান্ড বেশি ব্যবহৃত হয় কোনটিতে?
ক. টেলিফোনে খ. টেলিগ্রাফে
গ. স্যাটেলাইটে ঘ. কম্পিউটারে

১২. মোবাইল ফোন কোন পদ্ধতিতে ডেটা কমিউনিকেশন করে?
ক. সিমপ্লেক্স খ. হাফ ডুপ্লেক্স
গ. ফুল ডুপ্লেক্স ঘ. মাল্টিকাস্ট

১৩. সর্বোচ্চ গতিতে ডেটা ট্রান্সফার করে কোনটি?
ক. UTP খ. STP
গ. কো-এক্সিয়াল ক্যাবল ঘ. ফাইবার অপটিক ক্যাবল

১৪. একটি চ্যানেল দিয়ে 3 সেকেন্ডে 8100 বিট স্থানান্তরিত হলে তার ব্যান্ডউইথ কত?
ক. 1800 bps খ. 2700 bps
গ. 5400 bps ঘ. 600 bps

১৫. ন্যারোব্যান্ডে ডেটার গতিসীমা কত?
ক. 45 bps-300 bps খ. সর্বোচ্চ 9600 bps
গ. 9600 bps-2 Mbps ঘ. কমপক্ষে 1 Mbps

১৬. ন্যারোব্যান্ড টেলিফোনের ক্ষেত্রে কত হার্টজ ফ্রিকুয়েন্সি প্রদান করে থাকে?
ক. ৩০০ – ৩০০০ খ. ৩০০ – ৪৪০০
গ. ৩০০ – ৩৫০০ ঘ. ৩০০ – ৩৪০০

১৭. নিচের কোন পদ্ধতিতে প্রেরক কম্পিউটার সবসময় অন্য কম্পিউটারে ডেটা পাঠায়?
ক. সিমপ্লেক্স খ. ব্রডকাস্ট
গ. মাল্টিকাস্ট ঘ. হাফ–ডুপ্লেক্স

১৮. সিমপ্লেক্স পদ্ধতির উদাহরণ কোনটি?
ক. মোবাইল খ. ওয়াকিটকি
গ. টেলিফোন ঘ. রেডিও

১৯. কোথায় ভয়েস ব্যান্ড ব্যবহৃত হয়?
ক. টেলিগ্রাফিতে খ. ট্যালি প্যাথিতে
গ. টেলি কনফারেন্সে ঘ. টেলিফোনে

২০. নিচের কোনটি অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন বুঝায়?
ক. স্টার্ট/স্টপ–ট্রান্সমিশন খ. স্টপ ট্রান্সমিশন
গ. স্টার্ট ট্রান্সমিশন ঘ. লিনিয়ার ট্রান্সমিশন

২১. কোনটি সবচেয়ে দ্রুত গতির ডাটা ট্রান্সমিশন?
ক. ব্রড ব্যান্ড খ. ভয়েচ ব্যান্ড
গ. ন্যারো ব্যান্ড ঘ. লার্জ ব্যান্ড

২২. নিচের কোনটি সিমপ্লেক্স, হাফ ডুপ্লেক্স ও ফুল ডুপ্লেক্স মোডের নির্দেশক?
ক. মাল্টিকাস্ট মোড খ. ব্রড কাস্ট মোড
গ. ইউনিকাস্ট মোড ঘ. সেমি কাস্ট মোড

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১	গ	২	খ	৩	গ	৪	গ	৫	ঘ	৬	খ	৭	খ	৮	ঘ	৯	ক	১০	খ	১১	ক
১২	গ	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	ক	১৬	ঘ	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	ক	২১	ক	২২	গ

২৩. নিচের কোনটি কো–এক্স ক্যাবলের তারকে ঘিরে জড়ানো থাকে?
ক. প্লাস্টিকের আবরণ খ. নাইলন সূতার জাল
গ. প্লাস্টিক ফোমের ইনসুলেশন ঘ. ফোমের ইনসুলেশন

২৪. কোনটি কো–এক্সিয়াল ক্যাবলের সুবিধা?
ক. টুইস্টেড পেয়ারের চেয়ে গতি কম
খ. ডেটা ট্রান্সফার রেট কম
গ. ট্রান্সমিশন লস অপেক্ষাকৃত কম
ঘ. সিগন্যাল ট্রান্সমিট অপেক্ষাকৃত কম

২৫. এসটিপি ক্যাবলের বাইরে নিচের কোনটি থাকে?
ক. জ্যাকেট বা ক্যাবল খ. জ্যাকেট বা কেসিং
গ. ইউটিপি বা কেসিং ঘ. কেসিং বা ক্যাবল

২৬. কোন ক্যাবল যোগাযোগ ক্যাবল হিসেবে ব্যবহৃত হয়?
ক. ফাইবার অপটিক খ. টুইস্টেপ পেয়্যার
গ. অপটিক্যাল ফাইবার ঘ. কো–এক্সিয়াল

২৭. বর্তমানে যোগানকৃত ইউটিপি ক্যাবলের ডেটা ট্রান্সমিশন গতি সর্বোচ্চ কত এমবিপিএস?
ক. ১০০ খ. ৫০
গ. ৫০০ ঘ. ১০০০

২৮. কোনটি কো–এক্সিয়াল ক্যাবলকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত হয়?
ক. মেটালিক ফয়েল খ. প্লাস্টিকের জ্যাকেট
গ. সলিড কপার ওয়্যার ঘ. বেইডেড ওয়্যার

২৯. যখন কপার ওয়্যারসমূহ টুইস্টেড করা হয় তখন কী ফলাফল হয়?
ক. EMI কমে খ. পরিবাহকতা কমে
গ. রোধ কমে ঘ. তার স্থায়ী হয়

৩০. কী দিয়ে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল তৈরি?
ক. কাঁচ তন্তু খ. ইস্পাত
গ. কপার ঘ. ফেরাস কোর

৩১. নিচের কোনটি বর্তমানে প্রাপ্ত অপটিক্যাল ফাইবারের ডেটা পরিবহনের হারে সীমা নির্দেশক?
ক. 1mbps – 100 mbps খ. 100 gbps – 100 gbps
গ. 1gbps – 100 gbps ঘ. 100 mbps – 2 gbps

৩২. কীভাবে আন্তঃমহাদেশীয় অপটিক্যাল ফাইবার সারাবিশ্বে ছড়িয়ে গেছে?
ক. সমুদ্র তলদেশ দিয়ে খ. বায়ুর মধ্যে দিয়ে
গ. মাটির নিচ দিয়ে ঘ. ভূ–উপগ্রহের মাধ্যমে

■ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৩. কমিউনিকেশন বলতে বুঝায়—
i. মেসেজ প্রেরণ ii. তথ্য গ্রহণের ক্ষমতা
iii. তথ্য প্রবাহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii ও iii খ. i ও iii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৩৪. ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড হল—
i. অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন
ii. সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন
iii. আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

■ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩৫–৩৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
রানা তার বাবাকে জিজ্ঞেস করল মোবাইল কোম্পানীগুলো তাদের টাওয়ার উঁচুস্থানে স্থাপন করে কেন। রানার বাবা তখন তাকে বিভিন্ন ধরনের ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন মিডিয়ার কার্যপদ্ধতি ব্যাখ্যা করলেন।

৩৫. তারের মধ্য দিয়ে যখন সিগন্যাল অতিক্রম করতে থাকে তখন এর শক্তি বা মান ক্রমান্বয়ে লোপ পেতে থাকে, যাকে বলা হয়—.
ক. এটিনিউয়েশন খ. বিকিরণ
গ. ট্রান্সমিশন লস ঘ. প্রসেসিং সিস্টেম

৩৬. মোবাইল কোম্পানীগুলো আন্তঃদেশীয় টেলিযোগাযোগে কোন ওয়্যারলেস মিডিয়া ব্যবহার করে?
ক. রেডিও ওয়েভ খ. টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ
গ. স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ ঘ. ইনফ্রারেড

ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম

■ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৭. WIMAX টাওয়ার চারদিকে সর্বোচ্চ কত মাইল পর্যন্ত সেবা দিতে পারে?
ক. ১০ খ. ২০
গ. ৪০ ঘ. ৬০

৩৮. কোনটি Wi-Max স্ট্যান্ডার্ড?
ক. 802.15 খ. 802.11a
গ. 802.11b ঘ. 802.16

৩৯. কোন প্রযুক্তি ওয়্যারলেস প্যান এর জন্য ব্যবহার করা যায়?
ক. Wi–Max খ. টেলেস্টোরিয়াল
গ. স্যাটেলাইট ঘ. ব্লু–টুথ

৪০. পৃথিবী থেকে কত উচ্চতায় স্যাটেলাইট স্থাপন করা হয়?
ক. 1200 km খ. 36000 km
গ. 24000 km ঘ. 12000 km

৪১. একই সাথে অনেকগুলো দেশের যোগাযোগের জন্য নিচের কোনটি ব্যবহার করতে হবে?
ক. স্যাটেলাইট খ. অপটিক্যাল ফাইবার
গ. টেরিস্ট্রিয়াল ঘ. ইনফ্রারেড

৪২. রেডিও মডেল ও এন্টেনা প্রয়োজন কোন ক্ষেত্রে?
ক. ওয়্যারলেস ল্যান খ. ওয়্যারলেস ম্যান
গ. ওয়্যারলেস প্যান ঘ. ওয়্যারলেস ওয়ান

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

২৩	গ	২৪	গ	২৫	খ	২৬	গ	২৭	ঘ	২৮	খ	২৯	ক	৩০	ক	৩১	ঘ	৩২	ক
৩৩	ঘ	৩৪	খ	৩৫	ক	৩৬	খ	৩৭	ক	৩৮	ঘ	৩৯	ঘ	৪০	খ	৪১	ক	৪২	ক

৪৩. হটস্পট কী?
ক. নির্দিষ্ট উত্তপ্ত এলাকা খ. তারযুক্ত ইন্টারনেট ব্যবস্থা
গ. তার বিহীন ইন্টারনেট ব্যবস্থা
ঘ. বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা

৪৪. মাইক্রোওয়েভ এর ফ্রিকয়েন্সি রেঞ্জ কত?
ক. 300MHz–30GHz খ. 10KHz–1GHz
গ. 3KHz–3MHz ঘ. 300GHz–400THz

৪৫. নিচের কোনটি ওয়্যারলেস ম্যান-এর উদাহরণ?
ক. ব্লু–টুথ খ. Wi–Max
গ. স্যাটেলাইট ঘ. ইনফ্রারেড

৪৬. কোনটিকে পরস্পর সংযুক্ত ইন্টারনেট এক্সেস পয়েন্ট বলা হয়?
ক. হট স্পট খ. বাস
গ. পোর্ট ঘ. সুইচ

৪৭. কতদূরত্ব পর্যন্ত Wi–Max বেস স্টেশন ইন্টারনেট অ্যাকসেস সুবিধা প্রদান করে?
ক. 7 okm – 100 km10 খ. 1 km – 8 Km
গ. 1 km – 60 km ঘ. 1 m – 1 km

■ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪৮. ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন ব্যবহার হয়—
i. চলমান অবস্থায় ডেটা কমিউনিকেশনের জন্য
ii. রেডিও ও টিভির সম্প্রচারের জন্য
iii. তারবিহীন এনার্জি স্থানান্তরের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৯. ব্লুটুথ এর ক্ষেত্রে ডেটা ট্রান্সফারে—
i. উচ্চমানের নিরাপত্তা বজায় থাকে
ii. ১০ থেকে ১০০০ মিটার পর্যন্ত রেঞ্জ বজায় থাকে
iii. দেয়াল বা অন্য কিছু প্রতিবন্ধক হবে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

৫০. ওয়াই-ম্যাক্স ব্যবহার করে—
i. বিস্তীর্ণ এলাকায় ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা যায়
ii. ভিওআইপি ও আইপিটিভি এর সেবা প্রদান করা যায়
iii. নিম্ন গতির ইন্টরনেট সেবা প্রদান করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii ও iii খ. i ও iii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৫১. ওয়াইফাই হটস্পটে বিভিন্ন ওয়াইফাই এনবল ডিভাইসগুলোকে—
i. রাউটারের মাধ্যমে সংযুক্ত করা যায়
ii. সার্ভারের মাধ্যমে সংযুক্ত করা যায়
iii. অ্যাডহক মোডে সংযুক্ত করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও iii খ. i, ii ও iii
গ. i ঘ. i ও ii

৫২. Wi–Fi এর ক্ষেত্রে–
i. ফুল ডুপ্লেক্স মোড ব্যবহৃত হয়
ii. ক্যাবল এর প্রয়োজন নেই
iii. কভারেজ এরিয়া হচ্ছে ৩২ থেকে ৯৫ মিটার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৩. Wi-Fi ব্যবহার করা হয়–
i. ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কিং-এ
ii. সীমিত পরিসরে
iii. সবচেয়ে দ্রুত গতির ট্রান্সমিশনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৪. ওয়াই-ম্যাক্স হলো —
i. এক ধরনের তারবীহিন নেটওয়ার্ক
ii. বিনা তারে ব্রডব্যান্ড সেবা দেবার প্রযুক্তি
iii. একাধিক ডিজিটাল ডিভাইসে ডেটা স্থানান্তরের প্রযুক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i
গ. ii ঘ. iii

মোবাইল যোগাযোগ

■ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫৫. মোবাইল ফোনের কোন প্রজন্ম হতে SMS সেবা চালু হয়?
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয়
গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ

৫৬. নিচের কোন প্রতিষ্ঠান ব্লুটুথ এর উদ্ভাবক?
ক. স্যামসাং খ. এরিকসন
গ. নোকিয়া ঘ. সনি

৫৭. কে মোবাইল ফোনের আবিষ্কারক?
ক. জ্যাক উইলিয়ামসন খ. গ্রাহাম বেল
গ. রিচার্ড ফাইনম্যান ঘ. ড. মার্টিন কুপার

৫৮. বাণিজ্যিকভাবে 3G চালু হয় কবে থেকে—
ক. ১৯৮৯ খ. ২০০৫
গ. ২০০১ ঘ. ১৯৯৫

৫৯. 3G এর বিশেষ সুবিধা কোনটি?
ক. ভয়েস কল খ. মেসেজিং
গ. টেলিকনফারেন্স ঘ. ভিডিও কল

৬০. ডেটা ট্রান্সফরমার এর হার 4G-নেটওয়ার্কে সর্বোচ্চ কত?
ক. 10 mbps খ. 100 mbps
গ. 50 mbps ঘ. 25 mbps

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

৪৩	গ	৪৪	খ	৪৫	খ	৪৬	ক	৪৭	গ	৪৮	ঘ	৪৯	ঘ	৫০	গ	৫১	ক
৫২	ক	৫৩	ক	৫৪	ক	৫৫	খ	৫৬	খ	৫৭	ঘ	৫৮	গ	৫৯	ঘ	৬০	খ

■ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৬১. চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল প্রযুক্তির সফল বাস্তবায়ন হলো—
i. Wixmax ii. 3GPP LTE
iii. ওয়াই-ফাই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ঘ. iii

৬২. মোবাইল কমিউনিকেশন হলো—
i. তারবিহীন যোগাযোগ ব্যবস্থা
ii. শুধুমাত্র কথা বলার ব্যবস্থা iii. ফুল ডুপ্লেক্স নেটওয়ার্ক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক

■ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৬৩. ব্লুটুথ এর মাধ্যমে কোন নেটওয়ার্ক তৈরি হয়?
ক. PAN খ. LAN
গ. WAN ঘ. MAN

৬৪. কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে কম্পিউটার ও স্মার্টফোনে একই সাথে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া যাবে?
ক. Bluetooth খ. Wi-Fi
গ. WAN ঘ. LAN

৬৫. কোনটি **Network Topology**?
ক. LAN খ. BUS
গ. WAN ঘ. MAN

৬৬. সর্ববৃহৎ এলাকা জুড়ে কোন নেটওয়ার্কটি তৈরি হয়?
ক. PAN খ. LAN
গ. MAN ঘ. WAN

৬৭. কয়েকটি ভিন্ন নেটওয়ার্ক যুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত ডিভাইস কোনটি?
ক. সুইচ খ. রাউটার
গ. হাব ঘ. গেটওয়ে

৬৮. ভিন্ন ভিন্ন প্রোটোকল বিশিষ্ট নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করতে নিচের কোন ডিভাইসটি ব্যবহার করতে হয়?
ক. Switch খ. Gateway
গ. HUB ঘ. LAN Card

৬৯. কোন নেটওয়ার্ক সিস্টেমের ব্যাপ্তি কয়েক মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ–
ক. ল্যান খ. ম্যান
গ. ওয়ান ঘ. প্যান

■ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৭০. একই ভবনের বিভিন্ন তলায় অবস্থিত অনেকগুলো কম্পিউটারের মধ্যে নেটওয়ার্ককে কী বলে?
ক. LAN খ. CAN
গ. PAN ঘ. WAN

৭১. নিচের কোনটি **LAN** এর এরিয়া সর্বোচ্চ মান নির্দেশক?
ক. 100 মিটার খ. 50 মিটার
গ. 10 মিটার ঘ. 1000 মিটার

৭২. নিচের কোন নেটওয়ার্কে প্রতিটি কম্পিউটার তার দু দিকের দুটি কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে?
ক. বাস সংগঠন খ. শাখা–প্রশাখা সংগঠন
গ. স্টার সংগঠন ঘ. রিং সংগঠন

৭৩. নিচের কোনটি **Modulator** ও **Demodulator** কে বোঝায়?
ক. Modem খ. Demodulate
গ. Modulate ঘ. Module

৭৪. কোনটি লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে কম্পিউটার বা অন্যান্য যন্ত্রপাতির সংযোগ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়?
ক. নেটওয়ার্ক কার্ড খ. ভি–স্যাট
গ. রাউটার ঘ. হাব

৭৫. প্রত্যেকটি কম্পিউটার বা ডিভাইসকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হয় নেটওয়ার্কের কোন সংগঠনে?
ক. সংকর সংগঠন খ. স্টার সংগঠন
গ. বাস সংগঠন ঘ. ট্রাক সংগঠন

৭৬. **WAN**-এর উদাহরণ কোনটি?
ক. রেডিও খ. ওয়েবসাইট
গ. ইন্টারনেট ঘ. টেলিভিশন

৭৭. কোন ব্যবস্থায় কোনো কেন্দ্রীয় কম্পিউটার থাকে না?
ক. রিং টপোলজি খ. স্টার টপোলজি
গ. বাসটপোলজি ঘ. মেশ টপোলজি

৭৮. নেটওয়ার্কযুক্ত কম্পিউটারসমূহের অবস্থানগত এবং সংযোগ বিন্যাসের নাম কী?
ক. ডিভাইস খ. টপোলজি
গ. মিডিয়া ঘ. নেটওয়ার্ক

৭৯. একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী কম্পিউটারের সঙ্গে একাধিক কম্পিউটার সংযুক্ত হওয়ার সংগঠনের নাম কী?
ক. সংকর সংগঠন খ. রিং সংগঠন
গ. বাস সংগঠন ঘ. স্টার সংগঠন

■ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৮০. রিং নেটওয়ার্কের জন্য প্রযোজ্য হলো—
i. নেটওয়ার্ক বড় হলে তথ্য পারাপারের গতি কমে যায়
ii. কেন্দ্রীয় কম্পিউটার থাকে
iii. যেকোনো কম্পিউটার নষ্ট হলেও অন্য কম্পিউটার চালু থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

৬১	খ	৬২	ঘ	৬৩	ক	৬৪	খ	৬৫	খ	৬৬	ঘ	৬৭	খ	৬৮	খ	৬৯	ঘ	৭০	ক
৭১	ক	৭২	ঘ	৭৩	ক	৭৪	ঘ	৭৫	গ	৭৬	গ	৭৭	ক	৭৮	খ	৭৯	ঘ	৮০	ক

৮১. বাস টপোলজিতে ছোট আকারের নেটওয়ার্কে ব্যবহার—
i. খুব সহজ, সাশ্রয়ী, বিশ্বস্ত
ii. খুব কঠিন, ব্যয়বহুল
iii. খুব সহজ, ব্যয়বহুল, অবিশ্বস্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i
গ. ii ঘ. iii

৮২. WAN নেটওয়ার্ক মূলত একটি—
i. বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা
ii. শহর কেন্দ্রিক নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা
iii. নিকটবর্তী নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i ও ii

৮৩. ক্লাউড কম্পিউটিং বলতে বুঝায়—
i. ইন্টারনেট নির্ভর কম্পিউটিং
ii. ইন্টারনেট বিহীন কম্পিউটিং
iii. কম্পিউটিং এ দুইটি অবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ঘ. iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৮৪ এবং ৮৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও
সামিহা তার কম্পিউটারে অনেক নতুন সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারে না। পরে সে এমন এক সার্ভিস গ্রহণ করলো যা দ্বারা সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়, উচ্চগতিসম্পন্ন কম্পিউটারের সুবিধা পাওয়া যায় এবং খরচও কম হয়।

৮৪. উদ্দীপকের সার্ভিসটির নাম কী?
ক. Bluetooth খ. Wi–Fi
গ. Wi–max ঘ. Cloud Computing

৮৫. উদ্দীপকে ব্যবহৃত সার্ভিসটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–
i. কোন লাইসেন্স ফি প্রয়োজন হয় না
ii. ব্যবহারের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না
iii. রক্ষণাবেক্ষণ এর খরচ নেই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

৮১	খ	৮২	ক	৮৩	ক	৮৪	ঘ	৮৫	ঘ										

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
মারুফ সাহেবের অফিসের কম্পিউটারগুলো পরস্পরের সাথে সংযোগের জন্য যে ক্যাবল ব্যবহার করা হয়েছে তা অর্থ সাশ্রয়ী এবং সহজে স্থাপনযোগ্য। ফরহাদের অফিসের একটি কম্পিউটারের সংযোগ ক্যাবল নষ্ট হওয়ায় অন্যান্য কম্পিউটার কাজ করছে না। ফরহাদের বন্ধু হাসানের অফিসের সকল কম্পিউটারগুলো একটি কেন্দ্রীয় ডিভাইসের সাথে সংযুক্ত।
ক. মাইক্রোওয়েভ কী? ১
খ. কোন ট্রান্সমিশনে একই সঙ্গে উভয় দিকে ডেটা আদান-প্রদান করা যায়? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. মারুফ সাহেবের অফিসে ব্যবহৃত ক্যাবলটির ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ফরহাদ সাহেব ও হাসানের অফিসের নেটওয়ার্ক উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবস্থাদ্বয়ের মধ্যে কোনটি উত্তম? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
হাসান আলোর গতিতে একটি বায়োডাটা কানাডায় পাঠায়। হাসানের বন্ধু ইদ্রিস বলল, "আমার বাড়িতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি দ্বারা পাশাপাশি অবস্থিত এক ল্যাপটপ থেকে অন্য ল্যাপটপে ছবি প্রেরণ করা যায়"। ইদ্রিসের মামাতো ভাই সুমন বলল, "আমার গ্রামের বাড়ি থেকে ল্যাপটপের সাহায্যে ডেটা বিশ্বের যেকোন স্থানে পাঠানো যায়। কিন্তু বাড়ির বাইরে গেলে নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না। এটি বাড়ির সবাই ব্যবহার করতে পারে।"
ক. মডেম কী? ১
খ. ডেটা চলাচলের জন্য ফাইবার অপটিক ক্যাবল অধিক কার্যকর কেন? ২
গ. হাসানের বায়োডাটা প্রেরণের প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ইদ্রিস এবং সুমনের বাড়িতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি দুটির মধ্যে কোনটি উত্তম? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৩. নিচের চিত্রকল্পটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

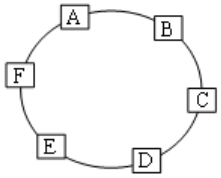

ক. রাউটার কী? ১
খ. ডেটা আদান-প্রদানে মডেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে- বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত টপোলজির বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. চিত্রকল্পের প্রতিটি কম্পিউটারকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করলে যে টপোলজি তৈরি হবে তার চিত্র অঙ্কন করে চিত্রকল্পের টপোলজি ও নতুন টপোলজির তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৪. নিচের চিত্রকল্পগুলো লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

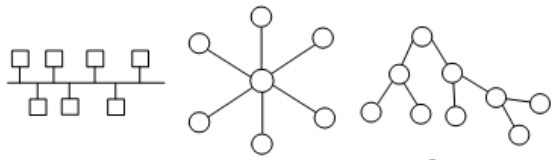

চিত্র-১ চিত্র-২ চিত্র-৩

ক. ব্যান্ড উইডথ কী? ১
খ. পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন পদ্ধতিতে ডেটা ট্রান্সমিশন বিবৃত কর। ২
গ. চিত্র–১ ও চিত্র–২ সংযুক্ত করলে কোন ধরনের টপোলজি গঠিত হবে? ব্যাখ্যা কর ৩
ঘ. স্বল্প ব্যয়ে ল্যাবরেটরিতে ব্যবহারের জন্য উদ্দীপকের কোন টপোলজিটি অধিকতর উপযোগী? তুলনামূলক বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
একটি প্রতিষ্ঠানের 'এ', 'বি' এবং 'সি' শাখা তিনটির প্রতিটিতে অবস্থিত বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা রয়েছে। কর্তৃপক্ষ প্রতিটি শাখাকে একটি কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্কের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু শাখা অফিসগুলোর ভৌগোলিক দূরত্ব বেশি হওয়ার কারণে ক্যাবল ব্যবহার করা যাচ্ছে না।
ক. কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কী? ১
খ. অপটিক্যাল ফাইবার তৈরিতে মাল্টিকম্পোনেন্ট কাচ ব্যবহার করা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'এ' স্থানের নেটওয়ার্কের ধরন বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে নেটওয়ার্ক মাধ্যম নির্বাচনে তোমার সুপারিশ ও তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
কুলিয়ারচর ডিগ্রী কলেজের ল্যাবে কম্পিউটারগুলোর জন্য ইন্টারনেট সুবিধা সকল ছাত্র-ছাত্রীর ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার লক্ষ্যে Free Wi-Fi Zone স্থাপন করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা আনন্দিত হলেও পরবর্তীতে তারা এটি ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে উঠে। একই সাথে কলেজের কম্পিউটার অপারেটরও নানা অভিযোগ করেন।
ক. ই-মেইল কী? ১
খ. ডেটা চলাচলের ক্ষেত্রে কোন ধরনের ক্যাবল অধিক কার্যকর? ২
গ. উদ্দীপকের ব্যবস্থাটি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যবহার বাঞ্ছনীয় নয়-ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ব্যবস্থায় গোপনীয় ডেটা নিশ্চিতভাবে শিক্ষাবোর্ডে প্রেরণ করার ক্ষেত্রে তোমার সুপারিশ বিশ্লেষণ কর। ৪

৭. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল হতে গ্রামের একটি কলেজকে দশটি কম্পিউটার, একটি প্রিন্টার ও একটি মডেম প্রদান করা হয়। সবগুলো কম্পিউটার যেন প্রিন্টার ও মডেম ব্যবহার করতে পারে সে ধরনের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি 32 Kbps ইন্টারনেট স্পীড গ্রহণ করে। তবে নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত হলেও এর মাধ্যমে সরাসরি ছবি দেখে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।
ক. রাউটার কী? ১
খ. ক্লাউড কম্পিউটিং সেবা গ্রহণ করা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপটে সর্বোচ্চ সুবিধা গ্রহণের জন্য কোন ধরনের নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়? চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা নিরসনে তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

৮. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

দৃশ্যকল্প-১

মারুফা কানাডায় বসবাস করে। মাঝে মধ্যে মায়ের কথা মনে পড়লে মায়ের সাথে কথা বলে এবং সাথে সাথে মায়ের ছবিও দেখতে পায়। মা মেয়েকে প্রশ্ন করে 'এটি কীভাবে সম্ভব?' মারুফার ব্যবহৃত প্রযুক্তি ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।

দৃশ্যকল্প-২

সিসটেক কোম্পানির পাঁচজন কর্মকর্তা বাংলাদেশ, চীন, জাপান, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র থেকে এক সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলছে। ব্যবহৃত প্রক্রিয়াটি তাদের চাহিদা পূরণে সক্ষম নয়।

ক. www কী? ১

খ. ফাইবার অপটিক ক্যাবল নেটওয়ার্কের ব্যাকবোন হিসেবে অধিক ব্যবহৃত হচ্ছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ ব্যবহৃত প্রযুক্তিতে তথ্য আদান-প্রদানের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ ও ২ এ ব্যবহৃত যোগাযোগ প্রটোকল দুইটির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৯. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

খাগড়াছড়ি পৌর এলাকার প্রায় ১০ থেকে ১২ বর্গ কি.মি. বিস্তৃত শহরের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ উদ্যোগে ইন্টারনেট সেবা ব্যবহার করছে, যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। পৌরমেয়রের নিকট সমস্যাটি উপস্থাপন করা হলে তিনি জানান যে, খাগড়াছড়িতে উঁচু-নিচু পাহাড়ের মধ্যে তারযুক্ত নেটওয়ার্ক স্থাপন শ্রমসাধ্য, ঝুঁকিপূর্ণ এবং সময়সাপেক্ষ। এমতাবস্থায় একজন প্রযুক্তিবিদের পরামর্শে পৌরমেয়র সমগ্র শহরে একটি সার্ভার-এর মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করার পরিকল্পনা করছেন।

ক. ব্লুটুথ কী? ১

খ. শুধু মডুলেশন বা ডিমডুলেশন কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে না কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পৌরমেয়র কোন ধরনের প্রযুক্তির পরিকল্পনা করছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পৌরমেয়রের গৃহীত উদ্যোগটি যৌক্তিক কি না? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১০. নিচের চিত্রকল্প দুটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

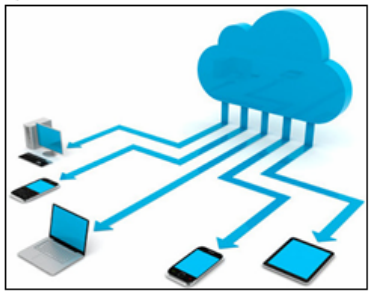

চিত্র–১

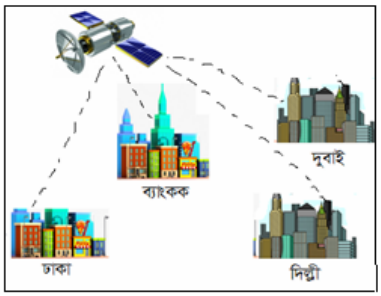

চিত্র–২

ক. মডেম কী? ১

খ. তারহীন দ্রুতগতিসম্পন্ন নেটওয়ার্ক সম্পর্কে লেখ। ২

গ. ১ম চিত্রে কী ধরনের সুবিধা পাওয়া যায়? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ২নং চিত্রের সাথে সাবমেরিন ক্যাবলের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

১১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

একটি সরকারি কলেজের প্রতিটি বিভাগ কম্পিউটারের মাধ্যমে আলাদাভাবে কাজ করায় ডেটা আদান-প্রদানে বিভিন্ন সমস্যা হয় বিধায় কলেজের অধ্যক্ষ সকল বিভাগকে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় এনে অফিসের যাবতীয় কার্যক্রম এবং শিক্ষা/পাঠদান অনলাইনে সম্পন্ন করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করার আগ্রহ দেখালেন এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিলেন।

ক. ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড কী? ১

খ. Wi-fi জোনে ডেটা নিরাপত্তা ব্যবস্থা কীভাবে করা যায়? ২

গ. উদ্দীপকে পরিবর্তিত ব্যবস্থায় ডেটা সংরক্ষণের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতির জন্য কোন ধরনের নেটওয়ার্ক উপযুক্ত? তোমার মতামতের পক্ষে যুক্তি বিশ্লেষণ কর। ৪

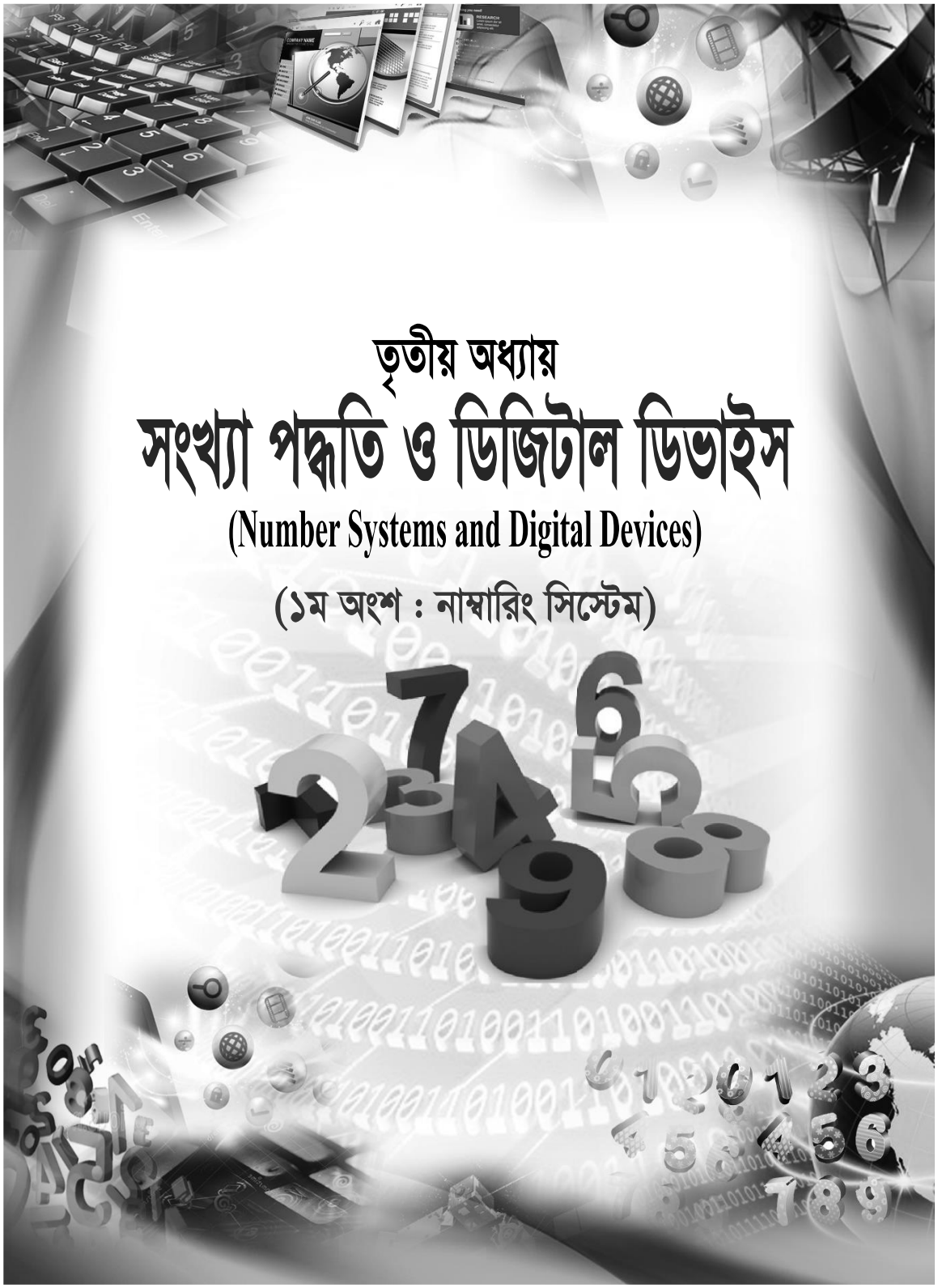

তৃতীয় অধ্যায়

সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস

(Number Systems and Digital Devices)

(১ম অংশ : নাম্বারিং সিস্টেম)

তৃতীয় অধ্যায় (প্রথম অংশ)

সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস

Number System and Digital Device

পিরিয়ড সংখ্যা : ২০

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে। ২. সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা পদ্ধতির আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে।	• সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস (History of inventing Numbers) • সংখ্যা পদ্ধতি (Number System) ❍ প্রকারভেদ (Classification of Number System) ❍ রূপান্তর (Conversion of Numbers)
৫. বাইনারি যোগ বিয়োগ সম্পন্ন করতে পারবে। ৬. চিহ্নযুক্ত সংখ্যার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. ২ এর পরিপূরক নির্ণয় করতে পারবে। ৮. কোডের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. বিভিন্ন প্রকার কোডের তুলনা করতে পারবে।	• বাইনারি যোগ ও বিয়োগ (Addition and Subtraction in Binary System) • চিহ্নযুক্ত সংখ্যা (Signed Numbers) • ২এর পরিপূরক (2’s Complement) • কোড (Code) ❍ কোডের ধারণা (Concept of Code) ❍ BCD, EBCDIC, Alphanumeric code, ASCII, Unicode
১০. বুলিয়ান অ্যালজেবরার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১. বুলিয়ান উপপাদ্যসমূহ প্রমাণ করতে পারবে। ১২. লজিক অপারেটর ব্যবহার করে বুলিয়ান অ্যালজেবরার ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে পারবে। ১৩. বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাথে সম্পর্কিত ডিজিটাল ডিভাইসসমূহের কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে পারবে।	• বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও ডিজিটাল ডিভাইস (Boolean Algebra and Digital Device) ❍ বুলিয়ান অ্যালজেবরা (Boolean Algebra) ❍ বুলিয়ান উপপাদ্য (Boolean Theorem) ❍ ডি মরগ্যানের উপপাদ্য (De Morgan’s Theorem) ❍ সত্যক সারণি (Truth Table) ❍ মৌলিক গেইট (AND, OR, NOT gate) ❍ সার্বজনীন গেইট (Universal Gate) ❍ বিশেষ গেইট (X-OR, X-NOR gate) ❍ এনকোডার (Encoder) ❍ ডিকোডার (Decoder) ❍ অ্যাডার (Adder) ❍ রেজিস্টার (Register) ❍ কাউন্টার (Counter)

১. সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস (History of Inventing Numbers)

মানুষের কোন কিছু গণনা করার চেষ্টা থেকেই সংখ্যার জন্ম হয়েছে। গণনার বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ আঙ্গুল, কাঠি, নুড়ি পাথর, রশিতে গিড়া দিয়ে, মাটিতে বা দেয়ালে দাগ কেটে গণনাকার্য সম্পাদন করেছে। এভাবে গণনার শিক্ষার জন্য বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন, বর্ণ, সংখ্যা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

খ্রিস্টপূর্ব ৩৪০০ সালে হায়ারোগ্লিফিক্স (Hieroglyphics) চিহ্ন বা সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বপ্রথম গণনার কাজে লিখিত সংখ্যা বা চিহ্নের প্রচলন শুরু হয় বলে অনুমান করা হয়। এরপর শুরু হয় মেয়ান (Mayan) পদ্ধতি। তারা ব্যবহার করতো একটি ২০ ভিত্তিক সংখ্যা (vigesimal) এবং ৫ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি। তাছাড়াও, প্রেক্লাসিক মায়া এবং তাদের প্রতিবেশীদের ৩৬ খৃস্টপূর্বাব্দের মধ্যে শূন্যের ধারণা স্বাধীনভাবে ক্রমবিকশিত করেছিল। খৃস্টপূর্ব ৩৪০০ সালে রোমানরা তাদের নিজস্ব বর্ণমালা ব্যবহারের মাধ্যমে রোমান (Roman) সংখ্যা পদ্ধতি চালু হয়। খৃষ্টপূর্ব ৪০০০ সালের দিকে ভারতবর্ষে দশভিত্তিক সংখ্যার প্রচলন হয় এবং আরবের পণ্ডিতেরা তাদের এ পদ্ধতির উপর ব্যাপক গবেষণা করে দশভিত্তিক সংখ্যা প্রকাশের কৌশল ও গণনার প্রবর্তন করে। পরবর্তীতে তা আরব থেকে ইউরোপে প্রবেশ করে। খৃষ্টপূর্ব ৪০০ সালে গ্রিসে ২৭টি গ্রিক এ্যালফাবেট নিয়ে ১০ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি চালু হয়।

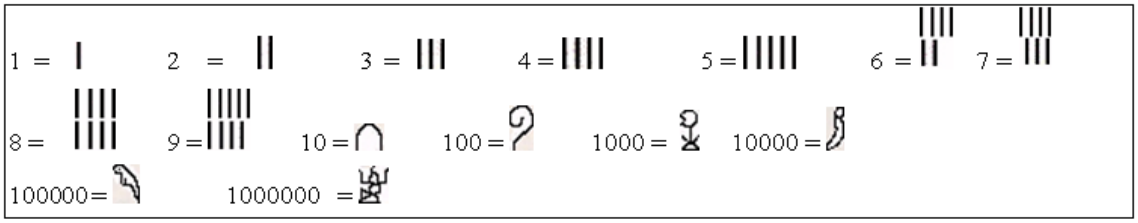

চিত্র : গণনার জন্য মিশরীয়দের দ্বারা ব্যবহৃত হায়ারোগ্লিফিক্স (Hieroglyphics) প্রতীক

মিশরীয়রা হিসাবে ব্যালান্স না থাকলে তাকে 'নফর' বা 'শূন্য' দিয়ে প্রকাশ করে। ভারতীয়রা সংস্কৃত শব্দ 'শূন্য' ব্যবহার করতো কোন কিছু না থাকা বোঝানোর জন্য। ৬০০ সালের দিকে ঋণাত্মক সংখ্যা ব্যবহার করা হয় কারো ঋণ বোঝানোর জন্য। ভগ্নাংশ সংখ্যা প্রথম প্রবর্তন হয় মিশরে। তবে গ্রিক ও ভারতীয় গণিতবিদরা খৃষ্টপূর্ব অর্ধশতাব্দীতে ভগ্নাংশ সংখ্যার তত্ত্ব ও উপপাদ্য আবিষ্কার করেন। দার্শনিক এরিস্টটল সর্বপ্রথম অসীম (∞) এর সংকেত প্রচলন করেন।

চিত্র : হায়ারোগ্লিফিক্স (Hieroglyphics) চিহ্ন

প্রাচীন ভারতীয় গণিতবিদ পিংগালা (Pingala) শূন্য ("০") আবিষ্কারের মাধ্যমে খৃস্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীতে প্রথম বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা দেন। সতের শতাব্দীতে গটফ্রেইড লিবনিজ (Gottfried Leibniz) একটি আর্টিকেলে আধুনিক বাইনারি সংখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেন। তিনি আধুনিক বাইনারি পদ্ধতির 0 এবং 1 এর ব্যবহার করেন। প্রখ্যাত ইংরেজ গণিতবিদ জর্জ বুল (George Boole) ১৮৫৪ সালে সত্য এবং মিথ্যা এ দুই যুক্তি বা লজিকের উপর ভিত্তি করে বুলিয় বীজগণিত রচনা করেন। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর বুলিয় বীজগণিতের সত্য এবং মিথ্যাকে বাইনারি 1 ও 0 দিয়ে পরিবর্তন করার মাধ্যমে কম্পিউটারে অঙ্ক কষার সমস্ত গাণিতিক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়। ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতির লজিক গেটে এ সংখ্যা পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ রয়েছে। তাছাড়া সকল আধুনিক কম্পিউটারে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

২. সংখ্যা পদ্ধতি (Number System)

বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন বা মৌলিক চিহ্ন বা অঙ্ক (ডিজিট) ব্যবহার করে সংখ্যা লেখা ও প্রকাশ করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি (Number System) বলা হয়। সংখ্যা পদ্ধতির সাহায্যে সহজেই সংখ্যা গণনা ও প্রকাশ করা যায়।

প্রকৃতপক্ষে সংখ্যা পদ্ধতি হল সংখ্যা প্রকাশের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম যাতে নিচের বিষয়সমূহ থাকতে হবে–

- সংখ্যাকে নির্দিষ্ট প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশের সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি।
- সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি নির্ণয় করার সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি।
- সংখ্যার বিভিন্ন রূপ যেমন ভগ্নাংশ, ধনাত্মক, ঋণাত্মক ইত্যাদি প্রকাশের সুনির্দিষ্ট/পরিপূর্ণ নিয়ামাবলি।

ডিজিট বা অঙ্ক : কোন সংখ্যা পদ্ধতি লিখে প্রকাশ করার জন্য যে সমস্ত মৌলিক চিহ্ন বা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে ডিজিট বা অঙ্ক বলা হয়। যেমন : বাইনারি সংখ্যা প্রকাশ করার জন্য 0, 1 ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ সংখ্যা তৈরির ক্ষুদ্রতম প্রতীকই হচ্ছে ডিজিট বা অঙ্ক। **উদাহরণ :** ৬২৩৪৫ সংখ্যাটি ৬, ২, ৩, ৪ ও ৫ এই পাঁচটি আলাদা অঙ্কের সমন্বয়ে গঠিত।

সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি (Base) : কোন সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি বলতে ঐ সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মোট অঙ্ক বা প্রতীকসমূহের সংখ্যাকে বুঝায়। যেমন– দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ এই দশটি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। তাহলে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে ১০। অনুরূপভাবে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির বেজ ২, অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির বেজ হলো ৮ এবং হেক্সাডেসিমাল এর বেজ ১৬। কোন সংখ্যা পদ্ধতির যে কোন সংখ্যাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখে ডান পাশে ছোট (সাবস্ক্রিপ্ট) করে সেই সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি লিখতে হয়। নিচে বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতির নাম, প্রতীক, বেজ ও উদাহরণ দেখানো হলো।

সংখ্যা পদ্ধতি	বেজ বা ভিত্তি	প্রতীক বা চিহ্ন	উদাহরণ
দশমিক বা ডেসিমাল	10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	$(397)_{10}$
বাইনারি	2	0, 1	$(110110)_2$
অক্টাল	8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	$(287)_8$
হেক্সাডেসিমাল	16	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F	$(5AD)_{16}$

বিট (Bit) : বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির 0 এবং 1 এই দুটি মৌলিক অঙ্ককে বিট বলে। Binary Digit শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে বিট (Bit)।

বাইট (Byte) : আটটি বিটের গ্রুপ নিয়ে গঠিত শব্দকে বাইট বলে। এক বাইট সমান এক ক্যারেক্টার।

শব্দ : এক বা একাধিক বিট বা বাইট নিয়ে গঠিত শব্দকে কম্পিউটার শব্দ বলে। সুতরাং, 8 Bit = 1 Byte or 1 Character, 16 Bits = 2 Character.

স্থানীয় মান : সংখ্যার গঠনে স্থানীয় মান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংখ্যাটির যে স্থানে অঙ্কটি বা প্রতীকটির অবস্থান তাকে স্থানীয় মান বলা হয়। ভিত্তি যত তার উপরে নির্ভর করে সংখ্যার ডানদিক থেকে বাম দিকে প্রতিটি স্থানীয় মানের যোগফলে একটি পূর্ণ সংখ্যা গঠিত হয়। নিচে ৫৫৫ দশ ভিত্তির একটি সংখ্যার স্থানীয় মান বিশ্লেষণ করে গঠন দেখানো হলো। এখানে ভিত্তি হলো ১০। কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে পরপর ছোট থেকে বড় স্থানীয় মানের মানকে ঐ সংখ্যা পদ্ধতির বেজের ০, ১, ৩, ৪ ..... ইত্যাদি পাওয়ার সংবলিত মান দিয়ে প্রকাশ করা যায়।

$৫\times১০^২ + ৫\times ১০^১ + ৫ \times১০^০ = ৫\times ১০০ + ৫\times১০ + ৫\times ১ = ৫০০ + ৫০ + ৫ = ৫৫৫$

যেকোনো সংখ্যার গঠন এভাবে তার ভিত্তির উপর নির্ভর করে।

২.১. সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ (Classification of Number System)

উপস্থাপন বা প্রকাশের পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে সংখ্যা পদ্ধতি দু'প্রকার। যথা–

১. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি (Positional Numbering System)

২. নন–পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি (Non–Positional Numbering System)

১. পজিশনাল বা অবস্থানগত সংখ্যা পদ্ধতি (Positional Numbering System) : এই পদ্ধতিতে একটি সংখ্যা যে প্রতীকগুলো দিয়ে প্রকাশ করা হয় সেই প্রতীকগুলোর সংখ্যার অবস্থানের উপর ভিত্তি করে সংখ্যার মান কম–বেশি হতে পারে। এখানে কোন একটি সংখ্যার মান বের করার জন্য দরকার–

ক. সংখ্যাটিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর নিজস্ব মান।
খ. সংখ্যা পদ্ধতির Base বা ভিত্তি।
গ. সংখ্যাটিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর অবস্থান বা স্থানীয় মান।

পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রতিটি সংখ্যাকে ডট বা Radix পয়েন্ট (.) দিয়ে পূর্ণাংশ (Integer) ও ভগ্নাংশ (Fraction) এ দুই অংশে ভাগ করা হয়। যেমন– ৫৭৬.১২ একটি সংখ্যা, এর ৫৭৬ হলো পূর্ণাংশ, এবং .১২ হলো ভগ্নাংশ।

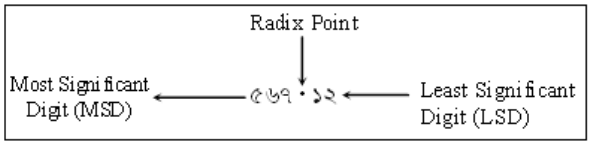

২. নন–পজিশনাল বা সমষ্টিগত সংখ্যা পদ্ধতি (Non Positional Numbering System) : এই পদ্ধতিতে সংখ্যায় উপস্থাপিত প্রতীকসমূহের অবস্থান সংখ্যার মানে কোন পরিবর্তন আনে না বা কোন রকম প্রভাব বিস্তার করে না। সংখ্যার মান উপস্থাপিত প্রতীকগুলো নির্দেশিত মানের যোগফলের সমান এবং ব্যবহৃত অংকগুলোর কোন স্থানীয় মান থাকে না। যেমন– হায়ারোগ্লিফিক্স সংখ্যা পদ্ধতি।

পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি চার প্রকার। যথা–

১. **বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি :** বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির বেজ হচ্ছে 2। কারণ এ পদ্ধতিতে 0 ও 1 মোট ২টি মৌলিক অঙ্ক আছে।
২. **দশমিক বা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি :** দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির বেজ হচ্ছে 10। কারণ এ পদ্ধতিতে 0 থেকে 9 পর্যন্ত মোট 10টি মৌলিক অঙ্ক আছে। যথা– 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ও 9।
৩. **অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি :** অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির বেজ হচ্ছে 8। কারণ এ পদ্ধতিতে 0 থেকে 7 পর্যন্ত মোট 8(আট)টি মৌলিক অঙ্ক আছে।
৪. **হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি :** হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির বেজ হচ্ছে 16। কারণ এ পদ্ধতিতে মোট 16টি মৌলিক চিহ্ন বা অঙ্ক আছে। যথা– 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B,C, D, E এবং F ।
(10 = A, 11 = B, 12 = C, 13 = D, 14 = E, 15 = F.)

২.২. বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতির পরিচিতি

১. দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি (Decimal Numbering System) : যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ১০টি অঙ্ক (Digit) ব্যবহার করা হয় তাকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়। প্রাচীন ভারতে এই পদ্ধতির প্রচলন প্রথম শুরু হয় বলে একে হিন্দু সংখ্যা পদ্ধতিও বলা হয়। দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ডিজিটগুলো হলো 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 এবং 9। সাধারণ হিসাব-নিকাশের জন্য দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি 10 বিধায় এই পদ্ধতিতে অঙ্কগুলোর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে দশ গুণ করে।

উদাহরণ : $(420)^{10}$।

দশভিত্তিক একটি সংখ্যা পদ্ধতির গঠন বিশ্লেষণ

786 একটি দশভিত্তিক সংখ্যা। এ সংখ্যাটিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। দশভিত্তিক একটি সংখ্যার অঙ্কগুলি অর্থাৎ প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান দশ বা তার গুণিতক। পূর্ণাংশে ডান দিক থেকে প্রথম অঙ্কের মান 10^0, দ্বিতীয় অঙ্কের স্থানীয় মান 10^1, তৃতীয় অঙ্কের মান 10^2 এবং ভগ্নাংশে বাম দিক থেকে প্রথম অঙ্কের স্থানীয় মান 10^{-1}, দ্বিতীয় অঙ্কের স্থানীয় মান 10^{-2}, তৃতীয় অঙ্কের মান 10^{-3}। প্রতি ক্ষেত্রে সূচক বা ঘাত গুণিতক প্রকাশ করে। যেমন– 786 সংখ্যাটি–

শতক	দশক	একক
7×10^2	8×10^1	6×10^0
7×100	8×10	6×1
700	80	6

একক + দশক + শতক = 6 + 80 + 700 = 786

দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিকে হিন্দু–আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতিও বলা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে ও আরবীয়দের মধ্যে এ সংখ্যা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। বিখ্যাত আরবীয় গণিতবিদ আল খোয়ারিযমী আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতির উপর ৮ম শতকে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১১ শতকের দিকে তাঁর রচিত গ্রন্থ স্পেনে অনূদিত হলে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির প্রচলন পরিপূর্ণভাবে ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রচলিত হয়। বর্তমান পৃথিবীতে দশভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি সর্বজন গৃহীত ও স্বীকৃত।

২. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি (Binary Numbering System) : যে সংখ্যা পদ্ধতিতে দুটি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলে। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি হলো সরলতম গণনা পদ্ধতি। এই পদ্ধতির ডিজিট দুটিকে সহজে ইলেকট্রনিক উপায়ে নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়েছে বলে কম্পিউটারসহ অনেক ইলেকট্রনিক যন্ত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ডিজিটগুলো হলো 0 এবং 1। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে 2।

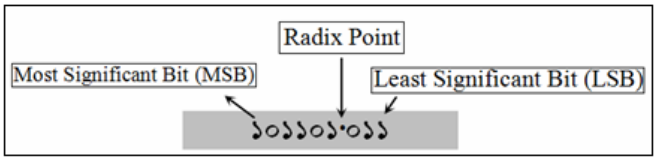

দুই ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির গঠন বিশ্লেষণ

১০১১১০ বাইনারি সংখ্যার প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান দুই বা তার গুণিতক। ডান দিক থেকে প্রথম অঙ্কের স্থানীয় মান $২^০$। দ্বিতীয় অঙ্কের মান $২^১$ এবং তৃতীয় অঙ্কের মান $২^২$। প্রতি ক্ষেত্রে সূচক বা ঘাত গুণিতক প্রকাশ করে।

$১০১১১০ = ১\times২^৫ + ০\times২^৪ + ১\times২^৩ + ১\times২^২ + ১\times২^১ + ০\times২^০$

সপ্তদশ শতকে বাইনারি সম্পর্কে প্রথম ধারণা দেন গটফ্রিড লিবনিজ। এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ০ অথবা ১ অঙ্ককে সংক্ষেপে বিট (Bit বা Binary digit) বলে। বিট হল ডেটা ও তথ্য সংরক্ষণ, ডেটা কমিউনিকেশন ও ডিজিটাল কম্পিউটারের মৌলিক একক। বাইনারি পদ্ধতি হলো সরলতম গণনা পদ্ধতি। ডিজিটাল সার্কিট ডিজাইন করতে মূলত বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কাজ সম্পন্ন হয় বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে।

৩. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি (Octal Numbering System) : যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ৮টি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে। কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কাজের ব্যাখ্যার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ডিজিটগুলো হলো ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ এবং ৭। অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে ৮।

আটভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির গঠন বিশ্লেষণ

৪৫৭ অক্টাল সংখ্যা। এ সংখ্যাটিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। আটভিত্তিক একটি সংখ্যার অন্তর্গত প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান আট বা তার গুণিতক। যেমন– ডান দিক থেকে প্রথম অঙ্কের মান $৮^০$। দ্বিতীয় অঙ্কের মান $৮^১$ বা তৃতীয় অঙ্কের মান $৮^২$। প্রতি ক্ষেত্রে সূচক বা ঘাত গুণিতক প্রকাশ করে। যেমন–

$৪৫৭ = ৪\times৮^২ + ৫\times৮^১ + ৭\times৮^০$

স্থানীয় মান : অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রতিটি ডিজিটের স্থানীয় মান (Value) হচ্ছে নিম্নরূপ :

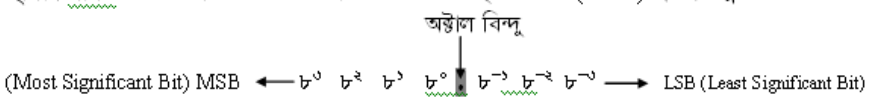

নিম্নে একটি অক্টাল সংখ্যার সমতুল্য দশমিক মান নির্ণয় করে দেখানো হলো।

$(৫৬০)_৮ = ৫\times৮^২ + ৬\times৮^১ + ০\times৮^০$

$= ৫\times৬৪ + ৬\times৮ + ০\times১$

$= ৩২০ + ৪৮ + ০ = (৩৬৮)_{১০}$

৪. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি (Hexadecimal Numbering System) : যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ১৬টি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়। হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 এই 10 টি অঙ্ক এবং A থেকে F এই 6 টি অঙ্ক ব্যবহৃত হয়। হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি 16। কম্পিউটারে হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতি ব্যবহার করে ভুলের সম্ভাবনা কমানো যায়, মেমরি এড্রেস ব্যবহার করা যায় এবং কালার কোড নির্ধারণ করা যায়। **উদাহরণ :** $(1A3)_{16}$ একটি হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা।

ষোলভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির গঠন বিশ্লেষণ

AF৯ একটি হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা। এ সংখ্যাটিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। ষোলভিত্তিক একটি সংখ্যার অন্তর্গত প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান ১৬ বা তার গুণিতক। যেমন– ডান দিক থেকে প্রথম অঙ্কের মান ১৬^{০}। দ্বিতীয় অঙ্কের মান ১৬^{১} এবং তৃতীয় অঙ্কের মান ১৬^{২}। প্রতি ক্ষেত্রে সূচক বা ঘাত গুণিতক প্রকাশ করে।

A × ১৬^{২} + F × ১৬^{১} + ৯ × ১৬^{০}

স্থানীয় মান : এ সংখ্যা পদ্ধতির প্রতিটি ডিজিটের স্থানীয় মান হচ্ছে নিম্নরূপ–

হেক্সাডেসিমাল বিন্দু

(Most Significant Bit) MSB ১৬^{২} ১৬^{১} ১৬^{০} ▮ ১৬$^{-১}$ ১৬$^{-২}$ ১৬$^{-৩}$ LSB (Least Significant Bit)

নিম্নে একটি হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার সমতুল্য দশমিক মান নির্ণয় করে দেখানো হলো।

$(২C১)_{১৬}$ = ২×১৬^{২} + C×১৬^{১} + ১×১৬^{০} = ২×২৫৬ + ১২×১৬ + ১×১ = ৫১২ + ১৯২ + ১ = $(৭০৫)_{১০}$

একটি ছকের মাধ্যমে বাইনারি, অক্টাল, ডেসিমাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি/বেজ, ব্যবহৃত ডিজিট এবং উদাহরণ দেয়া হলো–

সংখ্যা পদ্ধতি	ভিত্তি	ব্যবহৃত ডিজিটসমূহ	উদাহরণ
বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি	2	0 এবং 1	$(1011)_2$
অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি	8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 এবং 7	$(23)_8$
দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি	10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 এবং 9	$(720)_{10}$
হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি	16	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E এবং F	$(25D)_{16}$

বাইনারি, অক্টাল, দশমিক, হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির সমতুল্য ছক

বাইনারি পদ্ধতিতে মাত্র দুটি সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। তাই এর ভিত্তি (Base) ২। দশমিক পদ্ধতিতে ৯-এর পরে দশ লেখতে যেমন ১ এর পিঠে ০ দিয়ে লেখা হয় তেমনি বাইনারি পদ্ধতিতে ১ এর পরে দুই লেখতে ১-এর পিঠে ০ (১০) দিয়ে লেখতে হয়। তিন লেখতে ১-এর পিঠে (১১-তিন) দিয়ে লেখতে হয়। এখন চার লেখতে কীভাবে লেখব? আমরা দশমিক সংখ্যায় যেমন ৯৯ এর পর ১০০ লিখি অর্থাৎ সর্বোচ্চ সংখ্যার সমষ্টির পরে বামে একটি সংখ্যা বাড়িয়ে ডানদিকে শূন্যতে ফিরে যাই তেমনি বাইনারিতে ১১ (তিন) এর পরে চার লিখতে সর্ববামে একটি ১ বসিয়ে অন্য দু'টিকে শূন্য দিয়ে প্রকাশ করতে হয়। একইভাবে অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাও তৈরি করা হয়।

দশমিক সংখ্যা	বাইনারি সংখ্যা	অক্টাল সংখ্যা	হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9

দশমিক সংখ্যা	বাইনারি সংখ্যা	অক্টাল সংখ্যা	হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10

২.৩. সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর (Conversion of Number System)

এক সংখ্যা পদ্ধতি থেকে অন্য সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করাকে বলা হয় সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর। সাধারণভাবে আমরা দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশে ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু কম্পিউটার এবং অন্যান্য ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীতে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। সেজন্য কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ হিসাবাদি করার সময় ডেসিমাল সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করে নিতে হয়। কম্পিউটারের জন্য বাইনারিতে লেখা প্রোগ্রাম অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। কারণ বাইনারি সংখ্যায় লিখলে যে বিশাল আকার ধারণ করত তাকেই সংক্ষিপ্তাকারে প্রকার জন্য অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা ব্যবহার করা হয়।

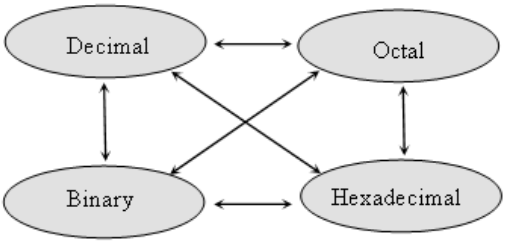

দশমিক সংখ্যা থেকে যে কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর

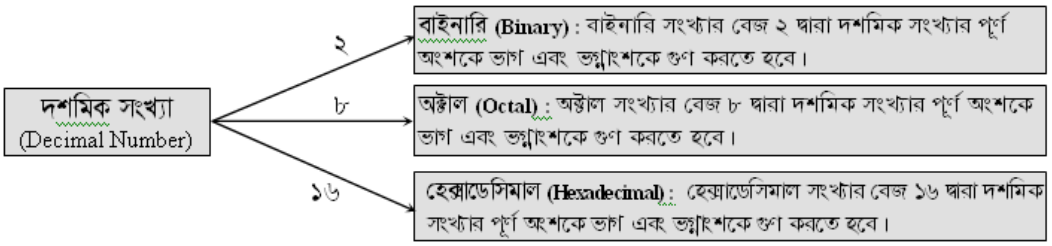

১. দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর (Convert decimal number into binary number)

পূর্ণ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

১. দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত করার জন্য দশমিক সংখ্যাকে ২ দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষকে সংরক্ষণ করতে হবে।

২. ভাগফলকে পুনরায় ২ দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষকে সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. এ পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করতে হবে যতক্ষণ না ভাজ্য ০ হয়।

৪. সংরক্ষিত ভাগশেষগুলোকে শেষ থেকে প্রথম দিকে ধারাবাহিকভাবে অর্থাৎ উল্টো করে সাজিয়ে লিখলে ১ ও ০ এর সমন্বয়ে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তাই দশমিক সংখ্যার সমকক্ষ বাইনারি সংখ্যা।

> বিঃ দ্রঃ ভিন্নভাবে বলা হলে ভাগশেষগুলোকে পেছন দিক থেকে পড়তে হবে। কারণ, সর্বশেষে প্রাপ্ত ভাগশেষ সংখ্যা সর্বোচ্চ গুরুত্বসম্পন্ন অঙ্ক। এ অংশটি কেবলমাত্র পূর্ণ সংখ্যার জন্য প্রযোজ্য।

ভগ্নাংশ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

১. ভগ্নাংশ অংশকে ২ দিয়ে গুণ করতে হবে। গুণ করার পর যে পূর্ণ অংশটি থাকবে (অর্থাৎ ১) তাকে সংরক্ষণ করতে হবে। যদি না থাকে তবে ০ সংরক্ষণ করতে হবে।

২. অবশিষ্ট ভগ্নাংশটিকে পুনরায় ২ দিয়ে গুণ করতে হবে। গুণ করার পর যে পূর্ণ অংশটি থাকবে (অর্থাৎ ১) তাকে সংরক্ষণ করতে হবে। যদি পূর্ণ অংশ না থাকে তবে ০ সংরক্ষণ করতে হবে।
৩. এভাবে পুনঃপুনঃ চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সম্পূর্ণ ভগ্নাংশ পূর্ণ অংশে পরিণত হয়।
৪. সংরক্ষিত পূর্ণ অংশগুলোকে প্রথম থেকে শেষ দিকে অর্থাৎ উল্টো করে পড়তে হবে।

উদাহরণ—১ : $(২৫)_{১০}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর কর।

দশমিক (বেজ ১০) → বাইনারি (বেজ ২)

ভাজক	ভাজ্য/ভাগফল	ভাগশেষ
২	২৫	
২	১২	১ সর্বনিম্ন গুরুত্বের অঙ্ক
২	৬	০
২	৩	০
২	১	১
২	০	১ সর্বোচ্চ গুরুত্বের অঙ্ক

$\therefore (২৫)_{১০} = (১১০০১)_{২}$

একক কাজ : কি কি ডিভাইসে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়? তালিকা তৈরি করে দেখাও।

সহজে দশমিক সংখ্যার সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা লেখার বিকল্প পদ্ধতি

নিচে সহজে দশমিক সংখ্যার সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা লেখার পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

১. প্রথমে কাগজে নিচের মতো করে লিখতে হবে।

.....	৬৪	৩২	১৬	৮	৪	২	১

২. যে ডেসিমাল সংখ্যাটিকে বাইনারি সংখ্যায় লেখা দরকার তাকে ডান দিক থেকে উপরের যেসকল সংখ্যার যোগফল দ্বারা প্রকাশ করা যায় তার নিচে নিচে ১ লিখে লিখে বাকি ঘরগুলোতে ০ লিখে পূরণ করতে হবে।

যেমন ৩৭ সংখ্যাটিকে বাইনারি সংখ্যায় প্রকাশ করার জন্য নিচের মতো করে ঘরগুলো পূরণ করলে পাওয়া যায়,

.....	৬৪	৩২	১৬	৮	৪	২	১
		১	০	০	১	০	১

৩২ এর ঘরে ১ অর্থাৎ [৩২+], এরপর ১৬ এর ঘরে ০, ৮ এর ঘরে ০, ও ৪ এর ঘরে ১ অর্থাৎ [৩২+০+০+৪+] এরপর ২ এর ঘরে ০ ও ১ এর ঘরে ১ অর্থাৎ [৩২+০+০+৪+০+১ = ৩৭]। তাই ৩৭ এর সমতুল্য বাইনারি সংখ্যাটি হচ্ছে $(১০০১০১)_{২}$। এভাবে যেকোন দশমিক সংখ্যার সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা বের করা যায়।

উদাহরণ—২ : $(৩৮.০৫)_{১০}$ সংখ্যাটিকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর কর।

পূর্ণ অংশ ৩৮ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর :

		অবশিষ্ট
২	৩৮	
২	১৯	০
২	৯	১
২	৪	১
২	২	০
২	১	০
২	০	১

শেষ থেকে শুরুর দিকে সাজিয়ে লিখে প্রাপ্ত বাইনারি সংখ্যা = ১০০১১০

ভগ্নাংশ $(.০৫)_{১০}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর :

পূর্ণসংখ্যা	ভগ্নাংশ
	.০৫
	×২
০	.১০
	×২
০	.২০
	×২
০	.৪০
	×২
০	.৮০
	×২
১	.৬০

শুরু থেকে শেষের দিকে সাজিয়ে লিখে প্রাপ্ত বাইনারি সংখ্যা = .০০০০১১... অর্থাৎ $(.০৫)_{১০} = (.০০০০১১. . .)_{২}$

অতএব $(৩৮.০৫)_{১০} = (১০০১১০.০০০০১১০০....)_{২}$

বিঃ দ্রঃ কোন সংখ্যা যদি পূর্ণ ও ভগ্নাংশ অংশ যুক্ত হয় সে ক্ষেত্রে পূর্ণ অংশকে আলাদা করে পূর্ণ সংখ্যার নিয়মে ও ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ সংখ্যার নিয়মে বাইনারিতে পরিণত করে পরে একত্রিত করে উপস্থাপন করতে হবে। তবে ভগ্নাংশের জন্য চার-পাঁচ বার গুণ করার পরও ১ না হলে তা আসন্ন মান হিসেবে রাখা যেতে পারে।

উদাহরণ–৩ : $(.৮১২৫)_{১০}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর কর।

গুণ	গুণফল	ভগ্নাংশ	পূর্ণসংখ্যা	
.৮১২৫×২ =	১.৬২৫	.৬২৫	১	⟵ সর্বোচ্চ গুরুত্বের অঙ্ক
.৬২৫ × ২ =	১.২৫	.২৫	১	
.২৫ × ২ =	.৫০	.৫০	০	
.৫০ × ২ =	১	০	১	⟵ সর্বনিম্ন গুরুত্বের অঙ্ক

∴ ফলাফল : $(.৮১২৫)_{১০} = (.১১০১)_{২}$

উদাহরণ–৪ : $(০.৭৭)_{১০}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর কর।

গুণ	গুণফল	ভগ্নাংশ	পূর্ণসংখ্যা	
০.৭৭×২ =	১.৫৪	.৫৪	১	⟵ সর্বোচ্চ গুরুত্বের অঙ্ক
.৫৪×২ =	১.০৮	.০৮	১	
.০৮ ×২ =	০.১৬	.১৬	০	
.১৬ ×২ =	০.৩২	.৩২	০	
০.৩২ ×২ =	০.৬৪	০.৬৪	০	
০.৬৪ ×২ =	১.২৮	০.২৮	১	⟵ সর্বনিম্ন গুরুত্বের অঙ্ক

∴ ফলাফল : $(০.৭৭)_{১০} = (.১১০০০১)_{২}$ আসন্ন মান।

উদাহরণ–৫ : $(৩০.১২৫)_{১০}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর কর।

পূর্ণ সংখ্যা অংশ :

ভাজক	ভাজ্য/ভাগফল		ভাগশেষ
২	৩০	–	
২	১৫	–	০
২	৭	–	১
২	৩	–	১
২	১	–	১
২	০	–	১

ভগ্নাংশ :

গুণ	গুণফল	ভগ্নাংশ	পূর্ণসংখ্যা
.১২৫×২ =	০.২৫	০.২৫	০
.২৫×২ =	০.৫০	০.৫০	০
.৫০×২ =	১.০০	০.০০	১
প্রাপ্ত সংখ্যা : $(.০০১)_{২}$			

প্রাপ্ত সংখ্যা = $(১১১১০)_{২}$ ∴ ফলাফল $(৩০.১২৫)_{১০} = (১১১১০.০০১)_{২}$

উদাহরণ–৬ : $(৭৫.১০৫)_{১০}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর কর।

পূর্ণ সংখ্যা অংশ :

ভাজক	ভাজ্য/ভাগফল		ভাগশেষ
২	৭৫	–	
২	৩৭	–	১
২	১৮	–	১
২	৯	–	০
২	৪	–	১
২	২	–	০
২	১	–	০
	০	–	১

ভগ্নাংশ :

গুণ	গুণফল	ভগ্নাংশ	পূর্ণসংখ্যা
.১০৫×২ =	০.২১	.২১	০
.২১×২ =	০.৪২	০.৪২	০
.৪২×২ =	০.৮৪	০.৮৪	০
.৮৪×২ =	১.৬৮	০.৬৮	১
.৬৮×২ =	১.৩৬	০.৩৬	১
.৩৬×২ =	০.৭২	০.৭২	০
.৭২×২ =	১.৪৪	০.৪৪	১

শেষ থেকে শুরুর দিকে সাজিয়ে লিখে প্রাপ্ত বাইনারি সংখ্যা = ১০০১০১১	শুরু থেকে শেষের দিকে সাজিয়ে লিখে প্রাপ্ত বাইনারি সংখ্যা .০০০১১০১

∴ $(৭৫.১০৫)_{১০}$ এর বাইনারি সংখ্যা = $(১০০১০১১.০০০১১০১)_{২}$

উদাহরণ–৭ : $(২৩.১২৫)_{১০}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর কর।

দশমিক বেজ ১০ → বাইনারি বেজ ২

পূর্ণ সংখ্যা অংশ :

ভাজক	ভাজ্য/ভাগফল		ভাগশেষ
২	২৩	–	
২	১১	–	১
২	৫	–	১
২	২	–	১
২	১	–	০
২	০	–	১

ভগ্নাংশ :

গুণ	গুণফল	ভগ্নাংশ	পূর্ণসংখ্যা
.১২৫×২ =	০.২৫	০.২৫	০
.২৫×২ =	০.৫০	০.৫০	০
.৫০×২ =	১.০০	০.০০	১

শেষ থেকে শুরুর দিকে সাজিয়ে লিখে প্রাপ্ত বাইনারি সংখ্যা = ১০১১১	শুরু থেকে শেষের দিকে সাজিয়ে লিখে প্রাপ্ত বাইনারি সংখ্যা= .০০১

∴ $(২৩.১২৫)_{১০}$ এর বাইনারি সংখ্যা $(১০১১১.০০১)_{২}$

২. দশমিক সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর
(Conversion of Decimal Number into Octal Number)

দশমিক পূর্ণ সংখ্যাকে ৮ দিয়ে ভাগ করে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করা যায়। ভাগফল শূন্য না হওয়া পর্যন্ত পুনঃপুনঃ ভাগ করতে হয়। পরিশেষে ভাগশেষসমূহ শেষ থেকে শুরু পর্যন্ত সাজালে অক্টাল সংখ্যা পাওয়া যাবে। দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যাকে অক্টালসংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য উক্ত সংখ্যাকে ৮ দিয়ে গুণ করে পূর্ণ সংখ্যাকে আলাদা করতে হবে। গুণফলে যদি ভগ্নাংশ থাকে, তবে তাকে পুনরায় ৮ দিয়ে গুণ করতে হবে। নিম্নের উদাহরণ দেয়া গেল।

উদাহরণ : $(১৭৫.১৫)_{১০}$ সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর কর।

দশমিক বেজ ১০ → অক্টাল বেজ ৮

পূর্ণসংখ্যার ক্ষেত্রে :

৮ | ১৭৫
৮ | ২১ – ৭
৮ | ২ – ৫
০ – ২

শেষ থেকে শুরুর দিকে সাজিয়ে সংখ্যা হয় ২৫৭

∴ $(১৭৫.১৫)_{১০} = (২৫৭.১১৪৬৩...)_{৮}$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

পূর্ণ সংখ্যা	ভগ্নাংশ
	.১৫ ×৮
১	.২০ ×৮
১	.৬০ ×৮
৪	.৮০ ×৮
৬	.৪০ ×৮
৩	.২০

শুরু শেষ থেকে শেষের দিকে সাজিয়ে সংখ্যা = $(.১১৪৬৩...)_{৮}$

৩. দশমিক সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর
(Conversion of Decimal Number into Hexadecimal Number)

দশমিক পূর্ণ সংখ্যাকে ১৬ দিয়ে ভাগ করে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করা যায়। ভাগফল শূন্য না হওয়া পর্যন্ত পুনঃপুনঃ ভাগ করতে হয়। পরিশেষে ভাগশেষসমূহ শেষ থেকে শুরু পর্যন্ত সাজালে সমমানের হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পাওয়া যাবে। দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য উক্ত সংখ্যাকে ১৬ দিয়ে গুণ করে গুণফল থেকে পূর্ণসংখ্যা আলাদা করতে হবে। পূর্ণ সংখ্যা না হওয়া পর্যন্ত ১৬ দিয়ে পুনঃপুনঃ গুণ করতে হয়।

নিম্নে উদাহরণ দেয়া গেল :

উদাহরণ : $(২৪৭৯.৫০)_{১০}$ সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর কর।

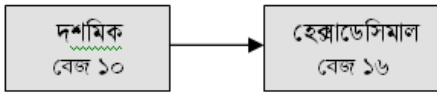

$(২৪৭৯.৫০)_{১০} = (?)_{১৬}$

পূর্ণসংখ্যার ক্ষেত্রে :

১৬ | ২৪৭৯
১৬ | ১৫৪ – ১৫ (F)
১৬ | ৯ – ১০ (A)
০ – ৯

$\therefore (২৪৭৯)_{১০} = (৯AF)_{১৬}$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

পূর্ণ সংখ্যা	ভগ্নাংশ
	.৫০
	× ১৬
↓ ৮	.০০

$\therefore (.৫০)_{১০} = (.৮)_{১৬}$

দশমিক সংখ্যা	হেক্সাডেসিমাল
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

$\therefore (২৪৭৯.৫০)_{১০} = (৯AF.৮)_{১৬}$

৪. বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর (Conversion of Binary Number into Decimal Number)

পূর্ণ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা

আমরা জানি যে, দশমিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে একক, দশক, শতক এভাবে কোন সংখ্যার স্থানীয় মান নির্ণয় করতে হয়। পূর্ণ বাইনারি সংখ্যার স্থানীয় মান নির্ণয় করতে সংখ্যার ডান দিক থেকে বাম দিকে প্রথম ঘরের মান $১০^{০}$ (১), দ্বিতীয় ঘরের মান $১০^{১}$ (১০), তৃতীয় ঘরের মান $১০^{২}$ (১০০), চতুর্থ ঘরের মান $১০^{৩}$ (১০০০) এভাবে নির্ণয় করা যায়। বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি দুই, তাই স্থানীয় মান দুই এর ঘাত বা শক্তি দিয়ে হিসাব করতে হবে। যেমন– প্রথম ঘর $২^{০}$ (১), দ্বিতীয় ঘর $২^{১}$($২ \times ১ = ২$), তৃতীয় ঘর $২^{২}$ ($২ \times ২ = ৪$), চতুর্থ ঘর $২^{৩}$ ($২ \times ২ \times ২ = ৮$) ইত্যাদি দিয়ে।

$২^{৪}, ২^{৩}, ২^{২}, ২^{১}, ২^{০}$ অর্থাৎ ১৬, ৮, ৪, ২, ১

বাইনারি অঙ্কগুলোকে নিজস্ব স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করে প্রাপ্ত গুণফলকে যোগ করলেও বাইনারি সংখ্যাটির সমান দশমিক সংখ্যা পাওয়া যাবে।

যেমন, $(১০০১)_{২} = (?)_{১০}$

$(১০০১)_{২} = ১ \times ২^{৩} + ০ \times ২^{২} + ০ \times ২^{১} + ১ \times ২^{০}$

$= ৮+০ + ০ +১\times১ = ৮+১ = ৯ \quad \therefore (১০০১)_{২} = (৯)_{১০}$

উদাহরণ–১ : $(১১০১)_{২}$ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর কর।

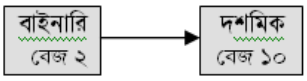

$(১১০১)_{২} = (১\times২^{৩}) + (১\times২^{২}) + (০\times২^{১}) + (১\times২^{০})$

$= ১ \times ৮ + ১ \times ৪ + ০\times২ + ১ \times ১ = ৮ + ০ + ০ +১ = ১৩$

$\therefore$ ফলাফল : $(১১০১)_{২} = (১৩)_{১০}$

ভগ্নাংশ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা

ভগ্নাংশ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য দশমিকের পর বামদিক থেকে ডানদিকে প্রথম ঘরের মান $২^{-১}$, দ্বিতীয় ঘরের মান $২^{-২}$, তৃতীয় ঘরের মান $২^{-৩}$, চতুর্থ ঘরের মান $২^{-৪}$ এভাবে নির্ণয় করা যায়। বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি ২। তাই ২ এর ঋণাত্মক মানের ঘাত দিয়ে হিসাব করতে হয়। যেমন $২^{-১} = ১/২$, $২^{-২} = ১/৪$ ইত্যাদি।

উদাহরণ–২ : $(০.১১০১)_{২}$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর কর।

$(০.১১০১)_{২} = ১\times২^{-১} + ১\times২^{-২} + ০\times২^{-৩} + ১\times২^{-৪}$

$= ১/২ + ১/৪ + ০ + ১/১৬$

$= .৫০ + .২৫+ .০৬২৫ = (০.৮১২৫)_{১০}$

$\therefore (.১১০১)_{২} = (.৮১২৫)_{১০}$

উদাহরণ–৩ : $(১১১১০.০০১)_২$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর কর।

$(১১১১০.০০১)_২ = ১\times২^৪ + ১\times২^৩ + ১\times২^২ + ১\times২^১ + ০\times২^০ + ০\times২^{-১} + ০\times২^{-২} + ১\times২^{-৩}$

$= ১৬ + ৮ + ৪ + ২ + ০ + ০ + ০ + ১/৮$

$= ৩০.১২৫$

সুতরাং, $(১১১১০.০০১)_২ = (৩০.১২৫)_{১০}$

৫. অক্টাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

(Conversion of Octal Number into Decimal Number)

অক্টাল সংখ্যার স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করে গুণফলসমূহ যোগ করে অক্টাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা যাবে। নিম্নে উদাহরণ দেয়া হলো।

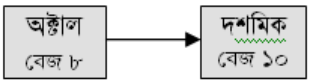

উদাহরণ : $(২০৬.৬৪)_৮$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর।

$(২০৬.৬৪)_৮ = ২\times৮^২ + ০\times৮^১ + ৬\times৮^০ + ৬\times৮^{-১} + ৪\times৮^{-২}$

$= ২\times৬৪ + ০\times৮ + ৬\times১ + ৬\times১/৮ + ৪\times১/৬৪$

$= ১২৮ + ০ + ৬ + ০.৭৫ + ০.০৬২৫ = (১৩৪.৮১২৫)_{১০}$

সুতরাং, $(২০৬.৬৪)_৮ = (১৩৪.৮১২৫)_{১০}$

৬. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

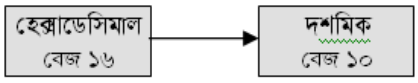

(Conversion of Hexadecimal Number into Decimal Number)

বাইনারি থেকে দশমিক কিংবা অক্টাল থেকে দশমিকে রূপান্তরের মতো একই নিয়মে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা হয়।

উদাহরণ–১ : $(৯AF.৮)_{১৬}$ সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর কর।

$(৯AF.৮)_{১৬} = ৯\times১৬^২ + A\times১৬^১ + F\times১৬^০ + ৮\times১৬^{-১}$

$= ৯\times২৫৬ + ১০\times১৬ + ১৫\times১ + ৮\times১/১৬$

$= ২৩০৪ + ১৬০ + ১৫ + ০.৫০ = (২৪৭৯.৫০)_{১০}$

$\therefore (৯AF.৮)_{১৬} = (২৪৭৯.৫০)_{১০}$

দশমিক সংখ্যা	হেক্সাডেসিমাল
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

৭. বাইনারি সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর

(Conversion of Binary Number into Octal Number)

বাইনারি থেকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করতে হলে ০ থেকে ৭ পর্যন্ত অক্টাল সংখ্যাগুলোর বাইনারি মান মনে রাখলে সুবিধা হবে। পাশের টেবিলে অক্টাল অঙ্কগুলোর বাইনারি মান দেয়া হলো। বাইনারি সংখ্যাকে অক্টালে রূপান্তর করতে হলে পূর্ণ সংখ্যার জন্য ডান দিক থেকে বাম দিকে এবং ভগ্নাংশ সংখ্যার জন্য বাম দিক থেকে ডান দিকে প্রতি তিন বিট একত্রে নিয়ে ছোট ছোট ভাগ করতে হয়। প্রতিটি ভাগের বাইনারি মান লিখতে হয়। এ মান অবশ্যই ০ থেকে ৭ এর মধ্যে হবে। প্রতিটি ভাগের বাইনারি মানসমূহ সাজালে অক্টাল সংখ্যা পাওয়া যাবে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো।

বাইনারি	অক্টাল
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

টেবিল : বাইনারি ও সমমানের অক্টাল সংখ্যা

উদাহরণ : $(১১০১০১)_২$ এর অক্টাল মান নির্ণয়

$(১১০১০১)_২ = ১১০\ ১০১ = (৬৫)_৮$

$(১০০১০১০০)_২ = ০১০\ ০১০\ ১০০ = (২২৪)_৮$

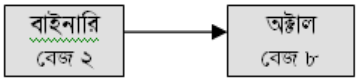

বাইনারি	তিন সংখ্যা করে বিভাজন	অক্টাল সংখ্যা
১১০১০১	১১০ ১০১	$(৬৫)_৮$
১০০১০১০০	০১০ ০১০ ১০০	$(২২৪)_৮$
.০১০১১০	.০১০ ১১০	$(.২৬)_৮$
১০০১১.১০	০১০ ০১১ .১০০	$(২৩.৪)_৮$

৮. বাইনারি সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর

(Conversion of Binary Number into Hexadecimal Number)

বাইনারি পূর্ণ সংখ্যাকে ডান থেকে বামে এবং বাইনারি ভগ্নাংশ সংখ্যাকে বাম দিক থেকে ডান দিকে চারটি ডিজিট নিয়ে আলাদা আলাদা গ্রুপে ভাগ করতে হয়। এরপর প্রতিটি ভাগের হেক্সাডেসিমাল মান বসিয়ে মানগুলোকে একত্রিত করলে বাইনারি সংখ্যাটির সমমানের হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পাওয়া যাবে।

বাইনারি (বেজ ২) → হেক্সাডেসিমাল (বেজ ১৬)

বাইনারি	হেক্সাডেসিমাল
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A(10)
1011	B(11)
1100	C(12)
1101	D(13)
1110	E(14)
1111	F(15)

উদাহরণ–১ : $(১০১১০১১০)_২ = (?)_{১৬}$

১০১১ ০১১০
↓ ↓
১১/B ৬

$\therefore (১০১১০১১০)_২ = (B৬)_{১৬}$

উদাহরণ–২ : $(১০১০১১০.০১০১১১)_২ = (?)_{১৬}$

০১০১ ০১১০ . ০১০১ ১১০০
↓ ↓ ↓ ↓
৫ ৬ . ৫ C/১২

$\therefore (১০১০১১০.০১০১১১)_২ = (৫৬.৫C)_{১৬}$

বাইনারি সংখ্যা	চার সংখ্যা অনুযায়ী বিভাজন	হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা
10110110	1011 0110	$(B6)_{16}$
1100111100	0011 0011 1100	$(33C)_{16}$
.1010011	.1010 0110	$(.A6)_{16}$
1010011.101101	0101 0011 .1011 0100	$(53.B4)_{16}$

৯. অক্টাল সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর (Con. of Octal Number into Binary Number)

অক্টালের প্রতিটি ডিজিটকে তার সমতুল্য তিন বিট করে বাইনারিতে লিখতে হবে।

উদাহরণ : $(১৭৫)_৮$ এবং $(৫২৭.০৬)_৮$ এর বাইনারি মান নির্ণয় কর।

অক্টাল (বেজ ৮) → বাইনারি (বেজ ২)

১ ৭ ৫
(০০১ ১১১ ১০১)

$\therefore (১৭৫)_৮ = (০০১\ ১১১\ ১০১)_২$

৫ ২ ৭ . ০ ৬
(১০১ ০১০ ১১১ . ০০০ ১১০)

$\therefore (৫২৭.০৬)_৮ = (১০১\ ০১০\ ১১১\ .\ ০০০\ ১১০)_২$

অক্টাল	বাইনারি
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

টেবিল : অক্টাল ও সমমানের বাইনারি সংখ্যা

অক্টাল সংখ্যা	সমতুল্য তিন বিট বাইনারি মান	বাইনারি
175	001 111 101	1111101
.023	.000 010 011	.000010011
12.46	001 010 .100 110	1010.100110

১০. হেক্সাডেসিমালকে বাইনারিতে রূপান্তর (Conversion of Hexadecimal into Binary Number)

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার প্রতিটি ডিজিটকে আলাদাভাবে চার ডিজিটের বাইনারিতে পরিবর্তন করে একত্রিত করলে প্রাপ্ত সংখ্যাটি হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার সমমানের বাইনারি সংখ্যা পাওয়া যাবে। নিম্নে উদাহরণ দেয়া গেল।

হেক্সাডেসিমাল বেজ ১৬ → বাইনারি বেজ ২

হেক্সাডেসিমাল	বাইনারি
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
A(10)	1010
B(11)	1011
C(12)	1100
D(13)	1101
E(14)	1110
F(15)	1111

উদাহরণ—১ : $(A০৯.E২)_{১৬} = (?)_{২}$

A ০ ৯ . E ২

$(১০১০\ ০০০০\ ১০০১\ .\ ১১১০\ ০০১০)_{২}$

$\therefore\ (A০৯.E২)_{১৬} = (১০১০\ ০০০০\ ১০০১\ .\ ১১১০\ ০০১০)_{২}$

হেক্সাডেসিমাল	বাইনারিতে বিভাজন			বাইনারি সংখ্যা
B5D	1011	0101	1101	$(101101011101)_2$
.0F2	.0000	1111	0010	$(.000011110010)_2$
AB.50	1010	1011	.0101	$(10101011.0101)_2$

১১. অক্টাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর

নিয়ম : প্রথমে অক্টালকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে তারপর বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমাল রূপান্তর করতে হবে।

অক্টাল বেজ ৮ → হেক্সাডেসিমাল বেজ ১৬

উদাহরণ—১ : $(৫২৭.৩৭৫)_{৮}$ অক্টাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় পরিবর্তন কর।

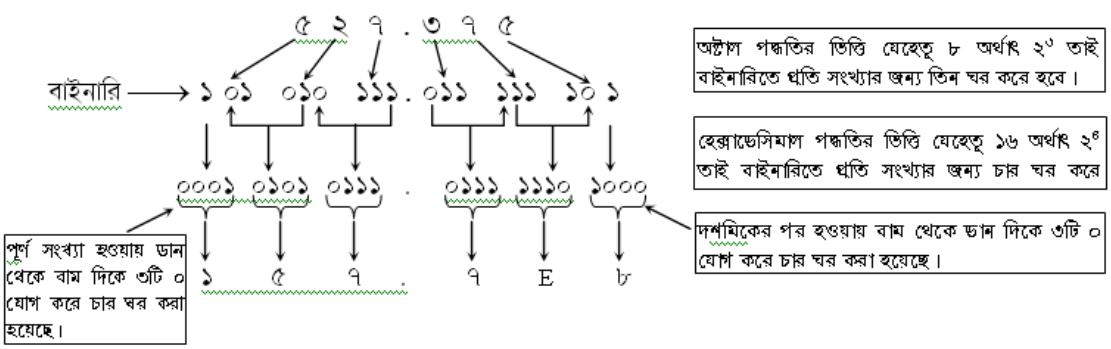

$(৫২৭.৩৭৫)_{৮} = (১৫৭.৭E৮)_{১৬}$

১২. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর
(Conversion of Hexadecimal Number into Octal Number)

নিয়ম : (1) হেক্সাডেসিমালকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে।

(2) বাইনারিকে অক্টালে রূপান্তর করতে হবে।

অর্থাৎ হেক্সাডেসিমাল ⟶ বাইনারি ⟶ অক্টাল

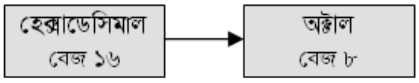

উদাহরণ–১ : $(২০৭.৫৪)_{১৬}$ সংখ্যাটির সমতুল্য অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর।

সমাধান :

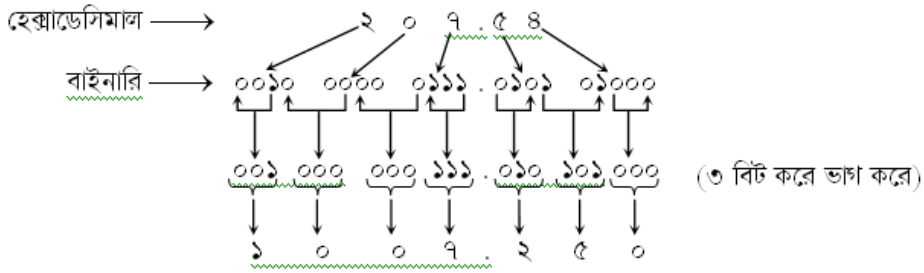

$\therefore$ $(২০৭.৫৪)_{১৬} = (১০০৭.২৫০)_{৮}$ **(উত্তর)**

উদারহণ–২ : $(৩৫৭.৫৪)_{১৬}$ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় পরিবর্তন।

সমাধান :

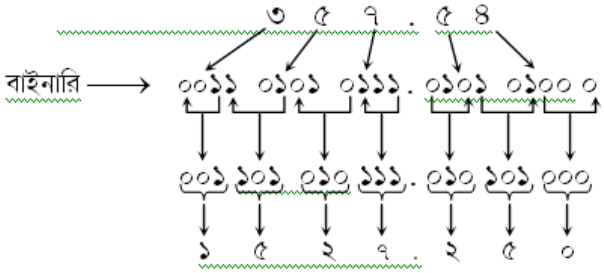

হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতির ভিত্তি যেহেতু ১৬ অর্থাৎ $২^৪$ তাই বাইনারিতে প্রতি সংখ্যার জন্য চার ঘর করে হবে।

অক্টাল পদ্ধতির ভিত্তি যেহেতু ৮ অর্থাৎ $২^৩$ তাই বাইনারিতে প্রতি সংখ্যার জন্য তিন ঘর করে হবে।

$\therefore$ $(৩৫৭.৫৪)_{১৬} = (১৫২৭.২৫০)_{৮}$

গ্রুপ–১	এক নজরে সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তর			
রূপান্তর	নিয়ম	পূর্ণাংশ	ভগ্নাংশ	ফলাফল
দশমিক – বাইনারি $(৩৮.০৫)_{১০} = (?)_{২}$ **D – B**	• ভাজ্য ০ না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যাকে ২ দিয়ে ভাগ • ভাগশেষগুলোকে শেষ থেকে শুরুর দিকে সাজানো • ভগ্নাংশ : অংশকে ২ দিয়ে গুণ করে পূর্ণ অংশটি (১) সংরক্ষণ। যদি না থাকে তবে ০ সংরক্ষণ। • এভাবে পুনঃপুনঃ চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সম্পূর্ণ ভগ্নাংশ পূর্ণ অংশে (১ এ) পরিণত হয়। • পূর্ণ অংশগুলোকে প্রথম থেকে শেষ দিকে সাজানো।	অবশিষ্ট ২ | ৩৮ – ২ | ১৯ – ০ ২ | ৯ – ১ ২ | ৪ – ১ ২ | ২ – ০ ২ | ১ – ০ ২ | ০ – ১	পূর্ণসংখ্যা ভগ্নাংশ .০৫ × ২ ০ .১০ × ২ ০ .২০ × ২ ০ .৪০ × ২ ০ .৮০ × ২ ১ .৬০	$(৩৮.০৫)_{১০}=$ $(১০০১১০.০০০০১....)_{২}$
দশমিক – অক্টাল $(১৭৫.১৫)_{১০} = (?)_{৮}$ **D – O**	• ভাজ্য ০ না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যাকে ৮ দিয়ে ভাগ করা। • এভাবে . . .	৮ | ১৭৫ ৮ | ২১ – ৭ ৮ | ২ – ৫ ০ – ২	পূর্ণসংখ্যা ভগ্নাংশ .১৫×৮ ১ .২০×৮ ১ .৬০×৮ ৪ .৮০×৮ ৬ .৪০×৮ ৩ .২০	$(১৭৫.১৫)_{১০}=$ $(২৫৭.১১৪৬৩...)_{৮}$
দশমিক – হেক্সা $(২৪৭৯.৫০)_{১০} = (?)_{১৬}$ **D – H**	• ভাজ্য ০ না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যাকে ১৬ দিয়ে ভাগ করা। • এভাবে . . .	১৬ | ২৪৭৯ ১৬ | ১৫৪ – ১৫ (F) ১৬ | ৯ – ১০ (A) ০ – ৯	পূর্ণসংখ্যা ভগ্নাংশ .৫০×১৬ ৮ .০	$(২৪৭৯.৫০)_{১০} = (৯AF.৮)_{১৬}$
গ্রুপ–২				
বাইনারি – দশমিক $(১১১১০.০০১)_{২} – (?)_{১০}$ **B – D**	- স্থানীয় মান ২এর ঘাত বা শক্তি দিয়ে হিসাব করতে হবে। যেমন– প্রথম ঘর $২^{০}$ (১), দ্বিতীয় ঘর $২^{১}$(২ × ১ = ২), তৃতীয় ঘর $২^{২}$(২ × ২ = ৪)... - দশমিকের পর বামদিক থেকে ডানদিকে ১ম ঘরের মান $২^{-১}$, দ্বিতীয় ঘরের মান $২^{-২}$, তৃতীয় ঘরের মান $২^{-৩}$, চতুর্থ ঘরের মান $২^{-৪}$ এভাবে . . .	= ১×$২^{৪}$ + ১×$২^{৩}$+ ১×$২^{২}$ + ১×$২^{১}$ + ০×$২^{০}$ = ১৬ + ৮+ ৪ + ২ + ০ = ৩০	= ০×$২^{-১}$ + ০×$২^{-২}$ + ১×$২^{-৩}$ = ০ + ০ +১/৮ = .১২৫	$(১১১১০.০০১)_{২}$ = $(৩০.১২৫)_{১০}$
অক্টাল – দশমিক $(২০৬.৬৪)_{৮} = (?)_{১০}$ **O – D**	- স্থানীয় মান ৮এর ঘাত বা শক্তি দিয়ে হিসাব করতে হবে। এভাবে . . .	= ২×$৮^{২}$ + ০×$৮^{১}$ + ৬×$৮^{০}$ = ২×৬৪+০×৮+৬×১ = ১২৮ +০+৬ = ১৩৪	= ৬×$৮^{-১}$+৪×$৮^{-২}$ = ৬×১/৮ +৪×১/৬৪ =০.৭৫+ .০৬২৫=.৮১২৫	$(২০৬.৬৪)_{৮}$ = $(১৩৪.৮১২৫)_{১০}$
হেক্সা– দশমিক $(৯AF.৮)_{১৬} = (?)_{১০}$ **H – D**	- স্থানীয় মান ১৬ এর ঘাত বা শক্তি দিয়ে হিসাব করতে হবে। এভাবে . . .	= ৯×$১৬^{২}$ + A×$১৬^{১}$ + F×$১৬^{০}$ = ৯×২৫৬ + ১০×১৬ + ১৫×১ = ২৩০৪ + ১৬০ +১৫= ২৪৭৯	= ৮× $১৬^{-১}$ = ৮/১৬ = ০.৫০	$(৯AF.৮)_{১৬}$ = $(২৪৭৯.৫০)_{১০}$
গ্রুপ–৩				
বাইনারি – অক্টাল $(১১০১০১)_{২} = (?)_{৮}$ $(.০১০১১০)_{২} = (?)_{৮}$ **B – O**	পূর্ণ সংখ্যার জন্য ডান দিক থেকে বাম দিকে এবং ভগ্নাংশ সংখ্যার জন্য বাম দিক থেকে ডান দিকে প্রতি ৩ বিট একত্রে নিয়ে ছোট ছোট ভাগ করতে হয়। প্রতিটি ভাগের বাইনারি মান লিখতে হয়।	= ১১০ ১০১ = $(৬৫)_{৮}$ (যেহেতু, $(১১০)_{২} = (৬)_{৮}$ এবং $(১০১)_{২} = (৫)_{৮}$	=.০১০ ১১০ = ২৬ (যেহেতু, $(০১০)_{২} = (২)_{৮}$ এবং $(১১০)_{২} = (৬)_{৮}$	$(১১০১০১)_{২}$ =$(৬৫)_{৮}$ $(.০১০১১০)_{২}$ =$(২৬)_{৮}$
বাইনারি – হেক্সা $(১০১০১১০)_{২} = (?)_{১৬}$ $(.০১০১১১)_{২} = (?)_{১৬}$ **B – H**	পূর্ণ সংখ্যার জন্য ডান দিক থেকে বাম দিকে এবং ভগ্নাংশ সংখ্যার জন্য বাম দিক থেকে ডান দিকে প্রতি ৪ বিট একত্রে নিয়ে ছোট ছোট ভাগ করতে হয়। প্রতিটি ভাগের বাইনারি মান লিখতে হয়।	$(১০১০১১০)_{২}$ ০১০১ ০১১০ ৫ ৬	$(.০১০১১১)_{২}$.০১০১ ১১০০ ৫ ১২/C	$(১০১০১১০)_{২}$= $(৫৬)_{১৬}$ $(.০১০১১১)_{২}$= $(.৫C)_{১৬}$
গ্রুপ–৪				
অক্টাল – বাইনারি $(৫২৭.০৬)_{৮} = (?)_{২}$ **O – B**	অক্টালের প্রতিটি ডিজিটকে তার সমতুল্য তিন বিট করে বাইনারিতে লিখতে হবে।	৫ ২ ৭ ১০১ ০১০ ১১১	.০৬ ০০০ ১১০	$(৫২৭.০৬)_{৮}$ = $(১০১০১০১১১.০০০১১০)_{২}$
হেক্সা– বাইনারি $(A০৯. E২)_{১৬} = (?)_{২}$ **H – B**	হেক্সাডেসিমালের প্রতিটি ডিজিটকে তার সমতুল্য চার বিট করে বাইনারিতে লিখতে হবে।	A ০ ৯ ১০১০ ০০০০ ১০০১	.E২ ১১১০ ০০১০	$(A০৯. E২)_{১৬}$ = $(১০১০ ০০০০১০০১.১১১০০০১০)_{২}$
গ্রুপ–৫				
অক্টাল – হেক্সা $(৫২৭.৩৭৫)_{৮} = (?)_{১৬}$ **O – H**	প্রথমে অক্টালকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে তারপর বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমাল রূপান্তর করতে হবে।	৫ ২ ৭ ০০০ ১০১ ০১০ ১১১ ১ ৫ ৭	.৩ ৭ ৫ ০০০ ০১১ ১১১ ১০১ ০ ১৫/F ১৩/D	$(৫২৭.৩৭৫)_{৮}$ = $(১৫৭.০FD)_{১৬}$
গ্রুপ–৬				
হেক্সা– অক্টাল $(২০৭.৫৪)_{১৬} = (?)_{৮}$ **H – O**	প্রথমে হেক্সাডেসিমালকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে তারপর বাইনারি থেকে অক্টালে রূপান্তর করতে হবে।	২ ০ ৭ ০০১০ ০০০০ ০১১১ ১ ০ ০ ৭	.৫৪ ০১০১ ০১০০ ০ ২ ৫ ০	$(২০৭.৫৪)_{১৬}$ = $(১০০৭.২৫০)_{৮}$

৩. বাইনারি যোগ বিয়োগ (Binary Addition and Subtraction)

বাইনারি সংখ্যার যোগ (Binary Addition)

বাইনারি সংখ্যার যোগ দশমিক সংখ্যার মতোই। নিচের টেবিলটি বাইনারিতে যোগ করার জন্য সহায়ক হবে।

ক	খ	যোগফল = ক + খ	Carry (হাতে)
0	0	0	নেই
0	1	1	নেই
1	0	1	নেই
1	1	0	1

টেবিল : বাইনারি যোগের নিয়ম

১. 11 + 01 = 100

২. 101 + 001 = 110

৩. 1100101 + 1010101 = 10111010

৪. 1101 + 1011 = 11000

৫. 10011 + 1001 = 11100

৬. 11.10 + 101.01 = 1000.11

৭. 11011.101 + 10110.110 = 110010.011

৮. 1001110 + 110111 = 10000101

৯. 11101.01001 + 1111.10000 = 101100.11001

১০. 11101.101 + 1001.001 = 100110.110

1+1 = 10, বসে '0' হাতে থাকে '1' অনুরূপভাবে, 1+1+1 = 11, বসে '1' হাতে থাকে '1'

বাইনারি সংখ্যার বিয়োগ (Binary Subtraction)

নিচের টেবিলটি বাইনারিতে বিয়োগ করার জন্য সহায়ক হবে।

ক	খ	বিয়োগফল = ক – খ	ধার
0	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
0	1	1	1

টেবিল : বাইনারি বিয়োগের নিয়ম

১. 111 – 101 = 010

২. 1101 – 1011 = 0010

৩. 1100 – 101 = 0111

৪. 1011011 – 101110 = 101101

৫. 11011.001 – 1011.110 = 1111.011

৬. 110101.101 – 010110.110 = 011110.111

৭. 110101 – 10110 = 011111

৮. 10101 – 1010 = 01011

৯. 11101.101 – 1001.001 = 10100.100

১০. 10000.11100 – 101.01001 = 1011.10011

দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে গাণিতিক কাজে সংখ্যার মানের দু'টি অবস্থা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক বোঝানোর জন্য সংখ্যার পূর্বে চিহ্ন + বা – থাকে।

৪. চিহ্নযুক্ত সংখ্যা (Signed Number)

আমরা বাইনারি গণিতের ব্যবহার শিখেছি। কম্পিউটারে আমরা কোন সংখ্যার সাথে কোন সংখ্যা যোগ–বিয়োগ করার নির্দেশ দিলে প্রথমে ডেসিমাল সংখ্যাটি বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত হয়। প্রতিটি সংখ্যার 1 বা 0 এক এক বিট জায়গায় থাকে। আট বিট মিলে হয় এক বাইট। কম্পিউটারে সংখ্যা আট বিটে বিন্যস্ত হয়। ধনাত্মক সংখ্যাটি যদি ছোট হয়, তাহলে ডানদিক থেকে সংখ্যা বসে বামদিকের বাকি ঘর শূন্য (০) দিয়ে পূরণ করে। তবে বাইনারি পদ্ধতিতে সংখ্যাটি কি ধনাত্মক নাকি ঋণাত্মক তা বুঝানোর জন্য সর্ববামের এক বিট ব্যবহার করা হয়। এ বিট 0 হলে সংখ্যাটিকে ধনাত্মক ও 1 হলে সংখ্যাটিকে ঋণাত্মক ধরা হয়। চিহ্ন রাখার জন্য সর্ববামের এ বিটকে চিহ্ন বিট (Sign bit) এবং চিহ্নযুক্ত সংখ্যাকে চিহ্নিত সংখ্যা বা সাইন্ড নাম্বার (Signed number) বলা হয়। ধনাত্মক সংখ্যার ক্ষেত্রে চিহ্ন বিট ছাড়া বাকি অংশটি সংখ্যার মান জ্ঞাপন করে। ঋণাত্মক সংখ্যার পরিণত করার মান জ্ঞাপনের জন্য তিনটি গঠন পদ্ধতি আছে। যথা–

১. চিহ্ন পরিমাণ (Sign–magnitude form) প্রকৃত মান গঠন,
২. 1 এর পরিপূরক গঠন (1'S Complement form) ও
৩. 2 এর পরিপূরক গঠন (2'S Complement form)

এ তিনটি পদ্ধতির মধ্যে প্রথম দু'টির ব্যবহার বর্তমানে নেই বললেই চলে। তবে ডিজিটাল ডিভাইসে ঋণাত্মক সংখ্যার মান জ্ঞাপনের জন্য ২ এর পরিপূরক ব্যবহার করা হয়। সেজন্য এখানে শুধু 2 এর পরিপূরক গাণিতিক প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বাইনারি সংখ্যাকে কত বিটে প্রকাশ করা হবে তা নির্ভর করবে রেজিস্টারের শব্দ দৈর্ঘ্যের উপর। রেজিস্টার যদি ৮ বিট বা ১ বাইটের হয় তাহলে সাইন বিটের জন্য ১ বিট এবং মানের জন্য ৭ বিট ব্যবহার করা হয়। রেজিস্টার ২ বাইট বা ১৬ বিট হলে সাইন বিটের জন্য ১ বিট এবং মানের জন্য ১৫ বিট ব্যবহার করা হয়।

৫. ২-এর পরিপূরক গঠন (2's Complement Structure)

বাইনারি সংখ্যাকে 1 এর পরিপূরক বা উল্টিয়ে লিখে তার সাথে 1 যোগ করে বাইনারি সংখ্যার 2 এর পরিপূরক পাওয়া যায়। ১৯৪৫ সালে জন ভন নিউম্যান EDSAC কম্পিউটারে 2-এর পরিপূরক ব্যবহারের প্রস্তাব করেন।

২-এর পরিপূরক গঠনের গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা :

- ২-এর পরিপূরক গঠনের ফলে বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করা যায়।
- ২-এর পরিপূরক গঠনে যোগ ও বিয়োগের জন্য একই বর্তনী ব্যবহার করা যায়। তাই আধুনিক কম্পিউটারে ২-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
- ২-এর পরিপূরক গঠন ব্যবহার করে সরল লজিক বর্তনী তৈরি করা যায়। যা দামে সস্তা ও দ্রুত গতিতে কাজ করে।
- ২-এর পরিপূরক গঠনে যোগ ও বিয়োগের জন্য একই বর্তনী ব্যবহার করা যায় বিধায় সার্কিটের মাত্রা কমে এবং জটিলতা কম হয়।

উদাহরণ : 26-এর 2-এর পরিপূরক গঠন

26-এর বাইনারি সংখ্যা = 11010

8-বিট রেজিস্টারের জন্য এ সংখ্যা = 00011010

অর্থাৎ, +26 = 0 0 0 1 1 0 1 0

1 1 1 0 0 1 0 1 (1-এর পরিপূরক)

+1

1 1 1 0 0 1 1 0 (2-এর পরিপূরক)

সংখ্যাটি রেজিস্টারে সজ্জিত থাকে এভাবে–

1	1	1	0	0	1	1	0

চিহ্ন-বিট চিহ্ন বিট যেহেতু 1 তাই, 1 1 1 0 0 1 1 0 = – 26

উদাহরণ : 12, 22, 8-এর 2-এর পরিপূরক গঠন

12 ডেসিমাল সংখ্যাটির বাইনারি সংখ্যা হলো 1100। ধনাত্মক 12 সংখ্যাটিকে রেজিস্টারে রাখা হয় এভাবে :

+12 →	0	0	0	0	1	1	0	0

↑ চিহ্ন-বিট

কিন্তু –12 ঋণাত্মক সংখ্যাটি 2 এর পরিপূরক হয়ে থাকে এভাবে, →

12 =1100 = 00001100 (৮-বিট হিসেবে সাজিয়ে)
11110011 (১ এর পরিপূরক করে)
+1
(–12) = 11110100 (২ এর পরিপূরক)

–12 →	1	1	1	1	0	1	0	0
+22 →	0	0	0	1	0	1	1	0
–22 →	1	1	1	0	1	0	1	0

22 =10110= 00010110 (৮-বিট হিসেবে সাজিয়ে)
11101001 (১ এর পরিপূরক করে)
+ 1
(–22) = 11101010 (২ এর পরিপূরক)

ঋণাত্মক সংখ্যা বুঝানোর জন্য চিহ্ন বিট ব্যবহৃত হয়। নিচে আরও কয়েকটি সংখ্যার উদাহরণ দেয়া হলো।

চিহ্ন	পরিমাণ	চিহ্ন	পরিমাণ
+ 12 = 0	0 0 0 1 1 0 0	এবং – 12 = 1	1 1 1 0 1 0 0
+ 8 = 0	0 0 0 1 0 0 0	এবং – 8 = 1	1 1 1 1 0 0 0
+ 22= 0	0 0 1 0 1 1 0	এবং – 22 = 1	1 1 0 1 0 1 0

বিপরীতকরণ বা নিগেশন : কোন ধনাত্মক সংখ্যাকে ঋণাত্মক সংখ্যায় বা কোন ঋণাত্মক সংখ্যাকে ধনাত্মক সংখ্যায় পরিবর্তন করাকে নিগেশন (Negation) বা বিপরীতকরণ বলা হয়। বাইনারি চিহ্নযুক্ত সংখ্যাকে ২-এর পরিপূরকে পরিবর্তন করে নিগেশন করা হয়। নিগেশনের ফলে কোন সংখ্যার মানের পরিবর্তন হয় না কিন্তু চিহ্নের (Sign) পরিবর্তন হয়। ৮ বিটে +৯ এর সমতুল্য বাইনারি মান হলো ০০০০১০০১ এবং -৯ এর সমতুল্য বাইনারি মান হলো ১০০০১০০১।

	০০০০১০০১	= +৯
নিগেশন	১০০০১০০১	= –৯ (২ এর পরিপূরক)
পুনঃ নিগেশন	০০০০১০০১	= +৯

2 এর পরিপূরকের গাণিতিক কাজ (Mathematical work of 2's complement)

২-এর পরিপূরক যোগ (2's complement addition)

২-এর পরিপূরক যোগের সময় বিটের সংখ্যা সমান হতে হয়। এক্ষেত্রে নিচের নিয়মগুলো মেনে চলে।

- সাধারণ বাইনারি যোগ করে।
- ঋণাত্মক সংখ্যাকে 2 এর পরিপূরক করে যোগ করে।
- চিহ্ন বিটের পর ক্যারি বাদ দেয়া হয়। (ফলাফলের ক্যারি বিট ওভার ফ্লো হলে তা বিবেচনা করা হয় না)
- ফলাফল ঋণাত্মক হলে (চিহ্ন বিট 1 হলে) তা 2-এর পরিপূরক আকারে হয়।

নিচের 8 বিট সংখ্যার জন্য যোগের প্রক্রিয়া দেখানো হলো।

দু'টি ধনাত্মক সংখ্যা : 8-বিট রেজিস্টারের জন্য +22 ও +9 এর যোগফল নির্ণয়।

	চিহ্ন বিট	
+ 22 :	0	0 0 1 0 1 1 0
+ 9 :	0	0 0 0 1 0 0 1
+ 31 :	0	0 0 1 1 1 1 1

এখানে সংখ্যা দু'টি এবং যোগফলের চিহ্ন বিট 0। সুতরাং, সংখ্যাগুলো ধনাত্মক।

বড় ধনাত্মক ও ছোট ঋণাত্মক সংখ্যা : +22 ও –13 এর যোগফল নির্ণয়।

+ 22	:	0	0 0 1 0 1 1 0
– 13	:	1	1 1 1 0 0 1 1 (দুই এর পরিপূরক)
+ 9	:	1	0 0 0 0 1 0 0 1

ক্যারিবিট চিহ্নবিট

13 = 1101 = 00001101
11110010
+ 1
∴ $(-13)_{10} = (11110011)_2$

এখানে ক্যারি 1 ধরা হবে না। চিহ্ন বিট 0 বলে ফলাফল ধনাত্মক হবে।

∴ নির্ণেয় যোগফল = $(00001001)_2$ বা 9

বড় ঋণাত্মক ও ছোট ধনাত্মক সংখ্যা : –22 এর সাথে +13 এর যোগফল নির্ণয়।

		চিহ্ন বিট	
– 22	:	1	1 1 0 1 0 1 0
+ 13	:	0	0 0 0 1 1 0 1
– 9	:	1	1 1 1 0 1 1 1

22 = 000 10110
11101001 [1 এর পরিপূরক করে]
+ 2
–22 = 11101010 [2 এর পরিপূরক করে]

উত্তর : – 9 = 11110111

–22 এর সাথে + 13 যোগ করলে যোগফল হবে –9 অর্থাৎ 9 এর 2-এর পরিপূরক = $(11110111)_2$ পাওয়া যাবে। এ মানটি ২-এর পরিপূরক হিসাবে আছে। এটিকে পুনরায় ২-এর পরিপূরক করলে সংখ্যা মান পাওয়া যাবে।

২-এর পরিপূরক মান হতে সংখ্যা মান বের করা

কোন সংখ্যা মান ২-এর পরিপূরক হিসেবে থাকলে এটিকে পুনরায় ২-এর পরিপূরক করলে সংখ্যা মান পাওয়া যাবে। ধরা যাক, 11110111 এর সংখ্যা মান ২-এর পরিপূরক হিসাবে আছে। এর সংখ্যা মান বের করতে হবে।

1 1 1 1 0 1 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 [1 এর পরিপূরক করে]
+1
0 0 0 0 1 0 0 1 = 9

কিন্তু আমাদের ফলাফল যেহেতু – 9 তাই উপরোক্ত 9 এর বাইনারি মানের চিহ্ন বিট 1 হবে। অর্থাৎ –9 = 10001001

দু'টি ঋণাত্মক সংখ্যা : -22 এর সাথে -13 এর যোগফল নির্ণয়।

– 22	:		1	1 1 0 1 0 1 0
– 13	:		1	1 1 1 0 0 1 1
– 35	:	1	1	1 0 1 1 1 0 1

ক্যারিবিট চিহ্ন–বিট

22 = 000 10110
11101001 [1 এর পরিপূরক করে]
+ 2
–22 = 11101010 [2 এর পরিপূরক করে]

13 = 00001101
11110010 [1 এর পরিপূরক করে]
+ 1
11110011 [2 এর পরিপূরক করে]
∴ $(-13)_{10} = (11110011)_2$

এখানে ক্যারি 1 ধরা হবে না। চিহ্ন বিট 1 বলে দু'য়ের পূরক আকারে আছে। এটিকে পুনরায় ২-এর পরিপূরক করলে সংখ্যা মান পাওয়া যাবে।

2 এর পরিপূরক বিয়োগ (2's complement Substraction)

2-এর পরিপূরক বিয়োগ 2-এর পরিপূরক যোগের মতোই। এক্ষেত্রেও যোগ করে বিয়োগের কাজ করা হয়। প্রথম সংখ্যাটিকে বিয়োজক (Minuend) এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটিকে বিয়োজ্য (Subtrahend) বলা হয়। বিয়োগ করার ক্ষেত্রে যে নিয়মগুলো মানতে হয় তা হলো–

- বিয়োজ্য সংখ্যাটির চিহ্ন পরিবর্তন করে (ধনাত্মক থাকলে ঋণাত্মক, ঋণাত্মক থাকলে ধনাত্মক করে) বিয়োজকের সাথে যোগ করতে হয়।
- যোগের মতোই সংখ্যাটি যদি ঋণাত্মক হয়, তাহলে এটির 2 এর পরিপূরক করা হয়।
- চিহ্ন বিটের অতিরিক্ত ক্যারি ধরা হয় না।

উদাহরণ–১ : + 22 থেকে + 13 বিয়োগ করতে হবে।

	চিহ্ন	
+ 22	=	0 0 0 1 0 1 1 0
+ 13	=	0 0 0 0 1 1 0 1
− 13	=	1 1 1 1 0 0 1 1 [২ এর পরিপূরক]

$22 - 13 = 22 + (-13)$
$13 = 00001101$
11110010 [1 এর পরিপূরক করে]
$+ 1$
$(-13) = 11110011$ [2 এর পরিপূরক করে]

সুতরাং + 22 থেকে + 13 এর বিয়োগ + 22 এর সাথে +13 এর 2 এর পরিপূরক যোগ অর্থাৎ –

+ 22	=		0 0 0 1 0 1 1 0
− 13	=		1 1 1 1 0 0 1 1
+ 9	=	1	0 0 0 0 1 0 0 1

ক্যারিবিট চিহ্ন–বিট

ক্যারি 1 বিবেচ্য নয়। সুতরাং, চিহ্ন বিট 0 তাই ফলাফল ধনাত্মক। ∴ নির্ণেয় যোগফল = $(00001001)_2$

উদাহরণ–২ : –13 থেকে –22 বিয়োগ করতে হবে।

-13 থেকে -22 বিয়োগ= $(-13) - (-22) = (-13) + 22$

− 13	=	1	1 1 1 0 0 1 1
+ 22	=	0	0 0 1 0 1 1 0
+ 9	=	1	0 0 0 0 1 0 0 1

ক্যারিবিট চিহ্ন বিট

$13 = 00001101$
11110010 [1 এর পরিপূরক করে]
$+ 1$
$(-13) = 11110011$ [2 এর পরিপূরক করে]

ক্যারি 1 ধর্তব্য নয়। তাই চিহ্ন বিট 0 হওয়াতে ফলাফল ধনাত্মক হবে। ∴ নির্ণেয় যোগফল, $9_{10} = (00001001)_2$ (উ:)

উদাহরণ–৩ : ২ এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে $(৬৫)_{১০}$ থেকে $(৫৫)_{১০}$ বিয়োগ কর।

৬৫ এর বাইনারি মান = ০১০০০০০১
৫৫ এর বাইনারি মান = ০০১১০১১১, ৮-বিট রেজিস্টারের জন্য এ সংখ্যা হবে = ০০১১০১১১

+৫৫ → ০ ০ ১ ১ ০ ১ ১ ১
১ ১ ০ ০ ১ ০ ০ ০ [১ এর পরিপূরক]
+ ১
১ ১ ০ ০ ১ ০ ০ ১ [২ এর পরিপূরক]

অর্থাৎ, – ৫৫ = ১ ১ ০ ০ ১ ০ ০ ১

(+) ৬৫ ⟶ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ১
(−) ৫৫ ⟶ ১ ১ ০ ০ ১ ০ ০ ১
অতিরিক্ত বিট ⟶ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ০ ১ ০

এখানে অতিরিক্ত ১ বিট বিবেচনা করা হয় না।
সুতরাং, নির্ণেয় বিয়োগ ফল $১০_{১০}$= $(০০০০১০১০)_২$

নোট : ৬৫ থেকে ৫৫ বিয়োগ করলে ফলাফল হয় ১০, ১০ এর বাইনারি মান = ১০১০ = $(০০০০১০১০)_২$

উদাহরণ–৪ : ২-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে $(১১০১১০১)_২$ থেকে $(১১০১১০)_২$ বিয়োগ কর।

এখানে ২য় সংখ্যা ১১০১১০ বিয়োগ করতে হবে, তাই এর ২-এর পরিপূরক করে ১ম সংখ্যা ১১০১১০১ এর সাথে যোগ করতে হবে।

১১০১১০ এর ৮–বিট সংখ্যা = ০০১১০১১০

০ ০ ১ ১ ০ ১ ১ ০
১ ১ ০ ০ ১ ০ ০ ১ [১ এর পরিপূরক]
+ ১
১ ১ ০ ০ ১ ০ ১ ০ [২ এর পরিপূরক]

০ ১ ১ ০ ১ ১ ০ ১
(+) ১ ১ ০ ০ ১ ০ ১ ০
অতিরিক্ত বিট ⟶ ১ ০ ০ ১ ১ ০ ১ ১ ১

এখানে অতিরিক্ত ১ বিট বিবেচনা করা হয় না।
সুতরাং, নির্ণেয় বিয়োগ ফল = $(০০১১০১১১)_২$

১৬ বিট সংখ্যার ক্ষেত্রে ২-এর পরিপূরক

বড় সংখ্যার ক্ষেত্রে বাইনারি মান ৮ বিটের সমান বা তার চেয়ে বেশি হলে অর্থাৎ চিহ্ন বিট ছাড়া সাত বিট অতিক্রম করলে সংখ্যাটি ১৬ বিট করে সাজায়ে ২-এর পরিপূরক করতে হয়। নিচে একটি উদাহরণ দেয়া হয়েছে।

উদাহরণ : ২-এর পরিপূরক ব্যবহার করে –৯২ ও –৫৩ সংখ্যা দু'টির যোগফল নির্ণয়।

৯২ এর সমতুল্য বাইনারি মান = ০১০১১১০০ এর ১৬ বিট বাইনারি মান = ০০০০০০০০০১০১১১০০

৫০ এর সমতুল্য বাইনারি মান = ০০১১০১০১ এর ১৬ বিট বাইনারি মান = ০০০০০০০০০০১১০১০১

৯২এর ২-এর পরিপূরক :

০০০০০০০০০১০১১১০০
১১ ১১১১ ১১১০১০০০১১
+১
১১ ১১১১ ১১১০১০০১০০

৫৩ এর ২-এর পরিপূরক :

০০০০০০০০০০১১০১০১
১১ ১১১১ ১১১১০০১০১০
+১
১১ ১১১১ ১১১১০০১০১১

–৯২ = ১১ ১১১১১১১০১০০১০০
–৫৩ = ১১ ১১১১১১১১০০১০১১
–১৪৫ = ১১১ ১১১১১১০১১০১১১১

অতিরিক্ত ক্যারি বিবেচনা করা হয় না। সুতরাং নির্ণেয় যোগফল, –১৪৫ = ১১১১১১১১০১১০১১১১
এটি ২-এর পরিপূরক হিসাবে আছে। এ মানকে পুনরায় ২-এর পরিপূরক করলে সংখ্যা পাওয়া যাবে। ১১১১১১১১০১১০১১১১ এর ২-এর পরিপূরক = ০০০০০০০০১০০১০০০০ = ১৪৫ কিন্তু ফলাফল +১৪৫ না হয়ে আছে –১৪৫ হিসেবে। তাই চিহ্ন বিট ১ হবে। অর্থাৎ -১৪৫ = ১০০০০০০০১০০১০০০০ (উত্তর)

উল্লেখ্য কোনো সংখ্যার বাইনারি মান বা তাদের যোগফল ১২৮ বা তার বেশি হলে ১৬-বিটের রেজিস্টার ব্যবহার করতে হবে।

কেন কম্পিউটারে বাইনারি সংখ্যা ব্যবহার করা হয়? (Why is binary number used in a computer?)

কম্পিউটার একটি ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র। কম্পিউটারে বাইনারি সংখ্যা ব্যবহার করার মূল কারণ হচ্ছে কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কার্যাবলি সংখ্যা নির্ভর। ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসগুলো মূলত সুইচ অন বা অফ এ দুই মোডকে কাজে লাগিয়ে সহজে কাজ করতে পারে বিধায় ডিজিটাল সার্কিটে বাইনারি সংখ্যার ব্যবহার দেখা যায়। বাইনারি পদ্ধতিতে দু'টি প্রতীকের ব্যবহার করার জন্য বিদ্যুতের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি কিংবা হাই-লো অবস্থার দ্বারা সহজেই কাজ করা যায়। বাইনারি সংখ্যার প্রতীক মাত্র দু'টি হওয়ায় এবং বাইনারি এ্যালজেবরা বা বুলিয়ান এ্যালজেবরার দ্বারা সকল দশমিক সংখ্যার গাণিতিক কাজ-কর্ম করা সম্ভব বিধায় কম্পিউটারে বাইনারি সংখ্যা ব্যবহার করা হয়।

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির সুবিধা

১. এই পদ্ধতির দুটি বিট (০ এবং ১) কে ইলেকট্রনিক যন্ত্রে সহজে সিগন্যাল আকারে ব্যবহার করা যায়।
২. কম্পিউটারে বাইনারি বিট (০ এবং ১) কে ইলেকট্রনিক সিগন্যালের সাহায্যে বিদ্যুতের অনুপস্থিতি এবং বিদ্যুতের উপস্থিতি দ্বারা প্রকাশ করা যায়।
৩. ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ বাইনারি মোডে কাজ করে। যেমন– একটি ম্যাগনেটিক কোরে clock wise এবং Anti clock wise হতে পারে, যা বাইনারি বিট ১ এবং ০ দ্বারা প্রকাশ করা যায়।
৪. বাইনারি সিস্টেমে দুটি অবস্থা থাকায় সার্কিট ডিজাইন সহজ হয়।

৬. কম্পিউটার কোডিং (Computer Coding)

কোড (Code) : কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত প্রতিটি বর্ণ, সংখ্যা বা বিশেষ চিহ্নকে পৃথক পৃথকভাবে সিপিইউকে বোঝানোর জন্য বাইনারি বিট অর্থাৎ ০ বা ১ রূপান্তর করে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে অদ্বিতীয় সংকেত তৈরি করা হয়। এই অদ্বিতীয় সংকেতকে কোড বলে। ডেটা ইনপুটের জন্য কোডিং এর দরকার হয়। প্রসেসিং শেষে আবার আউটপুটকে ডিকোডিং করা হয়। এ পদ্ধতিতে কোডকে আবার বর্ণ, সংখ্যা বা চিহ্নে রূপান্তর করা হয়। ব্যবহারের ভিত্তিতে কোডকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়। নিম্নে কতগুলো বহুল ব্যবহৃত কোডের নাম দেয়া হলো :

১. অক্টাল কোড (Octal Code)
২. হেক্সাডেসিমাল কোড (Hexadecimal Code)
৩. বিসিডি কোড (BCD Code)

৪. আলফানিউমেরিক কোড (Alphanumeric Code)
৫. অ্যাসকি কোড (ASCII Code)
৬. ইবিসিডিআইসি কোড (EBCDIC Code)
৭. ইউনিকোড (Uni Code)
৮. মোর্স কোড (Morse Code)
৯. গ্রে কোড (Gray Code)

বর্তমানে অ্যাসকি কোড এবং ইউনিকোড বেশি ব্যবহৃত হয়।

১. অক্টাল কোড (Octal Code)

অক্টাল কোড হলো তিন বিটের বাইনারি কোড অর্থাৎ ৩ বিট বিশিষ্ট বাইনারি কোডকে অক্টাল কোড বলা হয়। তিন বিটের অক্টাল কোডের সাহায্যে বড় ধরনের বাইনারি সংখ্যাকে সহজে সংক্ষিপ্ত সংকেত হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ডিজিটাল কম্পিউটার এবং মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে সংযোগের জন্য অক্টাল কোড ব্যবহৃত হয়।

যেমন : $(৪৬)_{১০} = (১০১১১০)_{২} = (৫৬)_{৮} = ১০১১১০$ (অক্টাল কোড)

২. হেক্সাডেসিমাল কোড (Hexadecimal Code)

হেক্সাডেসিমাল কোড হলো চার বিটের বাইনারি কোড অর্থাৎ ৪ বিট বিশিষ্ট বাইনারি কোডকে হেক্সাডেসিমাল কোড বলা হয় । চার বিটের হেক্সাডেসিমাল কোডের সাহায্যে বড় ধরনের বাইনারি সংখ্যাকে সহজে সংক্ষিপ্ত সংকেত হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ডিজিটাল কম্পিউটার এবং মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে সংযোগের জন্য অক্টাল কোড ব্যবহৃত হয়।

যেমন : $(৩৭)_{১০} = (২৫)_{১৬} = ০০১০০১০১$ (হেক্সাডেসিমাল কোড)

৩. বিসিডি কোড (BCD Code)

BCD শব্দ–সংক্ষেপটির পূর্ণ অর্থ হলো Binary Coded Decimal। দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় প্রকাশের জন্য বিসিডি কোড ব্যবহৃত হয়। 0 থেকে 9 এই দশটি অংকের প্রতিটিকে নির্দেশের জন্য 4 বিট বাইনারি অঙ্কের প্রয়োজন। 4 টি বিট দ্বারা 2^4 অর্থাৎ 16 টি ভিন্ন অবস্থা নির্দেশ করা হয়। কম্পিউটারের BIOS-এর তারিখ সংরক্ষণে, IBM-এর পুরানো সুপার কম্পিউটারে, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ডে তারিখ সংরক্ষণে BCD কোড ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন প্রকার বিসিডি কোড আছে। যেমন :

বিসডি ৮৪২১ কোড (বহুল ব্যবহৃত কোড)
বিসিডি ৭৪২১ কোড
বিসিডি ৫৪২১ কোড
বিসিডি ২৪২১ কোড ইত্যাদি।

BCD কোড একটি চার বিট বিশিষ্ট কোড। 0 থেকে 9 পর্যন্ত অঙ্কগুলোকে 4 বিটের বাইনারিতে পরিবর্তন করে BCD কোড পাওয়া যায়। যেমন– $0 \rightarrow 0000$, $1 \rightarrow 0001$, $2 \rightarrow 0010$ ইত্যাদি।

উদাহরণ–১ : $(395)_{10}$ কে বিসিডি কোডের মাধ্যমে দেখাও।

$$(395)_{10} = \begin{array}{ccc} 3 & 9 & 5 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 0011 & 1001 & 0101 \end{array}$$

$$\therefore (395)_{10} = (001110010101)_{BCD}$$

৪. আলফানিউমেরিক কোড (Alphanumeric Code)

বর্ণ, অঙ্ক, এবং বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্ন সহ (+, –, ×, ÷) আরও কতগুলো বিশেষ চিহ্নের (!, @, #, %, &, $) জন্য ব্যবহৃত কোডকে আলফানিউমেরিক কোড বলে। কতগুলো জনপ্রিয় আলফানিউমেরিক কোড হলো :

অ্যাসকি কোড (ASCII Code)
ইবিসিডিআইসি কোড (EBCDIC Code)
ইউনিকোড (Uni Code)

যেমন : ASCII-7 একটি আলফানিউমেরিক কোড। এ কোডের মাধ্যমে $২^৭$ বা ১২৮ টি চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়। অনুরূপ ভাবে $২^৮$ বা ২৫৬ টি চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।

৫. আসকি কোড (ASCII Code)

আসকি কোডের পূর্ণ অর্থ হচ্ছে American Standard Code for Information Interchange। এটি একটি বহুল প্রচলিত ৭ বিটের কোড। যার বাম দিকে তিনটি জোন এবং ডানদিকে চারটি সংখ্যা সূচক বিট হিসেবে ধরা হয়। তবে একেবারে বামে একটি প্যারিটি বিট যোগ করে ৮ বিট আসকি কোডে রূপান্তর করা যায়। মাইক্রোকম্পিউটারে এ কোডের ব্যাপক প্রচলন আছে। এছাড়াও কম্পিউটার এবং ইনপুট/আউটপুট এর জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র যেমন কীবোর্ড, মাউস, মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদির মধ্যে আলফানিউমেরিক তথ্য আদান প্রদানে ব্যবহৃত হয়। ১৯৬৫ সালে রবার্ট বিমার ৭ বিটের আসকি কোড উদ্ভাবন করেন। এ কোডের মাধ্যমে $২^৭$ বা ১২৮ টি চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়। যেমন: $Z = (01011010)_{ASCII}$

বিসিডি কোড ও বাইনারি সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য

বিসিডি কোড (BCD Code)	বাইনারি সংখ্যা (Binary Number)
১. বিসিডি কোড কোনো সংখ্যা পদ্ধতি নয়।	১. বাইনারি কোড একটি সংখ্যা পদ্ধতি।
২. এটা দশমিক পদ্ধতির সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়।	২. এ সংখ্যা পদ্ধতিতে কেবলমাত্র দুটি (0, 1) সংখ্যা ব্যবহৃত হয়।
৩. দশমিক সংখ্যাকে বিসিডি কোডে প্রকাশ করা খুব সহজ।	৩. দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় প্রকাশ করা কঠিন।
৪. শুধুমাত্র 0 থেকে 9 পর্যন্ত দশমিক সংখ্যার বাইনারি সমতুল্য সংখ্যা মনে রাখলেই যে কোন হিসাব সম্পন্ন করা যায়।	৪. বাইনারি কোডে হিসাবের প্রয়োজন হয়।
৫. কোনো সংখ্যাকে বিসিডি কোডে প্রকাশের জন্য বেশি বিট লাগে।	৫. কোনো সংখ্যাকে বাইনারিতে প্রকাশের জন্য কম বিট লাগে।
৬. উদাহরণ : $(১৩৭)_{১০}$ এর বিসিডি কোড = $(০০০১০০১১০১১১)_{BCD}$	৬. উদাহরণ : $(১৩৭)_{১০}$ এর সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা = $(১০০০১০০১)_{২}$

ASCII কোড ও BCD কোডের মধ্যে পার্থক্য

ASCII কোড	BCD কোড
১. ASCII শব্দ–সংক্ষেপটির পূর্ণরূপ হলো American Standard Code for Information Interchange.	১. BCD শব্দ–সংক্ষেপটির পূর্ণরূপ হলো Binary Coded Decimal.
২. ASCII–7, ৭টি বিট নিয়ে গঠিত। এ কোডের মাধ্যমে 2^7 বা 128 টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়। তবে ASCII–7 কোডের বামে একটি প্যারিটি বিট যোগ করে ASCII–8 গঠন করা হয়।	২. BCD কোড ৪টি বিট নিয়ে গঠিত। ৪টি বিট দ্বারা 24।
৩. এ কোডের মাধ্যমে 2^8 বা 256 টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।	৩. 16 টি ভিন্ন অবস্থা নির্দেশ করা যায়।
৪. বর্ণ, সংখ্যা, বিশেষ চিহ্ন ও প্রতীককে কোড করে মাইক্রো কম্পিউটারে ASCII কোডের ব্যাপক প্রচলন আছে।	৪. দশমিক পদ্ধতির সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তরের জন্যই BCD কোডের ব্যবহার হয়।

৬. ইবিসিডিআইসি কোড (EBCDIC Code)

EBCDIC কোডের পূর্ণ অর্থ হলো Extended Binary Coded Decimal Information Code। এটি একটি ৮ বিটের কোড। ইহাকে এক্সটেনডেন্ট EBCDIC Code বলা হয়। এই কোড দ্বারা $২^৮$ অর্থাৎ ২৫৬ টি অঙ্ক এবং বিশেষ চিহ্ন প্রকাশ করা হয়। এই কোড IBM কোম্পানি তাদের ৩৬০ এবং ৩৭০ সিরিজের কম্পিউটারে প্রথম ব্যবহার করে। এ কোডে ০ থেকে ৯ সংখ্যার জন্য ১১১১, A থেকে Z বর্ণের জন্য ১১০০, ১১০১ ও ১১১০ এবং বিশেষ চিহ্নের জন্য ০১০০, ০১০১, ০১১০ ও ০১১১ জোন বিট ব্যবহার করা হয়। দশমিক সংখ্যাগুলোকে ৮৪২১ কোডের মাধ্যমে প্রকাশ করে প্রত্যেক সংখ্যার সাথে ১১১১ জোন বিট যোগ করে কোড প্রকাশ করা হয়।

যেমন : ৫ এর বিসিডি কোড ৮৪২১ পরে কোড মান হবে ০১০১

তাই ৫ এর কোড ১১১১০১০১ এখানে ১১১১ যোগ করে।

৭. ইউনিকোড (Uni Code)

বিশ্বের সকল ভাষাকে কম্পিউটারে কোড ভুক্ত করার জন্য বড় বড় কোম্পানিগুলো একটি মান তৈরি করেছেন যাকে ইউনিকোড বলা হয়। ইউনিকোড-এর পূর্ণ অর্থ Universal Code বা সার্বজনীন কোড। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত আসকি কোডের পাশাপাশি ইউনিকোড সিস্টেম চালু হয়েছে। ইউনিকোড হচ্ছে ১৬ বিট কোড। বিভিন্ন ধরনের ক্যারেক্টার ও টেক্সটকে প্রকাশ করার জন্য ইউনিকোড ব্যবহার করা হয়। ইউনিকোডের মাধ্যমে $২^{১৬}$ = ৬৫৫৩৬ টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়। পৃথিবীর সব ভাষাভাষীর জন্য তাদের ভাষায় কম্পিউটিং করা সহজ করার লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে অ্যাপল কম্পিউটার কর্পোরেশন এবং Xerox Corporation-এর একদল কম্পিউটার প্রকৌশলী যৌথভাবে ইউনিকোড উদ্ভাবন করেন। Unicode Consortium–এর সদস্য হয়ে বাংলা ভাষাও ইউনিকোডভুক্ত হয়েছে।

ইউনিকোডের বৈশিষ্ট্য বা সুবিধা (Advantages of Uni Code)

১. ইহা ১৬ বিট বিশিষ্ট কোড ফলে ৬৫,৫৩৬ টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।
২. বিশ্বের ছোট বড় সকল ভাষাকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করা যায়।
৩. ক্যারেক্টারকে কোড করার জন্য ১৬ বিটই ব্যবহার করা হয়।
৪. ইউনিকোড ASCII কোডের সাথে কম্প্যাটিবল। অর্থাৎ ইউনিকোডের প্রথম ২৫৬টি কোড অ্যাসকি ২৫৬টি কোডের অনুরূপ।
৫. ইউনিকোড থেকে অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ড কোডে পরিবর্তন করা যায়।

ASCII কোড ও ইউনিকোড (UniCode) এর মধ্যে পার্থক্য

ASCII কোড	UniCode কোড
১. ASCII শব্দ–সংক্ষেপটির পূর্ণরূপ হলো American Standard Code for Information Interchange.	১. UniCode শব্দ–সংক্ষেপটির পূর্ণরূপ হলো Universal Code.
২. ASCII কোডের মাধ্যমে 2^8 বা 256 টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।	২. UniCode এর মাধ্যমে 2^{16} বা 65,536টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।
৩. American Standards Association এর অধীনে X3 নামক কমিটির পৃষ্ঠপোষকতায় এই কোড উন্নয়ন করা হয়।	৩. ইউনিকোডের দায়িত্বে রয়েছে ইউনিকোড কনসোর্টিয়াম নামক একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান।
৪. কম মেমোরির প্রয়োজন হয়।	৪. বেশি মেমোরির প্রয়োজন হয়।
৫. শুধুমাত্র আমেরিকান ইংলিশ বর্ণ চিহ্নের এনকোডের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, আসকি কোডে পাউন্ডের চিহ্ন ব্যবহার করে না।	৫. বিশ্বের শত শত ভাষার হাজার হাজার বর্ণ, চিহ্নের জন্য এ কোড ব্যবহৃত হয়।
৬. সব সফটওয়্যার এবং ই–মেইল আসকি কোড বুঝতে পারে।	৬. কিছু কিছু সফটওয়্যার এবং ই–মেইল ইউনিকোড ক্যারেক্টার সেট বুঝতে পারে না।
৭. আসকি হলো ৭ বিট/৮ বিট কোড।	৭. বিভিন্ন উপস্থাপনায় ইউনিকোড ৮, ১৬ অথবা ৩২ বিট ক্যারেক্টার বেজ ব্যবহার করে।
৮. উদাহরণ : A = 65 = 01000001	৮. উদাহরণ : A = \u0041

গাণিতিক সমস্যার সমাধান

১. $(5A)_{16}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

5 A
↓ ↓
0101 1010

সুতরাং $(5A)_{16} = 01011010 = (1011010)_2$ (উত্তর)

২. $(4C.B7)_{16}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

4 C . B 7
↓ ↓ ↓ ↓
0100 1100 . 1011 0111

$\therefore (4C.B7)_{16} = (1001100.10110111)_2$ (উত্তর)

৩. $(3E.1A)_{16}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

3 E . 1 A
↓ ↓ ↓ ↓
0011 1110 . 0001 1010

$\therefore 3E.1A = (111110.00011010)_2$ (উত্তর)

৪. $(FF)_{16}$ কে বাইনারিতে রূপান্তরকরণ :

F F
↓ ↓
1111 1111

$\therefore (FF)_{16} = (11111111)_2$ (উত্তর)

৫. $(৫৬.৪৭)_{৮}$ কে বাইনারিতে রূপান্তরকরণ :

৫ ৬ . ৪ ৭
↓ ↓ ↓ ↓
১০১ ১১০ . ১০০ ১১১

$\therefore (৫৬.৪৭)_{৮} = (১০১১১০.১০০১১১)_{২}$ (উত্তর)

৬. $(৫৩২.৭৫)_{৮}$ কে বাইনারিতে রূপান্তরকরণ :

৫ ৩ ২ . ৭ ৫
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
১০১ ০১১ ০১০ . ১১১ ১০১

$\therefore (৫৩২.৭৫)_{৮} = (১০১০১১০১০.১১১১০১)_{২}$ (উত্তর)

৭. $(৬F.৩C)_{১৬}$ কে বাইনারিতে রূপান্তরকরণ :

৬ F . ৩ C
↓ ↓ ↓ ↓
০১১০ ১১১১ . ০০১১ ১১০০

$\therefore (৬F.৩C)_{১৬} = (১১০১১১১. ০০১১১১০০)_{২}$ (উত্তর)

৮. $(ABCD.EF)_{১৬}$ কে বাইনারিতে রূপান্তরকরণ :

A B C D . E F
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
১০১০ ১০১১ ১১০০ ১১০১ . ১১১০ ১১১১

$\therefore (ABCD.EF)_{১৬} = (১০১০১০১১১১০০১১০১.১১১০১১১১)_{২(*)}$

৯. $(২৩.১২৫)_{১০}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে :

২ | ২৩
২ | ১১ ১
২ | ৫ ১
২ | ২ ১
২ | ১ ০
০ ১

LSB ↑ MSB

$(২৩)_{১০} = (১০১১১)_{২}$

$\therefore (২৩.১২৫)_{১০} = (১০১১১.০০১)_{২}$ (উত্তর)

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

পূর্ণাংশ	ভগ্নাংশ
	.১২৫
	× ২
০	.২৫০
	× ২
০	.৫০০
	× ২
১	.০০০

MSB ↓ LSB

$(০.১২৫)_{১০} = (০.০০১)_{২}$

১০. $(২০৯)_{১০}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

২	২০৯	
২	১০৪	১ LSB
২	৫২	০
২	২৬	০
২	১৩	০
২	৬	১
২	৩	০
২	১	১
	০	১ MSB

$\therefore$ $(২০৯)_{১০} = (১১০১০০০১)_{২}$ (উত্তর)

১১. $(৩৯৮)_{১০}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

২	৩৯৮	
২	১৯৯	০ LSB
২	৯৯	১
২	৪৯	১
২	২৪	১
২	১২	০
২	৬	০
২	৩	০
২	১	১
	০	১ MSB

$\therefore$ $(৩৯৮)_{১০} = (১১০০০১১১০)_{২}$ (উত্তর)

১২. $(১২৮.৩৭৫)_{১০}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে :

২	১২৮	
২	৬৪	০ LSB
২	৩২	০
২	১৬	০
২	৮	০
২	৪	০
২	২	০
২	১	০
	০	১ MSB

$\therefore$ $(১২৮)_{১০} = (১০০০০০০০)_{২}$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

	পূর্ণাংশ	ভগ্নাংশ
		. ৩৭৫
		× ২
MSB	০	. ৭৫০
		× ২
	১	. ৫০০
		× ২
LSB	১	. ০০০

$\therefore$ $(০.৩৭৫)_{১০} = (০.০১১)_{২}$

সুতরাং $(১২৮.৩৭৫)_{১০}$ এর সমতুল্য বাইনারি মান $(১০০০০০০০.০১১)_{২}$ (উত্তর)

১৩. $(১০১১০১০.১০১)_{২}$ কে দশমিকে পরিবর্তন :

$$(১০১১০১০.১০১)_{২} = ১ \times ২^{৬} + ০ \times ২^{৫} + ১ \times ২^{৪} + ১ \times ২^{৩} + ০ \times ২^{২} + ১ \times ২^{১} + ০ \times ২^{০} + ১ \times ২^{-১} + ০ \times ২^{-২} + ১ \times ২^{-৩}$$

$$= ১ \times ৬৪ + ০ + ১ \times ১৬ + ১ \times ৮ + ০ + ১ \times ২ + ০ + \frac{১}{২} + ০ + \frac{১}{৮} \quad [\because x^{০} = 1]$$

$$= ৬৪ + ১৬ + ৮ + ২ + ০.৫ + ০.১২৫ = ৯০ + ০.৫ + ০.১২৫ = ৯০.৬২৫$$

$\therefore$ $(১০১১০১০.১০১)_{২}$ এর সমতুল্য দশমিক মান $(৯০.৬২৫)_{১০}$ (উত্তর)

১৪. $(২০৩.২৫)_{৮}$ কে দশমিকে পরিবর্তন :

$$(২০৩.২৫)_{৮} = ২ \times ৮^{২} + ০ \times ৮^{১} + ৩ \times ৮^{০} + ২ \times ৮^{-১} + ৫ \times ৮^{-২}$$

$$= ২ \times ৬৪ + ০ + ৩ \times ১ + \frac{২}{৮} + \frac{৫}{৬৪} \quad [\because x^{০} = 1]$$

$$= ১২৮ + ৩ + ০.২৫ + ০.০৭৮১২৫ = ১৩১.৩২৮১২৫$$

$\therefore$ $(২০৩.২৫)_{২}$ এর সমতুল্য দশমিক মান $(১৩১.৩২৮১২৫)_{১০}$ (উত্তর)

১৫. $(৬F.৩C)_{১৬}$ কে দশমিকে রূপান্তরকরণ :

দশমিক সংখ্যা	হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

$$(৬F.৩C)_{১৬} = ৬ \times ১৬^{১} + F \times ১৬^{০} + ৩ \times ১৬^{-১} + C \times ১৬^{-২}$$

$$= ৬ \times ১৬ + ১৫ \times ১ + \frac{৩}{১৬} + \frac{১২}{২৫৬}$$

$$= ৯৬ + ১৫ + ০.১৮৭৫ + ০.০৪৬৮৭৫$$

$$= ১১১.২৩৪৩৭৫$$

$\therefore$ $(৬F.৩C)_{১৬}$ এর সমতুল্য দশমিক মান $(১১১.২৩৪৩৭৫)_{১০}$ (উত্তর)

১৬. $(ABCD.EF)_{১৬}$ কে দশমিকে রূপান্তরকরণ :

$$(ABCD.EF)_{১৬} = A \times ১৬^{৩} + B \times ১৬^{২} + \times C \times ১৬^{১} + \times D \times ১৬^{০} + E \times ১৬^{-১} + F \times ১৬^{-২}$$

$$= ১০ \times ৪০৯৬ + ১১ \times ২৫৬ + ১২ \times ১৬ + ১৩ \times ১ + \frac{১৪}{১৬} + \frac{১৫}{২৫৬}$$

$$= ৪০৯৬০ + ২৮১৬ + ১৯২ + ১৩ + ০.৮৭৫ + ০.০৫৮৫৯৩৭৫$$

$$= ৪৩৯৮১ + ০.৯৩৩৫৯৩৭৫$$

$$= ৪৩৯৮১.৯৩৩৫৯৩৭৫$$

$(ABCD.EF)_{১৬} = (৪৩৯৮১.৯৩৩৫৯৩৭৫)_{১০}$ (উত্তর)

১৭. $(৬DF)_{১৬}$ কে দশমিকে পরিবর্তনকরণ :

$(৬DF)_{১৬}$

$= ৬ \times ১৬^{২} + D \times ১৬^{১} + F \times ১৬^{০}$

$= ৬ \times ২৫৬ + ১৩ \times ১৬ + ১৫ \times ১$ $[\because x^{০} = 1]$

$= ১৫৩৬ + ২০৮ + ১৫$

$= ১৭৫৯$

$\therefore$ $(৬DF)_{১৬} = (১৭৫৯)_{১০}$ (উত্তর)

১৮. $(123.54)_8$ কে দশমিকে পরিবর্তন :

$(123.54)_8$

$= 1 \times 8^2 + 2 \times 8^1 + 3 \times 8^0 + 5 \times 8^{-1} + 4 \times 8^{-2}$

$= 1 \times 64 + 2 \times 8 + 3 \times 1 + \frac{5}{8} + \frac{4}{64}$

$= 64 + 16 + 3 + 0.625 + 0.0625$

$= 83 + 0.6875 = 83.6875$

$\therefore$ $(123.54)_8 = (83.6875)_{10}$ (উত্তর)

১৯. $(FF)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর :

$(FF)_{16} = F \times 16^1 + F \times 16^0$

$= 15 \times 16 + 15 \times 1$ $[\because x^{o} = 1]$

$= 240 + 15 = 255$

$\therefore (FF)_{16} = (255)_{10}$ (উত্তর)

২০. $(5A)_{16}$ কে দশমিক রূপান্তর :

$(5A)_{16} = 5 \times 16^1 + A \times 16^{o}$

$= 5 \times 16 + 10 \times 1$

$= 80 + 10 = 90$

$\therefore$ $(5A)_{16} = (90)_{10}$ (উত্তর)

২১. $(২BCD.৫৩)_{১৬}$ কে দশমিকে রূপান্তরকরণ :

$$(২BCD.৫৩)_{১৬} = ২ \times ১৬^{৩} + B \times ১৬^{২} + C \times ১৬^{১} + D \times ১৬^{০} + ৫ \times ১৬^{-১} + ৩ \times ১৬^{-২}$$

$$= ২ \times ৪০৯৬ + ১১ \times ২৫৬ + ১২ \times ১৬ + ১৩ \times ১ + \frac{৫}{১৬} + \frac{৩}{২৫৬} \quad [\because x^{o} = 1]$$

$$= ৮১৯২ + ২৮১৬ + ১৯২ + ১৩ + ০.৩১২৫ + ০.০১১৭১৮৭৫$$

$$= ১১২১৩ + ০.৩২৪২১৮৭৫ = ১১২১৩.৩২৪২১৮৭৫$$

$\therefore$ $(২BCD.৫৩)_{১৬} = (১১২১৩.৩২৪২১৮৭৫)_{১০}$ (উত্তর)

২২. $(3E.1A)_{16}$ কে অক্টালে রূপান্তর :

3 E . 1 A

0011 1110 . 0001 1010

∴ 000 111 110 . 000 110 100

0 7 6 . 0 6 4

∴ $(3E.1A)_{16} = (76.064)_8$

২৩. $(৭৫)_{১০}$ কে অক্টালে রূপান্তর :

৮ | ৭৫
৮ | ৯ ৩
৮ | ১ ১
০ ১

LSB ↑ MSB

∴ $(৭৫)_{১০} = (১১৩)_৮$ (উত্তর)

২৪. $(২৩.১২৫)_{১০}$ কে অক্টালে রূপান্তর :

পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে :

৮ | ২৩
৮ | ২ ৭
০ ২

LSB ↑ MSB

∴ $(২৩)_{১০} = (২৭)_৮$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

. ১ ২ ৫
× ৮
১ . ০ ০ ০

MSB ↓ LSB

∴ $(০.১২৫)_{১০} = (০.১)_৮$

সুতরাং $(২৩.১২৫)_{১০}$ এর সমতুল্য অক্টাল মান $(২৭.১)_৮$ (উত্তর)

২৫. $(১২৮.৩৭৫)_{১০}$ কে অক্টালে রূপান্তর :

পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে :

৮ | ১২৮
৮ | ১৬ ০
৮ | ২ ০
০ ২

LSB ↑ MSB

∴ $(১২৮)_{১০} = (২০০)_৮$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

. ৩ ৭ ৫
× ৮
৩ | . ০ ০ ০

MSB ↓ LSB

∴ $(.৩৭৫)_{১০} = (.৩)_৮$

কাজেই $(১২৮.৩৭৫)_{১০}$ এর সমতুল্য অক্টাল মান $(২০০.৩)_৮$ (উত্তর)

২৬. $(৬৭)_{১০}$ কে অকটালে রূপান্তর :

৮ | ৬৭
৮ | ৮ ৩
৮ | ১ ০
০ ১

LSB ↑ MSB

∴ $(৬৭)_{১০} = (১০৩)_৮$ (উত্তর)

২৭. $(৬৭)_{১০}$ কে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর :

১৬ | ৬৭
১৬ | ৪ ৩
০ ৪

LSB ↑ MSB

∴ $(৬৭)_{১০} = (৪৩)_{১৬}$ (উত্তর)

২৮. $(২৩.১২৫)_{১০}$ কে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর :

পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে :

১৬ | ২৩
১৬ | ১ ৭
০ ১

LSB ↑ MSB

$(২৩)_{১০} = (১৭)_{১৬}$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

. ১ ২ ৫
× ১ ৬
২ . ০ ০ ০

MSB ↓ LSB

$(০.১২৫)_{১০} = (০.২)_{১৬}$

∴ $(২৩.১২৫)_{১০} = (১৭.২)_{১৬}$ (উত্তর)

২৯. $(২০৯)_{১০}$ কে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর :

১৬ | ২০৯
১৬ | ১৩ ১
০ ১৩(D)

LSB ↑ MSB

$\therefore$ $(২০৯)_{১০} = (D১)_{১৬}$ (উত্তর)

৩০. $(৩৯৮)_{১০}$ কে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর :

১৬ | ৩৯৮
১৬ | ২৪ ১৪ (E)
১৬ | ১ ৮
০ ১

LSB ↑ MSB

$\therefore$ $(৩৯৮)_{১০}=(১৮E)_{১৬}$ (উত্তর)

৩১. $(১২৮.৩৭৫)_{১০}$ কে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর :

পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে :

১৬ | ১২৮
১৬ | ৮ ০
০ ৮

LSB ↑ MSB

$\therefore$ $(১২৮)_{১০} = (৮০)_{১৬}$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

. ৩ ৭ ৫
× ১ ৬
MSB ↓ ৬ . ০ ০ ০
LSB

$\therefore$ $(.৩৭৫)_{১০} = (.৬)_{১৬}$

কাজেই $(১২৮.৩৭৫)_{১০}$ এর সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল মান $(৮০.৬)_{১৬}$ (উত্তর)

৩২. $(203.25)_8$ কে হেক্সাডেসিমালে পরিবর্তন :

প্রথমে অক্টালকে বাইনারিতে রূপান্তর করে বাইনারিতে আবার হেক্সাডেসিমালে পরিবর্তন করতে হবে।

2 0 3 . 2 5
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
010 000 011 . 010 101

$\therefore$ বাইনারি সংখ্যাটি হলো–

0000 1000 0011 . 0101 0100
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
0 8 3 . 5 4

$\therefore$ $(203.25)_8 = (83.54)_{16}$ (উত্তর)

৩৩. $(437.375)_8$ কে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর :

437.375

100 011 111 . 011 111 101

0001 0001 1111 . 0111 1110 1000
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1 1 F 7 E 8

$\therefore$ $(11F.7E8)_{16}$

৩৪. ১০১১০১১০ এর সাথে ১০০১০০১১ যোগকরণ :

১ ০ ১ ১ ০ ১ ১ ০
(+) ১ ০ ০ ১ ০ ০ ১ ১
১ ০ ১ ০ ০ ১ ০ ০ ১

$\therefore$ নির্ণেয় যোগফল $(১০১০০১০০১)_২$

৩৫. ১০১১০১১০ হতে ১০০১০০১১ বিয়োগকরণ :

১ ০ ১ ১ ০ ১ ১ ০
(−) ১ ০ ০ ১ ০ ০ ১ ১
০ ০ ১ ০ ০ ০ ১ ১

$\therefore$ নির্ণেয় বিয়োগফল $(১০০০১১)_২$

৩৬. ১১০০১১০০ এর সাথে ১০০০১১০০ যোগকরণ :

১ ১ ০ ০ ১ ১ ০ ০
(+) ১ ০ ০ ০ ১ ১ ০ ০
১ ০ ১ ০ ১ ১ ০ ০ ০

∴ নির্ণেয় যোগফল $(১০১০১১০০০)_২$

৩৭. ১১০০১১০০ থেকে ১০০০১১০০ বিয়োগকরণ :

১ ১ ০ ০ ১ ১ ০ ০
(−) ১ ০ ০ ০ ১ ১ ০ ০
০ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০

∴ নির্ণেয় যোগফল $(১০০০০০০)_২$

৩৮. ৫৪ এর ১ এর ও ২ এর পরিপূরক গঠন :

৫৪ এর বাইনারি মান = ১ ১ ০ ১ ১ ০
৮বিট রেজিস্টারে মান = ০ ০ ১ ১ ০ ১ ১ ০
১-এর পরিপূরক = ১ ১ ০ ০ ১ ০ ০ ১
+ ১
২-এর পরিপূরক = ১ ১ ০ ০ ১ ০ ১ ০
চিহ্ন বিট

যেহেতু উভয় ক্ষেত্রে চিহ্ন বিট ১, সেহেতু সংখ্যাটি ঋণাত্মক
অর্থাৎ – ৫৪ = ১ ১ ০ ০ ১ ০ ০ ১ [১-এর পরিপূরক]
অর্থাৎ – ৫৪ = ১ ১ ০ ০ ১ ০ ১ ০ [২-এর পরিপূরক]

৩৯. ১২৩-এর ১ এবং ২-এর পরিপূরক গঠন :

১২৩ এর বাইনারি মান = ১ ১ ১ ১ ০ ১ ১
৮বিট রেজিস্টারে মান = ০ ১ ১ ১ ১ ০ ১ ১
১২৩ এর ১-এর পরিপূরক = ১ ০ ০ ০ ০ ১ ০ ০
+ ১
১২৩ এর ২-এর পরিপূরক = ১ ০ ০ ০ ০ ১ ০ ১
চিহ্ন বিট

যেহেতু উভয় ক্ষেত্রে চিহ্ন বিট ১, সেহেতু সংখ্যাটি ঋণাত্মক
অর্থাৎ – ১২৩ = ১ ০ ০ ০ ০ ১ ০ ০ [১–এর পরিপূরক]
এবং – ১২৩ = ১ ০ ০ ০ ০ ১ ০ ১ [২–এর পরিপূরক]

৪০. ১২৭-এর ১ এবং ২-এর পরিপূরক গঠন :

১২৭ এর বাইনারি মান = ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
৮বিট রেজিস্টারে মান = ০ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
১২৭ এর ১-এর পরিপূরক = ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
+ ১
১২৭ এর ২-এর পরিপূরক = ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১
চিহ্ন বিট

যেহেতু উভয় ক্ষেত্রে চিহ্ন বিট ১, সেহেতু সংখ্যাটি ঋণাত্মক
অর্থাৎ -১২৭= ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ [১-এর পরিপূরক]
এবং - ১২৭ = ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১ [২-এর পরিপূরক]

৪১. ৬৭-এর ১ এবং ২-এর পরিপূরক গঠন :

৬৭ এর বাইনারি মান = ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১
৮-বিট রেজিস্টারে মান = ০ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১
৬৭ এর ১–এর পরিপূরক = ১ ০ ১ ১ ১ ১ ০ ০
+ ১
৬৭ এর ২–এর পরিপূরক = ১ ০ ১ ১ ১ ১ ০ ১
চিহ্ন বিট

যেহেতু উভয় ক্ষেত্রে চিহ্ন বিট ১, সেহেতু সংখ্যাটি ঋণাত্মক
অর্থাৎ – ৬৭ = ১ ০ ১ ১ ১ ১ ০ ০ [১-এর পরিপূরক]
এবং – ৬৭ = ১ ০ ১ ১ ১ ১ ০ ১ [২-এর পরিপূরক]

২-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে বাইনারি বিয়োগ কর :

৪২. ১৬-বিট রেজিস্টারের জন্য + ২০৩ থেকে + ১৮০ বিয়োগ :

(+203) – (+180)
= 203 – 180
= 23

+ ২০৩-এর ১৬ বিট বাইনারি মান = ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১ ১ ০ ০ ১ ০ ১ ১
+ ১৮০-এর ১৬ বিট বাইনারি মান = ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১ ০ ১ ১ ০ ১ ০ ০
১৮০-এর ১-এর পরিপূরক = ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ০ ১ ০ ০ ১ ০ ১ ১
+ ১
১৮০ এর ২-এর পরিপূরক = ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ০ ১ ০ ০ ১ ১ ০ ০
এখন, ২০৩ = ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১ ১ ০ ০ ১ ০ ১ ১
+ (– ১৮০) = + ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ০ ১ ০ ০ ১ ১ ০ ০
(+ ২৩) = [১] ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১ ০ ১ ১ ১
ক্যারি

অতিরিক্ত ক্যারিবিট বিবেচনা করা হয় না। আবার চিহ্ন বিট ০। তাই ফলাফল ধনাত্মক হবে।
সুতরাং নির্ণেয় ফলাফল = $(০০০০০০০০০০০০১০১১১)_২$ বা +২৩।

৪৩. ১৬-বিট রেজিস্টারের জন্য ১২৩ থেকে ২৫৬ বিয়োগ করে দেখানো হলো–

+ ১২৩-এর ১৬ বিট বাইনারি মান = ০০০০০০০০০১ ১০০১০১১
+ ২৫৬-এর ১৬ বিট বাইনারি মান = ০০০০০০০১০০০০০০০০০
+ ২৫৬-এর ১-এর পরিপূরক = ১ ১ ১ ১ ১ ১১ ০১১১১১১১১১
+ ১

+ ২৫৬ এর ২-এর পরিপূরক = [১]১ ১ ১ ১ ১ ১ ১০০০০০০০০০

চিহ্ন বিট

যেহেতু চিহ্ন বিট ১, সেহেতু সংখ্যাটি ঋণাত্মক (Negative)।

এখন, + ১২৩ = ০০০০০০০০০০১১১১০১১
+ (– ২৫৬) = + ১১১১১১১১১০০০০০০০০০
– ১৩৩ = [১]১১১১১১১১০১১১১০১১

চিহ্ন বিট

সুতরাং নির্ণেয় বিয়োগ ফল ১১১১১১১১০১১১১০১১ বা – ১৩৩ (উত্তর)

৪৫. ৮বিট রেজিস্টার ব্যবহার করে $(১১১)_{১০}$ থেকে $(১০১)_{১০}$ বিয়োগ

$(১১১)_{১০}$ এর বাইনারি মান = ১ ১ ০ ১ ১ ১ ১
$(১১১)_{১০}$ এর ৮বিট বাইনারি মান = ০ ১ ১ ০ ১ ১ ১ ১
$(১০১)_{১০}$ এর বাইনারি মান = ১ ১ ০ ০ ১ ০ ১
$(১০১)_{১০}$ এর ৮বিট বাইনারি মান = ০ ১ ১ ০ ০ ১ ০ ১

এখানে বিয়োজ্য (+ ১০১)$_{১০}$। কাজেই $(১০১)_{১০}$ এর চিহ্ন পরিবর্তন করতে হবে। সুতরাং $(১০১)_{১০}$ এর ২-এর পরিপূরক–

১ ০ ০ ১ ১ ০ ১ ০ $(১০১)_{১০}$ এর ১-এর পরিপূরক
+ ১
১ ০ ০ ১ ১ ০ ১ ১ ২-এর পরিপূরক = $(– ১০১)_{১০}$

চিহ্ন বিট

$(+ ১১১)_{১০}$ = ০১ ১ ০ ১ ১ ১ ১
$+ (– ১০১)_{১০}$ = ১ ০ ০ ১ ১ ০ ১ ১
$(+ ১০)_{১০}$ = [১]০ ০ ০ ০ ১ ০ ১ ০

অতিরিক্ত বিট

অতিরিক্ত বিট বিবেচনা করা হয় না। যেহেতু চিহ্ন বিট ০, সেহেতু ফলাফল ধনাত্মক
সুতরাং ফলাফল= ০০০০১০১০ বা $(১০)_{১০}$

৪৬. $(৬F.৩C)_{১৬}$ ও $(২০৩.২৫)_{৮}$ যোগ কর এবং ফলাফল হেক্সাডেসিমালে প্রকাশ কর। [রা.বো. '০৮; য.বো. '১১]

$(6F.3C)_{16} \longrightarrow$ 0 0 1 1 0 1 1 1 1 . 0 0 1 1 1 1 0 0
$(203.25)_{8} \longrightarrow$ 0 1 0 0 0 0 0 1 1 . 0 1 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 . 1 0 0 1 0 0 0 0

0 F 2 9 0

∴ ফলাফল = $(F2.90)_{16}$

∴ $(6F.3C)_{16} + (203.25)_{8} = (F2.90)_{16}$ **(Ans.)**

৪৭. **10.11** বাইনারি সংখ্যাকে ডেসিমালে সংখ্যায় রূপান্তর কর।

$(10.11)_2 = (\ ?\ )_{10}$ পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে ঃ $(10)_2 = 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$ $= 2+0$ $= 2$ অতএব, $(10.11)_2 = (2.75)_{10}$ **(Ans.)**	ভগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে ঃ $(.11)_2 = 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}$ $= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 0.5 + 0.25 = .75$

৪৮. 2's কমপ্লিমেন্ট পদ্ধতিতে $(1111)_2$ হতে $(0110)_2$ বিয়োগ কর।

$(1111)_2 - (0110)_2$

$0110_{(2)}$-এর 1'S কমপ্লিমেন্ট $= 1001$

$+1$

$0110_{(2)}$-এর 2'S কমপ্লিমেন্ট $= 1010$

সুতরাং, 1111

$+1010$

$= 1|1001$

ক্যারি 1 বাদ দিলে সংখ্যাটি হয় $= (1001)_2$

উত্তর : $(1111)_2 - (0110)_2 = (1001)_2$

৪৯. $(৫১২.২৫)_{১০}$ সংখ্যাটিকে বাইনারিতে রূপান্তর কর এবং $(১০১১.০১)_২$ এর সাথে যোগ কর।

$(৫১২.২৫)_{১০}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর করে ১০১১.০১ এর সাথে যোগ

পূর্ণসংখ্যার ক্ষেত্রে–

২	৫১২		
২	২৫৬	-	০
২	১২৮	-	০
২	৬৪	-	০
২	৩২	-	০
২	১৬	-	০
২	৮	-	০
২	৪	-	০
২	২	-	০
২	১	-	০
	০	-	১

$\therefore$ $(৫১২)_{১০} = (১০০০০০০০০০০)_২$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে–

	.২৫
	× ২
০	.৫০
	×২
১	.০০

$\therefore$ $(.২৫)_{১০} = (.০১)_২$

$\therefore$ $(৫১২.২৫)_{১০} = (১০০০০০০০০০০.০১)_২$

১০০০০০০০০০০.০১

$+$ ১০১১.০১

১০০০০০১০১১.১০

$\therefore$ নির্ণেয় যোগফল $= (১০০০০০১০১১.১০)_২$ (উত্তর)

৫০. $(২৫)_{১০}$ কে বাইনারি ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর কর।

ভাজক	ভাজ্য/ ভাগফল	ভাগশেষ
২	২৫	–
২	১২	১
২	৬	০
২	৩	০
২	১	১
২	০	১

সর্বনিম্ন গুরুত্বের অঙ্ক

সর্বোচ্চ গুরুত্বের অঙ্ক

$\therefore$ $(২৫)_{১০} = (১১০০১)_২$

$\therefore$ $(২৫)_{১০} = (১১০০১)_২ = (১৯)_{১৬}$ (উত্তর)

$(১১০০১)_২$ এর হেক্সাডেসিমাল মান নির্ণয় :

১ ১০০১

০০০১ → ১

১০০১ → ৯

$\therefore$ $(১১০০১)_২ = (১৯)_{১৬}$

৫১. 19 হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার মানকে অক্টালে রূপান্তর করলে 31 হয় কিনা প্রমাণ কর।

19

0001 1001

∴ 0 0 0 | 0 1 1 | 0 0 1

0 3 1

সুতরাং 19 হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার মানকে অকটালে রূপান্তর করলে 31 হয়। **(প্রমাণিত)**

৫২. **$(১০১১.১১)_২$ ও $(১০১.১১)_২$ সংখ্যা দুইটির যোগফল ও বিয়োগফল নির্ণয় কর।** [সি.বো., ঢা.বো. '০৮; রা.বো. '০৬, '০৯]

i. $(১০১১.১১)_২$ এর সাথে $(১০১.১১)_২$ যোগ :	ii. $(১০১১.১১)_২$ হতে $(১০১.১১)_২$ বিয়োগ :
১ ০ ১ ১ . ১ ১ + ১ ০ ১ . ১ ১ ১ ০ ০ ০ ১ . ১ ০ সুতরাং নির্ণেয় যোগফল $(১০০০১.১০)_২$	১ ০ ১ ১ . ১ ১ + ১ ০ ১ . ১ ১ ০ ১ ১ ০ . ০ ০ সুতরাং নির্ণেয় বিয়োগফল $(০১১১০.০০)_২$

সার-সংক্ষেপ :

সংখ্যা পদ্ধতি : যে প্রণালী বা নিয়ম অনুসারে সংখ্যা ও প্রতীক ব্যবহার করে গণনাকার্য সম্পাদন করা হয় তাকে সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি : ০ থেকে ৯-এ দশটি সংখ্যার সমন্বয়ে যে সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি : ০ এবং ১ এর সমন্বয়ে দুইভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতিকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি : ০,১,২, ...৭ এর সমন্বয়ে আটভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতিকে অকটাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি : ০, ১, ২ .....৯ এবং A, B, C, D, E, F এর সমন্বয়ে ষোলভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতিকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

2 এর পরিপূরক গঠন : সংখ্যার চিহ্ন উপস্থাপনের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি যা অধিকাংশ গাণিতিক বর্তনীর জন্য 2 এর পরিপূরক গঠনে সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়।

বিসিডি কোড (BCD Code) : BCD শব্দ–সংক্ষেপটির পূর্ণরূপ হলো Binary Coded Decimal। দশমিক সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করাকে BCD Code বলে।

আসকি কোড (ASCII Code) : আসকি (ASCII) এর পূর্ণ অর্থ আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড কোড ফর ইনফরমেশন ইন্টারচেঞ্জ (American Standard Code for Information Interchange)।

ইউনিকোড (UniCode) : ইউনিকোড-এর পূর্ণ অর্থ ইউনিভার্সাল কোড (Universal Code) বা সার্বজনীন কোড। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত আসকি কোডের পাশাপাশি ইউনিকোড সিস্টেম চালু হয়েছে।

অনুশীলনী–৩ (১ম অংশ)

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

সংখ্যা পদ্ধতি

■ **সাধারণ নির্বাচনি প্রশ্ন :**

১. 4C এর বাইনারি সংখ্যা হলো–
ক. 11001100 খ. 01001100
গ. 01001010 ঘ. 01001101

২. বাইনারিতে একটি বইয়ের দাম 1001011 হলে ডেসিমালে কত?
ক. 70 খ. 75
গ. 78 ঘ. 80

৩. দশমিকে 94 হলে হেক্সাডেসিমালে হবে–
ক. 5E খ. 5F
গ. 6E ঘ. 6F

৪. কম্পিউটার অভ্যন্তরীণ কাজ করার জন্য কোন সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে?
ক. বাইনারি খ. দশমিক
গ. অক্টাল ঘ. হেক্সাডেসিমাল

৫. $(27)_{10}$ সংখ্যাটির সমতুল্য বাইনারি মান–
ক. 10011 খ. 11011
গ. 11010 ঘ. 10101

৬. ইউনিকোড কত বিটের?
ক. ৪ খ. ৮
গ. ১৬ ঘ. ৩২

৭. জারাফ : জানিস, আমার বয়স বাইনারিতে ১১০১।
ইবাদ : তাহলে আমি তোর চেয়ে ১ বছরের বড়।
ইবাদের বয়স ডেসিমালে কত বছর?
ক. ১২ খ. ১৩
গ. ১৪ ঘ. ১৫

৮. ১১০০ + ১০০০ এ বাইনারি সংখ্যার যোগফল কত?
ক. ১০১১০ খ. ১০১০০
গ. ১১০০ ঘ. ১০১০১

৯. ৯১-এর BCD কোড হল—
ক. ১০০১০০০১ খ. ১১১১১১১১
গ. ১০০১১ ঘ. ১০০০০০০১

১০. হেক্সাডেসিমাল F এর মান বাইনারিতে—
ক. ১০১০ খ. ১১১১
গ. ১১১০ ঘ. ১১০১

১১. $(1101)_2 = (?)_{10}$
ক. 12 খ. 13
গ. 14 ঘ. 15

১২. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির B ডিজিটের সমতুল্য সংখ্যা কোনটি?
ক. 10 খ. 11
গ. 13 ঘ. 14

১৩. $(130)_{10}$ এর BCD কোড কত?
ক. $(000100110000)_{BCD}$ খ. $(000000110001)_{BCD}$
গ. $(000100000011)_{BCD}$ ঘ. $(001100000001)_{BCD}$

১৪. দশমিক সংখ্যা ৯১ এর বাইনারি রূপ কোনটি?
ক. ১০১১০১১ খ. ১১০১০১০
গ. ১১১০০১১ ঘ. ১১০১১০১

১৫. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে 177 এর পরবর্তী সংখ্যা কোনটি?
ক. 100 খ. 170
গ. 200 ঘ. 270

১৬. শিক্ষক ছাত্রকে রোল নম্বর লিখতে বলায় সে লিখল 1001। দশমিক পদ্ধতিতে ছাত্রটির রোল নম্বর কত হবে?
ক. ৫ খ. ৯
গ. ১৬ ঘ. ১৭

১৭. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির বৃহত্তম অঙ্ক কোনটি?
ক. 1 খ. 7
গ. 8 ঘ. 10

১৮. $(১০১১১)_২$ এর সমতুল্য দশমিক মান কত?
ক. ৪৩ খ. ৩১
গ. ২৩ ঘ. ২২

১৯. বেজ এর উপর ভিত্তি করে সংখ্যা পদ্ধতি কত প্রকার?
ক. ২ খ. ৪
গ. ৮ ঘ. ১০

২০. বাংলা বর্ণমালা কোন কোড ভুক্ত?
ক. BCD খ. ASCII
গ. UNICODE ঘ. EBCDIC

২১. বাইনারি নিয়মে গুণ করা মানে—
ক. বার বার যোগ খ. বার বার বিয়োগ
গ. বার বার গুণ ঘ. বার বার ভাগ

২২. $(A1D)_{১৬}$ এর সমকক্ষ বাইনারি সংখ্যা কত?
ক. $(১০১০১০০১১১১০১)_২$ খ. $(১১০১০১০১০১০১)_২$
গ. $(১০১০০১০১১১০১)_২$ ঘ. $(১০১০০০০১১১০১)_২$

উত্তরমালা

১	খ	২	খ	৩	ঘ	৪	ক	৫	খ	৬	গ	৭	গ	৮	খ	৯	ক	১০	খ	১১	গ
১২	খ	১৩	ক	১৪	ক	১৫	গ	১৬	খ	১৭	গ	১৮	গ	১৯	খ	২০	গ	২১	ক	২২	ঘ

২৩. হেক্সাডেসিমালে F এর পরের সংখ্যা কোনটি?
ক. F0 খ. F1
গ. 10 ঘ. 20

২৪. হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতির ভিত বা বেজ কত?
ক. ২ খ. ৮
গ. ১০ ঘ. ১৬

২৫. BCD কত বিটের?
ক. 3 খ. 4
গ. 8 ঘ. 16

২৬. সিগমার আইসিটি শিক্ষক সিগমাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার ক্লাস রোল কত? সিগমা উত্তর দিল 3D 1 সংখ্যাটিকে দশমিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করলে হয়–
ক. 61 খ. 71
গ. 81 ঘ. 91

■ **বহুপদী সমাপ্তিসূচক নির্বাচনি প্রশ্ন :**

২৭. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির কোন একটি সংখ্যার মান বের করার জন্য দরকার–
i. সংখ্যা পদ্ধতির নাম
ii. সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি
iii. সংখ্যাটিতে ব্যবহৃত অংকগুলির নিজস্বমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৮. ৪৩৮ সংখ্যাটি হতে পারে–
i. ডেসিমাল
ii. অক্টাল
iii. হেক্সাডেসিমাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৯. BCD কোড—
i. প্রকাশে বাইনারির চাইতে অধিক সংখ্যক বিট দরকার হয়
ii. সুপার কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়
iii. ইংরেজি অক্ষর প্রকাশে ব্যবহৃত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

■ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩০ ও ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মি. পার্থিব তার একজন ছাত্রকে রোল নম্বর জিজ্ঞাসা করায় সে বলল তার রোল বাইনারিতে 1101

৩০. উদ্দীপকের বাইনারি নম্বরের সাথে $(1001)_2$ যোগ করলে তার যোগফল কত হবে?
ক. $(10110)_2$ খ. $(01100)_2$
গ. $(10010)_2$ ঘ. $(11110)_2$

৩১. উদ্দীপকের বাইনারি মানটির সমতুল্য মান–
i. $(11)_{16}$ ii. $(13)_{10}$
iii. $(15)_8$
কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. ii ও iii ঘ. ii ও iii

৩২. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হওয়ার কারণ–
i. ভুলের সম্ভাবনা কমানো যায়
ii. মেমরি ব্যবহার কম হয়
iii. কালার কোড নির্ধারণ করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৩. ৭৬২ সংখ্যাটি হচ্ছে–
i. অক্টাল ii. দশমিক
iii. হেক্সাডেসিমাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৪. ১০৭ সংখ্যাটি হবে–
i. বাইনারি ii. দশমিক
iii. অক্টাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৫. ৮বিট রেজিস্টারে "8" এর ২'র পরিপূরক হলো—
ক. 00101111 খ. 11111000
গ. 11010011 ঘ. 10011110

৩৬. 2's Complement এর নির্ণয়ের সূত্র নিম্নরূপ—
ক. 1's Complement + 1 খ. 1's Complement–1
গ. 2"– সংখ্যাটি ঘ. 2" + 1

৩৭. F ও 3 এর যোগফল কত?
ক. 10 খ. 13
গ. 15 ঘ. 18

উত্তরমালা

২৩	গ	২৪	ঘ	২৫	খ	২৬	ক	২৭	গ	২৮	খ	২৯	ঘ	৩০	ক	৩১	খ	৩২	ঘ
৩৩	ঘ	৩৪	গ	৩৫	খ	৩৬	ক	৩৭	ঘ										

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জনাব রাজিব একাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আইসিটি বিষয়ের সংখ্যা পদ্ধতি বুঝাচ্ছেন। তিনি বললেন কম্পিউটার তার অভ্যন্তরীণ কার্যাবলি 0 ও 1 এর সাহায্যে করে। কম্পিউটার দশমিক সংখ্যা চিনে না। এ দু'টি প্রতীক নিয়ে কী যেকোনো সংখ্যা প্রকাশ করা যায়। তিনি ৭৩২.৬৭ সংখ্যাটিকে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করে দেখালেন।

ক. ২-এর পরিপূরক কী? ১

খ. 10101 কী ধরনের সংখ্যা? বুঝিয়ে দাও। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংখ্যাটিকে কম্পিউটারের বোধগম্য সংখ্যায় রূপান্তর কর এবং 10101 এর সাথে যোগ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত রূপান্তরিত সংখ্যাটি কম্পিউটারের জন্য অত্যাবশ্যকীয় – বিশ্লেষণ কর। ৪

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জারীফকে তার বন্ধু ICT তে ১ম বর্ষ সমাপনী পরীক্ষায় ও নির্বাচনি পরীক্ষায় কত নম্বর পেয়েছে জানতে চাইলে সে লিখল যথাক্রমে $(1000000)_2$ ও $(111)_8$। তৎক্ষণাৎ জারীফকে তার বন্ধু বলল, আমিতো $(4E)_{16}$ পেয়েছিলাম।

ক. সংখ্যা পদ্ধতি কী? ১

খ. 'বীট ও বাইট এক নয়' – কেন? ২

গ. জারীফ কোন পরীক্ষায় বেশি নম্বর পেয়েছে তা প্রমাণ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে জারীফের বন্ধু হতে ২-এর পরিপূরক ব্যবহার করে জারীফের বন্ধু ও জারীফের নাম্বারের পার্থক্য যুক্তিসহ নিরূপণ কর। ৪

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মিলি কম্পিউটার ক্লাসে বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে। এ ধারণার ভিত্তিতে সে তার বয়স $(21)_8$ এবং রোল নম্বর $(1101)_2$ লিখে তার বন্ধু রাজুকে দেখাল।

ক. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কী? ১

খ. কম্পিউটার যোগের মাধ্যমে বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যার সমাধান করে – বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. মিলির বয়স দশভিত্তিক সংখ্যা ব্যবস্থায় কত বছর? প্রমাণ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ব্যবহৃত সংখ্যা দুটির মধ্যে কোন সংখ্যাটি কম্পিউটারে ব্যবহার করলে মেমরিতে কম জায়গা ধারণ করবে? বিশ্লেষণসহ যুক্তি দাও। ৪

তৃতীয় অধ্যায়

সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস

(Number Systems and Digital Devices)

(২য় অংশ : ডিজিটাল লজিক)

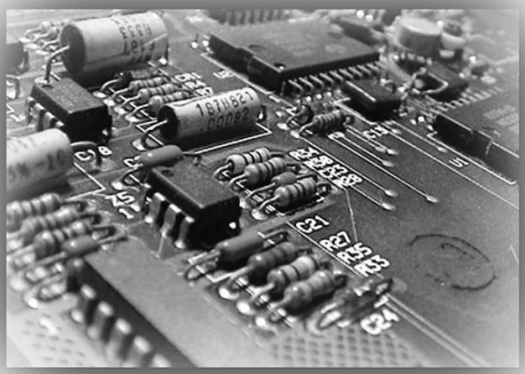

তৃতীয় অধ্যায় (২য় অংশ)

ডিজিটাল ডিভাইস (Digital Device)

৭. বুলিয়ান বীজগণিত (Boolean Algebra)

প্রখ্যাত ইংরেজ গণিতবিদ জর্জ বুল (George Boole) ১৮৪৭ সালে তার প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ "The Mathematical Analysis of Logic"–এ সর্বপ্রথম বুলিয় বীজগণিত নিয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তীতে ১৮৫৪ সালে গণিত ও যুক্তির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে তার 'An Investigation of the Laws of Thought' গ্রন্থে বুলিয় বীজগণিত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এতে মূলত সত্য এবং মিথ্যা এ দুই যুক্তি বা লজিকের উপর ভিত্তি করে আলোচনা করা হয়। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর বুলিয় বীজগণিতের সত্য এবং মিথ্যাকে বাইনারি 1 ও 0 দিয়ে পরিবর্তন করার মাধ্যমে কম্পিউটারে অঙ্ক কষার সমস্ত গাণিতিক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়। বুলিয় বীজগণিতে শুধু বুলিয় যোগ এবং গুণ–এর মাধ্যমে সমস্ত অঙ্ক করার কাজ করা হয়। যোগ এবং গুণের ক্ষেত্রে বুলিয়ান অ্যালজেবরা কতগুলো নিয়ম মেনে চলে। এ নিয়মগুলোকে বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ (Postulates) বলা হয়।

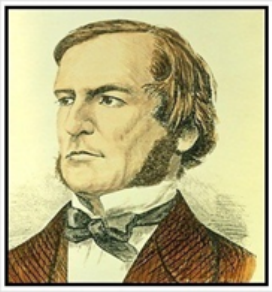

জর্জ বুল (George Boole) (১৮১৫-১৮৬৪) ছিলেন একজন ব্রিটিশ গণিতবিদ ও দার্শনিক যাকে গাণিতিক যুক্তিবিজ্ঞানের (Mathematical logic) জনকদের একজন হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৮৫৪ সালে তাঁর প্রধান কাজ 'An Investigation of the Laws of Thought' বের হয়। তিনি যে প্রকার প্রতীকী যুক্তিবিজ্ঞান নির্মাণ করেন, তার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে বুলিয়ান বীজগণিতের গবেষণা শুরু হয়। বর্তমান সময়ের কম্পিউটিং এবং বীজগণিতে এই বুলিয়ান বীজগণিতের গুরুত্ব রয়েছে। বুল, ডি-মরগান এবং অন্যান্যদের কাজ আধুনিক বিধিগত বীজগণিতের নির্মাণে সাহায্যকারী ভূমিকা রাখে। বুলের গবেষণাকর্মের উপরে পরবর্তীতে উইলিয়াম স্ট্যানলি জেভন্স, অগাস্টাস দ্য মরগান, চার্লস পিয়ার্স এবং উইলিয়াম আর্নস্ট জনসন কাজ করেছেন। বুলের গবেষণাকর্ম বহুদিন যাবত যুক্তিবিদদের ব্যতীত অন্যদের কাছে অপরিচিত ছিল। বুলীয় বীজগণিতের ব্যবহারিক কোনো প্রয়োগ বহুদিন যাবত অনাবিষ্কৃত ছিল। বুলের মৃত্যুর ৭০ বছর পরে ক্লদ শ্যানন ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান এ অধ্যয়নরত অবস্থায় দর্শন বিষয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে বুলিয়ান বীজগণিতের খোঁজ পান। পরবর্তীতে ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজিতে পড়ার সময় শ্যানন তাঁর মাস্টার্সের থিসিসে দেখান কীভাবে বুলিয়ান বীজগণিতের মাধ্যমে টেলিফোন রাউটিং সুইচের তড়িৎ–যান্ত্রিক রিলেসমূহের নকশা সঠিকভাবে করা যায়। তিনি আরো দেখান, এধরনের বর্তনী দিয়ে বুলিয়ান বীজগণিতের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। তড়িৎ বর্তনী দিয়ে যুক্তিবিদ্যার গণনা হলো আধুনিক কম্পিউটার বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি।

৭.১. বুলিয় বীজগণিতের মূলকথা

সাধারণ বীজগণিতে কোন চলক বা ভেরিয়েবলের বিভিন্ন মান হতে পারে। কিন্তু বুলিয় বীজগণিতে একটি চলকের কেবলমাত্র দু'টি মান "সত্য" (1) অথবা "মিথ্যা" (0) হতে পারে।

- 0 (0 Volt থেকে + 0.8 Volt)
  1 (2 volt থেকে + 5 Volt)
  কম্পিউটারের ইলেকট্রনিক্স সার্কিটগুলো 0 এবং 1 এই দুই মানের মাঝামাঝি কোন মান ধারণ করে না।
- বুলিয়ান বীজগণিতে তিনটি মৌলিক ক্রিয়া আছে। যথা–
  ১. বুলিয়ান যোগের ক্রিয়া (Logical OR Operation)
  ২. বুলিয়ান গুণের ক্রিয়া (Logical AND Operation)
  ৩. বুলিয়ান পূরকের ক্রিয়া (Logical NOT Operation)
- বুলিয় বীজগণিতে ভগ্নাংশ, ঋণাত্মক সংখ্যা, বর্গ ইত্যাদির ব্যবহার নেই।
  ১. OR কে $\vee$ চিহ্ন দিয়েও প্রকাশ করা হয়।
  ২. AND কে $\wedge$ চিহ্ন দিয়েও প্রকাশ করা হয়।
  ৩. NOT কে $\sim$ চিহ্ন দিয়েও প্রকাশ করা হয়।

সুতরাং, বুলিয় বীজগণিতে $a + b = c$ এ জাতীয় সমীকরণের তিনটি চলক a, b এবং c এর মান 1 এবং 0 হতে পারে। এ মানগুলো বসিয়ে বুলিয়ান অ্যালজেবরা যোগের ক্ষেত্রে যেসব নিয়ম মেনে চলে সেগুলো হলো নিম্নরূপ–

0 + 0	= 0	①
1 + 0	= 1	②
0 + 1	= 1	③
1 + 1	= 1	④

প্রথম তিনটি সমীকরণ সাধারণ বীজগণিতের নিয়ম মেনে চলছে কিন্তু 4 নং সমীকরণ 1 + 1 = 1 এর সাথে সাধারণ বীজগণিতের কোন মিল নেই। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, বুলিয়ান যোগ (+) চিহ্ন সাধারণ + চিহ্নকে বুঝায় না। বুলিয়ান যোগকে বলা হয় Logical Addition অথবা Logical Or Operation। গুণের ক্ষেত্রে বুলিয়ান অ্যালজেবরা যেসব নিয়ম মেনে চলে সেগুলো নিম্নরূপ :

0.0	= 0
1.0	= 0
0.1	= 0
1.1	= 1

বুলিয়ান অ্যালজেবরার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Boolean Algebra)

- বুলিয়ান অ্যালজেবরায় শুধুমাত্র 0 এবং 1 এ দুটি মাত্র অঙ্ক ব্যবহৃত হয়।
- এ অ্যালজেবরায় শুধুমাত্র যোগ এবং গুণের মাধ্যমে সমস্ত গাণিতিক কাজ করা হয়।
- এতে কোন ধরনের ভগ্নাংশ, লগারিদম, বর্গ, ঋণাত্মক সংখ্যা, কাল্পনিক সংখ্যা ইত্যাদি ব্যবহার করা যায় না।
- এতে কোন ধরনের জ্যামিতিক ও ত্রিকোণমিতিক সূত্র ব্যবহার করা যায় না।
- এ অ্যালজেবরা দশমিক অ্যালজেবরার তুলনায় অনেক সহজ পদ্ধতি।

বুলিয়ান ধ্রুবক ও চলক (Boolean Constant and Variable)

সাধারণভাবে ধ্রুবক বলতে কোন গাণিতিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত বিভিন্ন রাশির মান স্থির বা অপরিবর্তনশীল থাকাকে বুঝায়। আর চলক বলতে এমন গাণিতিক রাশিকে বুঝায় যার মান সর্বদা পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ চলকের মান স্থির থাকে না। বুলিয়ান অ্যালজেবরায় ব্যবহৃত কোন রাশির মান যদি শুধুমাত্র 0 বা 1 নির্দেশ করে তবে তাকে বুলিয়ান ধ্রুবক বলা হয়। যেমন, শুধুমাত্র A = 0 অথবা শুধুমাত্র A=1 হলে A ধ্রুবক বলে গণ্য হবে। অপরপক্ষে রাশিটির মান যদি দুটি ভিন্ন অবস্থার নির্দেশ করে (অর্থাৎ 0 ও 1) তবে তাকে বুলিয়ান চলক বলা হয়। যেমন A = 0,1 উভয়টি হলে A কে চলক বলা হবে। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক বর্তনীর ইনপুট ও আউটপুটের লজিক অবস্থা নির্দিষ্ট করার জন্য চলক ও ধ্রুবক ব্যবহৃত হয়।

বুলিয়ান পূরক (Boolean Complement)

বুলিয় বীজগণিতে চলকের দু'টি সম্ভাব্য মান 0 এবং 1-কে একটিকে অপরটির পূরক (Complement) বলা হয়। অর্থাৎ, 1-এর পূরক 0 এবং 0-এর পূরক 1। অর্থাৎ সত্যকে উল্টিয়ে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে উল্টিয়ে সত্য করা।

গণিতের ভাষায় লেখা হয় এভাবে–

A-এর পূরক A′ অথবা $\bar{A}$ (A′ অথবা $\bar{A}$ কে "এ নট" বলা হয়।)

যদি A-এর মান 0 হয় তাহলে A′ = 1, যদি A-এর মান 1 হয় তাহলে A′ = 0 হবে।

বুলিয় বীজগণিতে পূরকের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বুলিয় বীজগণিতে অঙ্ক করতে গেলে প্রায়ই পূরক নির্ণয় করতে হয়।

দ্বৈত নীতি (Duality Principle)

AND এবং OR অপারেশনের সাথে সম্পর্কযুক্ত সূত্রকে দ্বৈত নীতি বলা হয়। AND এবং OR অপারেশনের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল উপপাদ্য বা সমীকরণ দ্বৈত নীতি মেনে চলে। যেমন–

AND (.) এবং OR (+) পরস্পর বিনিময় করে। অর্থাৎ AND (.) এর পরিবর্তে OR (+) এবং OR (+) এর পরিবর্তে AND (.) ব্যবহার করে। যেমন–

$1+1=1$

$1.1=1$

1 এবং 0 পরস্পর বিনিময় (Interchange) করে। অর্থাৎ 1 এর পরিবর্তে 0 এবং 0 এর পরিবর্তে 1 ব্যবহার করে। যেমন–

$0+1=1$ এবং $0.1=1$

$1+0=1$ $1.0=1$

৭.২. বুলিয়ান উপপাদ্য (Boolean Theorems)

বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাধারণ উপপাদ্যগুলো নিচে দেয়া হলো :

মৌলিক উপপাদ্য (Basic Theorem)

- $A+0=A$
- $A+1=1$
- $A+A=A$
- $A+\overline{A}=1$
- $A.A=A$
- $A.1=A$
- $A.\overline{A}=0$
- $A.0=0$

বিনিময় উপপাদ্য (Commulative Theorem)

- $A+B=B+A$
- $A.B=B.A$

অনুষঙ্গ উপপাদ্য (Associative Theorem)

- $A+(B+C)=(A+B)+C$
- $A.(B.C)=(A.B).C$

সহায়ক উপপাদ্য (Secondary Theorem)

- $A+A.B=A$
- $\overline{\overline{A}}=A$

বিভাজন উপপাদ্য (Distributed Theorem)

- $A(B+C)=A.B+A.C$
- $A+B.C=(A+B)(A+C)$
- $A+\overline{A}B=A+B$
- $A.B+B.\overline{C}+BC=A.B+C$

ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য (De-Morgan's Theorem)

- $\overline{(A+B)}=\overline{A}.\overline{B}$
- $\overline{A.B}=\overline{A}+\overline{B}$

এসব উপপাদ্য দিয়ে যুক্তি রাশিমালা সরলীকরণ করা যায়।

সূত্রসমূহের ব্যাখ্যা :

ধরা যাক, $A=0$, সুতরাং $\overline{A}=1$

- $A+\overline{A}=0+1=1$
- $A.\overline{A}=0.1=0=A$, অর্থাৎ, $\overline{A}.A=A$
- $\overline{\overline{A}}=\overline{1}=0=A$, অর্থাৎ, $\overline{\overline{A}}=A$

ধরা যাক, $A=0, B=1$

- $A+A.B=0+0.1=0=A$ অর্থাৎ $A+A.B=A$

  যদি $A=1$ এবং $B=0$ হয় তাহলে, $A+A.B=1+1.0=1=A$

  সুতরাং $A+A.B=A$
- $A=0, B=1$ ধরে $A+\overline{A}B=0+1.1=1$, $A+B=0+1=1$

সুতরাং $A+\bar{A}B = A+B$

- $AB + BC + \bar{B}C = AB + C(B + \bar{B})$
  $= AB + C.1 = AB + C$ [যেহেতু $A + A = 1$]
- $A = 0$ এবং $B = 1$ ধরে

  $\overline{A + B} = \overline{0 + 1} = \bar{1} = 0$

  $\bar{A} . \bar{B} = \bar{0}. \bar{1} = 1.0 = 0$

  সুতরাং, $\overline{A + B} = \bar{A}. \bar{B}$
- $\overline{A.B} = \overline{0.1} = \bar{0} = 1$ $\quad \bar{A} + \bar{B} = \bar{0} + \bar{1} = 1 + 0 = 1$ সুতরাং $\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$

সত্যক সারণি (Truth Table)

বুলিয় চলকের মানের সম্ভাব্য সব বিন্যাসের জন্য বুলিয় ফাংশনের যে মান হয় তা দেখানোর টেবিলকে ট্রুথ টেবিল বলে। ট্রুথ টেবিলের সাহায্যে বুলিয় সব সূত্র প্রমাণ করা যায়। সত্যক সারণিতে এক বা একাধিক ইনপুট থাকে যার মান 0 বা 1 হতে পারে। n–সংখ্যক চলকের জন্য সত্যক সারণিতে 2^n সংখ্যক সারি থাকবে। যেমন, কোন লজিক বর্তনীতে 2টি ইনপুট A এবং B হলে উহার ইনপুটের অবস্থা হবে 4টি (00, 01, 10, 11)। আবার ইনপুট A, B এবং C হলে উহার ইনপুটের অবস্থা হবে 2^3= 8টি (000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111)

সত্যক সারণির ব্যবহার :

১. সত্যক সারণির মাধ্যমে সার্কিটটির আউটপুট কী ধরনের হবে তা ঠিক করা হয় এবং সেখান থেকে বুলিয়ান রাশি বের করা হয় এবং ইলেকট্রনিক্স সার্কিট তৈরি করা হয়।

২. বুলিয়ান উপপাদ্য প্রমাণ করার জন্য সত্যক সারণি ব্যবহার করা হয়।

৩. একটি বুলিয়ান রাশি সরলীকরণ করে নতুন একটি রাশিতে রূপান্তর করা যায়।

৪. সরলীকরণ সঠিক কিনা পরীক্ষার জন্য সত্যক সারণি ব্যবহৃত হয়।

যেমন, $A + A.B = A$ সূত্রটিকে নিচের সত্যক সারণিতে প্রকাশ করা যায়।

A	B	AB	A + AB
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	1	1

উপরিউক্ত সারণি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে–

$A + A.B = A$

$A + \bar{A}B = A+B$ সূত্রটিকে নিচের সত্যক সারণিতে প্রমাণ করা যায়।

A	B	$\bar{A}$	$\bar{A}B$	$A + \bar{A}B$	A + B
0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	1

উপরিউক্ত সারণি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে–

$A + \bar{A}B = A + B$ ।

সাধারণ অ্যালজেবরা এবং বুলিয়ান অ্যালজেবরার মধ্যে পার্থক্য

সাধারণ অ্যালজেবরা	বুলিয়ান অ্যালজেবরা
১. যে কোন অঙ্ক ব্যবহার করা যায়।	১. দুটি অঙ্ক ০ এবং ১ ব্যবহার করা হয়।
২. যে কোন গাণিতিক প্রক্রিয়া যেমন– যোগ, গুণ, ভাগ, বিয়োগ, বর্গ ইত্যাদি সম্ভব।	২. যোগ ও গুণ এ দুটি গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্ভব।
৩. পূরক চলক বা কমপ্লিমেন্ট (Complement) নেই।	৩. পূরক চলক বা কমপ্লিমেন্ট (Complement) আছে।
৪. ভগ্নাংশ বা ঋণাত্মক সংখ্যা ব্যবহার করা যায়।	৪. ভগ্নাংশ বা ঋণাত্মক সংখ্যা ব্যবহার করা যায় না।
৫. জ্যামিতিক, ত্রিকোণমিতিক বা লগারিদম ইত্যাদি সূত্র ব্যবহার করা যায়।	৫. জ্যামিতিক, ত্রিকোণমিতিক বা লগারিদম ইত্যাদি সূত্র ব্যবহার করা যায় না।
৬. গাণিতিক কাজ তুলনামূলক কঠিন।	৬. মাত্র দুইটি অঙ্ক থাকায় যোগ ও গুণের কাজ সহজ।

একক কাজ : বুলিয়ান অ্যালজেবরার সুবিধাদি সম্পর্কে লিখ।

ডি-মরগ্যানের সূত্র ও প্রমাণ

ইংরেজ গণিতবিদ ডি-মরগ্যান বুলিয়ান অ্যালজেবরার ক্ষেত্রে দুটি উপপাদ্য আবিষ্কার করেন। তার নাম অনুসারে উপপাদ্য দুটিকে ডি–মরগ্যানের সূত্র বা উপপাদ্য বলা হয়। বাইনারি পদ্ধতির গাণিতিক কাজকর্মে সূত্র দু'টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দুই চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য দুটি হলো–

1. $\overline{A+B} = \overline{A}\,.\,\overline{B}$
2. $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$

প্রথম উপপাদ্যের ব্যাখ্যা : A ও B দুটি চলকের যোগফলের কমপ্লিমেন্টের ফলাফল চলকগুলোর কমপ্লিমেন্টের গুণফলের সমান।

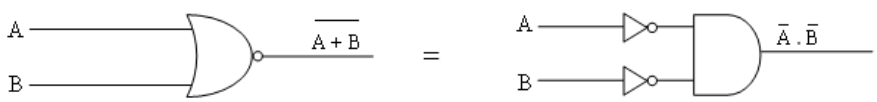

দ্বিতীয় উপপাদ্যের ব্যাখ্যা : A ও B দুটি চলকের গুণফলের কমপ্লিমেন্টের ফলাফল চলকগুলোর কমপ্লিমেন্টের যোগফলের সমান।

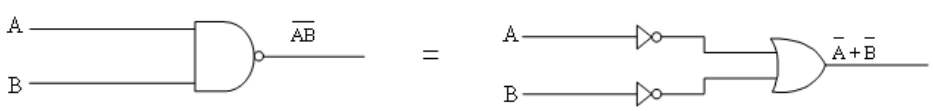

ডি-মরগ্যানের উপপাদ্যের প্রমাণ : A ও B দুটি চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের সূত্র দুটির প্রমাণ সত্যক সারণির মাধ্যমে খুব সহজেই করা যায়। নিম্নে সারণি দেয়া হলো–

					১ম সূত্র			২য় সূত্র	
A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	A + B	$\overline{A+B}$	$\overline{A}\,.\,\overline{B}$	AB	$\overline{AB}$	$\overline{A}+\overline{B}$
0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1	0	0

চিত্র : সত্যক সারণি বা ট্রুথ টেবিল

সত্যক সারণির মান পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, A ও B দুটি চলকের সকল মানের জন্য—

1. $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
2. $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$

সুতরাং ডি—মরগ্যানের সূত্র দুটি প্রমাণিত হল।

তিনটি বুলিয়ান চলকের ডি-মরগানের সূত্র প্রমাণ :

A, B ও C তিনটি চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের দুটি নিম্নরূপ :

1. $\overline{A+B+C} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$
2. $\overline{ABC} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$

মিনটার্ম (Minterm) : ট্রুথটেবিলে ভেরিয়েবলের বিভিন্ন মানকে মিনটার্ম দিয়ে প্রকাশ করা যায়। কোন লজিক্যাল ফাংশনের ইনপুট হিসেবে যেসব চলক ব্যবহার করা হয় সেসব চলকের গুণফলের বিভিন্ন সমাবেশকে মিনটার্ম বলা হয়। যদি কোন সমীকরণে n সংখ্যক চলক থাকে তাহলে ঐ সমীকরণে 2^n সংখ্যক মিনটার্ম থাকবে। ধরা যাক, দুইটি ইনপুট A এবং B এর বিভিন্ন ইনপুট মান রয়েছে। 1 এর জন্য A কে A এবং 0 এর জন্য A কে $\overline{A}$ দিয়ে প্রকাশ করা যায়। এখানে AND অপারেশনে A এবং B এর বিভিন্ন ইনপুট মানের মিনটার্ম দেখানো হয়েছে।

A	B	Minterm
0	0	$\overline{A}\,\overline{B}$
0	1	$\overline{A}B$
1	0	$A\overline{B}$
1	1	AB

নিম্নে সত্যক সারণির মাধ্যমে উপপাদ্য দুটি প্রমাণ করা হলো—

A	B	C	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{C}$	A + B + C	$\overline{A+B+C}$	$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$	ABC	$\overline{ABC}$	$\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$
0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0

১ম সূত্র ২য় সূত্র

চিত্র : সত্যক সারণি বা ট্রুথ টেবিল

উপর্যুক্ত সত্যক সারণির মান পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, A, B ও C তিনটি চলকের সকল মানের জন্য—

1. $\overline{A+B+C} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$
2. $\overline{ABC} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$

সুতরাং ডি-মরগ্যানের সূত্র দুটি প্রমাণিত হল।

n সংখ্যক বুলিয়ান চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য

n সংখ্যক বুলিয়ান চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য দুটি নিম্নরূপ—

1. $\overline{A_1 + A_2 + A_3 + \ldots\ldots\ldots\ldots + A_n} = \overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_3} \ldots\ldots\ldots\ldots \overline{A_n}$
2. $\overline{A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot \ldots\ldots\ldots\ldots A_n} = \overline{A_1} + \overline{A_2} + \overline{A_3} \ldots\ldots\ldots + \overline{A_n}$

লজিক ফাংশন সরলীকরণ

(Simplification of Logic Function)

লজিক্যাল ফাংশনগুলো লজিক গেটের মাধ্যমে কার্যকর করা হয়। তাই লজিক্যাল ফাংশনগুলো সরল হলে বাস্তবে লজিক গেটের ব্যবহার সহজতর হয়। বুলিয়ান সূত্রের সাহায্যে জটিল লজিক্যাল এক্সপ্রেশন বা যুক্তি রাশিমালাকে সরলীকরণ করা যায়। বুলিয়ান রাশিমালাকে সরলীকরণের ফলে সংশ্লিষ্ট লজিক গেটের সংখ্যা কম হয়, ফলে সময় এবং খরচ কমে।

বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে লজিক ফাংশন সরলীকরণ

বুলিয়ান উপপাদ্যের সাহায্যে লজিক ফাংশন সরলীকরণের ক্ষেত্রেও কতগুলো নিয়ম মেনে চলা হয়। নিয়মগুলো হলো–

১. সরলীকরণ বাম থেকে ডানদিকে শুরু করতে হয়।

২. প্রথম বন্ধনীর ভেতরের কাজ আগে করতে হয়।

৩. পূরক (NOT) অপারেশন থাকলে তার কাজ আগে করতে হয়।

৪. তারপর (AND) অর্থাৎ $(\cdot)$ অপারেশনের কাজ করতে হয়।

৫. এরপর (OR) অর্থাৎ + অপারেশনের কাজ করতে হয়।

উদাহরণ–১ :

$$F = (A+B)(A+C)$$
$$= AA + AC + AB + BC$$
$$= A + AC + AB + BC \quad [\because x.x = x]$$
$$= A(1 + C + B) + BC$$
$$= A(1 + B) + BC \quad [\because 1 + x = 1]$$
$$= A.1 + BC \quad [\because 1 + x = 1]$$
$$= A + BC$$

উদাহরণ–২ :

$$F = \overline{(A + B + \overline{C})}\,\overline{B}C$$
$$= \overline{A}.\overline{B}.\overline{\overline{C}}.\overline{B}C \quad [\because \overline{x+y+z} = \overline{x}.\overline{y}.\overline{z}]$$
$$= \overline{A}.\overline{B}.C.\overline{B}C \quad [\because \overline{\overline{x}} = x]$$
$$= \overline{A}(\overline{B}.\overline{B}).(C.C)$$
$$= \overline{A}\,\overline{B}C \quad [\because x.x = x]$$

উদাহরণ–৩ :

$$F = \overline{A}B + \overline{A}\,\overline{B} + AB$$
$$= \overline{A}(B + \overline{B}) + AB$$
$$= \overline{A}.1 + AB \quad [\because x + \overline{x} = 1]$$
$$= \overline{A} + AB$$
$$= \overline{A} + B \quad [\because x + \overline{x}y = x + y]$$

অগাস্টাস ডি মরগান ১৮০৬ সালে ভারতের মাদ্রাজ রাজ্যের মাদুরাই অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা কলোনেল অগাস্টাস ডি মরগান তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নানা পদে কর্মরত ছিলেন। আর তার মা ছিলেন জেমস্ ডডসনের কন্যা। এই জেমস ডডসন একটি এন্টি লগারিদম টেবিল গণনা সম্পাদন করেন যেটি ছিল আসলে নির্ভুল লগারিদমের বিপরীতে সঠিক সংখ্যাটি নির্ণয় পদ্ধতি। জন্মের এক বা দুই মাসের মাথায় অগাস্টাস ডি মরগানের একটি চোখ অন্ধ হয়ে যায়। অগাস্টাসের সাত মাস বয়সকালে তার পরিবারের সাথে ইংল্যান্ডে ফিরে যান। দশ বছর বয়সে ডি মরগ্যান পিতৃহারা হন। এরপর থেকে মিসেস ডি মরগ্যান ইংল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থানে বসবাস করতে থাকেন। ফলে তার পুত্র অগাস্টাস তার প্রাথমিক শিক্ষা এসব অঞ্চলেরই বিভিন্ন অখ্যাত স্কুলগুলোতে সম্পন্ন করে। কিন্তু তখনও তার গণিতপ্রতিভা ছিল সুপ্ত। তাদের এক পারিবারিক বন্ধু প্রথম ডি মরগ্যানের গণিত প্রতিভা আবিষ্কার করেন। ভদ্রমহিলা অগাস্টাসকে ইউক্লিডীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে একটি জটিল ফিগার রুলার এবং কম্পাসের সাহায্যে আঁকতে দেখে তার গাণিতিক জ্ঞানে বিস্মিত হন। অতঃপর তিনি অগাস্টাসের নিকট ইউক্লিডের গাণিতিক উদ্দেশ্যগুলো ব্যাখ্যা করেন এবং সেই সাথে তাকে ইউক্লিডীয় তত্ত্বে দীক্ষা প্রদান করে এ সম্পর্কে বিভিন্ন বিস্তারিত বিষয়গুলো তার নিকট বর্ণনা করেন। অগাস্টাস অক্সফোর্ডের ওরিয়েল কলেজের একজন ফেলো Mr. Parsons এর নিকট তার মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু অগাস্টাসকে তিনি গণিতের চেয়ে ক্ল্যাসিকাল বিষয়ে বেশি উৎসাহিত করেন। তার মা ছিলেন চার্চ অব ইংল্যান্ডের একজন সক্রিয় ও উৎসাহী সদস্যা। স্বভাবতই তিনি চাইতেন তার পুত্র হবে একজন যাজক কিন্তু ততদিনে ডি মরগান ভিন্নমতাশ্রয়ী হয়ে উঠেছেন। ১৮২৩ সালে অক্সফোর্ডের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হলেন অগাস্টাস। সেখানে তিনি George Peacock এবং William Whewell এর সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হন। পরবর্তীকালে এরা দু'জন তার আজীবনের বন্ধু হয়ে ওঠেন। পূর্বের গণিত বিষয়ক আগ্রহ থেকে তিনি বীজগণিত সংস্কারে উৎসাহী হয়ে ওঠেন এবং পরে তিনি একইভাবে যুক্তিবিদ্যার সংস্কারেও আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

উদাহরণ–৪ :

$$F = ABC + \bar{A}BC + A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C$$

$$= BC(A + \bar{A}) + \bar{B}C(A + \bar{A})$$

$$= BC + \bar{B}C \quad [\text{যেহেতু } A+A=1]$$

$$= C(B + \bar{B})$$

$$= C.1 = C$$

উদাহরণ–৫ :

$$F = AB\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + AB$$

$$= A\bar{C}(B + \bar{B}) + AB$$

$$= A\bar{C}.1 + AB \quad [\text{যেহেতু } \bar{x} + x = 1]$$

$$= A\bar{C} + AB \quad [\because x.1 = x]$$

উদাহরণ–৬ :

$$V = \overline{x + \bar{y}(z + \bar{x})}$$

$$= \bar{x} . \overline{\bar{y}(z + \bar{x})} \quad [\because \text{ডি মরগ্যানের সূত্রানুসারে}]$$

$$= \bar{x} . (\bar{\bar{y}} + \overline{(z + \bar{x})}) \quad [\because \text{ডি মরগ্যানের সূত্রানুসারে}]$$

$$= \bar{x} . (y + (\bar{z} . \bar{\bar{x}})) \quad [\because \bar{\bar{A}} = A]$$

$$= \bar{x} . (y + (\bar{z} . x))$$

$$= \bar{x}y + \bar{x} . \bar{z} . x = \bar{x}y + \bar{z} . x . \bar{x}$$

$$= \bar{x}y + \bar{z} . 0 \quad [\because A\bar{A} = 0]$$

$$= \bar{x}y + 0$$

লজিক গেইট (Logic Gate)

লজিক গেইট এক ধরনের ইলেক্ট্রনিক সার্কিট। বুলিয়ান অ্যালজেবরার গাণিতিক অপারেশনগুলোকে লজিক গেইটের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। **বুলিয়ান অ্যালজেবরার ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য যে গাণিতিক ইলেক্ট্রিক সার্কিট ব্যবহার করা হয় তাকে লজিক গেইট বলা হয়। লজিক গেইটের মধ্য দিয়ে এক বা একাধিক ইনপুট দিয়ে একটি আউটপুট পাওয়া যায়।** প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারে এ গেইটগুলো রিলে (Relay) যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি করা হতো। আধুনিক আইসি (ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট) প্রযুক্তিতে সব রকম ডিজিটাল গেইট আইসি হিসেবে তৈরি করা হয়।

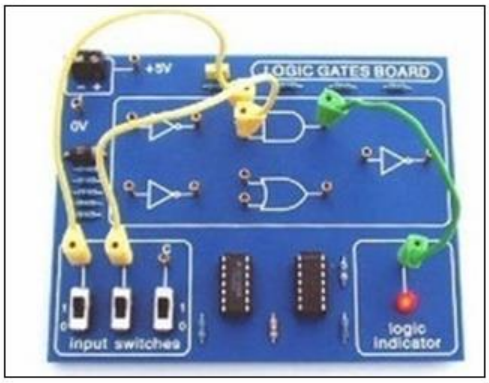

চিত্র : লজিক গেইট শেখার লজিক বোর্ড

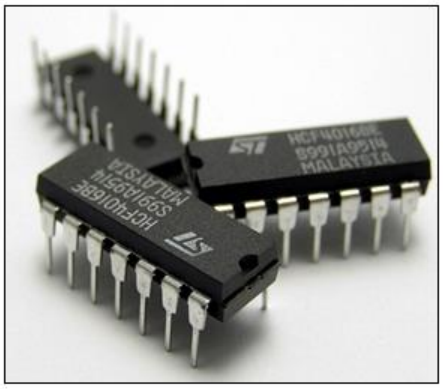

চিত্র : লজিক গেইট দিয়ে তৈরি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (আইসি)

লজিক গেইটের প্রকারভেদ (Types of Logic Gates)

বুলিয়ান অ্যালজেবরায় গাণিতিক অপারেশনগুলো সম্পাদন করা হয় মূলত তিনটি গাণিতিক অপারেশন দ্বারা। এগুলো হলো যোগ, গুণ ও পূরক। এছাড়া অন্য সব গাণিতিক অপারেশন সম্পাদন করা হয় উল্লিখিত তিনটি গাণিতিক অপারেশনের সমন্বয়ে। লজিক গেইটকে মূলত দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. মৌলিক গেইট ও
২. যৌগিক গেইট।

১. **মৌলিক গেইট (Basic Logic Gates) :** এ গেইটগুলো এককভাবে গাণিতিক অপারেশন সম্পাদন করতে পারে। তিন প্রকার মৌলিক গেইটগুলো হলো :

১. অর গেইট (OR Gate) : যৌক্তিক যোগের জন্য।
২. এন্ড গেইট (AND Gate) : যৌক্তিক গুণের জন্য।
৩. নট গেইট (NOT Gate) : যৌক্তিক পূরকের জন্য।

২. **যৌগিক গেইট (Compound Logic Gates) :** এ গেইটগুলো এক বা একাধিক মৌলিক গেইটের সমন্বয়ে তৈরি হয়। এগুলো হলো :

১. ন্যান্ড গেইট (NAND Gate) : AND গেইটের ও NOT গেইটের সমন্বয়ে তৈরি।
২. নর গেইট (NOR Gate) : OR গেইটের ও NOT গেইটের সমন্বয়ে তৈরি।
৩. এক্স–অর (X–OR Gate) : অর, এন্ড কিংবা নট গেইট দিয়ে এ গেইট তৈরি করা যায়
৪. এক্স–নর গেইট (X–NOR Gate) : এক্স-অর গেইটের সাথে NOT গেইট মিলিয়ে তৈরি হয়।

বিভিন্ন প্রকার গেইটের বিবরণ (Description of Different Gates)

নিচে তিন প্রকার মৌলিক গেইটের বর্ণনা দেয়া হলো।

অর গেইট (OR Gate)

এ গেইটে দুই বা দু'য়ের অধিক ইনপুট থাকে এবং আউটপুট থাকে একটি। যেকোন একটি ইনপুট সত্য (1) হওয়ার কারণে আউটপুট সত্য (1) হবে। এ গেইটে দুই বা ততোধিক সুইচ সমান্তরালে থাকে। চিত্রে অর গেইটের সমান্তরাল সুইচ সার্কিট দেখানো হয়েছে। এতে যেকোন একটি সুইচ অন (ON) হলে বাল্বটি প্রজ্জ্বলিত হয়। অর গেইটের বীজগাণিতীয় ফাংশন হলো $X = A + B$। যেখানে A ও B হলো OR গেইটের ইনপুট।

এখানে + (প্লাস) দিয়ে OR (অথবা) ক্রিয়া বুঝানো হয়েছে। A বা B যেকোন একটির মান 1 হলে আউটপুট $X = 1$ হবে।

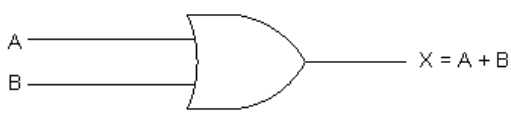

চিত্র ঃ অর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

সমীকরণ, $x = A \text{ OR } B = A+B$

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

চিত্র : সত্যক সারণি

আমরা বাল্বটির নিম্নবর্ণিত চারটি অবস্থা পরীক্ষা করে দেখি :

i. A ও B অফ থাকলে, X অফ থাকবে
ii. A অন ও B অফ থাকলে, X অন থাকবে
iii. A অফ ও B অন থাকলে, X অন থাকবে
iv. A অন ও B অন থাকলে, X অন থাকবে

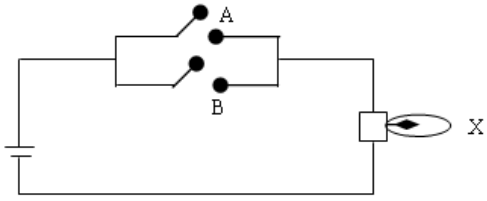

চিত্র : অর গেইটের সুইচিং সার্কিট

উপরে দু'টি ইনপুটের ক্ষেত্রে অর গেইটের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনটি ইনপুটের ক্ষেত্রে অর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন এবং সত্যক সারণি নিচের মতো হবে।

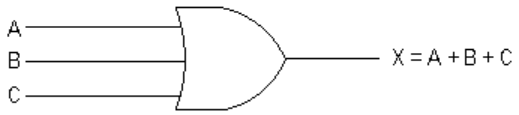

চিত্র : তিনটি ইনপুটের জন্য অর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

ইনপুট			আউটপুট
A	B	C	X = A + B + C
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

চিত্র : তিনটি ইনপুটের জন্য অর গেইটের সত্যক সারণি

এন্ড গেইট (AND Gate)

এ গেইটে দুই বা দু'য়ের অধিক ইনপুট এবং একটিমাত্র আউটপুট থাকে। যে কোন একটি ইনপুট মিথ্যা (0) হলে আউটপুট মিথ্যা (0) হবে। সবগুলো ইনপুট সত্য (1) হলে আউটপুট সত্য (1) হবে। যদি দু'টি ইনপুট A এবং B হয় তাহলে এর আউটপুট হবে, $X = A.B$। এক্ষেত্রে ইনপুট $A = 1$ এবং $B = 1$ হলে কেবল আউটপুট $X = 1$ হবে। চিত্রে এ্যান্ড গেইটের সুইচ সার্কিট দেখানো হয়েছে। উভয় সুইচ অন হলে বাল্বটি প্রজ্জ্বলিত হয়।

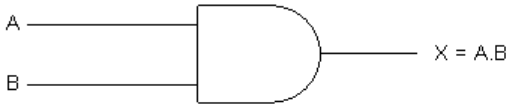

চিত্র ঃ এন্ড গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X = AB
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

চিত্র ঃ সত্যক সারণি

সমীকরণ, $x = A \text{ AND } B = A.B = AB$

নিম্নে বর্ণিত বাল্বটির চারটি অবস্থা হতে পারে ঃ

i. A ও B অফ থাকলে X অফ থাকবে
ii. A অন ও B অফ থাকলে X অফ থাকবে
iii. A অফ ও B অন থাকলে X অফ থাকবে
iv. A অন ও B অন থাকলে X অন থাকবে

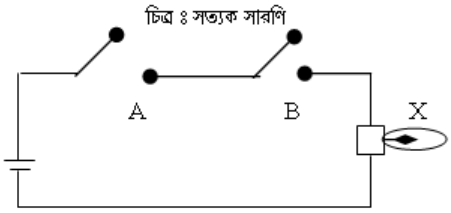

চিত্র ঃ এগইটের সুইচিং সার্কিট

তিনটি ইনপুট বিশিষ্ট এন্ড গেইটের আউটপুট $X = ABC$ হবে। এখানে A, B এবং C হলো গেইটটির ইনপুট সংকেত এবং X হলো আউটপুট সংকেত।

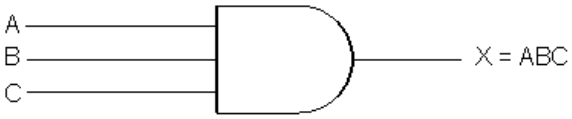

চিত্র ঃ তিনটি ইনপুটের জন্য এ্যান্ড গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

ইনপুট			আউটপুট
A	B	C	X = ABC
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

চিত্র : তিনটি ইনপুটের জন্য এ্যান্ড গেইটের সত্যক সারণি

নট গেইট (NOT Gate)

এ গেইটে একটি ইনপুট ও একটি আউটপুট থাকে। ইনপুটের বিপরীত হবে আউটপুট। সেজন্য এ গেইটকে ইনভার্টার (Inverter) বলা হয়। এ গেইটে ইনপুট সত্য হলে আউটপুট মিথ্যা, আর যদি ইনপুট মিথ্যা হয় তাহলে আউটপুট সত্য হয়। ইনপুট যদি A হয় তাহলে আউটপুট X = A (A এর উল্টো)। A = 0 হলে X = 1 এবং A = 1 হলে X = 0 হবে।

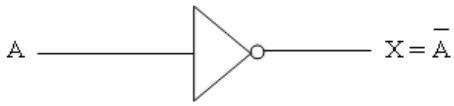

চিত্র ঃ নট গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

ইনপুট	আউটপুট
A	$X = \overline{A}$
0	1
1	0

চিত্র ঃ সত্যক সারণি

সমীকরণ, $x = NOT (A) = \overline{A}$

এছাড়াও বাফার গেইট নামের আর একটি গেইট আছে। তবে এর ইনপুট যা দেয়া হয় আউটপুটও তাই হয়। অনেক ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে এ গেইট ব্যবহার করা হয়।

ন্যান্ড গেইট (NAND Gate)

এ্যান্ড গেইট হতে নির্গত আউটপুট সংকেতকে নট গেইটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করলে ন্যান্ড গেইটের কাজ হয়।
অর্থাৎ, AND Gate + NOT Gate = NAND Gate

যদি A এবং B দু'টি ইনপুট হয়, তাহলে ন্যান্ড গেইট $X = \overline{A.B}$ অর্থাৎ এ্যান্ড গেইটের বিপরীত। এক্ষেত্রে একাধিক ইনপুট সত্য হলে আউটপুট মিথ্যা এবং ইনপুট মিথ্যা হলে আউটপুট সত্য হবে।

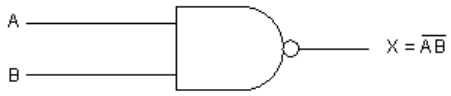

চিত্র : ন্যান্ড গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

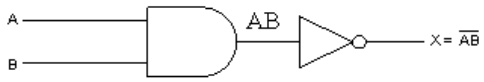

চিত্র : ন্যান্ড গেইটের সমকক্ষ বর্তনী

সমীকরণ, X = NOT (A AND B)

$= NOT (A . B) = NOT (AB) = \overline{AB}$

ইনপুট			আউটপুট
A	B	AB	$X = \overline{AB}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

চিত্র ঃ ন্যান্ড গেইটের সত্যক সারণি

i. A ও B অফ থাকলে X অন হবে। ii. A অন ও B অফ থাকলে X অন হবে।
iii. A অফ ও B অন থাকলে X অন হবে। iv. A অন ও B অন থাকলে X অফ হবে।

নর গেইট (NOR Gate)

অর গেইটের পর নট গেইট সংযুক্ত করলে নর গেইটের কাজ হয়। অর্থাৎ OR Gate + NOT Gate = NOR Gate। যদি A ও B দু'টি ইনপুট হয়, তাহলে নর গেইট $X = \overline{A + B}$ অর্থাৎ অর গেইটের বিপরীত।

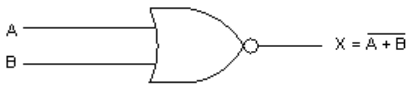

চিত্র : নর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

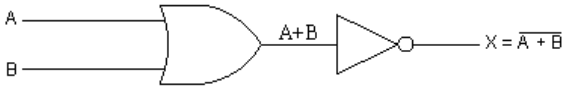

চিত্র : নর গেইটের সমকক্ষ বর্তনী

সমীকরণ, $X = NOT\ (A\ OR\ B)$

$= NOT\ (A + B)$

$= \overline{A + B}$

ইনপুট			আউটপুট
A	B	A+B	$X = \overline{A + B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

চিত্র : নর গেইটের এর সত্যক সারণি

এক্স-অর গেইট (X-OR Gate)

Exclusive OR গেইটকে সংক্ষেপে X-OR Gate বলা হয়। ইনপুট A এবং B হলে এ গেইটের আউটপুট X যে বুলিয় নিয়মটি মেনে চলে তা হলো $X = A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$ এখানে $\oplus$ চিহ্ন দ্বারা X-OR ক্রিয়া বুঝানো হয়েছে। এ গেইটটি বহুল ব্যবহৃত হয় বলে একে অন্যান্য মৌলিক গেইটের মতোই গুরুত্ব দেয়া হয়। অর, এ্যান্ড কিংবা নট গেইট দিয়ে এ গেইট তৈরি করা যায়, আবার এটি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (আইসি) বা একীভূত বর্তনী আকারেও পাওয়া যায়।

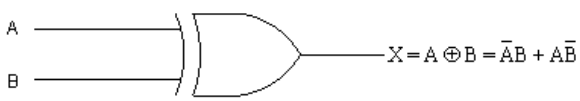

চিত্র : এক্স-অর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

চিত্র : এক্স-অর গেইটের সত্যক সারণি

উপরের সত্যক সারণি থেকে পাই যে,

$X = \bar{A}B + A\bar{B}$

মৌলিক গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন-

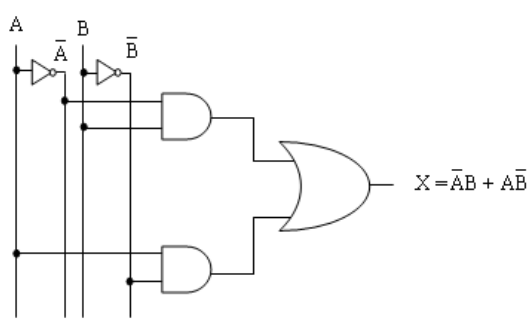

এক্স-নর গেইট (X-NOR Gate)

X-OR গেইটের সাথে NOT গেইটের সমন্বয়ে X-NOR গেইট গঠিত হয়। X-OR গেইটের আউটপুটকে NOT গেইটের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করলে X-NOR গেইট পাওয়া যায়। দু'টি ইনপুট A ও B হলে X-NOR গেইটের আউটপুট X-এর মান বুলিয় বীজগণিত অনুযায়ী হবে, $X = \overline{A \oplus B} = \overline{\bar{A}B + A\bar{B}} = \bar{A}\bar{B} + AB$

দু'টি ইনপুট বিশিষ্ট X-NOR গেটের জন্য ইনপুট দু'টি একই হলে আউটপুট একই হবে। নিচের সত্যক সারণিতে লক্ষ্য কর। অর্থাৎ X-OR Gate + NOT Gate = X-NOR Gate.

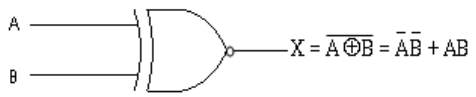

চিত্র : এক্স-নর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

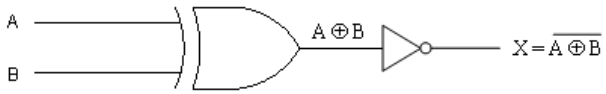

চিত্র : এক্স-নর গেইটের সমকক্ষ বর্তনী

ইনপুট			আউটপুট
A	B	$A \oplus B$	$X = \overline{A \oplus B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

চিত্র : এক্স-নর গেইটের সত্যক সারণি

সত্যক সারণি থেকে পাই যে, $X = \bar{A}\bar{B} + AB$

মৌলিক গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন–

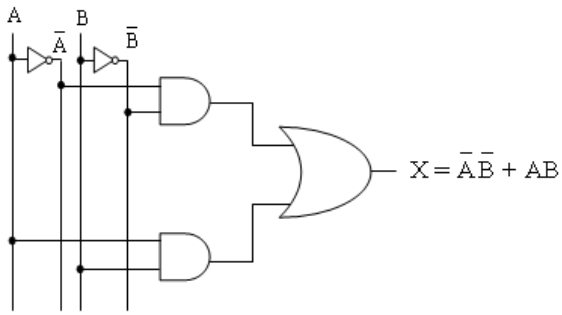

ন্যান্ড ও নর গেইটের সার্বজনীনতা

কোন গেইটের সার্বজনীনতা বলতে বোঝানো হয় ঐ গেইট দিয়ে তিনটি মৌলিক গেইটের প্রত্যেকটি তৈরি করা সম্ভব। আর মৌলিক তিনটি গেইট দিয়ে যেহেতু সকল যৌগিক গেইট তৈরি করা হয় তাই সকল গেইটই ঐ গেইট দিয়ে তৈরি করা সম্ভব। অর্থাৎ ঐ গেইট দিয়ে সার্বজনীনভাবে সকল বুলিয়ান ফাংশনের কাজ করা সম্ভব। অর, এ্যান্ড এবং নট-এ তিনটি মৌলিক গেইটের সমন্বয়ে যেকোন যুক্তিবর্তনী (Logic Circuit) তৈরি করা সম্ভব। আবার, শুধু ন্যান্ড গেইট দিয়েও যেকোন বর্তনী তৈরি করা সম্ভব। কারণ, ন্যান্ড গেইট দিয়ে অর, এ্যান্ড এবং নট গেইট বাস্তবায়ন সম্ভব। তেমনি নর গেইট দিয়েও যেকোন বর্তনী বাস্তবায়ন সম্ভব। এটি ন্যান্ড ও নর গেইটের সার্বজনীনতা নামে পরিচিত।

ন্যান্ড গেইটের সার্বজনীনতা/ন্যান্ড গেইট দিয়ে মৌলিক গেইট বাস্তবায়ন–

ন্যান্ড গেইট দিয়ে নট গেইট তৈরি :

নিচের চিত্রের ন্যায় সংযোগ দিলে ন্যান্ড গেইট নট গেইটের মতো কাজ করে। কারণ, এক্ষেত্রে ইনপুট দু'টি একই (A) হওয়ায় নট গেইট বাস্তবায়িত হয়েছে।

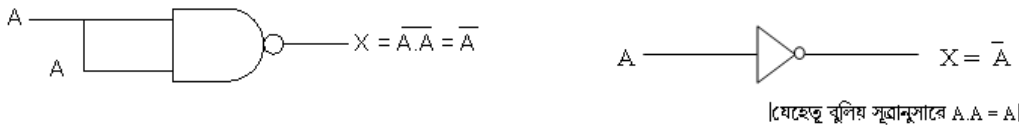

চিত্র : ন্যান্ড গেইট দিয়ে নট গেইট বাস্তবায়ন

ন্যান্ড গেইট দিয়ে অর গেইট তৈরি :

নিচের চিত্রের ন্যায় সংযোগ দিয়ে ন্যান্ড গেইটকে অর গেইটে বাস্তবায়ন করা যায়।

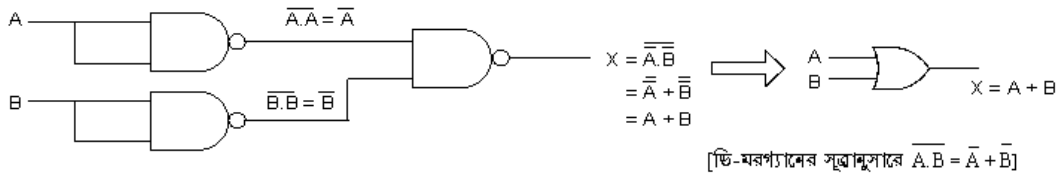

চিত্র : ন্যান্ড গেইট দিয়ে অর গেইট বাস্তবায়ন

ন্যান্ড গেইট দিয়ে এ্যান্ড গেইট তৈরি :

নিচের চিত্রের ন্যায় সংযোগ দিয়ে ন্যান্ড গেইটকে এ্যান্ড গেইটে বাস্তবায়ন করা যায়।

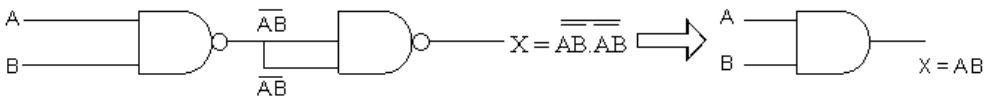

চিত্র : ন্যান্ড গেইট দিয়ে এ্যান্ড গেইট বাস্তবায়ন

$X = \overline{\overline{AB}.\overline{AB}} = \overline{\overline{AB}} = AB$

যেহেতু ন্যান্ড গেইট দ্বারা মৌলিক গেইট (নট, অর ও এ্যান্ড) বাস্তবায়ন করা যায়, সেহেতু ন্যান্ড গেইট একটি সার্বজনীন গেইট।

নর গেইটের সার্বজনীনতা/নর গেইট দিয়ে মৌলিক গেইট বাস্তবায়ন–

নর গেইট দিয়ে নট গেইট তৈরি :

নিচের চিত্রের মতো করে সংযোগ দিয়ে নর গেইটকে নট গেইটে বাস্তবায়ন করা যায়।

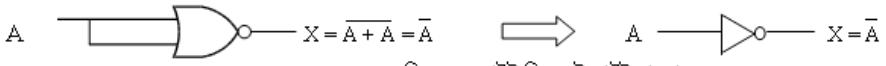

চিত্র : নর গেইট দিয়ে নট গেইট বাস্তবায়ন

দুটি ইনপুটই A হওয়ায় $X = A + A$, বুলিয় সূত্রানুসারে $A + A = A$। সুতরাং আউটপুট $X = \overline{A}$ অর্থাৎ অর গেইট দিয়ে নট গেইট তৈরি হয়েছে।

নর গেইট দিয়ে অর গেইট তৈরি :

নিচের চিত্রের মতো করে সংযোগ দিলে নর গেইট অর গেইট হিসেবে কাজ করবে।

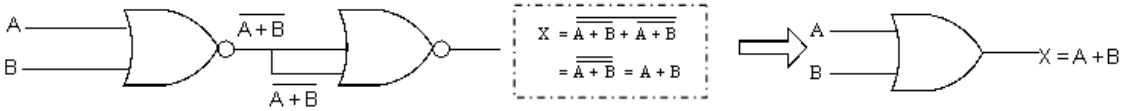

চিত্র : নর গেইট দিয়ে অর গেইট বাস্তবায়ন

নর গেইট দিয়ে এ্যান্ড গেইট তৈরি :

নিচের চিত্রের মতো করে সংযোগ দিয়ে নর গেইটকে অর গেইটে বাস্তবায়ন করা যায়।

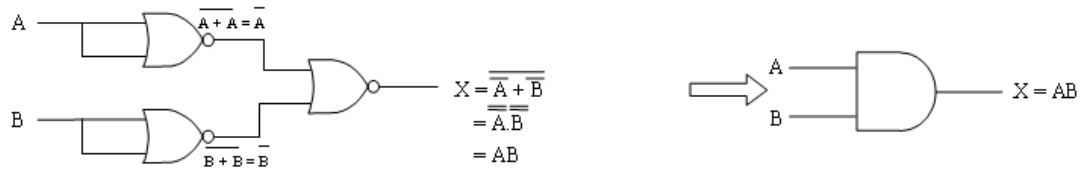

চিত্র : নর গেইট দিয়ে এ্যান্ড গেইট বাস্তবায়ন

যেহেতু নর গেইট দ্বারা মৌলিক গেইট (নট, অর ও এ্যান্ড) বাস্তবায়ন করা যায়, সেহেতু নর গেইট একটি সার্বজনীন গেইট।

শুধু NAND গেইট দ্বারা X–OR গেইটের বাস্তবায়ন–

$$\text{X-OR} = A \oplus B$$
$$= \overline{\overline{\overline{A}B + A\overline{B}}}$$
$$= \overline{\overline{\overline{A}B}\ \ \overline{A\overline{B}}}$$

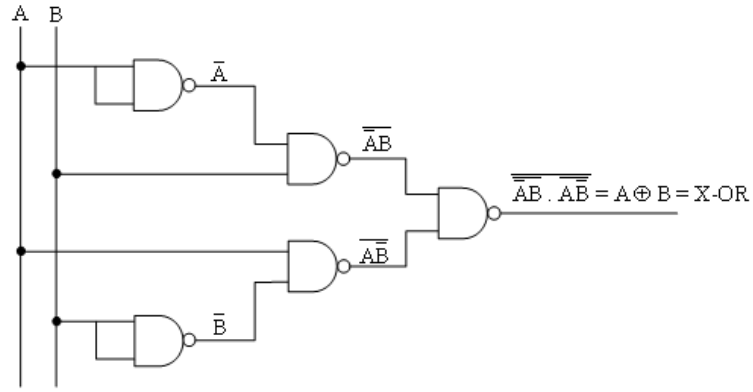

শুধু NAND গেইট দ্বারা X–NOR গেইটের বাস্তবায়ন–

$$\text{X-NOR} = \overline{A \oplus B}$$
$$= AB + \overline{A}\,\overline{B}$$
$$= \overline{\overline{AB + \overline{A}\,\overline{B}}}$$
$$= \overline{\overline{\overline{AB}}\ .\ \overline{\overline{A}\,\overline{B}}}$$
$$= \overline{AB + \overline{A}\,\overline{B}}$$
$$= \overline{A \oplus B}$$

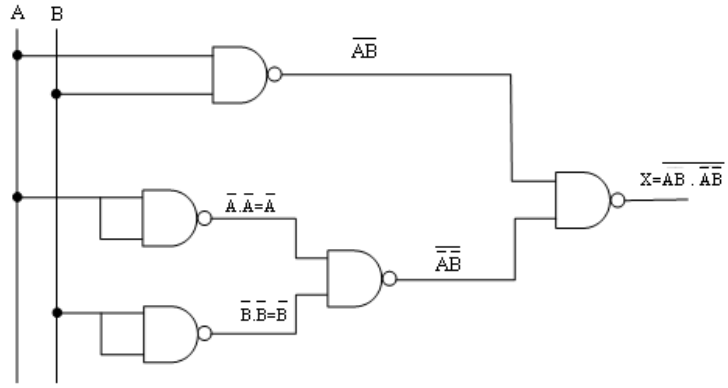

শুধু NOR গেইট দ্বারা X–OR গেইটের বাস্তবায়ন–

X-OR

$= A \oplus B$

$= \overline{A}B + A\overline{B}$

$= \overline{\overline{\overline{A}B}} + \overline{\overline{A\overline{B}}}$ $[A = \overline{\overline{A}}]$

$= \overline{\overline{A} + \overline{B}} + \overline{\overline{A} + \overline{\overline{B}}}$

$= \overline{A + \overline{B}} + \overline{\overline{A} + B}$

$= \overline{\overline{\overline{A + \overline{B}} + \overline{\overline{A} + B}}}$ $[A = \overline{\overline{A}}]$

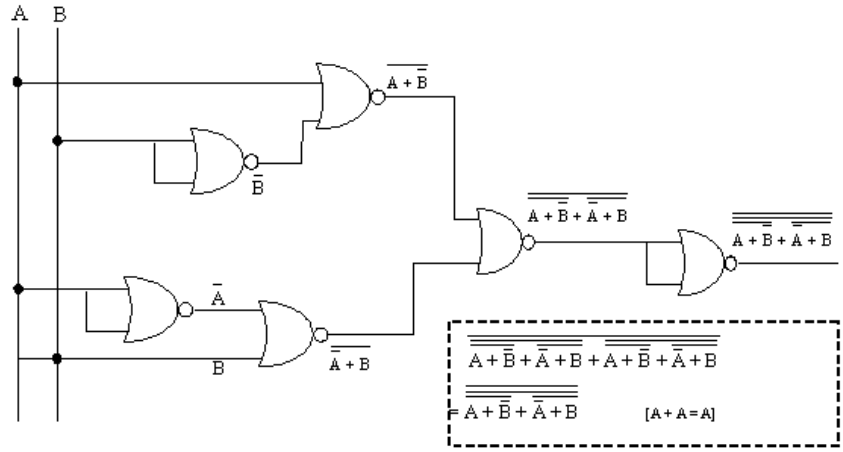

শুধু NOR গেইট দ্বারা X-NOR গেইটের বাস্তবায়ন–

X-NOR

$= \overline{A \oplus B}$

$= AB + \overline{A}\,\overline{B}$

$= \overline{\overline{AB}} + \overline{\overline{\overline{A}\,\overline{B}}}$

$= \overline{\overline{A} + \overline{B}} + \overline{\overline{\overline{A}} + \overline{\overline{B}}}$

$= \overline{\overline{A} + \overline{B}} + \overline{A + B}$

$= \overline{\overline{\overline{A} + \overline{B} + A + B}}$

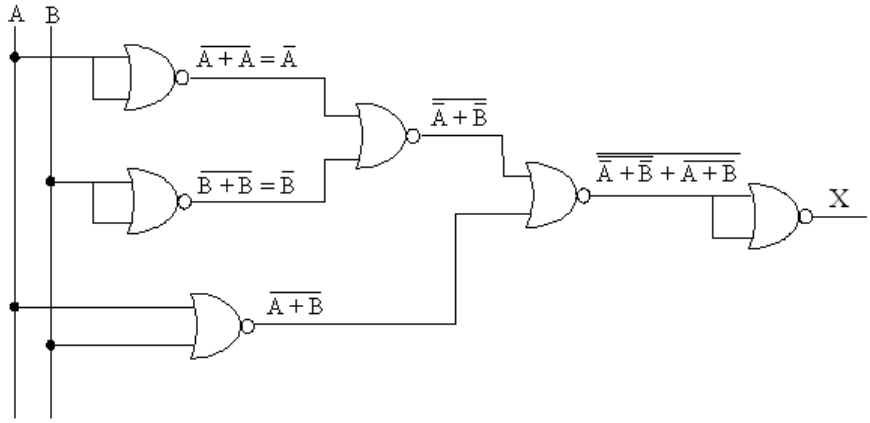

লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিটে রূপান্তর

১. লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিট আঁক।

$F = \bar{A}B + C + D\bar{C}$

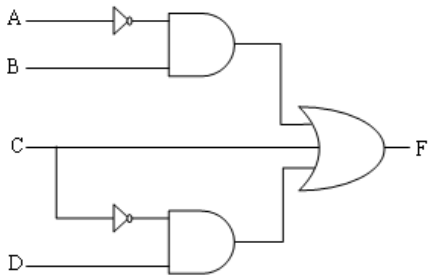

২. লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিট আঁক।

$F = \bar{A}B + A\bar{B}$

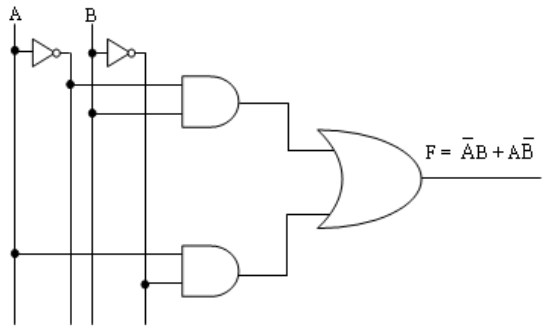

৩. লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিট আঁক।

$f = \bar{a} + bc$

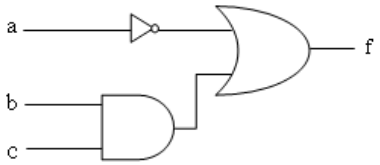

৪. লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিট আঁক।

$f = b\bar{c}$

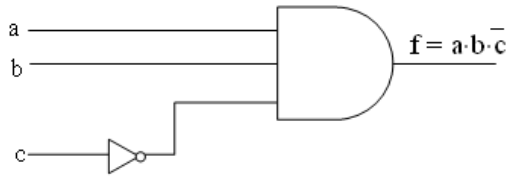

৫. লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিট আঁক।

$X = (\overline{A + B\bar{C}}) . \bar{B}C$

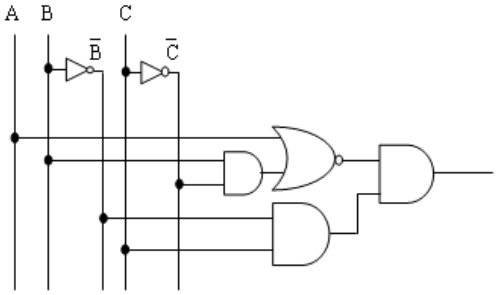

৬. লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিট আঁক।

$f = \bar{A}\cdot B\cdot C + A\cdot\bar{B}\cdot C + A\cdot B\cdot\bar{C}$

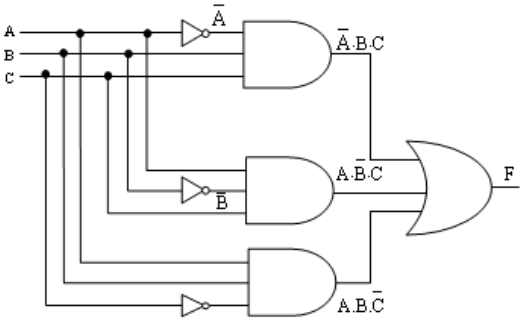

৮. লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিট আঁক।

$f = \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}bc + a\bar{b}$

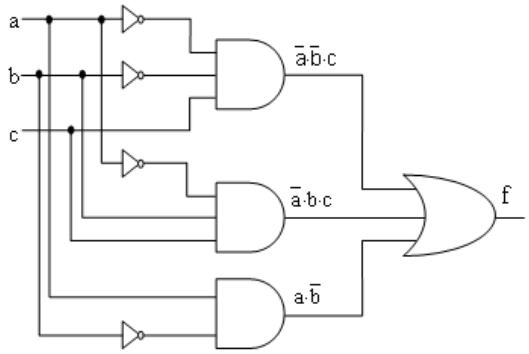

লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশনে রূপান্তর

১. নিচের লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশন লেখ।

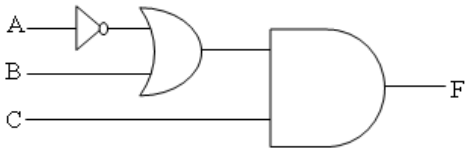

উত্তর ঃ $F = (\bar{A}+B).C$

২. লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশন লেখ।

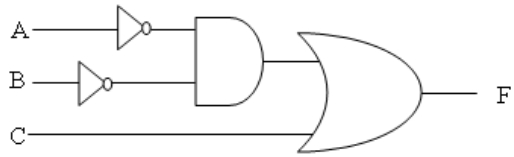

উত্তর ঃ $F = \bar{A}\bar{B} + C$

৩. নিচের লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশন লেখ।

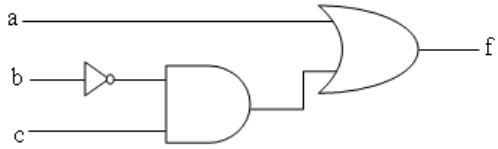

উত্তর ঃ $f = a + \bar{b}c$

৪. নিচের লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশন লেখ।

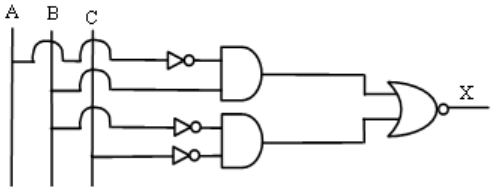

উত্তর ঃ $X = \overline{\bar{A}B + \bar{B}\bar{C}}$

৫. নিচের লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশন লেখ।

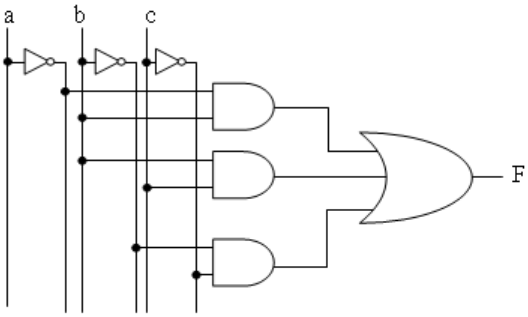

$F = \bar{a}b + bc + \bar{b}\,\bar{c}$

৬. লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশন লেখ।

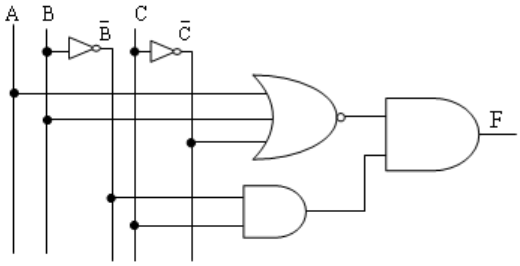

উত্তর ঃ $F = \overline{(A+B+\bar{C})}.\bar{B}\,C$

সমস্যা ও সমাধান

১. লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশন লেখ।

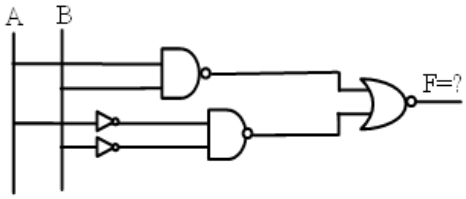

উত্তর ঃ $F = \overline{\overline{AB}+\overline{A\overline{B}}}$

২. X এর মান কত?

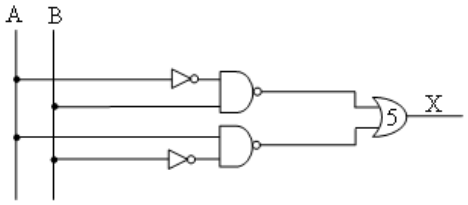

উত্তর ঃ $X = \overline{\overline{\bar{A}B} + \overline{A\bar{B}}}$

৩. X এর মান কত? বক্সে কোন গেইট যুক্ত করলে আউটপুট $Z = \overline{(\bar{A} + B)C + B + C}$ হবে ?

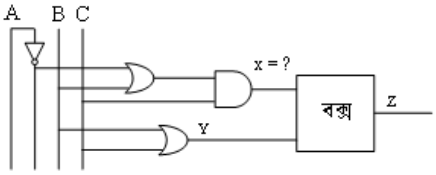

$X = (\bar{A} + B)\,C$

বক্সে NOR গেইট যুক্ত করলে আউটপুট–

$Z = \overline{(\bar{A} + B)C + B + C}$ হবে।

৪. নিচের লজিক চিত্রটির জন্য সরলীকৃত লজিক চিত্র আঁক।

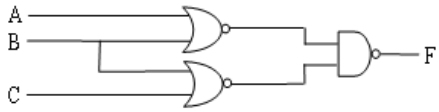

এক্ষেত্রে–

$F = \overline{(A+B)\,\overline{(B+C)}} = \overline{\overline{A+B}} + \overline{\overline{B+C}}$

$= A + B + B + C = A + B + C \quad [\because A + A = A]$

সুতরাং সরলীকৃত লজিক চিত্রটি হবে–

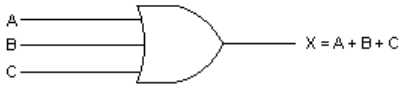

৫. Y =? R চিহ্নিত গেইটের পরিবর্তে কোন গেইট বসালে Y = A + B হবে?

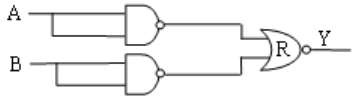

$Y = \overline{\overline{A.A} + \overline{B.B}} = \overline{\bar{A} + \bar{B}} = \bar{\bar{A}}.\bar{\bar{B}} = AB$

R চিহ্নিত গেইটের পরিবর্তে NAND গেইট বসালে-

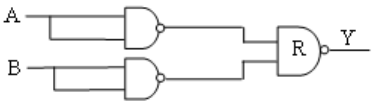

উপরোক্ত ক্ষেত্রে-

$Y = \overline{\overline{A.A}.\overline{B\,B}} = \overline{\bar{A}.\bar{B}} = \bar{\bar{A}} + \bar{\bar{B}} = A + B$

সুতরাং R চিহ্নিত গেইটের পরিবর্তে NAND গেইট বসালে $Y = A + B$ হবে।

৬. Y =? AND গেইটগুলোকে NAND গেইটদ্বারা প্রতিস্থাপন করলে Y এর কি মান পাওয়া যাবে?

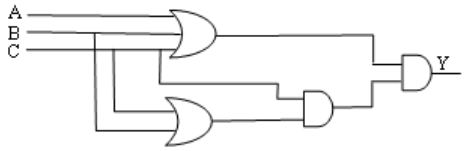

$Y = C\,(B+C)\,(A+B+C)$

AND গেইটগুলোকে NAND গেইটদ্বারা প্রতিস্থাপন করলে সার্কিটটি হবে নিম্নরূপ–

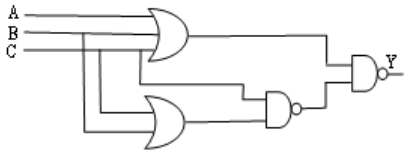

এক্ষেত্রে- Y এর মান হবে-

$Y = \overline{(A + B + C)\,\overline{C\,(B + C)}}$

৭. নিচের সার্কিট থেকে Y এর মান বের কর এবং মানকে NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন কর।

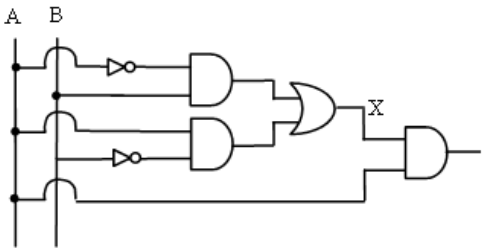

$Y = (\bar{A}B + A\bar{B})A$

$= A\bar{A}B + AA\bar{B}$

$= 0.B + A\bar{B}$ [$\because P.\bar{P} = 0, P.P = P$]

$= A\bar{B}$

শুধুমাত্র NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$Y = A\bar{B} = \overline{\overline{A\bar{B}}}$

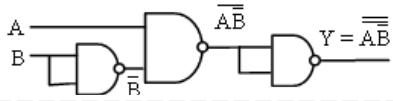

৯. "শুধু NAND গেইট দ্বারা প্রাপ্ত সমীকরণ বাস্তবায়ন সম্ভব"— সমীকরণটি হলো : $F = \bar{x}y + x\bar{y} + xy$

$F = \bar{x}y + x\bar{y} + xy$

$= \overline{\overline{\bar{x}y + x\bar{y} + xy}}$

$= \overline{\overline{\bar{x}y}\ \overline{x\bar{y}}\ \overline{xy}}$

NAND গেইট দ্বারা F এর প্রাপ্ত সমীকরণ বাস্তবায়ন :

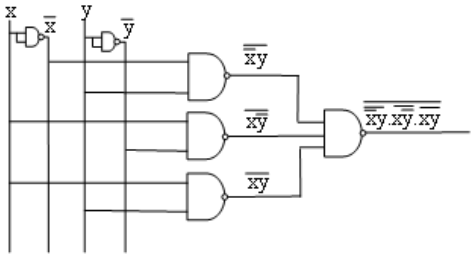

সুতরাং, উক্তিটির সত্যতা যাচাই করা হলো।

৮. নিচের সার্কিটের ৩, ৪ ও ৫ নং গেইটে কী পরিবর্তন করলে Y এর মান X-NOR গেইটের আউটপুটের সমতুল্য হবে?

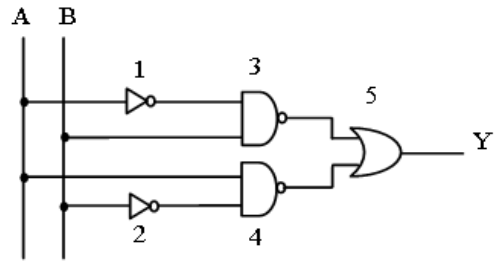

XNOR গেইটের দুইটি ইনপুট A, B এবং আউটপুট Y হলে—

$Y = \overline{A \oplus B} = \overline{\bar{A}B + A\bar{B}}$

সার্কিটটির ৩, ৪ ও ৫নং গেইটের আউটপুট যথাক্রমে $\overline{\bar{A}B}$, $\overline{A\bar{B}}$ এবং $\overline{\bar{A}B} + \overline{A\bar{B}}$ ।

XNOR গেইট বাস্তবায়নের জন্য ৩, ৪ ও ৫নং গেইটের আউটপুট যথাক্রমে $\bar{A}B$, $A\bar{B}$ ও $\overline{\bar{A}B + A\bar{B}}$ হওয়া প্রয়োজন। একারণে ৩ ও ৪নং এ NAND গেইটের পরিবর্তে দুইটি AND গেইট এবং ৫নং OR গেইটের পরিবর্তে NOR গেইট ব্যবহার করতে হবে।

Y এর মান XNOR গেইটের আউটপুটের সমতুল্য হওয়ার পরিবর্তিত সার্কিট হলো—

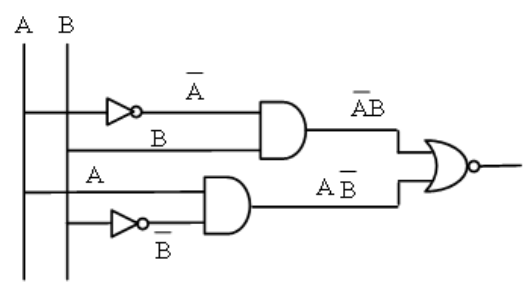

১০. নিচের সার্কিটিতে P ও Q কে ইনপুট হিসাবে ব্যবহার করে A.B আউটপুট পেতে হলে কী ব্যবস্থা নিতে হবে?

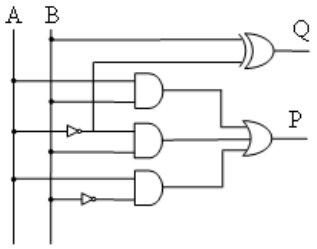

এখানে,

$$P = AB + \bar{A}B + A\bar{B}$$
$$= B(A + \bar{A}) + A\bar{B}$$
$$= B.1 + A\bar{B} = B + A\bar{B}$$
$$= (B + A)(B + \bar{B})$$
$$= (A + B).1$$
$$= A + B$$

AB একটি AND গেইটকে নির্দিষ্ট করে।

$P = A + B$

$Q = \bar{A} \oplus B$

এ ক্ষেত্রে, $Y = PQ$

$$= (A+B)(\bar{A} \oplus B)$$
$$= (A+B)(\bar{\bar{A}}B + A\bar{B})$$
$$= (A + B)(AB + \bar{A}B)$$
$$= AAB + A\bar{A}\bar{B} + BAB + B\bar{A}\bar{B}$$
$$= AB + 0 + AB + 0$$
$$= AB$$

অতএব, P ও Q কে ইনপুট হিসেবে বিবেচনা করে AND গেইটের মধ্যদিয়ে চালনা করলে আউটপুট AB পাওয়া যায়।

১১. নিচের সার্কিটিতে কী ধরনের পরিবর্তন আনলে আউটপুট $F = A + A\bar{B}$ পাওয়া যাবে?

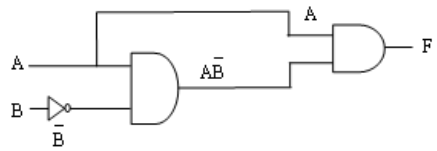

সমীকরণ অনুযায়ী লজিক সার্কিট

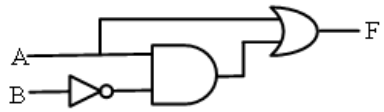

$F = A + A\bar{B}$ সমীকরণটি সরলীকরণ করে যে সমীকরণ পাওয়া গেল তার লজিক সার্কিট অংকন করে দেখা গেল যে, সার্কিটটির দ্বিতীয় AND গেইটের পরিবর্তে OR গেইট ব্যবহার করলে সমীকরণটি $F = A + A\bar{B}$ পাওয়া যায়।

১২. F =? OR গেইটের পরিবর্তে কোন গেইট স্থাপন করলে X-NOR গেইট পাওয়া যাবে?

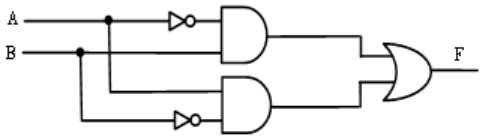

$F = \bar{A}B + A\bar{B}$

OR গেইটের পরিবর্তে NOR গেইট স্থাপন করলে সার্কিটটি হবে-

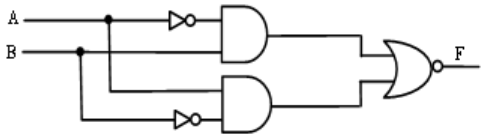

এক্ষেত্রে-

$F = \overline{\bar{A}B + A\bar{B}} = (\overline{\bar{A}B}) . (\overline{A\bar{B}})$ $[\because \overline{A+B} = \bar{A}\,\bar{B}]$

$= (\bar{\bar{A}} + \bar{B})(\bar{A} + \bar{\bar{B}})$ $[\because \overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}]$

$= (A + \bar{B})\ (\bar{A} + B)$

$= A\bar{A} + AB + \bar{A}\bar{B} + B\bar{B}$ $[\because A.\bar{A} = 0]$

$= 0 + AB + \bar{A}\bar{B} + 0$

$= 0 + AB + AB + 0$

$= AB + \bar{A}\bar{B}$

$= \overline{A \oplus B}$

যা X-NOR গেইটের সমীকরণ
সুতরাং OR গেইটের পরিবর্তে NOR গেইট স্থাপন করলে X-NOR গেইট পাওয়া যাবে।

১৩. Y এর মান কত? Y এর মান $\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$ পেতে হলে NOR গেইটের পরিবর্তে কোন গেইট ব্যবহার করতে পারি?

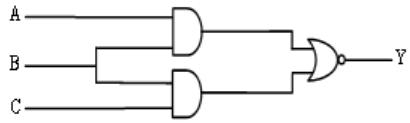

$Y = \overline{AB + BC}$

NOR গেইটের পরিবর্তে NAND গেইট ব্যবহার করলে সার্কিটটি হবে নিম্নরূপ-

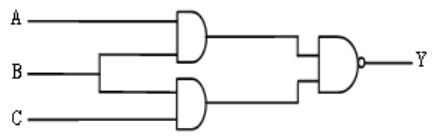

এক্ষেত্রে-

$Y = \overline{AB . BC}$

$= \overline{ABC}$

$= \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$

সুতরাং, Y এর মান $\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$ পেতে হলে NOR গেইটের পরিবর্তে NAND গেইট ব্যবহার করতে হবে।

ডিজিটাল ডিভাইস (Digital Device)

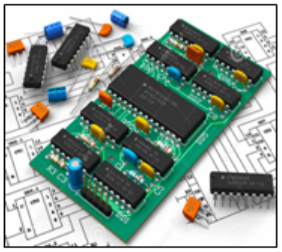

ডিভাইস অর্থ যন্ত্রপাতি। ডিজিটাল সার্কিট দিয়ে তৈরি যন্ত্রপাতিকে ডিজিটাল ডিভাইস বলা হয়। বুলিয়ান অ্যালজেবরার নিয়মানুসারে ডিজিটাল লজিক গেইট তৈরি করা হয়। বিভিন্ন ডিজিটাল লজিক গেইট দিয়ে তৈরি করা হয় ডিজিটাল সার্কিট। আর এই ডিজিটাল সার্কিট দিয়ে তৈরি করা হয় বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি। এসব যন্ত্রপাতিকে ডিজিটাল ডিভাইস বলা হয়। কম্পিউটার যন্ত্রপাতি, মোবাইল ফোন, ডিজিটাল ক্যামেরা এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরসহ যাবতীয় ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি ডিজিটাল ডিভাইসের অন্তর্ভুক্ত। যে ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র তথ্য জমা রাখে এবং প্রয়োজনমতো ডিজিটাল ফাইল হিসাবে প্রদর্শন করে তাকে ডিজিটাল ডিভাইস বলা হয়। যেমন- এনকোডার, ডিকোডার, অ্যাডার, রেজিস্টার ইত্যাদি।

ডিকোডার (Decoder)

ডিকোডার এমন একটি লজিক সার্কিট, যা কোন কোড (Code)-কে ডিকোড (Decode) করতে পারে। এটি কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করে। ডিকোডার ইনপুট সংখ্যা n হলে তার আউটপুট সংখ্যা 2^n হবে। ধরা যাক, কোন একটি কোড তিন বিটের। সেক্ষেত্রে তিনটি বিট দিয়ে সর্বাধিক আটটি কোড করা যাবে, যেহেতু তিনটি বিট দিয়ে আটটি বাইনারি নাম্বার লেখা যাবে। ধরা যাক, শূন্য (0)-এর জন্য কোড '000', 1 (এক) এর জন্য কোড '001' ইত্যাদি। নিচের ছকে অবশিষ্ট কোডগুলো দেখানো হলো।

কোড (Code)			Decoded Output
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	2
0	1	1	3
1	0	0	4
1	0	1	5
1	1	0	6
1	1	1	7

ডিকোডারে ৩ বিটের ইনপুট দিলে তার জন্য ৮ বিটের আউটপুট লাইনের যেকোন একটি Active হবে। কোন আউটপুট Active হওয়া মানে হচ্ছে সেই লাইনে '1' আসা। ডিকোডারে কোন একটি ইনপুট কম্বিনেশনের জন্য শুধু একটি আউটপুট লাইনে '1' এবং অবশিষ্ট সবগুলো লাইনে '0' হবে। যে আউটপুট লাইনে '1' আসবে, সেটিই হচ্ছে ইনপুট কোডের ডিকোডেড আউটপুট। একইভাবে 4 বিটের ইনপুট হলে তা দিয়ে সর্বাধিক 16 টি কোড করা যায় এবং তার জন্য আউটপুট লাইন লাগবে 16 টি। সাধারণভাবে এটিতে n সংখ্যক ইনপুট বিটের জন্য 2^n সংখ্যক আউটপুট লাইন থাকে। একটি ইনপুট কম্বিনেশনের জন্য শুধু একটিই Output লাইন Active হবে, যা ডিকোডেড আউটপুট।

ডিকোডার সার্কিটগুলো সাধারণত আউটপুট ডিভাইসের সাথে লাগানো থাকে। কম্পিউটারের আউটপুট ইউনিটে কোড ভাষায় লেখা তথ্যকে সাধারণ আকারে প্রকাশ করার জন্যই ডিকোডার ব্যবহৃত হয়।

কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষা → ডিকোডার → মানুষের বোধগম্য ভাষা

2 To 4 ডিকোডার

2 To 4 ডিকোডারে দুটি ইনপুট লাইন থেকে চারটি আউটপুট লাইনের যে কোন একটিতে ১ পাওয়া যায়। আউটপুট লাইনের যে কোন একটিতে ১ ও বাকি সবকটিতে ০ আউটপুট পাওয়া যায়। তবে কোন আউটপুট লাইনে ১ হবে তা নির্ভর করে ইনপুটগুলোর মানের উপর। নিচে একটি 2 To 4 সিঙ্গেল বিট ডিকোডারের ব্লক চিত্র এবং সত্যক সারণি দেয়া হলো।

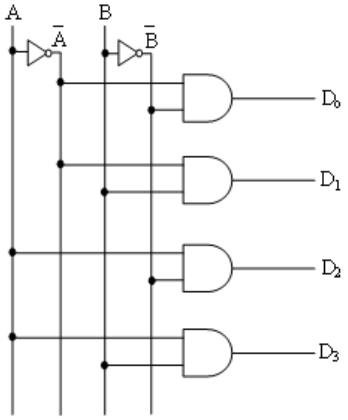

চিত্র : 2 to 4 line Decoder এর লজিক ডায়াগ্রাম

A	B	D_0	D_1	D_2	D_3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

Minterm Equation :

$D_0 = \bar{A}\bar{B}$

$D_1 = \bar{A}.B$

$D_2 = A\bar{B}$

$D_3 = A.B$

3 To 8 ডিকোডার

নিচে 3 To 8 Line ডিকোডারের ব্লক চিত্র এবং সত্যক সারণি দেয়া হলো।

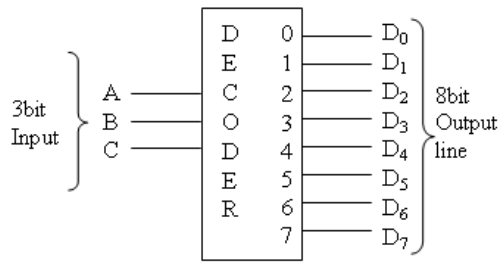

ব্লক চিত্র

Code			Decode Output							
A	B	C	D_0	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

3 to 8 line Decoder Truth table

চিত্রে Output line গুলোর নাম যথাক্রমে D_0, D_1, D_2..... D_7 এবং এদের নম্বর যথাক্রমে 0, 1, 2,.....7 ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রতিটি আউটপুট লাইন একটি করে দশমিক সংখ্যাকে নির্দেশ করে। আমরা দেখেছি A,B,C এর কম্বিনেশন বাইনারি সংখ্যা নির্দেশ করে। সুতরাং, এ সার্কিটটি বাইনারি কোডকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরিত বা Decode করে।

গঠন : একটি ডিকোডারের ভেতরে আসলে কিছু লজিক গেটের কম্বিনেশন থাকে। উপরের 'Truth Table' থেকে আমরা দেখতে পাই D_0 লাইন তখনই Active হবে যদি A, B, C-এর প্রত্যেকেই '0' হয়। অর্থাৎ $D_0 = \bar{A}.\bar{B}.\bar{C}$. একইভাবে D_3 line Active হবে যদি A = 0 এবং B ও C এর প্রত্যেকে '1' হয় অর্থাৎ $D_3 = \bar{A}.B.C$। নিচে প্রতিটি Output line-এর Boolean Expression দেয়া হলো।

$D_0 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}$ $\quad$ $D_1 = \bar{A}\bar{B}C$

$D_2 = \bar{A}B\bar{C}$ $\quad$ $D_3 = \bar{A}BC$

$D_4 = A\bar{B}\bar{C}$ $\quad$ $D_5 = A\bar{B}C$

$D_6 = AB\bar{C}$ $\quad$ $D_7 = ABC$

উদাহরণ : একটি ডিকোডারের ইনপুট 9 টি হলে আউটপুট কত?
উত্তর : যেহেতু ডিকোডারে ইনপুট সংখ্যা n হলে তার আউটপুট সংখ্যা 2^n হবে। তাই ডিকোডারে n সংখ্যক ইনপুট হতে 2^n সংখ্যক আউটপুটে পরিণত করে।
অতএব, ইনপুট = $2^9 = 512$। সুতরাং আউটপুট = 512 টি

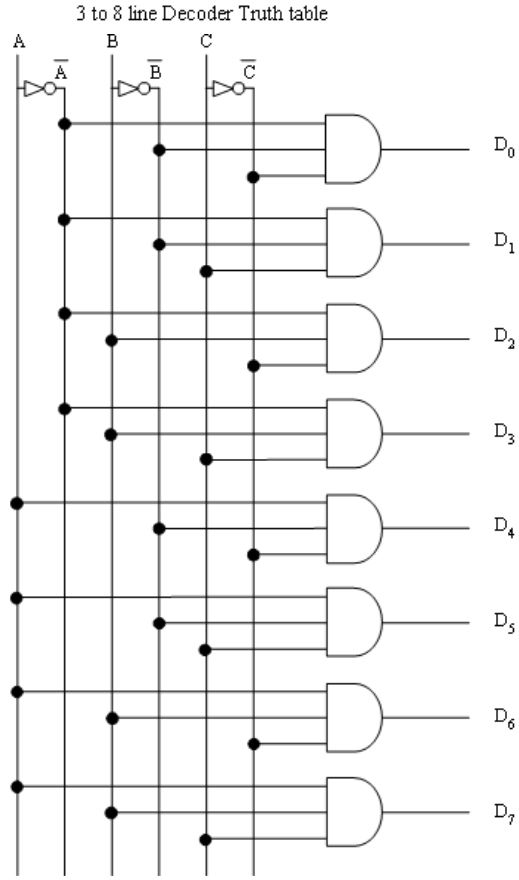

চিত্র : 3 to 8 line Decoder এর লজিক ডায়াগ্রাম

ডিকোডারের ব্যবহার (Application of Decoder)

ডিকোডার একটি বহুল ব্যবহৃত ইলেক্ট্রনিক সার্কিট। এটি যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তা হলো–

- ইলেক্ট্রনিক্স বর্তনীতে মনিটরে প্রদর্শনের জন্য ভিডিও কার্ডে ডিকোডার বর্তনী ব্যবহৃত হয়।
- বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা
- ASCII ও EBCDIC কোডকে আলফানিউমেরিক কোডে রূপান্তর করা।
- বিভিন্ন কোডে লিখিত সংখ্যাকে আমাদের বোধগম্য দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা।

একক কাজ : ডিকোডারের ব্যবহার সম্পর্কে লিখ।

এনকোডার (Encoder)

এনকোডার হচ্ছে এমন এক ধরনের লজিক সার্কিট, যা আমাদের ভাষাকে কম্পিউটারের বোধগম্য যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তর করে। এটি একটি এমন সমবায় সার্কিট যার 2^n ইনপুটের জন্য সর্বাধিক nটি আউটপুট পাওয়া যায়। এনকোডার যে কোন আলফানিউমেরিক ও নিউমেরিক বর্ণকে অ্যাসকি, এবসিডিক, বিসিডি ইত্যাদি কোডে পরিণত করে। এজন্য ইনপুট ব্যবস্থায় কী বোর্ডের সাথে এনকোডার যুক্ত থাকে। এটি ডিকোডারের ঠিক উল্টো। ডিকোডারের ইনপুট লাইনগুলোকে আউটপুট এবং আউটপুট লাইনগুলোকে ইনপুট হিসেবে কল্পনা করলে যে সার্কিটটি পাওয়া যাবে তাই এনকোডার। অর্থাৎ একই সময়ে একটিমাত্র ইনপুট সংকেত কার্যকর ধরা হয় এবং আউটপুটে কার্যকর ইনপুটের জন্য বাইনারি কোড তৈরি করে।

মানুষের ভাষা → এনকোডার → কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষা

কোনো এনকোডারে ৮টি ইনপুট সংকেত থেকে ৩টি আউটপুট সংকেত পাওয়া গেলে তবে অকটাল সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করা যায়। এ ধরনের এনকোডারকে অকটাল থেকে বাইনারি এনকোডার বলে। নিচে ৮টি ইনপুট থেকে ৩টি আউটপুট পাওয়া যায় এমন ধরনের একটি অকটাল এনকোডারের ব্লক চিত্র, সত্যক সারণি, বুলিয়ান সমীকরণ ও লজিক সার্কিট দেয়া হলো :

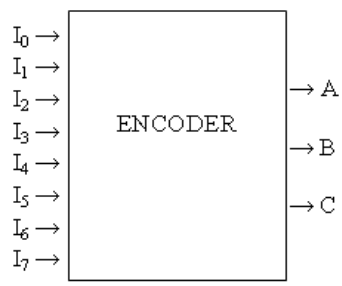

চিত্র : ৮ টু ৩ লাইন অকটাল এনকোডার

সত্যক সারণি : I → ইনপুট সংকেত

ইনপুট সংকেত								আউটপুট সংকেত		
I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	A	B	C
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

বুলিয়ান সমীকরণ :

$A = I_4 + I_5 + I_6 + I_7$
$B = I_2 + I_3 + I_6 + I_7$
$C = I_1 + I_3 + I_5 + I_7$

যুক্ত বর্তনী :

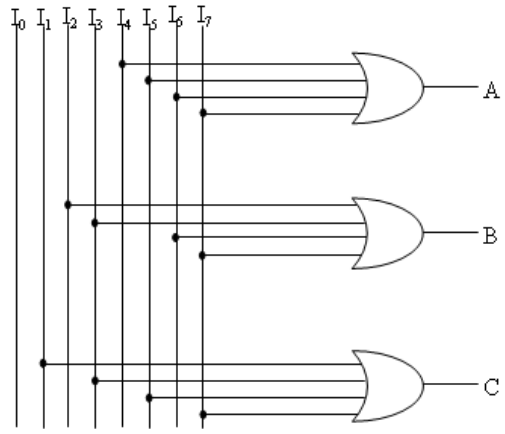

উদাহরণ : একটি এনকোডারের ইনপুট 1024 হলে আউটপুট কত?
উত্তর : যেহেতু এনকোডারে 2^n সংখ্যক ইনপুট এবং n-সংখ্যক আউটপুট লাইন থাকে, তাই এনকোডারে 2^n সংখ্যক ইনপুট হতে n সংখ্যক আউটপুটে পরিণত করে।
অতএব, ইনপুট = $1024=2^{10}$ ।
সুতরাং আউটপুট = 10

ডিকোডার এবং এনকোডারের মধ্যকার পার্থক্য

ডিকোডার	এনকোডার
১. ডিকোডার এমন একটি লজিক সার্কিট, যা কোন কোডকে ডিকোড করে।	১. এনকোডার ডিকোডারের বিপরীত কাজ করে।
২. এটি আউটপুট ইউনিটের সাথে যুক্ত থাকে।	২. এটি ইনপুট ইউনিটের (কীবোর্ডের) সাথে যুক্ত থাকে।
৩. এর সাহায্যে n-টি ইনপুট থেকে সর্বাধিক 2^n টি আউটপুট লাইনের একটিতে 1 ও বাকি সব কয়টিতে 0 আউটপুট পাওয়া যায়।	৩. সর্বাধিক 2^n টি ইনপুট থেকে n-টি আউটপুট লাইনে 1 বা 0 আউটপুট পাওয়া যায়।
৪. ডিকোডারের সাহায্যে কোড ভাষায় লেখাকে সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করা হয়।	৪. আলফানিউমেরিক বর্ণকে অ্যাসকি, এবসিডিক ইত্যাদি কোডে রূপান্তর করে।

ফ্লিপ-ফ্লপ (Flip-Flop)

মেমরি ডিভাইসের ক্ষুদ্রতম একক হল ফ্লিপ-ফ্লপ গেইট। এটি একটিমাত্র বিট ধারণ করতে পারে। এরূপ অসংখ্য ফ্লিপ-ফ্লপ এর সমন্বয়ে তৈরি হয় ইলেক্ট্রনিক মেমোরি ডিভাইস। ফ্লিপ-ফ্লপকে ল্যাচ (Latch) অথবা বাইস্ট্যাবল মাল্টিভাইব্রেটর (Bistable Multi-vibrator)ও বলা হয়। ফ্লিপ-ফ্লপের দু'টি Output থাকে। একটি অপরটির বিপরীত হয়। অর্থাৎ, একটি আউটপুট Q হলে অন্যটি হবে $\bar{Q}$ । ফ্লিপ-ফ্লপকে মেমোরির ক্ষুদ্রতম একক বলা হয়।

ফ্লিপ-ফ্লপের ব্যবহার :
১. মেমোরি উপাদান হিসেবে ফ্লিপ-ফ্লপ ব্যবহার করা হয়।
২. কাউন্টার, রেজিস্টার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৩. ডেটা ট্রান্সফারে ব্যবহৃত হয়।

ফ্লিপ-ফ্লপের প্রকারভেদ : ফ্লিপ-ফ্লপ সাধারণত চার প্রকার। যথা–SR, D, JK ও T ফ্লিপ-ফ্লপ।

SR ফ্লিপ-ফ্লপ : সবচেয়ে সরল ফ্লিপ-ফ্লপ হলো SR(SET-RESET) ফ্লিপ-ফ্লপ। দু'টি ন্যান্ড (NAND) গেইট অথবা দু'টি নর (NOR) গেইট এমনভাবে যুক্ত থাকে যে একটির আউটপুট (Output) অন্যটির ইনপুটের সাথে (Feedback) সংযুক্ত থাকে অর্থাৎ ক্রস কাপলড্ (Cross Coupled) ভাবে যুক্ত থাকে, একে SR ল্যাচ (Lach)–ও বলা হয়। SR ফ্লিপ-ফ্লপে আউটপুট অবস্থাকে '1' বা HIGH করাকে সেট (SET) এবং '0' বা Low করাকে রিসেট (RESET) বলা হয়।

ন্যান্ড ল্যাচ (Nand Latch) : দু'টি ন্যান্ড (Nand) গেইটকে ক্রস কাপলড্ (Cross Coupled) করে ন্যান্ড ল্যাচ (SR ফ্লিপ-ফ্লপ) তৈরি করা হয়। চিত্রে ন্যান্ড ল্যাচ দেখানো হলো।

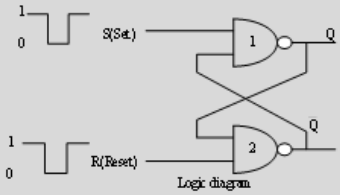

S	R	Q
0	0	No Change
0	1	0 (Reset)
1	0	1 (Set)
1	1	Invalid

চিত্র : Nand গেইট দ্বারা তৈরি সাধারণ ফ্লিপ-ফ্লপ সার্কিট

[বি. দ্র. : ফ্লিপ-ফ্লপ সিলেবাসে নেই। রেজিস্টার বোঝার জন্য এখানে ফ্লিপ-ফ্লপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।]

রেজিস্টার (Register)

একটি ফ্লিপ-ফ্লপ ডেটার এক বিট ধারণ করতে পারে। তাহলে একাধিক বিটের ডেটাকে সংরক্ষণ করার জন্য একাধিক ফ্লিপ-ফ্লপ প্রয়োজন। এই একাধিক ফ্লিপ-ফ্লপের সমষ্টিই হলো রেজিস্টার। **রেজিস্টার হলো এক প্রকার মেমোরি ডিভাইস, যা কতগুলো বিটকে ধারণ বা সংরক্ষণ করে থাকে। এটি একগুচ্ছ ফ্লিপ-ফ্লপ এর গেইট–এর সমন্বয়ে গঠিত সার্কিট, যেখানে প্রত্যেকটি ফ্লিপ-ফ্লপ একটি করে বাইনারি বিট ধারণ করে থাকে।** সুতরাং, n-বিট রেজিস্টারে n সংখ্যক ফ্লিপ-ফ্লপ থাকে এবং n-বিট বাইনারি তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে। রেজিস্টার প্রথম মেমোরি ডিভাইস হিসেবে CPU-এর অভ্যন্তরে থাকে এবং প্রসেসিং এর সময় অস্থায়ীভাবে ডেটা সঞ্চিত রাখে। এতে র‍্যামের মতো যতক্ষণ সার্কিটে বিদ্যুৎ থাকে ততক্ষণ অস্থায়ীভাবে ডেটা সঞ্চিত থাকে। রেজিস্টারে নতুন তথ্য ইনপুট করা বা সঞ্চয় করে রাখাকে লোডিং (Loading) বলা হয়। বিভিন্ন প্রকার লোডিং-এর জন্য রেজিস্টার বিভিন্ন গঠনের হতে পারে।

রেজিস্টারের গঠন (Formation of Register)

সরল ও সাধারণ রেজিস্টারগুলো শুধুমাত্র ফ্লিপ-ফ্লপ সার্কিট দ্বারা গঠিত এবং ক্লক পালস্ দ্বারা পরিচালিত হয়। গঠন ও কাজের প্রকৃতিভেদে রেজিস্টার ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং কম্বিনেশনাল (Combinational) গেইট ছাড়াও রেজিস্টার গঠন সম্ভব।

রেজিস্টার–এর ব্যবহার (Application of Register)

১. ক্ষণস্থায়ীভাবে ডেটা সঞ্চয় করতে ব্যবহৃত হয়।

২. ক্যাশ মেমোরি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৩. বিভিন্ন ধরনের প্রিন্টার ও কী-বোর্ড বাফারে ব্যবহৃত হয়।

৪. ক্যালকুলেটর ও ডিজিটাল ঘড়িতে ব্যবহৃত হয়।

রেজিস্টারের প্রকারভেদ (Types of Register)

রেজিস্ট্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ বহুল ব্যবহৃত ডিভাইস। এটিকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

ক. গঠন অনুসারে রেজিস্টার নিম্নরূপ–

১. বাফার বা প্যারালাল লোড রেজিস্টার (Buffer or Parallel Load Register)

২. শিফ্‌ট রেজিস্টার (Shift Register)।

খ. কাজের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে রেজিস্টার ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যথা–

১. **অ্যাকুমুলেটর রেজিস্টার :** অ্যাকুমুলেটর ALU-এর অর্ন্তগত বিশেষ ধরনের রেজিস্টার, যাতে হিসাবের ফল প্রাথমিকভাবে সংরক্ষণ করে রাখা হয়।

২. **সাধারণ রেজিস্টার :** সাধারণ তথ্য সংরক্ষণের জন্য এ সকল রেজিস্টার ব্যবহার করা হয়।

৩. **বিশেষ রেজিস্টার :** বিশেষ কোন ইনস্ট্রাকশনের জন্য প্রাথমিক মেমোরি হিসেবে ব্যবহৃত রেজিস্টারকে বিশেষ রেজিস্টার বলা হয়।

শিফ্‌ট রেজিস্টার (Shift Register)

বাইনারি ডেটাকে ১ বিট ডানে বা বামে বা উভয় দিকে সরানোর জন্য যে রেজিস্টার ব্যবহৃত হয় তাকে শিফট রেজিস্টার বলা হয়। শিফট রেজিস্টার এক ধরনের সিরিয়াল রেজিস্টার। শিফট রেজিস্টারে কতগুলো ফ্লিপ-ফ্লপ চেইন আকারে যুক্ত থাকে, যার একটি ফ্লিপ-ফ্লপের আউটপুট পরেরটির ইনপুটের সাথে সংযুক্ত থাকে। শিফট রেজিস্টার মূলত বিভিন্ন গাণিতিক যুক্তিমূলক কাজে এবং রেজিস্টারের মান ক্লিয়ার করতে ব্যবহৃত হয়। ডেটা প্রবাহের দিকের উপর ভিত্তি করে শিফট রেজিস্টার দুই প্রকার। যথা–

১. লেফট টু রাইট শিফট রেজিস্টার,

২. রাইট টু লেফট শিফট রেজিস্টার।

নিচে D–ফ্লিপ-ফ্লপ ব্যবহার করে একটি সরল 4-বিট শিফট রেজিস্টার তৈরি করা হয়েছে। এখানে একটি ফ্লিপ-ফ্লপের আউটপুট পরবর্তী ফ্লিপ-ফ্লপের ইনপুটের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। সকল ফ্লিপ-ফ্লপের সাথে একটি কমন পালস সিস্টেম যুক্ত করা হয়েছে। D–ইনপুটে যে ডেটাটি দেয়া হবে ক্লক পালস প্রদান করলে ডেটাটি এক বিট সরে যাবে।

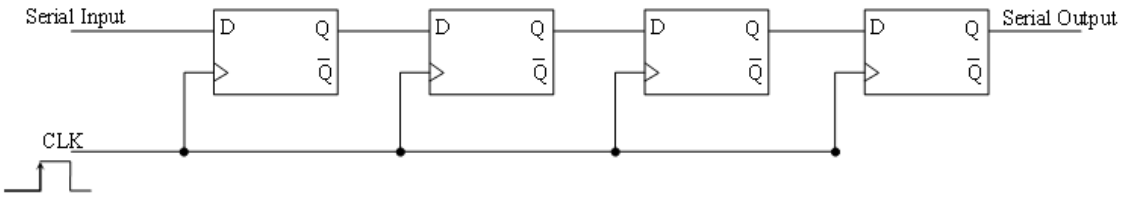

চিত্র : D– ফ্লিপ-ফ্লপ ব্যবহার করে একটি 4-বিট শিফট রেজিস্টার–এর গঠন চিত্র

বাফার বা প্যারালাল লোড রেজিস্টার (Buffer or Paralell Load Register)

প্যারালাল লোড রেজিস্টার হলো এমন এক ধরনের রেজিস্টার, যা একসাথে অনেকগুলো বাইনারি বিট ধারণ (লোড) করতে পারে এবং যেখানে একটি কমন ক্লক পালস সিস্টেম থাকে। কমন ক্লক ইনপুটে ক্লক পালস পাওয়ার সাথে সাথে সবগুলো ফ্লিপ-ফ্লপ সক্রিয় হয় এবং তথ্য ধারণ করে। নিচের চিত্রে একটি 4-বিট প্যারালাল লোড রেজিস্টারের গঠন দেখানো হলো। এটি 4-টি D-টাইপ ফ্লিপ-ফ্লপ দিয়ে গঠন করা হয়েছে। D-টাইপ ফ্লিপ-ফ্লপের ধর্ম হচ্ছে ক্লক পালস (CP) এর মান 0 হতে 1 হলে ইনপুটে যা দেওয়া হবে আউটপুটে তাই পাওয়া যাবে। ধরা যাক, I_0= 0, I_1=1, I_2=0 এবং I_3=1। ক্লক পালস (CP) এর মান 0 হতে 1 হলে আউটপুট A_0= 0, A_1=1, A_2=0 এবং A_3=1 হবে। পরবর্তী সময়ে নতুন ডেটা ইনপুট করে CP এর মান 0 হতে 1 না হওয়া পর্যন্ত আউটপুটে একই মান সংরক্ষিত থাকবে। সংরক্ষিত 4-বিট এ ডেটা যেকোন সময় আউটপুট থেকে পাওয়া যাবে। রেজিস্টারের তথ্য অপরিবর্তিত রাখতে হলে সার্কিটের ক্লক পালস অফ রাখতে হয়।

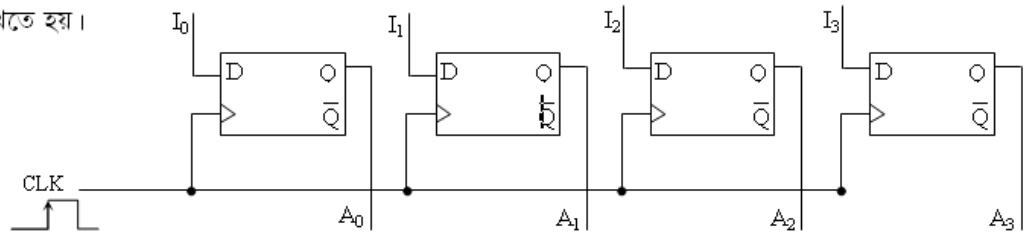

চিত্র : D– ফ্লিপ-ফ্লপ ব্যবহার করে একটি 4-বিট প্যারালাল লোড রেজিস্টার–এর গঠন চিত্র

ক্লক পালস (Clock Pulse) : ক্লক পালস (CP) হলো এক ধরনের সিগনাল বা ভোল্টেজের উপস্থিতি, যা একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে একই অবস্থায় থাকে এবং পরবর্তীতে আবার নির্দিষ্ট সময় ধরে বিপরীত অবস্থায় থাকে। ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমে অপারেশন সিনক্রোনাইজ করতে ক্লক পালস ব্যবহৃত হয়। ডিজিটাল সিস্টেমে একটি ক্লক সিগনাল জেনারেটর থাকে, যা সকল যন্ত্রের সাথে যুক্ত থেকে সিগনাল প্রদান করে।

শিফট রেজিস্টার	বাফার বা প্যারালাল লোড রেজিস্টার
১. ডেটা সংরক্ষণ করে এবং সরাতে পারে।	১. অস্থায়ীভাবে ডেটা সংরক্ষণ করে।
২. শিফট রেজিস্টার এক ধরনের সিরিয়াল রেজিস্টার।	২. বাফার রেজিস্টার এক ধরনের প্যারালাল রেজিস্টার।
৩. কতগুলো ফ্লিপ-ফ্লপ চেইন আকারে যুক্ত থাকে যার একটি ফ্লিপ-ফ্লপের আউটপুট পরেরটির ইনপুটের সাথে সংযুক্ত থাকে।	৩. সাধারণত D-টাইপের ফ্লিপ-ফ্লপ দিয়ে তৈরি হয়, যাতে ক্লক পালস (CP) এর মান 0 হতে 1 হলে ইনপুটে যা দেওয়া হবে আউটপুটে তাই পাওয়া যাবে।
৪. সমান গতির ডিভাইস ব্যবহৃত হয়।	৪. দুটি অসমান গতির যন্ত্রাংশের সমন্বয়ের জন্য এই রেজিস্টার ব্যবহৃত হয়।
৫. ছোট আকৃতির ডিজিটাল সার্কিটে ব্যবহৃত হয় (যেমন– ডিজিটাল মুভিং ডিসপ্লে)।	৫. ইনপুট ডিভাইস ও সিপিইউ এর মাঝে ইনপুট বাফার এবং আউটপুট ডিভাইস ও সিপিইউ এর মাঝে আউটপুট বাফার রেজিস্টার ব্যবহৃত হয়।

কাউন্টার (Counter)

কাউন্টার হলো এমন একটি সিকোয়েন্সিয়াল ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক সার্কিট, যা তার ইনপুটে দেয়া পাল্সের সংখ্যা গণনা করতে পারে। কাউন্টারের ইনপুট পাল্সকে কাউন্ট পাল্স বলা হয়, যা কোন নিয়মিত ক্লক–পাল্স বা অনিয়মিত যেকোন পাল্স হতে পারে। কোন একটি কাউন্টারের গণনার পরিধি কত হবে তা নির্ভর করে তার ডিজাইনের উপর। যদি কোন একটি বাইনারি কাউন্টারের বিট সংখ্যা n হয়, তবে তা n সংখ্যক ফ্লিপ-ফ্লপ এবং সংশ্লিষ্ট লজিক গেইট দ্বারা গঠিত হবে যা 0 থেকে (2^n-1) পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক সংখ্যা গুণতে পারে। উদাহরণস্বরূপ চিত্রের স্টেট (State) ডায়াগ্রামটি দেখা যেতে পারে। এখানে ৩-বিটের একটি বাইনারি কাউন্টারের স্টেটসমূহকে দেখানো হয়েছে। বাইনারি Count sequence 111 গণনা করার পরবর্তীতে 000 স্টেটে (State) চলে আসে। কাউন্টার সর্বাধিক যতগুলো সংখ্যা গুণতে পারে তাকে মডিউলাস (Modulus) বা মোড নাম্বার বলা হয়। n সংখ্যক ফ্লিপ-ফ্লপ দ্বারা গঠিত একটি কাউন্টারের মডিউলাস হলো 2^n।

কাউন্টারের ব্যবহার (Application of Counter)

যে সকল যন্ত্রপাতিতে ডিজিটাল লজিক বিদ্যমান তার প্রায় সবগুলোতেই বিভিন্ন কারণে কাউন্টার ব্যবহৃত হয়।

১. ইভেন্ট গণনার কাজে।
২. বিভিন্ন টাইমিং সিগনাল প্রদান করতে।
৩. ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্সের বিভিন্ন অপারেশন কন্ট্রোল করতে।
৪. এনালগ সিগনালকে ডিজিটাল সিগনালে রূপান্তর করতে।
৫. ডিজিটাল ঘড়িতে।
৬. ডিজিটাল কম্পিউটারে।
৭. ফ্রিকোয়েন্সি কাউন্টার তৈরিতে।

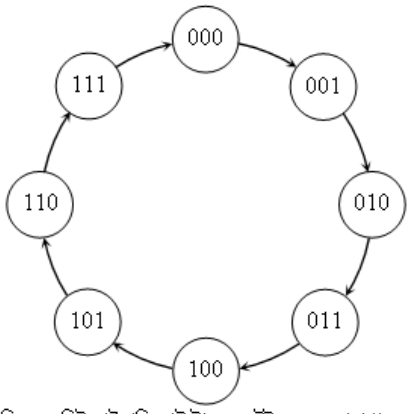

চিত্র : 3-বিট বাইনারি কাউন্টারের স্টেট (State) ডায়াগ্রাম

কাউন্টারের প্রকারভেদ (Types of Counter)

ইনপুট ক্লক পাল্সের উপর ভিত্তি করে কাউন্টার প্রধানত দু'প্রকার। যথা–

১. **সিনক্রোনাস (Synchronous) কাউন্টার :** যে কাউন্টারে একটিমাত্র ক্লক পাল্স কাউন্টারে ব্যবহৃত সবগুলো ফ্লিপ-ফ্লপ-এর অবস্থার (State) পরিবর্তন ঘটায় তাকে সিনক্রোনাস কাউন্টার বলা হয়। অর্থাৎ এই কাউন্টারে সকল ফ্লিপ-ফ্লপের ক্লক ইনপুট একসাথে যুক্ত থাকে এবং ফ্লিপ-ফ্লপগুলো ইনপুট পাল্স দ্বারা ট্রিগারড হয়। রিং কাউন্টার, মোড–10 কাউন্টার ইত্যাদি হলো সিনক্রোনাস কাউন্টারের উদাহরণ ।

২. **অ্যাসিনক্রোনাস (Asynchronous) কাউন্টার :** অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার হলো এমন ধরনের কাউন্টার যেখানে একটি ফ্লিপ-ফ্লপ-এর আউটপুট অন্যটির ক্লক-পাল্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন– রিপল কাউন্টার ।

অ্যাসিনক্রোনাস রিপল কাউন্টার আবার দু'প্রকার। যথা–

১. **রিপল আপ (up) কাউন্টার :** ছোট নম্বর থেকে বড় নম্বরের দিকে পর্যায়ক্রমিক গণনা করে।
২. **রিপল ডাউন (Down) কাউন্টার :** বড় থেকে পর্যায়ক্রমিকভাবে নিচের দিকে গণনা করে।

কাউন্টারের গঠন

রিপল কাউন্টার (Ripple Counter)

সবচেয়ে সহজ ও সরল কাউন্টার হলো বাইনারি রিপল কাউন্টার। রিপল কাউন্টার হলো অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ফ্লিপ-ফ্লপ এর আউটপুট দ্বারা তার পাশের ফ্লিপ-ফ্লপকে ট্রিগারিং (Triggering) করে। অর্থাৎ একটি ফ্লিপ-ফ্লপের আউটপুট পরবর্তী ফ্লিপ-ফ্লপের ক্লক সিগনাল হিসেবে কাজ করে। n বিট বাইনারি রিপল কাউন্টার n সংখ্যক ফ্লিপ-ফ্লপ দ্বারা গঠিত, যেখানে ফ্লিপ-ফ্লপগুলো সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করে। নিম্নে একটি বাইনারি রিপল কাউন্টার দেখানো হলো।

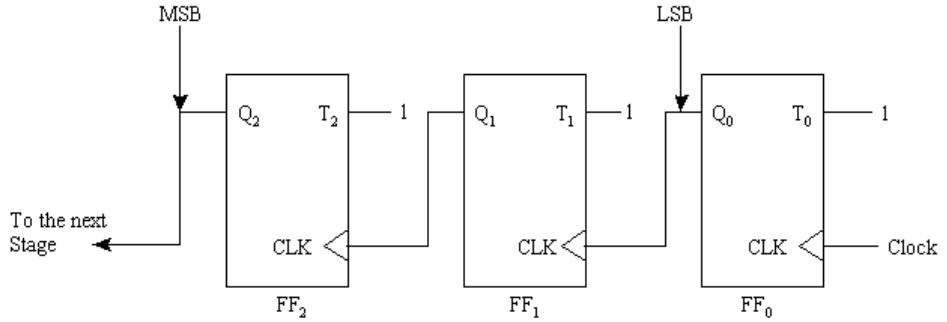

চিত্র : 3–বিট রিপল কাউন্টার

বাইনারি সংখ্যা কিভাবে গণনা করা হয় তা নিম্নে দেখানো হলো।

ক্লক পালসের সংখ্যা	আউটপুট		
	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1
	প্রতি চার বার পরপর টোগল করে	প্রতি দুই বার পরপর টোগল করে	প্রতি বার পরপর টোগল করে

রিপল কাউন্টার T টাইপ ফ্লিপ-ফ্লপ দ্বারা গঠিত, যা সবসময় টোগল (Toggle) মোডে কাজ করে। উপরিউক্ত রিপল কাউন্টারের–

- FF_0 তে সিগনাল দিলে টোগল করবে অর্থাৎ প্রতিবার 0 থেকে 1 বা 1 থেকে 0 হবে।
- Q_0 কে FF_1 এর ক্লক পালস্ হিসেবে দিলে FF_1 কাজ করবে। যখন $Q_0 = 1$ হয় তখন FF_1 টোগল করবে অর্থাৎ প্রতি ২ বার পর টোগল করবে।
- অনুরূপভাবে Q_1 কে FF_2 এর ক্লক পালস্ হিসেবে দিলে $Q_1 = 1$ হলে FF_2 টোগল করবে। সুতরাং FF_2 প্রতি ৪ বার অন্তর টোগল করবে। এভাবে রিপল কাউন্টার কাজ করে।

সিনক্রোনাস (Synchronous) কাউন্টার : যে কাউন্টারে একটিমাত্র ক্লক পালস কাউন্টারে ব্যবহৃত সবগুলো ফ্লিপ-ফ্লপ-এর অবস্থার (State) পরিবর্তন ঘটায় তাকে সিনক্রোনাস কাউন্টার বলা হয়। অর্থাৎ এই কাউন্টারে সকল ফ্লিপ-ফ্লপের ক্লক ইনপুট একসাথে যুক্ত থাকে এবং ফ্লিপ-ফ্লপগুলো ইনপুট পালস দ্বারা ট্রিগারড (Triggered) হয়। একসাথে ট্রিগারড হওয়ায় এই কাউন্টারে Cummulative time delay নেই। রিং কাউন্টার, মড–10 কাউন্টার ইত্যাদি হলো সিনক্রোনাস কাউন্টারের উদাহরণ । নিচে 3-টি J-K টাইপ ফ্লিপ-ফ্লপ দ্বারা গঠিত একটি 3-বিট সিনক্রোনাস কাউন্টারের ব্লক চিত্র দেখানো হলো। এই 3-বিট সিনক্রোনাস কাউন্টারের FF_0 ফ্লিপ-ফ্লপের J ও K ইনপুটদ্বয় 1-(High) লাইনের সাথে যুক্ত। FF_1 ফ্লিপ-ফ্লপের J ও K ইনপুটদ্বয় FF_0 ফ্লিপ-ফ্লপের আউটপুটের সাথে যুক্ত। আবার FF_2 ফ্লিপ-ফ্লপের J ও K ইনপুটদ্বয় গেইটের সাথে যুক্ত, যে AND গেইটের ইনপুটদ্বয় হচ্ছে FF_0 ও FF_1 ফ্লিপ-ফ্লপের আউটপুট।

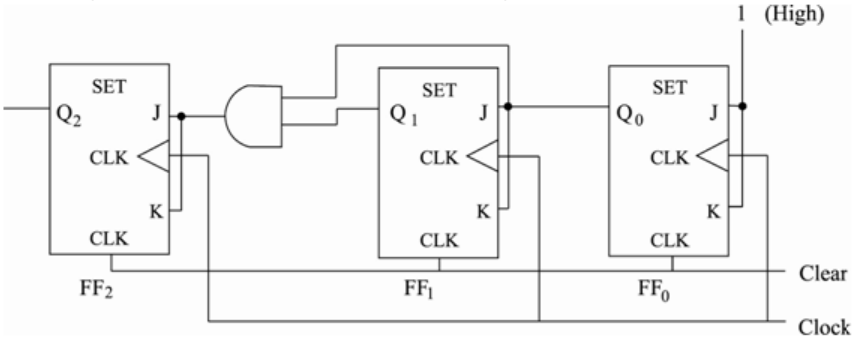

উপরিউক্ত সিনক্রোনাস কাউন্টারের-

- FF_0 তে সিগনাল দিলে প্রতিটি ক্লক পাল্সে পরিবর্তিত হবে।
- FF_1 ফ্লিপ-ফ্লপ পরিবর্তিত হবে, যখন $Q_0 = 1$ আউটপুট দিবে।
- FF_2 ফ্লিপ-ফ্লপ পরিবর্তিত হবে, যখন Q_0 এবং Q_1 উভয় আউটপুট 1 হবে– যা AND গেইটের সাহায্যে বাস্তবায়িত হয়েছে।

JK–FF ব্যবহার করে রিপল কাউন্টার

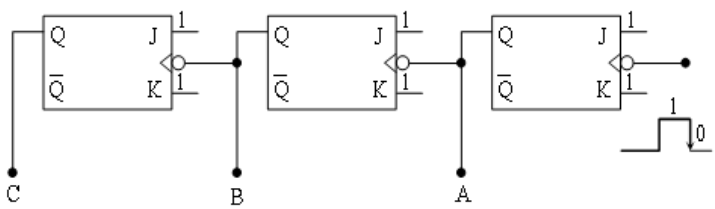

চিত্র : 3–বিট রিপল/অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার

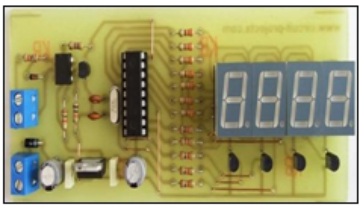

চিত্র : একটি কাউন্টার সার্কিট

কিভাবে কাজ করে?

উপরের ছকে A, B, C এর কলামে যে বাইনারি অঙ্ক (1, 0) আছে, আসলে তা বামের দশমিক সংখ্যাটিকে উপস্থাপন করছে। যেমন, 3 কে আমরা বাইনারিতে 011 লিখি। তাই 3 বরাবর A এর নিচে 0 এবং B এর নিচে 1 এবং C এর নিচে 1। পূর্ববর্তী রিপল কাউন্টারের চিত্র লক্ষ করি, এটি T ফ্লিপ-ফ্লপ দ্বারা গঠিত। আমরা জানি, T ফ্লিপ-ফ্লপের CP তে '1' দিলে এটা সবসময় টোগল (Toggle) করে সবগুলো ফ্লিপ-ফ্লপের ইনপুটে '1' দেয়া হয়েছে। অতএব FF_0 তে সিগন্যাল বা ক্লক পাল্স দিলে এটা প্রতিবার টোগল করবে অর্থাৎ প্রতিবার '0' থেকে '1' বা '1' থেকে '0' হবে এবং এ আউটপুট FF_1 এর CP হিসেবে কাজ করবে। অতএব, শুধু যখন $Q_0 = 1$ হবে তখনই FF_1 টোগল করবে। অর্থাৎ, প্রতি ২ বার পর FF_1 টোগল করবে। অনুরূপ, FF_1 এর আউটপুট Q, FF_2 এর CP হিসেবে কাজ করবে। সুতরাং, যেহেতু প্রতি দু'বার পর $Q = 1$ হবে তাই FF_2 প্রতি চারবার পর টোগল করবে।

অ্যাডার (Adder) বা যোগের বর্তনী

অ্যাডার হচ্ছে এমন একটি সমবায় সার্কিট (Combination Circuit), যা বাইনারি সংখ্যার যোগের কাজ করে। যেহেতু কম্পিউটারের যাবতীয় গাণিতিক কাজ বাইনারি যোগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়, তাই অ্যাডার একটি গুরুত্বপূর্ণ সার্কিট। অ্যাডার দু'প্রকার হতে পারে। যথা–

১. অর্ধযোগের বর্তনী (Half Adder)
২. পূর্ণযোগের বর্তনী (Full Adder)

হাফ অ্যাডার (Half Adder)

যে অ্যাডার দুটো বিট যোগ করে যোগফল (Sum) ও হাতে থাকা সংখ্যা বা ক্যারি (Carry) বের করতে পারে তাকে হাফ অ্যাডার বলা হয়। সাধারণত দুই বিট বাইনারি যোগের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত চারটি অবস্থা হতে পারে-

০	০	১	১
০	১	০	১
০	১	১	০

ক্যারি ১

A ও B দু'টি বাইনারি সংখ্যা এবং S ও C যথাক্রমে Sum এবং Carry হলে A ও B যোগের ফলে নিম্নলিখিত অবস্থাগুলো হতে পারে।

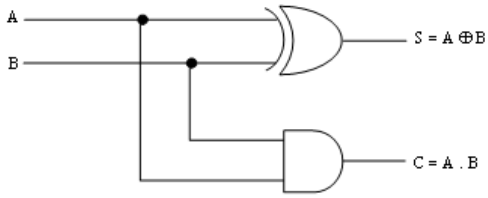

চিত্র : Half Adder logic circuit

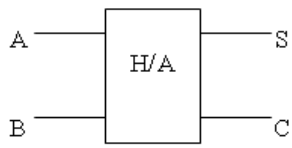

চিত্র : হাফ অ্যাডারের সাংকেতিক চিহ্ন

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

সত্যক সারণি

সত্যক সারণি থেকে প্রাপ্ত সমীকরণ হলো–

$\therefore\ S = \bar{A}B + A\bar{B}$ বা, $S = A \oplus B$ [⊕ Symbol অর্থাৎ X–OR]

$\therefore\ C = AB$

অর্থাৎ, Half Adder-এ একটি X–OR গেট এবং একটি AND গেট লাগবে।

ফুল অ্যাডার (Full Adder)

যে অ্যাডার ক্যারিসহ দুটি বিট যোগ করতে পারে তাকে ফুল অ্যাডার বলা হয়। হাফ অ্যাডারে Carry input থাকে না অর্থাৎ, কোন যোগে একটি ক্যারি উৎপন্ন হলে তা পরের দু'টি বিটের যোগফলের সাথে যোগ করা যায় না। কিন্তু ফুল অ্যাডারের দু'টি বিটের যোগফলের সাথে পূর্বের উৎপন্ন ক্যারি যোগ করা যায়। অর্থাৎ, Full Adder-এর কাজ হলো তিনটি বিট (দু'টি বিট ও একটি পূর্ববর্তী পর্যায়ের ক্যারি) যোগ করা।

Full Adder-এর ইনপুট দু'টি A ও B এবং পূর্ববর্তী ক্যারি (Carry Input বা lower order carry) C_i যোগফল S এবং বর্তমান ক্যারি (Carry out বা forward carry) C_o হলে,

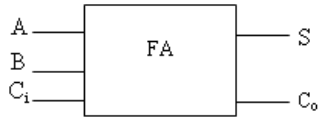

চিত্র : Full Adder এর বণ্টকচিত্র

Input			Output	
A	B	C_i	S	C_o
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

চিত্র : সত্যক সারণি

সত্যক সারণি থেকে প্রাপ্ত সমীকরণ হলো–

$$S = \bar{A}\bar{B}C_i + \bar{A}B\bar{C}_i + A\bar{B}\bar{C}_i + ABC_i$$

$$C_o = \bar{A}BC_i + A\bar{B}C_i + AB\bar{C}_i + ABC$$

উপরের S এবং C_0 ফাংশন দু'টিকে সরাসরি লজিক সার্কিটে রূপান্তরিত করা যায়। ফুল অ্যাডারে উপরিউক্ত সার্কিটটিতে 4টি AND গেট এবং 2টি 4 ইনপুট OR গেট ব্যবহৃত হয়েছে। সার্কিটটির আকার ছোট করা যায় যদি আমরা S এবং C_0 ফাংশন দু'টিকে ছোট করতে পারি। যেমন–

$$S = \bar{A}\bar{B}C_i + \bar{A}B\bar{C}_i + A\bar{B}\bar{C}_i + ABC$$

$$= \bar{A}(\bar{B}C_i + B\bar{C}_i) + A(\bar{B}\bar{C}_i + BC)$$

$$= \bar{A}(B \oplus C) + A(\overline{B \oplus C})$$ [$B \oplus C$ কে B ধরলে সমীকরণটি হয় $\bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$]

$$= A \oplus (B \oplus C)$$

C_o কে সরলীকরণ করলে পাওয়া যায়–

$$C_o = \bar{A}BC_i + A\bar{B}C_i + AB\bar{C}_i + ABC_i$$
$$= \bar{A}BC_i + ABC_i + A\bar{B}C_i + ABC_i + AB\bar{C}_i + ABC_i$$
$$= BC_i(\bar{A} + A) + AC_i(\bar{B} + B) + AB(\bar{C}_i + C_i)$$
$$= BC_i.1 + AC_i.1 + AB.1 \qquad [\because\ x + \bar{x} = 1]$$
$$= BC_i + AC_i + AB$$
$$= AB + BC_i + AC_i$$

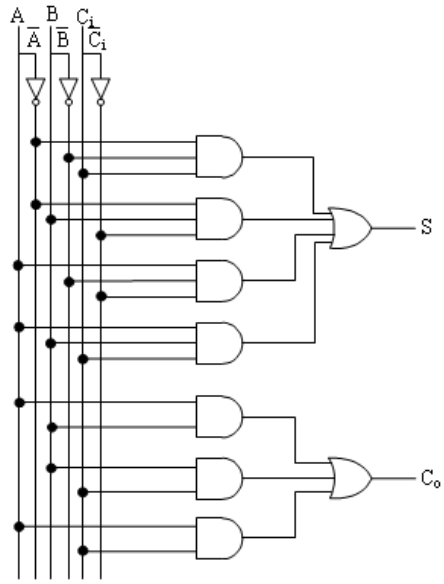

চিত্র : মৌলিক গেইটের সাহায্যে Full Adder এর লজিক

ফুল অ্যাডারকে যৌগিক গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করলে নিচের চিত্রের ন্যায় বর্তনী পাওয়া যাবে।

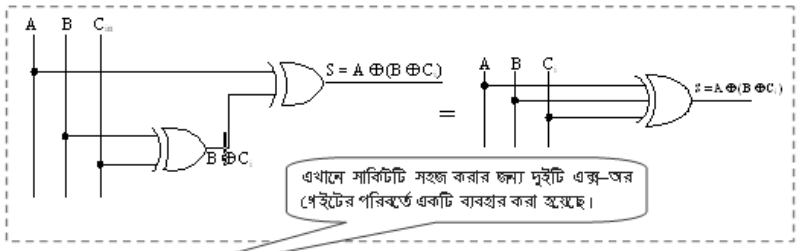

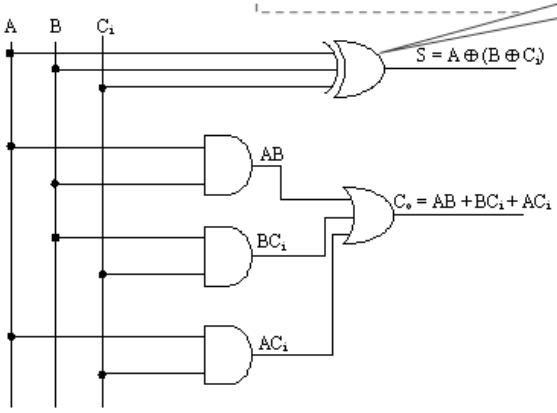

চিত্র : ফুল অ্যাডারের লজিক সার্কিট

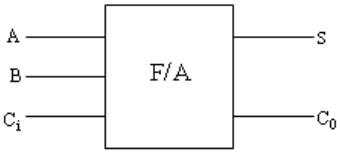

Symbol of Full Adder

হাফ অ্যাডার দিয়ে ফুল অ্যাডার বাস্তবায়ন (Implement Full Adder using by Half Adder)

হাফ অ্যাডার দিয়ে দুই বিট যোগ করা যায়। কিন্তু ফুল অ্যাডার দিয়ে ক্যারি বিটসহ তিন বিট যোগ করা যায়। দুটি হাফ অ্যাডারের সাহায্যে একটি ফুল অ্যাডার বাস্তবায়ন করা যায়। এক্ষেত্রে দুইটি হাফ অ্যাডারের সাথে একটি অর গেট প্রয়োজন হয়।

A ও B দু'টি বাইনারি সংখ্যা এবং S ও C যথাক্রমে Sum এবং Carry হলে A ও B যোগের ফলে নিম্নলিখিত অবস্থাগুলো হতে পারে।

আমরা জানি, হাফ অ্যাডারের ক্ষেত্রে-

$$S = A \oplus B$$
$$C = A.B$$

ফুল অ্যাডারের ক্ষেত্রে-

$$S = A \oplus (B \oplus C_i)$$
$$C_o = C_i (A \oplus B) + AB$$

দুটি হাফ অ্যাডারের মাধ্যমে একটি ফুল অ্যাডার তৈরির ক্ষেত্রে প্রথম হাফ অ্যাডারের ইনপুট A ও B হলে তার যোগফল S_1, ক্যারি C_1, এবং দ্বিতীয় হাফ অ্যাডারের ইনপুট S_1, C_i এবং যোগফল S_2 ক্যারি C_2 পাওয়া যায়।

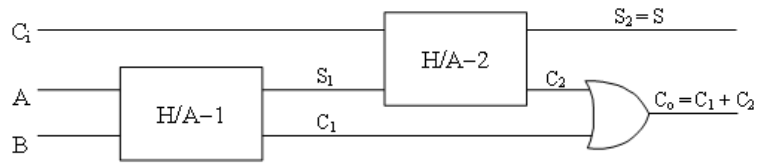

চিত্র : দুটি Half Adder এর সাহায্যে Full Adder বাস্তবায়নের ব্লক ডায়াগ্রাম

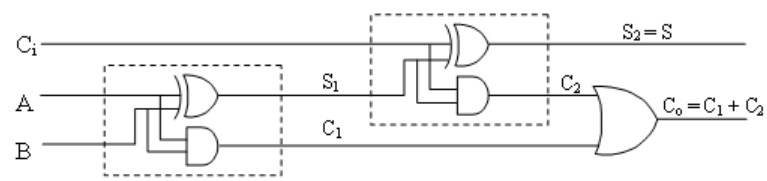

চিত্র : দুটি Half Adder এর সাহায্যে Full Adder বাস্তবায়নের লজিক ডায়াগ্রাম

প্রথম হাফ অ্যাডারের ক্ষেত্রে— যোগফল, $S_1 = A \oplus B$ .....(1) ক্যারি, $C_1 = AB$.....(2)

দ্বিতীয় হাফ অ্যাডারের ক্ষেত্রে— যোগফল, $S_2 = S_1 \oplus C_i$ .....(3) ক্যারি, $C_2 = S_1.C_i$.....(4)

ফুল অ্যাডার হতে আমরা পাই—

$$S = A \oplus B \oplus C_i$$
$$= S_1 \oplus C_i \quad \text{[1 নং সমীকরণ হতে]}$$
$$= S_2 \quad \text{[3 নং সমীকরণ হতে]}$$

$$C_o = \bar{A}BC_i + A\bar{B}C_i + AB\bar{C}_i + ABC_i$$
$$= C_i(\bar{A}B + A\bar{B}) + AB(\bar{C}_i + C_i)$$
$$= C_i(A \oplus B) + AB.1 \quad [\because \bar{C}_i + C_i = 1 \text{ ও } \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B]$$
$$= C_i . S_1 + AB$$
$$= C_2 + C_1 \quad \text{[2 ও 4 নং সমীকরণ হতে]}$$
$$= C_1 + C_2$$

উপর্যুক্ত ২টি হাফ অ্যাডার দিয়ে তৈরি অ্যাডারের ক্ষেত্রে সমীকরণটি ফুল অ্যাডারের সমীকরণের সাথে মিলে যায়। সুতরাং বলা যায় যে, দুটি হাফ অ্যাডারের সাহায্যে একটি ফুল অ্যাডার বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

লজিক ফাংশন সরলীকরণ (অতিরিক্ত)

১. $(B\bar{C} + \bar{A}D)(A\bar{B} + C\bar{D})$ [ঢা.বো. '০২]

$= A\bar{B}B\bar{C} + B\bar{C}C\bar{D} + \bar{A}DA\bar{B} + \bar{A}DC\bar{D}$

$= A\bar{C}(\bar{B}B) + B\bar{D}(\bar{C}C) + \bar{B}D(\bar{A}A) + \bar{A}C(D\bar{D})$

$= A\bar{C}.0 + B\bar{D}.0 + \bar{B}D.0 + \bar{A}C.0$ [$\because \bar{A}.A = 0$]

$= 0 + 0 + 0 + 0$

$= 0$ **(Ans.)**

২. $X\bar{Y}Z + \bar{X}\bar{Y}Z + XYZ$

$= \bar{Y}Z(X + \bar{X}) + XYZ$

$= \bar{Y}Z.1 + XYZ$ [$\because X + \bar{X} = 1$]

$= \bar{Y}Z + XYZ$

$= Z(\bar{Y} + XY)$

$= Z(\bar{Y} + X)(\bar{Y} + Y)$ [$\because A + BC = (A+B)(A+C)$]

$= Z(\bar{Y} + X).1$ [$\because X + \bar{X} = 1$]

$= Z(\bar{Y} + X)$ **(Ans.)**

৩. $(Q + R)(\bar{Q} + \bar{R})$

$= Q\bar{Q} + Q\bar{R} + R\bar{Q} + R\bar{R}$

$= 0 + Q\bar{R} + R\bar{Q} + 0$ [$\because R.\bar{R} = 0$]

$= Q\bar{R} + R\bar{Q}$

$= \bar{R}Q + R\bar{Q}$

$= R \oplus Q$ **(Ans.)** [$R \oplus Q = Q\bar{R} + \bar{Q}R$]

৪. $ABC + A\bar{B}C + \bar{A}$

$= AC(B + \bar{B}) + \bar{A}$

$= AC.1 + \bar{A}$ [$\because B + \bar{B} = 1$]

$= AC + \bar{A}$

$= \bar{A} + AC$

$= (\bar{A} + A)(\bar{A} + C)$ [$\because A + BC = (A+B)(A+C)$]

$= 1.(\bar{A} + C)$ [$\because X + \bar{X} = 1$]

$= \bar{A} + C$ **(Ans.)**

৫. $\overline{(\bar{A} + C)} + \overline{B + \bar{D}}$

$= (\bar{\bar{A}}.\bar{C}) + (\bar{B}.\bar{\bar{D}})$

$= (A.\bar{C}) + (\bar{B}.D)$

$= A\bar{C} + \bar{B}D$ **(Ans.)**

৬. $\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$ [য বো. ০৮; রা.বো. ০২]

$= \bar{A}(\bar{B}C + B\bar{C}) + A(\bar{B}\bar{C} + BC)$

$= \bar{A}(B \oplus C) + A\overline{(B \oplus C)}$

$\therefore \bar{B}C + B\bar{C} = B \oplus C$

$\bar{B}\bar{C} + BC = \overline{B \oplus C}$

$= \bar{A}X + A\bar{X}$

ধরি, $X = B \oplus C$

$\bar{X} = \overline{B \oplus C}$

$= A \oplus X$

$\therefore \bar{B}C + B\bar{C} = B \oplus C$

$= A \oplus B \oplus C$ [X এর মান বসিয়ে]

$= A \oplus B \oplus C$ **(Ans.)**

৭. $AB\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}BC + ABC$ [দি.১১; ব.১২; চ.১০,১২]

$= \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$

$= \bar{A}BC + ABC + A\bar{B}C + ABC + AB\bar{C} + ABC$

[$\because ABC = ABC + ABC + ABC$]

$= BC(\bar{A} + A) + AC(\bar{B} + B) + AB(\bar{C} + C)$

$= BC.1 + AC.1 + AB.1$ [$\because \bar{A} + A = 1$]

$= BC + AC + AB$ **(Ans.)**

৮. $\overline{(A + B + \bar{C})} + \bar{B}C$

$= \bar{A}.\bar{B}.\bar{\bar{C}} + \bar{B}C$ [$\because \overline{A + B + \bar{C}} = \bar{A}.\bar{B}.\bar{C}$]

$= \bar{A}.\bar{B}.C + \bar{B}C$

$= \bar{B}C(\bar{A} + 1)$

$= \bar{B}C.1$ [$\because \bar{A} + 1 = 1$]

$= \bar{B}C$ **(Ans.)**

৯. $(A + B)(A + \bar{B})(\bar{A} + C)$

$= (A.A + A\bar{B} + AB + B.\bar{B})(\bar{A} + C)$

$= (A + A\bar{B} + AB)(\bar{A} + C)$ [$\because A.A = A, A.\bar{A} = 0$]

$= [A(1 + \bar{B}) + AB](\bar{A} + C)$

$= (A.1 + AB)(\bar{A} + C)$ [$\because 1 + \bar{A} = 1$]

$= (A + AB)(\bar{A} + C)$

$= [A(1 + B)](\bar{A} + C)$

$= A.1(\bar{A} + C)$ [$\because (1 + A) = 1$]

$= A(\bar{A} + C)$

$= A.\bar{A} + AC$

$= 0 + AC$ [$\because A.\bar{A} = 0$]

$= AC$ **(Ans.)**

১০. $BC + BC + BC$
$= BC + BC$ $[\because BC + BC = BC]$
$= BC$ (Ans.)

১১. $\overline{(A + \bar{C})(\bar{B} + D)}$ [বা.বো. '০৪]
$= \overline{(A + \bar{C})} + \overline{(\bar{B} + D)}$ $[\because \overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}]$
$= \bar{A} . \bar{\bar{C}} + \bar{\bar{B}} . \bar{D}$
$= \bar{A}C + B\bar{D}$ (Ans.) $[\because \bar{\bar{A}} = A]$

১২. $V = \overline{x + \bar{y}(z + \bar{x})}$ [য.বো., চ.বো. '০৭]
$V = \overline{x + \bar{y}(z + \bar{x})}$
$= \bar{x} . \overline{\bar{y}(z + \bar{x})}$ |∵ ডি মরগ্যানের সূত্রানুসারে|
$= \bar{x} . (\bar{\bar{y}} + \overline{(z + \bar{x})})$ |∵ ডি মরগ্যানের সূত্রানুসারে|
$= \bar{x} . (y + (\bar{z} . \bar{\bar{x}}))$ |∵ $\bar{\bar{A}} = A$|
$= \bar{x} . (y + (\bar{z} . x))$
$= \bar{x}y + \bar{x} . \bar{z} . x$
$= \bar{x}y + \bar{z} . x . \bar{x}$
$= \bar{x}y + \bar{z} . 0$ |∵ $A\bar{A} = 0$|
$= \bar{x}y + 0$
$= \bar{x}y$ (Ans.)

১৩. $AB\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + ABC + A\bar{B}C$
$= AB\bar{C} + ABC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}BC$
$= AB(\bar{C} + C) + A\bar{B}(\bar{C} + C) + \bar{A}BC$
$= AB + A\bar{B} + \bar{A}BC$ $[\because A + \bar{A} = 1]$
$= A(B + \bar{B}) + \bar{A}BC$
$= A + \bar{A}BC$
$= (A + \bar{A})(A + BC)$ $[\because A + BC = (A + B)(A + C)]$
$= A + BC$ (Ans.)

১৪. $\overline{a(b + c(\overline{d + c}))}$
$= \bar{a} + \overline{(b + c(\overline{d + c}))}$
$= \bar{a} + (\bar{b} . \overline{(c(\overline{d + c}))})$
$= \bar{a} + \bar{b} . (\bar{c} + \overline{(\overline{d + c})})$
$= \bar{a} + (\bar{b} . (\bar{c} + d + c))$ $[\because \bar{\bar{a}} = a]$
$= \bar{a} + (\bar{b} . (c + \bar{c} + d))$
$= \bar{a} + \bar{b} . (1 + d)$ $[\because a + \bar{a} = 1]$
$= \bar{a} + \bar{b} . 1$ $[\because a + 1 = 1]$
$= \bar{a} + \bar{b}$ (Ans.)

১৫. $ABC + AB\bar{C} + A\bar{B}C$
$= AB(C + \bar{C}) + A\bar{B}C$ |∵ $C + \bar{C} = 1$|
$= AB + A\bar{B}C$
$= A(B + \bar{B}C)$
$= A(B + \bar{B})(B + C)$ |∵ $A + BC = (A + B)(A + C)$|
$= A.1(B + C)$ |∵ $B + \bar{B} = 1$|
$= A(B + C)$ (Ans.)

১৬. $\overline{c + b}(a + bc)$
$= \bar{c} . \bar{b}(a + bc)$ |ডি মরগ্যানের সূত্র : $\overline{a + b} = \bar{a} . \bar{b}$|
$= a\bar{b}\bar{c} + bc\bar{b}\bar{c}$
$= a\bar{b}\bar{c} + 0$ $[\because b . \bar{b} = 0]$
$= a\bar{b}\bar{c}$ (Ans.)

১৭. $\overline{RST}\,\overline{(R + S + T)}$ [চ. বো. '০৮]
$= (\bar{R} + \bar{S} + \bar{T})(\bar{R} . \bar{S} . \bar{T})$ |∵ ডি মরগ্যানের সূত্রানুসারে|
$= \bar{R}.\bar{R}\bar{S}\bar{T} + \bar{S}.\bar{R}\bar{S}\bar{T} + \bar{T}.\bar{R}\bar{S}\bar{T}$
$= \bar{R}\bar{S}\bar{T} + \bar{R}\bar{S}\bar{T} + \bar{R}\bar{S}\bar{T}$ |∵ $\bar{A}.\bar{A} = \bar{A}$|
$= \bar{R}\bar{S}\bar{T}$ (Ans.) |∵ $\bar{A} + \bar{A} + \bar{A} = \bar{A}$|

১৮. $\overline{\overline{\overline{A\bar{B}}C}D}$
$= \overline{\overline{\overline{A\bar{B}}}C} + \bar{D}$ |∵ $\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$|
$= \overline{A\bar{B}}C + \bar{D}$ |∵ $\bar{\bar{A}} = A$|
$= (\bar{A} + \bar{B})C + \bar{D}$ |∵ $\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$| (Ans.)

■ **প্রমাণ কর :**

১৯. $(A + B)(A + C) = A + BC$ [য. বো. '০৬]
বামপক্ষ, $(A + B)(A + C)$
$= AA + AC + AB + BC$
$= A + AC + AB + BC$ $[\because A.A = A]$
$= A(1 + C + B) + BC$
$= A.(1 + B) + BC$ $[\because 1 + A = 1]$
$= A.1 + BC$ $[\because 1 + A = 1]$
$= A + BC =$ বামপক্ষ (প্রমাণিত)

২০. $A + \bar{A}B = A + B$ [ব. বো. '১১]
বামপক্ষ, $A + \bar{A}B$
$= A1 + \bar{A}B$
$= A(1 + B) + \bar{A}B$ $[\because 1 + B = 1]$
$= A + AB + \bar{A}B$

$= A + B(A + \bar{A})$

$= A + B.1$ $[\because A + \bar{A} = 1]$

$= A + B =$ ডানপক্ষ (প্রমাণিত)

বিকল্প : $A + \bar{A}B = A + B$ [ব. বো. '১১]

বামপক্ষ, $A + \bar{A}B$

$= (A + \bar{A})(A + B)$ $[\because A + BC = (A+B)(A+C)]$

$= 1.(A + B)$ $[\because A + \bar{A} = 1]$

$= A + B$

$=$ R.H.S **(Proved)**

২১. $A + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B} = 1$

বামপক্ষ, $A + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}$

$= A + \bar{A}(B + \bar{B})$ $[\because A + \bar{A} = 1]$

$= A + \bar{A}.1 = A + \bar{A} = 1 =$ ডানপক্ষ (প্রমাণিত)

২২. $A + \bar{A} = 1$

বুলিয়ান চলক A এর মান 0 বা 1 হতে পারে।

যখন $A = 0$, তখন $\bar{A} = 1$

$\therefore A + \bar{A} = 0 + 1$ [মান বসিয়ে]

$= 1$ ..... (i)

আবার, যখন $A = 1$, তখন $\bar{A} = 0$

$\therefore A + \bar{A} = 1 + 0$

$= 1$ ..... (ii)

সমীকরণ (i) ও (ii) নং হতে পাই A এর সকল মানের জন্য

$A + \bar{A} = 1$ (প্রমাণিত)

২৩. $\overline{A \oplus B} = AB + \bar{A}.\bar{B}$ [ব.০৬; ঢা.০৮; রা.০২, ০৮; চ.০৯; দি.১২]

বামপক্ষ, $\overline{A \oplus B}$

$= \overline{\bar{A}B + A\bar{B}}$ $[\because A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}]$

$= (\overline{\bar{A}B}).(\overline{A\bar{B}})$ $[\because \overline{A + B} + \bar{A}\bar{B}]$

$= (\bar{\bar{A}} + \bar{B})(\bar{A} + \bar{\bar{B}})$ $[\because \overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}]$

$= (A + \bar{B})(\bar{A} + B)$

$= A\bar{A} + AB + \bar{A}\bar{B} + B\bar{B}$ $[\because A.\bar{A} = 0]$

$= 0 + AB + \bar{A}\bar{B} + 0$

$= AB + \bar{A}\bar{B}$

$=$ ডানপক্ষ **(প্রমাণিত)**

২৪. $(\overline{A + B})(\overline{\bar{A} + \bar{B}}) = 0$

বামপক্ষ, $(\overline{A + B})(\overline{\bar{A} + \bar{B}})$

$= (\bar{A}.\bar{B})(\bar{\bar{A}}.\bar{\bar{B}})$

$= (\bar{A}.\bar{B})(A.B)$

$= A\bar{A}.B\bar{B}$

$= 0.0$

$= 0$

$=$ ডানপক্ষ (প্রমাণিত)

২৫. $AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$ [ব.বো. '১১; দি.বো. '১২]

বামপক্ষ, $AB + \bar{A}C + BC$

$= AB + \bar{A}C + BC(A + \bar{A})$ $[\because A + \bar{A} = 1]$

$= AB + \bar{A}C + ABC + \bar{A}BC$

$= AB(1 + C) + \bar{A}C(1 + B)$

$= AB + \bar{A}C$

$=$ ডানপক্ষ (প্রমাণিত)

২৬. $\bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC = AB + BC + AC$
[ঢা.বো. '০৬, '১১; য.বো, '১২]

বামপক্ষ, $\bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$

$= \bar{A}BC + ABC + A\bar{B}C + ABC + AB\bar{C} + ABC$

$= BC(\bar{A} + A) + AC(\bar{B} + B) + AB(\bar{C} + C)$

$= BC.1 + AC.1 + AB.1$ $[\because \bar{C} + C = 1]$

$= BC + AC + AB$

$= AB + BC + AC$

$=$ ডানপক্ষ (প্রমাণিত)

২৭. $(\overline{A + \bar{B} + C\bar{D}}) = \bar{A}B(\bar{C} + D)$

বামপক্ষ, $\overline{A + \bar{B} + C\bar{D}}$

$= \bar{A}.\bar{\bar{B}}.\overline{C\bar{D}}$ [$\because$ ডি মরগ্যানের সূত্রানুসারে]

$= \bar{A}B(\bar{C} + \bar{\bar{D}})$ [$\because$ ডি মরগ্যানের সূত্রানুসারে]

$= \bar{A}B(\bar{C} + D)$ $[\because \bar{\bar{A}} = A]$

$=$ ডানপক্ষ (প্রমাণিত)

২৮. $(X + Y)(\bar{X} + Z)(Y + Z) = (X + Y)(\bar{X} + Z)$

বামপক্ষ, $(X + Y)(\bar{X} + Z)(Y + Z)$ [চ.বো. '০৭]

$= (X + Y)(\bar{X}Y + \bar{X}Z + YZ + ZZ)$

$= (X + Y)(\bar{X}Y + \bar{X}Z + YZ + Z)$ $[\because A.A = A]$

$= (X + Y)(\bar{X}Y + (\bar{X} + Y + 1)Z)$

$= (X + Y)(\bar{X}Y + (\bar{X} + 1)Z)$ $[\because A + 1 = 1]$

$= (X + Y)(\bar{X}Y + 1.Z)$ $[\because \bar{A} + 1 = 1]$

$= (X + Y)(\bar{X}Y + Z)$

$= X.\bar{X}Y + XZ + \bar{X}Y.Y + YZ$

$= 0 + XZ + \bar{X}Y + YZ$ $[\because A.\bar{A} = 0]$

$= XZ + \bar{X}Y + YZ$ ..... (i)

ডানপক্ষ, $(X + Y)(\bar{X} + Z) = X.\bar{X} + XZ + \bar{X}Y + YZ$

$= 0 + XZ + \bar{X}Y + YZ$

$= XZ + \bar{X}Y + YZ$ ..... (ii)

সমীকরণ (i) ও (ii) নং হতে পাই

বামপক্ষ = ডানপক্ষ **(প্রমাণিত)**

২৯. $(A + C)(AD + A\bar{D}) + AC + C = A + C$

বামপক্ষ, $(A + C)(AD + A\bar{D}) + AC + C$

$= (A + C)(A(D + \bar{D})) + C(A + 1)$

$= (A + C)A.1 + C.1$ $[\because A + \bar{A} = 1, A + 1 = 1]$

$= AA + AC + C$

$= A + C(A + 1)$ $[\because A.A = A]$

$= A + C.1$ $[\because A + 1 = 1]$

$= A + C$

= ডানপক্ষ (প্রমাণিত)

৩০. $ABC + A\bar{B}C + ABC + \bar{A}C = C$ [ঢা.বো. '০৩]

বামপক্ষ, $ABC + A\bar{B}C + ABC + \bar{A}C$

$= ABC + A\bar{B}C + \bar{A}C$ $[\because A + A = A]$

$= AC(B + \bar{B}) + \bar{A}C$ $[\because A + \bar{A} = 1]$

$= AC.1 + \bar{A}C = C(A + \bar{A})$ $[\because A + \bar{A} = 1]$

$= C.1 = C$

= ডানপক্ষ **(প্রমাণিত)**

৩১. $\overline{C + B}\,(A + BC) = A\bar{B}\bar{C}$

বামপক্ষ, $\overline{C + B}\,(A + BC)$

$= \bar{C}.\bar{B}(A + BC)$

$= A\bar{B}\bar{C} + BC\bar{B}\bar{C}$ $[\because B\bar{B} = 0]$

$= A\bar{B}\bar{C} + 0$

$= A\bar{B}\bar{C}$

= ডানপক্ষ (প্রমাণিত)

৩২. $(\overline{A + B + \bar{C}})\bar{B}C = \bar{A}\bar{B}C$

বামপক্ষ, $(\overline{A + B + \bar{C}})\bar{B}C$

$= \bar{A}.\bar{B}.\bar{\bar{C}}.\bar{B}.C$

$= \bar{A}.\bar{B}.C.\bar{B}.C$

$= \bar{A}\bar{B}C$ $[A.A = A]$

= ডানপক্ষ (প্রমাণিত)

৩৩. $(\overline{A + B} + \overline{C + D})A$

$= (\bar{A}.\bar{B} + \bar{C}.\bar{D})A$ [ডি–মরগ্যানের উপপাদ্য অনুসারে]

$= A\bar{A}\bar{B} + A\bar{C}\bar{D}$

$= 0.\bar{B} + A\bar{C}\bar{D}$ $[\because A\bar{A} = 0]$

$= 0 + A\bar{C}\bar{D}$

$= A\bar{C}\bar{D}$

৩৪. $ABC + A\bar{B}(\overline{\bar{A}\ \bar{C}})$

$= ABC + A\bar{B}(\bar{\bar{A}} + \bar{\bar{C}})$

$= ABC + A\bar{B}(A + C)$

$= ABC + AA\bar{B} + A\bar{B}C$

$= ABC + A\bar{B} + A\bar{B}C$ $[\because A.A = A]$

$= AC(B + \bar{B}) + A\bar{B}$

$= AC.1 + A\bar{B}$ $[\because B + \bar{B} = 1]$

$= AC + A\bar{B}$

$= A(C + \bar{B})$ **(Ans.)**

৩৫. $C(B + C)(A + B + C) = C$

L.H.S $= C(B + C)(A + B + C)$

$= (BC + CC)(A + B + C)$

$= (BC + C)(A + B + C)$ $[\because A.A = A]$

$= C(B + 1)(A + B + C)$

$= C.1(A + B + 1)$ $[\because B + 1 = 1]$

$= C(A + B + C)$

$= AC + BC + C.C$

$= AC + BC + C$ $[\because A.A = A]$

$= C(A + B + 1)$

$= C(A + 1)$ $[\because A + 1 = 1]$

$= C.1$

$= C$ **(Ans.)**

৩৬. $(AB + C)(AB + D)$

$= AB\ AB + ABD + ABC + CD$

$= AB + ABD + ABC + CD$ $[\because A.A = A]$

$= AB(1 + D + C) + CD$

$= AB.1 + CD$ $[\because 1 + A = 1]$

$= AB + CD$ **(Ans.)**

৩৭. $(B+\bar{C})(\bar{B}+C)+(\overline{\bar{A}+B+\bar{C}})$

$=(B\bar{B}+BC+\bar{B}\bar{C}+C\bar{C})+\bar{\bar{A}}.\bar{B}.\bar{\bar{C}}$

$=(0+BC+\bar{B}\bar{C}+0)+A\bar{B}C$ $[\because A.\bar{A}=0]$

$=\bar{B}\bar{C}+BC+A\bar{B}C$

$=\bar{B}\bar{C}+C(B+A\bar{B})$

$=\bar{B}\bar{C}+C(B+\bar{B})(B+A)$ $[\because A+BC=(A+B)(A+C)]$

$=\bar{B}\bar{C}+C(B+A)$ $[\because B+\bar{B}=1]$

$=\bar{B}\bar{C}+BC+AC$

$=\overline{B\oplus C}+AC$ **(Ans.)**

৩৮. $(x+\bar{y}+\bar{z})(x+\bar{y}+z)$

$=xx+x\bar{y}+xz+x\bar{y}+\bar{y}\bar{y}+\bar{y}z+x\bar{z}+\bar{y}\bar{z}+z\bar{z}$

$=x+x\bar{y}+xz+x\bar{y}+\bar{y}+\bar{y}z+x\bar{z}+\bar{y}\bar{z}+0$

$[\because z.\bar{z}=0, A.A=A]$

$=x+x\bar{y}+xz+x\bar{y}+x\bar{z}+\bar{y}+\bar{y}z+\bar{y}\bar{z}$

$=x(1+\bar{y}+z+\bar{y}+\bar{z})+\bar{y}(1+z\bar{z})$ $[\because A+\bar{A}=1]$

$=x(1+1+1)+\bar{y}(1+1)$

$=x.1+\bar{y}.1$ $[\because 1+1=1]$

$=x+\bar{y}$ **(Ans.)**

৩৯. $X=\overline{(A+B+\bar{C})\bar{B}C}$

$X=\overline{(A+B+\bar{C})\bar{B}C}$

$=\overline{(A.\bar{B}C+B\bar{B}C+\bar{B}\bar{C}C)}$

$=\overline{(A.\bar{B}C+0.C+0.\bar{B})}$

$=\overline{(A.\bar{B}C)}$

$=\bar{A}+\bar{\bar{B}}+\bar{C}=\bar{A}+B+\bar{C}$ **(Ans.)**

৪০. $(A+B)(A+\bar{B})$

$=(A+B)(A+\bar{B})$

$=A.A+A.\bar{B}+AB+B.\bar{B}$

$=A+A\bar{B}+AB+0$ $[\because A.A=A, B.\bar{B}=0]$

$=A((1+\bar{B}+B)$

$=A(1+1)$ $[\because B+\bar{B}=1]$

$=A.1$

$=A$

= বামপক্ষ

$\therefore$ $(A+B)(A+\bar{B})=A$ (প্রমাণিত)

■ **সরল কর :**

১. $\overline{(A+B)(C+D)}$

$=\overline{(A+B)(C+D)}$

$=\overline{(A+B)}+\overline{(C+D)}$ $[\because \overline{AB}=\bar{A}+\bar{B}]$

$=\bar{A}.\bar{B}+\bar{C}.\bar{D}$ $[\because \overline{A+B}=\bar{A}.\bar{B}]$

$=A.B+\bar{C}\bar{D}$

২. $(A+B)(A+\bar{B})(\bar{A}+C)$

$=(A+B)(A+\bar{B})(\bar{A}+C)$

$=(A.A+A\bar{B}+AB+B.\bar{B})(\bar{A}+C)$

$=(A+A\bar{B}+AB+0)(\bar{A}+C)$ $[\because A\bar{A}=0, A.A=A]$

$=[A(1+\bar{B})+AB](\bar{A}+C)$

$=(A+AB)(\bar{A}+C)$

$=[A(1+B)](\bar{A}+C)$

$=A(\bar{A}+C)$ $[\because 1+A=A]$

$=A.\bar{A}+AC$

$=0+AC$ $[\because A\bar{A}=0, B\bar{B}=0]$

$=AC$

৩. $(A+\bar{B}+\bar{C})(A+\bar{B}+C)$

সমাধান

$=A.A+A\bar{B}+AC+A\bar{B}+\bar{B}\bar{B}+\bar{B}C+A\bar{C}+\bar{B}\bar{C}+\bar{C}C$

$=A+A\bar{B}+AC+\bar{B}+\bar{B}C+A\bar{C}+\bar{B}\bar{C}+\bar{C}C$ $[\because A.A=A]$

$=A+A\bar{B}+AC+A\bar{C}+\bar{B}C+\bar{B}\bar{C}+\bar{B}+0$ $[\because C.\bar{C}=0]$

$=A(1+\bar{B}+C+\bar{C})+\bar{B}(1+C+\bar{C})$

$=A(1+\bar{B}+1)+\bar{B}(1+1)$

$=A.1+\bar{B}.1$

$=A+\bar{B}$ **(Ans.)**

৪. $z(y+z)(x+y+z)$

সমাধান

$=(yz+z.z)(x+y+z)$

$=(yz+z)(x+y+z)$ $[\because A.A=A]$

$=z(y+1)(x+y+z)$

$=z.1.(x+y+z)$ $[\because 1+A=1]$

$=z(x+y+z)$

$= xz + yz + zz$
$= xz + yz + z$ $[\because A.A = A]$
$= xz + z(y + 1)$
$= xz + z.1 = xz + z$
$= z(x + 1) = z.1 = z$ **(Ans.)**

৫. $(x + y)(x + \bar{y}) = x$

সমাধান L.H.S $= (x + y)(x + \bar{y})$
$= xx + x\bar{y} + xy + y\bar{y}$
$= x + x\bar{y} + xy + 0$ $[\because A.A = A$ এবং $A.\bar{A} = 0]$
$= x + x\bar{y} + xy$
$= x(1 + \bar{y} + y)$
$= x(1 + y)$ $[\because A + 1 = 1]$
$= x.1 = x$
$\therefore$ L.H.S = R.H.S **(Proved)**

৬. প্রমাণ কর : $(A + B)(\bar{A} + C) = AC + \bar{A}B$

সমাধান বামপক্ষ $= (A + B)(\bar{A} + C)$
$= A.\bar{A} + AC + \bar{A}B + BC$
$= 0 + AC + \bar{A}B + BC$ $[\because A.\bar{A} = 0]$
$= AC + \bar{A}B + BC$
$= AC(B + \bar{B}) + \bar{A}B(C + \bar{C}) + BC(A + \bar{A})$
$[\because A + \bar{A} = 1]$
$= ABC + A\bar{B}C + \bar{A}BC + \bar{A}B\bar{C} + ABC + \bar{A}BC$
$= ABC + A\bar{B}C + \bar{A}BC + \bar{A}B\bar{C}$
$[\because ABC + ABC = ABC, \bar{A}BC + \bar{A}BC = \bar{A}BC]$
$= AC(B + \bar{B}) + \bar{A}B(C + \bar{C})$
$= AC.1 + \bar{A}B.1$ $[\because B + \bar{B} = 1, (C + \bar{C}) = 1]$
$= AC + \bar{A}B$
= ডানপক্ষ

৭. প্রমাণ কর : $(A + \bar{B} + \bar{C})(A + \bar{B}C) = A + \bar{B}C$

সমাধান বামপক্ষ $= (A + \bar{B} + \bar{C})(A + \bar{B}C)$
$= AA + A\bar{B}C + A\bar{B} + \bar{B}\bar{B}C + A\bar{C} + \bar{B}C\bar{C}$
$= A + A\bar{B}C + A\bar{B} + \bar{B}C + A\bar{C} + 0$
$[A.A = A, \bar{B}\bar{B} = \bar{B}, C\bar{C} = 0]$
$= A(1 + \bar{B} + \bar{C}) + \bar{B}C$
$= A(1 + \bar{C}) + \bar{B}C$
$= A.1 + \bar{B}C$ $[\because 1 + A = 1]$
$= A + \bar{B}C$
= ডানপক্ষ
অতএব, বামপক্ষ = ডানপক্ষ **(প্রমাণিত)**

৮. প্রমাণ কর : $(A + B)(A + \bar{B})(\bar{A} + C)$

সমাধান বামপক্ষ $= (A + B)(A + \bar{B})(\bar{A} + C)$
$= (AA + A\bar{B} + AB + B\bar{B})(\bar{A} + C)$
$= (A + A\bar{B} + AB + 0)(\bar{A} + C)$
$= (A + A\bar{B} + AB)(\bar{A} + C)$
$= [A + A(\bar{B} + B)](\bar{A} + C)$
$= [A + A](\bar{A} + C) = A(\bar{A} + C)$ $[\because A + A = A]$
$= A\bar{A} + AC$
$= 0 + AC$
$= AC$ = ডানপক্ষ
অতএব, বামপক্ষ = ডানপক্ষ **(প্রমাণিত)**

৯. প্রমাণ কর যে, $C(B + C)(A + B + C) = C$

সমাধান
বামপক্ষ $= C(B + C)(A + B + C)$
$= (BC + CC)(A + B + C)$
$= (BC + C)(A + B + C)$ $[\because C.C = C]$
$= C(B + 1)(A + B + C)$
$= C.1(A + B + C)$ $[\because 1 + B = 1]$
$= C.(A + B + C)$
$= AC + BC + CC$
$= AC + BC + C$
$= AC + C(B + 1)$
$= AC + C.1$
$= AC + C$
$= C(A + 1)$
$= C.1$
$= C$ = ডানপক্ষ
অতএব, বামপক্ষ = ডানপক্ষ **(প্রমাণিত)**

১০. প্রমাণ কর যে, $(A + C)(AD + A\bar{D}) + AC + C = A + C$

সমাধান
বামপক্ষ $= (A + C)(AD + A\bar{D}) + AC + C$
$= (A + C)A(D + \bar{D}) + AC + C$
$= (A + C)A.1 + AC + C$
$= AA + AC + AC + C$
$= A + AC + C$ $[\because A + A = A, A.A = A]$
$= A(1 + C) + C$
$= A.1 + C$
$= A + C$
= ডানপক্ষ
অতএব, বামপক্ষ = ডানপক্ষ **(প্রমাণিত)**

■ উদাহরণ–এর সমাধান :

১১. বুলিয়ান ফাংশানাট সরলীকরণ কর,

$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}$

সমাধান $F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}$

$= \bar{A}C(\bar{B} + B) + A\bar{B}$

$= \bar{A}C.1 + A\bar{B}$

$= \bar{A}C + A\bar{B}$

১২. বুলিয়ান ফাংশানাট সরলীকরণ কর,

$F = AB + \overline{AC} + A\bar{B}C(AB + C)$

সমাধান $F = AB + \overline{AC} + A\bar{B}C(AB + C)$

$= AB + \bar{A} + \bar{C} + A\bar{B}C.AB + A\bar{B}C.C$

$= AB + \bar{A} + \bar{C} + 0 + A\bar{B}$ [$\because B.\bar{B} = 0$ and $C.C = C$]

$= AB(C + \bar{C}) + \bar{A} + \bar{C} + A\bar{B}C$

$= ABC + AB\bar{C} + \bar{A} + \bar{C} + A\bar{B}C$

$= AC(B + \bar{B}) + \bar{C}(AB + 1) + \bar{A}$

$= AC + \bar{C} + \bar{A}$ [$\because B + \bar{B} = 1$ and $AB + 1 = 1$]

$= AC + \overline{AC}$ [$\because \overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$]

১৩. $ABC + A\bar{B}C + \bar{A}$

$= AC(B + \bar{B}) + \bar{A}$

$= AC + \bar{A}$

$= \bar{A} + AC$

$= (\bar{A} + A)(\bar{A} + C)$ [$\because A + BC = (A+B)(A + C)$]

$= 1.(\bar{A} + C)$ [$\because A + \bar{A} = 1$]

$= \bar{A} + C$

১৪. $B\bar{C} + \bar{B}\bar{C} + BC$

$= \bar{C}(B + \bar{B}) + BC$

$= \bar{C} + BC$ [$\because A + \bar{A} = 1$]

$= (\bar{C} + B).(\bar{C} + C)$ [$\because A + BC = (A + B)(A + C)$]

$= (\bar{C} + B).1$

$= B + \bar{C}$

১৫. $A + AB = A$

বামপক্ষ, $A + AB$

$= A.1 + AB$

$= A(1 + B)$

$= A.1$

$= A$

= ডানপক্ষ

$\therefore$ বামপক্ষ = ডানপক্ষ (প্রমাণিত)

১৬. $A(\bar{A} + B) = AB$

বামপক্ষ, $A(\bar{A} + B)$

$= A.\bar{A} + AB$

$= 0 + AB$

$= AB$

= ডানপক্ষ

$\therefore$ বামপক্ষ = ডানপক্ষ (প্রমাণিত)

১৭. $(A + B)(A + \bar{B}) = A$

বামপক্ষ, $(A + B)(A + \bar{B})$

$= AA + A\bar{B} + BA + B.\bar{B}$

$= A + A.\bar{B} + B.A + 0$ [$\because A.A = A, A.\bar{A} = 0$]

$= A$ = ডানপক্ষ

$\therefore$ বামপক্ষ = ডানপক্ষ (প্রমাণিত)

১৮. $\bar{A} + A\bar{B} = \bar{A} + \bar{B}$

বামপক্ষ, $\bar{A} + A\bar{B}$

$= (\bar{A} + A)(\bar{A} + \bar{B})$

$= 1.(\bar{A} + \bar{B})$

$= \bar{A} + \bar{B}$ (প্রমাণিত)

সার–সংক্ষেপ :

বুলিয়ান এ্যালজেবরা : চলকের দু'টি মান লজিকের সত্য ও মিথ্যা–এই দুই স্তরের উপর ভিত্তি করে রচিত এ এ্যালজেবরা যুক্তি বর্তনী সরলীকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। ১৮৪৭ সালে জর্জ বুল এই এ্যালজেবরা প্রস্তাব করেন।

ডি-মর্গ্যানের উপপাদ্য : বুলিয়ান এ্যালজেবরাকে বিশ্লেষণ করে তৈরি সূত্র যা যুক্তি বর্তনী সরলীকরণে ব্যবহৃত হয়। সূত্র দু'টি হলো

i. $\overline{(A+B)} = \bar{A}.\bar{B}$

ii. $\overline{A.B} = \bar{A} + \bar{B}$

মৌলিক গেইট : কম্পিউটার অথবা যেকোন ডিজিটাল পদ্ধতিতে ব্যবহৃত এন্ড, অর এবং নট গেইট তিনটি হলো মৌলিক গেইট।

এক্স-অর ও এক্স-নর গেইট : বহুল ব্যবহৃত দু'টি যৌগিক গেইট।

ন্যান্ড ও নর গেইটের সার্বজনীনতা : ন্যান্ড অথবা নর গেইট দিয়ে যেকোন মৌলিক গেইট বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এটি ন্যান্ড অথবা নর গেইটের সার্বজনীনতা নামে পরিচিত।

কাউন্টার : বৈদ্যুতিক স্পন্দন গণনা করে ডিজিটাল যন্ত্রপাতির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে।

অর্ধ ও পূর্ণ যোগের বর্তনী : কম্পিউটারে গাণিতিক কাজ করার জন্য ব্যবস্থা বর্তনী।

এনকোডার, ডিকোডার : বাইনারি কোড তৈরি ও ডিজিটাল তথ্য প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত ডিজিটাল বর্তনী।

অনুশীলনী–৩ (২য় অংশ)

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :

ডিজিটাল সিস্টেম

১. আউটপুট Y হবে–

ক. 0 0 0 1 খ. 0 0 1 1

গ. 0 1 0 1 ঘ. 0 1 1 1

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

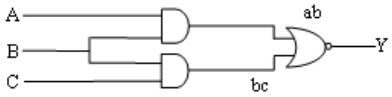

২. চিত্রে Y = ?

ক. $\overline{AB+BC}$ খ. $\overline{A+BC}$

গ. $\overline{AB+AC}$ ঘ. $A+B+C$

৩. উদ্দীপকের Y এর মান A + B + C পেতে হলে NOR গেইট এর পরিবর্তে কোন গেইট ব্যবহার করতে পারি?

ক. NAND খ. XOR

গ. XNOR ঘ. OR

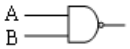

৪. উপরের চিত্রে Output কোনটি?

ক. $\overline{A+B}$ খ. $A+B$

গ. AB-A ঘ. AB

■ X = A.B+ C একটি Boolean সমীকরণ হলে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৫. A =1, B = 0 এবং C = 1 এর জন্য X = ?

ক. 0 খ. 1

গ. 10 ঘ. 11

৬. $\overline{A+B}=\bar{A}.\bar{B}$ উপপাদ্যটির উদ্ভাবক কে?

ক. মারশ্যাল ম্যাকলুহান খ. ডি-মরগ্যান

গ. চার্লস ব্যাবেস ঘ. জর্জ বুলি

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

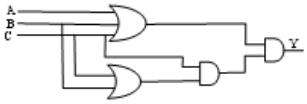

৭. চিত্রে Y = কত?

ক. C (B+C) (A+B+C) খ. (B+C) (A+B+C)

গ. C (A+B) (A+B+C) ঘ. C (A+B+C)

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৮. চিত্রে X এর মান কত?

ক. $\overline{\bar{A}+B}$ খ. $\overline{A+B}$

গ. $\overline{\bar{A}\oplus B}$ ঘ. $\overline{A}\,\overline{B}$

৯. চিত্রে A এবং B এর কোন কোন মানের জন্য X এর মান 1 হবে?

ক. $A=0, B=0$ খ. $A=1, B=0$

গ. $A=0, B=1$ ঘ. $A=1, B=1$

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

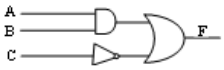

১০. F এর মান কত?

ক. $\overline{(\overline{A+B})\,(\overline{B+C})}$ খ. $A+B+\bar{C}$

গ. $A.B+\bar{C}$ ঘ. $(A+B)\,\bar{C}$

১১. $\overline{(M+\bar{N})\,(\bar{M}+N)}$

ক. MN খ. $\overline{MN}$

গ. $\bar{M}N+M\bar{N}$ ঘ. $\overline{MN}+MN$

১২. যুক্তি এ্যালজেবরার উদ্ভাবক কে?

ক. জর্জ বুল খ. নিউটন

গ. প্যাসকেল ঘ. বিল গেটস

১৩. AND গেইট আউটপুটে '১' পেতে হলে—

ক. সবগুলো ইনপুট ০ হবে

খ. যে কোনটি ইনপুট ০ হবে

গ. সবগুলো ইনপুট ১ হবে

ঘ. সর্বাবস্থাতেই আউটপুট ১ হবে

১৪. বর্তমানে ইউনিকোডের মোট অদ্বিতীয় চিহ্ন সংখ্যা কত?

ক. ৬৫৫৩৬ খ. ৫৬৬৩৬

গ. ৫৬৫৩৬ ঘ. ৬৬৫৩৬

১৫. 3D কোন ধরনের সংখ্যা?

ক. অক্টাল খ. ডেসিমাল

গ. হেক্সাডেসিমাল ঘ. বাইনারী

১৬. বুলিয়ান অ্যালজেবরার মৌলিক কাজ—

ক. ১টি খ. ২টি

গ. ৩টি ঘ. ৪টি

উত্তরমালা

১	ক	২	ক	৩	ক	৪	ঘ	৫	ক	৬	খ	৭	ক	৮	ঘ	৯	ক	১০	গ
১১	গ	১২	ক	১৩	গ	১৪	ক	১৫	গ	১৬	খ								

১৭. ২৬ সংখ্যাটি একটি—
i. দশমিক ii. অক্টাল
iii. হেক্সাডেসিমাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. সবগুলোই

১৮. $F = (A + B) + C$ সমীকরণটি কোন গেইট নির্দেশ করে?
ক. AND খ. OR
গ. NOT ঘ. NOR

১৯. কোন গেইটে একটি ইনপুট ও একটি আউটপুট থাকে?
ক. OR খ. AND
গ. NOT ঘ. NAND

২০. NOR গেটের আউটপুট কোনটির আউটপুটের বিপরীত?
ক. OR খ. AND
গ. X-OR ঘ. X-NOR

২১. কোনটি মৌলিক লজিক গেট?
ক. NAND খ. NOR
গ. OR ঘ. X-OR

২২. X-OR গেইটের আউটপুটের সমীকরণ কোনটি?
ক. $Y = \bar{A}\,\bar{B} + A$ খ. $Y = A\,\bar{B} + A$
গ. $Y = A\,\bar{B} + \bar{A}\,B$ ঘ. $Y = \bar{A}\,\bar{B} + A\,B$

২৩. সার্বজনীন গেইট কোনটি?
ক. AND খ. OR
গ. NAND ঘ. NOT

২৪. X-OR গেটের প্রতীক কোনটি?
ক. 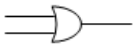 খ. 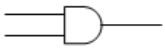
গ. 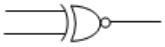 ঘ. 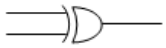

২৫. কোন লজিক গেইটের ইনপুট এবং আউটপুটের সংখ্যা সমান?
ক. AND খ. OR
গ. NOT ঘ. NOR

২৬. মৌলিক লজিক গেইট কয়টি?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৭

২৭. NOR গেইট কোন গেইটের আউটপুটের বিপরীত?
ক. OR খ. AND
গ. X-OR ঘ. X-NOR

২৮. ৫টি ইনপুট বিশিষ্ট ডিকোডারের আউটপুট লাইন কতটি?
ক. ৮টি খ. ১৬টি
গ. ৩২টি ঘ. ৬৪টি

২৯. কোনটি সার্বজনীন লজিক গেইট?
ক. AND খ. NAND
গ. OR ঘ. NOT

৩০. নিচের সত্যক সারণিটি কোন গেইট নির্দেশ করে?

Input	Output
0	1
1	0

ক. AND খ. OR
গ. NOT ঘ. NOR

৩১. 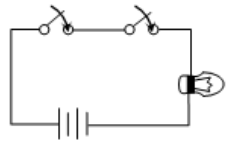
উপরিউক্ত যুক্তি বর্তনীটি কোন গেট নির্দেশ করে?
ক. অ্যান্ড খ. অর
গ. নট ঘ. নর

৩২. নিচের যুক্তি বর্তনীটির আউটপুট কোন লজিক নির্দেশ করে?
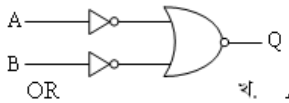

ক. OR খ. AND
গ. XNOR ঘ. NAND

৩৩. নিম্নের কোনটিতে কাউন্টার ব্যবহৃত হয় না?
ক. কম্পিউটারে খ. ডিজিটাল ঘড়িতে
গ. ব্যাংকের টাকা তোলার লাইনে
ঘ. কীবোর্ডে

৩৪. নিম্নের কোনটি সত্য নয়?
ক. একটি এনকোডারের ইনপুট 8টি এবং আউটপুট 256টি
খ. একটি ডিকোডারের ইনপুট 256টি এবং আউটপুট 8টি
গ. একটি ডিকোডারের ইনপুট 8টি এবং আউটপুট 256টি
ঘ. একটি এনকোডারের ইনপুট 256টি এবং আউটপুট 8টি

৩৫.

উপরিউক্ত বর্তনীর আউটপুট হবে—
i. $A + B$ ii. $\bar{A}B + A\bar{B}$
iii. $A \oplus B$
কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৬. সার্বজনীন গেইট হচ্ছে—
i. NAND ii. NOR
iii. AND
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	গ	২০	ক	২১	গ	২২	গ	২৩	গ	২৪	ঘ	২৫	গ	২৬	খ	২৭	ক
২৮	গ	২৯	খ	৩০	গ	৩১	ক	৩২	ক	৩৩	ঘ	৩৪	খ	৩৫	গ	৩৬	ক				

■ নিচের সারণিটি দেখ এবং ৩৭ ও ৩৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

৩৭. সত্যক সারণিটি কোন গেইটকে নির্দেশ করে?
ক. NOR খ. AND
গ. OR ঘ. NOT

৩৮. সত্যক সারণিটির বুলিয়ান সমীকরণ কোনটি?
ক. $X = AB$ খ. $X = A + B$
গ. $X = \overline{AB}$ ঘ. $X = \overline{A + B}$

■ সত্যক সারণিটি দেখ এবং ৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

Input		Output
A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

৩৯. সত্যক সারণিটিতে কোন গেইটের আউটপুট দেয়া আছে?
ক. NOT গেইট খ. AND গেইট
গ. OR গেইট ঘ. কোনোটিই নয়

৪০. NAND গেইট তৈরিতে কোন গেইট ব্যবহৃত হয়?
ক. NOR + NOT খ. OR + NOT
গ. AND + NOT ঘ. X-OR-NOT

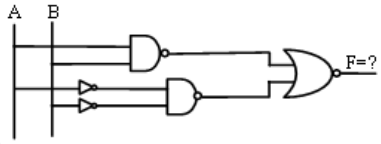

৪১. উদ্দীপকে F এর মান কত?
ক. $\overline{A}\overline{B} + B\overline{A}\overline{B}$ খ. $\overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{B}$
গ. $\overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{B}$ ঘ. $AB + \overline{A}\overline{B}$

■ নিচের উদ্দীপকটির আলোকে ৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

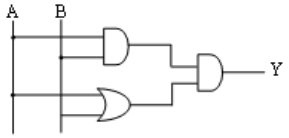

৪২. এখানে Y = ?
ক. $\overline{AB}$ খ. $\overline{\overline{AB}}$
গ. AB.(A+B) ঘ. $\overline{A + B}$

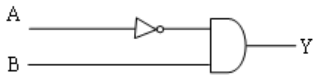

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

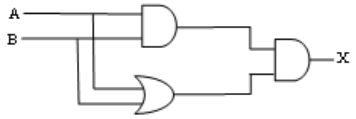

৪৩. উদ্দীপকে X এর মান কত?
ক. (A+B)AB খ. AB + (A+B)
গ. $\overline{(A+B)\,A\,B}$ ঘ. $\overline{A} + \overline{A}\,\overline{(A+B)}$

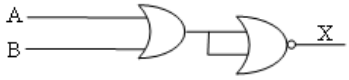

৪৪. X = 1 পেতে হলে A ও B এর মান কত হবে?
ক. A = 0, B = 0 খ. A = 0, B = 1
গ. A = 1, B = 0 ঘ. A = 1, B = 1

৪৫. যদি P, Q, R এবং S চারটি বুলিয়ান চলক হয় তবে এদের দ্বারা সর্বোচ্চ কয়টি কম্বিনেশন তৈরি করা সম্ভব?
ক. ৪ খ. ৮
গ. ১৬ ঘ. ৩২

৪৬. NAND গেইট ব্যবহার করে তৈরি করা যায়–
i. OR গেইট ii. AND গেইট
iii. NOT গেইট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৪৭ ও ৪৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

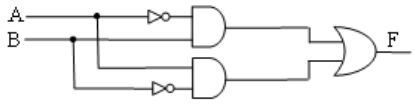

৪৭. চিত্রে F এর মান কত?
ক. $\overline{A}B + A\overline{B}$ খ. $\overline{A}B + \overline{AB}$
গ. $\overline{A}\,\overline{B} + A\overline{B}$ ঘ. $\overline{A}\,\overline{B} + AB$

৪৮. উদ্দীপক থেকে OR গেইটের পরিবর্তে কোন মৌলিক গেইট স্থাপন করলে Ex-NOR গেইট পাওয়া যাবে?
ক. NOR খ. AND
গ. NAND ঘ. NOT

■ উদ্দীপকের আলোকে ৪৯ ও ৫০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

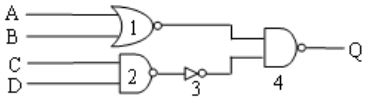

৪৯. নিচের 4 নং গেইটটি হচ্ছে–
ক. OR খ. NAND
গ. NOT ঘ. AND

উত্তরমালা

৩৭	গ	৩৮	খ	৩৯	গ	৪০	গ	৪১	খ	৪২	গ	৪৩	ক	৪৪	ক	৪৫	গ	৪৬	ঘ
৪৭	ক	৪৮	ঘ	৪৯	খ														

৫০. চিত্রে Q = 1 হবে যখন–

i. A = 1, B = 1, C = 1, D = 1
ii. A = 0, B = 1, C = 1, D = 1
iii. A = 1, B = 0, C = 0, D = 1

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫১. OR গেইট ও NOT গেইট মিলে কোন গেইট হয়?

ক. NAND খ. NOR
গ. X-OR ঘ. X-NOR

■ উদ্দীপকের আলোকে ৫২ ও ৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

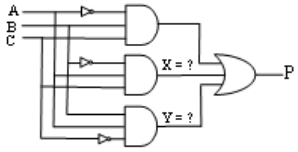

৫২. উপরের চিত্রটির আউটপুট X হবে–

ক. ABC খ. $A\bar{B}C$
গ. $AB\bar{C}$ ঘ. $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$

৫৩. উপরের চিত্রটির আউটপুট Y = 0 হবে যখন–

i. A = 1, B = 1, C = 0 ii. A = 0, B = 1, C = 1
iii. A = 1, B = 0, C = 1

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

■ উদ্দীপকের আলোকে ৫৪ এবং ৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

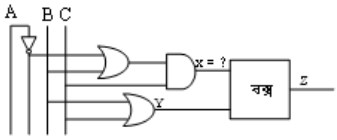

৫৪. X এর মান কত?

ক. $(\bar{A} + \bar{B})C$ খ. $(\bar{A} + B)C$
গ. $(\bar{A} + B)\bar{C}$ ঘ. $\overline{(A+B)}\ C$

৫৫. উদ্দীপকের বক্সে কোন গেইট যুক্ত করলে আউটপুট

$Z = \overline{(\bar{A} + B)+C+B + C}$

ক. AND খ. NOR
গ. X-OR ঘ. OR

৫৬. উপরের গেইটের সাথে একটি NOT গেইট যুক্ত করলে নিচের কোন গেইটের ফলাফল পাওয়া যাবে?

ক. OR খ. AND
গ. NOR ঘ. NAND

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

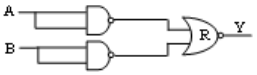

৫৭. চিত্রে R চিহ্নিত গেইটের পরিবর্তে কোন গেইট বসালে Y = A + B হবে–

ক. NOT খ. OR
গ. NAND ঘ. EX–OR

৫৮. রেজিস্টার ব্যবহার করা হয়–

i. 0, 1 স্টোর করতে ii. 0 ও 1 যোগ করতে
iii. Data Shift করতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

■ উদ্দীপকের আলোকে ৫৯ ও ৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

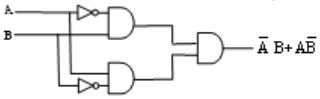

৫৯. চিত্রের আউটপুটটি কোন লজিক গেইটের?

ক. NAND খ. NOR
গ. XOR ঘ. XNOR

৬০. তিন ইনপুট বিশিষ্ট NOR গেইটের ক্ষেত্রে আউটপুট 1 হবে–

ক. সবগুলো ইনপুট 1 হলে খ. সবগুলো ইনপুট 0 হলে
গ. একটি ইনপুট 1 এবং অন্যগুলো 0 হলে
ঘ. একটি ইনপুট 0 এবং অন্যগুলো 1 হলে

■ নিচের উদ্দীপকটির আলোকে ৬১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

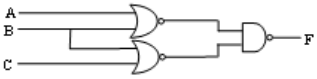

৬১. উপরের লজিক চিত্রটির জন্য সরলীকৃত লজিক চিত্র নিচের কোনটি?

ক. 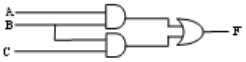

খ.

গ. 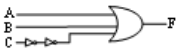

ঘ.

■ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৬২ ও ৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

P	Q	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

৬২. সত্যক সারণিতে প্রাপ্ত আউটপুটটি কোন লজিক গেইটকে নির্দেশ করে?

ক. OR খ. AND
গ. NOT ঘ. XOR

উত্তরমালা

৫০	ক	৫১	খ	৫২	খ	৫৩	গ	৫৪	খ	৫৫	খ	৫৬	খ	৫৭	গ	৫৮	খ
৫৯	গ	৬০	খ	৬১	গ	৬২	খ										

৬৩. লজিক্যাল ফাংশনের কাজ হচ্ছে–
i. জটিল সমীকরণকে সহজ করা
ii. সহজে সার্কিট তৈরি করা iii. যোগফল বের করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৪. ১৬ লাইন Encoder এর ক্ষেত্রে আউটপুট লাইন কয়টি হবে?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৮টি

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৬৫ ও ৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

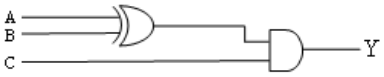

৬৫. চিত্রে Y = ?
ক. (A+B).C খ. A ⊕B⊕C
গ. (A⊕B) C ঘ. (A⊕B) + C

৬৬. উদ্দীপকের গেইটটিতে ব্যবহার করা হয়েছে–
i. AND গেইট ii. OR গেইট
iii. NOT গেইট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৭. NOR গেইট থেকে পাওয়া যায়–
i. AND + OR ii. OR + NOT
iii. NOT + AND
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৬৮ নং ও ৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

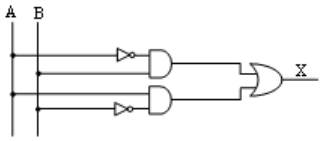

৬৮. চিত্রে X = ?
ক. $\overline{A}B + \overline{A}\,\overline{B}$ খ. $AB + \overline{A}\,\overline{B}$
গ. $\overline{A}B + A\,\overline{B}$ ঘ. $\overline{A}\,\overline{B} + A\,\overline{B}$

৬৯. A ও B এর কোন মানের জন্য X-এর মান 1 হবে?
i. A = 0, B = 0
ii. A = 1, B = 0
iii. A = 0, B = 1
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৭০. কোন বর্তনী B বর্ণকে ASCII-তে রূপান্তর করে?
i. অ্যাডার ii. এনকোডার
iii. ডিকোডার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

■ নিচের সারণিটি লক্ষ্য করে ৭১ ও ৭২নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

৭১. সত্যক সারণিটি কোন গেইটের?
ক. AND খ. OR
গ. Ex-OR ঘ. Ex-NOR

৭২. সত্যক সারণিটির লজিক ফাংশন হলো–
ক. $\overline{A}B + A\overline{B}$ খ. A⊕B
গ. $\overline{A \oplus B}$ ঘ. $\overline{A+B}$

৭৩. সার্বজনীন গেইট হলো–
i. EX-OR গেইট ii. NOR গেইট
iii. NAND গেইট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

■ নিচের সত্যক সারণিটি লক্ষ্য কর এবং ৭৪ ও ৭৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	1	1
1	0	0

৭৪. সত্যক সারণিটি কোন গেইটের?
ক. OR খ. NOR
গ. X-OR ঘ. X-NOR

৭৫. গেটটির লজিক ফাংশন হলো–
i. A⊕B ii. $\overline{A \oplus B}$
iii. $\overline{A}\,\overline{B} + AB$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

৬৩	গ	৬৪	গ	৬৫	গ	৬৬	ঘ	৬৭	খ	৬৮	গ	৬৯	খ	৭০	খ	৭১	ঘ
৭২	গ	৭৩	খ	৭৪	ঘ	৭৫	খ										

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

$$F = ZX + YZ$$
$$= Z(X+Y)$$
$$= \boxed{?}$$
$$= \bar{X}YZ + XZ$$
$$= \bar{X}YZ + XZ(Y+\bar{Y})$$
$$= \bar{X}YZ + X\bar{Y}Z + XYZ$$

ক. এনকোডার কী? ১

খ. যৌগিক গেইট একাধিক মৌলিক গেইটের সমন্বয়ে তৈরি – বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. $\boxed{?}$ চিহ্নিত অংশে কি হবে? প্রমাণসহ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সমীকরণের কোন অংশটি কমসংখ্যক বর্তনী দ্বারা বাস্তবায়ন করা যায় – বিশ্লেষণ কর। ৪

২. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

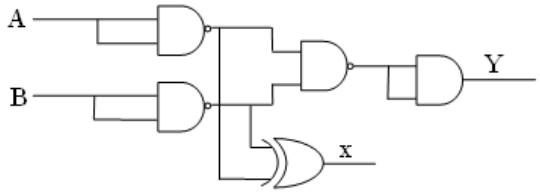

ক. বুলিয়ান পূরক কী? ১

খ. $(97)_{10}$ এর সমকক্ষ BCD কোড এবং বাইনারি সংখ্যার মধ্যে কোনটিতে বেশি বিট লাগে? বুঝিয়ে দাও। ২

গ. উদ্দীপকের Y এর সমীকরণ নির্ধারণ কর। ৩

ঘ. ক্যারি ব্যতীত A এবং B এর শুধু যোগফল, X-এর মানের সমান কিনা? তোমার মতামতের পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

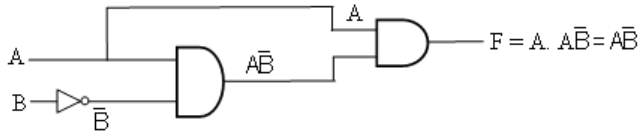

ক. বুলিয়ান অ্যালজেবরা কী? ১

খ. $(169)_{10}$ সংখ্যাকে কম্পিউটার সরাসরি গ্রহণ করে না-ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের বর্তনীটির সমীকরণ ও সত্যক সারণী লিখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বর্তনীটিতে কী ধরনের পরিবর্তন আনলে আউটপুট $F = A + A\bar{B}$ পাওয়া যাবে? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

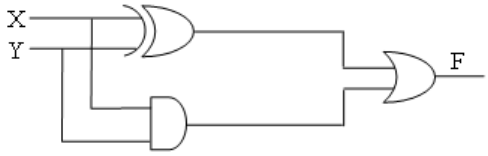

ক. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কী? ১

খ. $\overline{A+B}$ কোন গেইটকে সমর্থন করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে F এর সরলীকৃত মান বের কর। ৩

ঘ. "শুধু NAND গেইট দ্বারা প্রাপ্ত সমীকরণ বাস্তবায়ন সম্ভব"– বিশ্লেষণপূর্বক উক্তিটির সত্যতা যাচাই কর। ৪

৫. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

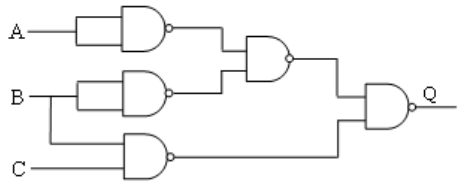

ক. সংখ্যা পদ্ধতির বেস কী? ১

খ. পৃথিবীর সকল ভাষাকে কোন কোডের মাধ্যমে কোডভুক্ত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সার্কিটের আউটপুট Q এর সমীকরণটি সরল কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ব্যবহৃত গেইট দিয়ে সকল গেইট বাস্তবায়ন করা যায় – বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৬. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

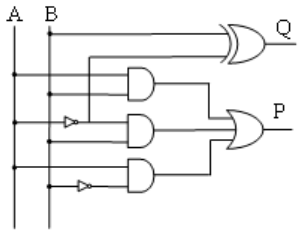

ক. ASCII কী? ১

খ. সত্যক সারণি ব্যবহার করে লজিক বর্তনী আঁকা সম্ভব–ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের লজিক চিত্র থেকে P এর সমীকরণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. P ও Q কে ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করে NAND গেইটের ভিতর প্রবেশ করালে সমীকরণের কী পরিবর্তন হয়? বিশ্লেষণ কর। ৪

৭. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

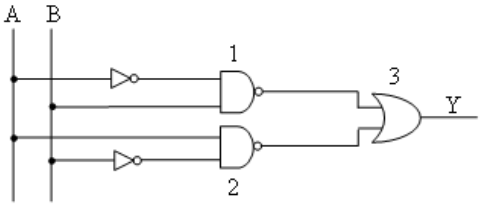

ক. কোড কী? ১

খ. 'বাইনারি যোগ এবং বুলিয়ান যোগ এক নয়'–ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক অনুসারে Y এর সরলীকৃত মান নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ১, ২ ও ৩ নং গেইটে কী পরিবর্তন করলে Y এর মান X-NOR গেইটের আউটপুটের সমতুল্য হবে? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও।

৮. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

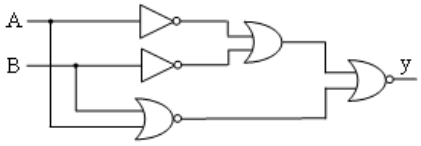

চিত্র–১

P	Q	R
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

চিত্র–২

ক. রেজিস্টার কী? ১

খ. সাধারণ ও বুলিয়ান অ্যালজেবরা এক নয় – ব্যাখ্যা কর। ২

গ. Y এর মান নির্ণয় কর। ৩

ঘ. ১নং চিত্র যে গেইট-এর কার্যকারিতা প্রদর্শন করে তার সাথে ২নং চিত্রের টেবিল যে গেইটকে প্রতিনিধিত্ব করে তাদের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

৯. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

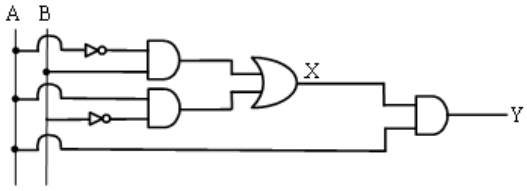

ক. লজিক গেইট কী? ১

খ. "বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করা সম্ভব"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে X এর সরলীকৃত মানের সমতুল বর্তনী অঙ্কন কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপক হতে প্রাপ্ত Y এর মান শুধু NOR গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন সম্ভব"– বিশ্লেষণপূর্বক উক্তিটির সত্যতা যাচাই কর। ৪

১০. নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

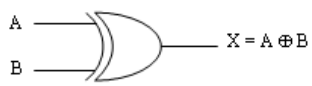

চিত্র-১

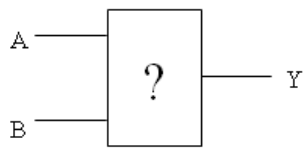

চিত্র-২

ক. অ্যাডার কী? ১

খ. NOR গেট দিয়ে এক্সঅর গেট ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্র-১ এর ব্যাখ্যাসহ সত্যক সারণি নির্ণয় কর। ৩

ঘ. চিত্র-১ ও চিত্র-২ এর সমন্বয়ে গঠিত লজিক সার্কিট কম্পিউটারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে – বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

১১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

চিত্রে দুটি ইনপুটের অরগেট এর প্রতীক এবং ইনপুট গ্রহণের সত্যক সারণি দেয়া হলো–

চিত্র-১

ইনপুট		আউটপুট
A	B	$X = \overline{A \oplus B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

চিত্র-২

ক. বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ কী? ১

খ. সত্যক সারণি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. প্রদত্ত চিত্র-১ এ ইনপুটগুলোর সাথে আরো একটি AND গেইট যুক্ত করলে যে লজিক গেইট পাওয়া যায় তা যুক্তিসহ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চিত্র-২ যে লজিক গেইটকে নির্দেশ করে তা বাস্তবায়নে চিত্র-১ এ কী পরিবর্তন করতে হবে– বিশ্লেষণ কর। ৪

১২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

$ABC + A\bar{B}C + \bar{A}$

ক. কাউন্টার কী? ১

খ. সমীকরণ তৈরিতে সত্যক সারণির গুরুত্ব সংক্ষেপে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের বুলিয়ান ফাংশনটির সরল কর ও যুক্তবর্তনী আঁক। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সমীকরণটি একটি একক গেইটের দ্বারা উপস্থাপন করা যায় – বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

চতুর্থ অধ্যায়

ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML

Introduction to Web Design and HTML

চতুর্থ অধ্যায়

ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML

Introduction to Web Design and HTML

পিরিয়ড সংখ্যা : ২৫

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. ওয়েব ডিজাইনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ২. ওয়েবসাইটের কাঠামো বর্ণনা করতে পারবে ৩. এইচটিএমএল এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে **ব্যবহারিক** ৪. এইচটিএমএল ব্যবহার করে ওয়েবপেজ ডিজাইন করতে পারবে ৫. ওয়েবসাইট পাবলিশ করার প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে পারবে	• ওয়েব ডিজাইনের ধারণা (Concept of webpage design) ○ ওয়েবসাইটের কাঠামো (Website structure) • HTML এর মৌলিক বিষয়সমূহ (HTML basics) ○ HTML এর ধারণা (Concept of HTML) ○ HTML এর সুবিধা (Advantages of HTML) ○ HTML ট্যাগ ও সিনটেক্স পরিচিতি (Introduction to HTML Tags & HTML's Syntax) ○ HTML পেজ লে-আউট ○ HTML-এ টেক্সট ফরম্যাটিং (Formatting) ○ HTML লিঙ্কস : হাইপারলিঙ্ক (Hyperlinks) ○ HTML পেজে ইমেজ যুক্ত করা ○ HTML-এ টেবিলের ব্যবহার • ওয়েবপেজ ডিজাইন করা (Designing webpage) • ওয়েবসাইট পাবলিশ করা (Publish a website)

১. ওয়েব ডিজাইনের ধারণা (Concept of Webpage Design)

ওয়েবপেজ (Webpage)

ইন্টারনেট তথা ওয়েবে তথ্য (লেখা, অডিও, ভিডিও, স্থির ছবি, এনিমেশন ইত্যাদি) সংবলিত পেজ রাখা যায়। বর্তমানে সারা বিশ্বে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তাদের তথ্য ওয়েবে পরিবেশন করছে। ওয়েবে এরূপ কোন তথ্য রাখার পেজকে ওয়েবপেজ বলা হয়। সরাসরি এইচটিএমএল এর মাধ্যমে অথবা অন্য কোন টুলস এর মাধ্যমে ওয়েবপেজ তৈরি করে এইচটিএমএল এ কনভার্ট করা যায়। ব্রাউজারের মাধ্যমে ওয়েবপেজকে প্রদর্শন করা যায়। এক ওয়েবপেজের সাথে অন্য পেজের লিংক তৈরি করা যায়। **একটি ওয়েবসাইটের স্বতন্ত্র কোন পেজকে ওয়েবপেজ বলা হয়।**

ওয়েবসাইট (Website)

একই ডোমেইনের অধীনে একাধিক ওয়েবপেজের সমষ্টিকে ওয়েবসাইট বলা হয়। ধরা যাক, সিসটেক নামক কোম্পানির www.systech.com ওয়েবসাইটটিতে কতগুলো ওয়েবপেজ যেমন-Home, About Us, Contact Us, Products, Services, FAQ's এবং অন্যান্য বিভিন্ন পেজ রয়েছে যেগুলো লিংক দ্বারা পরস্পরের সাথে সংযুক্ত।

Ask.com এর সংজ্ঞানুসারে ওয়েবসাইট হলো- A website is a collection of related web pages and they contain text, images and other graphics that users can view.

ওয়েবসাইটে প্রথম ঢুকলে যে পেজটি প্রদর্শিত হয় সেটিকে হোমপেজ বলা হয়। ইন্টারনেটে সার্বক্ষণিক যুক্ত সার্ভারে ওয়েবসাইট রাখা যায়। কোন ওয়েবসাইটকে যেখানে হোস্ট করা হয় তাকে ওয়েবসার্ভার বলা হয়। মাইক্রোসফটের ওয়েব সার্ভার হলো Internet Information Services (IIS)। ইন্টারনেটে ওয়েবসাইটটি যে সার্ভারে রাখা হবে তার জন্য একটি নির্দিষ্ট ঠিকানা থাকে। এটিকে ইউআরএল (URL-Uniform Resource Locator) বা ওয়েব এ্যাড্রেস বলা হয়। সারা বিশ্বে প্রতিদিন হাজার হাজার ওয়েবসাইট তৈরি হচ্ছে। কোন ওয়েবসাইট যে বিষয়ের সে বিষয়ে কেউ সার্চ করলে সার্চ তালিকায় ঐ ওয়েবসাইটের লিংক চলে আসার ব্যবস্থা করা যায়। এতে করে কেউ শুধু নির্দিষ্ট কোন ওয়েব ঠিকানা ব্যবহার না করেও তার প্রয়োজনীয় কোন বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য সার্চ করে ঐ বিষয় সম্পর্কিত যে কারো ওয়েবসাইটে ঢুকতে পারে। ইন্টারনেটে একটি ওয়েবসাইট খুলতে যা যা করতে হয়ঃ

১. প্রথমে একটি ডোমেইন নেম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।
২. ওয়েবপেজগুলো ডিজাইন করতে হবে।
৩. ওয়েবপেজগুলো সার্ভারে রাখতে হবে।
৪. ওয়েবসাইটটি আরো বেশি প্রচারমুখী করার জন্য সার্চ ইঞ্জিনে সাবমিশন করতে হবে।

ওয়েবসাইটের সুবিধা (Advantages of Website)

বর্তমান ইন্টারনেটের এ যুগে সবচেয়ে স্বল্প খরচে তথ্য প্রকাশ করার সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হলো ওয়েবসাইট। ওয়েবসাইটের বহুবিধ সুবিধা রয়েছে। যেমন –

১. স্বল্প ব্যয়ে কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তাদের ব্যবসায় প্রসারের জন্য ওয়েবসাইট প্রকাশ করতে পারে। প্রিন্ট মিডিয়ার চেয়ে অনেক কম খরচে আকর্ষণীয় সাইট তৈরি করা যায়।
২. ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য যে কেউ যে কোন স্থান থেকে যে কোন সময় দেখতে পারে।
৩. ওয়েবসাইটে লেখার পাশাপাশি ছবি, গ্রাফিক্স, অডিও, ভিডিও এবং এনিমেশন যুক্ত করা যায়।
৪. ওয়েবসাইটে তাৎক্ষণিক তথ্য প্রকাশ করা যায়।
৫. ওয়েবসাইট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ডাউনলোড করা যায়।
৬. যে কোন তথ্য জানার সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হলো ওয়েবসাইট। যে কোন বিষয় যেমন কোন স্থানের তাপমাত্রা, রেলের ও প্লেনের সময়সূচি, ভাড়া ইত্যাদি জানা যায়।
৭. কোন প্রোডাক্ট বা কোন বিষয়ে সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে মতামত জানা যায়।
৮. ঘরে বসে থেকে কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেয়া যায়।

৯. বিশ্বের নামকরা বড় বড় লাইব্রেরির সাইটে ঢুকে বই পড়া যায়।
১০. কোন প্রতিষ্ঠানে সরাসরি না গিয়ে তাদের সাইটে ঢুকে ফর্ম ফিলআপ করা যায়। এতে করে সময় ও অর্থ বাঁচে।
১১. ঘরে বসে বাস, ট্রেন, প্লেনের টিকিট কাটা যায়।
১২. হসপিটালের বা হোটেলের সাইটে ঢুকে রুম বুকিং দেয়া যায়।
১৩. সামাজিক বিভিন্ন সাইটের মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষের সাথে মতবিনিময় করা যায় এবং বন্ধুত্ব করা যায়।
১৪. সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম অল্প খরচে করা যায়। এ ছাড়াও আরো অনেক কাজ করা যায়।

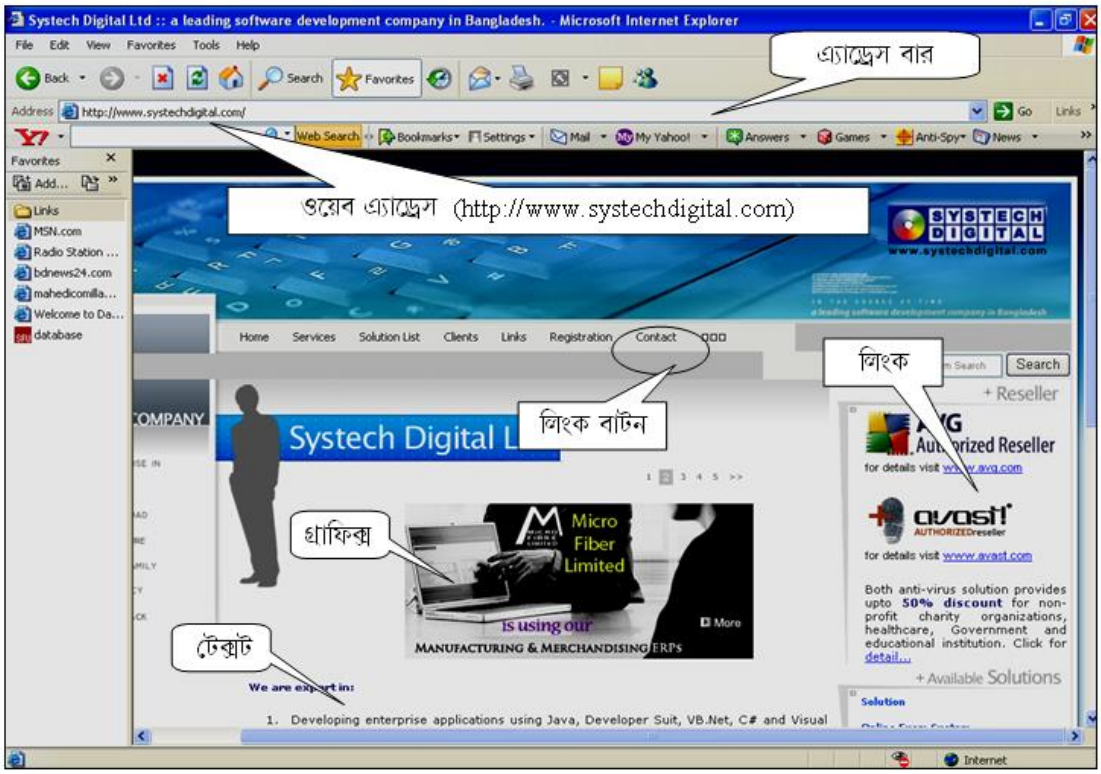

চিত্র ঃ একটি ওয়েবপেজের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে

আইপি এ্যাড্রেস (IP Address)

ইন্টারনেটে যুক্ত প্রতিটি কম্পিউটারের একটি ঠিকানা থাকে। এ ঠিকানাকে বলা হয় আইপি এ্যাড্রেস (IP Address)।

ডোমেইন নেম (Domain Name)

আইপি এ্যাড্রেস নাম্বার দ্বারা লিখিত হয়। আইপি এ্যাড্রেসের জন্য সংখ্যা মনে রাখা কষ্টকর। তাই আইপি এ্যাড্রেসকে সহজে ব্যবহারযোগ্য করার জন্য ইংরেজি অক্ষরের কোন নাম ব্যবহার করা হয়। ক্যারেক্টার ফর্মের দেওয়া কম্পিউটারের এরূপ নামকে ডোমেইন নেম বলা হয়। যেমন, আইপি এ্যাড্রেস ২০৩.৯১.১৩৯.২ এর পরিবর্তে bijoy.net ডোমেইন নেম ব্যবহার করা যায়। ডোমেইন নেমকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যাতে করে একই নাম অন্য কেউ না পায়। যে পদ্ধতিতে ডোমেইন নেমকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাকে DNS (Domain Naming System) বলে। এখানে bijoy.net ডোমেইন নেম-এ দুটি অংশ দেখা যাচ্ছে। ডট-এর পর শেষ অংশটিকে টপ লেভেল ডোমেইন বলা হয়। এটি দেখে সহজেই বুঝা যায় প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের। টপ লেবেল ডোমেইনসমূহকে আবার জেনেরিক এবং কান্ট্রি এ দুটি বৃহৎ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিচের টেবিলে সাত ধরনের জেনেরিক টপ লেভেল ডোমেইন দেখানো হলো।

টপ লেভেল ডোমেইন	ডোমেইন প্রকৃতি	উদাহরণ
.com	কমার্শিয়াল অর্থাৎ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান	microsoft.com, compaq.com
.gov	গভর্নমেন্টাল- রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান	whitehouse.gov
.mil	মিলিটারি-মার্কিন সেনাবাহিনীর জন্য সংরক্ষিত	usarmy.mil, usnavy.mil
.edu	এডুকেশনাল-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	umn.edu, du.edu, buet.edu
.net	নেটওয়ার্ক সার্ভিস	InterNIC.net, bangla.net
.org	অর্গানাইজেশন	most-bd.org, bccbd.org
.int	আন্তর্জাতিক সংস্থা	Wipo.int, un.int

আরো বেশি নির্দিষ্ট করার জন্য ডোমেইন হিসেবে ব্যবহারের জন্য দেশের সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহার করা হয়। যেমন- bijoy.net.bd। এসব টপ লেভেল ডোমেইনকে কান্ট্রি ডোমেইন বলা হয়। নিচে কয়েকটি কান্ট্রি ডোমেইন দেওয়া হলো–

ar	=	আর্জেন্টিনা	my	=	মালয়েশিয়া
au	=	অস্ট্রেলিয়া	nl	=	নেদারল্যান্ড
bd	=	বাংলাদেশ	pk	=	পাকিস্তান
bt	=	ভুটান	sa	=	সৌদি আরব
cn	=	চীন	th	=	থাইল্যান্ড
eg	=	মিসর	tr	=	তুর্কি বা তুরস্ক
id	=	ইন্দোনেশিয়া	uk	=	যুক্তরাজ্য
in	=	ইন্ডিয়া	us	=	যুক্তরাষ্ট্র
jp	=	জাপান	zw	=	জিম্বাবুয়ে
lk	=	শ্রীলংকা			

ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (WWW-World Wide Web)

ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (World Wide Web) কে সংক্ষেপে WWW বলা হয় যা সাধারণভাবে ওয়েব নামেই বেশি পরিচিত। এটি ইন্টারনেটে আন্তঃসংযোগকৃত হাইপারটেক্সট ডকুমেন্টসমূহ সংবলিত একটি পদ্ধতি। ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে যে কেউ ওয়েবপেজসমূহ প্রদর্শন করতে পারে যেটি টেক্সট, ইমেজ, ভিডিও এবং অন্যান্য মাল্টিমিডিয়া কনটেন্টগুলো বহন করে। হাইপারটেক্সট সিস্টেমগুলোর ধারণাকে কাজে লাগিয়ে ইংরেজ পদার্থবিদ স্যার টিম বার্নার্স লি ১৯৮৯ সালের মার্চে একটি প্রস্তাব লিখেন যা পরবর্তীতে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এ রূপ লাভ করে। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব হলো হাইপারটেক্সট পরিমণ্ডলে ইন্টারলিঙ্কযুক্ত ডকুমেন্টের সাধারণ নাম। এসব ডকুমেন্টের সাধারণ পরিচিতি হলো ওয়েবপেজ। এ সকল তথ্য ব্যবহার করার জন্য ইউজারকে কোন ব্রাউজার প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে হয়।

সার্চ ইঞ্জিন (Search Engine)

সার্চ ইঞ্জিন হচ্ছে এমন এক ধরনের টুল যার সাহায্যে ইন্টারনেটের অজস্র ওয়েব সার্ভার থেকে সহজেই যেকোন তথ্য খুঁজে বের করা যায়। বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এমন জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন হচ্ছে গুগল, ইয়াহু, আলটাভিসতা ইত্যাদি।

ওয়েবপেজ ডিজাইন করা (Webpage Design)

ওয়েবসাইট তথা ওয়েবপেজ তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের ল্যাংগুয়েজ বা কোড হচ্ছে HTML। HTML (এইচটিএমএল) এর পুরো অর্থ হলো Hyper Text Markup Language (হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাংগুয়েজ)। প্রকৃত অর্থে এটি কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ নয় বরং একটি মার্কআপ ল্যাংগুয়েজ যা একসারি মার্কআপ ট্যাগ এর সমন্বয়। ওয়েবসাইট বা ওয়েবপেইজকে বর্ণনা করার জন্য এসব মার্কআপ ট্যাগগুলোকে HTML ব্যবহার করে থাকে। সহজে ওয়েবসাইট ডিজাইন করার জন্য বর্তমানে বিভিন্ন টুলস রয়েছে। এসব টুল দিয়ে ডিজাইনকৃত ওয়েব পেজ HTML এ কনভার্ট হয়ে থাকে।

ওয়েবসাইটের কাঠামো (Website structure)

ওয়েবসাইটে বিভিন্ন পেজ থাকে। প্রতিটি পেজে বিভিন্ন উপাদান থাকে। **ওয়েবসাইটের অন্তর্গত বিভিন্ন পেজগুলো সাজানোর লেআউটই হলো ওয়েবসাইটের কাঠামো।** ওয়েবসাইটের বিভিন্ন পেজগুলো লিংক করা থাকে। একটি ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলে প্রথম কোন পেজটি প্রদর্শিত হবে, সেখান থেকে অন্যান্য পেজে কীভাবে যাওয়া যাবে তা ওয়েবসাইটের কাঠামোতে ঠিক করা হয়। একটি ওয়েবসাইটের কাঠামো মূলত তিন ভাগে বিভক্ত থাকে। যথা-

১. হোমপেজ (Homepage)
২. মূলধারার পেজ (Main section)
৩. উপ-ধারার পেজ (Sub section)

লেআউট হলো একটি পেজের প্রধান কন্টেন্ট এরিয়ার স্ট্রাকচার বা অবকাঠামো। একটি সম্পূর্ণ ওয়েবসাইট তৈরি করা অনেক সময়সাপেক্ষ। তাই সাইট তৈরি করার পূর্বেই এর বিভিন্ন উপাদানগুলো কীভাবে সজ্জিত হবে তার একটি লেআউট তৈরি করে নিলে কাজের সুবিধা হয়। যেমন, টাইটেল, হেডিং, প্রধান কন্টেন্ট (টেক্সট, ইমেজ, লিংক ইত্যাদি), ফুটার ইত্যাদি কোনটি কোথায়, কীভাবে স্থাপিত হবে তার পরিকল্পনা বা ছককে লেআউট বলা হয়।

Basic Website Layout

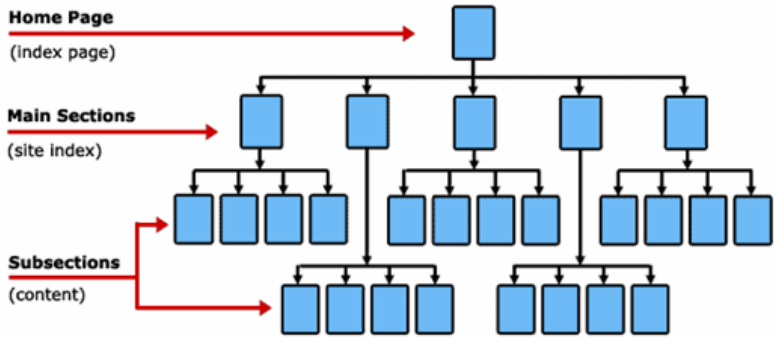

পদার্থবিধ টিম বার্নার্স লি ছিলেন সার্নের (European Laboratory for Particle Physics) একজন গবেষক। সার্নে মূলত বিশ্বের সকল পদার্থবিদদের মিলনস্থল। বিভিন্ন তথ্য নিয়ে কাজ করতে হতো গবেষকদের। আর এই তথ্যগুলো শেয়ার করারও প্রয়োজন হতো। মূলত কম্পিউটারে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তখন তথ্য এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে আদান প্রদান করা হতো এবং তা ডাউনলোড করে ব্যবহার করা হতো। টিম চাইলেন এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একই কম্পিউটার থেকে তথ্যগুলো সবাই সহজে পেতে পারে এবং একই সাথে তথ্যের পরিবর্তন সাধন করাও সহজ হয়। কারণ অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক ডকুমেন্ট আদান প্রদান করার পরে তা নিয়ে গবেষণা একটা ঝামেলার ব্যাপার ছিল। তথ্য পরিবেশনের জন্য তিনি ১৯৮৯ সালে একটি হাইপারটেক্সট ফরমেট প্রবর্তন করেন। ১৯৯০ সালে ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেমের ব্যবহার ব্যাপক বেড়ে গেল এবং ইন্টারনেটের ধারণা প্রচলিত হলো, যার ফলে তথ্য শেয়ারের মাধ্যম হিসেবে হাইপারটেক্সট পদ্ধতি সবার মাঝে চলে আসে। ১৯৯০ সালের মাঝের দিকে ডোমেইন নেম সিস্টেম প্রবর্তন হয় এবং ইন্টারনেটের প্রতিটি পাতার একটি ইউনিক লিংক হিসেবে চালু হয়। আর লি'র নিজস্ব প্রটোকল HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)'র মাধ্যমে যে হাইপারটেক্সট পাতাগুলো শেয়ার হয় তার নাম দেয়া হলো হাইপারটেক্সট মার্কআপ ল্যাংগুয়েজ তথা HTML. ১৯৯১ সালে HTML এর ট্যাগ এবং টেক্সট প্রকাশের পদ্ধতিটি আন্তর্জাতিক আলোচনায় চলে আসে।

ওয়েবসাইট কাঠামোর প্রকারভেদ (Types of Website structure)

একটি ওয়েবসাইটের গঠনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। ওয়েবসাইটের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এর কাঠামোকে নিম্নোক্ত চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. হায়ারারকিক্যাল কাঠামো (Hierarchical structure)
২. নেটওয়ার্ক কাঠামো (Network structure)
৩. লিনিয়ার কাঠামো (Linear structure)
৪. কম্বিনেশন কাঠামো (Combination structure)

হায়ারারকিক্যাল কাঠামো (Hierarchical structure)

এ পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটের বিভিন্ন শাখাগুলোকে আলাদাভাবে সংযুক্ত করা হয়ে থাকে। এতে করে ওয়েবসাইটের ভিজিটররা সহজেই বুঝতে পারে কোন অংশে তার প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো রয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট যেমন- কোন স্কুল, কলেজ বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এ ধরনের হয়ে থাকে। নিম্নে একটি উদাহরণের মাধ্যমে হায়ারারকিক্যাল কাঠামো দেয়া হল :

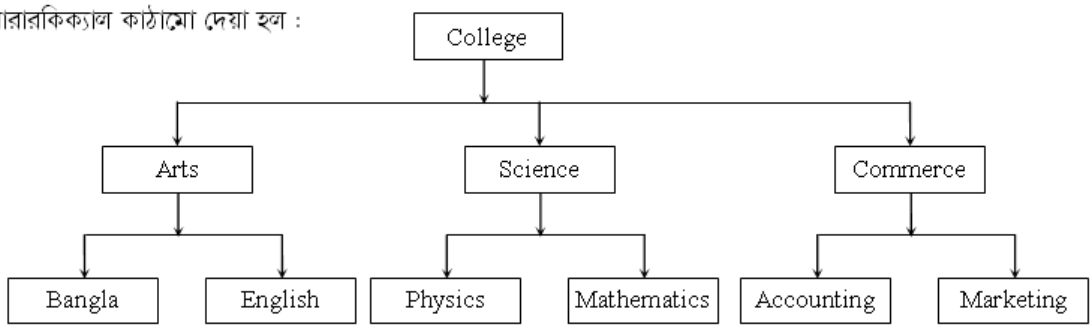

চিত্র : হায়ারারকিক্যাল স্ট্রাকচার

নেটওয়ার্ক কাঠামো (Network structure)

এ ধরনের কাঠামোতে সবগুলো পেজেরই একে অপরের সাথে লিংক থাকে অর্থাৎ একটি মেইন পেজের সাথে যেভাবে অন্যান্য পেজের যেমন লিংক থাকে ঠিক তেমনি অন্যান্য পেজের সাথেও মেইন পেজের লিংক থাকে। ফ্রেম ব্যবহার করে তৈরি করা ওয়েবসাইটগুলো এ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে লিংক করা হয়ে থাকে যাতে একটি ফ্রেমের মধ্যে অন্যান্য পেজের লিংকগুলো মেনু আকারে রাখা হয়। এই ফ্রেমটি সাধারণত স্থির থাকে এবং কোন একটি লিংক নির্বাচন করলে ঐ পেজটি অপেক্ষাকৃত বড় ফ্রেমের মধ্যে দেখায়।

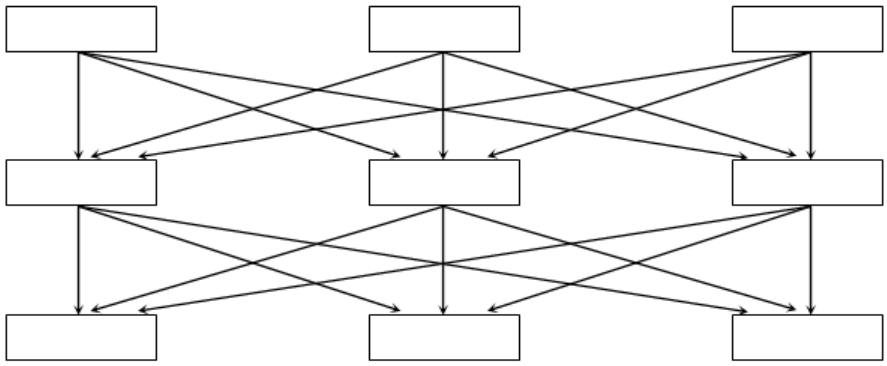

চিত্র : নেটওয়ার্ক স্ট্রাকচার

লিনিয়ার কাঠামো (Linear structure)

যখন একটি ওয়েবসাইটের পেজগুলো নির্দিষ্ট সিকুয়েন্স অনুসারে ভিজিট করার প্রয়োজন হয় তখন লিনিয়ার স্ট্রাকচার ব্যবহার করা হয়। কোন পেজের পর কোন পেজ আসবে তা ওয়েবপেজ ডিজাইন করার সময় ঠিক করা হয়ে থাকে। এ ধরনের পেইজগুলোতে সাধারণত Next, Previous, Last, First ইত্যাদি লিংক ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে পেজগুলো একটির পর আরেকটি এভাবে সিকুয়েন্স অর্ডার অনুযায়ী লিংক করা থাকে।

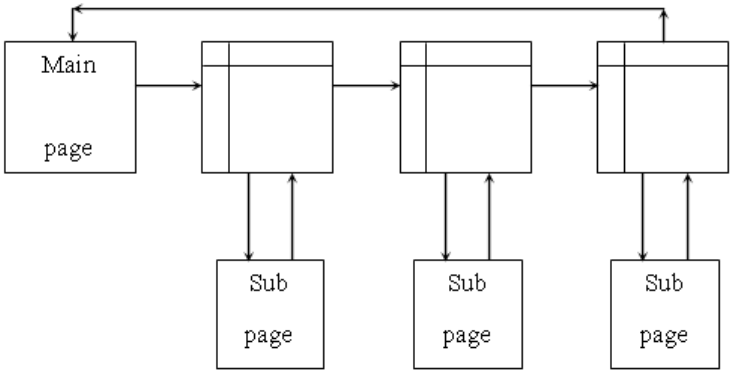

চিত্র : লিনিয়ার স্ট্রাকচার

কম্বিনেশন কাঠামো (Combination structure)

যখন একাধিক স্ট্রাকচার ব্যবহার করে ওয়েবসাইট ডিজাইন করা হয় তখন তাকে কম্বিনেশন বা মিক্সড স্ট্রাকচার বলা হয়। একাধিক স্ট্রাকচার ব্যবহার করলে ওয়েবসাইটের সৌন্দর্য যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি ভিজিটরদের জন্য ভিজিট করাও সহজ হয়।

দলীয় কাজ : তোমাদের কলেজের একটি ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য লে-আউট তৈরি করে দেখাও।

ইউআরএল (URL)

কোন ওয়েবপেজকে প্রদর্শন করতে ওয়েব ব্রাউজারে এর ঠিকানা নির্দিষ্ট করে দিতে হয়। URL (Universal Resource Locator) হলো ওয়েবসাইটের একক (Unique) ঠিকানা। প্রতিটি URL-এ থাকে-

১. ওয়েব প্রোটোকল (Web Protocol)
২. ওয়েব সার্ভারের নাম (Web Server name/Domain Name)
৩. সার্ভারের ডিরেক্টরি/ফোল্ডার নাম (Server Directory/Folder name)
৪. html ফাইল নাম (html file name)

নিচে একটি ইউআরএল এর বর্ণনা দেয়া হলো-

ওয়েব প্রোটোকল : http (hyphertext transfer protocol) প্রোটোকল হলো তথ্য বিনিময়ের যোগাযোগ নিয়ম যা ওয়েব ব্রাউজারকে ওয়েব সার্ভারের সাথে যোগাযোগ করার অনুমতি দেয়। সাধারণত প্রায় সব ওয়েব এ্যাড্রেসই শুরু হয় http:// দিয়ে। তাই ওয়েব এ্যাড্রেসে এ অংশটি লিখা হয় না। www অংশ দিয়েই শুরু করা হয়।

ওয়েব সার্ভার : সুনির্দিষ্ট একটি কম্পিউটার যেটিতে এ ওয়েবসাইটি আছে। World Wide Web এর সংক্ষিপ্তরূপ হলো www। এখানে systechdigital হলো প্রতিষ্ঠানটির নাম এবং com হলো টপ ডোমেইন যেটি দিয়ে বুঝা যায় এটি একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান।

সার্ভারের ডিরেক্টরি/ফোল্ডার নাম : সার্ভারের মধ্যে ওয়েবপেজগুলো যে ডিরেক্টরিতে আছে ওয়েব ব্রাউজার এ ডিরেক্টরি থেকে কাঙ্ক্ষিত ফাইল খোলে প্রদর্শন করে।

html ফাইল : html ফাইল হলো নির্দিষ্ট কোন পেজ। .html হলো ফাইলটির এক্সটেনশন। ব্রাউজারকে নির্দিষ্ট করে যে ফাইলটি তা হলো html (hyphertext markup language).

ওয়েবসাইটের প্রকারভেদ (Types of Website)

গঠন বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করে পেজ বা ওয়েবসাইটকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

১. স্ট্যাটিক ওয়েবপেজ বা স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট (Static Webpage or Static Website)
২. ডাইনামিক ওয়েবপেজ বা ডাইনামিক ওয়েবসাইট (Daynamic Webpage or Dynamic Website)

স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট (Static Website) : যে সকল ওয়েবপেজে পূর্ব থেকে তৈরিকৃত কিছু তথ্য প্রদর্শন করে থাকে সে সকল ওয়েবপেজকে স্ট্যাটিক ওয়েবপেজ বলে। সাধারণত HTML ভাষা ব্যবহার করে স্ট্যাটিক ওয়েবপেজ তৈরি করা হয়।

ডাইনামিক ওয়েবসাইট (Dynamic Website) ঃ যে সকল ওয়েবপেজে আপডেট তথ্য প্রদর্শন করে অর্থাৎ পরিবর্তিত তথ্য প্রদর্শন করে সে সকল ওয়েবপেজকে ডাইনামিক ওয়েবপেজ বলে। যেমন- ক্রিকেট লাইভ স্কোর। সাধারণত PHP, ASP, JSP ভাষা ব্যবহার করে ডাইনামিক ওয়েবপেজ তৈরি করা হয়। আবার অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ওয়েবপেজ দুই প্রকার–

১. লোকাল ওয়েবপেজ বা ওয়েবসাইট (Local webpage or website)
২. রিমোট ওয়েবপেজ বা ওয়েবসাইট (Remote webpage or website)

লোকাল ওয়েবপেজ ঃ যে সকল ওয়েবপেজ সাধারণত নিজস্ব কম্পিউটার বা সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয় এবং সোর্স ড্রাইভ ও ডিরেক্টরি থেকে সহজেই ব্যবহার করা যায় সেগুলোকে লোকাল ওয়েবপেজ বলা হয়। এ ধরনের ওয়েবপেজ ব্যবহারের জন্য ইন্টারনেট সংযোগের প্রয়োজন হয় না।

রিমোট ওয়েবপেজ ঃ দূরবর্তী কোন কম্পিউটারে সংরক্ষিত ওয়েব পেইজগুলোকে রিমোট ওয়েবপেজ বলা হয়। রিমোট ওয়েবপেজ ডাউনলোড করার জন্য ইন্টারনেট সংযোগের প্রয়োজন হয়। এ ধরনের ওয়েবপেজ ব্রাউজিং-এর জন্য ওয়েব অ্যাড্রেস জানার প্রয়োজন হয়। এরূপ অ্যাড্রেসকে URL (Universal Resource Locator) বলা হয়।

স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট এবং ডাইনামিক ওয়েবসাইট এর মধ্যকার পার্থক্য

স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট (Static websites)	ডাইনামিক ওয়েবসাইট (Dynamic websites)
১. নির্দিষ্ট সংখ্যক পেজ থাকে।	১. ডাইনামিকভাবে পেজ তৈরি হয়।
২. ওয়েবসাইটের থিম এবং ওয়েবপেজের কন্টেন্ট নির্দিষ্ট।	২. ওয়েবপেজ ডিজাইন এবং কন্টেন্ট রান টাইমে পরিবর্তিত হয়।
৩. কয়েকটি মাত্র মার্কআপ কন্টেন্ট থাকায় দ্রুত লোড হয়।	৩. ডাইনামিকভাবে কন্টেন্ট তৈরি হওয়ার জন্য লোড দেরি হয়।
৪. কখনো ডেটাবেজ কানেক্টিভিটি ব্যবহার করে না।	৪. ডেটাবেজ কানেক্টিভিটি ব্যবহার করে।
৫. তুলনামূলকভাবে বেশি নিরাপদ।	৫. তুলনামূলকভাবে কম নিরাপদ।
৬. কোন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রদর্শন করে।	৬. এখানে রান টাইমে কন্টেন্ট পরিবর্তন হয় যেমন ই-কমার্স, অনলাইন এক্সাম ইত্যাদি ওয়েবসাইটের তথ্য প্রদর্শন করে।

স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট (Static websites)	ডাইনামিক ওয়েবসাইট (Dynamic websites)
৭. সরাসরি রান করে। অন্য সার্ভার ল্যাংগুয়েজের প্রয়োজন হয় না। সাধারণত HTML এবং CSS দিয়ে তৈরি করা হয়।	৭. সার্ভারে এপ্লিকেশন রান করে এবং আউটপুট ওয়েবপেজে প্রদর্শন করে। তাই এতে সার্ভার এপ্লিকেশন ল্যাংগুয়েজ যেমন- PHP , Asp.NET, JSP ইত্যাদির প্রয়োজন হয়।
৮. ডেভলপ করা সহজ।	৮. ডেভলপ করা, টেস্ট করা, ব্যবস্থাপনা করার জন্য দক্ষ ডেভলপারের প্রয়োজন হয়।
৯. পরিবর্তন করলে পুনরায় সার্ভারে আপলোড করতে হয়।	৯. সার্ভার এপ্লিকেশন ব্যবহার করে কন্টেন্ট পেজ পরিবর্তন করা যায় বিধায় সার্ভারে আপলোড করার প্রয়োজন হয় না।

ওয়েব ব্রাউজার (Web Browser)

ওয়েব ব্রাউজার হলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব রিসোর্স থেকে তথ্য খুঁজে বের করা, উপস্থাপন করা এবং সংরক্ষণ করার একটি এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। ওয়েব ব্রাউজার দ্বারা উপস্থাপিত পেজের হাইপারলিংকে ক্লিক করে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য প্রদর্শন করা যায়। ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে একসেস করা ছাড়াও প্রাইভেট নেটওয়ার্কের ওয়েব সার্ভারেও একসেস করা যায়। বেশি প্রচলিত ওয়েব ব্রাউজারসমূহ হলো–

১. ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার (Internet Explorer)
২. ফায়ারফক্স (Firefox)
৩. গুগল ক্রোম (Google Chrome)
৪. সাফারি (Safari)
৫. ওপেরা (Opera)

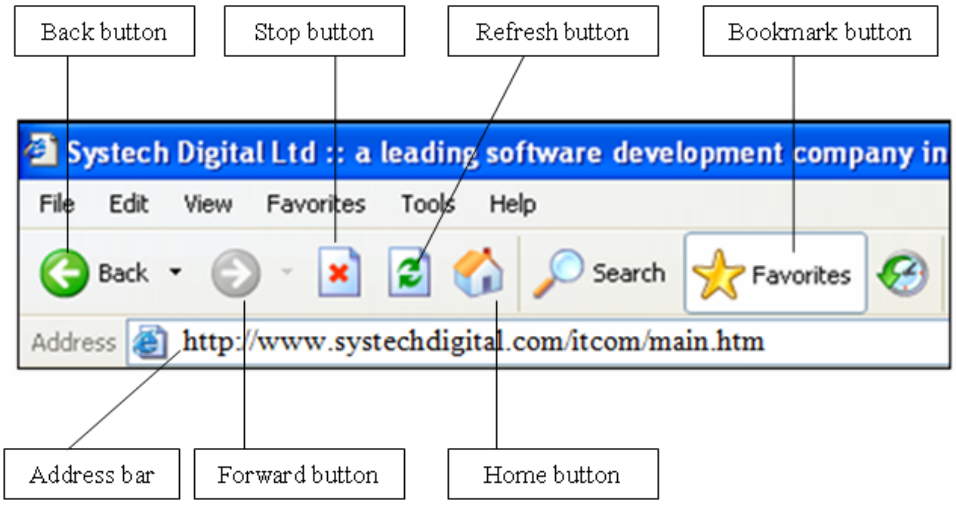

২. HTMLএর মৌলিক বিষয়সমূহ

২.১ এইচটিএমএল এর ধারণা (Concept of HTML)

এইচটিএমএল (HTML-Hypertext Markup Language) ওয়েবপেজ তৈরির জন্য বহুল ব্যবহৃত একটি প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ। এটি মূলত টেক্সটভিত্তিক প্রোগ্রাম ভাষা। ওয়েব ডেভেলপার হতে হলে এ ল্যাংগুয়েজটি সবার আগে

ভালোভাবে শিখতে হয়। ১৯৮০ সালের দিকে টিম বার্নার্স লি (Tim Berners Lee) এ ভাষার প্রাথমিক রূপ প্রদান করেন। HTML ব্যবহার করে সহজেই ওয়েবপেজ ডিজাইন করা যায়। HTML ফাইলে লেখা (টেক্সট) এবং অডিও, ভিডিও, গ্রাফিক্স, এনিমেশন ইত্যাদি লিংক করার কাজ করা যায়। এইচটিএমএল কতগুলো Markup ট্যাগের সমষ্টি যা ওয়েবপেজে বিভিন্ন এলিমেন্ট কীভাবে প্রদর্শন করবে তা নির্দেশ করে। প্রথমে HTML তৈরির উদ্দেশ্য ছিল বৈজ্ঞানিক গবেষণার তথ্য/উপাত্ত দ্রুত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আদান প্রদানের ব্যবস্থা করা। ১৯৯০ সালের দিকে NCSA কর্তৃক ডেভেলপকৃত মোজাইক ব্রাউজারের মাধ্যমে HTML পরিচিতি লাভ করে। ১৯৯৭ এর জানুয়ারিতে WC3 কর্তৃক প্রথম ডেভেলপকৃত HTML3.2 প্রকাশিত হয়। একই বছরের শেষে ডিসেম্বরে WC3 HTML এর নতুন সংস্করণ HTML4.2 প্রকাশ করে। ২০১০ সালে বর্তমানে প্রচলিত HTML এর সর্বশেষ ভার্সন HTML5 জনসম্মুখে পরিচিতি লাভ করে। বর্তমানে এইচটিএমএল ৫ সংস্করণ নিয়ে কাজ করা হয়। স্মার্টফোন ও ট্যাবলেটের মতো ডিভাইস বিবেচনায় রেখে এইচটিএমএল ৫ এর অনেক ফিচার নির্মিত হয়েছে। টেক্সট এডিটর ব্যবহার করে ওয়েব পেজের জন্য HTML ফাইল তৈরি করা যায় এবং HTML ফাইলের এক্সটেনশন হলো .html বা .htm ।

২.২ এইচটিএমএল এর সুবিধা (Advantages of HTML)

ওয়েবপেজ লেখার জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ল্যাংগুয়েজ হলো এইচটিএমএল। এটি ব্যবহার করা সহজ। নিচে এর সুবিধাদি সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো–

১. এইচটিএমএল ভাষা শেখা ও ফরমেটিং করা সহজ। প্লেইন টেক্সট বিধায় এডিট করা সহজ।
২. প্রায় সব ধরনের ব্রাউজার সমর্থন করে।
৩. XML এর সিনট্যাক্সের সাথে অনেক মিল রয়েছে যা ডেটা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
৪. উইন্ডোজের সাথে ফ্রি এডিটর।
৫. ওয়েব ফর্ম ডিজাইন করা যায়, ওয়েবপেজে সহজেই অডিও, ভিডিও এবং অ্যানিমেশন যুক্ত করা যায়।
৬. এটি ইউজার ফ্রেন্ডলি। প্রোগ্রামিং সম্পর্কে ধারণা নেই এমন ব্যবহারকারীরাও সহজে শিখতে পারে।
৭. এটি সিএসএস (ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট) এবং জাভাস্ক্রিপ্ট এবং কিছু অ্যাপলেটের সাথে মিথস্ক্রিয়।
৮. এটি একটি ওপেন টেকনোলজি।
৯. এইচটিএমএল এ তৈরি করা যে কোন সাইটকে রক্ষণাবেক্ষণ এবং আপডেট করা সহজ।
১০. এইচটিএমএল এ তৈরি করা ওয়েবপেজকে লোড করতে কম সময় লাগে।
১১. HTML validator এর সাহায্যে এইচটিএমএল এ তৈরি করা পেজের সিনট্যাক্স এরর বের করা যায়।
১২. সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজ ফ্রেন্ডলি সাইট তৈরি করা যায়।
১৩. পেজের সাইজ কম হওয়াতে হোস্টিং স্পেস কম লাগে। তাই এটি মূল্য সাশ্রয়ী।

এইচটিএমএল এর অসুবিধা (Disadvantages of HTML)

১. একটি সাধারণ ওয়েবপেজ তৈরি করার জন্য অনেক কোড লিখতে হয়।
২. শুধুমাত্র স্টেটিক এবং প্লেইন পেজ তৈরি করা যায়। ডাইনামিক পেজ তৈরিতে ব্যবহৃত হয় না।
৩. HTML এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই দুর্বল।
৪. বড় কোডে লেখা পেজ চালানো জটিলতার সৃষ্টি হয়।

২.৩ এইচটিএমএল ট্যাগ (HTML Tags)

এইচটিএমএল হলো একটি মার্কআপ ল্যাংগুয়েজ, টেক্সট-বেজড ল্যাংগুয়েজ যা ওয়েবপেজ লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়। এইচটিএমএল ট্যাগস হলো এইচটিএমএল ডকুমেন্টের সাথে এমবেডেড কোডিং নির্দেশাবলি (ইন্সট্রাকশনস)। ওয়েব ব্রাউজার এইচটিএমএল ট্যাগ এর লেখা প্রদর্শন করে থাকে। ট্যাগ হলো কীওয়ার্ড যা জোড়া অ্যাঙ্গেল ব্রাকেটের মধ্যে লিখতে হয়। প্রথম অ্যাঙ্গেল ব্রাকেট < > কে ওপেনিং ট্যাগ এবং স্ল্যাসসহ শেষ অ্যাঙ্গেল ব্রাকেট <\ > কে ক্লোজিং ট্যাগ বলা হয়। HTML Tags সিনটেক্স :

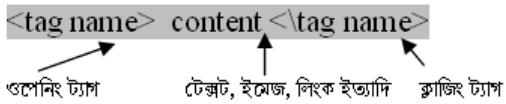

ট্যাগগুলো সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় আসে; যেমন– এবং । এ জোড়ার প্রথম ট্যাগটি হলো শুরুর ট্যাগ আর দ্বিতীয়টি হলো শেষ করার ট্যাগ। এ ট্যাগগুলোকে ওপেনিং ট্যাগ এবং ক্লোজিং ট্যাগ নামেও ডাকা হয়। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, কোনো ট্যাগ শুরু করলে অবশ্যই সেটি শেষ করার জন্য ওই ট্যাগের শেষের দ্বিতীয় অংশটুকু ব্যবহার করতে হবে। যেমন–

This is a paragraph. ।

ট্যাগ এর গঠন :

- অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর চিহ্ন (A less-than sign " < ")
- একটি অক্ষর বা শব্দ (A word or character)
- অপশনাল স্পেস এর পর এইচটিএমএল এট্রিবিউট যার গঠন হলো : এট্রিবিউট নাম = "ভ্যালু"
- অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর চিহ্ন (A greater-than sign " > ")
- শেষ ট্যাগে ফ্রন্ট স্ল্যাশ চিহ্ন "/")।

এইচটিএমএল এলিমেন্ট (HTML Element)

HTML ডকুমেন্টগুলো HTML এলিমেন্ট দ্বারা নির্ধারিত হয়। HTML এলিমেন্ট বলতে স্টার্ট ট্যাগ ও ইন্ড ট্যাগের ভেতরের সবকিছু বুঝায়। এদেরকে ওপেনিং ট্যাগ এবং ক্লোজিং ট্যাগও বলে।

স্টার্ট ট্যাগ/ওপেনিং ট্যাগ	এলিমেন্ট কনটেন্ট	ইন্ড ট্যাগ/ক্লোজিং ট্যাগ
	This is a paragraph	
<a href="default.htm" >	This is a link	</a>

এইচটিএমএল এলিমেন্ট সিনট্যাক্স (HTML Element Syntax)

- HTML এলিমেন্ট শুরু হয় ওপেনিং ট্যাগ দিয়ে, আর শেষ হয় ইন্ড ক্লোজিং ট্যাগ দিয়ে।
- স্টার্ট ও ইন্ড ট্যাগের মধ্যবর্তী সবকিছুই হলো এলিমেন্ট কনটেন্ট।
- কিছু কিছু HTML এলিমেন্টের কোনো কনটেন্ট থাকে না। এগুলোকে এম্পটি কনটেন্ট বলে।
- এম্পটি বা খালি এলিমেন্টগুলো স্টার্ট ট্যাগের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়।
- অধিকাংশ HTML এলিমেন্টের অ্যাট্রিবিউট থাকতে পারে।

নেস্টেড HTML এলিমেন্টস

অধিকাংশ HTML এলিমেন্টগুলো নেস্টেড হতে পারে। অর্থাৎ এগুলোতে অন্যান্য HTML এলিমেন্ট থাকতে পারে। HTML ডকুমেন্টগুলো নেস্টেড HTML এলিমেন্টসমূহ নিয়ে গঠিত হয়। নিচের উদাহরণটি লক্ষণীয়। এটি তিনটি HTML এলিমেন্ট নিয়ে গঠিত।

```
<html>
<body>
<p>This is my first paragraph</p>
</body>
</html>
```

উদাহরণের ব্যাখ্যা ঃ

** এলিমেন্ট**

```
<p>This is my first paragraph</p>
```

- এলিমেন্ট HTML ডকুমেন্টের মধ্যে একটি প্যারাগ্রাফকে নির্ধারণ করে।
- এলিমেন্টটির একটি ওপেনিং ট্যাগ এবং একটি ইন্ড ট্যাগ রয়েছে।
- এলিমেন্টটির কনটেন্ট হলো This is my first paragraph।

<body> এলিমেন্ট

```
<body>
<p>This is my first paragraph</p>
</body>
```

- <body> এলিমেন্ট HTML ডকুমেন্টের কাঠামোটিকে নির্ধারণ করে।
- এলিমেন্টটির একটি স্টার্ট ট্যাগ <body> এবং একটি ইন্ড ট্যাগ </body> রয়েছে।
- এই এলিমেন্টের কনটেন্টটি হলো আরেকটি HTML এলিমেন্ট (একটি প্যারাগ্রাফ)।

<html> এলিমেন্ট

```
<html>
<body>
<p>This is my first paragraph</p>
</body>
</html>
```

- <html> এলিমেন্ট পুরো HTML ডকুমেন্টটিকেই নির্ধারণ করে।
- এলিমেন্টটির একটি স্টার্ট ট্যাগ <html> এবং একটি ইন্ড ট্যাগ </html> রয়েছে।
- এই এলিমেন্টের কনটেন্টটি হলো আরেকটি HTML এলিমেন্ট (বডি)।

এম্পটি HTML এলিমেন্টসমূহ

কনটেন্ট নেই এমন ধরনের HTML এলিমেন্টকে এম্পটি এলিমেন্ট বলে। এই এলিমেন্টগুলো স্টার্ট ট্যাগেই শেষ হয়ে যেতে পারে। যেমন :
 হলো একটি এম্পটি এলিমেন্ট, যার কোনো ক্লোজিং ট্যাগ নেই। লাইনের মাঝে ব্রেক দেবার জন্য
 ব্যবহার করা হয়। HTML ট্যাগগুলো কেস সেনসিটিভ নয়। <P> দিয়ে যা বুঝায় দিয়েও তাই বুঝায়। ছোট বড় হরফের জন্য কোনো সমস্যা হয় না। তবে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব কনসোর্টিয়াম (W3C) এর পরামর্শ হলো HTML 4 এ লোয়ারকেস ব্যবহার করা।

এইচটিএমএল এট্রিবিউট (HTML attribute)

এট্রিবিউট হচ্ছে কোন কিছুর বৈশিষ্ট্য নির্ধারক নির্দেশ। ধরা যাক, কোন টেক্সটে একটি শব্দ আছে। এ শব্দটি যদি লাল রং করা হয় তাহলে এর এট্রিবিউট হবে রেড কালার। এইচটিএমএল ডকুমেন্টের জন্য এট্রিবিউট খুবই প্রয়োজনীয়। এট্রিবিউট ছাড়া ওয়েবপেজে অনেক তথ্য যেমন ছবি, হাইপারলিংক, এ্যাংকর নাম ইত্যাদি যুক্ত করা যায় না। এট্রিবিউট হিসেবে নির্দিষ্ট ফরমেট বা সিনট্যাক্স অনুসরণ করা হয়। HTML tag এর সাথে এট্রিবিউট যুক্ত করার জন্য ট্যাগ নামের পর স্পেস দিয়ে এট্রিবিউট নাম, সমান চিহ্ন (=) এবং কোটেশন চিহ্নের মধ্যে এট্রিবিউট ভ্যালু দিতে হবে। যেমন : This is paragraph এ টেক্সটটি একটি প্যারাগ্রাফ হিসেবে প্রদর্শিত হবে এবং টেক্সট এর রং হবে লাল। এর জন্য কোড লিখতে হবে–

```
<p style="color:red;"> This is paragraph </p>
```

নিচে এ কন্টেন্ট এর বিভিন্ন অংশকে চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে।

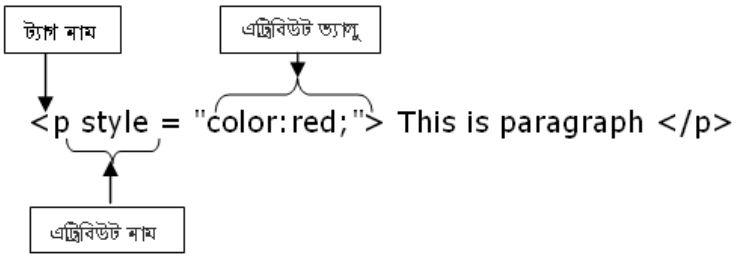

এইচটিএমএল সিনট্যাক্স (HTML syntax)

কতকগুলো বিধিবদ্ধ রীতি অনুসারে প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের সাহায্যে প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়। এ রীতিকে বলা হয় ল্যাংগুয়েজের ব্যাকরণ। এ রীতি ল্যাংগুয়েজ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কোন সুনির্দিষ্ট ল্যাংগুয়েজ দ্বারা যে রীতিতে কোন প্রোগ্রামের স্টেটমেন্টগুলো রচিত হয়- সে বিধিবদ্ধ রীতিই উক্ত ল্যাংগুয়েজের ক্ষেত্রে সিনটেক্স হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন ওয়েবপেজে Bangladesh লেখাটি বোল্ড হওয়ার জন্য উক্ত লেখার আগে ও পরে ট্যাগ লিখতে হয়। ট্যাগসহ উক্ত লেখাটিকে সিনট্যাক্স বলা হয়। যেমন-

 Bangladesh

Description	Example Syntax	Result
Bolded Text	Bolded Text	**Bolded Text**
Italicized Text	Italicized Text	*Italicized Text*
Deleted Text	<del>Deleted Text</del>	~~Deleted Text~~
Big Text	<big>Big Text</big>	Big Text
Small Text	<small>Small Text</small>	Small Text
Subscript	H₂O	H_2O
Superscript	3 x 10⁸	3×10^8
HTML Ignore	<xmp>Text</xmp>	Text
Hyperlink	<a href="http://www.google.com">Google</a>	Google
Email Hyperlink	<a href="mailto:mail@mail.com">mail@mail.com</a>	mail@mail.com

এইচটিএমএল ডকুমেন্টের মৌলিক কাঠামো (Basic structure of an HTML)

এইচটিএমএল ডকুমেন্ট ট্যাগ-এর সমন্বয়ে গঠিত, যা ওয়েবপেজ প্রদর্শনকে নির্দিষ্ট করে। এইচটিএমএল ডকুমেন্টে বেশিরভাগ ট্যাগই শেষ হয় ক্লোজিং ট্যাগ দিয়ে।

ওপেনিং ট্যাগ : <table> ক্লোজিং ট্যাগ: </table>

যেমন: এখানে এ দু'টি ট্যাগের মধ্যে পার্থক্য হলো এটি ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ, যা বুঝায় যে এটি একটি ক্লোজিং ট্যাগ।

- **পেজের শুরু ট্যাগ-** প্রত্যেক HTML ডকুমেন্ট অবশ্যই ফাইলের শুরুতে <html> ট্যাগ এবং ফাইলের শেষে </html> ট্যাগ লিখতে হয়। অন্যান্য তথ্যগুলো এর ভেতরে থাকে।
- **পেজের head-** এখানে ওয়েবপেজ কীওয়ার্ড, পেজের বর্ণনা এবং পেজ টাইটেল স্থাপন করা হয়। কোন পেজ ব্রাউজারে প্রদর্শিত হওয়ার আগে <head> থেকে প্রয়োজনীয় অংশ পড়ে নেয়।

- **পেজ title** - <head> এর ভেতরে পেজ এর <title> লিখতে হয় যেটি ব্রাউজারের উইন্ডোর উপরে টাইটেল হিসেবে প্রদর্শিত হয়।
- **পেজের body** - পেজের কন্টেন্ট, টেক্সট, ইমেজ এবং লিংক ইত্যাদি এ অংশে থাকে। ব্রাউজার এ অংশে থাকা সব তথ্যাদি ব্যবহারকারীকে দেখায়।

নিচের মৌলিক ফরমেট অনুযায়ী প্রত্যেক এইচটিএমএল পেজ লেখা হয় :

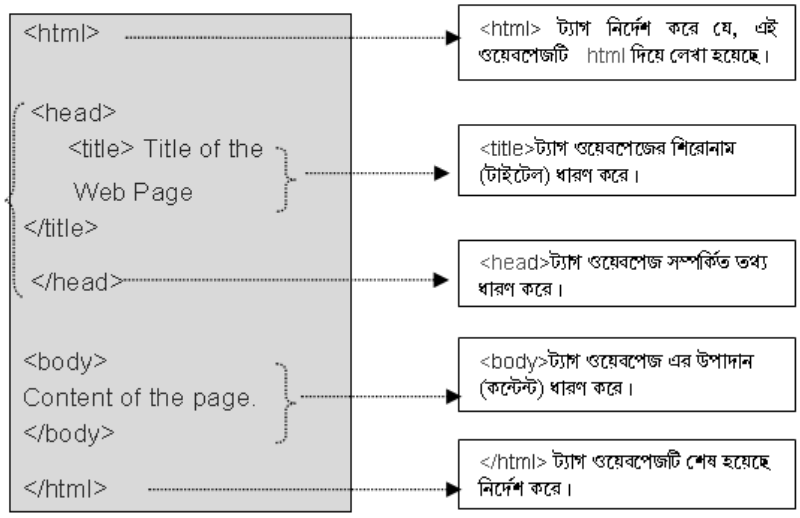

২.৪ এইচটিএমএল পেজ লেআউট (HTML Page Layout)

ওয়েবসাইটে বিভিন্ন উপাদান থাকে। যেমন, টাইটেল, হেডিং, প্রধান কন্টেন্ট (টেক্সট, ইমেজ, লিংক ইত্যাদি), ফুটার ইত্যাদি কোনটি কোথায়, কীভাবে স্থাপিত হবে তার পরিকল্পনা বা ছককে লেআউট বলা হয়। লেআউট হলো একটি পেজের প্রধান কন্টেন্ট এরিয়ার স্ট্রাকচার বা অবকাঠামো। সম্পূর্ণ ওয়েবসাইটটি একটি ডিজাইন হতে পারে কিন্তু প্রত্যেকটি আলাদা পেজের লেআউট ভিন্ন হতে পারে। ওয়েবসাইটে বিভিন্ন পেজ থাকে। একটি সম্পূর্ণ ওয়েবসাইট তৈরি করা অনেক সময়সাপেক্ষ। তাই সাইট তৈরি করার পূর্বেই এর লেআউট তৈরি করে নিলে কাজের সুবিধা হয়। ক্লায়েন্টরা ওয়েব ডেভলপারদেরকে লেআউট বুঝিয়ে দিলে সে অনুযায়ী সাইট ডিজাইন করা যায়। যেমন :

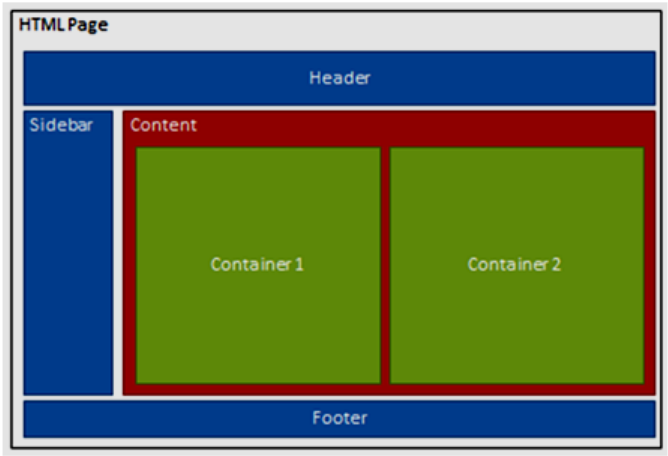

চিত্র ঃ একটি এইচটিএমএল পেজ লেআউট

HTML ডকুমেন্ট তৈরি করার উদাহরণ

১. উইন্ডোজের ডেস্কটপে থাকাবস্থায় Start ▸ Programs ▸ Accessories ▸ notepad নির্দেশ দিতে হবে।

২. নোটপ্যাড উইন্ডোটি প্রদর্শিত হবে। নোটপ্যাড উইন্ডোতে এইচটিএমএল কোড লিখতে হবে। যেমন–

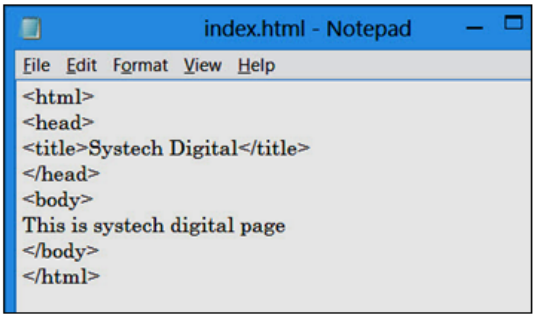

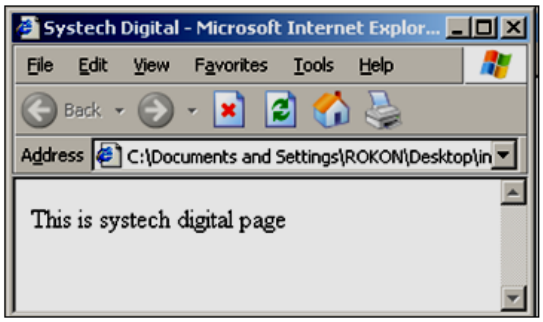

৩. File ▸ Save নির্দেশ দিয়ে কোন নাম .html এক্সটেনশনসহ (যেমন- first.html) টাইপ করে Save বাটনে ক্লিক করে ডকুমেন্টটি সেভ করতে হবে। HTML ফাইলটি তৈরি হবে।

৪. Start ▸ Programs ▸ Internet Explorer নির্দেশ দিলে পর্দায় ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার উইন্ডোটি প্রদর্শিত হবে।

৫. File ▸ Open ক্লিক নির্দেশ দিয়ে অথবা Ctrl+O কী-দ্বয় চাপলে পর্দায় ওপেন ডায়ালগ বক্স আসবে।

৬. Browse...এ ক্লিক করে সেভ করা এইচটিএমএল ডকুমেন্টটির (যেমন- first.html) নামের উপর ক্লিক করে Open বাটনে ক্লিক করে OK বাটনে ক্লিক করলে html এ করা ওয়েবপেজটি ওপেন হবে। (উপরের ২য় চিত্র)

ব্যাখ্যা : HTML এ নির্দিষ্ট কিছু ট্যাগ সংকেত ব্যবহার করে তথ্যকে নির্দিষ্ট স্থানে রাখা হয়।
একটি HTML পেজের শুরুতে এবং শেষে <html> এবং </html> এ কোড লিখতে হয়। অন্যান্য তথ্যগুলো এর ভেতরে থাকে। কোন কোড শেষ করার জন্য ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ (/) ব্যবহার করা হয়।
HTML পেজে একটি অংশ <head> এবং অন্য অংশ <body> হিসেবে বিবেচিত হয়। কোন পেজ ব্রাউজারে প্রদর্শিত হওয়ার আগে <head> থেকে প্রয়োজনীয় অংশ পড়ে নেয় এবং অংশে থাকা সব তথ্যাদি ব্যবহারকারীকে দেখায়। <head> এর ভেতরে পেজ এর <title> লিখতে হয় যেটি ব্রাউজারের উইন্ডোর উপরে টাইটেল হিসেবে প্রদর্শিত হয়।

HTML পেজে টেক্সট এর সাইজ নির্দিষ্ট করা এবং এ্যালাইন করা

এইচটিএমএল পেজের লেখার সাইজ নির্দিষ্ট করা যায় এবং এ্যালাইন করা যায়। যেমন :

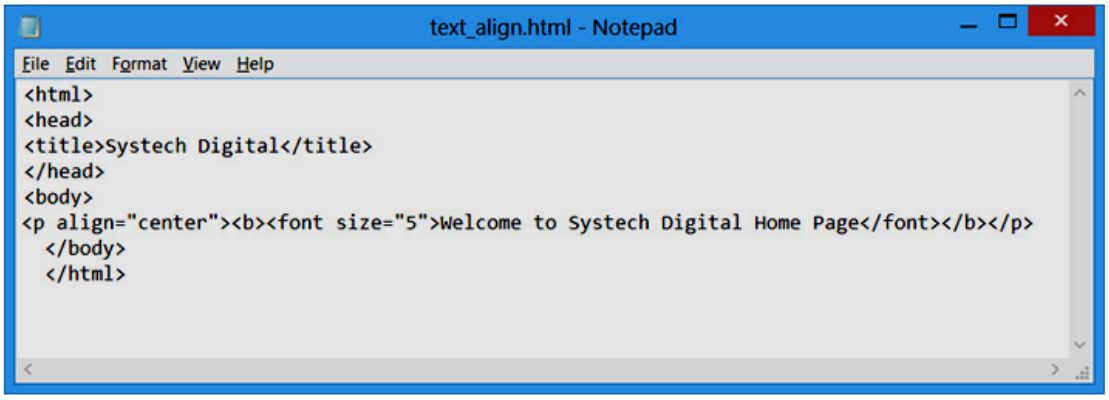

ওয়েব ব্রাউজারে পেজটি ওপেন করলে নিচের মতো ফলাফল দেখা যাবে :

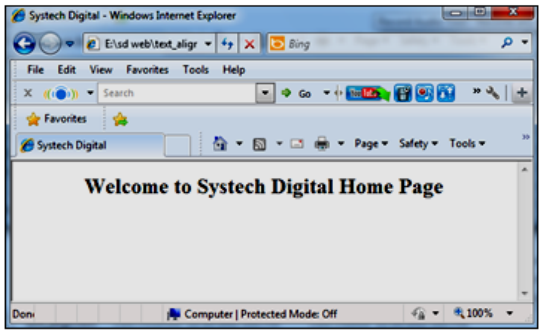

- <p> দ্বারা প্যারাগ্রাফ বুঝানো হয়েছে।
- align="center" দ্বারা লেখাটি সেন্টার এ্যালাইন হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।
- <b> দ্বারা লেখাটি বোল্ড হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।
- font size="5" দ্বারা লেখাটির সাইজ নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

HTML পেজে বাংলা ফন্ট ব্যবহার করা

সাধারণভাবে এইচটিএমএল পেজে সরাসরি বাংলা ব্যবহার করা যায় না। ইউনিকোড ব্যবহার করে সরাসরি অথবা অন্য কোন টেক্সট এডিটর যেমন, এমএস ওয়ার্ডে লেখা বাংলা কপি করে ব্যবহার করা যায়। অন্য কোন ওয়ার্ডপ্রসেসিং প্রোগ্রামে করা লেখা কপি করার জন্য <font face=এরপর যে ফন্টে লেখাটি টাইপ করা হয়েছিল সে ফন্টটির নাম ইনভার্টেড কমার ভিতরে লিখে ">" চিহ্ন টাইপ করে পেস্ট কমান্ড দিয়ে ক্লোজিং ট্যাগ লিখতে হয়।

১. এমএস ওয়ার্ডে টাইপ করা বাংলা লেখা ওয়েবসাইটে ব্যবহার করা

এমএস ওয়ার্ডে স্ট্যান্ডার্ড টুলবার থেকে SutonnyMJ ফন্টটি সিলেক্ট করে কী-দ্বয় একত্রে চেপে উচ্চ মাধ্যমিক কম্পিউটার শিক্ষা লেখাটি টাইপ করে লেখাটি ব্লক করে টুলবারের কপি টুলে ক্লিক করি অথবা Ctrl+C কী-দ্বয় চাপি। Start >All Programs>Accessories>Notepad নির্দেশ দিয়ে নোটপ্যাডটি ওপেন করি। নোটপ্যাড উইন্ডোটি প্রদর্শিত হবে। নোটপ্যাড উইন্ডোতে <font face=এর পর যে ফন্টে লেখাটি টাইপ করা হয়েছিল সে ফন্টটির নাম ইনভার্টেড কমার ভিতরে লিখতে হবে। অত:পর Ctrl+V কী-দ্বয় চেপে কপি করা লেখাটি পেস্ট করার নির্দেশ দিতে হবে। লাইনের শেষে </font> ট্যাগ লিখতে হবে। যেমন–

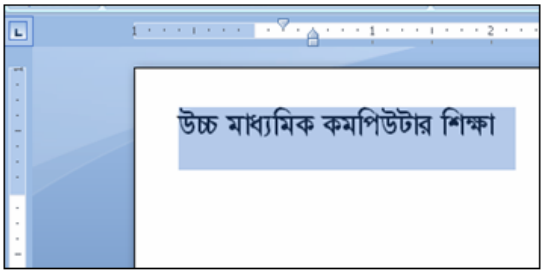

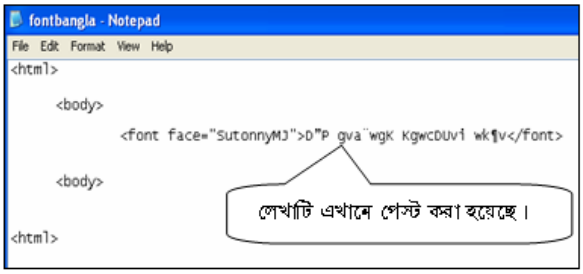

২. ইউনিকোডে সরাসরি HTML ডকুমেন্টে টাইপ করে বাংলা লেখা

ইউনিকোডভিত্তিক সফটওয়্যার যেমন, অভ্র অথবা বিজয় বায়ান্নো ব্যবহার করে ইউনিকোডে সরাসরি HTML ডকুমেন্টে টাইপ করে বাংলা লেখা যায়। যেমন, বিজয় বায়ান্নো সফটওয়্যারটি ইন্সটল করা থাকলে বিজয় বায়ান্নো আইকনে ক্লিক করে প্রদর্শিত মেনু থেকে অপশনটি নির্বাচন করে টাইপ করলে বাংলায় টাইপ হবে।

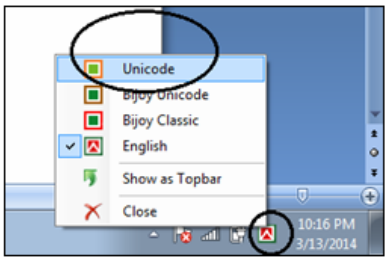

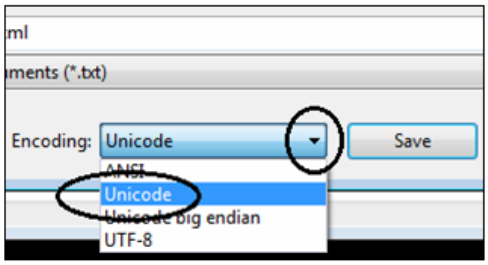

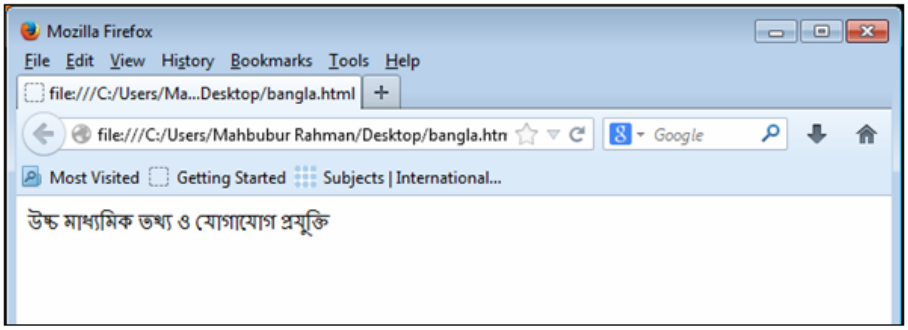

HTML হেডিং যুক্ত করা

HTML ফাইলে হেডিংগুলো <h1> থেকে <h6> পর্যন্ত ট্যাগ দ্বারা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। হেডিং এর ব্যবহার দেখার জন্য ঃ

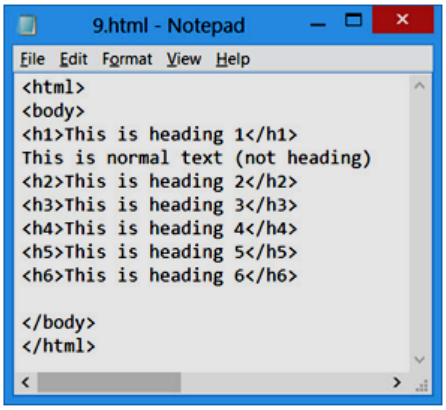

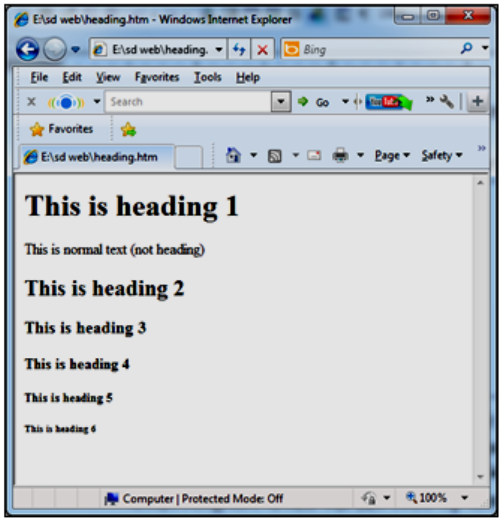

ওয়েব ব্রাউজারে পেজটি ওপেন করলে উপরের ২য় চিত্রের মতো ফলাফল দেখা যাবে :

- লক্ষ্য করলে দেখা যাবে একেক ট্যাগের মধ্যে থাকা হেডিংগুলো একেক সাইজে প্রদর্শিত হচ্ছে। বাই ডিফল্ট হেডিংগুলো ধারাবাহিকভাবে বড় থেকে ছোট আকারে প্রদর্শিত হবে। ইচ্ছে করলে বিভিন্ন ট্যাগ ব্যবহার করে ছোট কিংবা বড় আকারে প্রদর্শন করা যায়।
- ১ম হেডিং এবং ২য় হেডিং এর মাঝের This is normal text (not heading) লেখাটি নরমাল দেখাচ্ছে।

HTML প্যারাগ্রাফ এর ব্যবহার

HTML ফাইলে প্যারাগ্রাফগুলোকে ট্যাগ দ্বারা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এর শুরু হয় দিয়ে এবং শেষ করতে হয় ব্যবহার করে। ওই ট্যাগের মধ্যে টেক্সট বসাতে হয়। ওয়েব ব্রাউজারে পেজটি ওপেন করলে ফলাফল দেখা যাবে :

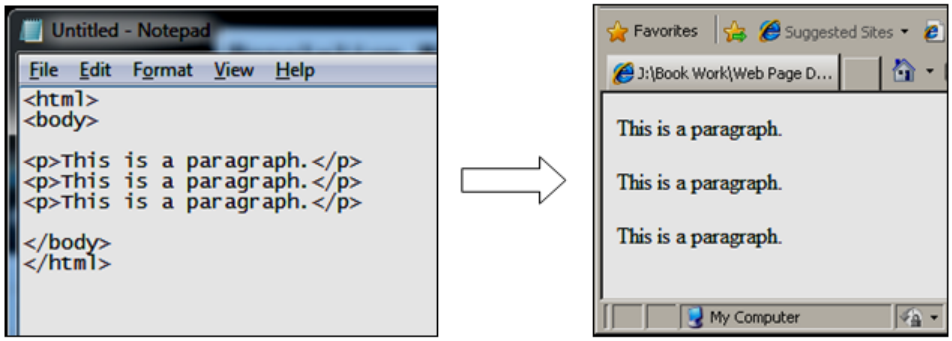

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এখানে প্রতিটি লাইনের মাঝে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফাঁকা স্থান রেখে প্যারাগ্রাফগুলো প্রদর্শিত হচ্ছে।

HTML লাইন ব্রেক এর ব্যবহার

নতুন প্যারাগ্রাফ শুরু না করেই লাইনের মাঝখানে কোনো অংশকে ভেঙে (নতুন লাইন তৈরি করতে)
 ট্যাগটি ব্যবহার করা হয়।
 এলিমেন্টটি একটি এম্পটি HTML এলিমেন্ট যার কোনো ইন্ড ট্যাগ নেই। লাইন ব্রেক এর ব্যবহার দেখার জন্য নিচের মতো কোড লিখতে হবে। ওয়েব ব্রাউজারে পেজটি ওপেন করলে ফলাফল দেখা যাবে :

```
<html>
<p>This is <br> a para<br> graph with line break</p>
</html>
```

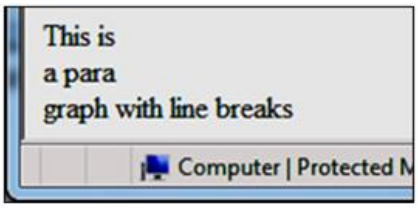

২.৫ HTML এ টেক্সট ফরমেটিং

HTML এর পেজের টেক্সট এর সাথে বিভিন্ন ট্যাগ ব্যবহার করে টেক্সটকে বিভিন্নভাবে ফরমেটিং করা যায়। যেমন :

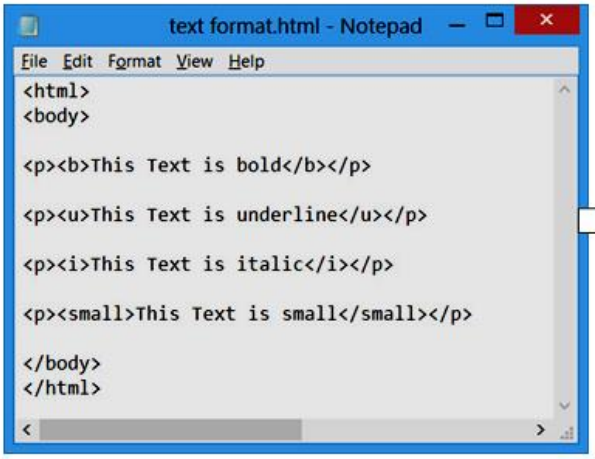

চিত্র : নোটপ্যাড উইন্ডোতে লেখা কোড

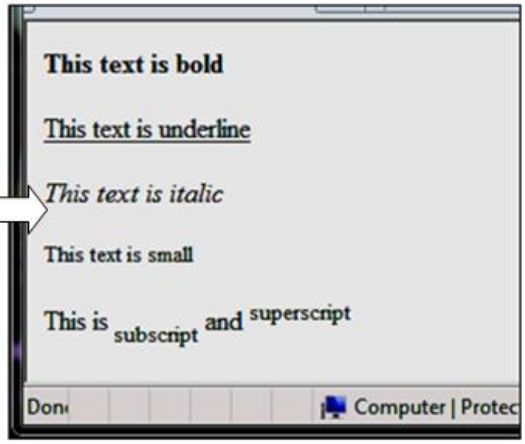

চিত্র : ওয়েব ব্রাউজারে পেজটি ওপেন করলে ফলাফল

ব্যাখ্যা :

- প্রতিটি লাইনকে   ট্যাগের ভেতর রেখে আলাদা প্যারাগ্রাফ হিসেবে এগুলো প্রথমে নির্ধারণ করা হয়েছে।
- বোল্ডের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ও ট্যাগ।
- আন্ডারলাইনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে <u> ও </u> ট্যাগ।
- স্মল লেটারের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে <small> ও </small> ট্যাগ।
- সাবস্ক্রিপ্ট এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে _ও ট্যাগ।
- সুপারস্ক্রিপ্টের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ^ও ট্যাগ।

টেক্সট ফরমেটিং ট্যাগ

ট্যাগ	বর্ণনা
	টেক্সটকে বোল্ড করতে ব্যবহৃত হয়।
<u>	টেক্সটকে আন্ডারলাইন করতে ব্যবহৃত হয়।
<big>	টেক্সটকে বড় করে দেখাতে ব্যবহৃত হয়।
	এমফাসাইজড টেক্সট দেখাতে ব্যবহৃত হয়।
<i>	টেক্সটকে ইটালিক করতে ব্যবহৃত হয়।
<small>	টেক্সটকে ছোট করে দেখাতে ব্যবহৃত হয়।
	টেক্সটকে স্ট্রং করে দেখাতে ব্যবহৃত হয়।
<sub>	সাবস্ক্রিপ্ট টেক্সট দেখাতে ব্যবহৃত হয়।
<sup>	সুপারস্ক্রিপ্ট টেক্সট দেখাতে ব্যবহৃত হয়।
<ins>	ইনসার্টকৃত টেক্সট নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়। টেক্সটের নিচে আন্ডারলাইন প্রদর্শিত হয়।
<del>	কোনো টেক্সটের মাঝখানে দাগ টেনে সেটি ডিলিট করা হয়েছে এমন বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

<address> ট্যাগের উদাহরণ

HTML ডকুমেন্টে অ্যাড্রেস লেখার জন্য নিচের মতো কোড লিখতে হবে।

```
<html>
<body>
<address>
Systech Digital Ltd.<br>
House # 7, Road # 31, Sector # 7 <br>
Uttara, Dhaka<br>
Bangladesh<br>
Phone: 8962636<br>
E-mail: admin@systechdigital.com<br>
Web: www.systechdigital.com
</address>
</body>
</html>
```

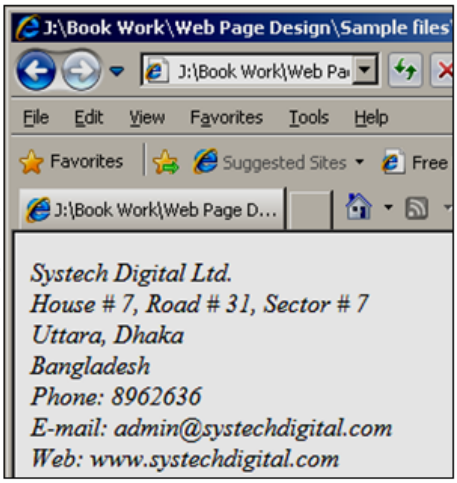

১. পুরো অ্যাড্রেসটিকে <address> </address> ট্যাগের মধ্যে আবদ্ধ করা হয়েছে। এরপর প্রতিটি লাইনের শেষে
 ট্যাগ বসিয়ে এদের মধ্যে সিঙ্গেল লাইন ব্রেক তৈরি করা হয়েছে। শেষের লাইনটিতে যেহেতু আর ব্রেকের দরকার নেই, সেহেতু সেখানে লাইনের শেষে
 ট্যাগ যুক্ত করা হয়নি।

২. ওয়েব ব্রাউজারে সেভ করা ফাইলটিকে ওপেন করলে ফলাফল দেখা যাবে। (উপরের ২য় চিত্র)

২.৬ এইচটিএমএল লিঙ্কস ঃ হাইপারলিংক (Hyperlink)

বিভিন্ন ধরনের তথ্যাবলির ভেতর ভার্চুয়াল সংযোগ স্থাপন করার ব্যবস্থাই হচ্ছে হাইপারলিংক। টেক্সট অথবা ইমেজকে লিংক হিসেবে নির্দিষ্ট করা যায়। সাধারণত লিংকে মাউস পয়েন্টার নিলে এটির আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে হাতের আইকনে পরিণত হয়। সাধারণভাবে লিংক করা টেক্সট আন্ডারলাইন করা থাকে এবং নীল রঙের হয়ে থাকে। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (World Wide Web) সহ সব হাইপারটেক্সট সিস্টেমে হাইপারলিংক হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান (ingredient)।

হাইপারলিংকের সুবিধা (Advantages of Hyperlink)

১. হাইপারলিংকে ক্লিক করে একই ডকুমেন্টের ভিন্ন পেজে অথবা এক ডকুমেন্ট থেকে একই অবস্থানে অথবা ভিন্ন কোন অবস্থানের ভিন্ন কোন ডকুমেন্টের পেজে যাওয়া যায়।
২. সম্পর্কিত তথ্য দ্রুত প্রদর্শন করে জানা যায়।
৩. ব্রাউজকারীর সময় বাঁচে।

HTML লিঙ্ক সিনট্যাক্স

HTML লিঙ্কের সিনটেক্স হলো–

```
<a href="url">Link text</a>
```

স্টার্ট ট্যাগটি লিংকের অ্যাট্রিবিউট বহন করে। এলিমেন্ট কনটেন্ট (লিঙ্ক টেক্সট) যে অংশটি প্রদর্শিত হবে সেটি নির্ধারণ করে।

href অ্যাট্রিবিউট

href অ্যাট্রিবিউট লিংকের ঠিকানা নির্ধারণ করে। যেমন- নিচের <a> এলিমেন্টটি একটি লিংক নির্ধারণ করেছে।

```
<a href="http://www.systechdigital.com">This is a link</a>
```

HTML ফাইলে লিংকসমূহ <a> ট্যাগ দ্বারা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এর শুরু হয় <a> দিয়ে এবং শেষ করতে হয় </a> ব্যবহার করে। ওই ট্যাগের মধ্যে টেক্সট বসাতে হয়। ধরা যাক, নিচের মতো কোড লিখে একটি পেজ তৈরি করা হলো।

```
<html>
<body>
<a href="http://www.systechdigital.com">This is a link</a>
</body>
</html>
```

ওয়েব ব্রাউজারে পেজটিকে খুললে নিচের মতো ফলাফল দেখা যাবে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এখানে লেখার নিচে একটি আন্ডারলাইন দেখা যাচ্ছে এবং পুরো লেখাটি নীল রঙে প্রদর্শিত হচ্ছে। এখানে লিংক তৈরি হয়েছে। এ লিংকে (আন্ডারলাইন করা This is a link লেখাতে) ক্লিক করলে উক্ত লিংকটিতে নির্দিষ্ট করা www.systechdigital.com ওয়েবপেজটি ব্রাউজারে খুলবে।

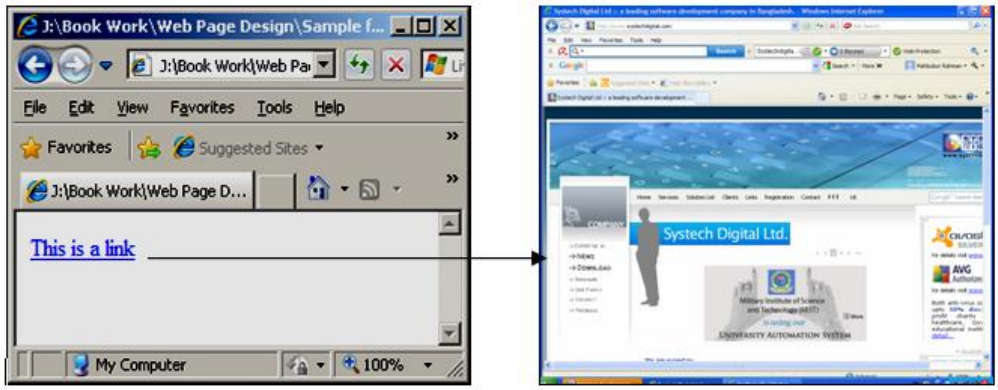

ওয়েবপেজের কোথাও কোনো লিংক বসাতে হলে উপরিউক্ত নিয়মে তা করতে হয়। লিংকের ঠিকানাটি <a> এর মধ্যেই href=" " লিখে কোটেশন চিহ্নের ভেতর বসিয়ে দিতে হয়। তারপর যথানিয়মে এ ট্যাগটি ক্লোজ করার জন্য </a> ব্যবহার করতে হয়। স্টার্টিং ও ক্লোজিং ট্যাগের মধ্যে যে লেখাতে ক্লিক করলে লিংকটি প্রদর্শিত হবে সে টেক্সটটি (যেমন : This is a link টেক্সটি) লিখতে হয়। ওয়েবপেজের কোন ইমেজকেও লিংক হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

হাইপারলিংক-এর প্রকারভেদ (Types of Hyperlink)

হাইপারলিংক দু'ভাবে করা হয়। যথা :

১. ইন্টারনাল হাইপারলিংক (Internal Hyperlink) এবং
২. এক্সটারনাল হাইপারলিংক (External Hyperlink)।

ইন্টারনাল হাইপারলিংক (Internal Hyperlink)

একই সার্ভারে অবস্থিত একটি ওয়েবসাইটের এক পেজের সাথে অন্য পেজের লিংক তৈরি করাকে ইন্টারনাল হাইপারলিংক বলে। ইন্টারনাল লিংকের মাধ্যমে কোনো শব্দগুচ্ছ একই পেজের অন্য কোনো অংশ বা অন্য কোনো পেজের নির্দিষ্ট অংশের সাথে সংযুক্ত করা হয়। ইন্টারনাল লিংকের জন্য রিলেটিভ ইউআরএল (Relative URL) ব্যবহার করা হয়। রিলেটিভ ইউআরএল প্রোটোকল ও হোস্ট নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র সার্ভারে অবস্থিত ফাইলের নাম উল্লেখ করতে হয়। ইন্টারনাল লিংকের জন্য <a> এর সাথে ফাইল name এট্রিবিউট ব্যবহার করা হয়। যেমন <a href = "basic.html"> This is a Link </ a > এখানে "This is a Link" টেক্সটি ওয়েবপেজে দেখা যাবে। এ টেক্সটটির উপর মাউস পয়েন্টার নিয়ে ক্লিক করলে একই সার্ভারে থাকা basic.html ফাইলটি প্রদর্শিত হবে।

ফাইলটি যদি অন্য কোনো ডিরেক্টরিতে থাকে তাহলে ইন্টারনাল লিংকের ক্ষেত্রে URL এ ফাইলের নামের পূর্বে ডিরেক্টরির নাম লিখলেই হবে। যেমন :

<a href = "salary/basic.html"> This is a Link </ a >

এখানে "This is a Link" টেক্সটটি ওয়েবপেজে দেখা যাবে। এ টেক্সটটির উপর মাউস পয়েন্টার নিয়ে ক্লিক করলে একই সার্ভারে থাকা salary ডিরেক্টরির basic.html ফাইলটি ওপেন হবে।

এক্সটারনাল হাইপারলিংক (External Hyperlink)

পৃথক পৃথক সার্ভারে অবস্থিত একটি ওয়েবপেজের সাথে অন্য পেজের লিংক তৈরি করাকে এক্সটারনাল হাইপারলিংক বলে। এক্সটারনাল লিংকের মাধ্যমে পেজকে একই ওয়েবপেজের অন্য কোনো পেজ কিংবা ভিন্ন ওয়েবপেজের কোনো পেজের সাথে সংযোগ তৈরি করা হয়। এক্সটারনাল লিংকের জন্য অ্যাবসল্যুট ইউআরএল (Absolute URL) ব্যবহার করা হয়। অ্যাবসল্যুট ইউআরএল-এ প্রোটোকল, হোস্ট নাম ও ফাইলের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে প্রোটোকল (http), ওয়েব সার্ভারের হোস্ট নাম বা আইপি অ্যাড্রেস, ফাইলের নাম ও পাথ থাকতে হবে। যেমন :

<a href = "http://www.abccompany.com/salary/basic.html/"> This is a External Link </ a >

href এর অর্থ হলো হাইপার রেফারেন্স এট্রিবিউট, http হলো প্রোটোকল, www.abccompany.com হলো হোস্ট নাম, salary হলো পাথ/ডিরেক্টরি এবং basic.html হলো ফাইল নাম। <a> ও </a> ট্যাগের মাঝে This is a External Link হলো অ্যাঙ্কর লিংক।

২.৭ এইচটিএমএল পেজে ইমেজ যুক্ত করা

HTML পেজে ইমেজ যুক্ত করার জন্য <img> ট্যাগ ব্যবহৃত হয়। <img> ট্যাগ এর দু'টি এট্রিবিউট হলো– src এবং alt। <img> ট্যাগটি এম্পটি অর্থাৎ এটি কেবল অ্যাট্রিবিউট বহন করে এবং এর কোনো ক্লোজিং ট্যাগ নেই। পেজে কোনো ইমেজ প্রদর্শন করতে চাইলে <img> ট্যাগ এর সাথে src অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে। src এর অর্থ হলো Source। পেজে যে ইমেজটি প্রদর্শন করা হবে তার URL হলো src অ্যাট্রিবিউটটির ভ্যালু। কোনো ইমেজকে নির্ধারণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সিনট্যাক্সটি হলো :

```
<img src="url" />
```

ইমেজটি কোথায় সংরক্ষিত আছে URL সেটি চিহ্নিত করে। ধরা যাক, "boat.gif" নামে একটি ইমেজ www.systechdigital.com নামের ওয়েবসাইটের "images" নামের একটি ডিরেক্টরিতে রয়েছে। তাহলে তার URL হবে http://www.systechdigital.com/images/boat.gif। ডকুমেন্টের যেখানেই ইমেজ ট্যাগটি পাবে সেখানেই ব্রাউজার ওই ইমেজটি বসিয়ে দেবে। যদি দু'টি প্যারাগ্রাফের মধ্যে একটি ইমেজ ট্যাগ থাকে তাহলে ব্রাউজারটি সবার আগে প্রথম প্যারাগ্রাফ, তারপর ইমেজ এবং সবশেষে দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফটি প্রদর্শন করবে।

Alt অ্যাট্রিবিউট

Alt অ্যাট্রিবিউটটি কোনো ইমেজের জন্য একটি 'অলটারনেট টেক্সট' নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়। Alt অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু হলো একটি অথর-ডিফাইনড টেক্সট। যেমন : <img src="boat.gif" alt="Big Boat" />। ব্রাউজার যদি কোনো কারণে ইমেজসমূহ লোড করতে ব্যর্থ হয় তবে Alt অ্যাট্রিবিউটটি পাঠক কি মিস করছেন সেটি তাকে বলে দেয়। এরপর ব্রাউজারটি ইমেজের পরিবর্তে অলটারনেট টেক্সট প্রদর্শন করবে। HTML ফাইলে বেশি ইমেজ থাকলে পেজটি লোড হতে প্রচুর সময় নিতে পারে। তাই পেজে কম ইমেজ ব্যবহার করাই উত্তম।

ইমেজের সাইজ নির্ধারণ করা

পেজে ইমেজ যুক্ত করার সময় সোর্স অ্যাট্রিবিউটের সাথে ইমেজের উচ্চতা (height) এবং প্রশস্ততা (width) কত পিক্সেল হবে তা নির্ধারণ করে দেয়া যায়। যেমন–

```
<img src="ocean.jpg" width="415" height="332">
```

এখানে ocean.jpg নামের ইমেজটি পেজে 415 X 332 পিক্সেলস আকৃতিতে প্রদর্শিত হবে।

ইমেজ ট্যাগসমূহ

ট্যাগ	কর্মনা
<img>	ইমেজকে নির্ধারণ করে।
<map>	ইমেজ ম্যাপকে নির্ধারণ করে
<area>	কোনো ইমেজ ম্যাপের অভ্যন্তরে ক্লিকযোগ্য এলাকা নির্ধারণ করে।

এবার কিছু উদাহরণ দেখি যার মাধ্যমে HTML ফাইলে ইমেজের ব্যবহার সম্পর্কে ভালো ধারণা লাভ করা যায়।

এইচটিএমএল পেজে ইমেজ যুক্ত করার উদাহরণ

ধরা যাক, একটি পেজে বড় এবং ছোট সাইজ করে দু'টি ইমেজ যুক্ত করা হবে। সেজন্য পেজে নিচের মতো করে কোড লিখতে হবে :

```
<html>
<body>
<p>
An Ocean image:
<img src="ocean.jpg" width="415" height="332">
</p>
<p>
A moving image:
<img src="hackanm.gif" width="48" height="48">
</p>
</body>
</html>
```

ওয়েব ব্রাউজারে এ ফাইলটি ওপেন করলে নিচের মতো ফলাফল দেখা যাবে :

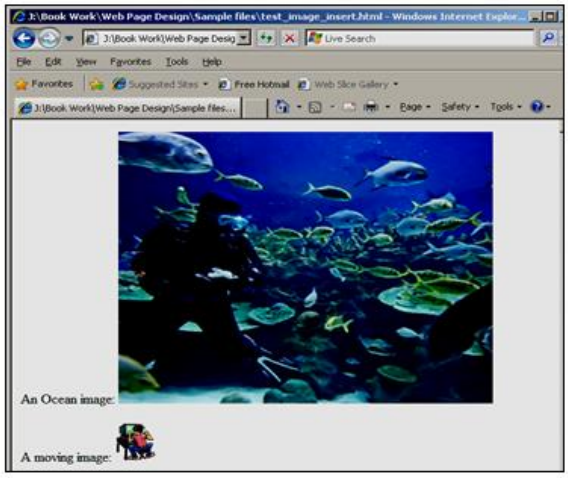

২.৮ এইচটিএমএল এ টেবিলের ব্যবহার

যে কোন তথ্যকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ/উপস্থাপন করার জন্য টেবিল তৈরি করা হয়। সারি (রো) ও স্তম্ভের (কলাম) সমন্বয়ে টেবিল সৃষ্টি হয়ে থাকে। ওয়েবপেজে টেবিল তৈরি করার প্রয়োজন দেখা যায়। এইচটিএমএল পেজে <table> ট্যাগ দ্বারা টেবিল নির্ধারণ করা হয়। একটি টেবিল <tr> ট্যাগ দ্বারা রো তে বিভক্ত থাকে এবং প্রতিটি রো আবার <td> ট্যাগ দ্বারা ডেটা সেলসমূহে বিভক্ত থাকে। td এর মানে হলো "table data" যা একটি ডেটা সেলের কনটেন্ট। একটি ডেটা সেল টেক্সট, ইমেজ, লিস্ট, ফটোগ্রাফ, ফর্ম, হরাইজন্টাল রুল, টেবিল ইত্যাদি বহন করতে পারে। একটি দুই কলাম এবং দুই রো বিশিষ্ট টেবিল তৈরি করার জন্য নিচের মতো কোড লিখতে হবে। ব্রাউজারে ফলাফল দেখাবে ঃ

```
<html>
<body>
<table border="1">
<tr>
<td>row 1, cell 1</td>
<td>row 1, cell 2</td>
</tr>
<tr>
<td>row 2, cell 1</td>
<td>row 2, cell 2</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

row 1, cell 1	row 1, cell 2
row 2, cell 1	row 2, cell 2

টেবিল ও বর্ডার এট্রিবিউট

টেবিল এর বর্ডার এট্রিবিউট নির্ধারণ না করে দিলে টেবিলটি কোনো বর্ডার ছাড়াই ব্রাউজারে প্রদর্শিত হবে। বর্ডারসহ টেবিল প্রদর্শনের জন্য অবশ্যই বর্ডার এট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে। যেমন–

```
<table border="1">
```

টেবিলের মধ্যে হেডিং দেয়া

টেবিলের মধ্যে হেডিং দেবার জন্য <th> ট্যাগ ব্যবহার করা হয়। যেমন-

```
<html>
<body>
<table border="1">
<tr>
<th>Heading</th>
<th>Another Heading</th>
</tr>
<tr>
<td>row 1, cell 1</td>
<td>row 1, cell 2</td>
</tr>
<tr>
<td>row 2, cell 1</td>
<td>row 2, cell 2</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

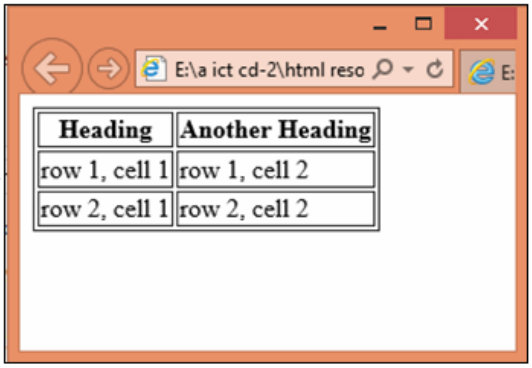

ব্রাউজারে এর ফলাফল আসবে।

টেবিল ট্যাগসমূহ (table tags)

ট্যাগ	বর্ণনা
<table>	একটি টেবিলকে নির্ধারণ করে।
<th>	টেবিলের হেডারকে নির্ধারণ করে।
<tr>	টেবিলের রো নির্ধারণ করে।
<td>	টেবিলের সেল নির্ধারণ করে।
<caption>	টেবিলের ক্যাপশন নির্ধারণ করে।
<colgroup>	টেবিলের কলামগুলোর গ্রুপসমূহকে নির্ধারণ করে।
<col>	টেবিলের মধ্যে থাকা এক বা একাধিক কলামের জন্য এট্রিবিউট ভ্যালু নির্ধারণ করে।
<thead>	টেবিলের হেড নির্ধারণ করে।
<tbody>	টেবিলের বডি নির্ধারণ করে।
<tfoot>	টেবিলের ফুটার নির্ধারণ করে।

হেডিংসহ টেবিল তৈরি

টেবিলে হেডারসহ প্রদর্শন করার জন্য <th> ট্যাগটি ব্যবহৃত হয়। যেমন–

```
<html>
<body>
<h4>Table headers:</h4>
<table border="1">
<tr>
  <th>Name</th>
  <th>Telephone</th>
  <th>Telephone</th>
</tr>
<tr>
  <td>Mahbubr Rahman</td>
  <td>555 77 854</td>
  <td>555 77 855</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

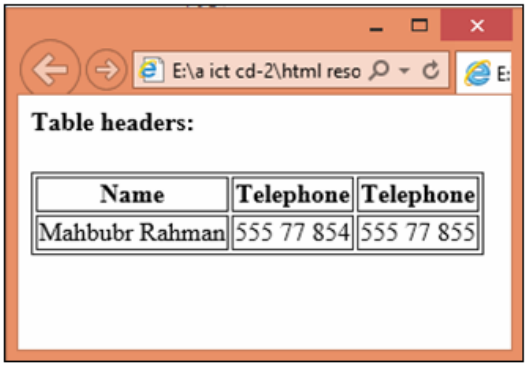

ওয়েব ব্রাউজারে পেজটি ওপেন করলে ফলাফল দেখা যাবে।

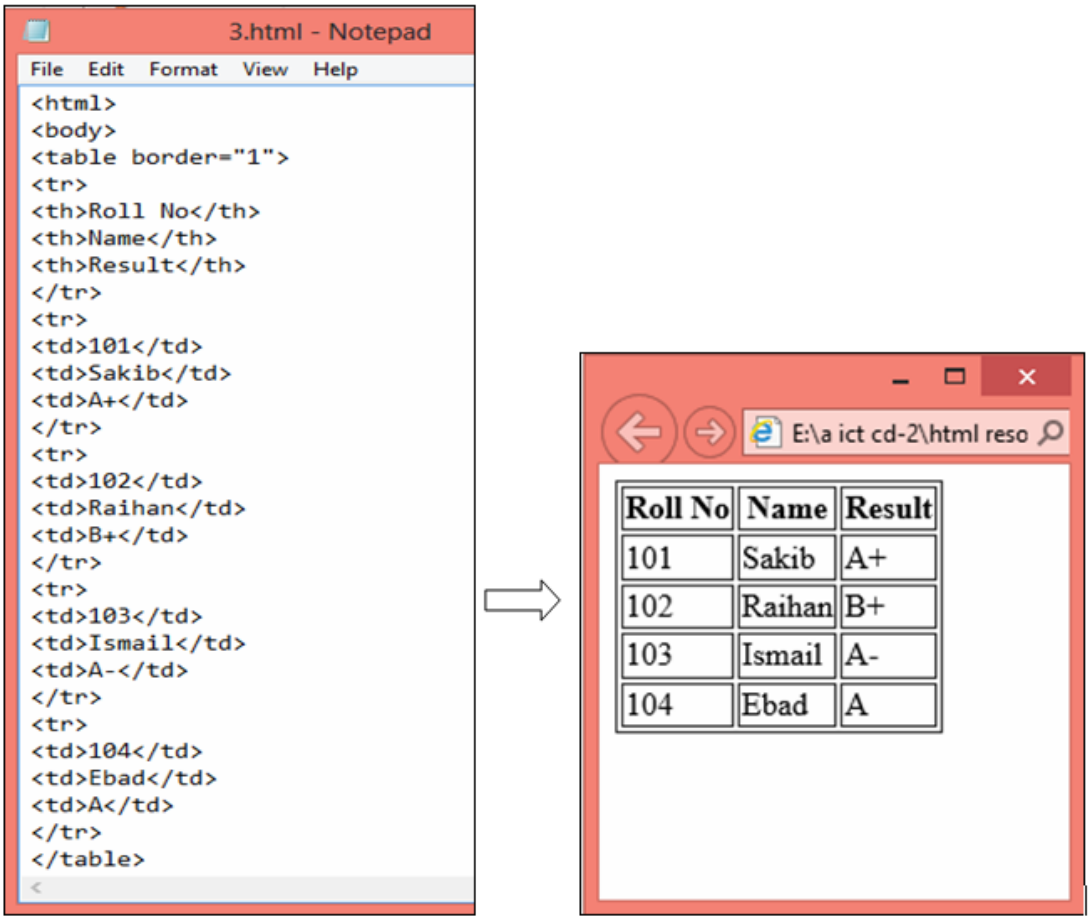

ফাঁকা সারির টেবিল তৈরি করা

টেবিলের সেলে কোন তথ্য না দিয়ে ফাঁকা সারির টেবিল তৈরি করার জন্য `<td>` এবং `</td>` এর মাঝে কোন ডেটা না লিখে`</br>` লিখলে সেলে কোন ডেটা না এসে ফাঁকা দেখাবে। যেমন-

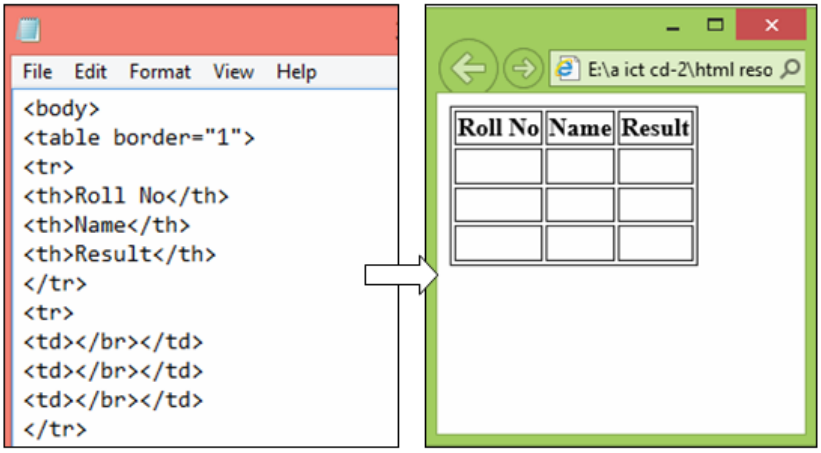

টেবিল সেলকে একাধিক রো/কলাম এ বিভক্ত করা

<th> ট্যাগের মধ্যে colspan বা rowspan এট্রিবিউটটি ব্যবহার করে টেবিল সেলকে একাধিক রো বা কলামে বিভক্ত করা যায়। যেমন :

```
<html>
<body>
<h4>Cell that spans two columns:</h4>
<table border="1">
<tr>
  <th>Name</th>
  <th colspan="2">Telephone</th>
</tr>
<tr>
  <td>Mahbubur Rahman</td>
  <td>555 77 854</td>
  <td>555 77 855</td>
</tr>
</table>
<h4>Cell that spans two rows:</h4>
<table border="1">
<tr>
  <th>First Name:</th>
  <td>Mahbubur Rahman</td>
</tr>
<tr>
  <th rowspan="2">Telephone:</th>
  <td>555 77 854</td>
</tr>
<tr>
  <td>555 77 855</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

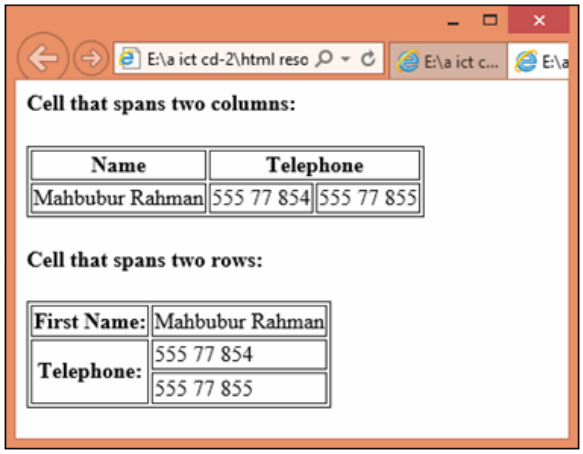

ওয়েব ব্রাউজারে পেজটি ওপেন করলে ফলাফল দেখা যাবে। (উপরের ২য় চিত্র)

HTML ডকুমেন্টে ফর্ম তৈরি করা

HTML ফর্মসমূহ বিভিন্ন ধরনের ইউজার ইনপুট সিলেক্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফর্ম হলো একটি এলাকা যা কোনো ফর্মের উপাদান বা এলিমেন্টগুলোকে ধারণ করতে পারে। ফর্ম এলিমেন্ট হলো এমন ধরনের এলিমেন্ট যা ব্যবহারকারীকে কোনো ফর্মের ভেতর তথ্য (যেমন-টেক্সট ফিল্ড, টেক্সট এরিয়া ফিল্ড, ড্রপ-ডাউন মেনু, রেডিও বাটন, চেক বক্স ইত্যাদি) প্রবেশ করানোর সুযোগ দেয়। একটি ফর্মকে <form> ট্যাগ দ্বারা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। ধরা যাক, একটি এন্ট্রি ফর্ম তৈরি করা হবে যা দেখতে হবে নিম্নরূপ :

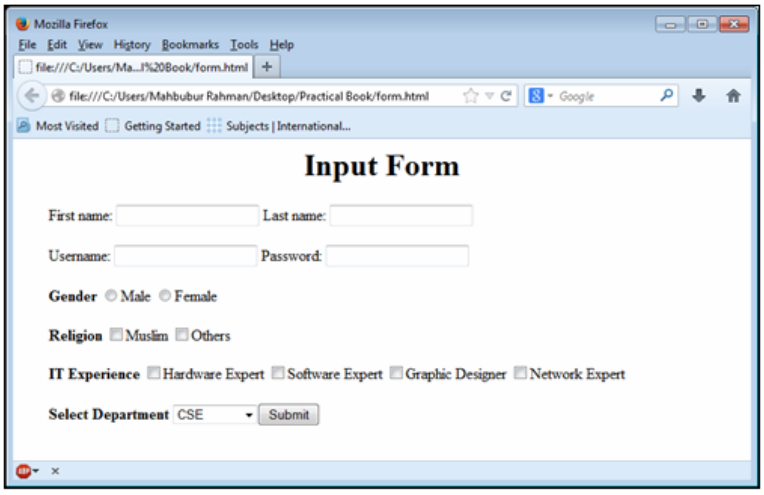

নোটপ্যাড উইন্ডোতে নিচের মতো এইচটিএমএল কোড লিখি। যেমন- ফর্মটি তৈরি করার জন্য নোটপ্যাড উইন্ডোতে নিচের ট্যাগসমূহ লিখতে হবে-

```
<html>
<h1 align="center"> Input Form</h1>

<table align="center" style="width:700px">
<tr>
  <td>
<form align="center">
First name: <input type="text" name="firstname">
Last name: <input type="text" name="lastname"><br><br>
Username: <input type="text" name="user">
Password: <input type="password" name="pwd"><br><br>
<b>Gender</b>
<input type="radio" name="sex" value="male">Male
<input type="radio" name="sex" value="female">Female<br><br>
<b>Religion</b>
<input type="checkbox" name="vehicle" value="Bike">Muslim
<input type="checkbox" name="vehicle" value="Car">Others<br><br>
<b>IT Experience</b>
<input type="checkbox" name="vehicle" value="Bike">Hardware Expert
<input type="checkbox" name="vehicle" value="Bike">Software Expert
<input type="checkbox" name="vehicle" value="Bike">Graphic Designer
<input type="checkbox" name="vehicle" value="Bike">Network Expert<br> <br>
<b>Select Department</b>
<select name="Department">
<option>CSE</option>
<option>EEE</option>
<option>Power</option>
<option>Pharmacy</option>
<input type="submit" value="Submit">
</form>
</td>
</tr>
</table>
```

উপরিউক্ত ফর্মটি তৈরি করতে যেসব এইচটিএমএল ট্যাগ লেখা হয়েছে নিচের টেবিলে সেগুলোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

ফর্ম ট্যাগসমূহ (Form Tags)

ট্যাগ	বর্ণনা
<form>	ইউজার ইনপুটের জন্য একটি ফর্মকে নির্ধারণ করে।
<input>	একটি ইনপুট ফিল্ড নির্ধারণ করে।
<textarea>	টেক্সট এরিয়া (মাল্টি-লাইন টেক্সট ইনপুট কন্ট্রোল) নির্ধারণ করে।
<label>	একটি কন্ট্রোলে লেবেলকে নির্ধারণ করে।
<fieldset>	একটি ফিল্ডসেট নির্ধারণ করে।
<legend>	একটি ফিল্ডসেটের জন্য ক্যাপশন নির্ধারণ করে।
<select>	একটি নির্বাচনযোগ্য তালিকা (ড্রপ-ডাউন বক্স) নির্ধারণ করে।
<optgroup>	একটি অপশন গ্রুপ নির্ধারণ করে।
<option>	ড্রপ-ডাউন বক্সে একটি অপশন নির্ধারণ করে।
<button>	একটি পুশ বাটন নির্ধারণ করে।

HTML 4.01 / XHTML 1.0 Tags Reference

Ordered by Function

DTD: indicates in which XHTML 1.0 DTD the tag is allowed. S = Strict, T = Transitional, and F = Frameset

Start tag	Purpose	DTD
Basic Tags		
<!DOCTYPE>	Defines the document type	STF
<html>	Defines an html document	STF
<body>	Defines the body element	STF
<h1> to <h6>	Defines header 1 to header 6	STF
<p>	Defines a paragraph	STF
 	Inserts a single line break	STF
<hr>	Defines a horizontal rule	STF
<!--...-->	Defines a comment	STF
Char Format		
<b>	Defines bold text	STF
<font>	Deprecated. Defines text font, size, and color	TF
<i>	Defines Italic text	STF
	Defines emphasized text	STF
<big>	Defines big text	STF
	Defines strong text	STF
<small>	Defines small text	STF
<sup>	Defines superscripted text	STF
<sub>	Defines subscripted text	STF
<bdo>	Defines the direction of text display	STF
<u>	Deprecated. Defines underlined text	TF
Output		
<pre>	Defines preformatted text	STF
<code>	Defines computer code text	STF
<tt>	Defines teletype text	STF
<kbd>	Defines keyboard text	STF
<var>	Defines a variable	STF
<dfn>	Defines a definition term	STF
<samp>	Defines sample computer code	STF
<xmp>	Deprecated. Defines preformatted text	
Blocks		
<acronym>	Defines an acronym	STF
<abbr>	Defines an abbreviation	STF
<address>	Defines an address element	STF
<blockquote>	Defines a long quotation	STF
	Deprecated. Defines centered text	TF
<q>	Defines a short quotation	STF
<cite>	Defines a citation	STF
<ins>	Defines inserted text	STF
<del>	Defines deleted text	STF
<s>	Deprecated. Defines strikethrough text	TF
<strike>	Deprecated. Defines strikethrough text	TF

Links		
<a>	Defines an anchor	STF
<link>	Defines a resource reference	STF
Frames		
<frame>	Defines a sub window (a frame)	F
<frameset>	Defines a set of frames	F
<noframes>	Defines a noframe section	TF
<iframe>	Defines an inline sub window (frame)	TF
Input		
<form>	Defines a form	STF
<input>	Defines an input field	STF
<textarea>	Defines a text area	STF
<button>	Defines a push button	STF
<select>	Defines a selectable list	STF
<optgroup>	Defines an option group	STF
<option>	Defines an item in a list box	STF
<label>	Defines a label for a form control	STF
<fieldset>	Defines a fieldset	STF
<legend>	Defines a title in a fieldset	STF
<isindex>	Deprecated. Defines a single-line input field	TF
Lists		
<ul>	Defines an unordered list	STF
<ol>	Defines an ordered list	STF
<li>	Defines a list item	STF
<dir>	Deprecated. Defines a directory list	TF
<dl>	Defines a definition list	STF
<dt>	Defines a definition term	STF
<dd>	Defines a definition description	STF
<menu>	Deprecated. Defines a menu list	TF
Images		
<img>	Defines an image	STF
<map>	Defines an image map	STF
<area>	Defines an area inside an image map	STF
Tables		
<table>	Defines a table	STF
<caption>	Defines a table caption	STF
<th>	Defines a table header	STF
<tr>	Defines a table row	STF
<td>	Defines a table cell	STF
<thead>	Defines a table header	STF
<tbody>	Defines a table body	STF
<tfoot>	Defines a table footer	STF
<col>	Defines attributes for table columns	STF
<colgroup>	Defines groups of table columns	STF
Styles		
<style>	Defines a style definition	STF
	Defines a section in a document	STF
	Defines a section in a document	STF

Meta Info		
<head>	Defines information about the document	STF
<title>	Defines the document title	STF
<meta>	Defines meta information	STF
<base>	Defines a base URL for all the links in a page	STF
<basefont>	Deprecated. Defines a base font	TF
Programming		
<script>	Defines a script	STF
<noscript>	Defines a noscript section	STF
<applet>	Deprecated. Defines an applet	TF
<object>	Defines an embedded object	STF
<param>	Defines a parameter for an object	STF

৩. ওয়েবপেজ ডিজাইন করা

ওয়েবসাইট ডিজাইন একটি সৃষ্টিশীল কাজ। প্রয়োজনানুয়ায়ী সাইটকে উপযুক্ত রূপে ডিজাইন করতে হয়। অপ্রয়োজনীয় কিংবা বাহুল্য কোনো উপাদান কোন সাইটের সৌন্দর্য হানিকর হতে পারে। এজন্য সাইটটিতে কি কি বিষয় থাকবে সেগুলোর একটি তালিকা আগেই তৈরি করে রাখা প্রয়োজন। ওয়েবসাইটে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের গ্রাফিক্স, স্থির ছবি, টেক্সট, এনিমেশন, অডিও, ভিডিও, ডেটাবেজ ইত্যাদি উপাদান থাকে। এদের সবগুলো উপাদানই যে সকল ওয়েবসাইটে থাকে এমনটি নয় বরং কিছু কিছু উপাদান বাদ রেখেও সুন্দর সুন্দর ওয়েবসাইট তৈরি করা যায়। ওয়েবসাইট ডিজাইনের বেশ কিছু পর্যায় রয়েছে। এগুলো হলো :

- গ্রাফিক্স ডিজাইন (Graphics Design)
- ওয়েব টেম্পলেট স্লাইসিং (Web template Slicing)
- কোডিং ও ডেটাবেজ হ্যান্ডেলিং (Coding & Database Handling)
- টেক্সট (Text)
- ইমেজ (Image)
- এনিমেশন (Animation)
- অডিও (Audio)
- ভিডিও (Video)
- টেস্টিং ও ডিবাগিং (Testing & Debugging)

গ্রাফিক্স ডিজাইন (Graphics Design)

ওয়েবসাইট ডিজাইনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ হলো গ্রাফিক্স ডিজাইন। একটি সাইটের লেআউট কেমন হবে তার পুরো ডিজাইনটি সাধারণত গ্রাফিক্স ডিজাইনের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। এ ধরনের লেআউট সাধারণত ওয়েব টেম্পলেট নামে পরিচিত। গ্রাফিক্স ডিজাইনের ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত গ্রাফিক্স সফটওয়্যার হলো এডোবি ফটোশপ। এর মাধ্যমে আকর্ষণীয় সব ডিজাইন তৈরি করা যায়। ওয়েব টেম্পলেট ডিজাইনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে এডোবি ইলাস্ট্রেটর প্রোগ্রামটিও ব্যবহৃত হতে পারে।

ওয়েব টেম্পলেট স্লাইসিং (Web Template Slicing)

ওয়েব টেম্পলেট তৈরি হয়ে গেলে এটি নিয়ে কাজ করার জন্য ওয়েব ডিজাইনারগণ সাধারণত টেম্পলেটটিকে স্লাইসিং করে থাকেন। স্লাইসিং বলতে বুঝায় কোনো একটি পেজকে কেটে টুকরো টুকরো করে নেয়া। প্রথমত টেম্পলেট তৈরি করে ফেললেই যে সেটি কোডিং করার উপযোগী হয় তা নয়। ওয়েবসাইটে ব্যানার, বাটনসমূহ, এনিমেশন, টেক্সট, ছবি, ফুটার ইত্যাদি বিভিন্নভাবে সজ্জিত থাকে। এসব অংশগুলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী আলাদা আলাদা করা দরকার। ফলে কোডিং এর সময় আলাদা অংশগুলোতে কাজ করা সম্ভব হয়। ফটোশপের মাধ্যমে সরাসরি স্লাইসিং করা যায়। স্লাইসিং করার পর এটিকে Save For Web & Device এর আওতায় সেভ করা হয়। এ সময় Save as type: হতে HTML and Images (*.html) নির্বাচন করে দিতে হয়। ফলে পরবর্তীতে এটি নিয়ে কোডিংয়ের কাজ করা সম্ভব হয়।

কোডিং ও ডেটাবেজ হ্যান্ডেলিং (Coding and Database Handling)

কোডিং ও ডেটাবেজ হ্যান্ডেলিংয়ের কাজটি ওয়েবসাইট ডিজাইনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ। কারণ ইতঃপূর্বে করা ডিজাইনের উপর এখানে কোড লিখে কাজ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে স্লাইসিং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফাইলটিকে ভিত্তি করে বাকি কাজ করা হয়। এ কাজে ড্রিমওয়েভার একটি জনপ্রিয় সফটওয়্যার। বহু ওয়েব ডিজাইনারই এ সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে থাকেন। এর মাধ্যমে HTML, HTML5, XHTML, CSS, JavaScript, HTML DOM, DHTML, VBScript, PHP, ASP.NET, ASP, ADO, AJAX, jQuery, E4X, XML ইত্যাদির মাধ্যমে কোডিংয়ের কাজগুলো করা যায়। এছাড়া MySQL, SQL Server ইত্যাদির মাধ্যমে ডেটাবেজ হ্যান্ডেলিং করা যায়।

টেক্সট (Text)

ওয়েবসাইটের প্রয়োজনীয় টেক্সট আগে থেকেই নির্ভুল করে টেক্সট ফাইলে রাখা হয়। কোডিং করার সময়ই প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন স্থানে এসব টেক্সট বসানো হয়ে থাকে। টেক্সটে বিভিন্ন ধরনের ফরমেটিং করার কাজটি কোডিং পর্যায়েই সম্পন্ন করা হয়।

ইমেজ (Image)

ওয়েবসাইটে ইমেজ বা ছবি ব্যবহারের ক্ষেত্রে খানিকটা কৌশলী হতে হয়। কোডিংয়ের সময় ইমেজ বা ছবিকে স্থাপনের জন্য প্রয়োজন হলে ফটোশপে সেগুলো তৈরি বা এডিটিং করে মাপমতো তৈরি করে নেয়া হয়। ফটোশপে ইমেজ সেভ করার সময় এগুলোর সাইজ যেন ছোট থাকে সেজন্য সবসময় Save For Web & Device এর আওতায় প্রয়োজনীয় ফরমেটে সেভ করতে হবে।

এনিমেশন (Animation)

এনিমেশন তৈরির জন্য সবচেয়ে ব্যবহৃত হয় এডোবি ফ্ল্যাশ প্রোগ্রামটি। এছাড়া আরও কিছু টুল পাওয়া যায় যেগুলোর মাধ্যমে ফ্ল্যাশ এর বিভিন্ন অবজেক্ট তৈরি করা হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে আছে সুইশম্যাক্স, কুল বাটন, অটো ফ্ল্যাশ, আমারা ফ্ল্যাশ, ফ্ল্যাক্স প্রভৃতি। তবে এগুলো প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ধরনের GIF এনিমেশন তৈরির জন্য এডোবি ফটোশপ প্রোগ্রামটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অডিও (Audio)

ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় অডিও রাখা যায়। আজকাল ফ্ল্যাশ অবজেক্ট সংবলিত বিভিন্ন বাটন, ব্যানার ইত্যাদিতে বিভিন্ন ধরনের অডিও ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে এডোবি ফ্ল্যাশ এ করা এনিমেশনগুলোতে ব্যবহৃত সাউন্ডগুলো এক্সপোর্টের সময় এদের সাইজ কমিয়ে নেয়া হয়। একেবারে র' সাউন্ড এডিটিং এর জন্য ভালো একটি টুল হলো সাউন্ডফোর্জ। এর মাধ্যমে প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন ফরমেটে সাউন্ডকে সেভ করে নিয়ে এনিমেশনে ব্যবহার করা যায়।

ভিডিও (Video)

ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য এডোবি প্রিমিয়ার সবচেয়ে উপযোগী সফটওয়্যার। বিভিন্ন ধরনের টুল যেমন– ম্যাজিক ভিডিও কনভার্টার, এনি ভিডিও কনভার্টার ইত্যাদির মাধ্যমে মূল ভিডিওকে প্রয়োজনানুযায়ী কনভার্ট করে নেয়া যায়। ভিন্ন একটি উপায়েও ব্যবহারকারী তার ওয়েবসাইটে ভিডিও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। এজন্য মূল ভিডিও ফাইলটিকে www.youtube.com, www.dailymotion.com, https://vimeo.com/ ইত্যাদি সাইটে আপলোড করে নিতে হবে। আপলোড হবার পর সেখানে প্রাপ্ত ভিডিও এমবেড করার কোডটুকু কপি করে নিয়ে ব্যবহারকারীর সাইটে স্থাপন করে দিলেই উক্ত ভিডিও ওই সাইটে প্রদর্শিত হবে। এক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর স্পেস নিয়ে ভাবতে হয় না, সাইটও লোড হয় দ্রুত।

টেস্টিং ও ডিবাগিং (Testing and Debugging)

এটি হলো ওয়েবসাইট ডিজাইনের শেষ ধাপ। সাইট তৈরির পর সেটি বারংবার টেস্ট করা প্রয়োজন। কোডে ভুল পেলে সেগুলো ডিবাগিং বা ঠিক করতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন অপারেটিং সিস্টেম ও ব্রাউজারে এগুলো চেক করে নেয়া প্রয়োজন। সর্বোপরি সাইটটি যেন ব্রাউজার কম্প্যাটিবল হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

৪. ওয়েবসাইট পাবলিশ করা (Publishing Website)

কোনো ওয়েবসাইটকে চূড়ান্তভাবে পাবলিশ করার আগে বেশকিছু ধাপ অতিক্রম করে আসতে হয়। যেমন-

১. সাইটটির ডিজাইন করা।
২. এর জন্য একটি ডোমেইন নেম নিবন্ধন করা।
৩. যে সার্ভারে সাইটটি আপলোড করা হবে তা নির্ধারণ এবং স্পেস, ব্যান্ডউইথ ইত্যাদি সুবিধা নিশ্চিত করা।
৪. সর্বোপরি শেষ পর্যায়ে সাইটটিকে আপলোড করা।

ধাপ-১ : সাইট ডিজাইন (Site Design)

সাইট ডিজাইনকে দু'টি পর্যায়ে ফেলা যায়। একটি হলো সাইটের গ্রাফিক্স লেআউট ডিজাইন ও সেটি থেকে কোড করার উপযোগী ফরমেট তৈরি করা এবং অপর পর্যায়টি হলো পিওর কোডিংয়ের মাধ্যমে সাইটটিকে কার্যোপযোগী করে তোলা।

ধাপ-২ : ডোমেইন নেম নিবন্ধন করা (Registration Domain name)

প্রতিটি সাইটের একটি স্বতন্ত্র নাম থাকতে হয় যেটিকে ডোমেইন নেম বলা হয়। এ ডোমেইন নেমের মাধ্যমেই একটি ওয়েবসাইট সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করে। বিভিন্ন কোম্পানি ডোমেইন নেম রেজিস্ট্রেশনের সেবা প্রদান করে। বাংলাদেশেও অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা বাইরের নামকরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে ব্যবহারকারীর জন্য ডোমেইন নেম নিবন্ধনের ব্যবস্থা করে দেয়। ডোমেইন বিষয়ে এদের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়া যায়। কারো কাছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট কার্ড কিংবা পেপ্যাল এর অ্যাকাউন্ট থাকলে সেক্ষেত্রে তিনি সরাসরি নিজেই ডোমেইন নেম কিনতে পারেন। www.name.com, www.godaddy.com, www.namecheap.com, order.1and1.com, www.gandi.net ইত্যাদিসহ আরও কিছু সাইট হতে ডোমেইন নেম নিবন্ধন করা যায়।

ধাপ-৩ : ওয়েব হোস্টিং (Web Hosting)

ডোমেইন নেম রেজিস্ট্রেশনের পরের কাজ হলো ওয়েবসাইটটিকে হোস্টিং করা। অর্থাৎ, ওয়েবসাইটটিকে ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত কোন ওয়েব সার্ভারে আপলোড করা বা সংরক্ষণ করা। বিশ্বজুড়ে বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান আছে যারা টাকার বিনিময়ে তাদের ওয়েব সার্ভারে কোন ওয়েবসাইটের জন্য প্রয়োজনীয় স্পেস বা জায়গা ভাড়া দেয়। ওয়েব হোস্টিংয়ের জন্য বিভিন্ন 'ওয়েব হোস্ট' কোম্পানি তাদের ক্লায়েন্টদেরকে স্পেস ভাড়া দেয়। নিজস্ব পিসিকে একটি ওয়েব সার্ভার হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ থাকলেও সর্বোত্তম উপায় হলো কোনো ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি) এর মাধ্যমে ওয়েবসাইটকে হোস্ট করা। এর ফলে অতিরিক্ত অনেক সুবিধা পাওয়া যায়।

কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার সাইটের কনটেন্ট এর উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন ডিস্ক স্পেসের হোস্টিং সেবা নিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মাসিক ট্রাফিক ভলিউম, সংযোগগতি, ২৪ ঘণ্টার সেবা, প্রতিদিন ডেটা ব্যাকআপ, ব্যান্ডউইথ বা কনটেন্ট বিধি-নিষেধ, ডেটাবেজ অ্যাকসেস ইত্যাদি বিষয়গুলো যাচাই করে নেয়া প্রয়োজন। সাধারণত যেসব কোম্পানি ডোমেইন নেম নিবন্ধন করে থাকে তাদের প্রায় সকলেই হোস্টিং সেবাও প্রদান করে। এদের অনেকেই বিশেষ হোস্টিং প্যাকেজ সেবাও প্রদান করে যা অনেক সময় অর্থ সাশ্রয়ী হয়ে থাকে। সাইটটি কী ল্যাংগুয়েজ বা কী ধরনের প্রযুক্তি দ্বারা তৈরি হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে সার্ভারের ধরন নির্ধারণ করতে হয়।

ধাপ-৪ : হোস্ট সার্ভারে সাইটকে আপলোড করা (Upload website to host server)

ওয়েব হোস্ট কোম্পানির কাছ থেকে হোস্টিং প্যাকেজ কিনলে তারা ক্রেতাকে পাসওয়ার্ডসহ একটি কন্ট্রোল প্যানেল প্রদান করে। অনেক কোম্পানি রয়েছে যারা গ্রাহকের হয়ে নিজেরাই সাইটের তদারকি করেন। সেক্ষেত্রে ইউজার ও পাসওয়ার্ড তাদের কাছেই থাকে। তারাই এর নিয়মিত দেখভাল করেন। তবে গ্রাহক যদি চান তবে কন্ট্রোল প্যানেলের নিয়ন্ত্রণ নিজের কাছেই নিয়ে নিতে পারেন।

কন্ট্রোল প্যানেল ঃ কন্ট্রোল প্যানেল হলো যেকোনো ওয়েব হোস্টিং অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি অনন্য সমাধান। ওয়েব হোস্টিং অ্যাকাউন্টগুলোর ব্যবস্থাপনার জন্য ওয়েব হোস্টিং কোম্পানিগুলো তাদের ক্লায়েন্টদেরকে সুবিধাজনক বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রোল প্যানেল সরবরাহ করে থাকে। এ কন্ট্রোল প্যানেলে সাইটকে আপলোড করার বিভিন্ন অপশনগুলো পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অতি জনপ্রিয় পাঁচটি কন্ট্রোল প্যানেল হলো– cPanel, Supreme Control Panel, Helm, SiteWorx, Plesk ইত্যাদি। **cPanel** এর মাধ্যমে সাইট আপলোড করার জন্য ওয়েব ব্রাউজারে ব্যবহারকারীর ওয়েব সাইটের অ্যাড্রেসটি (ডোমেইন নেমটি) টাইপ করার পর ফরোয়ার্ড স্ল্যাশ দিয়ে তারপর cPanel টাইপ করে এন্টার চাপতে হবে (যেমন– http://www.systechprojects.com/cpanel)। কন্ট্রোল প্যানেলের পেইজটি প্রদর্শিত হবে। এখানে ওয়েব হোস্ট কোম্পানির কাছ থেকে প্রাপ্ত ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ডটি টাইপ করে দিয়ে Log in বাটনে ক্লিক করতে হবে। কন্ট্রোল প্যানেলে প্রবেশ করবে। এখানে বিভিন্ন ধরনের কাজ করার জন্য বিভিন্ন অপশন পাওয়া যাবে। নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অপশন সিলেক্ট করে করে ডিজাইন করা সাইট (ফাইলটির) লোকেশন নির্দিষ্ট করে সাইটটি আপলোড করা যায়। রেজিস্ট্রেশনকৃত ডোমেইন নামে ওয়েব সাইট হোস্টিং করার পর ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবহারকারী ওয়েব সাইটটিকে অ্যাকসেস করতে পারবে।

হোস্টিং প্রযুক্তি (Hosting Technology)

উইন্ডোজ হোস্টিং (Windows Hosting) ঃ যদি ওয়েবসাইটটি ASP (Active Server Page) Programming Language এবং Microsoft SQL Server ডেটাবেজ ব্যবহার করে তৈরি হয়ে থাকে তবে windows server এ হোস্টিং করতে হবে।

লিনাক্স হোস্টিং (Linux Hosting) ঃ যদি ওয়েবসাইটটি PHP (Hyper Text Processor) Programming Language এবং MySQL Server ডেটাবেজ ব্যবহার করে তৈরি হয়ে থাকে তবে Linux server এ হোস্টিং করতে হবে। বাংলাদেশে লিনাক্স হোস্টিং জনপ্রিয়। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো বাংলাদেশে PHP developer এর সংখ্যা অনেক বেশি।

ওয়েবসাইটটিকে সার্চ ইঞ্জিনে তালিকাভুক্ত (Submit website to search engines)

ওয়েবে কোনো তথ্য খোঁজার জন্য ব্যবহৃত সার্চ ইঞ্জিন হয় যেমন- Google, Yahoo, MSN, Bing, Ask ইত্যাদি। এসব সার্চ ইঞ্জিনে ওয়েবসাইটটিকে তালিকাভুক্ত করা হলে সহজেই সাইটটিকে খুঁজে পাওয়া যায়। ওয়েবসাইটকে সার্চ ইঞ্জিনে যোগ করার জন্য ইন্টারনেটে বিভিন্ন সাইট আছে। এরা অর্থের বিনিময়ে সকল সার্চ ইঞ্জিনে ওয়েবসাইটটিকে যুক্ত করে। একে সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাইজেশন (এসইও) করা বলা হয়।

ডোমেইন নেম এবং ওয়েব হোস্টিং এর পার্থক্য (Difference between Domain name and Hosting)

১. প্রতিটি ওয়েবসাইটের যে স্বতন্ত্র নাম থাকে তাকে ডোমেইন নেম বলা হয়। অন্যদিকে ইন্টারনেটে ওয়েবের ফাইলগুলো কোনো সার্ভারে রাখাকে ওয়েব হোস্টিং বলা হয়।

২. ওয়েব হোস্টিং হলো স্থান (অর্থাৎ সার্ভার স্পেস) যেখানে টেক্সট, গ্রাফিক্স, অডিও, ভিডিও সংবলিত ওয়েবপেজ রাখা হয়। ডোমেইন হলো ইন্টারনেটে সাইনস্পট যা ব্রাউজারকে দেখায় যেখানে ঐসব তথ্য পাওয়া যাবে।

৩. ডোমেইন নেম হলো কোন বাড়ির ঠিকানা আর হোস্টিং হলো ঐ বাড়ি যেখানে গিয়ে কোন ব্যক্তির সাক্ষাত পাওয়া যায়। ওয়েবসাইটের জন্য ডোমেইন নেম এবং হোস্টিং দরকার। যখন কেউ ডোমেইন নেম টাইপ করে, ওয়েবসাইটের ডেটা ব্রাউজারকারীকে প্রদর্শন করে।

৪. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) নামক প্রতিষ্ঠান এককভাবে ডোমেইন নেম নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে হাজার হাজার কোম্পানি ওয়েব সার্ভার সার্ভিস দিয়ে থাকে।

৫. ডোমেইন ছাড়া ব্যবহারকারীরা কোন ওয়েবসাইটের ডেটা দেখতে পারবে না এবং ওয়েব হোস্টিং ছাড়া ওয়েবসাইটটি প্রদর্শিত হবে না।

দলীয় কাজ : তোমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি ওয়েব সাইট তৈরি করে কীভাবে আপলোড করবে ধারাবাহিক বর্ণনা দাও।

ব্যবহারিক

পরীক্ষণ : HTML ব্যবহার করে একটি সিম্পল ওয়েবপেজ তৈরি করা

তত্ত্ব : HTML ডকুমেন্টের পেজে লেখা টেক্সট এর সাইজ নির্দিষ্ট করা এবং এ্যালাইন করার জন্য font ট্যাগে এট্রিবিউট হিসেবে font align= এবং font size= এর পাশে এ্যালাইনমেন্ট এবং সাইজ সংখ্যায় নির্দিষ্ট করা হয়।

যন্ত্রপাতির ব্যবহার :

১. **হার্ডওয়্যার :** একটি কম্পিউটার।

২. **সফট্ওয়্যার :** অপারেটিং সিস্টেম– Windows7/8/Windows XP, এডিটিং সফটওয়্যার, যেমন- নোটপ্যাড, ব্রাউজিং সফটওয়্যার যেমন-উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার অথবা মজিলা ফায়ার ফক্স।

৩. **ব্যবহার :** উল্লিখিত পরীক্ষণটি সম্পন্ন করতে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিচের পদ্ধতি অনুসরণ করি–

- কাজের শুরুতে কম্পিউটারের বৈদ্যুতিক সংযোগ ঠিক আছে কি না তা দেখে নিতে হবে।
- বৈদ্যুতিক সংযোগ ঠিক থাকলে কম্পিউটারের পাওয়ার সুইচ অন করে কম্পিউটারটি চালু করতে হবে।
- উল্লিখিত সফটওয়্যারগুলো কম্পিউটারে ইনস্টল আছে কি না তা দেখে নিতে হবে।
- বর্ণিত পরীক্ষণটি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামটি চালু করতে হবে।
- পরীক্ষণটি সম্পন্ন হলে চালুকৃত প্রোগ্রামসমূহ বন্ধ করতে হবে এবং নিয়মানুযায়ী কম্পিউটারটি শাট ডাউন করতে হবে। প্রয়োজনে বৈদ্যুতিক সুইচ বন্ধ করে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

প্রক্রিয়া অনুসরণ :

কার্যপ্রণালী : পরীক্ষণটি সম্পন্ন করার জন্য নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করি :

১. কম্পিউটার চালু করে ডেস্কটপ এ আসি।
২. Start > All Programs >Accessories >Notepad নির্দেশ দেই।
৩. Notepad এর এডিটিং উইন্ডোতে নিচের মতো ট্যাগ টাইপ করি।

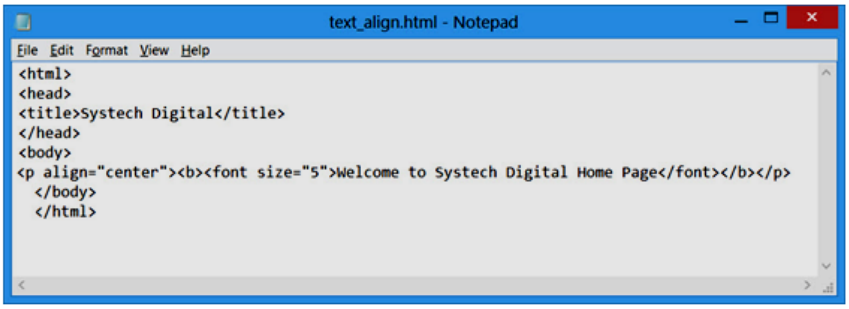

ফাইল সংরক্ষণ করা :

১. File>Save নির্দেশ দেই। Save As ডায়ালগ বক্স প্রদর্শিত হবে।
২. File name : এ ফাইলের নাম .html এক্সটেনশনসহ (যেমন- text_align.html) টাইপ করে Save বাটনে ক্লিক করে ডকুমেন্টটি সেভ করি। HTML ফাইলটি তৈরি হবে।

ফলাফল :

১. Start ▸ Programs ▸ Internet Explorer নির্দেশ দিলে পর্দায় ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার উইন্ডোটি প্রদর্শিত হবে।
২. File ▸ Open ক্লিক নির্দেশ দিয়ে অথবা Ctrl+O কী-দ্বয় চাপলে পর্দায় ওপেন ডায়ালগ বক্স আসবে।
৩. Browse...এ ক্লিক করে সেভ করা এইচটিএমএল ডকুমেন্টটির (যেমন- text_align.html) নামের উপর ডাবল ক্লিক করলে html এ করা ওয়েবপেজটি ওপেন হবে।

ব্যাখ্যা ঃ

- align="center" দ্বারা লেখাটি সেন্টার এ্যালাইন হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।
- <b> দ্বারা লেখাটি বোল্ড হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।
- font size="5" দ্বারা লেখাটির সাইজ নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

বিঃদ্রঃ সিসটেক থেকে প্রকাশিত উচ্চ মাধ্যমিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারিক বইয়ে এইচটিএমএল এর বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবহারিক বিস্তারিতভাবে (পরীক্ষণ-১ থেকে পরীক্ষণ-১৭) আলোচনা করা হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ

ওয়েবপেজ (Webpage) : একটি ওয়েবসাইটের স্বতন্ত্র কোন পেজকে ওয়েবপেজ বলা হয়।

ওয়েবসাইট (Website) : একই ডোমেইনের অধীনে একাধিক ওয়েবপেজের সমষ্টিকে ওয়েবসাইট বলা হয়।

আইপি এ্যাড্রেস (IP Address) : ইন্টারনেটে যুক্ত প্রতিটি কম্পিউটারের একটি ঠিকানা থাকে। এ ঠিকানাকে বলা হয় আইপি এ্যাড্রেস (IP Address)।

ওয়েবসাইটের কাঠামো (Website structure) : ওয়েবসাইটে বিভিন্ন পেজ থাকে। প্রতিটি পেজে বিভিন্ন উপাদান থাকে। ওয়েবসাইটের অন্তর্গত বিভিন্ন পেজগুলো সাজানোর লেআউটই হলো ওয়েবসাইটের কাঠামো।

ইউআরএল (URL) : কোন ওয়েবপেজকে প্রদর্শন করতে ওয়েব ব্রাউজারে এর ঠিকানা নির্দিষ্ট করে দিতে হয়। URL (Universal Resource Unique Locator) হলো ওয়েবসাইটের একক (Unique) ঠিকানা।

ওয়েব ব্রাউজিং (Web Browsing) : ওয়েব ব্রাউজার হলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব রিসোর্স থেকে তথ্য খুঁজে বের করা, উপস্থাপন করা এবং সংরক্ষণ করার একটি এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার।

এইচটিএমএল ট্যাগ (HTML Tags) : এইচটিএমএল হলো একটি মার্কআপ ল্যাংগুয়েজ, টেক্সট-বেজড ল্যাংগুয়েজ যা ওয়েবপেজ লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়। এইচটিএমএল ট্যাগস হলো এইচটিএমএল ডকুমেন্টের সাথে এমবেডেড কোডিং নির্দেশাবলি।

এইচটিএমএল এলিমেন্ট (HTML Element) : HTML ডকুমেন্টগুলো HTML এলিমেন্ট দ্বারা নির্ধারিত হয়। HTML এলিমেন্ট বলতে বুঝায় স্টার্ট ট্যাগ ও ইন্ড ট্যাগের ভেতরের সবকিছু। এদেরকে ওপেনিং ট্যাগ এবং ক্লোজিং ট্যাগও বলে।

এইচটিএমএল পেজ লেআউট (HTML Page Layout) : ওয়েবসাইটে বিভিন্ন উপাদান থাকে। যেমন, টাইটেল, হেডিং, প্রধান কন্টেন্ট (টেক্সট, ইমেজ, লিংক ইত্যাদি), ফুটার ইত্যাদি কোনটি কোথায়, কীভাবে স্থাপিত হবে তার পরিকল্পনা বা ছককে লেআউট বলা হয়।

হাইপারলিংক (Hyperlink) : বিভিন্ন ধরনের তথ্যাবলির ভেতর ভার্চুয়াল সংযোগ স্থাপন করার ব্যবস্থাই হচ্ছে হাইপারলিংক।

অনুশীলনী-৪

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. URL দ্বারা কোনটি প্রকাশ করা হয়?
ক. ইন্টারনেট খ. ডোমেইন নেম
গ. ইয়াহু ঘ. ফেসবুক

২. URL এর প্রথম অংশের নাম কী?
ক. হোস্টনেম খ. প্রোটোকল
গ. পাথ ঘ. প্যারামিটার

৩. URL এর দ্বিতীয় অংশের নাম —
ক. পাথ খ. প্রোটোকল
গ. প্যারামিটার ঘ. হোস্টনেম

৪. URL এর তৃতীয় অংশের নাম কী?
ক. প্রোটোকল খ. পাথ
গ. প্যারামিটার ঘ. হোস্টনেম

৫. কোন ওয়েবসাইটকে ইন্টারনেটে যে কমপিউটারে রাখা হয় তাকে কী বলা হয়?
ক. হোম কম্পিউটার খ. মাদার কম্পিউটার
গ. হাউট কম্পিউটার ঘ. হোস্ট কম্পিউটার

৬. ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে যুক্ত হাইপার টেক্সট ডকুমেন্টকে কী বলা হয়?
ক. ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব খ. নেটওয়ার্কিং
গ. ব্রাউজিং ঘ. প্রোগ্রামিং

৭. ওয়েবসাইট তৈরি হয় —
ক. একাধিক সফটওয়্যার নিয়ে
খ. একাধিক অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে
গ. একাধিক ডকুমেন্ট নিয়ে
ঘ. একাধিক ওয়েবপেজ নিয়ে

৮. কোনটি ওয়েব ব্রাউজার?
ক. গুগল খ. ইয়াহু
গ. মজিলা ঘ. বিং

৯. কোন ওয়েবসাইটকে যেখানে হোস্ট করা হয় তার নাম কী?
ক. হোমপেজ খ. ওয়েব সার্ভার
গ. হোস্টার ঘ. মাদার কমপিউটার

১০. এইচটিএমএল হলো —
ক. ওয়েবব্রাউজার খ. মার্কআপ ল্যাংগুয়েজ
গ. মেশিন ল্যাংগুয়েজ ঘ. ওয়েবপেজ তৈরির টুলস

১১. এইচটিএমএল এ   ট্যাগ ব্যবহার করা হয় —
ক. প্যারাগ্রাফ তৈরির জন্য খ. নতুন পেজ তৈরির জন্য
গ. লেখা বোল্ড করার জন্য ঘ. প্রোগ্রাম শুরু করার জন্য

১২. HTML ফাইল নামের এক্সটেনশন হলো —
ক. .html খ. .htm
গ. .txt ঘ. ক ও খ দুটিই

১৩. ওয়েবপেজে নিচের কোড লেখা হলো —
** This is a paragraph <br> with line break **
এখানে
 দিয়ে যা বোঝানো হয়েছে—
ক. নতুন প্যারাগ্রাফ খ. লাইনব্রেক
গ. লেখা বোল্ড হবে ঘ. লাইন শেষ হবে

১৪. এইচটিএমএল এ ও ট্যাগ ব্যবহার করা হয়—
ক. প্যারাগ্রাফ তৈরির জন্য খ. নতুন পেজ তৈরির জন্য
গ. লেখা বোল্ড করার জন্য ঘ. কোনটি নয়

১৫. এইচটিএমএল এর উদ্ভাবক হলেন —
ক. টিম বার্নার্স লী খ. মাইকেল জুকারবার্গ
গ. স্টিভ জবস ঘ. মার্শাল ম্যাকলুহান

১৬. নিম্নের কোন ভাষাটি দিয়ে ওয়েব পেইজ তৈরি করা সহজ?
ক. C++ খ. Qbasic
গ. HTML ঘ. Pascle

১৭. ওয়েবের তথ্যগুলো থাকে-
ক. ওয়েব সাইটে খ. ওয়েব পেইজে
গ. ওয়েব ব্রাউজারে ঘ. ওয়েব ক্লায়েন্টে

১৮. ইন্টারনেটে এক ওয়েব পেজ থেকে অন্য ওয়েবপেজে গমন করাকে বলা হয় —
ক. ব্রাউজিং খ. সার্চিং
গ. নেভিগেশন ঘ. আপলোডিং

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৯–২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
রনি হায়দার একটি কোম্পানির মালিক। তিনি সেই কোম্পানির একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে চান। এজন্য তিনি কয়েকজন ওয়েব প্রোগ্রামারের কাছে গেলেন এবং সবাইকে ওয়েব ডিজাইন করতে বললেন।

১৯. HTML কোড লেখার জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি—
ক. নোটপ্যাড খ. এমএস ওয়ার্ড
গ. এমএস অফিস ঘ. পিএইচপি

২০. HTML এর ট্যাগগুলো কী দ্বারা বেষ্টিত থাকে?
ক. () খ. { }
গ. <> ঘ. [ ]

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১	খ	২	খ	৩	ঘ	৪	খ	৫	ঘ	৬	ক	৭	ঘ	৮	গ	৯	খ	১০	খ
১১	ক	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	গ	১৫	ক	১৬	গ	১৭	ক	১৮	ক	১৯	ক	২০	গ

২১. ওয়েবসাইট ডিজাইনের সময় নিচের কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা উচিত নয়?
ক. সাইটটির ব্যবহারকারী
খ. হোস্টিং কোম্পানির অপারেটিং সিস্টেম
গ. ব্যবহারকারীদের ব্রাউজার
ঘ. সাইটটির তৈরির খরচ

২২. নতুন প্যারাগ্রাফ ব্যতীত একটি নতুন লাইন লেখার জন্য ব্যবহার করা হয় —
ক.
 খ. <break>
গ. <new_line> ঘ. <return>

২৩. ইন্টারনেটে সাবস্ক্রিপ্ট করতে ব্যবহৃত হয় —
ক. <sup> খ. <p>
গ. <sub> ঘ. <sb>

২৪. ইন্টারনেটে সুপারস্ক্রিপ্ট করতে ব্যবহৃত হয় —
ক. <sup> খ. <p>
গ. <sub> ঘ. <sb>

২৫. বাঁকা অক্ষরে মুদ্রিত করার জন্য ব্যবহার করা হয়
ক. খ. <italize>
গ. <it> ঘ. <i>

২৬. ইবাদ কোডিং করার জন্য কোন টেক্সট এডিটর ব্যবহার করবে?
ক. Text Edit খ. Word Star
গ. Notepad ঘ. Simple Text

২৭. ওয়েবে ঢুকলে প্রথম যে পেজটি প্রদর্শিত হয় তাকে কী বলে?
ক. Web page খ. Home page
গ. Web presentation ঘ. HTTP

২৮. টেবিলে প্রতিটি রো কোন ট্যাগ দ্বারা ডেটা সেলসমূহে বিভক্ত থাকে?
ক. <a> খ. <tr>
গ. <td> ঘ. <link>

২৯. নিচের কোনটি মাইক্রোসফটের সার্ভার?
ক. ISP খ. IIS
গ. APache ঘ. URL

৩০. কোন প্রতিষ্ঠানের সার্ভারের নাম **Apache?**
ক. Microsoft খ. Linux
গ. Apple ঘ. Intel

৩১. সকল সার্ভারে নিচের কোনটি ব্যবহার করা হয়?
ক. http protocool খ. html protocool
গ. url protocool ঘ. Internet protocool

৩২. নিচের কোনটির মাধ্যমে সার্ভারের ডেটাবেসের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব?
ক. পিএইচপি খ. পাইথন
গ. জাভাস্ক্রিপ্ট ঘ. ক্লায়েন্ট সাইড স্ক্রিপ্টিং

৩৩. বিশ্বব্যাপী কমপিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার নাম কী?
ক. কমপিউটার খ. ম্যান
গ. ইন্টারনেট ঘ. মাল্টিমিডিয়া

৩৪. কোনটি ইন্টারনেট প্রোটোকলের প্রধান কাজ?
ক. চিঠি আদান-প্রদান করা খ. ভাষা আদান-প্রদান করা
গ. অর্থ আদান-প্রদান করা ঘ. তথ্য আদান-প্রদান করা

৩৫. ইন্টারনেটকে সংক্ষেপে বলা হয় —
ক. nt খ. net
গ. Inet ঘ. Int

৩৬. দু'টি ওয়েব পেজের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য কী ব্যবহার করতে হয়?
ক. হাইপার লিঙ্ক খ. এলিমেন্ট
গ. সার্চ ইঞ্জিন ঘ. ব্রাউজার

৩৭. ওয়েবসাইটের অভ্যন্তরীণ ছবি বা অন্য কোনো কিছু দেখতে দরকার —
ক. ওয়েব ডকুমেন্ট খ. ওয়াইড ওয়েব
গ. ওয়েব ব্রাউজার ঘ. গেটওয়ে

৩৮. মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ কোনটি?
ক. PHP খ. HTML
গ. Sign Up ঘ. Application

৩৯. কোনটি থেকে ওয়েবসাইটের ভেতরে থাকা বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়?
ক. ল্যাংগুয়েজ খ. হোমপেজ
গ. মেইন পেজ ঘ. সাবকনটেন্ট

৪০. নিচের কোনটি হোম পেজে থাকে?
ক. উপধারার লিঙ্ক খ. বিস্তারিত তথ্য
গ. মূল ধারা ও উপধারার লিঙ্ক
ঘ. মূল ধারার লিঙ্ক

৪১. কোন ব্রাউজারে **Basefont** ট্যাগ দেখা যায়?
ক. ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার খ. গুগল ক্রোম
গ. মজিলা ফায়ারফক্স ঘ. সাফারি

৪২. প্রতিটি সাইটের স্বতন্ত্র নামকে কী বলে?
ক. ফটোশপ খ. ডোমেইন
গ. HTML ঘ. সাইট ডিজাইন

৪৩. **Internet Explorer** কে কী বলা হয়?
ক. Page খ. Program
গ. Browser ঘ. ওয়ার্ল্ড

৪৪. ওয়েবসাইট হচ্ছে —
ক. HTML ডকুমেন্টের সমষ্টি
খ. ডোমেইনের নাম
গ. HTTP প্রোটোকল ঘ. অসংখ্য URL এর সংযুক্তি

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

২১	ঘ	২২	ক	২৩	গ	২৪	ক	২৫	ঘ	২৬	গ	২৭	খ	২৮	গ	২৯	খ	৩০	খ
৩১	ক	৩২	ক	৩৩	গ	৩৪	ঘ	৩৫	খ	৩৬	ক	৩৭	গ	৩৮	খ	৩৯	খ	৪০	ঘ
৪১	ক	৪২	খ	৪৩	গ	৪৪													

৪৫. ওয়েবপেজে চিত্র সংযোগ করার জন্য কোন ট্যাগ ব্যবহৃত হয়?
ক. <img> খ. <jpg>
গ. <pic> ঘ. <png>

৪৬. সবচেয়ে বড় হেডিং ট্যাগ কোনটি?
ক. <h6> খ. <h3>
গ. <h2> ঘ. <h1>

৪৭. ওয়েবসাইটের প্রথম যে পেজটি ব্রাউজ করা হয় তার নাম কী?
ক. home.html খ. index.html
গ. main.html ঘ. start.html

৪৮. কোনটি সঠিক URL?
ক. www.abc-com/xyz খ. www.abc.com\xyz
গ. www.abc-com\xyz ঘ. www.abc.com/xyz

৪৯. টেবিলের হেডিং এর জন্য নিচের কোন ট্যাগটি ব্যবহৃত হয়?
ক. <tr> খ. <td>
গ. <th> ঘ.

৫০. টেবিলের রো এর জন্য নিচের কোন ট্যাগটি ব্যবহৃত হয়?
ক. <tr> খ. <td>
গ. <th> ঘ.

৫১. টেবিলের সেল এর জন্য নিচের কোন ট্যাগটি ব্যবহৃত হয়?
ক. <tr> খ. <td>
গ. <th> ঘ.

৫২. টেবিলের ক্যাপশন এর জন্য নিচের কোন ট্যাগটি ব্যবহৃত হয়?
ক. <tr> খ. <t_cap>
গ. <th> ঘ. <caption>

৫৩. HTML এ ফর্ম তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত ট্যাগ —
ক. <f> খ. <frm>
গ. <form> ঘ. <fm>

৫৪. HTML এর ফর্মে ড্রপ-ডাউন বক্স তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত ট্যাগ —
ক. <option> খ. <drop>
গ. <dd> ঘ. <dwon>

৫৫. HTML এর ফর্মে অপশন গ্রুপ তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত ট্যাগ —
ক. <option> খ. <optgroup>
গ. <og> ঘ. <ogroup>

■ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫৬. প্রোগ্রামাররা ওয়েব সাইট ডিজাইন করবে —
i. এইচটিএমএল ব্যবহার করে
ii. Pascal ব্যবহার করে
iii. C/C++ ব্যবহার করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii ও iii
গ. i, ii ও iii ঘ. কোনোটিই নয়

৫৭. কোন ট্যাগের শুরু থাকলেও শেষ থাকে না
i. <img> ii.
iii. hr
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i, ii ও iii খ. ii
গ. iii ঘ. ii ও iii

৫৮. HTML এ ওয়েব পেজ তৈরির জন্য ফাইলের এক্সটেনশন হচ্ছে —
i. .htm ii. .doc
iii. .html
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i এবং ii খ. i এবং iii
গ. ii এবং iii ঘ. i, ii এবং iii

৫৯. একটি HTML ফাইলে —
i. শুরু ট্যাগ হিসেবে <html> থাকে
ii. প্রতি জোড়া শুরু ও শেষ ট্যাগ থাকে
iii. অ্যাট্রিবিউট শুরু ট্যাগে থাকে।
নিচের কোনটি সত্য?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬০. ইন্টারনেটে ফোর ঠিকানা ব্যবহৃত হয় সেগুলো সাধারণত —
i. আইপি অ্যাড্রেস
ii. টেক্সটনির্ভর ডোমেইন নেম সিস্টেম (DNS)
iii. লোকাল অ্যাড্রেস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬১. ওয়েবসাইটে যে ধরনের স্ট্রাকচার বা কাঠামোগুলো বেশি ব্যবহৃত হয় —
i. লিনিয়ার স্ট্রাকচার ii. হায়ারার্কি স্ট্রাকচার
iii. বাইনারি স্ট্রাকচার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬২. ওয়েবপেজ পাবলিশিং এর জন্য —
i. ওয়েবপেজটি তৈরি করতে হবে
ii. ওয়েবপেজটি হোস্টিং করতে হবে
iii ওয়েবপেজটির জন্য ডোমেইন নেম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

৪৫	ক	৪৬	ঘ	৪৭	খ	৪৮	ঘ	৪৯	গ	৫০	ক	৫১	খ	৫২	ঘ	৫৩	গ	৫৪	ক
৫৫	খ	৫৬	ক	৫৭	খ	৫৮	খ	৫৯	ক	৬০	ক	৬১	খ	৬২	ঘ				

৬৩. প্রথমে ঢুকলে যে পেজটি প্রদর্শিত হয় তা হলো —
i. হোম পেজ ii. ফার্স্ট পেজ
iii. নাইস পেজ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. iii

৬৪. ওয়েবপেজ দেখার জন্য আবশ্যক —
i. সার্চ ইঞ্জিন ii. ওয়েব ব্রাউজার
iii. কমপিউটার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও iii খ. ii ও iii
গ. ii ঘ. i, ii ও iii

৬৫. ওয়েব ব্রাউজার হলো —
i. সাফারি ii. অপেরা
iii. গুগলক্রম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৬. ওয়েবসাইটের কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হলো —
i. Main Section ii. Home Page
iii. Subsection
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৭. **Line break** এ প্রয়োজন নেই– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. Closing tag ii. Opening tag
iii. Base tag
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৮. ওয়েবপেজে **ocean.jpg** নামক ইমেজটি যুক্ত করার জন্য নির্দেশ হলো **<img src = "ocean.jpg" >** এখানে ইমেজটির সাইজ ৪০০ বাই ৩০০ পিক্সেল করার জন্য কী নির্দেশ দিতে হবে?
ক. w="400" h="300"
খ. width="400" height="300"
গ. pixw="400" pixh="300"
ঘ. কোনটি সত্য নয়

৬৯. ওয়েব-এ ব্যবহৃত ইমেজ ফরমেট —
i. Gif ii. png
iii. jpeg
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭০. **<font>** ট্যাগ এর কাজ হলো ওয়েবসাইটের– (প্রয়োগ)
i. টেক্সটের ফন্ট ঠিক করা
ii. টেক্সটের আকার ঠিক করে
iii. টেক্সটের রং ঠিক করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭১. ওয়েবসাইট তৈরির জন্য —
i. ব্যান্ডউইথ প্রয়োজন ii. জায়গা প্রয়োজন
iii. ঠিকানা প্রয়োজন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭২. ব্রাউজিং সফটওয়্যার হলো —
i. Mozilla Firefox ii. Internet Exlorer
iii. HTML
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

■ **অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :**

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭৩ ও ৭৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

সাকিব নতুন ওয়েব পেজ ডিজাইনার। সে HTML ব্যবহার করে কাজ করে। সম্প্রতি সে ওয়েব পেজে হাইপারলিংক ব্যবহার করার পদ্ধতিটি শিখেছে।

৭৩. সাকিব কোন ট্যাগটি ব্যবহার করে হাইপারলিংক করেছে?
ক. <caption> খ. <a>
গ. <head> ঘ. <html>

৭৪. সাকিব সম্প্রতি যে পদ্ধতিটি শিখেছে তার মাধ্যমে সে ওয়েব পেজ–
i. সমৃদ্ধ করতে পারবে
ii. তথ্যবহুল করে তুলতে পারবে
iii. দৃষ্টিনন্দন করতে পারবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭৫ ও ৭৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও।**

রহমান তার ওয়েবসাইটে লেখার সাথে ছবিও যুক্ত করেছে। এতে করে তার সাইটটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়েছে।

৭৫. রহমান কোন ট্যাগটি ব্যবহার করে ছবিটি যুক্ত করেছে?
ক. <caption> খ. <img>
গ. <head> ঘ. <html>

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

৬৩	ক	৬৪	গ	৬৫	ঘ	৬৬	ঘ	৬৭	ক	৬৮	খ	৬৯	ঘ	৭০	ঘ	৭১	গ	৭২	ক
৭৩	খ	৭৪	ঘ	৭৫	খ														

৭৬. রহমান যে ছবিটি যুক্ত করেছে সেটি যে ফরমেটের হতে পারে—
i. .jpg ii. .png
iii. .psd
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

Roll No	Name	Result
101	Sakib	A+
102	Raihan	B+
103	Ismail	A-
104	Ebad	A

৭৭. ওয়েবসাইটের টেবিলটিতে কয়টি কলাম ও কয়টি সারি রয়েছে?
ক. ৩ কলাম ৪ সারি খ. ৩ কলাম ৫ সারি
গ. ৩ কলাম ৩ সারি ঘ. কলাম ৪ সারি

৭৮. উদ্দীপকের টেবিলটি তৈরি করতে নিচের কোন কোন ট্যাগ ব্যবহার করা হয়েছে?
i. <tr> ii. <td>
iii. <th>
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

```
<address>
Systech Digital Ltd.<br>
House#7, Road#31, Sector#7 <br>
Uttara, Dhaka<br>
Bangladesh<br>
</address>
```

৭৯. উদ্দীপকে **
** ব্যবহার করা হয়েছে—
ক. ঠিকানা লেখার জন্য খ. লাইন ব্র্যাক করার জন্য
গ. প্যারাগ্রাফ ব্র্যাক করার জন্য
ঘ. লেখা সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য

৮০. উদ্দীপকে ব্যবহৃত **
** ট্যাগটির—
i. কোন ক্লোজ ট্যাগ নেই ii. ক্লোজ ট্যাগ আছে
iii. এম্পটি ইলিমেন্টস বলা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮১ ও ৮২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মবিন নোটপ্যাড এডিটর ব্যবহার করে 'New World'/ 'নিউ ওয়ার্ল্ড' নামে একটি HTML ডকুমেন্ট তৈরি করল।

৮১. নতুন ডকুমেন্ট নামকরণে মবিন কোন **HTML** ট্যাগটি ব্যবহার করেছে?
ক. <table> খ. <html>
গ. <p> ঘ. <title>

৮২. মবিন তার '**New World**' ডকুমেন্টটি দেখতে পারবে—
i. ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ব্যবহার করে
ii. গুগল ক্রোম ব্যবহার করে
iii. মজিলা ফায়ারফক্স ব্যবহার করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮৩ ও ৮৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
ওয়েবসাইট তৈরি অর্থাৎ ওয়েব ডিজাইনের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে ওয়েবসাইট ডিজাইন করলে সেই ওয়েবসাইট ব্যবহারকারী, গ্রাহক বা ক্রেতার চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে।

৮৩. ওয়েবসাইট ডিজাইনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার কোন বিষয়টি জরুরী?
ক. গুণগতমান বজায় রাখা
খ. হ্যাকিং থেকে রক্ষা পাওয়া
গ. দৃষ্টিনন্দন সাইট তৈরি করা
ঘ. ব্যবসায় লাভবান হওয়া

৮৪. ওয়েবসাইট তৈরি ও পাবলিশিংয়ের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়—
i. ওয়েবসাইট ডিজাইন ii. ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন
iii. ডোমেইন হোস্টিং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৮৫ ও ৮৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
< a href = "url"> link text </a>

৮৫. উপরিউক্ত কোডের "**url**" দ্বারা বুঝায়—
ক. ওয়েব পৃষ্ঠার পূর্ণ ঠিকানা
খ. ওয়েবসাইটের পূর্ণ ঠিকানা
গ. কলেজের ওয়েবসাইটের ঠিকানা
ঘ. যেকোনো ঠিকানা

৮৬. উক্ত কোড থেকে বুঝায়—
i. href দ্বারা লিঙ্কের ঠিকানা
ii. url দ্বারা ওয়েব পৃষ্ঠার পূর্ণ ঠিকানা
iii. <a> দ্বারা অ্যাঙ্কর এলিমেন্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮৭–৮৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ইউসুফ একটি ওয়েবসাইট তৈরি করে তাতে তার ব্যক্তিগত সকল তথ্যের সাথে প্রয়োজনীয় ছবি ও কার্টুন যুক্ত করল।

৮৭. ইউসুফের কাজকে বলা যায়—
ক. ওয়েবহোস্টিং খ. ওয়েব লিঙ্ক
গ. ওয়েব ইনফো ঘ. ওয়েব ডিজাইন

৮৮. ইউসুফ তার ওয়েবপেজে যুক্ত করতে পারে—
i. টেক্সট ii. ভিডিও
iii. চিত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

৭৬	ক	৭৭	খ	৭৮	ঘ	৭৯	খ	৮০	গ	৮১	খ	৮২	ঘ	৮৩	খ	৮৪	ঘ	৮৫	ক
৮৬	ঘ	৮৭	ঘ	৮৮	ঘ														

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জাহিদ একটি সাধারণ ওয়েবসাইট তৈরি করবে। সে উইন্ডোজ এক্সপি ব্যবহার করে। ওয়েবসাইট ডিজাইন করার কোন প্রোগ্রাম বা টুলস তার কমপিউটারে নেই। সে এইচটিএমএল মোটামুটি জানে।

ক. সার্চ ইঞ্জিন কী? ১

খ. HTML-এ ব্যবহৃত কয়েকটি এলিমেন্টের কাজ লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে কোন লেখাতে ক্লিক করলে আরেকটি পেজ ওপেন হবে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. জাহিদের কাঙ্ক্ষিত কাজটি কীভাবে তাকে সাহায্য করবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

২. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

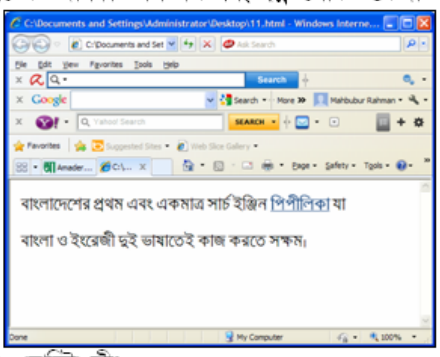

ক. হোস্টিং কী? ১

খ. এইচটিএমএল এ ওয়েবপেজে কীভাবে বাংলা লিখবে? ২

গ. উদ্দীপকের পিপীলিকা লেখাতে বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র সার্চ ইঞ্জিন www.pipilika.comএর লিংক তৈরি করার জন্য কী নির্দেশ দিতে হবে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত লিংক করা থাকলে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়– বিশ্লেষণসহ তোমার মতামত দাও। ৪

৩. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শতরূপা গার্মেন্টসের মালিক আবু তাহের তার প্রতিষ্ঠানের একটি ওয়েবসাইট তৈরির জন্য বাংলাদেশের একটি লিডিং সফটওয়্যার ডেভেলপ কোম্পানি সিসটেক ডিজিটাল লিমিটেডকে অনুরোধ করেন। তার অনুরোধের প্রেক্ষিতে সিসটেক ডিজিটাল লিমিটেড কোম্পানির একজন কর্মকর্তা জনাব আতিকুর রহমান তাকে বেশকিছু পরামর্শ দেন।

ক. ওয়েবসাইট কী? ১

খ. ওয়েব সার্ভার বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে কর্মকর্তার পরামর্শ কী হতে পারে– আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ওয়েবসাইট তৈরিতে গৃহীত ব্যবস্থা নিজের ভাষায় তুলে ধর। ৪

৪. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

```
<html>
<body>
<p>
An Ocean image:
<img    src="boat.gif"    alt="Big
 Boat" />|
</p>
<p>
</body>
</html>
```

ক. URL কী? ১

খ. HTML-এ ট্যাগ গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রোগ্রামে Big Boat লেখা হয় চিত্রটি প্রদর্শনের জন্য তোমার করণীয় – ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ভাষাটি ওয়েবপেজ ডিজাইনের সুবিধাজনক – বিশ্লেষণ কর। ৪

৫. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

Roll No	Name	Result
101	Sakib	A+
102	Raihan	B+
103	Ismail	A-
104	Ebad	A

ক. সার্চ ইঞ্জিন কী? ১

খ. ওয়েবসাইটের কাঠামো বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের আউটপুটটি পাওয়ার জন্য এইচটিএমএল ভাষায় প্রোগ্রাম লেখ। ৩

ঘ. Name ও Result এর মাঝে B_Date নামক একটি কলাম যুক্ত করে এতে জন্ম তারিখ এন্ট্রি করার জন্য প্রোগ্রামে কি ধরনের পরিবর্তন আনতে হবে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ইবাদ, মুসা, আশরাফ, তমাল এবং জাহিদ রায়পুরা ডিগ্রী কলেজে একাদশ শ্রেণীতে পড়ে। তারা সিদ্ধান্ত নিল এইচটিএমএল দিয়ে একটি সাধারণ ওয়েবসাইট তৈরি করবে যেখানে তাদের শ্রেণীর অন্যান্য শিক্ষার্থীদের তথ্য থাকবে।

ক. আইপি অ্যাড্রেস কী? ১

খ. ইন্টারনেটে তথ্য খোঁজার জন্য ব্যবহৃত সফটওয়্যারের গুরুত্ব – সংক্ষেপে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে ব্যবহৃত ভাষা দিয়ে শিক্ষার্থীদের কর্মকাণ্ডের একটি নমুনা তৈরি কর। ৩

ঘ. শিক্ষার্থীদের কর্মকাণ্ডটি তাদের কলেজকে কীভাবে উপকৃত করবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

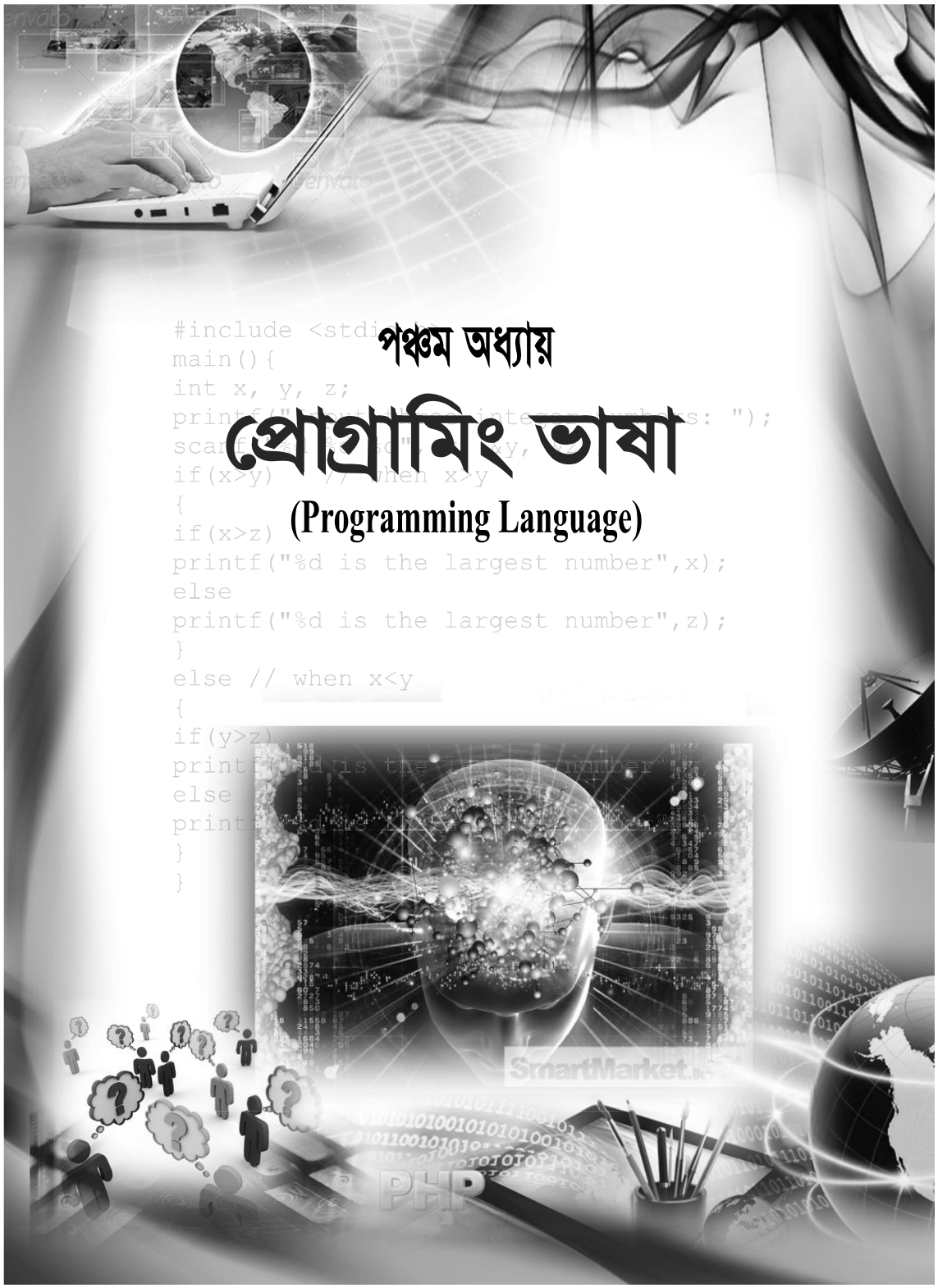

পঞ্চম অধ্যায়

প্রোগ্রামিং ভাষা

(Programming Language)

পঞ্চম অধ্যায়

প্রোগ্রামিং ভাষা (Programming Language)

পিরিয়ড সংখ্যা : ৩৫

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. প্রোগ্রামের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ২. বিভিন্ন স্তরের প্রোগ্রামিং ভাষা বর্ণনা করতে পারবে	● প্রোগ্রামের ধারণা (Concept of Program) ● প্রোগ্রামের ভাষা (Programming Language) ● বিভিন্ন প্রজন্মের প্রোগ্রামের ভাষা ● নিম্নস্তরের ভাষা (Low Level Language) ▪ মেশিন ভাষা (Machine Language) ▪ অ্যাসেম্বলি ভাষা (Assembly Language) ● মধ্যম স্তরের ভাষা (Mid Level Language) ● উচ্চ স্তরের ভাষা (High Level Language) ▪ সি (C) ▪ অ্যালগল (Algol) ▪ সি ++ (C++) ▪ ফোরট্রান (Fortran) ▪ জাভা (Java) ▪ পাইথন (Python) ▪ ওরাকল (Oracle) ▪ ভিজুয়াল বেসিক (Visual Basic) ▪ চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা (4th Generation Language-4GL)
ব্যবহারিক ৩. প্রোগ্রামের সংগঠন প্রদর্শন করতে পারবে ৪. প্রোগ্রাম অ্যালগরিদম ও ফ্লো চার্ট প্রস্তুত করতে পারবে	● অনুবাদক প্রোগ্রাম (Translator Program) - কম্পাইলার (Compiler) - ইন্টারপ্রিটার (Interpreter) - অ্যাসেম্বলার (Assembler) ● প্রোগ্রামের সংগঠন (Program Organization) ● প্রোগ্রাম উন্নয়নের ধাপসমূহ (Steps of Developing a Program) - অ্যালগরিদম (Algorithm) - ফ্লোচার্ট (Flow Chart)
৫. 'সি' প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করে প্রোগ্রাম প্রস্তুত করতে পারবে	● প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল (Program Design Model) ● 'সি' প্রোগ্রামিং ভাষা ('C' Programming Language) - প্রাথমিক ধারণা (Concept of C programming) - বৈশিষ্ট্য (Characteristics of C programming) - সি প্রোগ্রাম কম্পাইলিং (Compling of C Programs) - সি প্রোগ্রামের গঠন (Structure of C Programs) - ডেটা টাইপ (Types of Data) ❍ ধ্রুবক (Constant) ❍ চলক (Variables) - অপারেটর (Operator) - বর্ণনা (Expressions) - কী ওয়ার্ড (Key word) - ইনপুট আউটপুট স্টেটমেন্ট (Input Output Statements) - কনডিশনাল স্টেটমেন্ট (Conditional Statement) - লুপ স্টেটমেন্ট (Loop Statement) -অ্যারে (Array) -ফাংশন (Function)

১. প্রোগ্রামের ধারণা (Concept of Program)

কোন সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পিউটারের ভাষায় ধারাবাহিকভাবে কতগুলো কমান্ড বা নির্দেশের সমষ্টিকে প্রোগ্রাম বলা হয়। প্রোগ্রাম লেখার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম ভাষা ব্যবহৃত হয়। প্রোগ্রামে লিখিত নির্দেশসমূহ সোর্স প্রোগ্রাম ফাইলে সারিবদ্ধভাবে লেখা হয়। কম্পিউটার এ নির্দেশসমূহকে পর্যায়ক্রমিকভাবে পালনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান করে।

২. প্রোগ্রামের ভাষা (Programming Language)

কম্পিউটার সিস্টেমে প্রোগ্রাম রচনার জন্য ব্যবহৃত শব্দ, বর্ণ, অঙ্ক, সংকেত এবং এগুলো বিন্যাসের নিয়ম মিলিয়ে তৈরি হয় প্রোগ্রামের ভাষা বা প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ। বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম রচনার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম ভাষা ব্যবহৃত হয়। প্রোগ্রামিং-এর মাধ্যমে জটিল সমস্যা অল্প সময়ে এবং সহজে সমাধান করা যায়। প্রোগ্রাম রচনার জন্য উপযুক্ত প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ প্রয়োজন হয়। প্রতিটি প্রোগ্রামিং ভাষারই বিশেষ কিছু সিনটেক্স রয়েছে এবং সিনটেক্স অনুসারেই ঐ ভাষায় প্রোগ্রাম লিখতে হয়।

৩. বিভিন্ন প্রজন্মের প্রোগ্রামের ভাষা

১৯৪৫ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত কয়েকশ প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ বা ভাষা আবিস্কৃত হয়েছে। এ সকল ভাষাকে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পাঁচটি স্তর বা প্রজন্মে ভাগ করা যায়। যথা :

১. প্রথম প্রজন্ম ভাষা (১৯৪৫) : মেশিন ভাষা (Machine language)
২. দ্বিতীয় প্রজন্ম ভাষা (১৯৫০) : অ্যাসেম্বলি ভাষা (Assembly language)
৩. তৃতীয় প্রজন্ম ভাষা (১৯৬০) : উচ্চতর ভাষা (High level language)
৪. চতুর্থ প্রজন্ম ভাষা (১৯৭০) : অতি উচ্চতর ভাষা (Very high level language)
৫. পঞ্চম প্রজন্ম ভাষা (১৯৮০) : স্বাভাবিক বা ন্যাচারাল ভাষা (Natural language)

প্রোগ্রাম রচনার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রোগ্রাম ভাষাসমূহকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

১. নিম্নস্তরের ভাষা (Low Level Language)
২. উচ্চস্তরের ভাষা (High Level Language)

নিম্নস্তরের ভাষা (Low Level Language)

কম্পিউটার বা অনুরূপ যন্ত্রগুলো সরাসরি বুঝতে পারে এরূপ ভাষাকে নিম্নস্তরের ভাষা বলা হয়। নিম্নস্তরের ভাষা ৩.১ আবার দু'প্রকার। যথা–

১. মেশিন ভাষা (Machine Language) এবং
২. এ্যাসেম্বলি ভাষা (Assembly Language)।

মেশিন ভাষা (Machine Language)

কম্পিউটার মেশিনের নিজস্ব ভাষাকে মেশিন ভাষা বা নিম্নস্তরের ভাষা বলা হয়। সাধারণত মেশিন ভাষা 0 ও 1 এ দুই বাইনারি অঙ্ক দিয়ে লিখতে হয় তবে হেক্স পদ্ধতি ব্যবহার করেও সবকিছু লেখা হয়। কম্পিউটার একমাত্র যন্ত্রভাষাই বুঝতে পারে, অন্য ভাষায় প্রোগ্রাম করলে কম্পিউটার আগে উপযুক্ত অনুবাদকের সাহায্যে তাকে যন্ত্রভাষায় পরিণত করে নেয়। মেশিনের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে অবজেক্ট প্রোগ্রামও বলা হয়। এ ভাষা ব্যবহার করে কম্পিউটারে বর্তনীর ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা যায়। এ ভাষা অনুশীলনের মাধ্যমে কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ সংগঠন সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা সম্ভব। যন্ত্রভাষায় যেসব নির্দেশ দেওয়া হয় তাদের চার ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন–

১. গাণিতিক (Arithmetic) অর্থাৎ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ।
২. নিয়ন্ত্রণ (Control) অর্থাৎ লোড (Load), স্টোর (Store) ও (Jump) জাম্প।
৩. ইনপুট-আউটপুট অর্থাৎ পড় (Read) ও (Write) লেখ।
৪. প্রত্যক্ষ ব্যবহার (Direct use) অর্থাৎ শুরু বা আরম্ভ (Start), থামা (Halt) ও শেষ (End)।

মেশিন ভাষার নির্দেশে দুটি অংশ থাকে।

১. অপকোড (Operation Code or OP Code) – অপকোড কম্পিউটারকে কী ধরনের অপারেশন হবে তা বলে দেয়।
২. অপারেন্ড (Operand) – অপারেন্ড কমম্পিউটারকে কী অপারেশন হবে তা নির্দেশ করে।

মেশিন ভাষায় প্রোগ্রাম রচনার সুবিধা

- কম মেমোরি ও লজিক পরিসরে প্রোগ্রাম লেখা সহজ।
- এ ভাষা ব্যবহার করে কম্পিউটারে বর্তনীর ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা যায়।
- এ ভাষা অনুশীলনের মাধ্যমে কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ সংগঠন সম্পর্কে জানা যায়।
- প্রোগ্রাম দ্রুত কার্যকরী হয়।
- কম পরিমাণ লজিক ব্যবহার করে প্রোগ্রাম নির্বাহ করা যায়।
- কম পরিমাণ মেমোরি ব্যবহার করে প্রোগ্রাম নির্বাহ করা যায়।

মেশিন ভাষায় প্রোগ্রাম রচনার অসুবিধা

- প্রোগ্রাম রচনা অত্যন্ত ক্লান্তিকর ও সময়সাপেক্ষ।
- এক ধরনের মেশিনের জন্য লিখিত প্রোগ্রাম অন্য ধরনের মেশিনে ব্যবহার করা যায় না।
- প্রোগ্রাম রচনার জন্য কম্পিউটারের সংগঠন সম্বন্ধে ধারণা থাকা অপরিহার্য।
- ডিবাগ করা কষ্টকর।
- দক্ষ প্রোগ্রামারের প্রয়োজন হয়।

অ্যাসেম্বলি ভাষা (Assembly Language)

অ্যাসেম্বলি ভাষা হচ্ছে মেশিন ভাষার পরবর্তী প্রোগ্রামের ভাষা। এ ভাষা বিভিন্ন সংকেত সহযোগে গঠিত। তাই একে সাংকেতিক ভাষাও বলা হয়। অ্যাসেম্বলি ভাষায় সাংকেতিক কোডে নির্দেশ দেয়া হয়। অ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে মেশিনের ভাষায় রূপান্তরিত করার জন্য অ্যাসেম্বলার নামক একধরনের ট্রান্সলেটর বা অনুবাদক প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়। অ্যাসেম্বলি ভাষার প্রচলন শুরু হয় ১৯৫০ সাল থেকে, দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারের এ ভাষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। সাংকেতিক ভাষার ক্ষেত্রে নির্দেশ ও তথ্যের ঠিকানা বাইনারি বা হেক্স সংখ্যার সাহায্যে না দিয়ে সংকেতের সাহায্যে দেয়া হয়। এ সংকেতকে বলে সাংকেতিক কোড (Symbolic code) বা নেমোনিক (Nemonic) অর্থাৎ যে সংকেতের সাহায্যে কোন বড় সংখ্যা বা কথাকে মনে রাখার সুবিধা হয়। যেমন : সঞ্চয়কে রাখ, এর নেমোনিক LDA। এ ভাষায় রচিত প্রোগ্রাম দক্ষ ও সংক্ষিপ্ত হয় এবং প্রোগ্রাম রচনায় ভুলের পরিমাণ কম হয়।

অ্যাসেম্বলি ভাষার নির্দেশে চারটি অংশ থাকে। যথা–

১. লেবেল (Lebel) ফিল্ড
২. অপকোড (OPcode)
৩. অপারেন্ড (Operand)
৪. কমেন্ট (Comment)

অ্যাসেম্বলি ভাষায় প্রোগ্রাম রচনার সুবিধা

অ্যাসেম্বলি ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা জটিল হলেও এ ভাষা ব্যবহারে বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। যেমন :

- এ ভাষায় রচিত প্রোগ্রাম দক্ষ ও সংক্ষিপ্ত হয়।
- মেমোরি এ্যাড্রেসের বিবরণের প্রয়োজন হয় না।
- প্রোগ্রাম রচনায় ভুলের পরিমাণ কম হয়।
- মেশিনের অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে জানা হয়।
- ডিবাগিং করা সহজ।

অ্যাসেম্বলি ভাষায় প্রোগ্রাম রচনার অসুবিধা

- প্রোগ্রাম রচনা অত্যন্ত ক্লান্তিকর ও সময়সাপেক্ষ।
- এক ধরনের মেশিনের জন্য লিখিত প্রোগ্রাম অন্য ধরনের মেশিনে ব্যবহার করা যায় না।
- প্রোগ্রাম রচনার জন্য কম্পিউটারের সংগঠন সম্বন্ধে ধারণা থাকা অপরিহার্য।
- প্রোগ্রাম নির্বাহের জন্য অনুবাদক প্রোগ্রাম অ্যাসেম্বলারের প্রয়োজন।
- এই ভাষা সরাসরি মেশিন বুঝতে পারে না।

যান্ত্রিক ভাষা ও অ্যাসেম্বলি ভাষার মধ্যে পার্থক্য
(Difference Between Machine Language and Assembly Language)

যান্ত্রিক ভাষা ও অ্যাসেম্বলি ভাষা উভয়ই নিম্নস্তরের ভাষা। তবুও এদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

যান্ত্রিক ভাষা/মেশিন ভাষা	অ্যাসেম্বলি ভাষা
১. কম্পিউটার যন্ত্র সরাসরি যে ভাষা বুঝতে পারে সে ভাষাই হচ্ছে যান্ত্রিক ভাষা।	১. যে প্রোগ্রামিং ভাষায় Numeric code—এর পরিবর্তে Nemonic code ব্যবহার করা হয় তাকে অ্যাসেম্বলি ভাষা বলে।
২. মেশিনের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে বস্তু প্রোগ্রাম বা Object প্রোগ্রাম বলা হয়।	২. অ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে উৎস প্রোগ্রাম বা Source প্রোগ্রাম বলে।
৩. 0 এবং 1 এ দুটি অক্ষর দিয়ে যন্ত্রভাষা লেখা হয়।	৩. অ্যাসেম্বলি ভাষায় অক্ষর এর পরিবর্তে সংকেত ব্যবহার করা হয়।
৪. যান্ত্রিক ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা অত্যন্ত ক্লান্তিকর ও সময়সাপেক্ষ।	৪. যান্ত্রিক ভাষার তুলনায় অ্যাসেম্বলি ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা সহজতর ও কম সময়সাপেক্ষ।
৫. যন্ত্র ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামে অনুবাদক প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয় না।	৫. অ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম কম্পিউটারকে বুঝানোর জন্য অ্যাসেম্বলার নামক অনুবাদক প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয়।
৬. এই ভাষা মেশিন সহজে বুঝতে পারে।	৬. এই ভাষা মেশিন সহজে বুঝতে পারে না।
৭. ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।	৭. ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।
৮. প্রোগ্রাম ডিবাগ করা কঠিন।	৮. প্রোগ্রাম ডিবাগ করা সহজ।

৩.২ মধ্যম স্তরের ভাষা (Mid Level Language)

কম্পিউটার দিয়ে আরো বেশি কাজ করানোর জন্য মধ্যমস্তরের ভাষার উদ্ভব হয়। এই ভাষার সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ ও সিস্টেম প্রোগ্রাম রচনা করা যায়। মধ্যমস্তরের ভাষা হলো এক ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যা যেকোন ধরণের কম্পিউটারে নির্বাহ করা সম্ভব। যেমন : C, FORTRAN, PASCAL ইত্যাদি। ১৯৬০ সালের দিকে এই ভাষার উদ্ভব হয়। নিম্নস্তরের ভাষা প্রোগ্রামারদের বোঝা কঠিন ছিল বলে মধ্যম স্তরের ভাষা ব্যবহৃত হয়।

মধ্যমস্তরের ভাষার বৈশিষ্ট্য/সুবিধা :

১. এই ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম বোঝা প্রোগ্রামারদের কাছে সহজসাধ্য।
২. যে কোন ধরনের কম্পিউটার নির্বাহ করা সম্ভব।
৩. একবার লিখিত প্রোগ্রাম পরবর্তীতে পরিবর্তন করা সহজ।
৪. ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।
৫. ভুল সংশোধন করা সম্ভব।

মধ্যমস্তরের ভাষার অসুবিধা :

১. অনুবাদক প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয়।
২. এই ভাষা মেশিন বুঝতে পারে না।
৩. উচ্চতর ভাষার তুলনায় এই ভাষা কঠিন।

৩.৩ উচ্চতর ভাষা (High Level Language)

মেশিন ও অ্যাসেম্বলি ভাষায় এক ধরনের কম্পিউটারের জন্য রচিত প্রোগ্রাম অন্য ধরনের কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায় না। তাছাড়া লো লেভেল ভাষায় (মেশিন ও অ্যাসেম্বলি ভাষা) প্রোগ্রাম লেখা কষ্টকর ও শ্রমসাধ্য কাজ। কম্পিউটারের পক্ষে লো লেভেল ভাষা বোঝা সহজ হলেও মানুষের পক্ষে লো লেভেল ভাষা বোঝা সহজসাধ্য নয়। এ সকল অসুবিধা থেকে অব্যাহতির প্রচেষ্টার ফলে উচ্চতর ভাষার উদ্ভব হয়। মানুষের কাছাকাছি ভাষা হচ্ছে হাই লেভেল ভাষা। হাই লেভেল ভাষা মানুষ দ্রুত লিখতে, বুঝতে ও স্মরণ রাখতে পারে। এটি ইংরেজি ভাষার সদৃশ। উদাহরণ : C++, BASIC, PASCAL, FORTRAN ইত্যাদি।

হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজের কতিপয় বৈশিষ্ট্য বা সুবিধা

১. হাই লেভেল ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম যে কোন কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায়।
২. মানুষের পক্ষে নিম্নস্তরের চেয়ে উচ্চস্তরের ভাষা শেখা সহজ।
৩. হাই লেভেল ভাষায় তাড়াতাড়ি প্রোগ্রাম লেখা যায়।
৪. নিম্নস্তরের ভাষায় চার/পাঁচটি নির্দেশের জায়গায় উচ্চস্তরের ভাষায় মাত্র একটি বাক্য লিখলেই চলে।
৫. হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজ লেখা প্রোগ্রামে ভুল হবার সম্ভাবনা কম ও সংশোধন করা সহজ।
৬. লাইব্রেরি ফাংশন সুবিধা পাওয়া যায়।
৭. প্রোগ্রাম লেখার সময় হার্ডওয়্যার নিয়ে ভাবতে হয় না।
৮. প্রোগ্রাম তুলনামূলকভাবে ছোট হয়।

হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজের অসুবিধা

১. এ ভাষায়র প্রোগ্রাম কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে না।
২. প্রোগ্রাম লেখার পূর্বে স্ট্রাকচার জানতে হয়।
২. কমান্ডের সিনটেক্স জানতে হয়।
৩. এ ল্যাংগুয়েজে লিখিত প্রোগ্রাম মেশিন ল্যাংগুয়েজে রূপান্তরের জন্য অনুবাদক প্রোগ্রাম প্রয়োজন হয়।
৪. লো-লেভেল ভাষার তুলনায় দক্ষতা কম।
৫. লো-লেভেল ভাষার তুলনায় বেশি মেমরি প্রয়োজন পড়ে।
৬. লো-লেভেল ভাষার তুলনায় Flexibility কম।

হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজের ব্যবহার (Use of High Level Language)

হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজ নিম্নলিখিত কাজে ব্যবহৃত হয় —

১. বড় প্রোগ্রাম তৈরির কাজে।
২. বৃহৎ ডেটা প্রসেসিং-এর কাজে ব্যবহৃত প্রোগ্রাম তৈরি করতে।
৩. যেসব ক্ষেত্রে প্রচুর মেমোরি প্রয়োজন সেসব ক্ষেত্রের সফটওয়্যার তৈরির কাজে।
৪. জটিল গাণিতিক নিকাশে ব্যবহৃত সফটওয়্যার তৈরির কাজে।
৫. এপ্লিকেশন প্যাকেজ সফটওয়্যার তৈরির কাজে।
৬. বিভিন্ন ধরনের অটোমেটিক প্রসেস কন্ট্রোলের কাজে।

হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজের প্রকারভেদ (Types of High Level Language)

হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজকে দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা–

১. সাধারণ কাজের (General purpose) ভাষা
২. বিশেষ কাজের (Special purpose) ভাষা।

যে ভাষা সব ধরনের কাজের উপযোগী তাকে বলে সাধারণ কাজের ভাষা, যেমন বেসিক, সি ইত্যাদি। যে ভাষা শুধু বিশেষ বিশেষ কাজের উপযোগী তাকে বলে বিশেষ কাজের ভাষা, যেমন– কোবল, লিস্প, ফোরট্রান।

বিশেষ কাজের (Special purpose) হাই লেভেল ভাষাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

বাণিজ্যিক প্রয়োগের ভাষা

এসব ভাষায় বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ডেটার বিশ্লেষণ, বিন্যাস এবং প্রক্রিয়াকরণের ব্যাপক সুবিধা থাকে। এসব ভাষায় কাজের নির্দেশ ইংরেজি ভাষার মত। বিভিন্নভাবে রিপোর্ট ও সারণী প্রদর্শনের সুবিধা এ ভাষার অন্যতম আকর্ষণ। কোবল (Cobol) একটি অন্যতম বাণিজ্যিক প্রয়োগের ভাষা।

বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের ভাষা

এসব ভাষায় গবেষণালব্ধ উপাত্ত ও তথ্য বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফলাফল প্রক্রিয়াকরণের সুবিধা থাকে। শক্তিশালী গাণিতিক কাজের ক্ষমতা, গাণিতিক ফাংশনের বৃহৎ লাইব্রেরি, গাণিতিক বর্ণনা ও সূত্র ব্যবহারের সুবিধা, ম্যাট্রিক্স ব্যবহারের ক্ষমতা এ ধরনের ভাষার বিশেষত্ব। ফোরট্রান, এলগল এ ধরনের ভাষার উদাহরণ।

বিশেষ প্রয়োগের ভাষা

বিশেষ প্রয়োগের জন্য এ ধরনের ভাষার উদ্ভব হয়েছে। মেশিন নিয়ন্ত্রণ, সিমুলেশন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। (যেমন– CSL সিমুলেশন ভাষা)

হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজ ও মেশিন ল্যাংগুয়েজের মধ্যে পার্থক্য

মেশিন ল্যাংগুয়েজ	হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজ
১. কম্পিউটার যে ভাষা সরাসরি বুঝতে পারে তাকে মেশিন ল্যাংগুয়েজ বলা হয়।	১. কম্পিউটারকে সর্বজন ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে যে ভাষা তৈরি হয় তাই হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজ বা উচ্চস্তরের ভাষা।
২. এটি মেশিনের ভাষা বিধায় কম্পিউটারকে বুঝানোর জন্য অনুবাদের প্রয়োজন হয় না।	২. উচ্চস্তরের ভাষা মেশিন–নির্ভর নয়। তাই এ ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম কমপিটারকে বুঝানোর জন্য মেশিনের ভাষায় অনুবাদ করে দিতে হয়।
৩. মেশিনের ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা তুলনামূলকভাবে কষ্টসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।	৩. মেশিনের ভাষার তুলনায় উচ্চস্তরের ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা করা সহজ।
৪ মেশিনের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে অবজেক্ট প্রোগ্রাম বা বস্তু প্রোগ্রাম বলে।	৪. উচ্চস্তরের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে Source বা উৎস প্রোগ্রাম বলে।
৫. মেশিনের ভাষা হচ্ছে বাইনারি, যা 0 এবং 1 দ্বারা গঠিত।	৫. কয়েকটি উচ্চস্তরের ভাষা হচ্ছে C++, BASIC, PASCAL, FORTRAN ইত্যাদি।
৬. এই ভাষা মেশিন সহজে বুঝতে পারে।	৬. এই ভাষা মেশিন সহজে বুঝতে পারে না।
৭. ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।	৭. ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।
৮. প্রোগ্রাম ডিবাগ করা কঠিন।	৮. প্রোগ্রাম ডিবাগ করা সহজ।

অ্যাসেম্বলি ল্যাংগুয়েজ ও হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজের মধ্যে পার্থক্য

অ্যাসেম্বলি ল্যাংগুয়েজ	হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজ
১. যে প্রোগ্রামিং ভাষায় Numeric code–এর পরিবর্তে Nemonic code ব্যবহার করা হয় তাকে অ্যাসেম্বলি ভাষা বলে।	১. কম্পিউটারকে সর্বজন ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে যে ভাষা তৈরি হয় তাই হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজ বা উচ্চস্তরের ভাষা।
২. অ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে উৎস প্রোগ্রাম বা Source প্রোগ্রাম বলে।	৩. উচ্চস্তরের ভাষা মেশিন–নির্ভর নয়। তাই এ ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম কমপিটারকে বুঝানোর জন্য মেশিনের ভাষায় অনুবাদ করে দিতে হয়।
৩. অ্যাসেম্বলি ভাষায় অক্ষর এর পরিবর্তে সংকেত ব্যবহার করা হয়।	৫. মেশিনের ভাষার তুলনায় উচ্চস্তরের ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা করা সহজ।
৪. যান্ত্রিক ভাষার তুলনায় অ্যাসেম্বলি ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা সহজতর ও কম সময়সাপেক্ষ।	৬. উচ্চস্তরের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে Source বা উৎস প্রোগ্রাম বলে।
৫. অ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম কম্পিউটারকে বুঝানোর জন্য অ্যাসেম্বলার নামক অনুবাদক প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয়।	৫. কয়েকটি উচ্চস্তরের ভাষা হচ্ছে C++, BASIC, PASCAL, FORTRAN ইত্যাদি।
৬. এটি মেশিন নির্ভর ভাষা।	৬. উচ্চতর ভাষা মেশিন নির্ভর নয়।
৭. এই ভাষার জন্য ব্যবহৃত অনুবাদক প্রোগ্রামকে অ্যাসেম্বলার বলা হয়।	৭. এই ভাষার জন্য ব্যবহৃত অনুবাদক প্রোগ্রামকে কম্পাইলার/ইন্টারপ্রেটার বলা হয়।
৮. এই ভাষার জন্য কম মেমরির প্রয়োজন হয়।	৮. উচ্চতর ভাষার জন্য বেশি মেমরির প্রয়োজন হয়।

কয়েকটি জনপ্রিয় উচ্চস্তরের প্রোগ্রাম ভাষা

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উচ্চস্তরের প্রোগ্রাম ভাষা চালু হয়েছে এবং দিন দিন এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এগুলোর কোনটি বর্তমানে চালু আছে, কোনটি বা বিলুপ্ত হয়েছে। আবার কোনটির ব্যবহার নেই বললেই চলে। বর্তমান সময়ে প্রচলিত কয়েকটি উচ্চতরের ভাষা হলো ঃ ভিজুয়্যাল বেসিক, ফোরট্রান, কোবল, প্যাস্কেল, সি, সি++, জাভা ইত্যাদি।

ভাষার নাম	বছর	উদ্ভাবক	প্রয়োগক্ষেত্র
FORTRAN	১৯৫৭	আইবিএম	বিজ্ঞান/প্রকৌশল
ALGOL	১৯৫৮	ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ	বিজ্ঞান/প্রকৌশল
LISP	১৯৫৯	এম আইটি, ইউ এস এ	কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
APL	১৯৬০	আইবিএম	বিজ্ঞান/প্রকৌশল
COBOL	১৯৬১	ইউএস সামরিক বিভাগ	ব্যবসায়িক
BASIC	১৯৬৪	ডার্টমথ কলেজ	প্রকৌশল/বিজ্ঞান/ব্যবসায়/শিক্ষা
PASCAL	১৯৭০	ফেডারেল ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি, সুইজারল্যান্ড	সাধারণ
C	১৯৭৩	বেল ল্যাবরেটরি	সাধারণ
ADA	১৯৭৫	ইউএস সামরিক বিভাগ	সাধারণ

নিচে জনপ্রিয় কয়েকটি হাইলেবেল ল্যাংগুয়েজের পরিচিতি দেয়া হলো–

সি (C)

১৯৭০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেল ল্যাবরেটরিতে ডেনিস রিচি সি (C) ভাষার উদ্ভাবন করেন। বর্তমানে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় উচ্চতর ভাষা হিসেবে সি পরিচিত। ভাষাটি তৈরির প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেম-এর কোড লেখায় এর ব্যবহার, কিন্তু অচিরেই এটি একটি বহুল ব্যবহৃত ভাষায় পরিণত হয়। বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটারে এবং বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেমের নিয়ন্ত্রণে সি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সি ভাষায় অ্যাসেম্বলি এবং উচ্চতর ভাষার প্রোগ্রামিং

কৌশলের সমন্বয় সাধন করা যায় অর্থাৎ ভাষায় বিট, বাইট, মেমোরি অ্যাড্রেস নিয়ে কাজ করা যায় আবার উচ্চতর ভাষার মত ডেটা টাইপ নিয়েও কাজ করা যায় বলে এটি মধ্যস্তরের ভাষা হিসেবে পরিচিত। সি ভাষায় সহজেই অত্যন্ত জটিল সমস্যা সমাধান করা যায়। ইউনিক্স, লিনাক্স, ম্যাক ওএস ইত্যাদি সি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। কম জায়গা ও রিসোর্স নিয়ে কাজ করা সফটওয়্যার তৈরিতে সি বেশি উপযোগী।

সি++ (C++)

সি++ একটি বহুল ব্যবহৃত অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ভাষা। ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের এটিএন্ডটি বেল ল্যাবরেটরিতে বিজারনি স্ট্রাউসট্রাপ এ ভাষা উদ্ভাবন করেন। প্রথমে এর নাম ছিল 'সি উইথ ক্লাস'। পরবর্তী সময়ে আরও কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ করে ১৯৮৩ সালে সি++ নামকরণ করা হয়। সি++ এ সি এর প্রায় সব বৈশিষ্ট্যসহ অতিরিক্ত আরও কিছু বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা আছে। এজন্য সি++ কে সি-এর বর্ধিত সংস্করণ বা সুপারসেট বলা যায়। টেক্সট এডিটর তৈরি, কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রেটার তৈরি, ডেটাবেজ হ্যান্ডলিং, কমিউনিকেশন সিস্টেম ডিজাইন, ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেম ডিজাইন, রিয়েল-টাইম সিস্টেম ডিজাইন ও উইন্ডোভিত্তিক এ্যাপ্লিকেশনসমূহ সি++ এর অনন্য অবদান। সি++ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এক্স উইন্ডো সিস্টেম, কিউট ইত্যাদির মত গ্রাফিক্যাল ডিসপ্লে ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামিং। অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর দুনিয়ায় একটি কিংবদন্তি এবং জাভার সৃষ্টির প্রেরণা হলো সি++। মজিলা ফায়ারফক্স আর ক্রোমিয়াম ব্রাউজারও কিন্তু বেশিরভাগই সি++ এ লেখা।

ভিজুয়াল বেসিক (Visual Basic)

উইন্ডোজ অ্যাপ্লিকেশনের নাম নিলেই চলে আসে ভিজুয়াল বেসিকের নাম। ভিবি নামেই বহুল প্রচলিত মাইক্রোসফটের ডেভেলপ করা এ প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। দ্রুত এবং সহজে প্রোগ্রাম উন্নয়নের জন্য ভিজুয়াল বেসিক অতুলনীয় হয়ে উঠে। বিশেষত নতুন বা অদক্ষ প্রোগ্রামারদের কাছে এ ভাষা জনপ্রিয়। মাইক্রোসফট বেসিক ল্যাংগুয়েজকে কিনে সেটাকে ডেভেলপ করে এবং ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট (IDE) সহ ১৯৯১ সালে ভিজুয়াল বেসিক নামে বাজারে ছাড়ে। ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ, অ্যাকটিভ এক্স কন্ট্রোল, সরাসরি এক্সিকিউটেবল ও ডায়নামিক লাইব্রেরি লিংক (DLL) তৈরির সুবিধার কারণে ভিবির কদর অনেকের কাছেই বেশি ছিল। ভিজুয়াল বেসিকে খুব সহজে বিভিন্ন ডেটাবেজ বিষয়ক সফটওয়্যারের সাথে সংযোগ করা যায়। তাছাড়া ভিজুয়াল বেসিক স্ক্রিপ্ট সহজে ওয়েবপেজ উন্নয়নে সুবিধা প্রদান করে। ভিবিকে ডটনেটে যুক্ত করে ছাড়া হয় ভিজুয়াল বেসিক ডটনেট হিসেবে। মাইক্রোসফটের ডটনেট তৈরিতে ভিবির অনেক আইডিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। ডটনেট হলো মাইক্রোসফটের ফ্রেমওয়ার্ক, যাতে আছে ওয়েব ও ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন তৈরির নানারকম এপিআই। উইন্ডোজের অনেক অ্যাপ ভিবি ডটনেটে তৈরি হচ্ছে।

জাভা (Java)

জাভা অত্যন্ত শক্তিশালী, ডায়নামিক, হাই লেভেল, সম্পূর্ণ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড, ক্রসপ্লাটফর্ম ও জেনেরিক প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ। বহু ল্যাংগুয়েজ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে তৈরি করা হয়েছে জাভা। এটির সিনট্যাক্স মূলত সি++ এর আদলে তৈরি। জাভা খুবই পোর্টেবল, কাজেই এটা ক্রসপ্লাটফর্ম। শত শত ডিভাইস ও অ্যাপ্লিকেশনে জাভা ব্যবহার করা হয়েছে। টেক জায়ান্ট গুগলেও অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপে জাভা ব্যবহার করা হয়েছে।

Java একটি শক্তিশালী আধুনিক প্রোগ্রাম ভাষা। ১৯৯১ সালের শেষের দিকে জেমস গসলিং-এর নেতৃত্বে একদল বিশেষজ্ঞ কর্তৃক জাভা ভাষার উৎপত্তি। প্রথমে এর নাম ছিল 'ওক' (Oak)। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে এর নামকরণ করা হয় জাভা। জাভা প্রোজেক্টের প্রতিষ্ঠাতা James Gosling, Mike Sheridan আর Patrick Naughton একটি কফিশপে বসে জাভার আইডিয়া পান। সে থেকে জাভার আইকন হয়ে গেল কফির কাপ। জাভা অনেকটা সি++ এর মতো, তবে সি++ এর তুলনায় এ ভাষা সহজ, নিরাপদ এবং প্লাটফর্ম অনির্ভরশীল। ইন্টারনেটের জন্য ব্যবহারিক সফটওয়্যার উন্নয়নে এ ভাষার ব্যবহার অতুলনীয়। এজন্য জাভাকে সি++ এর ইন্টারনেট সংস্করণও বলা যায়। জাভা প্রোগ্রাম ভাষা নির্দিষ্ট কিছু হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ফলে এক কম্পিউটার কিংবা অপারেটিং সিস্টেমে লেখা জাভা

প্রোগ্রাম ভিন্ন কম্পিউটার কিংবা অপারেটিং সিস্টেমে ব্যবহার করা সম্ভব। বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্ক প্রোগ্রামিং-এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় জাভা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং আগামীতে এর পরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। জাভাস্ক্রিপ্ট ভিজুয়াল বেসিক স্ক্রিপ্টের ন্যায় ওয়েবপেজ উন্নয়নের সুবিধা প্রদান করে।

ওরাকল (ORACLE)

ডঃ ই. এফ. কড (Dr. E. F. Codd) এর সুদীর্ঘ গবেষণার ফল ওরাকল। সি এবং জাভা ল্যাংগুয়েজ এর সমন্বয়ে ওরাকল ডেভেলপ করা হয়েছে। ওরাকল কর্পোরেশন প্রথম কোম্পানি যারা বাণিজ্যিকভাবে একটি রিয়েল রিলেশনাল ডেটাবেজ প্রোগ্রাম বাজারে ছেড়েছে। ওরাকল সিস্টেম ডেটাবেজ কারনেলের সঙ্গে কানেক্ট করতে নন-প্রসিডিউরাল এসকিউএল বা স্ট্রাকচারড কুয়েরি ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করছে। ওরাকল বর্তমান বিশ্বে নেটওয়ার্ক বেসড ডেটাবেজ প্রোগ্রাম হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে ডেটাবেজ প্রোগ্রাম হিসেবে ওরাকল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ওরাকলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা অত্যন্ত মজবুত। তাছাড়া এর সিকিউরিটি সিস্টেম বা নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই শক্তিশালী। বর্তমানে ওরাকল ডেটাবেজ ডেভেলপারগণের নিকট একটি আদর্শ ডেটাবেজ প্রোগ্রাম হিসেবে বিবেচিত।

ওরাকল একটি রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Relational Database Management System) সংক্ষেপে RDBMS প্রোগ্রাম। বিশ্বে রিলেশনাল ডেটাবেজ এখন স্ট্যান্ডার্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। RDBMS ডেটাবেজ প্রোগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। ডঃ ই. এফ. কড তার সুদীর্ঘ গবেষণার ফলশ্রুতি হিসেবে RDBMS ১২টি রুল তৈরি করেছেন। এখন পর্যন্ত ওরাকল ডেটাবেজ প্রোগ্রামে RDBMS এর সর্বাধিক রুলস্ প্রয়োগ করা যায়। RDBMS-এর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে ডেটাবেজের সকল ডেটা একে অপরের সাথে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

এলগল (ALGOL)

এলগল অ্যালগরিদমিক ল্যাংগুয়েজ এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ১৯৫৮ সালে সব কম্পিউটারে ব্যবহারযোগ্য সর্বজনীন ভাষা উদ্ভাবনের চেষ্টার ফলে ইউরোপে এ ভাষার উদ্ভব হয়। এটি মূলত ফোরট্রান ল্যাংগুয়েজের বিভিন্ন সমস্যা উত্তরণের জন্য তৈরি হয়। ইউরোপিয়ান এবং আমেরিকান কম্পিউটার বিজ্ঞানীদের একটি কমিটি সমন্বিতভাবে এটি তৈরি করে। এতে তিনটি সুনির্দিষ্ট সিনট্যাক্স ছিল। যথা: রেফারেন্স সিনট্যাক্স, পাবলিকেশন্স সিনট্যাক্স এবং ইমপ্লিমেন্টেশন সিনট্যাক্স। প্রধানত বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত সমস্যা সমাধানের জন্য এটি আমেরিকা এবং ইউরোপের গবেষক কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করতো।

ফোরট্রান (FORTRAN)

ইংরেজি FORTRAN শব্দটির পূর্ণরূপ Formula Translation। গাণিতিক উপায়ে বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত সমস্যা সমাধানের জন্য এ ভাষা অত্যন্ত উপযোগী। ১৯৫৭ সালে আইবিএম কোম্পানি এ ভাষা চালু করে। বর্তমানে এ ভাষার প্রচলন কমে এসেছে। অনেক পুরনো হলেও ফোরট্রানের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়নি। সাধারণ ব্যবহারকারীর চেয়ে সুপার কম্পিউটার ও হাই পারফরমেন্স কম্পিউটিং-এ ফোরট্রান ব্যবহার করা হয়। কলেজ ইউনিভার্সিটির পুরনো শিক্ষকদের মুখেই ফোরট্রানের নাম শোনা যায়, কেননা এখন সি/সি++, জাভা, পাইথন ইত্যাদিতে প্রযুক্তি ভরপুর। ফোরট্রান কিন্তু হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজ, পুরনো বলেই অ্যাসেম্বলির মত লো লেভেল নয়। ১৯৫৩ সালে জন ডব্লিউ. বেকুস (John W. Backus) IBM 704 মেইনফ্রেম কম্পিউটারে ব্যবহার করার জন্য এ ভাষাটি তৈরি করেন।

পাইথন (Python)

পাইথন (Python) হচ্ছে প্রোগ্রামিং ভাষাসমূহের মধ্যে অন্যতম হাই লেভেল অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ভাষা। ডায়নামিক ওয়েব এ্যাপ্লিকেশনসহ অনেক কিছু বানানোতে এটি ব্যবহার করা হয়। ১৯৯১ সালে নেদারল্যান্ডের এক বিজ্ঞানী ভ্যান রোসাম (Van Rossum) এ ভাষাটি রচনা করেন। এ ভাষার নামকরণ করা হয়েছে ব্রিটিশ কমেডি শো "মন্টি পাইথন" এর নামে। পাইথনের কোর সিনট্যাক্স ও সেমান্টিক্স খুবই সংক্ষিপ্ত, তবে ভাষাটির স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি অনেক সমৃদ্ধ। পাইথন একটি বহু-প্যারাডাইম প্রোগ্রামিং ভাষা (ফাংশনভিত্তিক, বস্তু-সংশ্লিষ্ট ও নির্দেশমূলক) এবং এটি একটি পুরোপুরি চলমান প্রোগ্রামিং

ভাষা যাতে পার্ল, রুবি প্রভৃতি ভাষার মত স্বনিয়ন্ত্রিত মেমোরি ব্যবস্থাপনা রয়েছে। পাইথন ভাষার মুক্ত, কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন মডেল রয়েছে, যার দায়িত্বে আছে পাইথন সফটওয়্যার ফাউন্ডেশন নামের একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য ল্যাংগুয়েজের যতরকম ফিচার বা নতুন নতুন সাপোর্ট আসে, সবই পাইথনে খুব সহজে ব্যবহার করা যায়। বড় বড় গ্রাফিক্যাল প্রজেক্ট যেমন : মুভির থ্রিডি রেন্ডারিং, ওয়েব সার্ভিং কোন কিছুতেই পাইথন পিছিয়ে নেই। লিনাক্স বেজড অপারেটিং সিস্টেমে বহু প্রোগ্রাম লেখা হয় পাইথনে। ড্রপবক্স, বিটটরেন্ট, ব্লেন্ডার, গুইবার তৈরিতে কাজে লেগেছে পাইথন। সিভিলাইজেশন ফাইভ গেমটিতে পাইথনই ছিল মূল চালক। ইউটিউব, গুগল অ্যাপইঞ্জিন ইত্যাদি সাইটগুলো চলছে পাইথনের ওয়েবফ্রেমের শক্তিতে। তথ্য নিরাপত্তা শিল্পে পাইথনের বহুবিধ ব্যবহার লক্ষণীয়। সাধারণত দ্রুত সফটওয়্যার নির্মাণের জন্য পাইথন ব্যবহৃত হয়। যে সমস্ত বড় প্রতিষ্ঠান পাইথন ব্যবহার করে তাদের মধ্যে গুগল ও নাসা উল্লেখযোগ্য।

চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা (4th Generation Language–4GL) (১৯৭০)

কম্পিউটারে সহজে ব্যবহারের জন্য বিশেষ ভাষাকে চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা (4GL) বা অতি উচ্চতরের ভাষাও বলা হয়। রিপোর্ট ও পর্দায় ফলাফলের গঠন, ডেটা রেকর্ড, ইনপুট ডেটা প্রভৃতি নির্দিষ্টকরণে সরল কুয়েরি নির্দেশ ব্যবহারের ক্ষমতা চতুর্থ প্রজন্মের ভাষার বৈশিষ্ট্য। প্রধানত বাণিজ্যিক প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত এসব ভাষাকে অনেক সময় এপ্লিকেশন জেনারেটর (Application Generator) বলা হয়। এ ভাষায় ইংরেজি ভাষার মত নির্দেশ দিয়ে কম্পিউটার ব্যবহারকারী ডেটাবেজের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং ডেটা আদান-প্রদান করতে পারেন। চতুর্থ প্রজন্মের ভাষায় কথোপকথন রীতিতে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে কম্পিউটারের সাথে ব্যবহারকারীর যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকে। ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্টের সাথে সংশ্লিষ্ট কুয়েরি (Query) এবং রিপোর্ট জেনারেটর ও ডেটা সঞ্চালনের জন্য ব্যবহৃত ভাষাসমূহ চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন : Structured Query Language (SQL)

4GL এর বৈশিষ্ট্য :

১. এই ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম কোন পরিবর্তন ছাড়াই অন্য কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায়।
২. এটি অনেকটা ন্যাচারাল বা স্বাভাবিক ভাষার মত।
৩. ডেটা সংরক্ষণ, কুয়েরী, রিপোর্ট তৈরি ইত্যাদি কাজ খুব সহজেই করা যায়।
৪. এটি ইন্টারঅ্যাকটিভ মোডে কর্মক্ষম।
৫. প্রোগ্রামিং প্রসেসকে সহজ করে।
৬. উচ্চতর ভাষার তুলনায় 4GL খুবই সহজ বোধগম্য ও ব্যবহারযোগ্য।
৭. সফটওয়্যার ডেভলপ করতে সময়, অর্থ এবং শ্রম কম লাগে।
৮. 4GL এর সাহায্যে সহজেই অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা যায়।
৯. একটি কমান্ড লেখার সাথে সাথে কম্পাইল হয়ে যায়। পুরো প্রোগ্রাম একবারে কম্পাইল করতে হয় না।
১০. এ ল্যাংগুয়েজে করা প্রোগ্রাম রান করতে সময় বেশি লাগে।

চতুর্থ প্রজন্মের ভাষার অসুবিধা

১. অনেক বেশি মেমরির প্রয়োজন হয়।
২. প্রোগ্রামের আকার অধিকাংশ সময়ে বড় হয়।
৩. এটি হার্ডওয়্যারের ক্যাপাসিটির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।
৪. অনেক বেশি Disk space এর প্রয়োজন হয়।

পঞ্চম প্রজন্ম বা ফিফ্থ জেনরেশন ভাষা (Fifth Generation Programming language–5GL) (১৯৮০)

ফিফ্থ জেনরেশন প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ হলো এলগরিদম ব্যবহার না করে সহজভাবে সমস্যা সমাধান করার ল্যাংগুয়েজ। সব constraint-based এবং লজিক প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ এবং declarative ল্যাংগুয়েজ হলো ফিফ্থ জেনরেশন ল্যাংগুয়েজ। 5GL কে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে আগের প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের মতো জটিল কোড লিখতে পারে এমন প্রোগ্রামার ছাড়াই কম্পিউটার দিয়ে সমস্যা সমাধান করা যায়। যার ফলে প্রোগ্রামারদেরকে কিভাবে একটি রুটিন অথবা এলগরিদম প্রয়োগ করতে হবে তা চিন্তা না করে কি সমস্যা সমাধান করতে হবে, কি শর্ত পূরণ করতে তা নিয়ে ভাবলেই চলে। ফিফ্থ জেনরেশন ল্যাংগুয়েজ মূলত: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষণায় ব্যবহৃত হয়। Prolog, OPS5এবং Mercury হলো ফিফ্থ জেনরেশন ল্যাংগুয়েজের উদাহরণ।

৪. অনুবাদক প্রোগ্রাম (Programme Translator)

যে প্রোগ্রাম কম্পিউটারের উৎস প্রোগ্রাম (Source Programme) কে যন্ত্রভাষায় অনুবাদ করে বস্তু প্রোগ্রাম (Object Programme) এ পরিণত করে সে প্রোগ্রামকে অনুবাদক প্রোগ্রাম বলে। মূলত উচ্চস্তরের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে নিম্নস্তরের ভাষায় রূপান্তরের জন্য অনুবাদক প্রোগ্রাম ব্যবহৃত হয়। কম্পিউটার একমাত্র যন্ত্রভাষা বুঝতে পারে বলে অন্য ভাষায় লেখা উৎস প্রোগ্রামকে যন্ত্রভাষায় অনুবাদ না করলে তা কার্যকর করতে পারে না।

তিন ধরনের অনুবাদক প্রোগ্রাম রয়েছে। যথা–

১. কম্পাইলার (Compiler)
২. ইন্টারপ্রিটার (Interpreter)
৩. অ্যাসেম্বলার (Assembler)

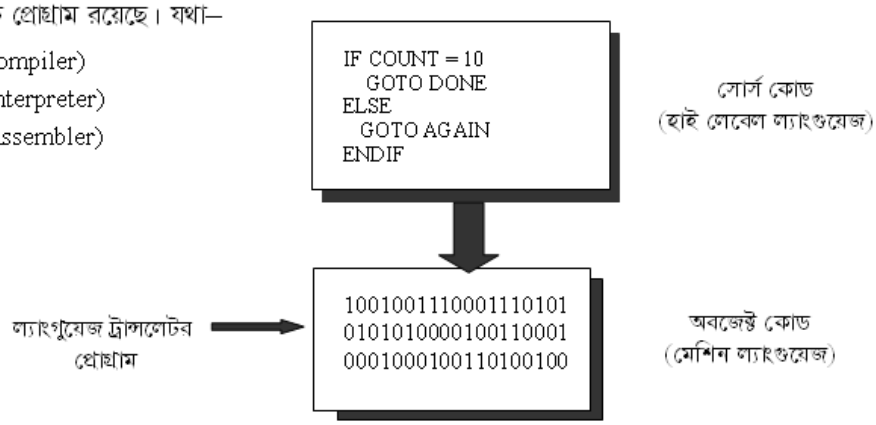

কম্পাইলার (Compiler)

কম্পাইলারের কাজ হলো উচ্চস্তরের ভাষার উৎস প্রোগ্রামকে বস্তু প্রোগ্রামে অনুবাদ করা। কম্পাইলার সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটিকে একসাথে পড়ে এবং একসাথে অনুবাদ করে। কম্পাইলার সহায়ক মেমোরিতে (Auxilliary Memory) থাকে। প্রয়োজনে র‍্যামে এনে কাজ করে। কম্পাইলার মেমোরির বেশি জায়গা দখল করে। ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ভাষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কম্পাইলার থাকে। কোন একটি কম্পাইলার একটিমাত্র উচ্চস্তরের ভাষাকে যন্ত্রভাষায় পরিণত করতে পারে। এটি প্রোগ্রামে কোন ভুল থাকলে তা জানিয়ে দেয়।

কম্পাইলারের প্রধান কাজ বা সুবিধা (Function/Advantages of Compiler)

১. উৎস প্রোগ্রামকে বস্তু প্রোগ্রামে অনুবাদ করা।
২. প্রোগ্রামকে লিঙ্ক (Link) করা।
৩. প্রোগ্রামে কোন ভুল থাকলে তা জানানো।
৪. প্রধান মেমোরিতে প্রয়োজনীয় মেমোরির ব্যবস্থা (Allocation) করা।
৫. প্রয়োজনে বস্তু বা উৎস প্রোগ্রামকে ছাপিয়ে বের করা।
৬. প্রোগ্রামিং এর উপর নির্ভরশীলতাকে মেশিনের উপর কমিয়ে দেয়।

কম্পাইলারের অসুবিধা (Disdvantages of Compiler)

১. ধাপে ধাপে ভুল সনাক্ত ও সংশোধন করা যায় না।
২. সনাক্ত না করার কারণে ভুল সংশোধন করা যায় না।
৩. ডিবাগিং ও টেস্টিং-এর কাজ ধীরগতির।
৪. বেশি মেমোরি দরকার।

ইন্টারপ্রিটার (Interpreter)

ইন্টারপ্রিটার উচ্চস্তরের ভাষায় করা প্রোগ্রামকে এক লাইন এক লাইন করে মেশিন ভাষায় অনুবাদ করে তা কার্যে পরিণত করে ইন্টারপ্রিটার সেখানে একটি নির্দেশ যন্ত্রভাষায় অনুবাদ করে তা কার্যে পরিণত করে এবং পরবর্তী নির্দেশ কার্যকর করে।

ইন্টারপ্রিটারের সুবিধা (Advantages of Interpreter)

১. ইন্টারপ্রিটার অধিক ব্যবহার বান্ধব (User friendly)।
২. প্রোগ্রামের ভুল সংশোধন করা বা প্রোগ্রাম পরিবর্তন করা সহজ হয়।
৩. ইন্টারপ্রিটার আকারে ছোট বলে মেমোরি কম খরচ হয়।
৪. অনূদিত অবজেক্ট প্রোগ্রামকে মেমোরিতে সংরক্ষণ করে রাখতে হয় না।
৫. ছোট কম্পিউটারে সাধারণত ইন্টারপ্রিটার ব্যবহৃত হয়।

ইন্টারপ্রিটারের অসুবিধা (Disadvantages of Interpreter)

১. প্রোগ্রাম কার্যকরী করতে কম্পাইলারের তুলনায় ৫ থেকে ২৫ গুণ বেশি সময় লাগে।
২. ইন্টারপ্রিটার ব্যবহারে যতবার প্রোগ্রাম কার্যকরী করতে হয় ততবারই প্রোগ্রামের নির্দেশগুলো একটির পর একটি অনুবাদ করতে হয়।

কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রিটারের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Compiler and Interpreter)

কম্পাইলার	ইন্টারপ্রেটার
১. সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটিকে একসাথে অনুবাদ করে।	১. এক লাইন করে পড়ে এবং অনুবাদ করে।
২. সবগুলো ভুল একসাথে প্রদর্শন করে।	২. এক লাইন করে ভুল প্রদর্শন করে অনুবাদ বন্ধ করে দেয়।
৩. ডিবাগিং ও টেস্টিং এর ক্ষেত্রে ধীর গতিসম্পন্ন।	৩. ডিবাগিং ও টেস্টিং এর ক্ষেত্রে দ্রুত গতিসম্পন্ন।
৪. প্রোগ্রাম নির্বাহে কম সময় লাগে।	৪. প্রোগ্রাম নির্বাহে বেশি সময় লাগে।
৫. অনুবাদকৃত প্রোগ্রামটি পূর্ণাঙ্গ মেশিন প্রোগ্রামে রূপান্তরিত করে।	৫. অনুবাদকৃত প্রোগ্রামটি পূর্ণাঙ্গ মেশিন প্রোগ্রামে রূপান্তরিত হয় না।
৬. একবার কম্পাইল অর্থাৎ রূপান্তর করার পর পুনরায় কম্পাইল করার প্রয়োজন হয় না।	৬. প্রতিবার কাজের পূর্বে পুনঃরূপান্তরের প্রয়োজন হয় না।
৭. প্রধান মেমোরিতে জায়গা বেশি লাগে।	৭. প্রধান মেমোরিতে জায়গা কম লাগে।
৮. কাজের প্রক্রিয়া জটিল।	৮. কাজের প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত সহজ।

অ্যাসেম্বলার (Assembler)

অ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে মেশিন ভাষায় অনুবাদ করার জন্য অ্যাসেম্বলার ব্যবহার করা হয়। এর প্রধান কাজ হলো–

১. নেমোনিক কোডকে যন্ত্রভাষায় অনুবাদ করা।
২. সাংকেতিক ঠিকানাকে যন্ত্রভাষায় লেখা ঠিকানায় পরিণত করা।
৩. প্রত্যেক নির্দেশ ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করা, ঠিক না থাকলে তা জানানো।
৪. সব নির্দেশ ও তথ্য মুখ্য স্মৃতিতে রাখা।
৫. সব ভুল সংশোধনের পর প্রথম নির্দেশ থেকে কাজ শুরু করতে কন্ট্রোলকে নির্দেশ দেয়।
৬. সাংকেতিক ভাষায় প্রত্যেক নির্দেশকে যন্ত্রভাষায় একটি নির্দেশে পরিণত করে।

৫. প্রোগ্রামের সংগঠন (Program Organization)

প্রোগ্রামের সংগঠন বলতে প্রোগ্রামের গঠনরীতিকে বুঝায়। প্রত্যেক প্রোগ্রামেরই প্রধানত তিনটি অংশ থাকে। যথা- ইনপুট, প্রসেস এবং আউটপুট। এ অংশগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রোগ্রাম গঠিত হয়। ইনপুট বলতে ফলাফল লাভের উদ্দেশ্যে যে সকল তথ্য, উপাত্ত এবং নির্দেশ কম্পিউটারে দেয়া হয় সেগুলোকে বোঝায়। প্রসেস হলো প্রোগ্রামে দেয়া নির্দেশ অনুসারে প্রদেয় তথ্যকে প্রক্রিয়াকরণ করা। আউটপুট বলতে প্রক্রিয়াকরণের ফলে প্রাপ্ত ফলাফলকে বুঝায়। প্রোগ্রামের গঠনকে নিম্নরূপে ছক আকারে উপস্থাপন করা যায় :

- ইনপুট
- প্রক্রিয়াকরণ ও
- আউটপুট।

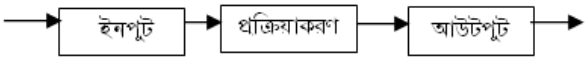

প্রদত্ত ছক অনুযায়ী দু'টি সংখ্যার গুণফল বের করার জন্য :

ইনপুট : সংখ্যা দু'টি প্রদান করতে হবে।

প্রক্রিয়াকরণ : সংখ্যা দু'টি গুণ করতে হবে।

ফল : গুণফল Total = 210 প্রদর্শিত হবে।

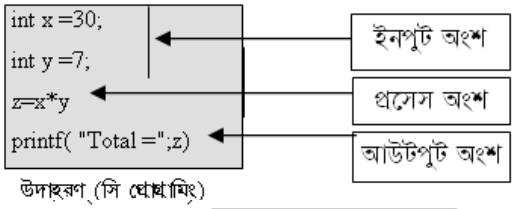

উদাহরণ (সি প্রোগ্রামিং)

৬. প্রোগ্রাম উন্নয়নের ধাপসমূহ

কোন সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে প্রোগ্রাম লেখা হয়। এ কারণে প্রোগ্রাম রচনার ক্ষেত্রে পরিকল্পিত এবং সুশৃঙ্খলভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হয়। প্রোগ্রাম উন্নয়নের সাধারণ ধাপগুলো হলো :

- সমস্যা নির্দিষ্টকরণ
- সমস্যা বিশ্লেষণ
- প্রোগ্রাম ডিজাইন
- প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট বা কোডিং
- প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন
- প্রোগ্রাম ডকুমেন্টেশন
- প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ।

প্রোগ্রাম উন্নয়নের ধাপগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

কম্পিউটারে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পিউটার পদ্ধতির উপযোগী করে প্রোগ্রাম রচনা করতে হয়। প্রোগ্রাম হলো সাজানো নির্দেশের একটি তালিকা। তাই প্রোগ্রাম রচনার সময় পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হতে হয়। এজন্য নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হয়।

ক. **সমস্যা নির্দিষ্টকরণ :** প্রোগ্রামটি কী সমস্যা সমাধানের জন্য রচনা করা হবে সে সমস্যাটির একটি পরিষ্কার বর্ণনা তৈরি করা হয়। এজন্য সব রকম তথ্যানুসন্ধান করতে হয়।

খ. **সমস্যা বিশ্লেষণ :** সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পিউটার প্রয়োজন কিনা তা নির্ণয়, সমস্যার কাঠামোগত বর্ণনা প্রস্তুত এবং সম্ভব হলে সমস্যার গাণিতিক মডেল প্রস্তুত করতে হয়।

গ. **প্রোগ্রাম ডিজাইন :** সমস্যার মডেল অথবা গঠনগত বর্ণনা হতে সুবিধাজনক অ্যালগরিদম বা সিদ্ধান্তক্রম নির্ধারণ এবং ফ্লোচার্ট বা প্রবাহচিত্রের সহায়তায় প্রোগ্রামের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়।

ঘ. **প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট বা কোডিং :** কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় প্রোগ্রাম রচনাকে কোডিং বলা হয়। ফ্লোচার্ট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় বিবেচনা করে কম্পিউটারের ভাষায় নির্দেশসমূহ সাজিয়ে প্রোগ্রাম রচনা করতে হয়।

ঙ. **প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন :** প্রোগ্রাম রচনার পর প্রথমে প্রোগ্রামের প্রতিটি অংশ এবং পরে সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম পরীক্ষা করে দেখতে হয়। এ সময় প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে প্রোগ্রামকে প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপযুক্ত করে সম্পূর্ণভাবে তৈরি করে নেয়া হয়।

চ. **প্রোগ্রাম ডকুমেন্টেশন :** ভুল সংশোধনের পর প্রোগ্রাম সঠিকভাবে কাজ করলে তাকে Run Program বলা হয় এবং এ প্রোগ্রামকে ভবিষ্যতে রক্ষণের জন্য লিপিবদ্ধ করতে হয়। এ লিপিবদ্ধকরণকে প্রোগ্রাম লেখ্য বা ডকুমেন্টেশন বলা হয়।

ছ. **প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ :** বিভিন্ন প্রয়োজনে ও প্রোগ্রামের উন্নতিকল্পে প্রোগ্রামের আধুনিকীকরণ, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, প্রোগ্রামের ভুল সংশোধন ইত্যাদি প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ কাজের অন্তর্ভুক্ত।

৬.১ অ্যালগরিদম (Algorithm)

An algorithm is a step by step procedure for solving a problem. সমস্যা সমাধানের যুক্তিসম্মত ও পর্যায়ক্রমিক ধারা বর্ণনাকে অ্যালগরিদম বলা হয়। সহজ ও যথার্থ উপায় নির্ধারণের জন্য অ্যালগরিদম অপরিহার্য। সমস্যাকে পর্যায়ক্রমিক ছোট ছোট ভাগ করে তা সমাধানের উদ্দেশ্যে একজন প্রোগ্রামার অ্যালগরিদম রচনায় প্রয়াসী হয়ে থাকেন। অ্যালগরিদম রচনার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত ও নিয়ম মানতে হয়। প্রথমে প্রোগ্রামের বিষয় নির্ধারণ করতে হয়। বিষয়টির একটি শিরোনাম দিতে হয়। তারপর বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তগুলোকে ধারাবাহিকভাবে সাজাতে হয়। প্রোগ্রাম রচনায় অ্যালগরিদম দিয়ে প্রোগ্রাম নির্বাহের ধাপগুলো সরল তৈরি করতে হবে যেন প্রোগ্রাম নির্বাহের ধাপগুলো সরল এবং স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। অ্যালগরিদম হলো ফ্লোচার্ট থেকে লিখিত রূপ।

অ্যালগরিদমের নিয়ম ও বৈশিষ্ট্য /শর্ত (Rules and Characteristics of Algorithm)

১. অ্যালগরিদম সহজবোধ্য হতে হবে।
২. প্রত্যেকটি ধাপ স্পষ্ট হতে হবে ।
৩. ধাপে ধাপে সমস্যার সমাধান করতে হবে।
৪. প্রয়োগ উপযোগী হতে হবে।

অ্যালগরিদম লিখনের সুবিধা (Advantage of Algorithm Writing)

সহজ ও পরিচ্ছন্ন প্রোগ্রাম রচনায় অ্যালগরিদম লিখন বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে। প্রোগ্রাম রচনায় অ্যালগরিদম লিখনের সুবিধা হলো :

- সহজে প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য বুঝতে সহায়তা করে।
- প্রোগ্রামের ভুল নির্ণয়ে সহায়তা করে।
- প্রোগ্রাম পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে সহায়তা করে।
- সহজে ও সংক্ষেপে জটিল প্রোগ্রাম লিখতে সহায়তা করে ইত্যাদি।

অ্যালগরিদম লিখনের অসুবিধা (Disadvantage of Algorithm Writing)

- প্রোগ্রাম বুঝতে বেশি সময় লাগে।
- অ্যালগরিদমের সাহায্যে প্রোগ্রাম প্রবাহের দিক হঠাৎ করে বুঝা যায় না।

উদাহরণ—১ : একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের অ্যালগরিদম

ধাপ-১ : শুরু।
ধাপ-২ : ত্রিভুজের ভূমি ও উচ্চতা গ্রহণ করা।
ধাপ-৩ : ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = ১/২ × ভূমি × উচ্চতা সূত্র ব্যবহার করে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা।
ধাপ-৪ : ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল প্রদর্শন করা।
ধাপ-৫ : শেষ।

উদাহরণ—২ : ১০০ পর্যন্ত পূর্ণ ও জোড় সংখ্যাগুলোর যোগফল ও গড় নির্ণয়ের অ্যালগারিদম

ধাপ-১ : শুরু।
ধাপ-২ : যোগফল, গড়ের প্রারম্ভিক মান ০ (শূন্য) এবং কাউন্টার ভেরিয়েবলের প্রারম্ভিক মান ২ হিসেবে গ্রহণ কর।
ধাপ-৩ : পূর্বের যোগফলের সাথে কাউন্টার ভেরিয়েবল যোগ কর।
ধাপ-৪ : কাউন্টার ভেরিয়েবলের মান ২ বৃদ্ধি কর।
ধাপ-৫ : কাউন্টারের মান ১০০ না হওয়া পর্যন্ত উপরিউক্ত ৩ ও ৪ নং প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখ।
ধাপ-৬ : যোগফলকে ৫০ দ্বারা ভাগ করে গড়ফল নির্ণয়।
ধাপ-৭ : যোগফল ও গড়ফল প্রদর্শন।
ধাপ-৮ : শেষ।

একক কাজ : অ্যালগরিদম করে প্রোগ্রাম তৈরির সুবিধা লেখ।

৬.২ ফ্লোচার্ট (Flowchart)

যে চিত্রের মাধ্যমে কোন সিস্টেম বা প্রোগ্রাম কীভাবে কাজ করবে তার গতিধারা নির্ধারণ করা হয় তাকে প্রবাহচিত্র বা ফ্লোচার্ট বলা হয়। ফ্লোচার্টের সাহায্যে প্রোগ্রাম বুঝতে কম সময় লাগে এবং প্রোগ্রাম প্রবাহের দিক সহজেই বুঝা যায়। অ্যালগরিদমের চিত্ররূপ হলো ফ্লোচার্ট। সমস্যা বিশ্লেষণের পর তা সহজে বোঝানোর জন্য ফ্লোচার্ট কার্যকরী। ফ্লোচার্টে কতগুলো জ্যামিতিক ছবি ও চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। ফ্লোচার্টকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা ঃ

১. সিস্টেম ফ্লোচার্ট (System Flowchart) এবং
২. প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট (Program Flowchart)

সিস্টেম ফ্লোচার্ট (System Flowchart)

অনেকগুলো কাজ বা প্রক্রিয়ার সমন্বয় হচ্ছে সিস্টেম। সিস্টেমের ডেটার প্রবাহ বা প্রক্রিয়াকরণ এর প্রবাহ প্রদর্শনকারী চার্টই সিস্টেম ফ্লোচার্ট। একটি সংস্থার সমস্ত কাজের ধারাবাহিকতা সিস্টেম ফ্লোচার্টের মাধ্যমে দেখানো সহজ হয়।

সিস্টেম ফ্লোচার্টে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের প্রতীক (Some Symbols for System Flowchart)

সিস্টেম ফ্লোচার্টে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের প্রতীক বা সিম্বলসমূহ হলো :

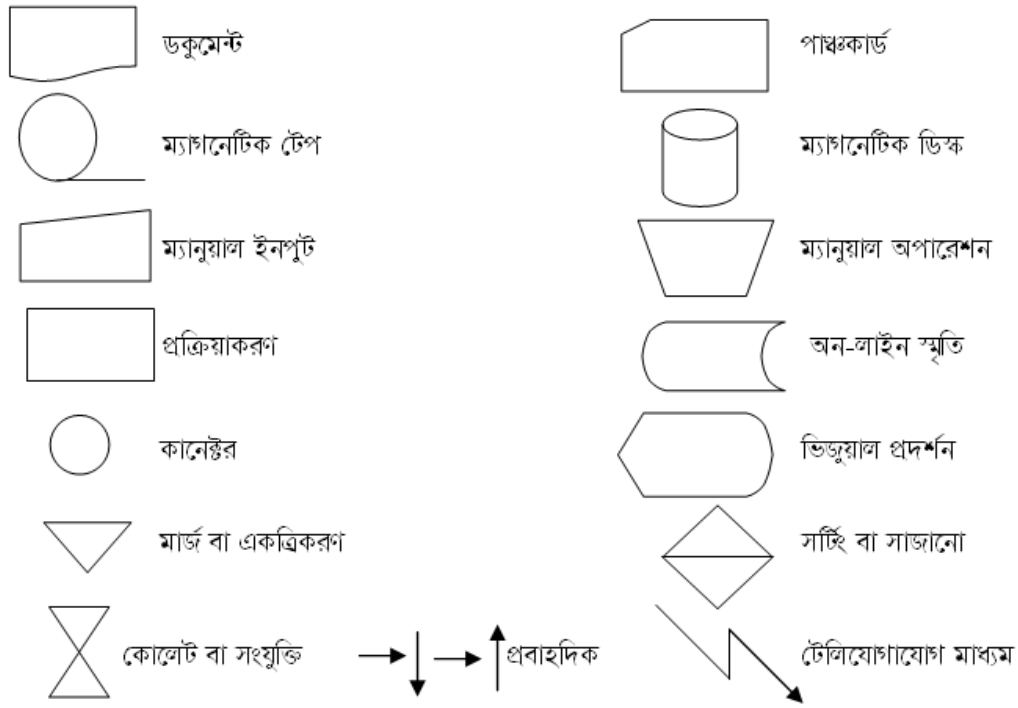

অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্টের মধ্যে পার্থক্য (Difference Between Algorithm and Flowchart)

অ্যালগরিদম	ফ্লোচার্ট
১. সমস্যা সমাধানের ধাপসমূহের লিখিত উপায়কে অ্যালগরিদম বলে।	১. চিত্র বা সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের ধাপসমূহকে ফ্লোচার্ট বলে।
২. অ্যালগরিদম হাই লেভেল ভাষায় অনুবাদ করে তবেই ইনপুট দিতে হয়।	২. কতগুলো জ্যামিতিক বা সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে প্রোগ্রামের পরিকল্পনা করতে হয়।
৩. অ্যালগরিদম বর্ণনানির্ভর।	৩. ফ্লোচার্ট চিত্রনির্ভর।
৪. অ্যালগরিদম রচনার পূর্বে সুডোকোড বা ছদ্ম প্রোগ্রাম তৈরির প্রয়োজন হতে পারে।	৪. ফ্লোচার্ট রচনার জন্য সুডোকোডের প্রয়োজন নেই।
৫. প্রোগ্রাম বুঝতে সময় বেশি লাগে।	৫. প্রোগ্রাম বুঝতে সময় কম লাগে।
৬. প্রোগ্রাম প্রবাহের দিক অনুধাবন করা যায় না।	৬. প্রোগ্রাম প্রবাহের দিক অনুধাবন করা যায়।
৭. প্রোগ্রাম লিখতে নির্দিষ্ট কোন নিয়ম না মানলেও চলে।	৭. প্রোগ্রাম লিখতে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে।
৮. প্রোগ্রামের ভুলত্রুটি খুঁজে বের করা ও সংশোধন করা কঠিন।	৮. প্রোগ্রামের ভুলত্রুটি খুঁজে বের করা ও সংশোধন করা সহজ।

একটি সিস্টেম ফ্লোচার্টের উদাহরণ (Example of a System Flowchart)

একটি কারখানার সাপ্তাহিক বেতন হিসাবের জন্য একটি সিস্টেম ফ্লোচার্ট নিচে দেখানো হয়েছে।

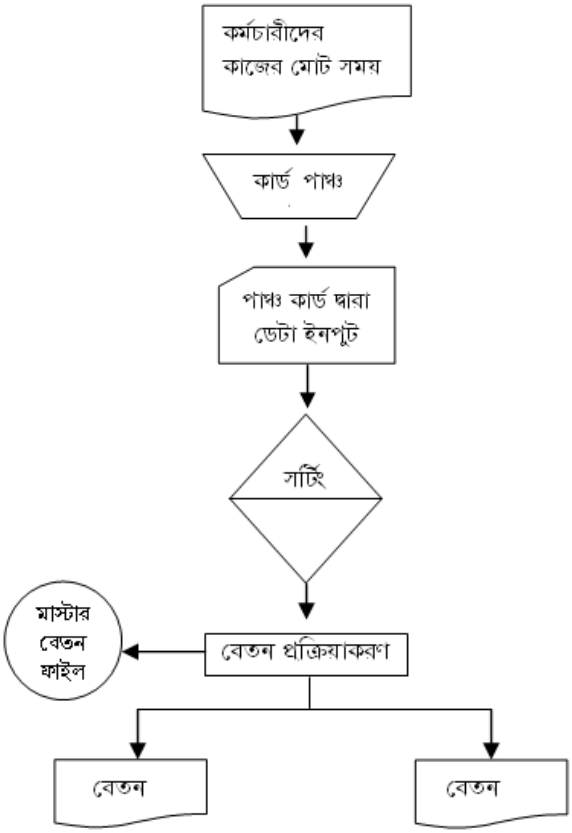

প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট (Program Flowchart)

প্রোগ্রাম লেখার পূর্বে প্রোগ্রামের কাজের ধাপগুলো চিত্রের সাহায্যে লেখাই প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট। সিস্টেম ফ্লোচার্ট প্রোগ্রামের কাজের বিশদ বিবরণের চিত্র থাকে না। কিন্তু প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টে এর বিশদ বিবরণ থাকে। প্রোগ্রামার সহজেই প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টের সহায়তায় প্রোগ্রাম লিখতে পারেন।

প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের প্রতীক (Some Symbols for Program Flowchart)

প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের প্রতীক বা সিম্বলসমূহ হলো :

ক. **টার্মিনাল প্রতীক (Terminal Symbol) :** এটি একটি ডিম্বক (Oval) আকৃতিক প্রতীক। এটি প্রোগ্রামের আরম্ভ এবং শেষ নির্দেশ করে থাকে। একটি প্রোগ্রামে একাধিকবার টার্মিনাল প্রতীক ব্যবহৃত হতে পারে।

খ. **গ্রহণ/নির্গমন প্রতীক (Input/Output Symbol) :** সামান্তরিক আকৃতির প্রতীককে গ্রহণ/নির্গমন প্রতীক বলে। এর সাহায্যে প্রক্রিয়াকরণের জন্য ইনপুট চাওয়া হয় এবং প্রক্রিয়াকরণের শেষে ফলাফল আউটপুট প্রদর্শন করানো হয়।

গ. **প্রক্রিয়াকরণ প্রতীক (Process Symbol) :** আয়তাকার আকৃতির প্রতীকই প্রক্রিয়াকরণ প্রতীক। প্রক্রিয়াকরণের কাজ (Activities) কী রকম হবে তা নির্দেশের জন্য এই প্রতীক ব্যবহৃত হয়।

ঘ. **সিদ্ধান্ত প্রতীক (Decision Symbol) :** হীরক (Diamond) আকৃতির প্রতীককে সিদ্ধান্ত প্রতীক বলা হয়। এটি সর্বদা একটি প্রশ্ন করে থাকে, যার দু'টি সম্ভাব্য উত্তর (হ্যাঁ বা না) থাকে। উত্তরের উপরে নির্ভর করে ফ্লোচার্টকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়।

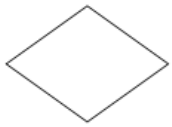

ঙ. **প্রবাহদিক প্রতীক (Flowline Symbol) :** তীর চিহ্ন বিশিষ্ট সরলরেখা প্রবাহদিক প্রতীক হিসেবে পরিচিত। তীর চিহ্নটি প্রোগ্রামের ব্যবহার পথকে নির্দেশ করে। একটি অপারেশন চালিয়ে যাবার পর পরবর্তীতে কোথায় যেতে হবে তা নির্দেশ করে।

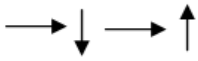

চ. **সংযোগ প্রতীক (Connector Symbol) :** তীর চিহ্ন ও একটি বৃত্ত বিশিষ্ট সরলরেখা সংযোগ প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যখন একটি বড় ফ্লোচার্ট এক পৃষ্ঠায় ধরে না তখন সংযোগ প্রতীক ব্যবহার করে বাকী অংশ অপর পৃষ্ঠায় আঁকা হয়।

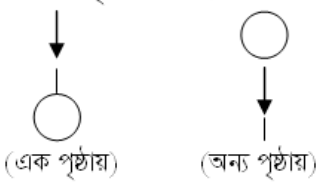

ছ. **লুপ বা চক্র প্রতীক (Loop Symbol) :** ষড়ভুজ আকৃতির একটি প্রতীক লুপ প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কোন চক্র বা লুপের কাজ দেখানোর জন্য লুপ প্রতীক ব্যবহার করা হয়।

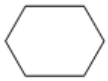

জ. **সাবরুটিন প্রতীক (Subroutine Symbol) :** মূল প্রোগ্রামের কোন অংশ বা সাবরুটিনকে এ প্রতীকের সাহায্যে চিত্রিত করা যায়। একটি প্রোগ্রামে একাধিক সাবরুটিন থাকতে পারে।

ঝ. **বর্ণনা প্রতীক (Description Symbol) :** ফ্লোচার্টের কোন অংশ বর্ণনার জন্য অংশটির পার্শ্বে এ প্রতীক ব্যবহার করা হয়। এটি টীকা প্রতীক নামেও পরিচিত।

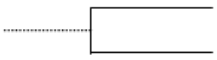

ফ্লোচার্ট তৈরির নিয়মাবলি (Rules for drawing Flowchart)

ফ্লোচার্ট অঙ্কনের জন্য নির্দিষ্ট কতগুলো নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। যেমন :

- নির্দিষ্ট প্রতীক ব্যবহার করতে হয়।
- ফ্লোচার্টের প্রবাহ নির্দেশ করার জন্য তীর চিহ্ন দিতে হয়।
- অতিরিক্ত সংযোগ রেখা ও প্রতীকের ব্যবহার পরিহার করতে হয়।
- প্রতীকের ভেতরের লেখা সংক্ষিপ্ত ও সহজ হতে হয়।
- ফ্লোচার্টে নির্দিষ্ট কোন প্রোগ্রাম ভাষা ব্যবহার করা উচিত নয়।
- প্রয়োজনে বিস্তারিত বর্ণনার জন্য আলাদা ফ্লোচার্ট ব্যবহার করা উচিত।

ফ্লোচার্টের সুবিধা (Advantages of Flowchart)

- সহজে প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য বুঝা যায়।
- প্রোগ্রামের ভুল নির্ণয়ে সহায়তা করে।
- প্রোগ্রাম পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে সহায়তা করে।
- সহজে ও সংক্ষেপে জটিল প্রোগ্রাম লিখতে সহায়তা করে।
- প্রোগ্রাম প্রক্রিয়াকরণের দিক বুঝতে সাহায্য করে।

একটি ফ্লোচার্টের উদাহরণ (Example of a Flowchart)

ধরা যাক, ইলেকট্রিক হিটার জ্বালিয়ে চা তৈরির ফ্লোচার্ট তৈরি করতে হবে। এ ফ্লোচার্ট তৈরির জন্য সমস্যার বিবরণ ও অ্যালগরিদম নিম্নরূপ হতে পারে।

সমস্যার বিবরণ : হিটার, কেটলি, চিনি, চা, দুধ, পানি, চামচ, কাপ, ছাঁকনি দেয়া আছে। হিটার জ্বালিয়ে চা তৈরি করতে হবে।

অ্যালগরিদম : কেটলিতে পরিমাণ মত পানি নিয়ে হিটারে বসাতে হবে। এবার হিটারের সুইচ অন করতে হবে। পানি গরম হলে সঠিক মাত্রায় চিনি, চা ও দুধ মিশিয়ে ছাকনি দিয়ে চা ছেকে কাপে নিলে চা তৈরির কাজ শেষ হবে।

ফ্লোচার্ট : উপরের অ্যালগরিদমটির ফ্লোচার্ট পাশের চিত্রে দেখানো হয়েছে।

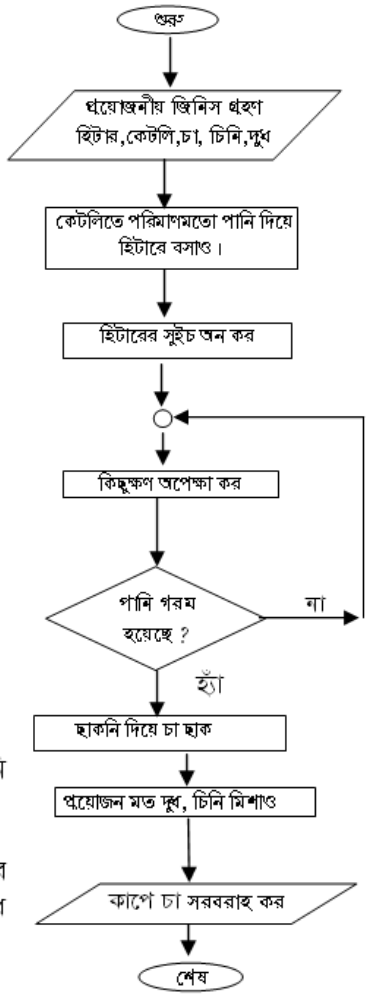

চিত্র ঃ চা তৈরির ফ্লোচার্ট

উদাহরণ–১ : ৫টি সংখ্যা যোগ করার অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট।

অ্যালগরিদম :

ধাপ-১ : শুরু।
ধাপ-২ : সংখ্যা ৫টি পড়ি।
ধাপ-৩ : ৫টি সংখ্যা যোগ করি।
ধাপ-৪ : যোগফল ছাপি।
ধাপ-৫ : শেষ।

ফ্লোচার্ট :

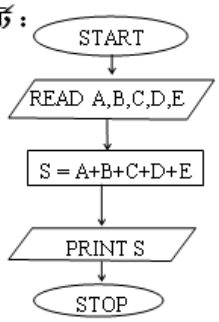

বি.দ্র. : প্রোগ্রামিং অংশে অ্যালগরিদম এর আরো অনেক উদাহরণ দেয়া হয়েছে।

একক কাজ : ফ্লোচার্ট তৈরি করে প্রোগ্রাম তৈরির সুবিধা লিখ।

সুডোকোড (Pseudo code)

সুডো (Pseudo) গ্রিক শব্দ। সুডো শব্দের অর্থ হচ্ছে ছদ্ম বা কৃত্রিম। প্রোগ্রামাররা অনেক সময় প্রোগ্রামের জন্য যে কোড লেখা হবে তার একটি খসড়া টেক্সট ভার্সন তৈরি করেন, এটি দেখতে অনেকটা প্রোগ্রামিং কোডের মতে হলেও আসল নয়। প্রোগ্রামের ধরন ও কার্যাবলি তুলে ধরার জন্য কিছুসংখ্যক নির্দেশ বা স্টেটমেন্টের সমাহারকেই সুডোকোড বলা হয়। সুডোকোড থেকে প্রথমে অ্যালগরিদম ও পরে প্রোগ্রাম রচনা করা সহজ হয়।

উদাহরণ : তিনটি সংখ্যার যোগফল এবং গড় নির্ণয় করার জন্য একটি সুডোকোড।
প্রথমে সংখ্যা তিনটি কম্পিউটারে ইনপুট করতে হবে। তারপর সংখ্যা তিনটি যোগ করে যোগফল এবং যোগফলকে ৩ দ্বারা ভাগ করে গড় বের করা হয়।

সুডোকোড :

```
INPUT NUMBER1
INPUT NUMBER2
INPUT NUMBER3
TOTAL=NUMBER1+NUMBER2+NUMBER3
AVERAGE=TOTAL/3
PRINT AVERAGE
STOP
```

৭. প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল (Program Design Model)

প্রোগ্রাম ডিজাইন বলতে প্রোগ্রামের গঠনরীতিকে বুঝায়। সহজ ও সুন্দর প্রোগ্রাম রচনার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ডিজাইন বা মডেল ব্যবহৃত হয়। আধুনিক প্রোগ্রামিং মডেল হলো–

- স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং (Structured Programming)
- অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং (Object Oriented Programming)
- ভিজুয়াল প্রোগ্রামিং (Visual Programming)
- ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামিং (Event Driven Programming) ইত্যাদি।

স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং (Structured Programming)

স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং হলো প্রসিডিউরাল প্রোগ্রামিং এবং টপ-ডাউন ডিজাইন মডেল, যাতে প্রোগ্রামকে কতগুলো সাবসেকশনে বিভক্ত করতে হয়। এতে প্রোগ্রামের স্টেটমেন্টগুলো ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে লেখা হয়। স্টেটমেন্টের সংখ্যা এক এক শ্রেণির জন্য একেক রকম হতে পারে এবং প্রত্যেকটি শ্রেণি ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে থাকে। এ মডেলে বড় সমস্যাকে ছোট ছোট ভাগ করে তা সমাধান করা হয়।

স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং এর বৈশিষ্ট্য :

১. সহজে অনুধাবনযোগ্য
২. সহজে রচনা করা যায়।
৩. ডিবাগিং করা সহজ।
৪. মডিউল বহু ব্যবহারযোগ্য।
৫. রক্ষণাবেক্ষণ সহজ।

প্রোগ্রামের কাজ/গঠন : স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং সংগঠনের একটি মূল অংশ (Main Module) থাকে যা বিভিন্ন মডিউলকে কল করে। এক মডিউল আবার অন্য মডিউলকে কল করতে পারে। কোন মডিউল ব্যবহার না করলে নিজের নির্দেশসমূহ রান করে আবার মূল প্রোগ্রামে আসে। **উদাহরণ :** বেসিক, ফোরট্রান, কোবল, প্যাস্কেল, সি ইত্যাদি।

স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিংয়ে তিন ধরনের কন্ট্রোল স্ট্রাকচার ব্যবহৃত হয়। যথা–

১. **পর্যায়ক্রমিক গঠন (Sequential Structure)** : এই কাঠামোতে প্রোগ্রামের একটির পর একটি নির্দেশ ধারাবাহিকভাবে নির্বাহ হয়।
২. **চক্র বা লুপ গঠন (Loop Structure) :** এক বা একাধিক নির্দেশকে শর্তহীনভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যকবার বা শর্তের অধীন অনির্দিষ্ট সংখ্যক বার নির্বাহ করা যায়।
৩. **সিদ্ধান্তমূলক গঠন (Decisional Structure) :** সিদ্ধান্তমূলক কাজের ক্ষেত্রে এই কাঠামো ব্যবহার করা হয়।

অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং (Object Oriented Programming–OOP)

প্রোগ্রামের কোন সেগমেন্টকে একই প্রোগ্রামের অন্য জায়গায় অথবা অন্য প্রোগ্রামে ব্যবহার করার মাধ্যমে সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করার জন্য গড়ে উঠেছে অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং (Object Oriented Programming-OOP)

সাধারণভাবে প্রোগ্রামিং কোড বা ইন্সট্রাকশন এবং ডেটার সমন্বিত উপস্থাপনাই হচ্ছে অবজেক্ট। অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং-এ প্রত্যেকটি অবজেক্টের এট্রিবিউট এবং ফাংশন রয়েছে। একটি অবজেক্ট সম্পূর্ণ একটি ইউনিট হতে পারে অথবা অন্যান্য অবজেক্টের একটি উপাদান (কম্পোনেন্ট) হতে পারে। একটি অবজেক্টের মধ্যে অন্যান্য আরো অবজেক্ট থাকতে পারে। অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম মানেই হচ্ছে কতকগুলো অবজেক্টের সমষ্টি, যাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন এট্রিবিউট এবং বিহেভিয়ার আছে। OOP-এর প্রধান তিনটি ধারণা (কনসেপ্ট)/ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা :

১. **পলিমরফিজম (Polymorphism) :** অর্থ বহুরূপ। এ বৈশিষ্ট্যের জন্য কোন কোড মডিউলের নাম এক হলেও একাধিক রূপ থাকতে পারে। কখন কোন রূপ ব্যবহৃত হবে তা কম্পাইলার নির্দিষ্ট করবে।
২. **ইনহেরিটেন্স (Inheritance) :** একটি Class কে পরিবর্তন ও বর্ধিত করে আরেকটি নতুন তৈরি অর্থাৎ Parent object থেকে child object তৈরি ও ব্যবহার করা হয়।
৩. **এনক্যাপসুলেশন (Encapsulation)** : প্রোগ্রামে চলক এবং চলক সংশ্লিষ্ট কোডকে একত্রে রাখার কৌশলই হল এনক্যাপসুলেশন। এর ফলে এক অবজেক্টের ডেটা ও মেথডস অন্য অবজেক্ট অবৈধভাবে ব্যবহার করতে পারে না।

ভিজুয়াল প্রোগ্রামিং (Visual Programming)

স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিংয়ের কাঠামো ও ভাষাকে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসে রূপান্তরিত করে তৈরি করা হয়েছে ভিজুয়াল প্রোগ্রামিং। পিসিতে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস (জিইউআই) পরিবেশে (যেমন– উইন্ডোজ) কাজ করার প্রবণতা দ্রুত বৃদ্ধির কারণে ভিজুয়াল প্রোগ্রামিং-এর প্রচলন শুরু হয়। ভিজুয়াল প্রোগ্রামিং পদ্ধতিতে আইকন বা অবজেক্টসমূহ চোখে দেখা যায় বলে দ্রুত কম কমান্ড ব্যবহার করে সহজেই কাঙ্ক্ষিতরূপে এবং কাঙ্ক্ষিত স্থানে স্থাপন করা যায়। ভিজুয়াল প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে দ্রুত এবং সহজে প্রোগ্রাম রচনা করা যায়।

উদাহরণ : ভিজুয়াল বেসিক, ভিজুয়াল সি++ ইত্যাদি জনপ্রিয় কয়েকটি ভিজুয়াল প্রোগ্রাম ভাষা।

ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামিং (Event Driven Programming)

ব্যবহারকারী কর্তৃক কোন ঘটনায় যেমন– কোন কমান্ড বাটনে মাউস দিয়ে ক্লিকে (ইভেন্টে) সাড়া দিয়ে নির্বাহিত প্রোগ্রামকে ইভেন্ট চালিত প্রোগ্রাম বা ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রাম বলা হয়। এসব প্রোগ্রামিংয়ে বিভিন্ন নির্দেশ চিত্রের মাধ্যমে দেয়া হয়। ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামে বিভিন্ন ইভেন্ট প্রসিডিউর যেমন- মাউস ক্লিক, মাউস ডাউন, মাউস মুভ এবং কী বোর্ডের কোন কী চাপ দেয়া ইত্যাদি নির্দিষ্ট করা থাকে। কোড লিখার সময় কোন কন্ট্রোলে কি ইভেন্ট নির্দেশ দেয়া হবে তার ইভেন্ট প্রসিডিউরে কোড লিখতে হয়। অ্যাপ্লিকেশন রান করে ব্যবহারকারী ইভেন্টে কাজ করতে পারে। সকল ভিজুয়াল প্রোগ্রামিংই হচ্ছে ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামিং।

একটি সাধারণ প্রোগ্রামের বৈশিষ্ট্য

সাধারণত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম রচনা করা হয়। প্রোগ্রাম রচনার ক্ষেত্রে ৭টি ধাপে রচনা কার্য সমাপ্ত করতে হয়। ধাপগুলো এ অধ্যায়ের প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে। এ ৭টি ধাপে প্রোগ্রাম রচনা করলে রচনাকার্যে ত্রুটির সম্ভাবনা কম থাকে। তাছাড়া একটি সাধারণ প্রোগ্রামের গুণাবলি নিম্নরূপ :

১. **পরিচয় পর্ব :** প্রোগ্রামের বিষয়বস্তু/উদ্দেশ্য, প্রোগ্রামারের নাম, প্রোগ্রামের সময়কাল, প্রোগ্রামে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধ্রুবক, চলকের বর্ণনা ইত্যাদি থাকে।

২. **বর্ণনা :** এ পর্বে প্রোগ্রামের সমস্যার বর্ণনা, সমাধানের কৌশল, সিদ্ধান্ত, যুক্তি ইত্যাদি উল্লেখ থাকে।

৩. **ইনপুট :** প্রোগ্রামে ডেটা ইনপুটের সুবিধা থাকবে।

৪. **প্রসেস :** প্রোগ্রামে অবশ্যই ডেটা প্রক্রিয়াকরণের সুবিধা থাকবে।

৫. **আউটপুট :** ফলাফল প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে।

৬. প্রোগ্রামটি নির্ভুল ও যুক্তিপূর্ণ হতে হয়।

৭. যতটা সম্ভব সরল ও সংক্ষিপ্ত হতে হয় এবং অতিরিক্ত লুপ থাকবে না।

৮. সহজে প্রোগ্রামটির পরিবর্তন পরিমার্জন ও ভুল সংশোধন করার ব্যবস্থা থাকবে। ইত্যাদি

একটি আদর্শ প্রোগ্রাম এর বৈশিষ্ট্য

একটি আদর্শ প্রোগ্রামের কতিপয় গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর মধ্যে কিছু উল্লেখ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেয়া হলো–

১. প্রোগ্রাম সহজ হবে।
২. প্রোগ্রাম বোধগম্য হবে।
৩. প্রোগ্রাম যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হবে।
৪. প্রোগ্রামে প্রয়োজনের অতিরিক্ত লুপ ব্যবহার করে প্রোগ্রামকে দীর্ঘায়িত না করা।
৫. সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়াটি স্পষ্ট ও যুক্তিনির্ভর হতে হবে।
৬. প্রোগ্রাম সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।
৭. প্রোগ্রামের কোডিং অবশ্যই ভুল বিহীন হবে।
৮. প্রোগ্রামকে অবশ্যই নেটওয়ার্ক সংবলিত পরিবেশে কাজ করার উপযোগী হতে হবে।
৯. প্রোগ্রামে জাম্প ও ব্রাঞ্চ ইনস্ট্রাকশন ব্যবহার না করা, এতে প্রোগ্রামের দক্ষতা কমে যায়।
১০. প্রোগ্রামে চলক, ধ্রুবক, উদ্দেশ্যের বর্ণনা দেয়া। যাতে ব্যবহারকারী সহজে বুঝতে পারে।
১১. প্রোগ্রাম অবশ্যই দ্রুত গতি সম্পন্ন হতে হবে।
১২. প্রোগ্রাম যেন বেশি মেমোরি ধারণ না করে।
১৩. সঠিক কাজের জন্য সঠিক প্রোগ্রাম নির্বাচন করতে হবে।

প্রোগ্রাম ডিবাগিং (Programme Debugging)

প্রোগ্রাম তৈরির সময় বিভিন্ন কারণে প্রোগ্রামে ভুল হতে পারে। প্রোগ্রামের ভুলকে বাগ (Bug) বলে। প্রোগ্রামের ভুল-ত্রুটি খুঁজে বের করা এবং সংশোধন করাকে ডিবাগিং (Debugging) বলা হয়। সব ভুল-ত্রুটি দূর না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রোগ্রামই ব্যবহার করা যায় না। প্রোগ্রামে তিন ধরনের ভুল হতে পারে। যথাঃ

১. ডেটা ভুল (Data Error)
২. যুক্তিগত ভুল (Logical Error) ও
৩. সিনট্যাক্স ভুল (Syntex Error)

১. **ডেটা ভুল :** কম্পিউটারে ভুল ডেটা দিলে তাকে ডেটা ভুল বলে। যেমন : 82 এর স্থলে ভুল করে 28 টাইপ করা হলে কম্পিউটার কোন ভুলের বার্তা প্রদর্শন করে না।

২. **যুক্তিগত ভুল :** প্রোগ্রামে যুক্তিরকে যুক্তি ভুল বলা হয়। যুক্তি ভুল হলে ফলাফলে ভুল হয়। যেমন– $M > N$ এর স্থলে $M < N$ বা $T = A + B$ এর স্থলে $T = A - B$ লিখলে যুক্তি ভুল হয়। এক্ষেত্রেও কম্পিউটার কোন ভুলের বার্তা প্রদর্শন করে না।

৩. **সিনট্যাক্স ভুল :** সিনট্যাক্স ভুল হলো প্রোগ্রামিং ভাষার ব্যাকরণগত ভুল। যেমন– বানান ভুল, কমা, ব্র্যাকেট না দেয়া, চলকের মান না দেয়া ইত্যাদি। কম্পাইলার দিয়ে অনুবাদকের সময় ভুল সহজেই ধরা পড়ে এবং কম্পিউটারে এরর মেসেজ দিয়ে জানিয়ে দেয়।

৮. সি-প্রোগ্রামিং (C-Programming)

৮.১ সি প্রোগ্রামিং ভাষা (C-Programming Language)

C হচ্ছে মধ্য পর্যায়ের হাই-লেভেল ল্যাংগুয়েজ। এটি শক্তিশালী প্রোগ্রাম ভাষা। এ ভাষা ব্যবহার করে সব ধরনের প্রোগ্রাম রচনা করা যায় বলে বর্তমানে এ ভাষা বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ভাষাতে কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম এবং প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার লেখা হয়।

সি প্রোগ্রামিং ভাষা উন্নয়নের ইতিহাস (Development History of C Programming Language)

সি একটি প্রসিডিউরাল প্রোগ্রাম ভাষা। বর্তমানে প্রসিডিউর অরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ভাষা হিসেবে সি ব্যাপকভাবে পরিচিত। সি নামটা এসেছে মার্টিন রিচার্ডস-এর উদ্ভাবিত BCPL (Basic Combined Programming Language) ভাষা (সংক্ষেপে বি) থেকে, যা প্রাথমিকভাবে ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে রিসার্স অরিয়েন্টেড কাজে ব্যবহৃত হতো। ১৯৭০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের এটিএন্ডটি বেল ল্যাবরেটরিতে ডেনিস রিচি (Dennis Ritchie) ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে সি ভাষা উদ্ভাবন করেন। ১৯৭৮ সালে ডেনিস রিচির লেখা 'দ্যা সি প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ' বইটি প্রকাশের পর এবং মাইক্রো কম্পিউটারের জনপ্রিয়তা বাড়ার সাথে সাথে সি-এর ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। সে সময়ে সি-এর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ ছিল এক কম্পিউটারে লেখা প্রোগ্রাম অন্য কম্পিউটারে ব্যবহারের সুবিধা।

সি-এর সংস্করণ

সি ভাষা ১৯৭৮ সালের পর খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব ভার্সনে সি বের করা শুরু করে। ফলে ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। ১৯৮৩ সালে আমেরিকান ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইন্সটিটিউট (ANSI) তৎকালীন সি-এর একটি আদর্শ মান নির্ধারণ করে, যা (ANSI-C) নামে পরিচিতি লাভ করে। সি/সি++ এর বিভিন্ন কম্পাইলারের মধ্যে টার্বো সি++, বোরাল্যান্ড সি++ মাইক্রোসফ্ট সি++ ইত্যাদি অন্যতম। সি++ হচ্ছে সি এর অবজেক্ট অরিয়েন্টেড ভার্সন। ১৯৮০ সালে Bjarne Stroustrp সিমুলা ৬৭ ও সি-এর সম্মিলন ঘটিয়ে সি উইথ ক্লাসেস (C with Classes) নামক একটি ল্যাংগুয়েজ উদ্ভাবন করেন। ১৯৮৩ সালে এর নতুন নাম দেয়া হয় সি++।

টার্বো সি/সি++ কম্পাইলার

টার্বো সি/সি++ ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় একটি সি কম্পাইলার। সাধারণত C ড্রাইভে Turbo C লোড করা হয়। প্রধান ডিরেক্টরের (TC ও Z) মধ্যে BIN নামক আরেকটি ডিরেক্টরি আছে। BIN ডিরেক্টরির মধ্যে TC নামে এক্সিকিউটেবল ফাইল আছে। TC কে রান করলেই কম্পিউটার স্ক্রিনে টার্বো সি এডিটর ডিসপ্লে হয়। একে IDE (integrated development environment) বলা হয়। মেনু, টুলস, এডিটর সংবলিত এ স্ক্রিনে প্রোগ্রাম লিখা, এডিট করা, কম্পাইল করা ও রান করাসহ অন্যান্য কাজ করা হয়।

ডেনিস রিচি ১৯৪১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের Bronxe-ville এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা Alistair Ritchie ছিলেন বেল ল্যাবরেটরিজের একজন সুইচিং সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার। নিউ জার্সিতে বেড়ে ওঠা রিচি ছেলেবেলায় লেখাপড়ায় ছিলেন তুখোড়। স্কুলের পাঠ চুকিয়ে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ফিজিক্সে ব্যাচেলর ডিগ্রি নিয়ে তিনি তার গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। স্কুলে পড়া অবস্থাতেই একবার তিনি হার্ভার্ডের কম্পিউটার সিস্টেম ইউনিভ্যাক ওয়ান কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে একটি লেকচার শুনে কম্পিউটার বিষয়ে আরও বেশি জানার জন্য প্রবলভাবে আগ্রহী হন। ফলশ্রুতিতে হার্ভার্ডে পড়ার ফাঁকে রিচি কম্পিউটারের উপর আরও বিস্তারিত জানার জন্য কম্পিউটার চর্চা অব্যাহত রাখেন। তবে তার বিশেষ আগ্রহ ছিল কম্পিউটার প্রোগ্রামিং বিষয়ে। হার্ভার্ডে থাকাকালেই রিচি Massachusetts Institute of Technology (MIT) তে চাকুরি পান। সেসময়ে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং বিষয়ে কোন ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ ছিল না। সে কারণে কম্পিউটার ল্যাবগুলো হাতে-কলমে প্রোগ্রামিং জানে এমন যে কাউকে তাদের কম্পিউটারের কাজে সহযোগিতার জন্য ল্যাবে নিয়োগ দিত। কম্পিউটার বিষয়ে রিচির নিরবচ্ছিন্ন আগ্রহই সম্ভবত তাকে এ কাজের জন্য উপযুক্ত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। MIT এর জন্য অনেক বছর কাজ করেছেন রিচি। এখানকার অন্যান্য বিজ্ঞানীদের আরও উন্নতমানের কম্পিউটার সিস্টেম ও সফটওয়্যার উদ্ভাবনের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে অক্লান্ত সহায়তা দিয়ে গেছেন তিনি। অধিকতর পোর্টেবল কম্পিউটারের জন্য অপারেটিং সিস্টেম ডেভেলপের কাজও তিনি শুরু করেন। সে সময়ের অধিকাংশ কম্পিউটার পুরো একটা ঘর জুড়ে ব্যাপৃত থাকলেও তাদের কার্যক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। ততদিনে অধিকতর ছোট ডেস্কটপ কম্পিউটার ডেভেলপ হয়ে গেছে, অথচ এদের জন্য কোন সহজে ব্যবহার্য অপারেটিং সিস্টেম তখনও ডেভেলপ হয়নি। রিচি এরূপ একটি অপারেটিং সিস্টেম তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রিচি তার সমগ্র জীবনে প্রোগ্রামিংকে কখনো সমস্যা হিসেবে গ্রহণ করেন নি। বরং এর পরিবর্তে প্রোগ্রামিংকে তিনি সর্বদা একটি ধাঁধা হিসেবে নিয়েছেন এবং তার সমাধান করেছেন।

সি বনাম সি++

সি থেকে সি++ এর উৎপত্তি। সি++ হলো সি এর সুপারসেট অর্থাৎ সি এর উন্নততর ভার্সন হলো সি++। আগে সি++ কে সি (ক্লাসসহ) বলা হতো। সি++ এর এক্সপ্রেশন এবং অপারেটরসমূহ সি–এর এক্সপ্রেশন এবং অপারেটরসমূহের মতো।

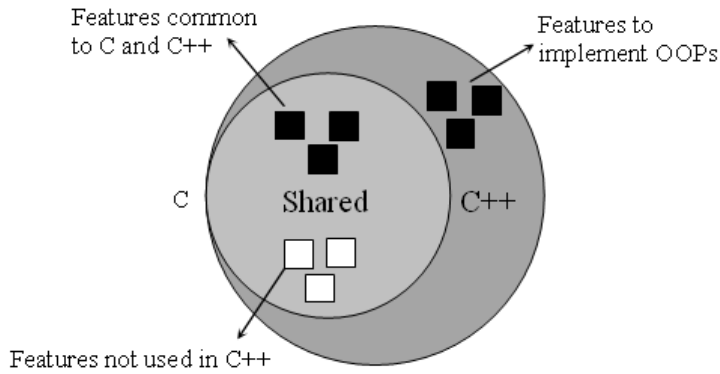

সি এবং সি++ এর মধ্যকার পার্থক্য (Difference between C and C++)

সি (C)	সি++ (C++)
১. সি হলো একটি প্রসিডিউরাল প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ।	১. সি++ হলো একটি অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ।
২. রিজার্ভড কী ওয়ার্ডের সংখ্যা কম।	২. রিজার্ভড কী ওয়ার্ডের সংখ্যা বেশি।
৩. ইনপুট এবং আউটপুট লাইব্রেরিভিত্তিক এবং প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়।	৩. ইনপুট এবং আউটপুট এবং কমান্ডের মাধ্যমে গঠিত।
৪. পলিমরফিজম এবং ইনহেরিটেন্স ওভারলোডিং সুবিধা নেই।	৪. পলিমরফিজম এবং ইনহেরিটেন্স ওভারলোডিং সুবিধা বিদ্যমান।
৫. সি কম্পাইলার দিয়ে সি++ কম্পাইল করা যায় না।	৫. বেশিরভাগ সি++ কম্পাইলার দিয়ে সি কম্পাইল করা যায়।
৬. scanf() – ইনপুট নেয়ার জন্য এ ফাংশন ব্যবহৃত হয়। printf() – আউটপুট নেয়ার জন্য এ ফাংশন ব্যবহৃত হয়।	৬. Cin>> – ইনপুট নেয়ার জন্য এ ফাংশন ব্যবহৃত হয়। Cout<< – আউটপুট নেয়ার জন্য এ ফাংশন ব্যবহৃত হয়।
৭. প্রোগ্রাম ডিজাইনে টপ-ডাউন অ্যাপ্রোচ ব্যবহৃত হয়।	৭. প্রোগ্রাম ডিজাইনে বটম-আপ অ্যাপ্রোচ ব্যবহৃত হয়।
৮. গ্লোবাল ভেরিয়েবল–এর মাল্টিপল ডিক্লেয়ারেশন করা যায়।	৮. গ্লোবাল ভেরিয়েবল–এর মাল্টিপল ডিক্লেয়ারেশন করার অনুমতি দেয় না।
৯. main() এর সাথে অন্যান্য ফাংশন কল করে।	৯. main() এর সাথে অন্যান্য ফাংশন কল করে না।
১০. প্রিমিটিভ এবং বিল্ট-ইন ডেটা টাইপকে সাপোর্ট করে।	১০. বিল্ট-ইন এবং ইউজার ডিফাইন ডেটা টাইপকে সাপোর্ট করে।

C ভাষার ব্যবহার (Using of C Programming Language)

বর্তমানে প্রচলিত কম্পাইলার ও অপারেটিং সিস্টেমগুলোর শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি C ভাষায় রচিত। C ভাষায় অ্যাসেম্বলি এবং উচ্চতর ভাষার প্রোগ্রামিং কৌশলের সমন্বয় সাধন করা যায় বলে এটি মধ্যস্তরের ভাষা হিসেবে পরিচিত। সি ভাষায় সহজেই অত্যন্ত জটিল সমস্যা সমাধান করা যায়। C ভাষাকে কম্পিউটার ভাষার জনক বলা হয়ে থাকে। এ ভাষার সাহায্যে যে ধরনের প্রোগ্রাম লেখা যায় তা হলো–

১. অপারেটিং সিস্টেম (Operating System)
২. ল্যাংগুয়েজ কম্পাইলার (Language Compiler)

৩. ল্যাংগুয়েজ ইন্টারপ্রিটার (Language Interpreter)
৪. অ্যাসেম্বলার (Assembler)
৫. ডেটাবেজ প্রোগ্রাম (Database Programme)
৬. টেক্সট এডিটর (Text Editor)
৭. কম্পিউটার গেমস (Computer Games)
৮. কম্পিউটার ভাইরাস ও এন্টিভাইরাস (Computer Virus and Anti-Virus)
৯. ইউটিলিটিজ (Utilities)
১০. নেটওয়ার্ক ড্রাইভারস (Network Drivers)

C ভাষার প্রোগ্রামের গঠন (Basic Structure of C programme)

সি প্রোগ্রাম একটি main() ফাংশনসহ এক বা একাধিক ফাংশনের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রোগ্রাম। সি প্রোগ্রামে বেসিক স্ট্রাকচার পাশের চিত্রে দেখানো হলো।

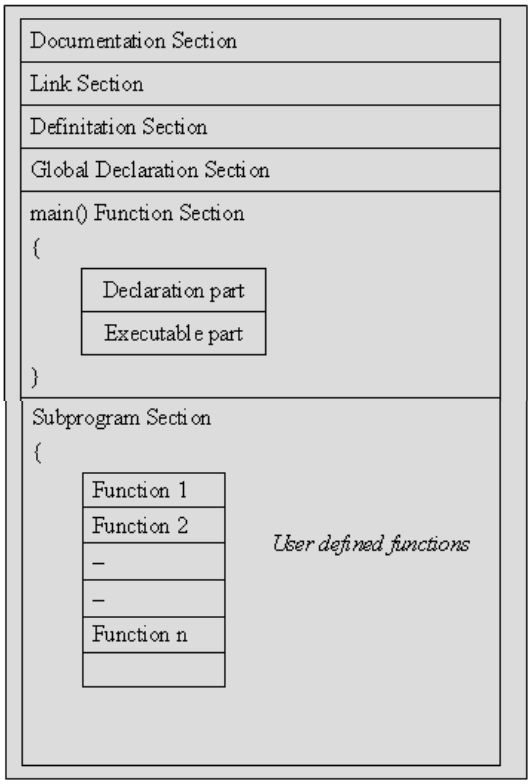

১. ডকুমেন্টেশন সেকশন (Documentation Section)

সি প্রোগ্রামের ঐচ্ছিক এ অংশে প্রোগ্রামের প্রয়োজনীয় মন্তব্য (comment) থাকে। প্রোগ্রাম নির্বাহে এ অংশের কোনো ভূমিকা নেই। এক লাইনের কমেন্টের জন্য // ব্যবহার করা হয়। যেমন :

// This is my first programme in C

তবে একাধিক লাইনের কমেন্টের জন্য শুরুতে /* এবং শেষে */ ব্যবহার করা হয়। যেমন :

//* This is my first program in C. I have written my comment to clarify my program */

২. লিংক সেকশন (Link Section)

এ অংশে প্রোগ্রামের ব্যবহৃত বিভিন্ন ফাংশনের জন্য প্রয়োজনীয় হেডার ফাইল সংযুক্ত করা হয়। এটি সি প্রোগ্রামের একটি আবশ্যকীয় অংশ। হেডার ফাইল সংযোগের নিয়ম হলো :

#include<Header_file_name>

যেমন-print() ফাংশন এর হেডার ফাইল stdio.h সংযোগ করার জন্য লিখতে হবে :

#include<studio.h>

৩. ডেফিনেশন সেকশন (Definitation Section)

অনেক সময় ইউজার ডিফাইন ফাংশন বা main() ফাংশনের অভ্যন্তরে কিছু ধ্রুবক (constant) ব্যবহার করা হয়। এই সকল ধ্রুবককে # define এর মাধ্যমে এ অংশে লেখা হয়। যেমন–

#define pi=3.14;

৪. গ্লোবাল ডিকলারেশন সেকশন (Global Declaration Section)

যে কোন ফাংশনে অথবা প্রোগ্রামের সর্বত্র ব্যবহৃত হবে এমন ভেরিয়েবলকে গ্লোবাল ভেরিয়েবল বলা হয়। এ অংশে গ্লোবাল ভেরিয়েবল ঘোষণা করা হয়।

৫. মেইন ফাংশন সেকশন (main() Function Section)

সি প্রোগ্রাম main() ফাংশনকে ঘিরে আবর্তিত হয়। এ ফাংশনের দু'টি অংশ রয়েছে। যথা : ১. ঘোষণা অংশ (Declarative part) এবং ২. নির্বাহ অংশ (Executable part)। মেইন সেকশনের ঘোষণা অংশে সাধারণত বিভিন্ন টাইপের ভেরিয়েবল, অ্যারে, পয়েন্টার, ফাইল ইত্যাদি ঘোষণা করা হয়। নির্বাহ অংশে কমপক্ষে একটি স্টেটমেন্ট থাকতে হয়। উভয় অংশের প্রত্যেক স্টেটমেন্টের শেষে সেমিকোলন (;) থাকতে হবে। ফাংশনের সম্পূর্ণ অংশ দ্বিতীয় বন্ধনী বা { } দ্বারা আবদ্ধ থাকে।

৬. সাবপ্রোগ্রাম সেকশন (Subprogram Section)

এই অংশে সাধারণত ব্যবহারকারী কর্তৃক তৈরি করা ফাংশন লেখা হয়। সাধারণত main() ফাংশনের শেষে এ সকল ফাংশন থাকে, তবে এদেরকে main() ফাংশনের আগেও লেখা যায়।

৮.২ সি প্রোগ্রামের গঠন বৈশিষ্ট্য

C প্রোগ্রামের গঠন বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১. সি একটি মধ্যস্তরের ভাষা। এ ভাষায় কম্পিউটারের বিট পর্যায়ের প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে হার্ডওয়্যার নিয়ন্ত্রণ ও সিস্টেম প্রোগ্রাম রচনা করা যায়।

২. এ ভাষায় উচ্চস্তরের ভাষার সুবিধা পাওয়া যায়, আবার নিম্নস্তরের ভাষার সমকক্ষ প্রোগ্রাম রচনা করা যায়।

৩. সি ল্যাংগুয়েজ দিয়ে সব ধরনের প্রোগ্রাম রচনা করা যায়। তাই একে general purpose languageও বলা হয়।

৪. সি ল্যাংগুয়েজে মূল সমস্যাকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগে প্রয়োজনীয় ভেরিয়েবল, ফাংশন, কন্সট্যান্ট ইত্যাদি ব্যবহার করা যায় এবং প্রয়োজনে কন্ট্রোল স্টেটমেন্টও ব্যবহার করা যায়। তাই সি-কে স্ট্রাকচারড ল্যাংগুয়েজও বলা হয়।

৫. C প্রোগ্রামের ভাষা শুরু হয় একটি ফাংশন main () এর মাধ্যমে। প্রতিটি প্রোগ্রামের কাজ এ ফাংশন থেকে শুরু হয়।

৬. ফাংশনের মধ্যে যেসব Statement থাকে, সেগুলোকে দ্বিতীয় বন্ধনী এর মধ্যে রাখতে হয়।

৭. প্রতিটি Statement-এর শেষে সেমিকোলন (;) দিতে হয়।

৮. প্রোগ্রামে কোন Comment ব্যবহার করতে হলে তার আগে /* চিহ্ন এবং শেষে */ চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়।

৯. প্রোগ্রামের যে কোন স্থানে যতগুলো ইচ্ছা Comment দেয়া যায়।

১০. পর্যাপ্ত সংখ্যক লাইব্রেরি ফাংশন, ব্রাঞ্চিং স্টেটমেন্ট ও কন্ট্রোল স্টেটমেন্টের সুবিধা রয়েছে।

১১. সাধারণত সি ল্যাংগুয়েজ দিয়ে লিখিত এক মেশিনের প্রোগ্রাম অন্য মেশিনে চালানো যায়।

১২. এতে পর্যাপ্ত সংখ্যক কম্পাউন্ড অপারেটর, যেমন– +=,- =,*= ইত্যাদি রয়েছে।

সি প্রোগ্রামিং ভাষার অসুবিধা

১. সি ল্যাংগুয়েজকে case sensitive ভাষাও বলা হয়। সি-ভাষায় সাধারণত সব প্রোগ্রাম ছোট হাতের অক্ষরে লেখা হয় অর্থাৎ সি প্রোগ্রামে ছোট হাতের অক্ষর ও বড় অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

২. সি ভাষায় নেম স্পেস অগ্রাহ্য করে।

৩. সি ভাষা সঠিকভাবে চলক ঘোষণা করে হয়।

৪. লাইব্রেরি ফাংশনের হেডার ফাইলগুলো ঠিকমত ডিক্লেয়ার করতে হয়।

৫. সি ল্যাংগুয়েজ অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ফিচারকে সমর্থন করে না।

৬. প্রোগ্রাম রান করার সময় চেকিং করা যায় না।

৭. আধুনিক প্রোগ্রামিং এনভায়রনমেন্টকে হ্যান্ডেলিং করার মতো পর্যাপ্ত লাইব্রেরি ফাংশন নেই।

সি প্রোগ্রাম শুরু করার পদ্ধতি

বেশিরভাগ সি কম্পাইলারে নিজস্ব সোর্স এডিটর আছে, যেখানে সহজে ও সুন্দরভাবে সি সোর্স ফাইল তৈরি করা যায় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে অতিরিক্ত কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। টার্বো সি কম্পাইলারে এরূপ একটি সমন্বিত পরিবেশ আছে, যাকে টার্বো সি আইডিই (IDE) বলা হয়। এই আইডিই রান করানোর জন্য টার্বো সি কম্পাইলার ডিরেক্টরির BIN সাব-ডিরেক্টরি থেকে TC.EXE (অথবা, উইন্ডোভিত্তিক কম্পাইলারের জন্য TCW.EXE) ফাইল চালানো হয়। অতঃপর File মেনু থেকে New নির্বাচন করলে NONAME00.CPP বা NONAME00.C নামে একটি নতুন সোর্স ফাইল ওপেন হয়। যেখানে পর্যায়ক্রমে প্রোগ্রামের স্টেটমেন্টসমূহ লেখা হয়।

সি প্রোগ্রাম সেভ বা সংরক্ষণ করা

নতুন সোর্স ফাইল সেভ বা সংরক্ষণ করার জন্য File মেনু থেকে Save অথবা Save as সাবমেনু নির্বাচন করতে হয়। Save File As ডায়ালগ বক্স প্রদর্শিত হলে ফাইলের নাম লিখে এন্টার কী চাপতে হয়। পূর্বে সংরক্ষণ করা কোন সোর্স ফাইল ভিন্ন নামে সংরক্ষণ করার জন্য Save as সাবমেনু নির্বাচন করতে হয়।

সি প্রোগ্রামের সোর্স ফাইলের বর্ধিত নাম (এক্সটেনশন নেম)

সি প্রোগ্রামের সোর্স ফাইলের বর্ধিত নাম .C, টার্বো সি++ কম্পাইলারে সংরক্ষণের সময় সোর্স ফাইলসমূহের বর্ধিত নাম বাই-ডিফল্ট .CPP হয়, তবে কম্পাইলারের Options মেনু থেকে সোর্স ফাইলের বর্ধিত নাম ডিফল্ট হিসেবে .C নির্ধারণ করা যায়। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া কোন .C প্রোগ্রামকে .CPP প্রোগ্রাম হিসেবে সংরক্ষণ করে চালনা করলে ফলাফলের কোন পার্থক্য হয় না।

সি স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি ফাংশন

প্রোগ্রামাররা যাতে স্বল্প সময়ে ভাল প্রোগ্রাম লিখতে পারে সেজন্য সি প্রোগ্রামে অনেক লাইব্রেরি ফাংশন রয়েছে। যেমন, কোন সংখ্যার বর্গমূল বের করার জন্য নিজে নিজে কোড লিখে প্রোগ্রাম তৈরি করা যায়। কিন্তু এতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু সি প্রোগ্রামিং এ math.h হেডার ফাইলের অধীন sqrt() ফাংশনটি ব্যবহার করে সহজেই কোন সংখ্যার বর্গমূল বের করা যায়।

হেডার ফাইল

একটি সি প্রোগ্রাম রচনা করার সময় শুরুতে এতে যেসব ফাংশন ব্যবহার করা হবে সেসব ফাংশনের হেডার ফাইল অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হয়। যেমন, প্রোগ্রামে printf() এবং scanf() এ দুটি ফাংশন ব্যবহার করার জন্য প্রোগ্রামের শুরুতে লেখা হয়েছে–

```
#Include<stdio.h>
```

কারণ stdio.h (standard input/output) হেডার ফাইলে printf() এবং scanf() এ ফাংশনগুলো রয়েছে।

লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহারের নিয়ম

লাইব্রেরি ফাংশনগুলোর ঘোষণা তাদের হেডার (.h) ফাইলে এবং বিস্তারিত বর্ণনা সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরি (.Lib) ফাইলে দেয়া থাকে। এজন্য সি প্রোগ্রামে কোন লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহার করলে প্রোগ্রামের শুরুতেই #include প্রিপ্রসেসিং ডিরেক্টিভ (preprocessing directive)–এর সাহায্যে সংশ্লিষ্ট হেডার ফাইল সংযুক্ত করতে হয়। প্রোগ্রামে কোন হেডার ফাইল সংযুক্ত করা হলে কম্পাইলার প্রোগ্রাম কম্পাইল করার সময় সংযুক্ত ফাইলের উপাদানগুলো সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরি ফাইল থেকে কপি করে। এরূপ সংযোগের ফলে কম্পাইলারের এমন মনে হয় যে, সংযুক্ত ফাইল যেন সংযোগকারী ফাইলেরই অংশবিশেষ। উল্লেখ্য, প্রোগ্রামের শুরুতে #include স্টেটমেন্টের মাধ্যমে কোন হেডার ফাইল সংযুক্ত করা হলে তা ঐ হেডার ফাইলে বর্ণিত সকল ফাংশনের জন্য কাজ করে। কোন লাইব্রেরি ফাংশনের হেডার ফাইল এবং ব্যবহারবিধি কি তা জানার জন্য ঐ লাইব্রেরি ফাংশনের উপর কার্সর রেখে বা সিলেক্ট করে Alt+F1 বা Ctrl+F1 চাপলে হেল্প ফাইল থেকে তা জানা যায়।

হেডার ফাইল	কি ধরনের লাইব্রেরি ফাংশন	লাইব্রেরি ফাংশন	কাজ
stdio.h:	I/O functions	getchar()	কী–বোর্ডে টাইপকৃত পরবর্তী অক্ষর রিটার্ন করে।
		putchar()	স্ক্রিনে সিঙ্গেল ক্যারেক্টার আউটপুট করে।
		printf()	মনিটরের পর্দায় আউটপুট প্রকাশ করে।
		scanf()	ডেটা ইনপুট করে ভেরিয়েবলে রাখবে।
string.h	String functions	strcat()	স্ট্রিং-২ এর কন্টেন্টকে স্ট্রিং-১ এ কপি করে।
		strcmp()	দুইটি স্ট্রিং–এর মধ্যে তুলনা করে।
		strcpy()	স্ট্রিং-২ এর কন্টেন্টকে স্ট্রিং-১ এ কপি করে।
ctype.h	Character functions	isdigit()	নন 0 রিটার্ন করে, যদি **arg** 0 থেকে 9 ডিজিট হয়।
		isalpha()	নন 0 রিটার্ন করে, যদি **arg** কোন এলফাবেটের অক্ষর হয়।
		isalnum()	নন 0 রিটার্ন করে, যদি **arg** কোন এলফাবেট বা ডিজিট হয়।
		islower()	নন 0 রিটার্ন করে, যদি **arg** লয়ারকেচ লেটার হয়।
		isupper()	নন 0 রিটার্ন করে, যদি **arg** আপারকেচ লেটার হয়।
math.h	Mathematics functions	acos()	**arg** এর **arc cosine** রিটার্ন করে।
		asin()	**arg** এর **arc sine** রিটার্ন করে।
		atan()	**arg** এর **arc tangent** রিটার্ন করে।
		cos()	**arg** এর **arc cosine** রিটার্ন করে।
		exp()	**e** এর ন্যাচারাল অ্যালগরিদম রিটার্ন করে।
		fabs()	কোন সংখ্যার **absolute value** রিটার্ন করে।
		sqrt()	কোন সংখ্যার **square root** রিটার্ন করে।
time.h	Time and Date functions	time()	বর্তমান ক্যালেন্ডারের সময় রিটার্ন করে।
		difftime()	দুটি সময়ের মধ্যেকার পার্থক্য সেকেন্ডে বের করে।
		clock()	প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় সিস্টেম ক্লক সাইকেল সংখ্যা রিটার্ন করে।
stdlib	Miscellaneous functions	malloc()	
		rand()	pseudo-random integral নাম্বার রিটার্ন করে।
		srand()	rand() ফাংশনের শুরুর পয়েন্ট সেট করে।

সি ল্যাংগুয়েজে নমুনা প্রোগ্রাম

সি ল্যাংগুয়েজে কীভাবে প্রোগ্রাম লেখা হয় এবং প্রোগ্রামটি কীভাবে কাজ করে তা দেখানোর জন্য একটি ছোট নমুনা প্রোগ্রাম দেখা যাক। প্রোগ্রামটি চালু করলে কম্পিউটার যে কোন তিনটি সংখ্যা চাইবে। সংখ্যা তিনটি এন্ট্রি করলে এগুলোর গড় দেখাবে। প্রথমেই চিন্তা করতে হবে প্রোগ্রামটি কী ধাপে কাজ করবে। প্রোগ্রামের ধাপসমূহ হবে :

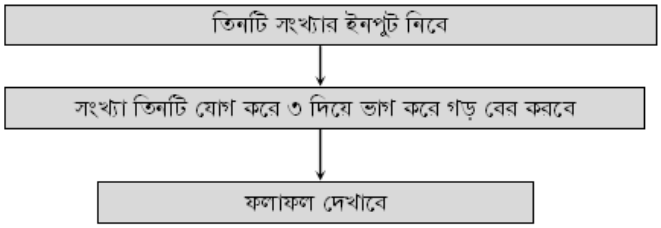

প্রোগ্রামটি লেখার জন্য :

১. টার্বো সি কম্পাইলার ডিরেক্টরির BIN সাব-ডিরেক্টরি থেকে TC.EXE এ ডাবল ক্লিক করতে হবে। সি কম্পাইলারে প্রোগ্রামটি শুরু করতে হবে।

২. File মেনু থেকে New নির্বাচন করতে হবে। প্রোগ্রাম লেখার জন্য এডিটিং উইন্ডো আসবে। পর্দার উপরের বাম কোনায় কার্সর মিট মিট করবে। কী-বোর্ড থেকে টাইপ করলে কার্সরের অবস্থানে লেখা হবে।

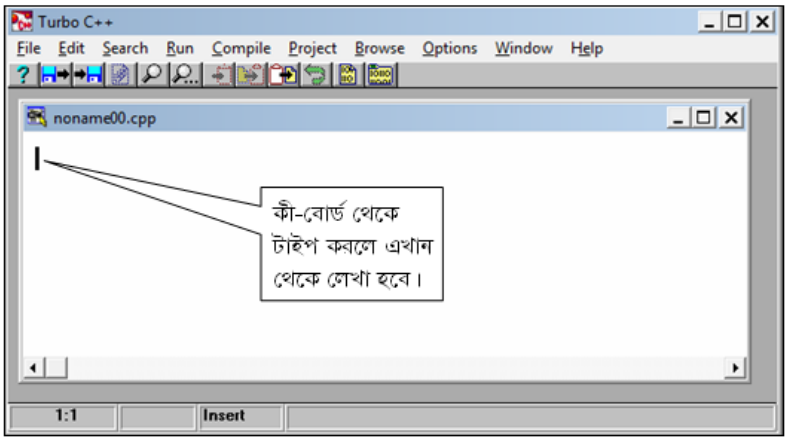

কী-বোর্ড থেকে /* Program of summation and average */ টাইপ করে এন্টার কী চেপে নিচের লাইনে এসে পরবর্তী লাইনে #include<stdio.h> টাইপ করি। এভাবে নিচের মতো সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটি টাইপ করি :

```
/* Program of summation and average */
#include<stdio.h>
main(){
int a,b,c,sum;
float avg;
printf("Enter three integer Value :");
scanf("%d %d %d",&a,&b,&c);
sum = a+b+c;
avg=(float)sum/3 ;
printf("\n The summation of three number are=%d",sum);
printf("\n Average of three number are =%.2f",avg);
}
```

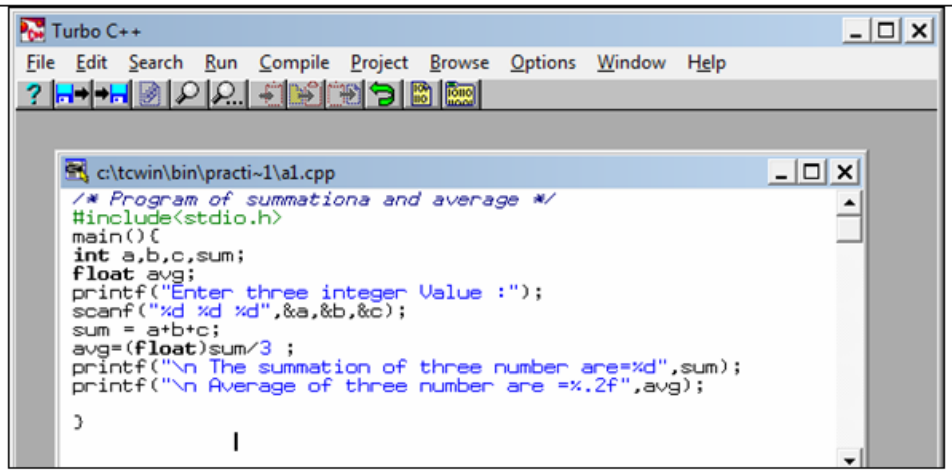

কী-বোর্ডের Ctrl+F9 কী-দ্বয় একত্রে চেপে প্রোগ্রামটি রান করালে তিনটি সংখ্যা ইনপুট করার জন্য নির্দেশ আসবে :
Enter three integer Value :

58 টাইপ করে স্পেসবার চেপে 66 টাইপ করে, আবার স্পেসবার চেপে 71 টাইপ করে এন্টার কী চাপতে হবে।
Enter three integer Value : 58 66 71 (Enter)

ফলাফল দেখাবে। গড় সংখ্যা ৬৫ প্রদর্শিত হবে।

অর্থাৎ,

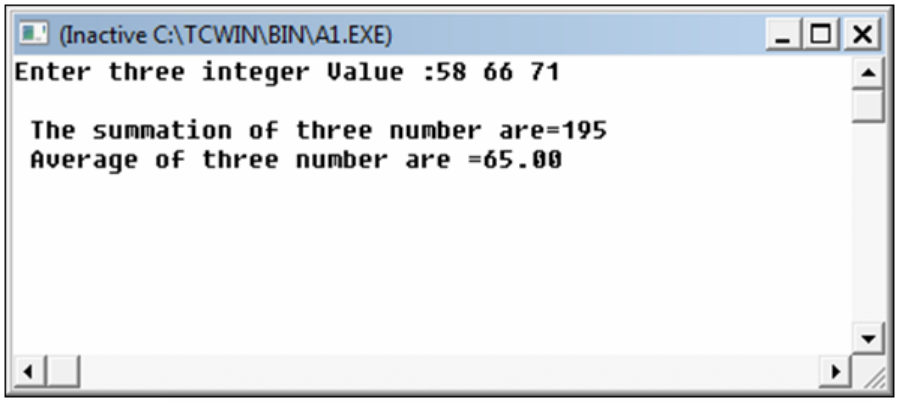

প্রোগ্রাম বিশ্লেষণ :

সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটি হলো–

```
/* Program of summation and average */
#include<stdio.h>
main(){
int a,b,c,sum;
float avg;
printf("Enter three integer Value :");
scanf("%d %d %d",&a,&b,&c);
sum = a+b+c;
avg=(float) sum/3 ;
printf("\n The summation of three number is=%d",sum);
printf("\n Average of three number is =%.2f",avg);
}
```

যেসব কমান্ড, স্টেটমেন্ট, ফাংশন ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

Comment
main()
printf()
scanf()

% d, %f- ফরমেট স্পেসিফায়ার

\n – স্কেপ সিকুয়েন্স

ব্যবহৃত অপারেটর

+ = - /

/* Program of summation and average */ - প্রোগ্রামে কোন Comment ব্যবহার করার জন্য এক বা একাধিক লাইনের আগে /* চিহ্ন এবং শেষে */ চিহ্ন এবং শুধুমাত্র এক লাইনের ক্ষেত্রে // চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। প্রোগ্রামের ভেতর কমেন্টের কোন প্রভাব নেই। শুধুমাত্র পরবর্তীতে প্রোগ্রামটির নাম অথবা কী ধরনের প্রোগ্রাম ইত্যাদি বোঝার জন্য কমেন্ট ব্যবহার করা হয়।

#include<stdio.h> -প্রোগ্রামের ভেতরে printf() ও scanf()এ দুইটি লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহার করা হয়েছে। এই ফাংশন দুটি stdio.h নামক হেডার ফাইলে রয়েছে। সি প্রোগ্রামে যেসব লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহার করা হবে সেগুলো যে হেডার ফাইলে রয়েছে প্রোগ্রামের শুরুতে সে হেডার ফাইলের নাম #include এর সাথে সংযুক্ত করতে হয়।

main() -কম্পাইল এবং নির্বাহের সময় সি/সি++ প্রোগ্রাম main() ফাংশন থেকে শুরু হয়। তাই প্রোগ্রামে এ ফাংশনটি অবশ্যই লিখতে হয়।

{ - main( ) লেখার পর এ ফাংশনটির কার্যক্রম শুরু এবং শেষ সীমা বুঝানোর জন্য শুরুতে "{ " এবং শেষে " } " সেকেন্ড ব্র্যাকেট ব্যবহার করা হয়।

int a,b,c, sum; দুইটি ইন্টিজার টাইপের ভেরিয়েবল a, b, c এবং sum ডিক্লেয়ার করা হয়েছে। একই লাইনে এভাবে ভেরিয়েবল ঘোষণা করা হলে মাঝখানে কমা এবং শেষে সেমিকোলন ব্যবহার করতে হয়।

float avg; ফ্লোট টাইপের ভেরিয়েবল avg ডিক্লেয়ার করা হয়েছে। তিনটি সংখ্যার যোগফলকে তিন দিয়ে ভাগ করে গড় নির্ণয় করা হবে বিধায় এটি ভগ্নাংশ হতে পারে। তাই ফ্লোট টাইপের ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয়েছে।

printf()– মনিটরের পর্দায় আউটপুট প্রকাশের জন্য এ ফাংশনটি ব্যবহৃত হয়। এর ব্র্যাকেটের ভিতরে ইনভার্টেড কমার ভেতরে যে টেক্সট টাইপ করা হবে প্রোগ্রাম মনিটরের পর্দায় হুবহু তা দেখাবে ।

scanf()– এই ফাংশনটি প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় কী-বোর্ড থেকে মান নিয়ে ভেরিয়েবলে রাখবে।

%d– একে ফরমেট স্পেসিফায়ার বলা হয়। ঘোষণাকৃত ভেরিয়েবল টাইপ অনুযায়ী স্টেটমেন্টে ফরমেট স্পেসিফায়ার ব্যবহার করতে হয়। এখানে "%d" ফরমেট স্পেসিফায়ারটি decimal integer টাইপের ডেটা ইনপুট করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। i ভেরিয়েবলটি যদি ফ্লোটিং পয়েন্ট টাইপের হয় তাহলে %d এর পরিবর্তে %f ফরমেট স্পেসিফায়ার ব্যবহার করতে হতো।

&-ইনভার্টেড কমার পর & চিহ্নের পাশে ভেরিয়েবল–এর নামটি রাখা হয়েছে। এটি দিয়ে ইনপুট করা সংখ্যাটি উক্ত ভেরিয়েবল ঠিকানায় রাখা হয়েছে বুঝাচ্ছে। যে কয়টি সংখ্যা ইনপুট করা হবে সে কয়টি ফরমেট স্পেসিফায়ার লিখতে হবে। ইনভার্টেড কমার পর কমা দিয়ে ভেরিয়েবল ঠিকানা টাইপ করতে হয়।

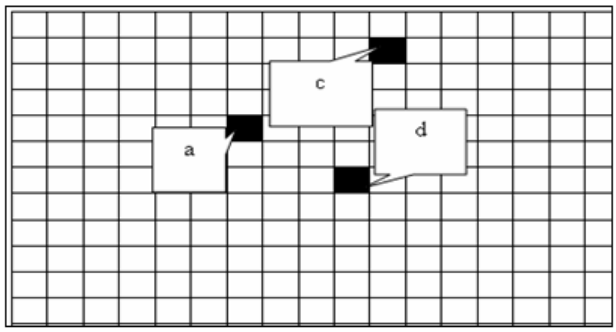

"%d" ফরমেট স্পেসিফায়ারটি decimal integer টাইপের ডেটা ইনপুট করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

scanf("%d%d%d", &a,&b,&c);

ইনপুট নেয়ার ফাংশন

কী বোর্ড থেকে টাইপ করে প্রথম যে সংখ্যাটি এন্ট্রি করা হবে সেটি মেমোরির এ ঠিকানায় রাখবে।

sum = a+b+c; : sum হলো আরেকটি ভেরিয়েবল যেটিতে a, b, c এ তিনটি ভেরিয়েবলের মান যোগ করে যে ফলাফল হবে তার মান রাখবে।

avg=(float) sum/3 ; যেহেতু গড়ফল ফ্লোয়েট (দশমিকের পর সংখ্যা অর্থাৎ ভগ্নাংশ) হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু যোগফল হচ্ছে ইন্টিজার–তাই এক টাইপের ভেরিয়েবলের মান আরেক টাইপের ভেরিয়েবল প্রদর্শনের জন্য Avg = (float)Sum/3;লাইনে (float)ব্যবহার করা হয়েছে।

printf("\n The summation of three number is=%d", sum); print() – ফাংশনটি প্রোগ্রামের ফলাফল মনিটরের পর্দায় প্রদর্শন করবে। Print এর পাশে ইনভার্টেড কমার ভেতরে যে টেক্সট টাইপ করা হবে প্রোগ্রাম হুবহু তা দেখাবে। এ লাইনে কমার পর যে ভেরিয়েবলের নাম লেখা হবে প্রোগ্রাম সেটির মধ্যে যে মান দেয়া আছে তা ফরমেট স্পেসিফায়ার %d এর স্থানে দেখাবে।

আউটপুট নতুন লাইনের শুরুতে প্রদর্শনের জন্য ইস্কেপ সিকুয়েন্স ব্যবহার করা হয়েছে।

টেক্সট কি ধরনের ফলাফল দেখাচ্ছে তা বুঝানোর জন্য ইনভার্টেড কমার ভেতরে এখানে টেক্সট লেখা হয়।

printf("\n The summation of three number is=%d",sum);

আউটপুট ফাংশন

sum ভেরিয়েবল এর মধ্যে যে মান আছে প্রোগ্রাম এখানে তা দেখাবে।

sum ভেরিয়েবল

printf("\n Average of three number is=%.2f", avg);

যেহেতু গড়ফল ফ্লোয়েট (দশমিকের পর সংখ্যা অর্থাৎ ভগ্নাংশ) হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই Avg এর মান দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত প্রদর্শনের জন্য ফরম্যাট স্পেসিফায়ার হিসেবে %.2f ব্যবহৃত হয়েছে।

একক কাজ : সি এর কয়েকটি কম্পাইলারের নাম লেখ। বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেমে কম্পাইলারের ব্যবহার সম্পর্কে লেখ।

৮.৩ প্রোগ্রাম কম্পাইলিং (Program Compiling)

হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজে লিখিত প্রোগ্রামকে কম্পিউটারের বোধগম্য মেশিন ল্যাংগুয়েজে রূপান্তরকে কম্পাইলিং বলা হয়। সি-তে সোর্স প্রোগ্রাম তৈরির পর তা নির্বাহ করার জন্য প্রথমে তা কম্পাইল করতে হয়। সি প্রোগ্রাম কম্পাইল করার জন্য Alt+F9 কী চাপতে হয়। সোর্স ফাইল কম্পাইল করলে তার সাথে সংযুক্ত অন্যান্য সোর্স ও হেডার ফাইলের সমন্বয়ে একই নামে একটি অবজেক্ট (.OBJ) ফাইল তৈরি হয়। তবে কম্পাইল প্রক্রিয়ায় প্রোগ্রামে কোন ভুল বা অসংগতি থাকলে সেগুলো Warning এবং Error মেসেজ আকারে প্রদর্শিত হয়।

কম্পাইলিং–এর প্রধান কাজ (Main Functions of Compiling)

১. সোর্স প্রোগ্রামকে ট্রান্সলেট (অনুবাদ) করে অবজেক্ট প্রোগ্রাম তৈরি করা।
২. প্রোগ্রামের সংগে প্রয়োজনীয় রুটিন (প্রোগ্রামের ছোট অংশ) কে লিংক করা।
৩. প্রোগ্রামের মধ্যে কোন ভুল থাকলে তা জানানো।
৪. প্রোগ্রামের জন্য প্রধান মেমোরিতে অবস্থান তৈরি করা।
৫. প্রোগ্রামের মধ্যেকার ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা।

সি প্রোগ্রাম কম্পাইল করার ধাপসমূহ

১. প্রথমে C প্রোগ্রামে প্রবেশের পর File মেনুতে ক্লিক করলে একটি কমান্ড লিস্ট দেখা যাবে।
২. New অপশনে ক্লিক করলে একটি খালি স্ক্রিন দেখা যাবে।
৩. এখন যে কোন প্রোগ্রাম লিখে প্রোগ্রামটি সংরক্ষণ করতে হবে। একে Source Code বলে।
৪. এখন প্রোগ্রামটি কম্পাইল করার জন্য Compile মেনুতে ক্লিক করে এর অধীনে Compile অপশনটি সিলেক্ট করতে হবে অথবা ALt+F9 কী-দ্বয় চাপতে হবে।
৫. প্রোগ্রামটি কম্পাইল করার পর যদি এতে কোন Error থাকে, তাহলে তা ঠিক করতে হবে।
৬. Run মেনুতে ক্লিক করে Run কমান্ড অপশনে ক্লিক করলে অথবা, Ctrl+F9 কী-দ্বয় চাপলে প্রোগ্রামটি রান হবে।

সি প্রোগ্রাম নির্বাহ (রান) করার পদ্ধতি

অবজেক্ট (.OBJ) ফাইল থেকে এক্সিকিউটেবল (.EXE) ফাইল তৈরির পদ্ধতিকে প্রোগ্রাম নির্বাহ বুঝায়। সোর্স প্রোগ্রাম থেকে আউটপুট বা ফলাফল পাওয়ার জন্য তা নির্বাহ বা রান করতে হয়। সি প্রোগ্রাম নির্বাহ বা রান করার জন্য Ctrl+F9 কী চাপতে হয়। এ প্রক্রিয়ায় অবজেক্ট ফাইল থেকে একই নামের একটি এক্সিকিউটেবল (.EXE) ফাইল তৈরি হয়।

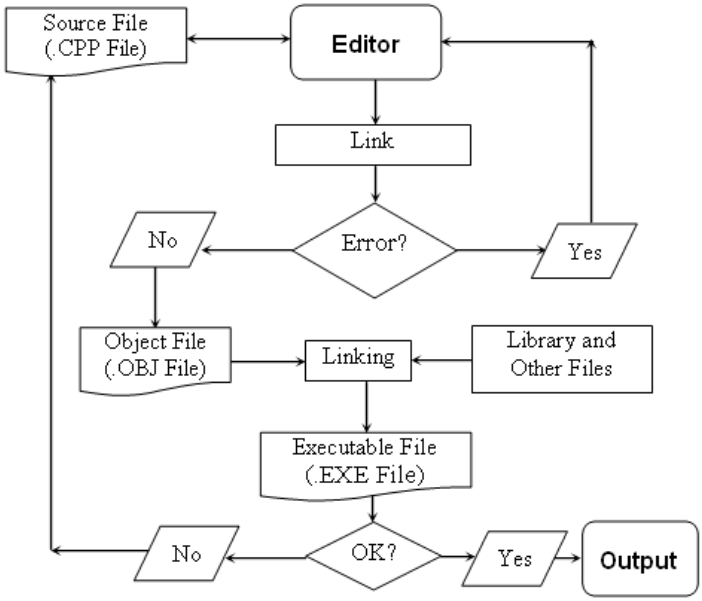

চিত্র : সি প্রোগ্রাম কম্পাইল ও নির্বাহ প্রক্রিয়া

সি প্রোগ্রাম কম্পাইল ও নির্বাহ পদ্ধতি

সি প্রোগ্রাম নির্বাহ করার জন্য প্রথমে কম্পাইল, অতঃপর রান বা নির্বাহ করতে হয়। সোর্স ফাইল কম্পাইল করলে একই নামে একটি অবজেক্ট (.OBJ) ফাইল তৈরি হয়। কম্পাইল বা নির্বাহ প্রক্রিয়ায় প্রোগ্রামে কোন ভুল বা অসংগতি থাকলে সেগুলো Warning এবং Error মেসেজ আকারে প্রদর্শিত হয়। অতঃপর এন্টার কী চেপে সোর্স প্রোগ্রামে ফেরত এসে ত্রুটি সংশোধন (এডিট) করতে হয়। চিত্রে একটি সি প্রোগ্রাম কম্পাইল ও নির্বাহ প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে।

৮.৪ ডেটা টাইপ (Data Type)

ডেটার ধরনকে ডেটা টাইপ বলা হয়। সি প্রোগ্রামিং-এ ভেরিয়েবল ঘোষণার জন্য ডেটার মান অনুযায়ী ডেটা টাইপ বলে দিতে হয়। বিভিন্ন টাইপের ডেটা মেমোরিতে ভিন্ন ভিন্ন বাইটের জায়গা দখল করে। ডেটার ধরন এবং মেমোরি পরিসর সংরক্ষণের ভিত্তিতে সি ভাষায় চারটি মৌলিক ডেটা টাইপ আছে। যথা–

১. ক্যারেক্টার (Charater)
২. ইন্টেজার (Integer)
৩. ফ্লোটিং পয়েন্ট (Floating Point) এবং
৪. ডাবল (Double)

এদেরকে মৌলিক বা বিল্ট-ইন ডেটা টাইপও বলা হয়। আবার প্রয়োজনে নিজস্ব ডেটা টাইপ তৈরি করে নেয়া যায়। এরূপ ডেটা টাইপকে ইউজার ডিফাইন্ড বা কাস্টম ডেটা টাইপ বলা হয়।

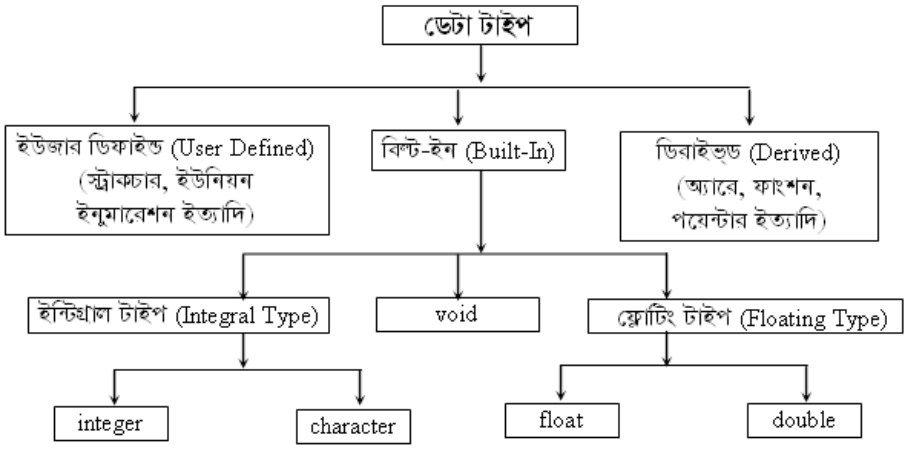

সি-এর মৌলিক ডেটা টাইপগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

সি-এর মৌলিক চারটি ডেটা টাইপ–এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. **Character টাইপ :** সি প্রোগ্রামে ক্যারেক্টার টাইপ ডেটা (অর্থাৎ বিভিন্ন বর্ণ বা বর্ণমালা) নিয়ে কাজ করার জন্য character ডেটা টাইপ ব্যবহৃত হয়। character টাইপ ভেরিয়েবল ঘোষণার জন্য char কীওয়ার্ড লিখতে হয়। যেমন,

```
char x;
```

এর জন্য ১ বাইট জায়গা থাকে। char টাইপ ডেটা ভ্যালু ০-২৫৬ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং ২৫ অক্ষর লেখা যায়। ক্যারেক্টার আবার Signed char ও Unsigned char ধরনের হয়।

২. **Integer টাইপ :** সি প্রোগ্রামে পূর্ণসংখ্যা (যেমন : 23, 1435, –456, 2345 ইত্যাদি) নিয়ে কাজ করার জন্য integer টাইপ ভেরিয়েবল ঘোষণার জন্য int কীওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়। যেমন,

```
int x;
```

মেমোরিতে integer লেখার জন্য ২ বাইট জায়গা নেয়।

৩. **Float টাইপ :** সি প্রোগ্রামে ভগ্নাংশ বা দশমিক চিহ্নযুক্ত সংখ্যা (যেমন : 23.45, –456.50, 2345.23 ইত্যাদি) নিয়ে কাজ করার জন্য float ডেটা টাইপ ব্যবহৃত হয়। float টাইপ ঘোষণার জন্য float কীওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়। দশমিক চিহ্ন ৬ ডিজিট পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য।

```
float y;
```

প্রতিটি float টাইপ ভেরিয়েবলের জন্য কম্পাইলার মেমোরিতে ৪ বাইট বা ৩২ বিট জায়গা সংরক্ষণ করে।

৪. **Double টাইপ** : সি প্রোগ্রামে ফ্লোটের চেয়ে বড় দশমিক চিহ্নযুক্ত সংখ্যা বা এক্সপোনেন্সিয়াল বা সায়েন্টিফিক ফরম্যাটে সংখ্যা (যেমন : $3.5*10^{20}$, $3.5*10^{200}$, $-4.5*10^{-200}$ ইত্যাদি) নিয়ে কাজ করার জন্য double ডেটা টাইপ ব্যবহৃত হয়। double টাইপ ঘোষণার জন্য double কীওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়। দশমিক চিহ্ন ১৪ ডিজিট পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য। যেমন–

```
double z;
```

প্রতিটি double টাইপ মেমোরিতে ৮ বাইট জায়গা লাগে।

float ছাড়া অন্যান্য বেসিক ডেটা টাইপের সাথে আবার signed, unsigned, short, long ইত্যাদি মডিফায়ার যোগ করে ডেটার ধরন এবং মেমোরি পরিসর সংরক্ষণের পরিমাণ বাড়ানো বা কমানো যায়। এ ধরনের কয়েকটি উদাহরণ হলো unsigned char, long int ইত্যাদি। এদেরকে মডিফাইড ডেটা টাইপ বলা হয়। সাধারণত signed ও unsigned মডিফায়ার char ও int টাইপ ভেরিয়েবলের জন্য এবং long ও short মডিফায়ার int ও double টাইপ ভেরিয়েবলের জন্য ব্যবহৃত হয়। আবার প্রয়োজনে নিজস্ব ডেটা টাইপ তৈরি করে নেয়া যায়। এরূপ ডেটা টাইপকে ইউজার ডিফাইন্ড বা কাস্টম ডেটা টাইপ বলা হয়। ভিন্ন ভিন্ন ডেটা টাইপের প্রয়োজনে একই ভেরিয়েবলের জন্য সংরক্ষিত মেমোরি পরিসর আলাদা হয়।

ডেটা টাইপ	বিট সংখ্যা	ভেরিয়েবলের রেঞ্জ
char	8	-128 -> 127 বা, -27 -> 27-1
signed char	8	-128 -> 127 বা, -27 -> 27-1
unsigned char	8	0 -> 255 বা, 0 -> (28-1)
int	16	-32768 -> 32767 বা, -215 -> 215-1
signed int	16	-32768 -> 32767 বা, -215 -> 215-1
unsigned int	16	0 -> 65535 বা, 0 -> (216-1)
short int	16	-32768 -> 32767
enum	16	-32768 -> 32767
long int ev	32	-2147483648-> 2147483647 ev, -231 -> 231-1
signed long	32	-2147483648 -> 2147483647
unsigned long	32	0 -> 4294967295 ev, 0 -> (232-1)
float	32	3.4xE-38 -> 3.4xE+38 এর মধ্যবর্তী ঋণাত্মক বা ধনাত্মক সংখ্যা।
double	64	1.7xE-308 ->1.7xE+308 এর মধ্যবর্তী ঋণাত্মক/ধনাত্মক সংখ্যা।
long double	80	3.4xE-4932 -> 1.1xE+4932 এর মধ্যবর্তী ঋণাত্মক বা ধনাত্মক সংখ্যা।

ডেটা টাইপ ঘোষণার নিয়ম

সি প্রোগ্রামিং এ ডেটার ধরনের উপর ভিত্তি করে ভেরিয়েবল ঘোষণার আগে ডেটা টাইপের কী ওয়ার্ড লিখতে হয়। ডেটা টাইপ ঘোষণার নিয়ম :

- ভেরিয়েবল ঘোষণার আগে ডেটা টাইপ নির্ধারণ করার জন্য ডেটা টাইপের কী ওয়ার্ড লিখতে হবে।
- তারপর স্পেস দিয়ে ভেরিয়েবল এর নাম লিখতে হবে।
- সবশেষে সেমিকোলন দিতে হবে।
- একই টাইপের একাধিক ভেরিয়েবল ঘোষণায় ডেটা টাইপ কী ওয়ার্ডের পর একই লাইনে কমা দিয়ে ভেরিয়েবলসমূহকে আলাদা করে লিখে সবশেষে সেমিকোলন লিখতে হবে।
- ঘোষণাকৃত ভেরিয়েবল টাইপ অনুযায়ী স্টেটমেন্টে ফরমেট স্পেসিফায়ার ব্যবহার করতে হয়।

ফর্মেট :

<ডেটা টাইপ কীওয়ার্ড > <ভেরিয়েবল নাম>; অথবা,

<ডেটা টাইপ কীওয়ার্ড > <ভেরিয়েবল নাম১>, <ভেরিয়েবল নাম২>,<ভেরিয়েবল নাম১>;

ডেটা টাইপ	ব্যবহৃত কী ওয়ার্ড	উদাহরণ
Character	char	char a; char a,b,c;
Integer	int	int number; int number1,number2
Float	float	float x; float a,b,c;
Double	double	double x; double x,y,z;

৮.৫ কন্সট্যান্ট বা ধ্রুবক (Constant)

প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় কোন অবস্থাতেই যার মান পরিবর্তন করা যায় না তাকে কন্সট্যান্ট বা ধ্রুবক বলা হয়। প্রোগ্রামে কোন স্থির বা অপরিবর্তনশীল মান ব্যবহার করার জন্য কন্সট্যান্ট হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কন্সট্যান্ট প্রধানত দু'ধরনের; যথা–

১. সংখ্যা বা সংখ্যাসূচক ধ্রুবক (Numeric Constant)
২. অক্ষরমালা ধ্রুবক (Character Constant)

সংখ্যা বা সংখ্যাসূচক ধ্রুবক (Numeric Constant)

এ ধ্রুবকের মান ধনাত্মক ও ঋণাত্মক হতে পারে। ধ্রুবকে কমা ব্যবহার করা উচিৎ নয়। যেমন– দশ হাজারকে লিখতে হয় 10000। উল্লেখ্য 10,000 লেখা ভুল। C প্রোগ্রামে নিউমেরিক কন্সট্যান্টকে ইন্টিজার কন্সট্যান্ট বা পূর্ণ সংখ্যা, রিয়েল কন্সট্যান্ট বা প্রকৃত সংখ্যা বা দশমিক বিন্দুযুক্ত সংখ্যা বা ফ্লোটিং-পয়েন্ট বা এক্সপোনেন্সিয়াল গঠনের সংখ্যা, হেক্সাডেসিমাল, অকটাল প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে এদের উদাহরণ দেয়া হলো–

১. **পূর্ণ সংখ্যা ধ্রুবক (Integer constant)** : এ ধরনের ধ্রুবক ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যে কোন পূর্ণসংখ্যা হতে পারে। এ ধ্রুবকে দশমিক বিন্দু থাকে না। যেমন : 546, 45, –32 ইত্যাদি। এর মান –32768 এবং + 32767 এর মধ্যবর্তী যেকোনো পূর্ণ সংখ্যা ।
২. **ফিক্সড-পয়েন্ট ধ্রুবক (Fixed point constant)** : –28.7, 2.3, 512.5, 2.6786, -8.5 ইত্যাদি।
৩. **ফ্লোটিং-পয়েন্ট ধ্রুবক (Floating point constant)** : এ ধরনের ধ্রুবক ধনাত্মক বা ঋণাত্মক পূর্ণ বা ভগ্নাংশবিশিষ্ট সংখ্যা হতে পারে। আংশিক মানের জন্য দশমিক ব্যবহৃত হয়। যেমন : 56, 3.14 , -45.678.
৪. **অকটাল ধ্রুবক (Octal constant)** : এ ধরনের সংখ্যার পূর্বে 0 বসাতে হয়, যেমন : 0437, 01234 ইত্যাদি।

৫. **হেক্সাডেসিমেল ধ্রুবক (Hexadecimal constant)** : এ ধরনের সংখ্যার পূর্বে Ox বা OX লিখতে হয় এবং অঙ্কের চিহ্ন ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, a, b, c, d, e, f বা ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, A, B, C, D, E, F ব্যবহার করা হয়। যেমন : OxAB65, OXFE23B ইত্যাদি।

অক্ষরমালা ধ্রুবক (Character Constant)

ক্যারেক্টার বা অক্ষর দিয়ে ক্যারেক্টার কন্সট্যান্ট গঠিত হয়। এতে সাধারণত সিঙ্গেল কোটেশন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন– 'A', 'K' ইত্যাদি। বর্ণ, অঙ্ক এবং অন্যান্য চিহ্ন সাজিয়ে এ ধ্রুবক গঠিত হয়। এ ধ্রুবককে আবার বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। যথা :

১. **Single Character Constant** : Single Character Constant (Character Constant) একটি বর্ণ, যা single quote mark দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়। যেমন : 'A', '5', '<' ইত্যাদি।

২. **Staring Constant** : বর্ণ, অঙ্ক এবং অন্যান্য চিহ্ন সাজিয়ে এ ধ্রুবক গঠিত হয়। এ ধ্রুবককে সিঙ্গেল অথবা ডাবল কোটেশন দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়। স্ট্রিং কনস্ট্যান্টে 0 হতে 255টি অক্ষর থাকতে পারে। যেমন, "A", "Dhaka", , "33.72", "Bangladesh" ইত্যাদি।

৩. **Blackslash Character Constant** : C প্রোগ্রামে কিছু Blackslash Character Constant ব্যবহার করা হয়, যা আউটপুট ফাংশন হিসেবে কাজ করে। সাধারণত ব্যাকস্ল্যাশ (\) দেয়ার পর একটি ক্যারেক্টার ব্যবহার করা হয়, যা একটি নির্দিষ্ট ফাংশন হিসেবে কাজ করে। প্রতিটি ব্যাকস্ল্যাশ ক্যারেক্টার কন্সট্যান্ট আলাদা আলাদা কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন– average ভেরিয়েবলের মান নতুন লাইনে প্রদর্শন করানোর জন্য আউটপুট ফাংশন printf এর সাথে প্রোগ্রামে নিচের মতো স্টেটমেন্ট লিখতে হবে।

```
printf ("average is %f\n", average);
```

এখানে, **%f**-হলো ফরমেট স্পেসিফায়ার, যা ফ্লোটিং টাইপের ডেটা আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
\n-হলো ইস্কেপ সিকুয়েন্স, যা নতুন লাইনের শুরুতে আউটপুট প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

নিচের টেবিলে ব্যাকস্ল্যাশ ক্যারেক্টার কন্সট্যান্ট ও তাদের কাজ দেখানো হলো।

Blackslash Character Constant	Meaning
\a	audible alert (bell)
\b	back space
\f	form feed
\n	new line
\r	carriage return
\t	horizontal tab
\v	vertical tab
\'	single quote
\"	double quote
\?	question mark
\\	backslash
\0	Null
\ooo	Octal number
\xhhh	Hexadecimal number

কন্সট্যান্ট ঘোষণার নিয়ম

সি প্রোগ্রামে মোট দু'ভাবে কন্সট্যান্ট ঘোষণা করা যায়। যথা–১.const কীওয়ার্ড ব্যবহার করে এবং ২. #define প্রিপ্রসেসর ব্যবহার করে।

const কীওয়ার্ড ব্যবহার করে কন্সট্যান্ট ঘোষণার পদ্ধতি

const কীওয়ার্ড ব্যবহার করে কন্সট্যান্ট ঘোষণার ফরম্যাট হলো–

```
const ConstType ConstName = ConstValue ;
```

এখানে ConstType বলতে একটি মৌলিক বা মডিফাইড ডেটা টাইপ বুঝায়। তবে ConstType উল্লেখ না থাকলে কম্পাইলার তাকে int টাইপ হিসেবে ধরে নেয়। আর ConstName হলো প্রোগ্রামারের দেয়া কোন বৈধ নাম। উল্লেখ্য, এরূপ ঘোষণার জন্য কনস্ট্যান্ট-এর প্রারম্ভিক মান এবং শেষে সেমিকোলন দেয়া আবশ্যক।

```
const int      Max =50;
const char Ch ='a';
```

#define প্রিপ্রসেসর ব্যবহার করে কন্সট্যান্ট ঘোষণার পদ্ধতি

#define প্রিপ্রসেসর ব্যবহার করে কন্সট্যান্ট ঘোষণার ফরম্যাট হলো–

```
#define ConstName  ConstValue
```

উদাহরণ :

```
#define  Max  50
#define  TRUE  1
#define  PI   3.1415
```

এরূপ ঘোষণার জন্য কেবল কনস্ট্যান্টের নাম ও প্রারম্ভিক মান দিতে হয়। তবে কোন টাইপ উল্লেখ করতে হয় না এবং মাঝে সমান চিহ্ন ও শেষে সেমিকোলন বসে না।

কন্সট্যান্ট ব্যবহারের নিয়ম

কন্সট্যান্ট ব্যবহারের কতগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। যেমন–

১. প্রতিটি কনস্ট্যান্টের নাম থাকে।
২. কন্সট্যান্ট ঘোষণার সময়ই তার মান নির্ধারণ করে দিতে হয়।
৩. প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় কোন অবস্থাতেই মান পরিবর্তন করা যায় না।
৪. প্রয়োজনে প্রোগ্রামের যেকোন জায়গায় কন্সট্যান্ট ব্যবহার করা যায়।
৫. কনস্ট্যান্টের মান প্রদর্শনের জন্য উপযুক্ত ফরম্যাট স্পেসিফায়ার ব্যবহৃত হয়।

৮.৬ চলক (Variable)

সি ভাষায় মেমোরিতে ডেটা সংরক্ষণ করতে যে নাম ব্যবহৃত হয় তাকে চলক (Variable) বলা হয়। ভেরিয়েবল হলো মেমোরি (RAM) লোকেশনের নাম বা ঠিকানা। প্রোগ্রামে যখন কোন ডেটা নিয়ে কাজ করা হয়, প্রাথমিকভাবে সেগুলো কম্পিউটারের মেমোরিতে (র‍্যামে) রাখা হয়। এক্ষেত্রে মেমোরি অ্যাড্রেস সরাসরি ব্যবহার না করে একটি নাম দিয়ে ঐ নামের অধীনে ডেটা রাখা হয়। ঐ নামকেই ভেরিয়েবল বলা হয়। প্রতিবার প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় মেমোরিতে ভেরিয়েবলগুলো অবস্থান এবং সংরক্ষিত মান পরিবর্তন হয় বা হতে পারে বলে এদেরকে ভেরিয়েবল বা চলক বলা হয়। ব্যবহারকারীর প্রয়োজনানুযায়ী মান ব্যবহার এবং ফলাফল পেতে ভেরিয়েবল ব্যবহৃত হয়। ডেটার ধরনের উপর ভিত্তি করে সি ল্যাংগুয়েজে তিন ধরনের ভেরিয়েবল ব্যবহার করা হয়। যথা-

১. ক্যারেক্টার ভেরিয়েবল (Character Variable)
২. ইন্টিজার ভেরিয়েবল (Integer Variable)
৩. ফ্লোটিং পয়েন্ট ভেরিয়েবল (Floating Point Variable)

ক্যারেক্টার ভেরিয়েবল (Character Variable)

নাম, ঠিকানা বা যে কোন বর্ণের ক্ষেত্রে ক্যারেক্টার ভেরিয়েবল ব্যবহৃত হয়। এর জন্য ১ বাইট মেমোরি লাগে। ক্যারেক্টার টাইপের ভেরিয়েবল ঘোষণার আগে char ব্যবহৃত হয়। যেমন– char a, char x, char name, char address ইত্যাদি।

ইন্টিজার ভেরিয়েবল (Integer Variable)

পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে সি ভাষায় কাজ করার জন্য ইন্টিজার ভেরিয়েবল ব্যবহৃত হয়। এর জন্য ২ বাইট মেমোরি লাগে। ইন্টিজার টাইপের ভেরিয়েবল ঘোষণার জন্য int ব্যবহৃত হয়। যেমন– int a, int x, int salary ইত্যাদি।

ফ্লোটিং পয়েন্ট ভেরিয়েবল (Floating Point Variable)

সি ভাষায় দশমিক সংখ্যা বা প্রকৃত সংখ্যার ক্ষেত্রে ফ্লোটিং পয়েন্ট ভেরিয়েবল ব্যবহৃত হয়। এর জন্য ৪ বাইট মেমোরি লাগে। ফ্লোটিং পয়েন্ট টাইপের ভেরিয়েবল ঘোষণার জন্য float ব্যবহৃত হয়। যেমন– float a, float x, float salary ইত্যাদি।

ডিক্লারেশনের উপর ভিত্তি করে ভেরিয়েবলের প্রকারভেদ

ডিক্লারেশনের উপর ভিত্তি করে ভেরিয়েবলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. লোকাল ভেরিয়েবল (Local Variable)
২. গ্লোবাল ভেরিয়েবল (Global Variable)

১. লোকাল ভেরিয়েবল (Local Variable)

কোন ফাংশনের মধ্যে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলে তাকে উক্ত ফাংশনের লোকাল ভেরিয়েবল বলা হয়। কোন ফাংশনের মধ্যে ডিক্লেয়ার করা লোকাল ভেরিয়েবল উক্ত ফাংশনের বাইরে ব্যবহার করা যায় না। লোকাল ভেরিয়েবলের কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ফাংশনেই সীমাবদ্ধ থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ফাংশনে একই নামের লোকাল ভেরিয়েবল থাকতে পারে।

২. গ্লোবাল ভেরিয়েবল (Global Variable)

সকল ফাংশনের বাইরে প্রোগ্রামের শুরুতে ডিক্লেয়ার করা ভেরিয়েবলকে গ্লোবাল ভেরিয়েবল বলা হয়। গ্লোবাল ভেরিয়েবল সাধারণত প্রোগ্রামের শুরুতেই ডিক্লেয়ার করা হয়। গ্লোবাল ভেরিয়েবলের কর্মকাণ্ড কোন ফাংশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বলে একে গ্লোবাল ভেরিয়েবল বলা হয়।

লোকাল ভেরিয়েবল ও গ্লোবাল ভেরিয়েবল–এর মধ্যে পার্থক্য

লোকাল ভেরিয়েবল	গ্লোবাল ভেরিয়েবল
১. কোন ফাংশনের মধ্যে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলে তাকে উক্ত ফাংশনের লোকাল ভেরিয়েবল বলা হয়।	১. সকল ফাংশনের বাইরে প্রোগ্রামের শুরুতে ডিক্লেয়ার করা ভেরিয়েবলকে গ্লোবাল ভেরিয়েবল বলা হয়।
২. যে ফাংশনের মধ্যে ডিক্লেয়ার করা হয় তা উক্ত ফাংশনের বাইরে ব্যবহার করা যায় না।	২. গ্লোবাল ভেরিয়েবলের কার্যক্রম কোন ফাংশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অর্থাৎ পুরো প্রোগ্রামের জন্য প্রযোজ্য।
৩. ভিন্ন ভিন্ন ফাংশনে একই নামের লোকাল ভেরিয়েবল থাকতে পারে।	৩. একটি প্রোগ্রামে একই নামের একটি মাত্র গ্লোবাল ভেরিয়েবল থাকতে পারে।
৪. ফাংশনের শুরুতে লিখতে হয়।	৪. প্রোগ্রামের শুরুতে লিখতে হয়।

ভেরিয়েবল নামকরণের নিয়ম

প্রোগ্রামের শুরুতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভেরিয়েবল ঘোষণা করে প্রোগ্রামের পরবর্তী অংশে সেগুলো ব্যবহার করতে হয়। তবে ভেরিয়েবল তৈরি (ঘোষণা) এবং নামকরণের মধ্যে কিছু মৌলিক সীমাবদ্ধতা ও নিয়ম-কানুন রয়েছে। নিম্নে সেগুলোর কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

১. ভেরিয়েবলের প্রথম অক্ষরটি অবশ্যই বর্ণ (a,..,z, A,..,Z) হতে হবে।
২. ভেরিয়েবলের প্রথম অক্ষরটির পরে ভেরিয়েবল নামকরণে কেবল আলফাবেটিক ক্যারেক্টার (a,..,z, A,..,Z), ডিজিট (0,..,9) এবং আন্ডারস্কোর (_) ও ডলার চিহ্ন ($) ব্যতীত অন্য কোন ক্যারেক্টার ব্যবহার করা যায় না।

৩. একই ফাংশনে একই নামে দুই বা ততোধিক ভেরিয়েবল ঘোষণা করা যায় না।
৪. ভেরিয়েবল নামের মধ্যে কোন ফাঁকা স্থান থাকতে পারে না।
৫. ভেরিয়েবল নাম ডিজিট বা অঙ্ক দিয়ে শুরু হতে পারে না।
৬. ভেরিয়েবলের নামকরণে ইংরেজি ছোট এবং বড় হাতের অক্ষরগুলো আলাদা অর্থ বহন করে। তাই MyRoll নামে ভেরিয়েবল ঘোষণা করে একে আবার Myroll নামে ব্যবহার করা যায় না।
৭. কোন কীওয়ার্ড, ফাংশন, স্টেটমেন্ট, রিজার্ভড ওয়ার্ড ইত্যাদির নাম ভেরিয়েবল হিসেবে ব্যবহার করা যায় না।
৮. ভেরিয়েবল নামকরণে সর্বাধিক ৩১ ক্যারেক্টার ব্যবহার করা যায়।

কয়েকটি বৈধ ও অবৈধ ভেরিয়েবলের উদাহরণ

কয়েকটি বৈধ ও অবৈধ ভেরিয়েবলের উদাহরণ নিম্নরূপ –

অবৈধ ভেরিয়েবলের উদাহরণ	কারণ	শুদ্ধরূপ
int 5X;	বর্ণ দিয়ে শুরু হয়নি।	int X5;
int "Roll";	কোটেশন হবে না।	int Roll;
int main;	**main** ব্যবহার করা যাবে না।	int Main;
int Roll-10;	- চিহ্নের ব্যবহার বৈধ নয়।	int Roll_10;
float Marks 10;	মাঝে ফাঁকা থাকবে না।	float Marks10;

সি ল্যাংগুয়েজে কন্সট্যান্ট ও ভেরিয়েবল–এর মধ্যে পার্থক্য

কনস্ট্যান্ট (Constant)	ভেরিয়েবল (Variable)
১. কন্সট্যান্ট একটি নির্দিষ্ট মান ধারণ করে।	১. ভেরিয়েবল হলো ডেটা রাখার জন্য মেমোরিতে লোকেশনের অ্যাড্রেস।
২. কন্সট্যান্ট কমা ব্যবহার করা যায় না, তবে প্রয়োজনে দশমিক ব্যবহার করা যায়।	২. ভেরিয়েবলের মান নির্ধারণ করার সময় সংখ্যার মধ্যে কমা ব্যবহার করা যাবে।
৩. প্রোগ্রাম চালানোর সময় কন্সট্যান্ট–এর মান পরিবর্তন করা যায় না।	৩. প্রোগ্রাম চালানোর সময় ইচ্ছেমত ভেরিয়েবল–এর মান পরিবর্তন করা যায় ।
৪. প্রোগ্রামে কম ব্যবহার করা হয়।	৪. প্রোগ্রামে চলক সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।
৫. উদাহরণ : const int a=55;	৫. উদাহরণ : int a;

৮.৭ অপারেটর (Operator)

সি ভাষায় গাণিতিক এবং যৌক্তিক কাজ করার জন্য যে সকল চিহ্ন (যেমন, +, -, *, /, <, > ইত্যাদি) ব্যবহৃত হয়, তাকে অপারেটর বলা হয়। নিচে বিভিন্ন ধরনের অপারেটর সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

সি ল্যাংগুয়েজে অপারেটরকে আট ভাগে ভাগ করা যায়। যথা –

১. অ্যারিথমেটিক অপারেটর (Arithmetic Operator)
২. রিলেশনাল অপারেটর (Relational Operator)
৩. লজিক্যাল অপারেটর (Logical Operator)
৪. কন্ডিশনাল অপারেটর (Conditional Operator)
৫. ইনক্রিমেন্ট এবং ডিক্রিমেন্ট অপারেটর (Increment and Decrement Operator)
৬. স্পেশাল অপারেটর (Special Operator)
৭. বিটওয়াইজ অপারেটর (Bitwise Operator)
৮. এসাইনমেন্ট অপারেটর (Assignment Operator)

এ্যারিথমেটিক অপারেটর (Airthmetic Operator)

সি প্রোগ্রামে বিভিন্ন গাণিতিক কাজ (যেমন: যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি) সম্পন্ন করার জন্য যেসব সিম্বল বা অপারেটর ব্যবহৃত হয় তাদেরকে অ্যারিথমেটিক অপারেটর বলা হয়। নিম্নের ছকে বহুল ব্যবহৃত অ্যারিথমেটিক অপারেটরসমূহের তালিকা এবং ব্যবহার উল্লেখ করা হলো।

অপারেটর	ব্যবহার	উদাহরণ	ফলাফল
() (প্যারেনথিসিস)	একাধিক অপারেন্ডের গ্রুপ তৈরির জন্য।	(15/5+6*2-5)-7	3
/ (ডিভিশন)	ভাগ করার জন্য।	81/9	9
* (মাল্টিপ্লিকেশন)	গুণ করার জন্য।	7*6	42
% (মডিউলো)	ভাগশেষ (অবশিষ্ট) নির্ণয় করার জন্য।	20%6	2
+ (বাইনারি প্লাস)	যোগ করার জন্য।	8+5+2.75	15.75
-(বাইনারি মাইনাস)	বিয়োগ করার জন্য।	9-5	4

রিলেশনাল অপারেটর (Relational Operator)

সি প্রোগ্রামে দু'টো অপারেন্ডের মধ্যে সম্পর্ক (যেমন : ছোট, ছোট বা সমান, বড়, বড় বা সমান ইত্যাদি) বোঝানোর জন্য যে অপারেটর ব্যবহৃত হয়, তাকে রিলেশনাল অপারেটর বলা হয়। বস্তুত এই অপারেটর সংশ্লিষ্ট দুই অপারেন্ডের মধ্যে তুলনা করে ফলাফল সত্য/মিথ্যা হিসেবে জানিয়ে দেয়।

নিম্নের ছকে বহুল ব্যবহৃত রিলেশনাল অপারেটরসমূহের তালিকা এবং ব্যবহার উল্লেখ করা হলো।

অপারেটর	অর্থ
<	Less than (ছোট)
<=	Less than or equal (ছোট বা সমান)
>	Greater than (বড়)
>=	Greater than or equal (বড় বা সমান)
==	Equal to (সমান)
!=	Not equal to (অসমান)

লজিক্যাল অপারেটর (Logical Operator)

সি প্রোগ্রামে লজিক্যাল অপারেশন (যেমন– লজিক্যাল অর, লজিক্যাল অ্যান্ড, লজিক্যাল নট) সম্পন্ন করার জন্য যে অপারেটর ব্যবহৃত হয় তাকে লজিক্যাল অপারেটর বলা হয়। নিম্নের ছকে বহুল ব্যবহৃত লজিক্যাল অপারেটরসমূহের তালিকা এবং ব্যবহার উল্লেখ করা হলো।

অপারেটর	উদাহরণ	ব্যবহার
|| (লজিক্যাল অর)	Op1=Op2)|| Op3;	দু'টি অপারেন্ডের মধ্যে লজিক্যাল OR অপারেশনের জন্য।
&& (লজিক্যাল অ্যান্ড)	Op1=Op2&&Op3;	দু'টি অপারেন্ডের মধ্যে লজিক্যাল AND অপারেশনের জন্য।
! (*লজিক্যাল নট)	Op1=!Op2;	কোন অপারেন্ডের লজিক্যাল NOT অপারেশনের জন্য।

লজিক্যাল অর এবং লজিক্যাল অ্যান্ড অপারেটর হলো বাইনারি অপারেটর এবং এদের উভয় অপারেন্ড int টাইপ হয়। লজিক্যাল অর (||) এবং লজিক্যাল অ্যান্ড (&&) এর জন্য দু'টি করে অপারেন্ড থাকে, কিন্তু লজিক্যাল নট (!) এর জন্য একটি অপারেন্ড থাকে। এজন্য লজিক্যাল নট (!) একটি ইউনারি অপারেটর।

কন্ডিশনাল অপারেটর (Conditional Operator)

সি প্রোগ্রামে শর্ত সাপেক্ষে কোন ভেরিয়েবল বা এক্সপ্রেশনের মান অন্য কোন ভেরিয়েবল বা এক্সপ্রেশনের মান হিসেবে নির্ধারণ করার জন্য কন্ডিশনাল অপারেটর (?:) ব্যবহৃত হয়। কন্ডিশনাল অপারেটর ব্যবহারের ফরম্যাট হলোঃ

```
                True
Exp1  = ( Test Condition) ?     Exp2 : Exp3;
                False
```

উপরের স্টেটমেন্টে প্রথমে Test Condition পরীক্ষিত হবে; এই মান সত্য বা অশূন্য হলে Exp1 = Exp2 নির্ধারিত বা সম্পাদিত হবে, আর এই মান মিথ্যা বা শূন্য হলে Exp1=Exp3 নির্ধারিত বা সম্পাদিত হবে। উল্লেখ্য, কন্ডিশনাল অপারেটরের ক্ষেত্রে কেবল Exp2 অথবা Exp3 সম্পাদিত হয়; কখনোই Exp2 এবং Exp3 উভয় সম্পাদিত হয় না।

ইনক্রিমেন্ট এবং ডিক্রিমেন্ট অপারেটর (Increment and Decrement Operator)

ইনক্রিমেন্ট অপারেটর (Increment Operator) : প্রোগ্রামে কখনও কখনও ভেরিয়েবলের মান একটা নির্দিষ্ট ইনক্রিমেন্ট বাড়াতে হয়। ভেরিয়েবলের মানকে বর্ধিত (Increment) করার জন্যই মূলত ইনক্রিমেন্ট অপারেটর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই বর্ধিতকরণ 1 থেকে শুরু করে যে কোন মান হতে পারে। যেমন : x = x + 1; x = x + 2, x = x + 3 ইত্যাদি। ইনক্রিমেন্টের মান 1 করে বর্ধিত করার জন্য সি এর স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট অপারেটর যেমন ++ ব্যবহার করা হয়, যার সাধারণ গঠন (General Syntex) হলো :

variable ++ বা ++ variable;

প্রথমটিকে Postfix ইনক্রিমেন্ট আর দ্বিতীয়টিকে Prefix ইনক্রিমেন্ট বলা হয়। সাধারণত while, for ইত্যাদি লুপিং এর ক্ষেত্রে এ ধরনের ইনক্রিমেন্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অবশ্য Postfix এবং Prefix এর সাথে আলাদা আলাদা অর্থ প্রকাশ করে। যেমন ঃ i = 4 এবং j = + +i; এ ক্ষেত্রে i এবং j উভয়ের মান হবে 5 আবার যদি j = + +i; লেখা হয় তাহলে i এর মান হবে 5 কিন্তু j এর মান হবে 4.

অর্থাৎ, Prefix প্রথমে বাম প্রান্তের variable এর সাথে 1 যোগ করে, তারপর ফলাফলকে বাম প্রান্তে ভেরিয়েবল দ্বারা অ্যাসাইন করে। অপরদিকে Postfix প্রথমে বাম প্রান্তের variable এর মান অ্যাসাইন করে, তারপর অপারেন্ডের মান 1 বর্ধিত করে।

variable ++ অথবা i++ এবং ++ variable অথবা ++i এর মধ্যে পার্থক্য

variable ++ অথবা i++	++ variable অথবা ++i
১. একে Postfix বলা হয়।	১. একে Prefix বলা হয়।
২. Postfix প্রথমে বাম প্রান্ত variable এর মান অ্যাসাইন করে, তারপর অপারেন্ডের মান 1 বর্ধিত করে।	২. Prefix প্রথমে Operand এর সাথে 1 যোগ করে, তারপর ফলাফলকে বাম প্রান্তে ভেরিয়েবল দ্বারা অ্যাসাইন কর।
৩. উদাহরণ ঃ i = 4 এবং j = + +i; এ ক্ষেত্রে i এবং j উভয়ের মান হবে 5	৩. উদাহরণ ঃ i = 4 এবং j = + +i; এ ক্ষেত্রে i এর মান হবে 5 কিন্তু j এর মান হবে 4

ডিক্রিমেন্ট অপারেটর (Decrement Operator) : ইনক্রিমেন্ট অপারেটরের বিপরীতে কাজ করে ডিক্রিমেন্ট অপারেটর। অর্থাৎ ভেরিয়েবলের মানকে হ্রাস (Decrement) করার জন্যই মূলত ডিক্রিমেন্ট অপারেটর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই হ্রাসকরণ 1 থেকে শুরু করে যে কোন মান হতে পারে। যেমন : x = x-1;x = x-2; x = x-3 ইত্যাদি। ডিক্রিমেন্টের মান 1 করে হ্রাস করার জন্য সি এর স্পেশাল ডিক্রিমেন্ট অপারেটর ব্যবহার করা হয়, যার সাধারণ গঠন (General Syntax) হলো :

variable – or – variable;

প্রথমটিকে prosfix ডিক্রিমেন্ট এবং দ্বিতীয়টিকে prefix ডিক্রিমেন্ট বলা হয়। সাধারণত for, while লুপিং এর ক্ষেত্রে এ ধরনের ডিক্রিমেন্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

স্পেশাল অপারেটর (Special Operator)

সি প্রোগ্রামে বহুল ব্যবহৃত আরও কিছু অপারেটর হলো কমা অপারেটর (,), সাইজ অফ অপারেটর (sizeof), পয়েন্টার অপারেটর (& এবং *) এবং মেম্বার সিলেকশন অপারেটর (.এবং->)। এদের মধ্যে অন্যতম অপারেটর হলো কমা অপারেটর (,) ও সাইজ অফ অপারেটর (sizeof)।

কমা অপারেটর (Comma Operator) : একই ধরনের একাধিক এক্সপ্রেশনকে সংযুক্ত বা আলাদা করতে কমা অপারেটর ব্যবহৃত হয়। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে কমা অপারেটরের ব্যবহার দেখানো হলো–

এক্সপ্রেশন	কমা অপারেটর ব্যবহার করে সমতুল্য এক্সপ্রেশন
int x = 5; y = 6; int z = 7;	int x =5, y=6, z=7;
int i; int j = 10; for (i=I; i<=j; i+ +)	int i,j; for (j=10;i-I; i<j; i++)

বিটওয়াইজ অপারেটর (Bit Wise Operator)

সি প্রোগ্রামে বাইনারি ডেটা অর্থাৎ বিট/বাইট নিয়ে বিভিন্ন রকম যৌক্তিক অপারেশন যেমন : অর, এন্ড, নট, এক্স-অর, লেফ্‌ট শিফ্‌ট, রাইট শিফ্‌ট ইত্যাদি সম্পন্ন করার জন্য বিটওয়াইজ অপারেটর ব্যবহৃত হয়। এদের মধ্যে বিটওয়াইজ নট হলো ইউনারি অপারেটর, অন্যগুলো বাইনারি অপারেটর। নিম্নের টেবিলের মাধ্যমে বিটওয়াইজ অপারেটরসমূহের নাম ও ব্যবহার উল্লেখ করা হলো :

বিটওয়াইজ অপারেটর	ব্যবহার
| (বিটওয়াইজ অর)	দু'টি অপারেন্ডের বিটসমূহের মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় অর (OR) অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
& (বিটওয়াইজ অ্যান্ড)	দু'টি অপারেন্ডের বিটসমূহের মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় অ্যান্ড (AND) অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
^ (বিটওয়াইজ এক্স-অর)	দু'টি অপারেন্ডের বিটসমূহের মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় এক্সক্লুসিভ অর (X-OR) অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
<< (বিটওয়াইজ লেফ্‌ট শিফ্‌ট)	কোনো অপারেন্ডের বাইনারি বিটসমূহকে এক বা একাধিক ঘর বামদিকে সরানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।
>> (বিটওয়াইজ রাইট শিফ্‌ট)	কোনো অপারেন্ডের বাইনারি বিটসমূহকে এক বা একাধিক ঘর ডানদিকে সরানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।
~ (বিটওয়াইজ নট)	কোনো অপারেন্ডের বিটগুলোকে বিপরীত (inverse) করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

টেবিল : বিটওয়াইজ অপারেটর ও তাদের ব্যবহার

উল্লেখ্য, বিটওয়াইজ অপারেটর কেবল int টাইপের ডেটা নিয়ে কাজ করে। বিটওয়াইজ অপারেশনের পূর্বে কম্পাইলার উভয় অপারেন্ডের মান বাইনারিতে পরিবর্তন করে এবং অপারেন্ড দুইটির ডান দিক থেকে জোড়ায় জোড়ায় (বিট বাই বিট) অপারেশন সম্পন্ন করে।

বিটওয়াইজ অর, অ্যান্ড এবং নট ইত্যাদি অপারেশনের ফলাফল যথাক্রমে লজিক্যাল অর, অ্যান্ড, নট ইত্যাদি গেটের অনুরূপ, তবে এদের মধ্যে একটু ভিন্নতা আছে। যেমন : Op1 = 2 এবং Op2 = 4 হলে লজিক্যাল অর অপারেশনের মান 1; কিন্তু বিটওয়াইজ অর অপারেশনের মান 6। আবার এদের লজিক্যাল অ্যান্ড অপারেশনের মান 1; কিন্তু বিটওয়াইজ অ্যান্ড অপারেশনের মান 0 (শূন্য)।

Op1	Op2	লজিক্যাল অপারেশন	ফলাফল	Op1	Op2	বিটওয়াইজ অপারেশন	ফলাফল
2	4	Op1 || Op2	1	2	4	Op1 | Op2	6
2	4	Op1 && Op2	1	2	4	Op1 & Op2	0

চিত্র : লজিক্যাল ও বিটওয়াইজ অপারেশনের তুলনা

অনুরূপভাবে বিটওয়াইজ নট অপারেশন এবং লজিক্যাল নট অপারেশনের মধ্যে ভিন্নতা আছে। বিটওয়াইজ নট অপারেশনের আগে কম্পাইলার অপারেন্ডের মান বাইনারিতে পরিবর্তন করে এবং প্রতিটি বিটের জন্য বাইনারি নট অপারেশন সম্পন্ন করে। অতপর দশমিক সংখ্যায় ফলাফল প্রকাশ করে। কিন্তু লজিক্যাল নট অপারেশনে ব্যবহৃত অপারেন্ডের মান শূন্য (0) হলে কম্পাইলার এক্সপ্রেশনের ফলাফল এক (1) ধরে, আর অপারেন্ডের মান শূন্য না হলে এক্সপ্রেশনের ফলাফল শূন্য (0) ধরে।

আবার, লেফ্‌ট শিফট অপারেশনের পূর্বে কম্পাইলার << এর বাম দিকের অপারেন্ডের মান বাইনারিতে পরিবর্তন করে। অতঃপর ডান দিকের অপারেন্ডের মান অনুযায়ী বিটগুলো এক এক করে বামদিকে সরিয়ে ডানদিকের ফাঁকা স্থান শূন্য দ্বারা পূর্ণ করে। অর্থাৎ, প্রতিবারে লেফ্‌ট শিফ্‌ট অপারেশনে কোন সংখ্যার মান দ্বিগুণ হয়। বিপরীতক্রমে, রাইট শিফ্‌ট অপারেশনের পূর্বে কম্পাইলার >> এর বাম দিকের অপারেন্ডের মান বাইনারিতে পরিবর্তন করে, অতঃপর ডান দিকের অপারেন্ডের মান অনুযায়ী বিটগুলো এক এক করে ডানদিকে সরিয়ে বাম দিকের ফাঁকা স্থান শূন্য (0) দ্বারা পূর্ণ করে। অর্থাৎ প্রতিবার রাইট শিফট অপারেশনে কোন সংখ্যার মান অর্ধেক হয়।

অপারেন্ড	লেফ্‌ট শিফ্‌ট অপারেশনের মান			রাইট শিফ্‌ট অপারেশনের মান		
	১ম শিফ্‌ট	২য় শিফ্‌ট	৩য় শিফ্‌ট	১ম শিফ্‌ট	২য় শিফ্‌ট	৩য় শিফ্‌ট
a = 2	a<<1=4	a<<2=8	a<<3=16	a>>1=1	a>>2=0	a>>3=0
b = 4	b<<1=8	b<<2=16	b<<3=32	b>>1=2	b>>2=1	b>>3=0

চিত্র : কয়েকটি লেফ্‌ট শিফট ও রাইট শিফ্‌ট অপারেশনের ফলাফল

অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর (Assignment Operator)

সি প্রোগ্রামে একটি ভেরিয়েবল বা এক্সপ্রেশনের মান অন্য কোনো ভেরিয়েবল বা এক্সপ্রেশনের মান হিসেবে নির্ধারণ করতে যে অপারেটর ব্যবহার করা হয় তাকে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর বলা হয়। সাধারণত অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর হিসেবে '=' চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন : x=5, factorial = 0। এখানে x ও factorial হলো ভেরিয়েবলের নাম যাদেরকে যথাক্রমে 5 এবং 0 দিয়ে অ্যাসাইন্ট করা হয়েছে। আবার, C ভাষায় Short hand assignment operator ও ব্যবহৃত হয়। যেমন :

x = x+1	x+=1
x = x-1	x- = 1
x = x*y	x*= y
x = x/y	x/ = y
x = x% y	x% = y

টেবিল : সি এর Short hand assignment operators

৮.৮ এক্সপ্রেশন (Expression)

কতগুলো অপারেন্ড, অপারেটর এবং কনস্ট্যান্টের অর্থবোধক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ উপস্থাপনকে এক্সপ্রেশন বা বর্ণনা বলা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, Avg=(V1+V2)/2; একটি এক্সপ্রেশন। এখানে Avg, V1, V2 ও 2 অপারেন্ড এবং/, = ও + অপারেটর। কতগুলো অপারেন্ড, কনস্ট্যান্টের এবং অ্যারিথমেটিক অপারেটরের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপস্থাপন বা সম্পর্ককে অ্যারিথমেটিক বা গাণিতিক এক্সপ্রেশন বলা হয়।

উদাহরণ : Avg = (V1+V2)/2; একটি গাণিতিক এক্সপ্রেশন। এখানে Avg, V1, V2 অপারেন্ড, 2 কনস্ট্যান্ট এবং =, +, / গাণিতিক অপারেটর।

সি-তে গাণিতিক ফর্মুলাকে সমতুল্য এক্সপ্রেশনে রূপান্তরের পদ্ধতি

সি-তে গাণিতিক ফর্মুলাকে সমতুল্য এক্সপ্রেশনে রূপান্তরের ক্ষেত্রে বিশেষ কতগুলো নিয়ম ব্যবহৃত হয়। যেমন– a^2 কে a* a হিসেবে লেখা হয়, 2ab কে 2*a*b হিসেবে লেখা হয়, $x \le y$ কে x <= y হিসেবে লেখা হয়, $x \ne y$ কে x != y হিসেবে লেখা হয় ইত্যাদি। নিম্নের ছকে গাণিতিক এক্সপ্রেশন এবং তাদের সমতুল্য সি এক্সপ্রেশন দেয়া হলো।

গাণিতিক এক্সপ্রেশন	সমতুল্য সি এক্সপ্রেশন
$x = a^2 + 2ab + b^2$	x = a*a + 2*a*b + b*b ;
$y = ax^2 + bx + c$	y = a*x*x + b*x + c ;
$d = \sqrt{(b^2 - 4ac)}/2a$	d = sqrt(b*b–4*a*c)/(2*a);
$\sqrt{(3a^2 + 6b^2)}$	sqrt(3*a*a + 6*b*b)
$d = x \div y$	d = x/y;
$a + \frac{b}{\lvert m-n \rvert}$	a+b/abs(m-n)
r = x mod y	r = x%y;
for(x = y)	for(x == y)
for(x ≠ y)	for(x != y)
for(x ≤ y)	for(x <= y)
for(x ≥ y)	for(x >= y)
for x =1 to 10, x=x+1	for(x=1; x<=10; x=x+1)
for x =10 to 1 ,x=x-1	for(x=10; x>=1; x=x-1)
$Area = \pi r^2 + 2\pi rh$	Area=π*r*r+2*π*r*h

উদাহরণ—১

$a^2+2ab+b^2$ সমীকরণকে সি এক্সপ্রেশনে রূপান্তর

$a^2+2ab+b^2$= a * a + 2 * a * b + b * b

উদাহরণ—২

Area = $\pi r^2 + 2\pi rh$ সমীকরণটিকে গাণিতিক এবং সি এক্সপ্রেশনে রূপান্তর

Area = $\pi r^2 + 2\pi rh$ বা, Area = π * r * r + 2 * π * r * h → সি এক্সপ্রেশন

Area = π × r × r + 2 × π × r × h → গাণিতিক এক্সপ্রেশন

উদাহরণ—৩

কয়েকটি গাণিতিক এক্সপ্রেশনের সি এক্সপ্রেশন :

গাণিতিক এক্সপ্রেশন	সি এক্সপ্রেশন
ক. $(a + b)^2$ →	ক. (a + b)* (a + b)
খ. $a^2 - b^2$ →	খ. a*a – b* b
গ. (a + b) (a – b) →	গ. (a + b)*(a – b)
ঘ. $a^3 + b^3$ →	ঘ. a*a*a + b*b*b
ঙ. $a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$ →	ঙ. a*a*a – b*b*b – 3*a*b*(a – b)
চ. $(a + b)^2 - (a - b)^2$ →	চ. (a + b)*(a + b) – (a – b)*(a – b)

উদাহরণ—৪

(ক) 81/9/9=? (খ) 4*(3+8)=? (গ) 3*3*3=? (ঘ) 3*2*2/4+3=?

(ঙ) 36/(2*(3*3))=? (চ) 4*2*2/8=? (ছ) 6/2+7-3*3=?

উত্তর : (ক) 1 (খ) 44 (গ) 27 (ঘ) 6 (ঙ) 2 (চ) 2 (ছ) 1

উদাহরণ–৫ : Pow((6/2+4/2),(13 MOD 5))–4*2+7 হিসাবটি সি প্রোগ্রামে সম্পন্ন কর।

সমাধান :

Pow((6/2+4/2),(13 MOD 5))-4*2+7
= Pow((3+2),(3))-8+7
= Pow((5,3)-1 = 25-1
= 24

এখানে pow() হলো পাওয়ার ফাংশন। pow(4, 2) = 4 × 4 = 16
pow(4, 3) = 4 × 4 × 4 = 64
pow(4, 4) = 4 × 4 × 4 × 4 = 256
এখানে mod হলো মডিউলাস অর্থাৎ ভাগশেষ।
mod(14, 3) = 14 ÷ 3 = 2 (ভাগশেষ)

উদাহরণ–৬ : Pow((15/3–9/3),(17 MOD 5))–4+3*2+7 হিসাবটি সি প্রোগ্রামে সম্পন্ন কর।

সমাধান :

Pow((15/3–9/3),(17 MOD 5)) – 4 + 3*2 + 7
= Pow((5 – 3),(2)) – 4 + 6 + 7 = Pow((2,2) – 4 + 13 = 4 – 4 + 13 = 13

উদাহরণ–৭ : 49/7–Pow((18/3 –3/3), (14 MOD 4)) –5 + 2*2 + 9 হিসাবটি সি প্রোগ্রামে সম্পন্ন কর।

সমাধান :

49/7 – Pow((18/3 –3/3), (14 MOD 4)) – 5 + 2*2 + 29
= 7– Pow((6 – 1),(2)) – 5 + 4 + 29 = 7 – Pow((5, 2) – 5 + 33 = 7 – 25 – 5 + 33 = 40 – 30 = 10

৮.৯ কীওয়ার্ড (Keyword)

কীওয়ার্ড হলো প্রোগ্রামে ব্যবহৃত কতগুলো সংরক্ষিত বিশেষ শব্দ। প্রত্যেকটি কীওয়ার্ডের একটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে এবং প্রোগ্রামে একটি নির্দিষ্ট কার্যসম্পাদন করে। কীওয়ার্ডগুলো প্রচলিত অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে এবং কম্পাইলার যখন কোন প্রোগ্রাম কম্পাইল করে তখন কীওয়ার্ড-এর জন্য কিছু পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রাম কোড উৎপন্ন করে। কীওয়ার্ডসমূহ ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। এর সামান্য ব্যতিক্রম হলে প্রোগ্রাম ভুল ফলাফল দিতে পারে। নিম্নে কীওয়ার্ড ব্যবহারের কয়েকটি নিয়ম উল্লেখ করা হলো।

- কীওয়ার্ডসমূহের নাম একটি একক শব্দ বা ওয়ার্ডে হয়, অর্থাৎ মাঝে কোন ফাঁকা স্থান থাকে না।
- কীওয়ার্ডসমূহের প্রতিটি বর্ণ ছোট হাতের হয়, অর্থাৎ কীওয়ার্ডের নাম লিখতে ইংরেজি বড় হাতের অক্ষর ব্যবহার করা যায় না।
- কখনও যদি দু'টো কীওয়ার্ড একত্রে ব্যবহৃত হয়, তবে মাঝে ফাঁকা স্থান থাকে ইত্যাদি।

ভেরিয়েবল এবং কীওয়ার্ড–এর মধ্যে পার্থক্য

ভেরিয়েবল হলো প্রোগ্রামার কর্তৃক প্রদত্ত মেমোরি লোকেশনের নাম, যেখানে প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় পরিবর্তনশীল মান বা ডেটা সংরক্ষণ করা হয়। আর কীওয়ার্ড হলো নির্দিষ্ট অর্থপূর্ণ কোন ওয়ার্ড, যা প্রোগ্রামে একটি নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করে এবং প্রোগ্রাম কম্পাইলের সময় পূর্বনির্ধারিত কিছু প্রোগ্রাম কোড উৎপন্ন হয়। ভেরিয়েবলের নাম হিসেবে কোন কীওয়ার্ড ব্যবহার করা যায় না।

কীওয়ার্ডকে ভেরিয়েবল হিসেবে ব্যবহার করা যায় না কেন?

প্রত্যেকটি কীওয়ার্ডের একটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে এবং প্রোগ্রামে একটি নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করে এবং প্রোগ্রাম কম্পাইলের সময় প্রতিটি কীওয়ার্ড-এর জন্য পূর্বনির্ধারিত কিছু প্রোগ্রাম কোড উৎপন্ন হয়। এজন্য কীওয়ার্ডকে ভেরিয়েবল হিসেবে ব্যবহার করা যায় না।

সি প্রোগ্রামে ব্যবহৃত কীওয়ার্ডসমূহ

স্ট্যান্ডার্ড সি-তে ব্যবহারের জন্য মোট ৪৭টি কীওয়ার্ড আছে। নিম্নের ছকে সি ভাষায় ব্যবহৃত কীওয়ার্ডসমূহের তালিকা দেয়া হলো। তবে সাধারণ প্রোগ্রামে এগুলো সব ব্যবহৃত হয় না।

auto	else	int	signed
break	enum	interrupt	sizeof
case	_es	_loadds	_ss
cdecl	extern	long	static
char	export	near	struct
const	far	pascal	signed
continue	_fastcall	int	switch
_cs	float	register	typedef
default	for	return	union
do	goto	_saveregs	void
double	huge	_seg	volatile
_ds	if	short	while

৮.১০ স্টেটমেন্ট (Statement)

প্রোগ্রামে কোন এক্সপ্রেশন কিংবা ফাংশনের শেষে যখন সেমিকোলন (;) দেয়া হয়, তখন সি এর ভাষায় একে সাধারণত স্টেটমেন্ট বলা হয়। সি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামে অনেকগুলো স্টেটমেন্ট-এর সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং স্টেটমেন্টসমূহ ধারাবাহিকভাবে সাজানো থাকে। স্টেটমেন্ট দুই ধরনের হতে পারে। যথা– ইনপুট স্টেটমেন্ট ও আউটপুট স্টেটমেন্ট।

ইনপুট স্টেটমেন্ট (Input Statement)

সি প্রোগ্রামে Standard 1/O লাইব্রেরি ফাংশন রয়েছে, যা সকল ধরনের ইনপুট/আউটপুটের কাজ সম্পন্ন করে। প্রোগ্রামে ডেটা তথা ভেরিয়েবলের মান গ্রহণ করার জন্য ব্যবহৃত স্টেটমেন্টকে ইনপুট স্টেটমেন্ট বলা হয়। কী বোর্ড থেকে স্ট্রিং জাতীয় ডেটা ইনপুটের জন্য সি-তে কয়েক ধরনের স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়। যথা– scanf() ,getc(), gets(), getchar(). সি ল্যাংগুয়েজে তিন ধরনের ব্যবস্থার মাধ্যমে ডেটা ইনপুট দেয়া যেতে পারে। যথা–

১. অ্যাসাইনমেন্ট স্টেটমেন্ট (Assignment Statement)
২. ফরমেটেড ইনপুট (Formated Input)
৩. রিডিং এ ক্যারেক্টার (Reading a character)

অ্যাসাইনমেন্ট স্টেটমেন্ট (Assignment Statement)

ডেটাকে সরাসরি ভেরিয়েবলে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। যেমন–

bang = 76 eng = 84

এ দুটি ভেরিয়েবলে নির্দিষ্ট মানের যোগফল বের করার জন্য নিচের মতো প্রোগ্রাম রচনা করা যায়।

ফরমেটেড ইনপুট scanf () ফাংশন

এটি একটি বহুল ব্যবহৃত ইনপুট স্টেটমেন্ট। প্রোগ্রাম রান করার সময় ব্যবহারকারীর নিকট থেকে প্রয়োজনীয় ডেটা নেয়ার জন্য scanf () ফাংশনটি ব্যবহৃত হয়। এর সাহায্যে int, char, float ইত্যাদি টাইপের ডেটা ইনপুট করা যায়। এর জন্য stdio.h লাইব্রেরি ফাংশন প্রোগ্রামে সংযুক্ত করতে হয়। নিম্নে scanf () ফাংশন ব্যবহারের সিনট্যাক্স দেয়া হলো–

```
scanf (æControl String ", &VariableName);
```

- Control String হলো ফরম্যাট স্পেসিফায়ার, যা কোন টাইপের ডেটা ইনপুট করবে তা নির্দেশ করে।
- Variable Name হলো পূর্বে ঘোষিত কোন ভেরিয়েবলের নাম।

- & হলো অ্যাড্রেস অপারেটর, যা ভেরিয়েবলের জন্য গৃহীত মান মেমোরির ঐ লোকেশনে প্রেরণ করে এবং কোন ভেরিয়েবলের মান বহন করে।

```
int Age;
scanf ("%d", &Age);
```

এখানে %d হলো integer ডেটা টাইপের ফরমেট স্পেসিফায়ার এবং &Age হলো Age নামের ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেস, যা নির্দেশ করে integer টাইপের Age নামের ভেরিয়েবলের মেমোরি লোকেশন যেখানে ডেটা সংরক্ষিত হবে।

দুই বা ততোধিক ইনপুট ডেটা নেয়ার জন্য স্টেটমেন্টের গঠন হলো–

```
scanf ("%d", &variable1, &variable2, &variable3, . . . &variablen );
```

এখানে একই টাইপের ডেটার জন্য হতে পারে অথবা ভিন্ন টাইপের ডেটার জন্যও হতে পারে। ভেরিয়েবলসমূহ যদি একই টাইপের হয় তাহলে আলাদা করে না লিখে একই লাইনে কমা দিয়ে পৃথক করে লেখা যায়।

ফরমেট স্পেসিফায়ার

scanf () ফাংশনের সাথে ফরমেট স্পেসিফায়ার উল্লেখ করতে হয়। তাই এ সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা প্রয়োজন। নিচের টেবিলে বিভিন্ন ধরনের ফরমেট স্পেসিফায়ারের ব্যবহার উল্লেখ করা হলো :

ফরমেট স্পেসিফাইয়ার	ব্যবহার
%c	single character প্রিন্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
%d	decimal integer টাইপের ডেটা ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
%f	floating point টাইপের ডেটা ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
%u	unsigned integer টাইপের ডেটা ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
%o	octal টাইপের ডেটা ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
%x	hexadecimal integer টাইপের ডেটা ইনপুট/আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
%s	string টাইপের ডেটা ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

আউটপুট স্টেটমেন্ট (Output Statement)

প্রোগ্রামে ডেটা তথা ভেরিয়েবলের মান প্রদর্শন করার নিমিত্তে ব্যবহৃত স্টেটমেন্টকে আউটপুট স্টেটমেন্ট বলা হয়। কী বোর্ড থেকে স্ট্রিং জাতীয় ডেটা আউটপুট প্রদর্শনের জন্য সি-তে কয়েক ধরনের স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়। যথা-

printf()
putc()
puts()
putchar()

সি ল্যাংগুয়েজে দু' ধরনের ব্যবস্থার মাধ্যমে ডেটা আউটপুট দেয়া যেতে পারে। যথা-

১. ফরমেটেড আউটপুট (Formated Output)
২. রিডিং এ ক্যারেক্টার (Reading a character)

ফরমেটেড আউটপুট বা printf () ফাংশন

এটি একটি বহুল ব্যবহৃত আউটপুট স্টেটমেন্ট। এর সাহায্যে int, char, float ইত্যাদি টাইপের ডেটার মান মনিটরের স্ক্রিনে প্রদর্শন করা যায়। printf () এর সিনট্যাক্স হলো–

```
printf ("string ");
```

String হিসেবে যে কোন ওয়ার্ড বা ক্যারেক্টার বা সেনটেন্স হতে পারে। printf এর প্রথম বন্ধনী () এর ভেতর ডাবল কোটেশনের মধ্যে যা লেখা হয় আউটপুট হিসেবে মনিটরের পর্দায় তা প্রদর্শিত হয়।

কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট (Control Statements)

সি ল্যাংগুয়েজে লেখা প্রোগ্রামে স্টেটমেন্টগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো থাকে, যা একের পর এক সিকোয়েন্স অনুযায়ী নির্বাহ হয়। এক্ষেত্রে স্টেটমেন্টগুলোর পুনরাবৃত্তি অনুযায়ী নির্বাহের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু স্টেটমেন্টগুলোর পুনরাবৃত্তি অনুযায়ী নির্বাহের প্রয়োজন হলে কিছু শর্তযুক্ত করা হয়। এগুলোকে কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট বলা হয়। স্টেটমেন্ট নির্বাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে প্রোগ্রাম লেখা হলে প্রোগ্রামের আকার ছোট হয় এবং প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় কম লাগে।

সি ল্যাংগুয়েজে কন্ট্রোল স্টেটমেন্টকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট (Conditional Control Statements)
২. লুপ কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট (Loop Control Statements)।

কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট (Conditional Control Statements)

সি/সি++ প্রোগ্রামে শর্তসাপেক্ষে কোন স্টেটমেন্ট সম্পাদনের জন্য কন্ডিশনাল কন্ট্রোল ব্যবহৃত হয়। কন্ডিশনাল কন্ট্রোলে ব্যবহৃত শর্ত সত্য হলে প্রোগ্রামে এক ধরনের ফল পাওয়া যায়, আর সত্য না হলে অন্য ধরনের ফল পাওয়া যায়। অন্যতম কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্টসমূহ হলো– **if, if...else, else if** এবং **switch** স্টেটমেন্ট।

if স্টেটমেন্ট

সি/সি++ প্রোগ্রামে "যদি" অর্থে **if** স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। প্রোগ্রামে শর্ত সাপেক্ষে কোন স্টেটমেন্ট সম্পাদনের জন্য **if** স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। **if** স্টেটমেন্ট ব্যবহারের ফরম্যাট হলো ঃ

```
if(Condition)
 {
 Block1;
 }
Block2;
```

if স্টেটমেন্টে ব্যবহৃত শর্ত (Condition) সাধারণত এক বা একাধিক লজিক্যাল বা রিলেশনাল এক্সপ্রেশন হয় যা **if** পরবর্তী প্রথম বন্ধনীর মধ্যে লেখা হয়। if (Condition) স্টেটমেন্টের পর কোন সেমিকোলন থাকবে না। এ শর্তের মান যদি সত্য হয় তবে Block1 সম্পাদিত হয়। অন্যথায় Block1 সম্পাদিত হয় না। তবে উভয় ক্ষেত্রে Block2 সহ পরবর্তী স্টেটমেন্টসমূহ সম্পাদিত হয়। Block1 যে কোন বৈধ সিম্পল বা কম্পাউন্ড স্টেটমেন্ট হতে পারে। চিত্রে **if** স্টেটমেন্টের প্রবাহচিত্র দেয়া হলো।

if ... else স্টেটমেন্ট

সি/সি++ প্রোগ্রামে "অন্যথায়" অর্থে if স্টেটমেন্টের সাথে else স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। এজন্য এ স্টেটমেন্টকে if...else স্টেটমেন্ট বলা হয়। if... else স্টেটমেন্ট ব্যবহারের ফরম্যাট হলো :

```
if(Condition)
 {
  Block1;
 }
else{
 Block2;
 }
Block3;
```

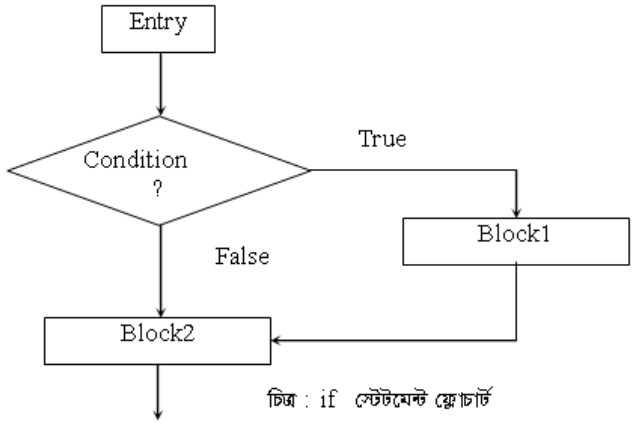

চিত্র : if স্টেটমেন্ট ফ্লোচার্ট

else কন্ট্রোলে ব্যবহৃত শর্ত (Condition) সাধারণত এক বা একাধিক লজিক্যাল বা রিলেশনাল এক্সপ্রেশন হয় যা **if** এর পরে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে লেখা হয়। if (Condition) স্টেটমেন্টের পরে কোন সেমিকোলন বসে না। এ শর্তের মান যদি সত্য হয় তবে Block1 সম্পাদিত হয়। অন্যথায় Block1 সম্পাদিত না হয়ে Block2 সহ পরবর্তী স্টেটমেন্ট সম্পাদিত হয়। Block1 ও Block2 যে কোন বৈধ সিম্পল বা কম্পাউন্ড স্টেটমেন্ট হতে পারে। চিত্রে if..else স্টেটমেন্টের প্রবাহচিত্র দেখানো হলো।

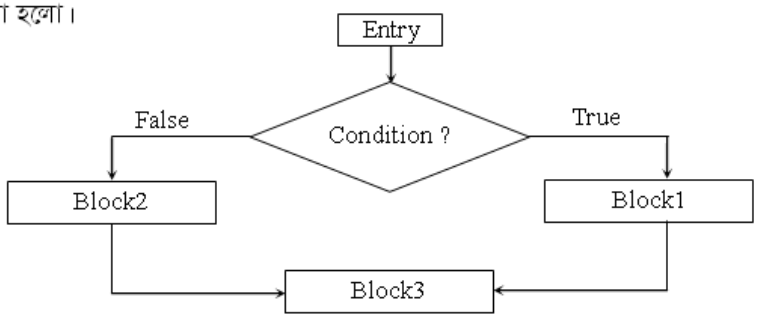

চিত্র : if...else স্টেটমেন্টের প্রবাহচিত্র

একটি if...else স্টেটমেন্টের মধ্যে অপর একটি if...else স্টেটমেন্টও থাকতে পারে। এরূপ মধ্যবর্তী if.. else স্টেটমেন্টকে নেস্টেড if...else স্টেটমেন্ট বলা হয়। চিত্রে নেস্টেড if...else স্টেটমেন্টের প্রবাহচিত্র দেখান হলো :

else if স্টেটমেন্ট

একাধিক শর্ত যাচাইয়ে সি/সি++ প্রোগ্রামে "অন্যথায় যদি" অর্থে if...else স্টেটমেন্টের সাথে else if স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। else if স্টেটমেন্ট if...else স্টেটমেন্টের if এবং else স্টেটমেন্টের মাঝে বসে। else if স্টেটমেন্টে else এবং if এর মাঝে ফাঁকা স্থান থাকে। প্রোগ্রামে একাধিক if স্টেটমেন্ট ব্যবহারের বিকল্প হিসেবে else if স্টেটমেন্ট জনপ্রিয়। অর্থাৎ প্রোগ্রামে একাধিক শর্ত যাচাই করার জন্য else if ব্যবহৃত হয়।

switch স্টেটমেন্ট

সি ভাষায় একাধিক স্টেটমেন্ট থেকে নির্দিষ্ট কোন স্টেটমেন্ট সম্পাদনে switch স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। মূলত বেশি সংখ্যক else if স্টেটমেন্ট ব্যবহারের পরিবর্তে switch স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। switch স্টেটমেন্টের সাথে অতিরিক্ত **case, break** ব্যবহৃত হতে পারে।

লুপ কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট (Loop Control Statement)

প্রোগ্রামে যে সকল স্টেটমেন্ট দুই বা ততোধিকবার সম্পাদিত হয় সেগুলোকে লুপ স্টেটমেন্ট বলা হয়। প্রোগ্রামে স্টেটমেন্টসমূহ সাধারণত স্বয়ংক্রিয়ভাবে ও পর্যায়ক্রমে একবার করে সম্পাদিত হয়। কিন্তু যদি কোন স্টেটমেন্ট দুই বা ততোধিকবার সম্পাদনের প্রয়োজন হয়, সেসব ক্ষেত্রে লুপ স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। লুপ স্টেটমেন্টের দুটি অংশ থাকে। যথা– Loop বডি ও Test condition বা শর্ত। প্রোগ্রামে যতক্ষণ টেস্ট কন্ডিশন থাকে, লুপ বডির আবর্তন ততক্ষণ চলতে থাকে।

সি ভাষায় ব্যবহৃত লুপিং স্টেটমেন্টসমূহ

সি প্রোগ্রামে ব্যবহৃত লুপ স্টেটমেন্টগুলো হলো– for লুপ স্টেটমেন্ট, while লুপ স্টেটমেন্ট, do...while লুপ স্টেটমেন্ট, continue স্টেটমেন্ট, goto স্টেটমেন্ট।

for লুপের সাধারণ গঠন

সি-তে কোন স্টেটমেন্ট দুই বা ততোধিক বার সম্পাদন করার জন্য for স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। সাধারণ কোন ভেরিয়েবল ব্যবহার করে for লুপের আবর্তন সংখ্যা গণনা করা হয়। এরূপ ভেরিয়েবলকে কাউন্টার ভেরিয়েবল বলা হয়। কাউন্টার ভেরিয়েবলকে for স্টেটমেন্টে ব্যবহারের পূর্বেই ঘোষণা করতে হয়। for লুপের সাধারণ ফরম্যাট হলো :

```
Counter Declaration;
for(Initialization; Condition; CounterUpdate)
{
LoopBody;
}
```

উদাহরণ :

```
int i;
for (i=1; i<=5; i=i+1)
 {
 printf(æProgramming in C\n");
 }
```

while লুপের সিনটেক্স

সি-তে শর্ত সাপেক্ষে দুই বা ততোধিক বার কোন স্টেটমেন্ট সম্পাদন করার জন্য while স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। এটি অনেকটা for স্টেটমেন্টের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। for স্টেটমেন্টের মতো পূর্বে ঘোষিত কোন কাউন্টার ভেরিয়েবল ব্যবহার করে while স্টেটমেন্টের আবর্তন সংখ্যা গণনা করা হয়। while লুপ নিয়ন্ত্রণের ফরম্যাট হলো:

```
Counter Initialization;
while(Condition)
{
LoopBody
CounterUpdate;
}
```

do- while লুপের সিনটেক্স

সি-তে শর্ত সাপেক্ষে এক বা একাধিক বার কোন স্টেটমেন্ট সম্পাদনের জন্য **do...while** স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। **do** স্টেটমেন্ট **while** স্টেটমেন্টের সাহায্য ছাড়া কাজ করে না। **do...while** লুপ স্টেটমেন্টকে অনেক সময় **do** স্টেটমেন্টও বলা হয়। **while** স্টেটমেন্টের মতো পূর্বে ঘোষিত কোন কাউন্টার ভেরিয়েবল ব্যবহার করে **do** স্টেটমেন্টের আবর্তন সংখ্যা গণনা করা হয় এবং পুনরাবর্তন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। do...while লুপ নিয়ন্ত্রণের ফরম্যাট হলো :

```
Counter Declaration;
Counter Initialization;
do
{
LoopBody
CounterUpdate;
} while(Condition);        // Ending Semicolon must
```

উদাহরণ :

```
int i=1;
do{
 printf(æProgramming in C\n");
 i=i+1;
 }  while (i<=5)
```

৮.১১ অ্যারে (Array)

একই ধরনের ডেটা টাইপের গুচ্ছকে অ্যারে বলা হয়। অ্যারের উপাদানগুলো মেমোরিতে পাশাপাশি অবস্থান করে। অ্যারের নাম সংলগ্ন তৃতীয় বন্ধনীর '[ ]' মধ্যে অ্যারে সাইজ লেখা হয়, যা অ্যারে ভেরিয়েবলের সর্বোচ্চ ডেটার সংখ্যা নির্দেশ করে, এই সংখ্যাকে অ্যারের Index বলা হয় এবং অ্যারের প্রতিটি স্বতন্ত্র ভেরিয়েবলকে আলাদাভাবে অ্যারে উপাদান (Array element) বলা হয়। অ্যারে একটি ডিরাইভড ডেটা টাইপ। যেমন– int Roll[4];

এখানে Roll একটি int টাইপ অ্যারে। এই অ্যারেতে মোট পাঁচটি রোল নাম্বার আছে, যা অ্যারের সাইজ নির্দেশ করে। এই অ্যারের ১ম ভেরিয়েবলটি হলো– Roll[0], ২য় ভেরিয়েবলটি হলো– Roll[1], ৩য় ভেরিয়েবলটি হলো– Roll[2], ৪র্থ ভেরিয়েবলটি হলো– Roll[3] এবং ৫ম ভেরিয়েবলটি হলো– Roll[4]।

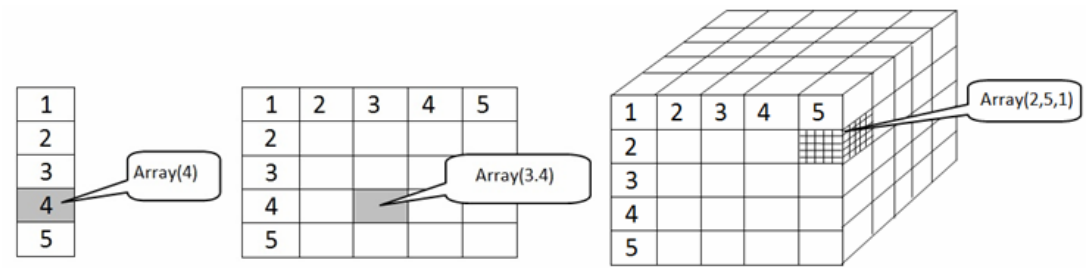

অ্যারে ব্যবহারের সুবিধা (Advantages of using array)

১. একই ধরনের ডেটাগুলোকে একটি চলক দিয়ে প্রকাশ করা যায়।
২. অ্যারে প্রোগ্রামকে সহজ, সুন্দর ও ছোট করে।
৩. প্রোগ্রাম নির্বাহ দ্রুত হয়।
৪. অ্যারের উপাদানগুলো দ্রুত একসেস করা যায়।
৫. প্রোগ্রামের জটিলতা কমায়।

অ্যারে ব্যবহারের অসুবিধা (Disadvantages of using array)

১. প্রোগ্রাম নির্বাহের সময়ে অ্যারের সাইজ পরিবর্তন করা যায় না।
২. প্রকৃত ডেটা অপেক্ষা অ্যারের সাইজ অনেক বেশি ঘোষণা করা হলে মেমোরির অপচয় হতে পারে।
৩. প্রকৃত ডেটা অপেক্ষা অ্যারের সাইজ কম ঘোষণা করা হলে অ্যারেতে ডেটার পর্যাপ্ত স্থান সংকুলান হয় না।
৪. বিভিন্ন টাইপের ডেটা অ্যারেতে রাখা যায় না।

ভেরিয়েবল ও অ্যারের মধ্যে পার্থক্য (Difference between variable and array)

ভেরিয়েবল	অ্যারে
১. ভেরিয়েবল হলো মেমোরি (RAM) লোকেশনের নাম বা ঠিকানা।	১. একটি সাধারণ ভেরিয়েবলের নামের আওতায় মেমোরিতে পরপর সংরক্ষিত একই টাইপের কতগুলো ভেরিয়েবলের সেটকে অ্যারে বা বিন্যাস বলা হয়।
২. ডেটা ভেরিয়েবল বা চলকের নাম যে কোন আকারের হতে পারে।	২. অ্যারের একটি নাম থাকে এবং এর সদস্য বা আইটেমসমূহকে বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়।
৩. ভেরিয়েবল চার প্রকার।	৩. অ্যারে দুই প্রকার।
৪. উদাহরণ– int a; char x	৪. উদাহরণ– int roll[25]

অ্যারের ডাইমেনশন (Array Dimension)

একটি অ্যারের যেকোন উপাদানকে শনাক্ত করার জন্য যত বা যতগুলো সংখ্যা প্রয়োজন হয় তাকে ঐ অ্যারের ডাইমেনশন বা মাত্রা বলে। যেমন, int Roll[4]; অ্যারের পাঁচটি উপাদানের যেকোন একটি শনাক্ত করার জন্য কেবল একটি সংখ্যা (০ থেকে ৪ এর মধ্যবর্তী) প্রয়োজন হবে। C তে ইনডেক্স শুরু হয় ০ থেকে।

অ্যারের ডাইমেনশন–এর প্রকারভেদ

একটি অ্যারের ডাইমেনশন এক বা একাধিক হতে পারে। মাত্রা বা ডাইমেনশনের উপর ভিত্তি করে অ্যারে দু'ধরনের হতে পারে। যথা–

১. একমাত্রিক অ্যারে (One dimensional array)
২. দ্বিমাত্রিক অ্যারে (Two dimensional array)

একমাত্রিক অ্যারে (One Dimensional Array)

যদি কোন অ্যারের ডেটাগুলো শুধুমাত্র একটি একক সারি বা কলাম আকারে উপস্থাপিত থাকে এবং একটি মাত্র সাবস্ক্রিপ্ট দ্বারা প্রকাশিত হয়, তবে সেই অ্যারেকে একমাত্রিক অ্যারে বলা হয়। সি ল্যাংগুয়েজে একমাত্রিক অ্যারে তৈরির নিয়ম হলো–

```
data_type  vriable_name [size]
```

যেমন, int roll[4]; এটি একটি একমাত্রিক অ্যারে। এখানে int হলো ডেটা টাইপ, roll হলো ভেরিয়েবলের নাম, এবং [4] হলো সাইজ। এই অ্যারের মধ্যে পাঁচটি উপাদান (০ – ৪) রাখা যাবে।

দ্বিমাত্রিক অ্যারে (Two dimensional array)

যদি কোন অ্যারের ডেটাগুলো একক সারি এবং কলাম আকারে উপস্থাপিত থাকে এবং দু'টি সাবস্ক্রিপ্ট দ্বারা প্রকাশিত হয় তবে সেই অ্যারেকে দ্বিমাত্রিক অ্যারে বলা হয়। যেমন–

```
int marks[2][3];
```

এটি দ্বিমাত্রিক অ্যারে। কারণ এই অ্যারের marks[0][0], marks[0][1], marks[0][2], marks[1][0], marks[1][1] কিংবা marks[1][2] এ ৬টি উপাদানের যে কোনটি নির্দেশ করার জন্য মোট দু'টি সংখ্যা যেমন, ০, ০ বা, ০, ১ বা, ০, ২ বা, ১, ০ বা, ১, ১ বা, ১, ২ প্রয়োজন হবে।

	0	1	2
0	0,0	0,1	0,2
1	1,0	1,1	1,2

প্রোগ্রামে মূলত মেট্রিক্স অর্থাৎ সারি ও কলাম সম্পর্কিত কাজের জন্য দ্বিমাত্রিক অ্যারে ব্যবহার করা হয়। ফলে অনেক সহজে সমস্যার সমাধান করা যায়। যেমন- কোন পরীক্ষায় পাঁচটি বিষয় আছে এবং প্রত্যেক বিষয়ে চল্লিশজন করে পরীক্ষার্থী আছে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর প্রত্যেক বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর হিসাব করে ফলাফল নির্ণয় করার জন্য দ্বিমাত্রিক অ্যারে ব্যবহার করা যেতে পারে।

দ্বিমাত্রিক অ্যারে ঘোষণার নিয়ম

সি-তে দ্বিমাত্রিক অ্যারে ঘোষণার সাধারণ ফরম্যাট হলো–

```
DataType ArrayName[RowSize][ColumnSize];
```

DataType– যে কোন বৈধ ডেটা টাইপ।

ArrayName– প্রোগ্রামার কর্তৃক দেয়া অ্যারে ভেরিয়েবলের যেকোন বৈধ নাম।

RowSize ও **ColumnSize**– পূর্ণসংখ্যায় প্রকাশিত কোন ধ্রুব মান, যাদেরকে যথাক্রমে দ্বিমাত্রিক অ্যারের সারি সংখ্যা ও কলাম সংখ্যা বলা হয়।

উদাহরণ :

int Marks[2][3];

এই অ্যারের মোট উপাদান সংখ্যা ছয়টি (২×৩ = ৬)। যথা :

Marks[0][0]	Marks[0][1]	Marks[0][2]
Marks[1][0]	Marks[1][1]	Marks[1][2]

অ্যারে ঘোষণার পদ্ধতি

সাধারণ ভেরিয়েবল ঘোষণার মতো ব্যবহারের পূর্বে ডেটা টাইপসহ অ্যারে ভেরিয়েবল ঘোষণার প্রয়োজন হয়। অ্যারে ঘোষণার সাধারণ ফরম্যাট হলো :

```
DataType ArrayName[ArraySize];
```

এখানে, DataType যে কোন বৈধ ডেটা টাইপ, ArrayName প্রোগ্রামার কর্তৃক দেয়া অ্যারে ভেরিয়েবলের যেকোন বৈধ নাম এবং ArraySize পূর্ণসংখ্যায় প্রকাশিত কোন ধ্রুব মান, যাকে অ্যারে সাইজ বা অ্যারে ইনডেক্স (index) বলা হয়। অ্যারের নাম সংলগ্ন তৃতীয় বন্ধনীর '[ ]' মধ্যে পূর্ণসংখ্যা দ্বারা প্রকাশিত অ্যারে সাইজ বা অ্যারে ইনডেক্স অ্যারের সাইজ নির্ধারণ করে, যা অ্যারে ভেরিয়েবলে সংরক্ষিত সর্বোচ্চ ডেটার সংখ্যা নির্দেশ করে।

উদাহরণ :

```
int  Roll[10];          // int  type array
char  Name[20];         // char  type array
float Marks[10];        // float type array
```

অ্যারে ব্যবহার করে কতগুলো সংখ্যা হতে বড় সংখ্যাটি খুঁজে বের করার প্রোগ্রাম তৈরিকরণ

অ্যারে ব্যবহার করে সহজেই কতগুলো সংখ্যার মধ্য থেকে বড় সংখ্যাটি নির্ণয় করা যায়। এজন্য অ্যারের প্রথম উপাদানটি বড় মনে করে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য উপাদানসমূহের সাথে তুলনা করা হয়। পরবর্তী কোন উপাদান প্রথম বড় উপাদান থেকে বড় হলে সেটিকে বড় ধরে পুনরায় এই প্রক্রিয়া চালানো হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমিক কয়েকটি ধাপে কতগুলো সংখ্যা থেকে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি নির্ণয় করা যায়।

```
/*     Finding maximum of a group of numbers */
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int s[10],n,i,max;
printf("How many number ? ");
scanf("%d", &n);
printf("Enter %d integer numbers : \n", n);
for(i=0;i<n;i++)
scanf("%d", &s[i]);
max=s[0];
for(i=1;i<n;i++)
{
if(s[i] >max)
max=s[i];
else
max=max;
}
printf("%d is the maximum of given numbers", max);
getch();
}
```

Output:

```
How many number ? 5
Enter 5 integer numbers :
25 45 76 83 24
83 is the maximum of given numbers
```

৮.১২ ফাংশন (Function)

সি প্রোগ্রামে যখন কোন নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য কতগুলো স্টেটমেন্ট কোন নামে একটি ব্লকের মধ্যে রাখা হয় তখন তাকে ফাংশন বলা হয়। প্রতিটি সি প্রোগ্রাম হলো এক বা একাধিক ফাংশনের সমষ্টি। ফাংশন চেনার সহজ উপায় হলো ফাংশনের নামের শেষে এক জোড়া প্রথম বন্ধনী '( )' থাকে, এই প্রথম বন্ধনীর মধ্যে অনেক কিছু থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। প্রতিটি ফাংশনের একটি নাম থাকে, যে নামে কম্পাইলার তাকে শনাক্ত করে। প্রোগ্রাম নির্বাহের সময়ে কম্পাইলার যখন কোন ফাংশন কল পায়, তখন মূল প্রোগ্রামের কাজ স্থগিত রেখে কল্ড ফাংশনে নির্বাহ শুরু করে এবং নির্বাহ শেষে মূল ফাংশনে প্রত্যাবর্তনপূর্বক পরবর্তী লাইন থেকে নির্বাহ চালিয়ে যায়। তবে এ প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত কিছুটা সময় ব্যয় হয়। ছোট প্রোগ্রামের জন্য সাধারণত ফাংশন ব্যবহার করা হয় না।

ফাংশনের প্রয়োজনীয়তা/সুবিধা (Importance/Advantages of Function)

১. ফাংশনের সাহায্যে প্রোগ্রামকে সংক্ষিপ্ত করা যায়।
২. ফাংশনের ব্যবহারে একই ধরনের কাজের জন্য একই ধরনের স্টেটমেন্ট বার বার লেখার প্রয়োজন হয় না।
৩. প্রোগ্রামের ভুল নির্ণয় ও সংশোধন করা সহজ হয়।
৪. ব্যবহারকারী তার প্রয়োজন অনুযায়ী ফাংশন তৈরির কাজ করতে পারে।
৫. একই ফাংশন বিভিন্ন প্রোগ্রামে ব্যবহার করা যায়।
৬. প্রোগ্রাম দ্রুত নির্বাহ হয়।

ফাংশন–এর প্রকারভেদ (Types of Function)

সি-তে ব্যবহৃত ফাংশনসমূহকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১. লাইব্রেরি ফাংশন (Library Function) / বিল্ট ইন ফাংশান
২. ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন (User Defined Function) /ব্যবহারকারী বর্ণিত ফাংশন

লাইব্রেরি ফাংশন (Library Function)

সি ভাষায় সবসময় প্রয়োজন এমন ফাংশন–যা আগে থেকে তৈরি এবং সরাসরি ব্যবহার করা যায়। এরূপ ফাংশনগুলোকে লাইব্রেরি ফাংশন বলা হয়। লাইব্রেরি ফাংশনগুলোকে তাদের নিজস্ব ফরম্যাট অনুযায়ী main() ফাংশনে ব্যবহার করা যায়। printf(), scanf(), getch(), getchar(), abs(), sqrt(), sin(), cos(), tan(), rand() এ ধরনের লাইব্রেরি ফাংশনের উদাহরণ। লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহার সহজ। এজন্য কেবল ঐ ফাংশনের ব্যবহারবিধি এবং ফরম্যাট জানলেই চলে। লাইব্রেরি ফাংশনগুলোকে বিল্ট-ইন ফাংশনও বলা হয়। সি-তে বিভিন্ন গাণিতিক, যৌক্তিক ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য টার্বো সি কম্পাইলারে এরূপ অনেক লাইব্রেরি ফাংশন আছে। লাইব্রেরি ফাংশনগুলোর প্রোটোটাইপ তার হেডার ফাইলে বর্ণিত থাকে। এজন্য সি++ প্রোগ্রামে কোন লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহার করলে প্রোগ্রামের শুরুতে #include এ যুক্ত করতে হয়।

সি প্রোগ্রামিং–এর কয়েকটি লাইব্রেরি ফাংশনের নাম ও ব্যবহার

ফাংশন	ব্যবহার
abs()	কোন সংখ্যার পরমমান নির্ণয় করে।
clock()	প্রোগ্রাম নির্বাহের শুরু থেকে সম্পাদিত ক্লক টিক্ রিটার্ন করে।
exit()	প্রোগ্রামের নির্বাহের সমাপ্তি ঘটায়।
gettime(), settime()	কম্পিউটার সিস্টেমের সময় নির্ণয় পুনঃনির্ধারণ করে।
log(), log100	কোন সংখ্যার লগারিদম তথা $\log_e x$ ও $\log_{10} x$ নির্ণয় করে।
pow(), pow10()	কোন সংখ্যার ঘাত (power) তথা x^n 10^n নির্ণয় করে।
rand(), srand()	দৈব (random) সংখ্যা নির্ণয় ও ইনিশিয়ালাইজ করে।

ফাংশন	ব্যবহার
sqrt()	কোন ধনাত্মক সংখ্যার ঘাত (squareroot) নির্ণয় করে।
asin(), acos(), atan()	ত্রিকোণমিতিক কোণের Arc sine, Arc cosine এবং Arc tangent মান নির্ণয় করে।
sin(), cos(), tan()	ত্রিকোণমিতিক কোণের sine, cosine এবং tangent মান নির্ণয় করে।
sinh(), cosh(), tanh()	ত্রিকোণমিতিক কোণের Hyperbolic sine, Hyperbolic cosine এবং Hyperbolic tangent মান নির্ণয় করে।
delay(), sleep()	নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (মিলিসেকেন্ডে) স্টেটমেন্টের নির্বাহ স্থগিত রাখে।
system()	ডস কমান্ড জেনারেট করে।
time(), stime()	কম্পিউটার সিস্টেমের সময়, দিন, তারিখ ইত্যাদি রিটার্ন করে।

ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন (User Defined Function)

সি কম্পাইলারে অনেক বিল্ট-ইন/লাইব্রেরি ফাংশন থাকা সত্ত্বেও প্রোগ্রাম রচনার সময় চাহিদা অনুযায়ী সব রকম ফাংশন পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে প্রোগ্রামার তার নিজস্ব প্রয়োজন এবং প্রজ্ঞা অনুযায়ী যেসকল ফাংশন তৈরি করে প্রোগ্রাম তথা main() ফাংশনে ব্যবহার করেন সেগুলোকে ইউজার ডিফাইন্ড (User defined) বা ব্যবহারকারী বর্ণিত ফাংশন বলা হয়। এই ফাংশন আকার আকৃতি ও সমস্যার ধরন, সমাধানের কৌশলের উপর নির্ভর করে। ফাংশনের অংশ/উপাদান হলো-

১. ফাংশন বর্ণনা (Function defination)
২. ফাংশন কল (Function call)
৩. ফাংশন প্রোটোটাইপ (Function prototype)
৪. ফাংশনের রিটার্ন টাইপ ও রিটার্ন স্টেটমেন্ট (Functions return type & return statement)

রিকার্সিভ ফাংশন (Recursive Function)

সি প্রোগ্রামে কোন ফাংশন যখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজে নিজেকে call করে তখন সেই ফাংশনকে রিকার্সিভ ফাংশন এবং এই প্রক্রিয়াকে রিকার্সিভ বলা হয়। রিকার্সিভ ফাংশন একবারে বুঝতে পারা বেশ কষ্টসাধ্য। গণিতশাস্ত্রের সিরিজকে রিকার্সিভ ফাংশনের মাধ্যমে সহজে সমাধান করা যায়। প্রতিটি রিকার্সিভ ফাংশনের একটি টার্মিনেটিং কন্ডিশন থাকতে হয়।

সার-সংক্ষেপ

প্রোগ্রামের ভাষা (Programming Language) : কম্পিউটার সিস্টেমে প্রোগ্রাম রচনার জন্য ব্যবহৃত শব্দ, বর্ণ, অঙ্ক, সংকেত এবং এগুলো বিন্যাসের নিয়ম মিলিয়ে তৈরি হয় প্রোগ্রামের ভাষা বা প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ।

কম্পাইলার (Compiler) : কম্পাইলারের কাজ হলো উচ্চস্তরের ভাষার উৎস প্রোগ্রামকে বস্তু প্রোগ্রামে অনুবাদ করা। কম্পাইলার সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটিকে একসাথে পড়ে এবং একসাথে অনুবাদ করে।

ইন্টারপ্রিটার (Interpreter) : ইন্টারপ্রিটার উচ্চস্তরের ভাষাকে যন্ত্রভাষায় পরিণত করে। তবে এটি প্রোগ্রামকে এক লাইন এক লাইন করে অনুবাদ করে।

অ্যাসেম্বলার (Assembler) : অ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে মেশিন ভাষায় অনুবাদ করার জন্য অ্যাসেম্বলার ব্যবহার করা হয়।

অ্যালগরিদম (Algorithm) : সমস্যা সমাধানের যুক্তিসম্মত ও পর্যায়ক্রমিক ধারা বর্ণনাকে অ্যালগরিদম বলা হয়।

ফ্লোচার্ট (Flowchart) : যে চিত্রের মাধ্যমে কোন সিস্টেম বা প্রোগ্রাম কীভাবে কাজ করবে তার গতিধারা নির্ধারণ করা হয় তাকে প্রবাহচিত্র বা ফ্লোচার্ট বলে।

সুডোকোড (Pseudo code) : সুডো (Pseudo) গ্রিক শব্দ। সুডো শব্দের অর্থ হচ্ছে ছদ্ম বা কৃত্রিম। প্রোগ্রামের ধরন ও কার্যাবলি তুলে ধরার জন্য যে খসড়া তৈরি করা হয় তাকেই সুডোকোড বলা হয়।

অনুশীলনী–৫

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি উচ্চস্তরের ভাষা?
ক. অ্যাডা খ. অ্যাসেম্বলি ল্যাংগুয়েজ
গ. পাইথন ঘ. মেশিন ল্যাংগুয়েজ

২. কোনটি নিম্নস্তরের ভাষা?
ক. Machine Language খ. BASIC
গ. Pascal ঘ. Fortran

৩. যান্ত্রিক ভাষাকে কোন স্তরের ভাষা বলা হয়?
ক. উচ্চস্তরের খ. মধ্যস্তরের
গ. নিম্নস্তরের ঘ. অতি উচ্চস্তরের

৪. অ্যাসেম্বলি ভাষা অনুবাদ করে–
ক. কম্পাইলার খ. ইন্টারপ্রিটার
গ. অ্যাসেম্বলার ঘ. ভিডিও

৫. মানুষের ভাষার সাথে কোন ভাষার মিল আছে?
ক. উচ্চস্তরের খ. নিম্নস্তরের
গ. যান্ত্রিক ঘ. অ্যাসেম্বলি

৬. নিচের কোনটি অনুবাদক প্রোগ্রাম?
ক. ইন্টারপ্রিটার খ. সি++
গ. পাইথন ঘ. প্যাসকেল

৭. কোনটি অনুবাদক প্রোগ্রাম নয়?
ক. কোবল খ. ইন্টারপ্রিটার
গ. কম্পাইলার ঘ. অ্যাসেম্বলার

৮. ইন্টারপ্রিটার প্রোগ্রামকে–
ক. এক লাইন এক লাইন করে অনুবাদ করে
খ. একসাথে পুরো প্রোগ্রাম অনুবাদ করে
গ. একসাথে পাঁচ লাইন করে অনুবাদ করে
ঘ. অর্ধেক অর্ধেক লাইন অনুবাদ করে

৯. ফ্লোচার্টের বিষয়কে কম্পিউটারের প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় রূপান্তর করাকে কী বলে?
ক. সুডোকোড খ. অ্যালগরিদম
গ. কোডিং ঘ. প্রিন্ট

১০. প্রোগ্রামের কোন ভাষা যন্ত্রনির্ভর?
ক. উচ্চস্তরের ভাষা খ. যন্ত্রভাষা
গ. অ্যাসেম্বলি ভাষা ঘ. নিম্নস্তরের ভাষা

১১. সুডো শব্দের অর্থ কী?
ক. শৃঙ্খলা খ. পদ্ধতি
গ. ত্রুটি ঘ. ছদ্ম

১২. কোন ভাষা কোনো ধরনের রূপান্তর ছাড়া কম্পিউটার সরাসরি নির্বাহ করতে পারে?
ক. মেশিন ভাষা খ. অ্যাসেম্বলি ভাষা
গ. উচ্চস্তরের ভাষা ঘ. মধ্যম স্তরের ভাষা

১৩. মেশিনের ভাষায় রূপান্তরিত প্রোগ্রামকে কী বলা হয়?
ক. অ্যাসেম্বলার খ. কম্পাইলার
গ. ইন্টারপ্রিন্টার ঘ. অবজেক্ট প্রোগ্রাম

১৪. কোনটি অনুবাদক প্রোগ্রাম?
ক. অ্যাসেম্বলি ল্যাংগুয়েজ খ. কম্পাইলার
গ. পাইথন ঘ. Foxpro

১৫. কোন ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে?
ক. মেশিন ভাষা খ. হাই লেভেল ভাষা
গ. অ্যাসেম্বলি ভাষা ঘ. চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা

১৬. কোন ভাষা দিয়ে কম্পিউটারের মেমোরি–অ্যাড্রেসের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ সাধন সম্ভব?
ক. মেশিন ভাষা খ. হাই লেভেল ভাষা
গ. অ্যাসেম্বলি ভাষা ঘ. চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা

১৭. কোন অনুবাদক দিয়ে সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটি একসাথে অনুবাদ করা সম্ভব?
ক. অ্যাসেম্বলার খ. কম্পাইলার
গ. ইন্টারপ্রিটার ঘ. 4GL

১৮. প্রথম প্রজন্মের ভাষা বলা হয় কোনটিকে?
ক. যান্ত্রিক ভাষা খ. অ্যাসেম্বলি ভাষা
গ. উচ্চস্তরের ভাষা ঘ. নিম্নস্তরের ভাষা

১৯. প্রবাহচিত্র কী?
ক. বিশেষ চিহ্ন সংবলিত ধারাবাহিক প্রোগ্রাম নির্বাহ চিত্র
খ. প্রোগ্রামের চিত্র
গ. প্রোগ্রামের উন্নয়ন চিত্র ঘ. প্রোগ্রামের অংশের চিত্র

২০. 4GL বলতে কী বুঝায়?
ক. অতি উচ্চতর ভাষা খ. উচ্চতর ভাষা
গ. মধ্যম স্তরের ভাষা ঘ. নিম্নস্তরের ভাষা

২১. প্রোগ্রামের ভুলত্রুটি খুঁজে বের করাকে কী বলে?
ক. বাগ খ. ডিবাগিং
গ. সিনটেক্স ঘ. বাগিং

২২. উচ্চস্তরের ভাষাকে যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তরিত করাকে কী বলে?
ক. প্রসেসিং খ. ডিবাগিং
গ. অনুবাদ ঘ. মডিউল

২৩. নিচের কোনটি চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা?
ক. C খ. FORTRAN
গ. SQL ঘ. ALGOL

২৪. প্রোগ্রামের ত্রুটি সংশোধনের পদ্ধতিকে কি বলা হয়?
ক. Encoding খ. Amending
গ. Debugging ঘ. Correction

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১	গ	২	ক	৩	গ	৪	গ	৫	ক	৬	ক	৭	ক	৮	ক	৯	গ	১০	গ	১১	ঘ	১২	ক
১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	গ	১৬	ক	১৭	খ	১৮	ক	১৯	ক	২০	ক	২১	খ	২২	গ	২৩	গ	২৪	গ

২৫. ওয়েবসাইট তৈরিতে ব্যবহৃত ভাষা কোনটি?
ক. PYTHON খ. HTML
গ. BASIC ঘ. FORTRAN

২৬. C++ কোন প্রজন্মের ভাষা?
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয়
গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ

২৭. 'সি' হচ্ছে —
ক. অপারেটিং সিস্টেম খ. প্যাকেজ প্রোগ্রাম
গ. উচ্চতর প্রোগ্রামিং ভাষা ঘ. নিম্নস্তর প্রোগ্রামিং ভাষা

২৮. কোনটি **Relational Operator?**
ক. + খ. –
গ. > ঘ. And

২৯. কম্পিউটার প্রক্রিয়াকরণের চিহ্ন হিসেবে প্রদর্শন করে?
ক. খ.
গ. ঘ.

৩০. প্রোগ্রামের ভিত্তি কোনটি?
ক. কোডিং খ. ফ্লোচার্ট
গ. ডিবাগিং ঘ. প্রসিডিউ

৩১. কোনটি পুনরাবৃত্তিমূলক স্টেটমেন্ট? (অনুধাবন)
ক. IF – THEN খ. FOR – THEN
গ. DO – LOOP ঘ. FOR – LOOP

৩২. নিচের কোনটি টপ-ডাউন ডিজাইন মডেল? (জ্ঞান)
ক. স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং খ. ভিজ্যুয়াল প্রোগ্রামিং
গ. ইভেন্ট ড্রিভন প্রোগ্রামিং
ঘ. অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং

৩৩. শর্তসাপেক্ষে স্টেটমেন্টগুচ্ছকে নির্বাহ করার জন্য সি প্রোগ্রামিং ভাষায় কোন লুপ ব্যবহৃত হয়? (অনুধাবন)
ক. for লুপ খ. do while লুপ
গ. for while লুপ ঘ. while লুপ

৩৪. < = কোন ধরনের অপারেটর?
ক. গাণিতিক খ. রিলেশনাল
গ. লজিক্যাল ঘ. কম অথবা সমান

৩৫. নিচের কোনটি তৃতীয় প্রজন্মের ভাষা?
ক. Math-matci খ. Matlab
গ. C ঘ. অ্যাসেম্বলি ভাষা

৩৬. 'C' প্রোগ্রামিং ভাষাটি কোন্ সময়ে উদ্ভাবিত হয়?
ক. ১৯৬০ সালে
খ. ১৯৭০ সালের শেষের দিকে
গ. ১৯৬০ সালে ঘ. ১৯৭১ সালে

৩৭. 'C' ভাষাটি কোন্ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে উদ্ভাবন করা হয়?
ক. Unix খ. Linux
গ. Mac ঘ. Android

৩৮. নিচের কোনটি কী ওয়ার্ড?
ক. int খ. main
গ. printf ঘ. for

৩৯. '%d'—কোন্ ধরনের উপাত্ত নিয়ে কাজ করে?
ক. দশমিক পূর্ণসংখ্যা খ. character
গ. string পূর্ণসংখ্যা ঘ. floating pint মান

৪০. রিলেশনাল অপারেটর কোনটি?
ক. + খ. –
গ. > ঘ. And

৪১. ফ্লোচার্ট কত প্রকার?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

৪২. C প্রোগ্রামিং ভাষায় উপাত্ত গ্রহণের কমান্ড কোনটি?
ক. clrscr() খ. printf()
গ. scanf() ঘ. getch()

৪৩. $y = a^2 + b^2$ একটি গাণিতিক রাশিমালা হলে C প্রোগ্রামের ভাষায় রাশিমালাটির সঠিক রূপান্তর কোনটি?
ক. $y = a^2 + b * b$ খ. $y = a^2 + b * 2$
গ. $y = a * a + b^2$ ঘ. $y = a * a + b * b$

৪৪. $y = a^2 + b^2$ গাণিতিক রাশিমালাটিতে স্বাধীন চলক কয়টি?
ক. ১টি খ. ২টি
গ. ৩টি ঘ. ৪টি

৪৫. C প্রোগ্রামের ভাষায় লেখা প্রোগ্রামকে কী বলা হয়?
ক. গন্তব্য প্রোগ্রাম খ. উৎস প্রোগ্রাম
গ. ইউনিকোড ঘ. আসকি বোড

৪৬. কোনটি রিলেশনাল অপারেটর –
ক. + খ. = =
গ. AND ঘ. OR

৪৭. কোন ফাংশানটি সি প্রোগ্রামের জন্য অত্যাবশ্যকীয়?
ক. printf() খ. main()
গ. getch() ঘ. scanf()

৪৮. সি ভাষায় নিচের কোন ফাংশন দ্বারা ডেটা পড়ানো হয়?
ক. printf() খ. abs()
গ. float() ঘ. scanf()

৪৯. সি ভাষায় নিচের কোন ফাংশন দ্বারা প্রোগ্রামের ফলাফল প্রকাশ করা যায়?
ক. printf() খ. sqrt()
গ. main() ঘ. scanf()

৫০. সি ভাষায় নিচের কোন ফাংশন দ্বারা কর্মমূল নির্ণয় করা যায়?
ক. printf() খ. abs()
গ. sqrt() ঘ. scanf()

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

২৫	খ	২৬	গ	২৭	গ	২৮	গ	২৯	ক	৩০	ক	৩১	ঘ	৩২	ক	৩৩	গ	৩৪	খ	৩৫	গ	৩৬	খ	৩৭	ক
৩৮	ঘ	৩৯	ক	৪০	গ	৪১	ক	৪২	গ	৪৩	ঘ	৪৪	খ	৪৫	খ	৪৬	খ	৪৭	খ	৪৮	ঘ	৪৯	ক	৫০	গ

৫১. নিচের কোনটি অ্যারে চলক?
ক. m(5) খ. m[5]
গ. m5 ঘ. m_5

৫২. নিচের কোনটি **Two dimensonal** অ্যারে চলক?
ক. m(4,5) খ. m(4)(5)
গ. m[4][5] ঘ. m[4,5]

৫৩. **Printf()** দ্বারা কী বুঝায়?
ক. ইনপুট মান ইনপুট মাধ্যমে পাঠায়
খ. আউটপুট মান আউটপুট মাধ্যমে পাঠায়
গ. ইনপুট মান আউটপুট মাধ্যমে পাঠায়
ঘ. আউটপুট মান ইনপুট মাধ্যমে পাঠায়

৫৪. সি ভাষায় কোনটি সঠিক চলক?
ক. int 5X; খ. int main;
গ. int x5; ঘ. int x-5;

৫৫. **for(i=2; i<10; i = i+2)**
printf("%d",i); স্টেটমেন্টটির ফলাফল কোনটি?
ক. 1,3,5,7,9 খ. 2,4,6,8,10
গ. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ঘ. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

৫৬. নিচের কোন ভেরিয়েবলটি ভগ্নাংশ ডেটা ধারণ করে?
ক. int x, y, s; খ. float z;
গ. x = 235; ঘ. y=188.75

৫৭. নিচের কোন কোড ব্লকটি সঠিক?
ক. int x; scanf("%c", &x);
খ. int x scanf("%d", &x);
গ. int x; scanf("%s", &x);
ঘ. int x; scanf("%f", &x);

৫৮. সি ভাষায় নতুন লাইন তৈরির ব্যাকস্লাস ক্যারেক্টার কোনটি
ক. \a খ. \b
গ. \n ঘ. \r

৫৯. সি ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা করা হয় কোন বন্ধনীর ভিতরে?
ক. ( ) খ. { }
গ. < > ঘ. [ ]

৬০. উৎস প্রোগ্রামকে একত্রে বস্তু প্রোগ্রামে রূপান্তর করে কোনটি?
ক. কম্পাইলার খ. ইন্টারপ্রিটার
গ. লিঙ্কার ঘ. অ্যাসেম্বলার

৬১. ইন্টিজার টাইপের ডেটার ফরমেট স্পেসিফাইয়ার কোনটি?
ক. %c খ. %d
গ. %F ঘ. %I

৬২. 'সি' ভাষায় ইন্টিজার ডেটা টাইপ কত বিটের?
ক. ৮ খ. ১৬
গ. ৩২ ঘ. ৬৪

৬৩. 'সি++' ভাষা কোন ধরনের প্রোগ্রামিং মডেল অনুসরণ করে?
ক. স্ট্রাকচার্ড খ. অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড
গ. ভিজুয়াল ঘ. ইভেন্ট ড্রাইভেন

৬৪. সি প্রোগ্রামিং-এ কোন স্টেটমেন্টটি নির্বাহযোগ্য নয়?
ক. #include<stdio.h> খ. main()
গ. /*its a program*/ ঘ. printf();

৬৫. সি ভাষায় পূর্ণ সংখ্যার ডেটা টাইপ কোনটি?
ক. ক্যারেক্টার খ. ইন্টিজার
গ. স্ট্রিং ঘ. ফ্লোটিং

৬৬. সি প্রোগ্রামে চলক ঘোষণায়–
ক. ফাঁকা স্থান রাখা যাবে না
খ. প্রথম অক্ষর সংখ্যাবাচক হবে
গ. সংরক্ষিত শব্দ ব্যবহার করা যাবে
ঘ. ছোট ও বড় হাতের বর্ণের অর্থ একই

৬৭. মেশিন ভাষার সুবিধা কোনটি?
ক. প্রোগ্রাম সরাসরি ও দ্রুত কার্যকরী হয়
খ. সহজ বলে সাধারণের ব্যবহার উপযোগী
গ. প্রোগ্রামের ভুল সহজে শনাক্ত করা যায়
ঘ. সাব-প্রোগ্রামের আকারে লেখা যায়

৬৮. **for(i=1;i<10;i+=2)**
printf("%d",i);
স্টেটমেন্টটির ফলাফল কোনটি?
ক. ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
খ. ১ ৩ ৫ ৭ ৯
গ. ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ঘ. ২ ৪ ৬ ৮ ১০

৬৯. **&&** লজিক্যাল অপারেটর—
ক. লজিক্যাল AND অপারেশন সম্পন্ন করে
খ. লজিক্যাল OR অপারেশন সম্পন্ন করে
গ. লজিক্যাল NOT অপারেশন সম্পন্ন করে
ঘ. লজিক্যাল NAND অপারেশন সম্পন্ন করে

■ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৭০. কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট হলো–
i. if ii. switch
iii. for
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭১. হেডার ফাইল হলো–
i. stdio.h ii. math.h
iii. input.h
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭২. C প্রোগ্রামের ভাষায় লুপ নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলো হচ্ছে—
i. for ii. do while
iii. array
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

৫১	খ	৫২	ঘ	৫৩	গ	৫৪	গ	৫৫	খ	৫৬	খ	৫৭	খ	৫৮	গ	৫৯	খ	৬০	ক	৬১	খ
৬২	গ	৬৩	খ	৬৪	গ	৬৫	খ	৬৬	ক	৬৭	ক	৬৮	খ	৬৯	ক	৭০	গ	৭১	ক	৭২	ক

৭৩. যে কোনো প্রোগ্রাম রচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে—
i. সমস্যা নির্ধারণ ও বিশ্লেষণ
ii. অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট তৈরি
iii. প্রোগ্রাম কোডিং ডিবাগিং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৪. উচ্চস্তরের ভাষাকে মেশিনের ভাষায় পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত অনুবাদক প্রোগ্রামগুলো হলো–
i. অ্যাসেম্বলার ii. কম্পাইলার
iii. ইন্টারপ্রেটার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii ও iii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৭৫. প্রবাহচিত্র বা ফ্লোচার্ট সম্পর্কে নিচের যে বিবরণগুলো সঠিক–
i. প্রবাহচিত্র হচ্ছে প্রোগ্রামের ভিত্তি
ii. প্রোগ্রাম কোন প্রকার পরিবর্তন করতে হলে প্রথমে প্রবাহচিত্র পুনর্বিন্যস্ত করে নিতে হবে
iii. প্রোগ্রামের প্রতিটি নির্দেশ প্রবাহচিত্রের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৬. কোনো প্রোগ্রাম লেখার কাজ শেষ করার পর যে ত্রুটি থাকতে পারে—
i. নির্বাহজনিত ত্রুটি ii. যুক্তিসংক্রান্ত ত্রুটি
iii. চিহ্নসংক্রান্ত ত্রুটি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৭. ইন্টারপ্রিটার সম্পর্কে নিচের যে বিবরণ সঠিক–
i. এটি একটি অনুবাদক প্রোগ্রাম
ii. এটি উচ্চস্তরের ভাষাকে যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তরিত করতে পারে
iii. এর অনুবাদ করার পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া কম্পাইলারের মতোই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. iii ঘ. ii ও iii

৭৮. 4GL সম্পর্কিত তথ্য—
i. একে RAD টুল বলা হয়
ii. এর সাহায্যে কম্পিউটারের সাথে সংযোগ স্থাপন করা যায়
iii. অপারেটিং সিস্টেম তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৯. 'সি' ভাষায় গাণিতিক অপারেটরের সাহায্যে—
i. যোগ করা যায়
ii. ছোট বড় তুলনা করা যায়
iii ভাগশেষ নির্ণয় করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮০. অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ভাষা হলো–
i. C ii. C++
iii. Java
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

■ **অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮১ ও ৮২নং প্রশ্নের উত্তর দাও।**
সি প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ ডেটা টাইপের জন্য বেশ সমৃদ্ধ। সাধারণত ডেটা টাইপ মেশিনের উপর নির্ভরশীল। ANSI C তে চার ধরনের ডেটা ব্যবহৃত হয়।

৮১. C ভাষা **long integer** মেমরিতে কত বাইট জায়গা নেয়?
ক. ২ বাইট খ. ৪ বাইট
গ. ৮ বাইট ঘ. ১৬ বাইট

৮২. C ভাষায় কোন ধরনের অনুবাদক প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়?
i. Compiler ii. Interpreter
iii. Assembler
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. সবগুলো

■ **নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৮৩ ও ৮৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।**

```
#include<stdio.h>
main ()
{
float x;
print ("Enter the number")
scanf("%d" ,&x);
}
```

৮৩. প্রোগ্রামে ডিক্লেয়ার করা **float x** এর **x** কী?
ক. ভেরিয়েবল খ. ধ্রুবক
গ. স্টেটমেন্ট ঘ. লাইব্রেরি ওয়ার্ড

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

৭৩	ঘ	৭৪	খ	৭৫	ক	৭৬	ঘ	৭৭	খ	৭৮	ক	৭৯	খ	৮০	খ	৮১	খ	৮২	ক	৮৩	ক

৮৪. প্রোগ্রামে লেখা ভুল %d এর পরিবর্তে যেটি ব্যবহার করা যেতে পারে—

i. % f ii. % .2f
iii. % s

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৮৫ ও ৮৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সি প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজে বিভিন্ন ধরনের অপারেটর ব্যবহার করা হয়। যেমন– +, –, (), *, / প্রভৃতি ক্যারেক্টারগুলো হলো অপারেটর। তাছাড়া ANSI এর মান অনুযায়ী সি ল্যাংগুয়েজে ৩২টি কীওয়ার্ড আছে।

৮৫. নিচের কোনটি লজিক্যাল অপারেটর?

ক. < = খ. << =
গ. && ঘ. <<

৮৬. সি প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজে কীওয়ার্ড হলো–

i. auto ii. double
iii. union

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ করে ৮৭ ও ৮৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

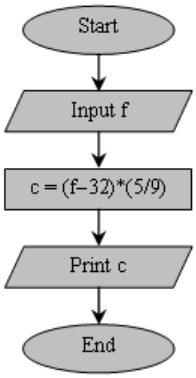

৮৭. উপরের চিত্রের [ ] প্রতীকটির অর্থ–

ক. ইনপুট খ. আউটপুট
গ. প্রক্রিয়াকরণ ঘ. কোনটি নয়

৮৮. উপরের চিত্রের ▱ প্রতীকটির অর্থ–

i. ইনপুট ii. আউটপুট
iii. প্রক্রিয়াকরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৮৯ ও ৯০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

ইব্রাহিম একটি সফটওয়্যার কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিতে এসেছে। কোন সংখ্যা জোড় না বিজোড় তা বের করার জন্য একটি প্রোগ্রাম লিখতে বলায় সে সি–ল্যাংগুয়েজে একটি প্রোগ্রাম রচনা করল।

৮৯. সি ল্যাংগুয়েজে কী ওয়ার্ডের সংখ্যা কতটি?

ক. ১৫ খ. ২০
গ. ২২ ঘ. ৩৫

৯০. উদ্দীপকে উল্লিখিত সি প্রোগ্রামিং ভাষায়–

i. শুরু হয় একটি ফাংশন main () এর মাধ্যমে
ii. ডেটা ইনপুট নেয়ার জন্য Read() ফাংশান ব্যবহৃত হয়
iii. প্রতিটি Statement-এর শেষে সেমিকোলন (;) দিতে হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i ,ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯১ ও ৯২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সাব্বির একটি প্রোগ্রাম রচনা করল এবং প্রোগ্রামটি নির্বাহ করার পর সব ভুল একসাথে দেখালো।

৯১. অনুবাদক প্রোগ্রামটি হলো–

ক. ইন্টারপ্রেটার খ. কম্পাইলার
গ. অ্যাসেম্বলার ঘ. লিংকার

৯২. উদ্দীপকে উল্লিখিত অনুবাদক প্রোগ্রামটির বৈশিষ্ট্য হলো–

i. উৎস প্রোগ্রামকে বস্তু প্রোগ্রামে অনুবাদ করে
ii. সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটিকে একসাথে পড়ে এবং একসাথে অনুবাদ করে
iii. প্রোগ্রামে কোন ভুল থাকলে তা জানিয়ে দেয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i ,ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯৩ ও ৯৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

ইকবাল একটি প্রোগ্রাম রচনা করার জন্য প্রথমে প্রোগ্রামটির অ্যালগরিদম তৈরি করে এর আলোকে কোড লিখল।

৯৩. অ্যালগরিদম হলো–

ক. চিত্রের সাহায্যে সমস্যা সমাধান করার পদ্ধতি
খ. ডিবাগিং
গ. সুডোকোড
ঘ. ধাপে ধাপে সমস্যা সমাধান করার পদ্ধতি

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

৮৪	ক	৮৫	গ	৮৬	ঘ	৮৭	গ	৮৮	ক	৮৯	খ	৯০	গ	৯১	খ	৯২	ঘ	৯৩	গ

৯৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত অ্যালগরিদমের বৈশিষ্ট্য হলো–
i. সহজে প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য বুঝতে সহায়তা করে
ii. প্রোগ্রামের ভুল নির্ণয়ে সহায়তা করে
iii. প্রোগ্রাম পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে সহায়তা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i ,ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯৫ ও ৯৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
প্রোগ্রামার ইকবালকে তার কোম্পানির সিস্টেম এনালিস্ট হাসান চিত্রের মাধ্যমে একটি প্রোগ্রাম কীভাবে রচনা করা হবে তা দেখিয়ে দিল। ইকবাল এর আলোকে প্রোগ্রাম রচনা শুরু করল।

৯৫. উদ্দীপকের চিত্রের সাহায্যে সমস্যা সমাধান করার পদ্ধতিকে কি বলা হয়?
ক. অ্যালগরিদম খ. ডিবাগিং
গ. সুডোকোড ঘ. ফ্লোচার্ট

৯৬. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টির বৈশিষ্ট্য হলো–
i. জ্যামিতিক বা সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে প্রোগ্রামের পরিকল্পনা
ii. প্রোগ্রাম প্রবাহের দিক অনুধাবন করা যায়
iii. ধাপে ধাপে সমস্যা সমাধান করার পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i ,ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯৭ ও ৯৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

```
#include <Stdio.h>
# include<conio.h>
main(){
int x, y, s;
printf("Enter Value :");
scanf("%d", "%d", &x, &y);
s = x+y;
printf("\ns   =%d", s);
getch();
}
```

৯৭. উদ্দীপকে লিখিত প্রথম হেডার ফাইলটির সঠিক রূপ কোনটি–
ক. <Stdio.h> খ. <STDIO.H>
গ. <STDio.H> ঘ. <stdio.h>

৯৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত **printf()** এবং **scanf()** ফাংশনদ্বয়ের কাজ হলো–
i. প্রিন্ট করা এবং তথ্য স্ক্যান করা
ii. আউটপুট দেখানো এবং ইনপুট নেয়া
iii. পর্দায় প্রদর্শন করা এবং প্রিন্ট করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii
গ. i ও iii ঘ. i ,ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯৯ ও ১০০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

```
#include <stdio.h>
# include<conio.h>
main(){
int x, y, s;
printf("Enter Value :");
scanf("%d", "%d", &x, &y);
s = x+y;
printf("\ns   =%d", s);
getch();
}
```

৯৯. **float** ডেটা টাইপের জন্য মেমোরিতে কত বাইট জায়গা দখল হয়?
ক. 2 খ. 4
গ. 8 ঘ. 16

১০০. উদ্দীপকে যে মৌলিক ডেটা টাইপ উল্লেখ করা আছে তাহলো–
i. int ii. float
iii. char
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i ,ii ও iii

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

৯৪	ঘ	৯৫	ঘ	৯৬	ক	৯৭	ঘ	৯৮	খ	৯৯	খ	১০০	ক						

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মুসা একাদশ শ্রেণির ছাত্র। আইসিটি শিক্ষক জনাব মোঃ ইকবাল বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ে প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ সম্পর্কে লেকচার দিয়েছেন। কিন্তু মুসা বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারছে না, তাই সে বিষয়টি পুনরায় বুঝিয়ে দেয়ার অনুরোধ করায় স্যার ক্লাসের সবার উদ্দেশে বিষয়টি বিস্তারিত বুঝিয়ে দিলেন।

ক. ফ্লোচার্ট কী? ১

খ. অ্যালগরিদম প্রোগ্রাম রচনার সহায়ক-বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. মুসা কীভাবে একটি প্রোগ্রাম উন্নয়ন করবে? উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রেটার হলো উদ্দীপকের শিক্ষকের বুঝিয়ে দেয়া ক্ষেত্রটির অনুবাদক"— বিশ্লেষণ কর। ৪

২. **নিচের উদ্দীপকটি পর্যবেক্ষণ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

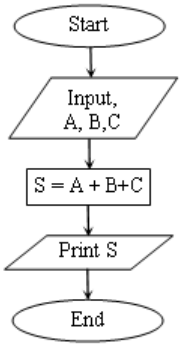

ক. অ্যালগরিদম কী? ১

খ. প্রতীক ব্যবহারে প্রবাহচিত্র সহজ হয় — বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের উল্লেখিত প্রবাহ চিত্রের প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে তিনটি সংখ্যার গড় বের করার জন্য প্রবাহ চিত্রে কি পরিবর্তন হবে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩. **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

C একটি জনপ্রিয় হাইলেভেল ল্যাংগুয়েজ। সি ভাষায় সহজেই অত্যন্ত জটিল সমস্যা সমাধান করা যায়। রায়হান একটি সাধারণ প্রোগ্রাম লেখার জন্য সি ভাষা ব্যবহার করেছে।

ক. হাইলেভেল ল্যাংগুয়েজ কী? ১

খ. সি-কে একটি মধ্যমস্তরের ভাষা বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ভাষাটির গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. রায়হানের ব্যবহৃত প্রোগ্রামিং ভাষাটি সুবিধাজনক — বিশ্লেষণপূর্বক তোমার মতামত দাও। ৪

৪. **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

জনাব লকিত উল্লাহ আশাশুনি হাই স্কুল এন্ড কলেজের কম্পিউটার শিক্ষক। তিনি যখন প্রোগ্রাম তৈরি করেন তখন তা ধাপে ধাপে করেন। কিন্তু তারপরও একটি সমস্যায় পড়তে হয়েছে তাকে। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর ওজন ও উচ্চতার তালিকা করার জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করতে গিয়ে দেখেন একই নাম বারবার এসেছে। অবশ্য সম্প্রতি তিনি এমন একটি প্রোগ্রাম ব্যবহার করছেন, যার ফলে কম্পিউটারে বারবার অনুবাদ করতে হয় না।

ক. অনুবাদক প্রোগ্রাম কী? ১

খ. হাইলেভেল ল্যাংগুয়েজে প্রোগ্রাম রচনা করা অনেক সহজ- বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. লকিত উল্লাহ সাহেব যদি ১৮ কেজি ওজনের সব ছাত্র-ছাত্রীর ওজন বের করতে চান, তাহলে তাকে কোন প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে হবে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. লকিত উল্লাহ সাহেবের সম্প্রতি ব্যবহার করা প্রোগ্রামটি অত্যন্ত জনপ্রিয়– বিশ্লেষণ কর। ৪

৫. **উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

সাতনরী ওয়েল কোম্পানির শ্রমিকদের সপ্তাহিক মজুরি হিসাব করার জন্য কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাব কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিলেন। তিনি বলে দিলেন, যারা সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করবে তারা মজুরি ৪৫০ টাকা হারে পাবে, আর যারা ৪০ ঘণ্টার অতিরিক্ত কাজ করবে তারা অতিরিক্ত কাজের জন্য ঘণ্টা প্রতি ৬৫০ টাকা হারে মজুরি পাবে। হিসাব কর্মকর্তা মজুরি হিসাব করার জন্য একটি প্রোগ্রাম তৈরির অ্যালগরিদম লিখতে বললেন।

ক. সুডোকোড কী? ১

খ. সি ভাষায় প্রোগ্রাম লেখার শুরুতেই হেডার ফাইল উল্লেখ করতে হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে আলোকে অ্যালগরিদম লিখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকের হিসাব কর্মকর্তার নির্দেশিত কাজে অ্যালগরিদম এবং ফ্লোচার্টের গুরুত্ব অনেক– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬. **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

আবিরের গায়ে প্রচণ্ড জ্বর। ডাক্তার থার্মোমিটার দিয়ে মেপে দেখলেন 105^0 F কিন্তু রুমের তাপমাত্রা তখন 30^0C। আইসিটি ক্লাসে স্যার ফারেনহাইটকে সেলসিয়াসে কনভার্ট করার যে প্রোগ্রামের কথা বর্ণনা দিয়েছিলেন আবিরের তা মনে পড়ল।

ক. অ্যাসেম্বলার কী? ১

খ. সি ভাষায় চলকের নামকরণে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ফারেনহাইটকে সেলসিয়াসে কনভার্ট করার অ্যালগরিদম লিখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আবিরকে ফারেনহাইটকে সেলসিয়াসে কনভার্ট করার প্রোগ্রাম লিখতে পাঁচটি ধাপ সম্পন্ন করতে হবে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৭. **উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int i , N;
long Sum=0;
printf("\nEnter last number of the series: ");
scanf("%d", &N);
printf("1 + 2 + 3+  ... + N = ", N);
for (i=1;i<=N; i= i+1 ) // Condition
{
Sum = Sum +i;
}  // End of for
printf("%ld", Sum);
getch();
}
```

ক. অপারেটর কী? ১
খ. সি ভাষায় প্রোগ্রাম লিখতে একটি নির্দিষ্ট গঠন মেনে চলতে হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রোগ্রামটির অ্যালগরিদম লিখ। ৩
ঘ. ২+৪+৬+৮+... +১০০ পর্যন্ত জোড় সিরিজ নাম্বারের যোগফল নির্ণয় করার জন্য উদ্দীপকে যে পরিবর্তন করতে হবে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮. **উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

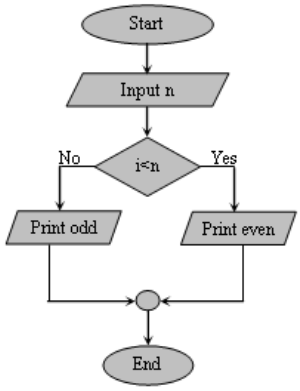

ক. লুপ কী? ১
খ. সি ভাষায় ইচ্ছেমতো চলকের নাম লিখা যায় না কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটির অ্যালগরিদম লিখ। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটির ক্ষেত্রে লিখিত সি প্রোগ্রাম বিশ্লেষণ কর। ৪

৯. **উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

সাকিব আইসিটি বিষয়টি পড়ছিল। সে ৫ম অধ্যায়ের প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজে তিনটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যাটি নির্ণয়ের প্রোগ্রামটি দেখছিল। কিন্তু সে প্রোগ্রামটি বুঝতে পারছিল না। তার বড় বোন কমপিউটার প্রকৌশলী মারুফা রহমান তাকে বিষয়টি সহজ করে বুঝিয়ে দিল।

ক. অ্যালগরিদম কী? ১
খ. কম্পাইলারের তুলনায় ইন্টারপ্রেটার কোন ক্ষেত্রে ভালো ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটির ফ্লোচার্ট লিখ। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটির ক্ষেত্রে লিখিত সি প্রোগ্রাম বিশ্লেষণ কর। ৪

১০. **উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

```
int i , n[20], s=0;
for (i=0;i<=20; i= i++ )
{
Scanf("%d", &n[i]);
sum = sum +n[i];
}
```

ক. ফরমেট স্পেসিফায়ার কী? ১
খ. কীওয়ার্ডকে ভেরিয়েবল হিসেবে ব্যবহার করা যায় না কেন? ২
গ. উদ্দীপকের for স্টেটমেন্টটির বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকের প্রোগ্রামটি Run করার জন্য করণীয় বিশ্লেষণ কর। ৪

সি প্রোগ্রামিং প্র্যাকটিক্যাল (অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্টসহ)

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ দুটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করার অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম লেখ।

মূলতত্ত্ব ঃ কীবোর্ড হতে দুটি ইন্টেজার নাম্বার ইনপুট করার জন্য ফাংশন scanf() ব্যবহার করতে হবে। অতঃপর তাদের যোগফল নির্ণয় করে যোগফলকে প্রদর্শন করার জন্য আউটপুট ফাংশন printf() ব্যবহার করতে হবে।

Algorithm :

Step-1 : Start
Step-2 : Input A, B
Step-3 : Sum = A + B
Step-4 : Print, Sum
Step-5 : End

Flowchart :

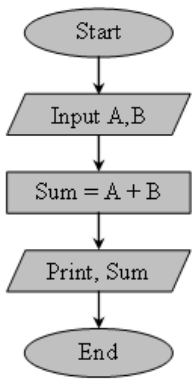

C-Program :

```
# include <stdio.h>
void main ( )
{
int A, B, Sum;
scanf("%d %d",&A,&B);
Sum = A + B;

printf ("%d",sum);
}
```

- প্রোগ্রামে কীবোর্ড থেকে সংখ্যামান ইনপুট করার জন্য scanf() ফাংশন ব্যবহৃত হয়েছে।
- ফলাফল প্রদর্শনের জন্য printf() ফাংশন ব্যবহৃত হয়েছে।
- ইন্টেজার টাইপ মান Sum প্রদর্শনের জন্য ফরম্যাট স্পেসিফায়ার হিসেবে %d ব্যবহৃত হয়েছে।

Output :
8 12 ↵ (Input)
20

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ তিনটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করার অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম লেখ।

মূলতত্ত্ব ঃ কীবোর্ড হতে তিনটি ইন্টেজার নাম্বার ইনপুট করার জন্য ফাংশন scanf() ব্যবহার করতে হবে। অতঃপর তাদের যোগফল নির্ণয় করে যোগফলকে প্রদর্শন করার জন্য আউটপুট ফাংশন printf() ব্যবহার করতে হবে।

Algorithm :

Step-1 : Start
Step-2 : Input A, B, C
Step-3 : Sum=A+B+C
Step-4 : Print, Sum
Step-5 : End

Flowchart :

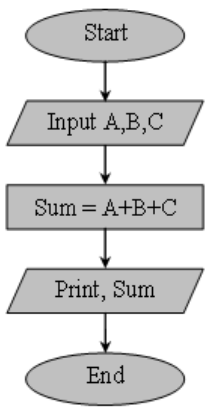

C-Program :

```
# include <stdio.h>
void main ( )
{
int A, B, C, Sum;
scanf("%d %d%d",&A,&B,&C);

Sum = A + B + C;

printf ("%d",sum);

}
```

Output :
5 8 13 ↵ (Input)
26

টার্বো সিতে করা অনেক প্রোগ্রাম কোডব্লক কম্পাইলারটিতে রান করে না।

এর কারণ হলো কোডব্লক কম্পাইলারটিতে হেডার ফাইল conio.h প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ এ হেডার ফাইলের ফাংশান (যেমন- getch(), clrscr()) ফাইলগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে। তাই প্রোগ্রামে উক্ত ফাংশানগুলোর জন্য হেডার ফাইল ডিক্লেয়ার করার প্রয়োজন নেই। তাই যেসব প্রোগ্রামে এ হেডার ফাইল এবং ফাংশানগুলো রয়েছে সেগুলো উঠিয়ে দিয়ে প্রোগ্রামটি চালালে রান করবে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ তিনটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা ৫, ১০, ১৫ এর যোগফল নির্ণয় করার অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম লেখ।

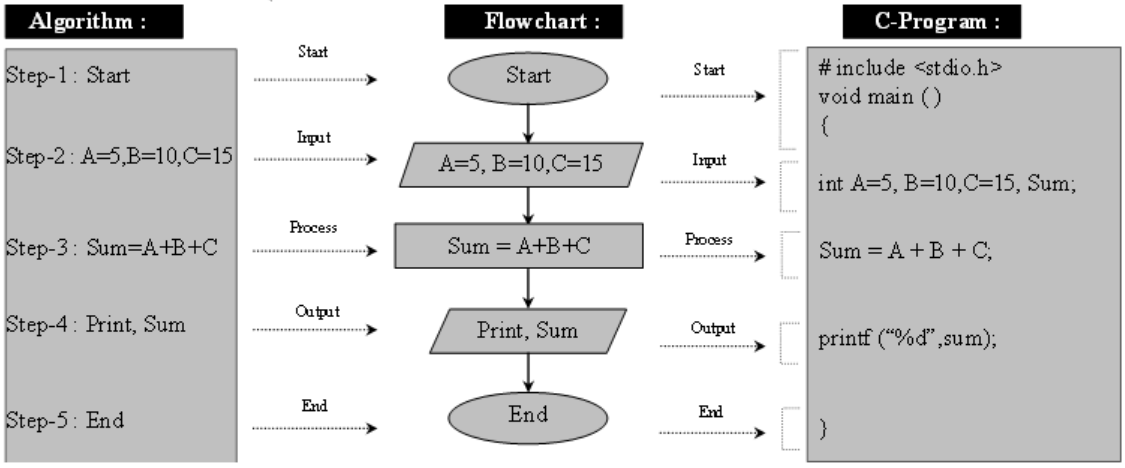

- এখানে যেহেতু সংখ্যা তিনটির মান তিনটি ভেরিয়েবলে নির্দিষ্ট করা আছে তাই কী বোর্ড থেকে ইনপুট নিতে হচ্ছে না। শুধুমাত্র ফলাফল প্রদর্শনের জন্য printf() ফাংশন ব্যবহৃত হয়েছে।

Output :
30

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ তিনটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার গড় নির্ণয় করার অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম লেখ।

মূলতত্ত্ব ঃ কীবোর্ড হতে তিনটি ইন্টেজার নাম্বার ইনপুট করার জন্য ফাংশন scanf() ব্যবহার করতে হবে। অতঃপর তাদের যোগফল নির্ণয় করে যোগফলকে তিন দ্বারা ভাগ করলে গড় মান পাওয়া যাবে।

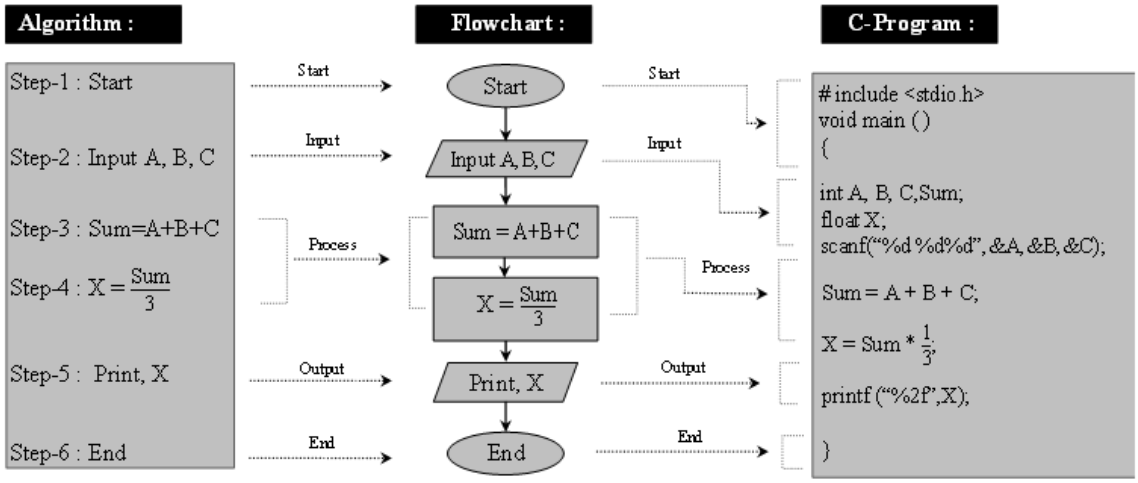

যেহেতু গড়ফল ফ্লোয়েট (দশমিকের পর সংখ্যা অর্থাৎ ভগ্নাংশ) হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাই ফ্লোয়েট টাইপের ভেরিয়েবল (float X;) ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এবং ফলাফল হিসাবে X এর মান দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত প্রদর্শনের জন্য ফরম্যাট স্পেসিফায়ার হিসেবে %.2f ব্যবহৃত হয়েছে।

Output :
30 10 7 ↵ (Input)
23.50

বিকল্প পদ্ধতি

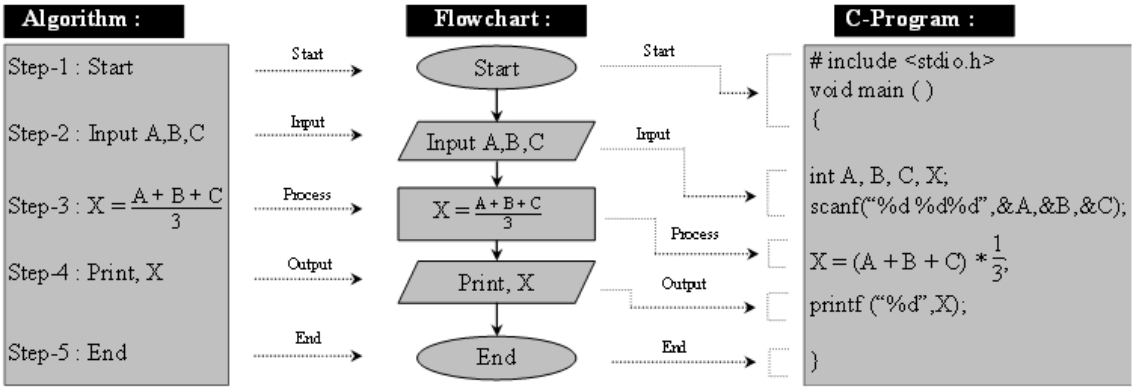

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম লেখ।

মূলতত্ত্ব ঃ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য scanf() ব্যবহার কীবোর্ড হতে প্রথমে ত্রিভুজের ভূমি এবং ত্রিভুজের উচ্চতা গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর ক্ষেত্রফল = ১/২ × ভূমি × উচ্চতা সূত্র ব্যবহার করে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে।

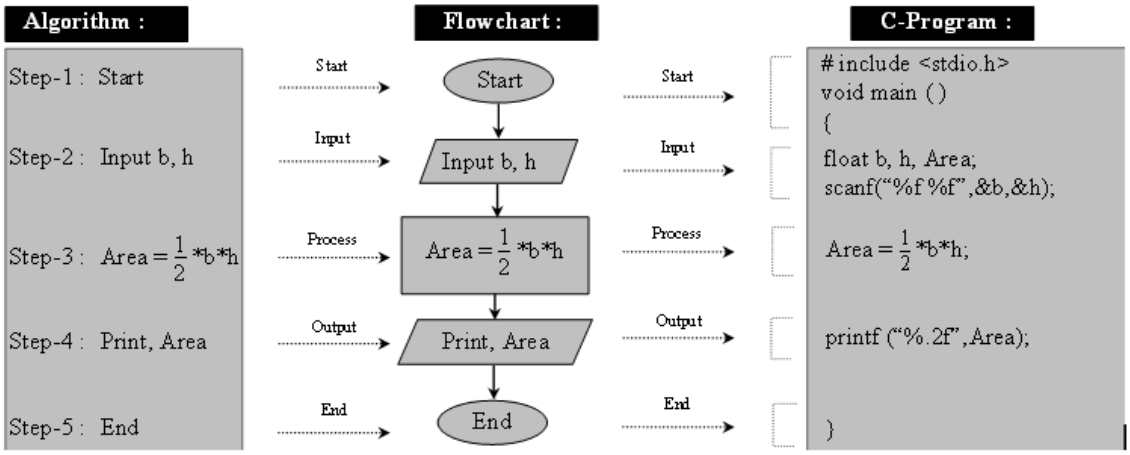

যেহেতু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ফ্লোয়েট (দশমিকের পর সংখ্যা অর্থাৎ ভগ্নাংশ) হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাই ফ্লোয়েট টাইপের ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এবং ফলাফল হিসাবে Area এর মান দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত প্রদর্শনের জন্য ফরম্যাট স্পেসিফায়ার হিসেবে %.2f ব্যবহৃত হয়েছে।

Output :
7 3.5 ↵ (Input)
12.25

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ সেন্টিমিটারকে ইঞ্চিতে রূপান্তর করার প্রোগ্রাম।

সেন্টিমিটারকে ইঞ্চিতে রূপান্তর করার জন্য ১ ইঞ্চি = ২.৫৪ সেন্টিমিটার সূত্রটি ব্যবহার করতে হবে। সূত্রানুসারে, ১ সেন্টিমিটার = ১ /২.৫৪ ইঞ্চি হবে।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ ইঞ্চিকে সেন্টিমিটারে রূপান্তর করার প্রোগ্রাম।

ইঞ্চিকে সেন্টিমিটারে রূপান্তর করার জন্য ১ ইঞ্চি = ২.৫৪ সেন্টিমিটার সূত্রটি ব্যবহার করতে হবে। সূত্রানুসারে, ৫ ইঞ্চি = ৫*২.৫৪ সেন্টিমিটার হবে।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম লেখ।

মূলতত্ত্ব ঃ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য scanf() ব্যবহার কীবোর্ড হতে প্রথমে আয়তক্ষেত্রের ভূমি এবং আয়তক্ষেত্রের উচ্চতা গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর ক্ষেত্রফল = ভূমি × উচ্চতা সূত্র ব্যবহার করে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে।

Algorithm :

Step-1 : Start
Step-2 : Input b, h
Step-3 : Area = b*h
Step-4 : Print, Area
Step-5 : End

Flowchart :

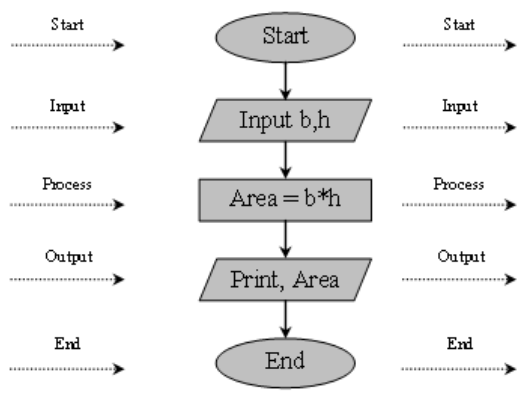

C-Program :

```
# include <stdio.h>
void main ( )
{
float b, h, Area;
scanf("%f %f",&b,&h);
Area = b*h;
printf ("%f",Area);
}
```

যেহেতু ফলাফল ফ্লোয়েট (দশমিকের পর সংখ্যা অর্থাৎ ভগ্নাংশ) হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাই ফ্লোয়েট টাইপের ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এবং ফলাফল হিসাবে Area এর মান দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত প্রদর্শনের জন্য ফরম্যাট স্পেসিফায়ার হিসেবে %.2f ব্যবহৃত হয়েছে।

Output :
7.25 4.65 ↵ (Input)
33.71

প্রশ্ন ॥ ৯॥ বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম লেখ।

মূলতত্ত্ব ঃ বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য scanf() ব্যবহার কীবোর্ড হতে বৃত্তের ব্যাসার্ধ গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর ক্ষেত্রফল = π × (ব্যাসার্ধ)^{২} সূত্র ব্যবহার করে বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে। এখানে π (পাই) একটি ধ্রুব সংখ্যা যার মান ২২/৭।

Algorithm :

Step-1 : Start
Step-2 : Input r
Step-3 : Area = π*r*r
Step-4 : Print Area
Step-5 : End

Flowchart :

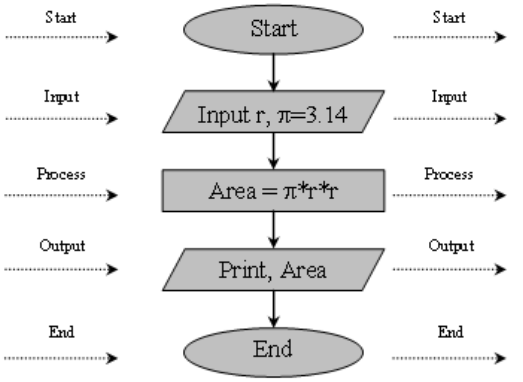

C-Program :

```
# include <stdio.h>
# include <conio.h>
void main ( )
{
float r, Area;
scanf("%f",&r);
Area = 3.14*r*r;
printf ("%f",Area);
getch ()
}
```

যেহেতু ফলাফল ফ্লোয়েট (দশমিকের পর সংখ্যা অর্থাৎ ভগ্নাংশ) হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাই ফ্লোয়েট টাইপের ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এবং ফলাফল হিসাবে Area এর মান দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত প্রদর্শনের জন্য ফরম্যাট স্পেসিফায়ার হিসেবে %.2f ব্যবহৃত হয়েছে।

Output :
3 ↵ (Input)
28.26

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ সেন্টিগ্রেট তাপমাত্রাকে ফারেনহাইট তাপমাত্রায় রূপান্তর এলগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম লেখ।

মূলতত্ত্ব ঃ scanf() ব্যবহার কীবোর্ড হতে সেন্টিগ্রেড স্কেলে তাপমাত্রা (C) গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর F=9*C/5+32 সূত্র ব্যবহার করে গৃহীত সেন্টিগ্রেড স্কেলের তাপমাত্রাকে ফারেনহাইট স্কেলে রূপান্তর করতে হবে।

Algorithm :

Step-1 : Start
Step-2 : Input c
Step-3 : f = 9*c/5+32
Step-4 : Print f
Step-5 : End

Flowchart :

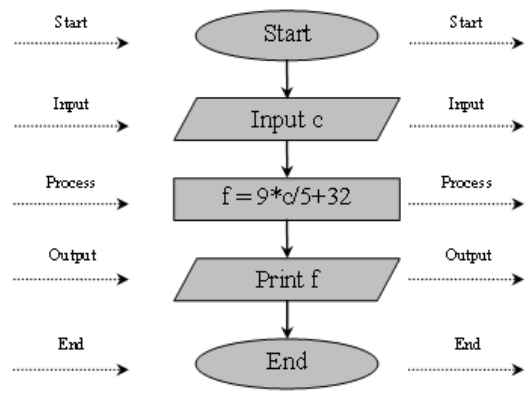

C-Program :

```
# include <stdio.h>
# include <conio.h>
void main ( )
{
float c, f;
scanf("%f",&c);
f = 9*c/5+32;
printf ("%f",f);
getch ()
}
```

যেহেতু ফলাফল ফ্লোয়েট (দশমিকের পর সংখ্যা অর্থাৎ ভগ্নাংশ) হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাই ফ্লোয়েট টাইপের ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এবং ফলাফল হিসাবে f এর মান দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত প্রদর্শনের জন্য ফরম্যাট স্পেসিফায়ার হিসেবে %.2f ব্যবহৃত হয়েছে।

Output :
33 ↵ (Input)
91.40

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ ফারেনহাইট তাপমাত্রাকে সেন্টিগ্রেট তাপমাত্রায় রূপান্তর এলগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম লেখ।

মূলতত্ত্ব ঃ scanf() ব্যবহার কীবোর্ড হতে ফারেনহাইট স্কেলে তাপমাত্রা গ্রহণ (F) করতে হবে। অতঃপর C=5*(F-32)/9 সূত্র ব্যবহার করে গৃহীত ফারেনহাইট স্কেলের তাপমাত্রাকে সেন্টিগ্রেড স্কেলে রূপান্তর করতে হবে।

Algorithm :

Step-1 : Start
Step-2 : Input f
Step-3 : c=(f-32)*(5/9)
Step-4 : Print c
Step-5 : End

Flowchart :

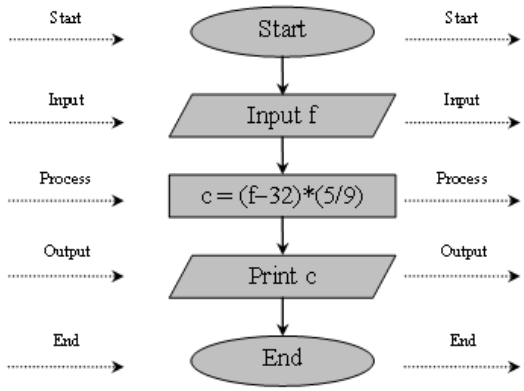

C-Program :

```
# include <stdio.h>
# include <conio.h>
void main ( )
{
float c, f;
scanf("%f",&f);
c = (f-32)*(5/9);
printf ("%.2f",c);
getch ()
}
```

যেহেতু ফলাফল ফ্লোয়েট (দশমিকের পর সংখ্যা অর্থাৎ ভগ্নাংশ) হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাই ফ্লোয়েট টাইপের ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এবং ফলাফল হিসাবে c এর মান দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত প্রদর্শনের জন্য ফরম্যাট স্পেসিফায়ার হিসেবে %.2f ব্যবহৃত হয়েছে।

Output :
91.4 ↵ (Input)
33

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ তিনটি সংখ্যার মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যাটি নির্ণয়ে অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম লেখ।

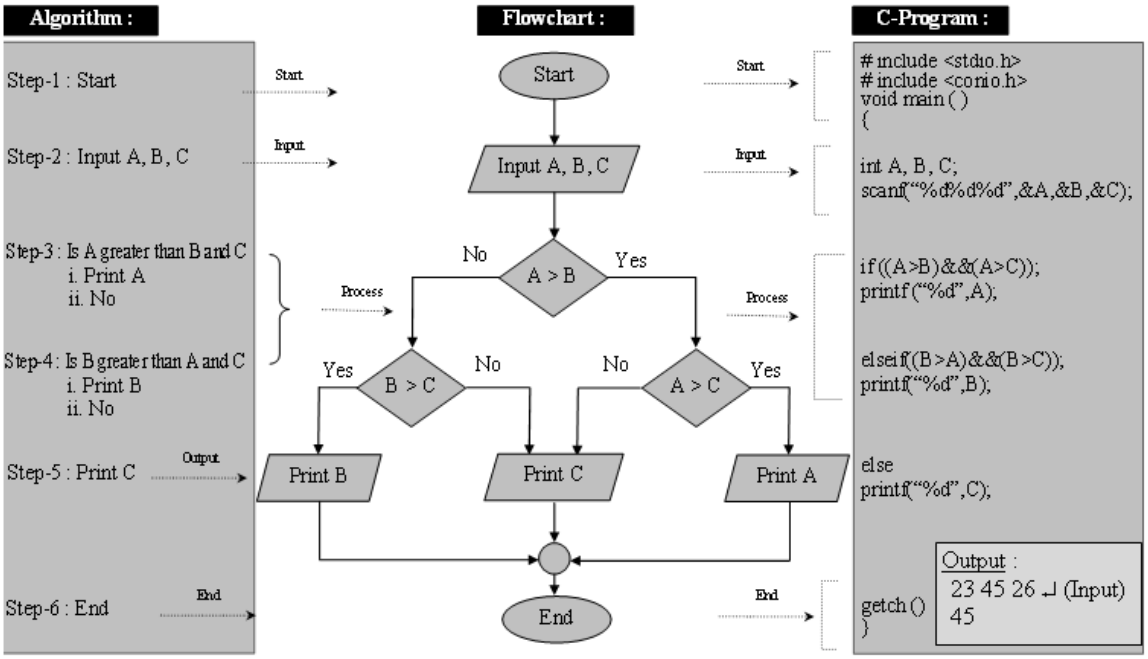

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ তিনটি সংখ্যার মধ্যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি নির্ণয়ে অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম লেখ।

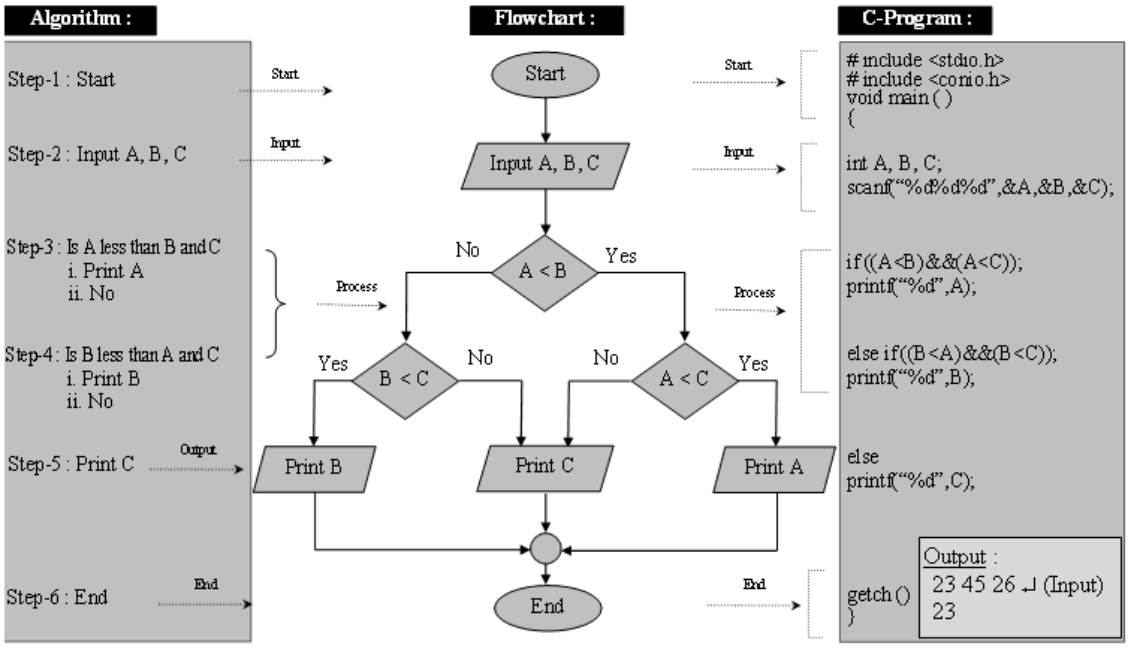

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ ১ থেকে n পর্যন্ত সংখ্যাগুলো যোগ করার অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম লেখ।

অথবা, ১ + ২ + ৩ + ---------- + n পর্যন্ত সংখ্যাগুলো যোগ করার অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম লিখ।

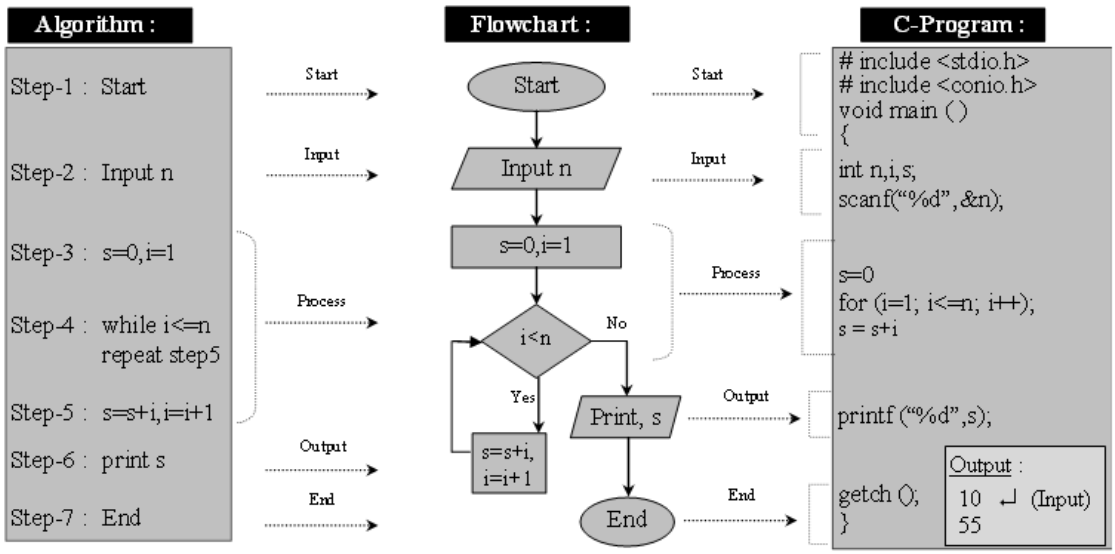

* প্রোগ্রামটি রান করা যে কী বোর্ড থেকে 10 টাইপ করলে দশটি সংখ্যার যোগফল 1 + 2 + 3 + ... 10 = 55 দেখাবে।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো যোগ করার অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম লেখ।

অথবা, ১ + ২ + ৩ + ---------- + ১০০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো যোগ করার অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম লেখ।

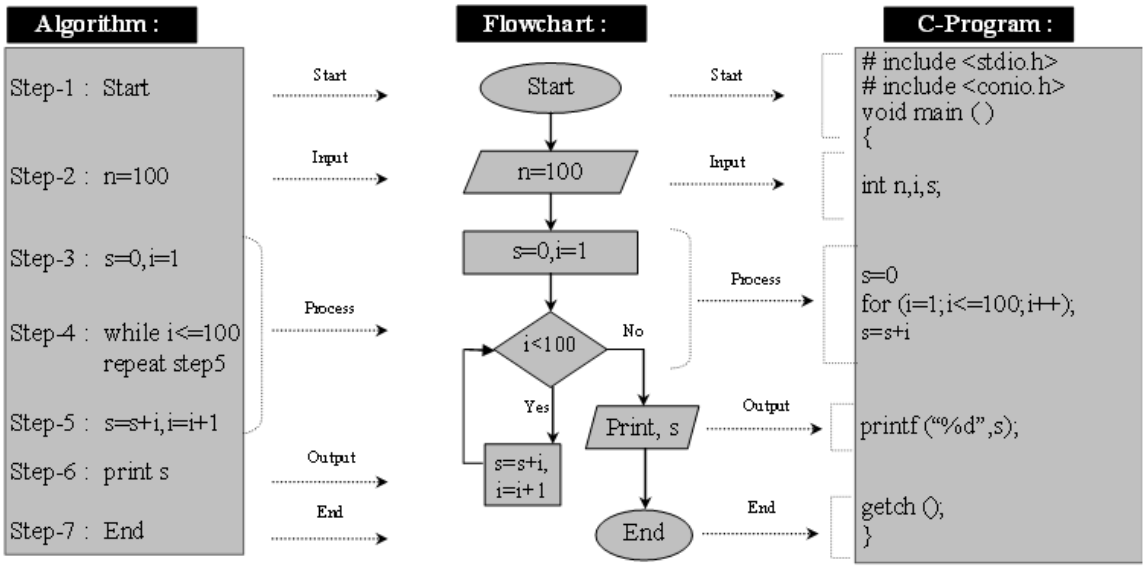

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ ১ থেকে n পর্যন্ত জোড় সংখ্যাগুলো যোগ করার অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম লেখ।

অথবা, ২ + ৪ + ৬ + ---------- + n পর্যন্ত জোড় সংখ্যাগুলো যোগ করার অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম লেখ।

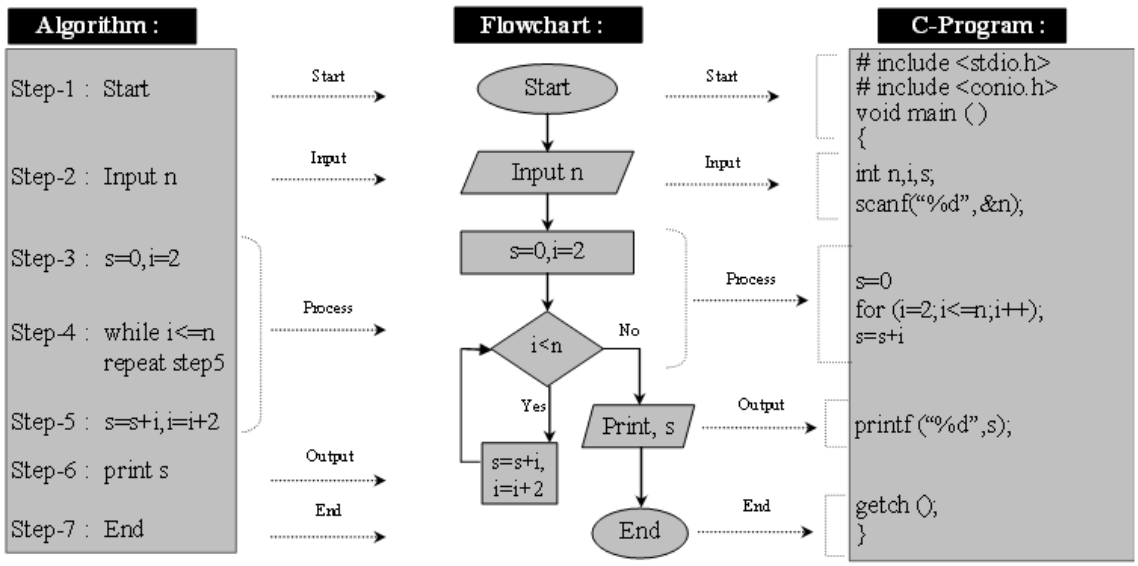

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ ১ থেকে n পর্যন্ত বিজোড় সংখ্যাগুলো যোগ করার অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম লেখ।

অথবা, ১ + ৩ + ৫ + ---------- + n পর্যন্ত বিজোড় সংখ্যাগুলো যোগ করার অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম লেখ।

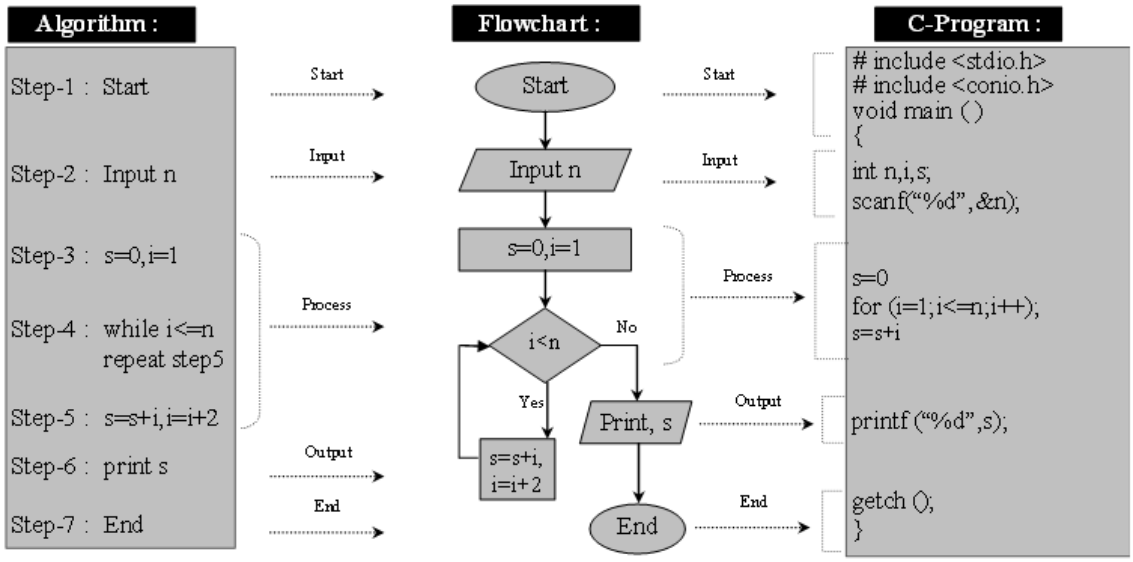

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ 5+10+15+20.....n ধারার যোগফল নির্ণয়।

উত্তর : প্রশ্ন-১৪ এ দেখানো নিয়মানুযায়ী হবে। শুধুমাত্র লুপ স্টেটমেন্টে নিচের মতো হবে।

```
for (i=5;i<=N; i= i+5 ) // Condition
{
Sum = Sum +i;
```

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ $1^2 + 2^2 + 3^2 + \text{---------} + n^2$ সংখ্যাগুলো যোগ করার অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম লেখ।

Algorithm :

Step-1 : Start
Step-2 : Input n
Step-3 : s=0,i=1
Step-4 : while i<=n
repeat step5
Step-5 : s=s+i*i,i=i+1
Step-6 : print s
Step-7 : End

Flowchart :

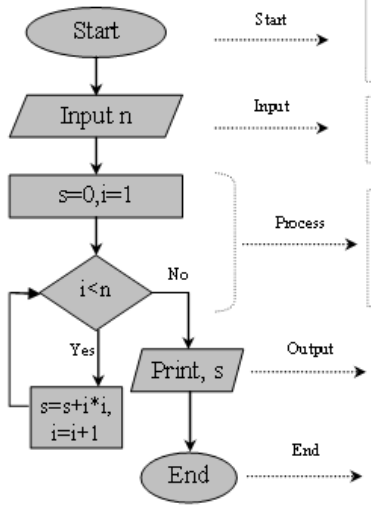

C-Program :

```
# include <stdio.h>
# include <conio.h>
void main ()
{
int n,i,s;
scanf("%d",&n);

s=0
for (i=1;i<=n;i++);
s=s+i*i

printf ("%d",s);

getch ();
}
```

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ $1^5 + 2^5 + 3^5 + \text{---------} + n^5$ সংখ্যাগুলো যোগ করার অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম লেখ।

Algorithm :

Step-1 : Start
Step-2 : Input n
Step-3 : s=0,i=1
Step-4 : while i<=n
repeat step5
Step-5 : s=s+i^5,i=i+1
Step-6 : print s
Step-7 : End

Flowchart :

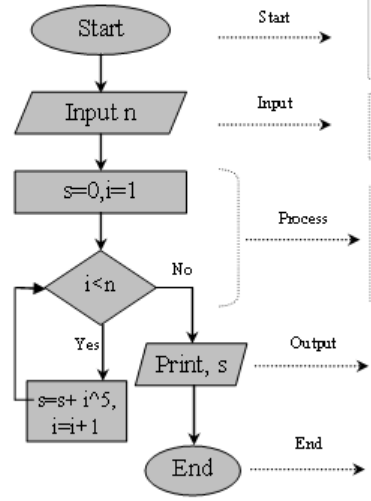

C-Program :

```
# include <stdio.h>
# include <conio.h>
void main ()
{
int n,i,s;
scanf("%d",&n);

s=0
for (i=1;i<=n;i++);
s=s+i*i*i*i*i

printf ("%d",s);

getch ();
}
```

প্রশ্ন ॥ ২১ ॥ ১ থেকে n পর্যন্ত সংখ্যাগুলো গুণ করার অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম লেখ।

অথবা, ১ × ২ × ৩ × ---------- × n পর্যন্ত সংখ্যাগুলো গুণ করার অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম লেখ।

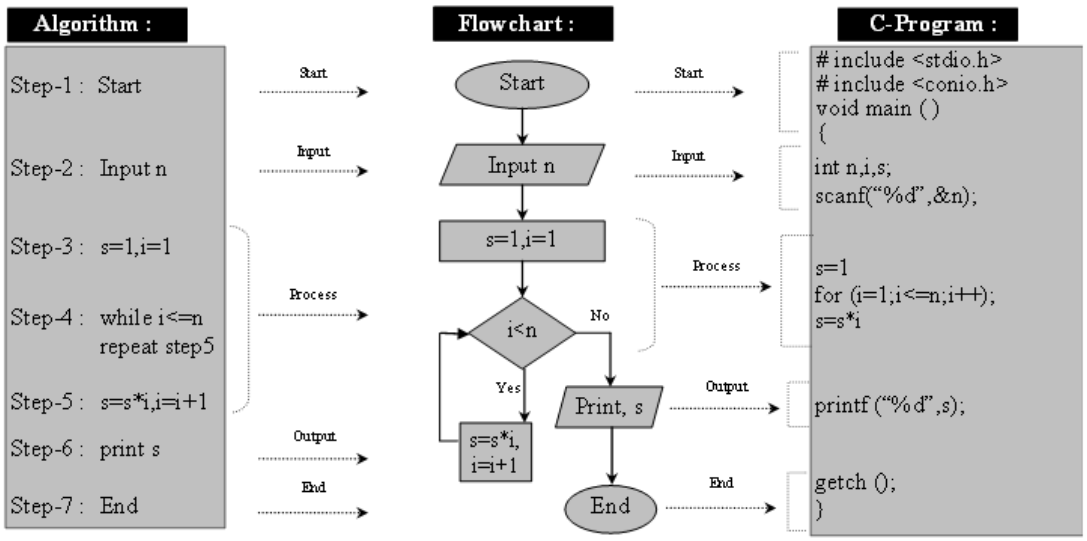

প্রশ্ন ॥ ২২ ॥ $1^2 \times 2^2 \times 3^2 \times$ --------- $\times n^2$ সংখ্যাগুলো গুণ করার অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম লেখ।

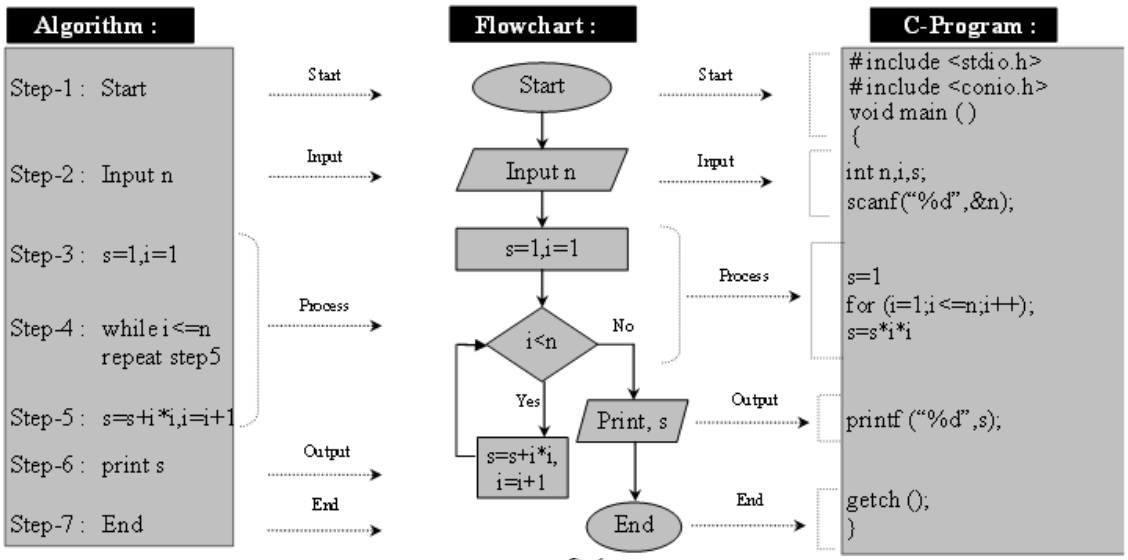

প্রশ্ন ॥ ২৩ ॥ ঃ 1.5+2.5+3.5+ .....N ধারার যোগফল নির্ণয়।

উত্তর : প্রশ্ন-১৪ এ দেখানো নিয়মানুযায়ী হবে। শুধুমাত্র লুপ স্টেটমেন্টে নিচের মতো হবে।

```
for (i=1.5;i<=N; i= i+1 ) // Condition
{
Sum = Sum +i;
```

প্রশ্ন ॥ ২৪ ॥ $1+1/2^2+1/3^2+1/4^2+$.....N ধারার যোগফল নির্ণয়।

উত্তর : প্রশ্ন-১৪ এ দেখানো নিয়মানুযায়ী হবে। শুধুমাত্র লুপ স্টেটমেন্টে নিচের মতো হবে।

```
for (i=1;i<=N; i= i+1 ) // Condition
{
Sum = Sum +1/(i*i);
```

প্রশ্ন ॥ ২৫॥ $2^2 + 4^2 + 6^2 + \ldots\ldots\ldots N^2$ ধারাটির যোগফল নির্ণয়।

উত্তর : প্রশ্ন-১৪ এ দেখানো নিয়মানুযায়ী হবে। শুধুমাত্র লুপ স্টেটমেন্টে নিচের মতো হবে।

```
for (i=2;i<=N; i= i+2 )
{
Sum = Sum +i*i;
```

দলীয় কাজ : ১+২+৩+৪ ----------ঘ সিরিজের যোগফল বের করার প্রোগ্রাম লিখ এবং একই ধরনের অন্যান্য সিরিজ যেমন : ১+৩+৫+----------ঘ ২+৪+৬+৮+----------ঘ, ১২ + ২২ + ৩২ ----------ঘ, ১.৫ + ২.৫ + ৩.৫ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রোগ্রামে কি পরিবর্তন করতে হবে ব্যাখ্যা কর।

প্রশ্ন ॥ ২৬ ॥ একটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল নির্ণয় করার অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম লেখ।

Algorithm :

Step-1 : Start
Step-2 : Input n
Step-3 : fact=1,i=1
Step-4 : while i<=n repeat step5
Step-5 : fact=fact*i i=i+1
Step-6 : print fact
Step-7 : End

Flowchart :

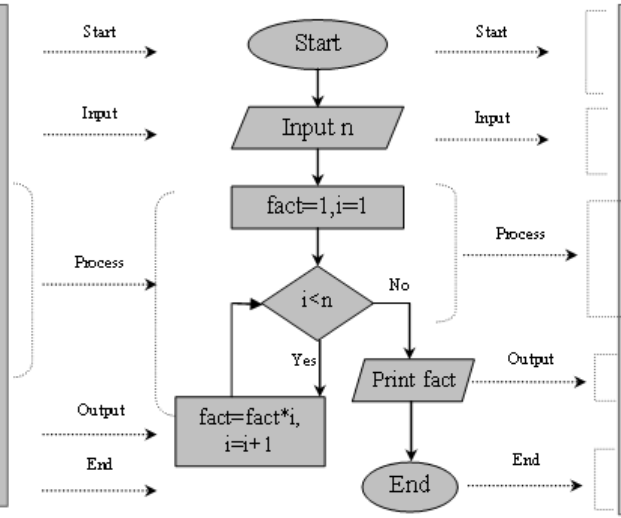

C-Program :

```
# include <stdio.h>
# include <conio.h>
void main ( )
{
int n,i,fact;
scanf("%d",&n);

fact=1
for (i=1;i<=n;i++);
fact=fact*i

printf ("%d",fact);

getch ();
}
```

প্রশ্ন ॥ ২৭ ॥ একটি সংখ্যা জোড় না বিজোড় তা নির্ণয় করার অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম লেখ।

Algorithm :

Step-1 : Start
Step-2 : Input n
Step-3 : is (n%2=0)?
Step-4 : (i) yes, print "even number" (ii) no, print "odd number"
Step-5 : End

Flowchart :

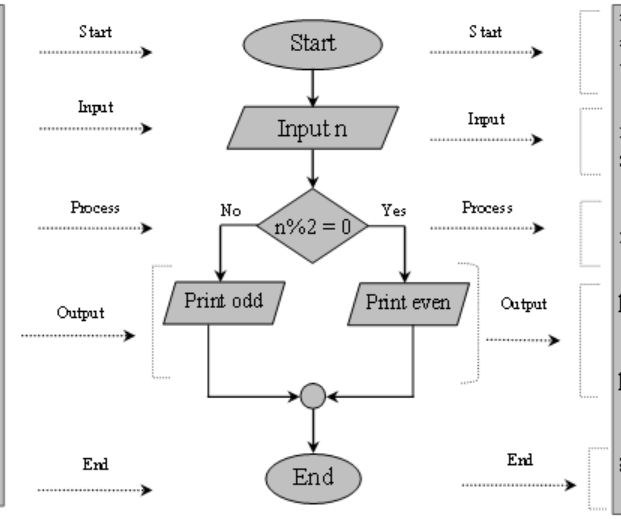

C-Program :

```
# include <stdio.h>
# include <conio.h>
void main ( )
{
int n;
scanf("%d",&n);

if(n%2 == 0)?

printf ("even number");
    else
printf ("odd number");

getch ();
}
```

প্রশ্ন ॥ ২৮ ॥ একটি বর্ষ অধিবর্ষ কিনা তা নির্ণয় করার অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম লেখ।

Algorithm :

Step-1 : Start

Step-2 : Input year

Step-3 : is
((year%400=0) ||
(year% 100!=0
&& year%4==0))

Step-4 : (i) yes, print "leap year"
(ii) no, print "not leap year"

Step-5 : End

Flowchart :

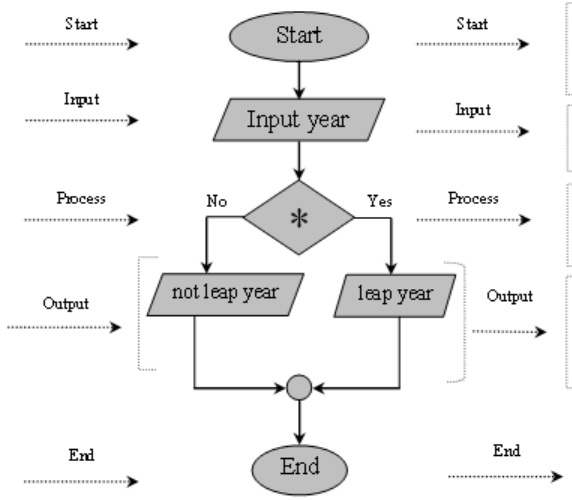

C-Program :

```
# include <stdio.h>
# include <conio.h>
void main ( )
{
int year;
scanf("%d",&year);
if((year%400=0)||
        (year% 100!=0
        && year%4==0));
printf ("leap year");
        else
printf ("not leap year");

getch ();
}
```

* = ((year%400=0) || (year% 100!= 0 && year%4==0))

প্রশ্ন ॥ ২৯ ॥ দুটি ধনাত্মক সংখ্যার গ.সা.গু নির্ণয় করার অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সি প্রোগ্রাম লেখ।

Algorithm :

Step-1 : Start

Step-2 : Input l, s

Step-3 : is r = l%s

Step-4 : while r = 0
(i) yes, print s
(ii) no, go to step 5

Step-5 : l = s, s = r
go to step 3

Step-6 : End

Flowchart :

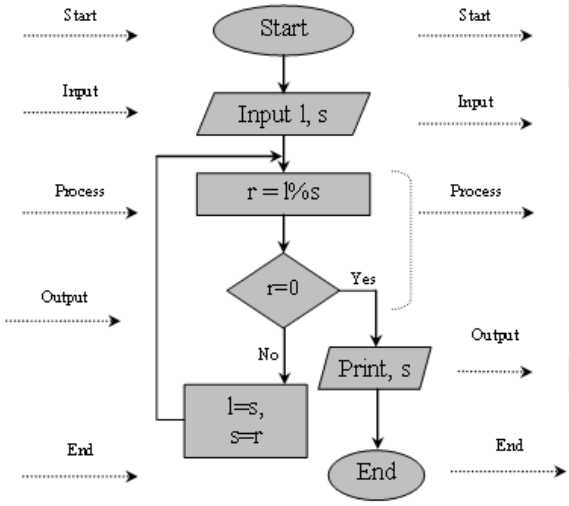

C-Program :

```
# include <stdio.h>
# include <conio.h>
void main ( )
{
int l, s, r;
scanf("%d%d",&l,&s);

do{
    r = l%s;
    l = s;
    s = r;
  } while (r!=0);

printf ("%d",s);

getch ();
}
```

প্রশ্ন ॥ ৩০ ॥ একটি সংখ্যা ধনাত্মক নাকি ঋণাত্মক তা বের করার প্রোগ্রাম।

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int a;
clrscr();
printf("Insert a number:");
scanf("%d",&a);
```

```
if(a>0)
printf("The number is positive\n");
else if(a<0)
printf("The number is negative\n");
else
printf("it is zero.\n");
getch();
}
```

```
Output :
Insert a number: 7
The number is positive
```

প্রশ্ন ॥ ৩১ ॥ পরীক্ষার ফলাফল (গ্রেড) নির্ণয় করার প্রোগ্রাম

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

void main()
{
int s;
printf("\n Enter your score:");
scanf("%d",&s);
if((s>=80) && (s<=100))
printf("\n your grade is A+");
else if((s>=70)&&(s<=80))
printf("\n your grade is A");
else if((s>=60)&&(s<=70))
printf("\n your grade is A-");
else if((s>=50)&&(s<=60))
printf("\n your grade is B");
else if((s>=40)&&(s<=50))
printf("\n your grade is C");
else if((s>=33)&&(s<=40))
printf("\n your grade is D");
else
printf("\n your grade is F");
getch();
}
```

```
Output:
Enter your score: 77
your grade is A
```

প্রশ্ন ॥ ৩২ ॥ বড় বা ছোট হাতের অক্ষর নির্ণয়

```
Example of else if Statement*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
char ch;
clrscr();
printf("Enter a character: ");
scanf("%c", &ch);
if((ch >= 'A') && (ch <= 'Z'))
  printf("\nYou entered a capital letter : %c", ch);
else if((ch >= 'a') && (ch <= 'z'))
  printf("\nYou entered a small letter : %c", ch);
else
  printf("\nThe letter you entered is not a character.");
getch();
}   // End of main

Output:
Enter a character: A
You entered a capital letter : A
```

```
Output:
Enter a character : B
You entered a capital letter : B
```

ষষ্ঠ অধ্যায়

ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

(Database Management System)

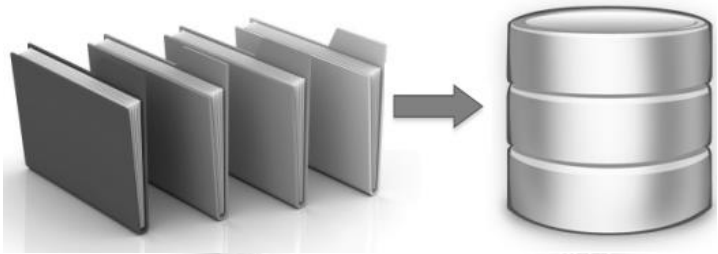

ষষ্ঠ অধ্যায়

ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

Database Management System

পিরিয়ড সংখ্যা : ৩৫

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ২. ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট এর কার্যাবলি বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৩. রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বর্ণনা করতে পারবে।	• ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্টের ধারণা (Concept of Database Management) • ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Database Management System) ❍ DBMS এর কাজ (Functions of DBMS) ❍ RDBMS (Relational Database Management System) ❍ RDBMS এর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of RDBMS) ❍ RDBMS এর ব্যবহার (Uses of RDBMS)
ব্যবহারিক ৬. ডেটাবেজ তৈরি করতে পারবে। ৭. ডেটা সিকিউরিটির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. ডেটা সিকিউরিটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৯. ডেটা এনক্রিপশনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. ডেটা এনক্রিপশনের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• ডেটাবেজ তৈরি (Creating Database) ❍ কুয়েরি (Query) ❍ সর্টিং (Sorting) ❍ ইনডেক্সিং (Indexing) ❍ ডেটাবেজ রিলেশন (Database Relation) ❍ কর্পোরেট ডেটাবেজ (Corporate Database) ❍ সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডেটাবেজ (Database in Government Organization) ❍ ডেটা সিকিউরিটি (Data Security) ❍ ডেটা এনক্রিপশন (Data Encryption)

১. ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্টের ধারণা

ডেটা (Data)

Data শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Datum-এর বহুবচন। Datum অর্থ হচ্ছে তথ্যের উপাদান (an item of information)। তথ্যের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্রতর অংশসমূহ হচ্ছে ডেটা বা উপাত্ত। প্রক্রিয়াকরণ করে তথ্যে পরিণত করার জন্য কম্পিউটারে ডেটা ইনপুট করা হয়। কম্পিউটার মূলত ডেটাকে প্রসেস করে তথ্যে রূপান্তরিত করে। যেমন– কোন একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের পে-রোল তৈরি করার জন্য তাদের নাম, পদবি, কোড নং, মূল বেতন ইত্যাদি হলো ডেটা। ডেটা বিভিন্ন ভাষার প্রতীক, যেমন– অ, ক, A, B, f ১, ৩ ইত্যাদি অথবা কোন ছবি, যেমন-চন্দ্র, সূর্য, গাড়ি বা অন্য যেকোন কিছু হতে পারে। এ প্রতীকগুলোকে কম্পিউটারে বোঝার উপযোগী করার জন্য কম্পিউটারের ভাষায় বা মেশিন কোডে রূপান্তরের ব্যবস্থা থাকে।

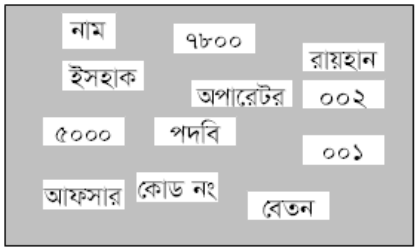

কোড নং	নাম	পদবি	বেতন
০০১	রায়হান	অফিসার	৭৮০০
০০২	ইসহাক	অপারেটর	৫০০০

ডেটাবেজ (Database)

ডেটা (Data) শব্দের অর্থ হচ্ছে উপাত্ত এবং বেজ (Base) শব্দের অর্থ হচ্ছে ঘাঁটি বা সমাবেশ। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এক বা একাধিক ডেটা টেবিল বা ফাইলের সমষ্টি হচ্ছে ডেটাবেজ। কোন একটি প্রতিষ্ঠানের সমগ্র ডেটা ঐ প্রতিষ্ঠানের ডেটাবেজে সংরক্ষিত থাকে। বর্তমানে ডেটাবেজের আওতায় এক বা একাধিক ডেটা টেবিল, কুয়েরি, ফর্ম, রিপোর্ট, ম্যাক্রো, মডিউল ইত্যাদি ফাইল থাকতে পারে। অর্থাৎ ডেটাবেজ হচ্ছে ডেটাসমৃদ্ধ এক বা একাধিক ফাইলের সমষ্টি।

আমাদের চারপাশে অজস্র তথ্য বা উপাত্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তবে এ সমস্ত তথ্যের সমাবেশকে ডেটাবেজ বলা যাবে না। কারণ ডেটাবেজ হচ্ছে সেই সকল ডেটা বা তথ্যের সমষ্টি যাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। যেমন: ভোটার তালিকায় সংরক্ষিত ভোটারদের তথ্যসমূহ, কোন কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ফাইলের রেকর্ডসমূহ ইত্যাদি ডেটাবেজ ফাইলে সংরক্ষণ করা যায়।

ডেটাবেজ ব্যবহারের সুবিধা (Advantages of using Database)

ডেটাবেজ ব্যবহারের সুবিধাগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. অতি দ্রুত ডেটা উপস্থাপন করা যায়।
২. অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ডেটা পরিচালনা করা যায়।
৩. সংরক্ষিত ডেটাকে পরবর্তীতে আপডেট করা যায়।
৪. ডেটাবেজের তথ্যসমূহকে প্রয়োজনে অ্যাসেন্ডিং ও ডিসেন্ডিং অর্ডারে সাজানো যায়।
৫. অল্প সময়ে ডেটার বিন্যাস ঘটানো যায়।

ডেটাবেজের বিভিন্ন উপাদান (Elements of Database)

ডেটাবেজের বিভিন্ন উপাদানসমূহ হলো ঃ

১. ডেটা (Data)
২. রেকর্ড (Record)
৩. ফিল্ড (Field)
৪. ডেটা টেবিল (Data Table)

নিচে এগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

১. **ডেটা (Data)** ঃ ডেটা টেবিলের বিভিন্ন ফিল্ডে আমরা যা কিছু ইনপুট করি তাই ডেটা। উদাহরণস্বরূপ নিচের টেবিলের Jabbar একটি ডেটা যা Name ফিল্ডের অধীনে আছে। Dhaka অন্য একটি ডেটা যা Address ফিল্ডের অধীনে আছে এবং Officer আর একটি ডেটা যা Job Title ফিল্ডের অধীনে আছে। উপর্যুক্ত ডেটা টেবিলের বিভিন্ন ফিল্ডের অধীনে এন্ট্রিকৃত সব তথ্যই হলো ডেটা।

employee

ID	Name	JobTitle	Department	Address	JoinDate	Salary
1	Aminul	Accountent	Admin	Narshingdi	9/9/1990	$9,200.00
2	Morshed	Manager	Admin	Dhaka	11/12/1999	$9,500.00
3	Sahid	Officer	Finance	Khulna	2/10/1997	$7,000.00
4	Ratan	Officer	Finance	Barishal	12/12/1996	$6,000.00
5	Shafiq	Officer	Admin	Jessore	9/10/1993	$5,400.00
6	Hasan	Sales Rep	Marketing	Sylhet	11/12/1994	$5,500.00
7	Tareq	Sales Rep	Marketing	Dhaka	11/9/1994	$4,890.00
8	Zahid	Sales Rep	Marketing	Chittagong	11/21/1994	$5,400.00
9	Rafiq	Driver	Admin	Khulna	11/19/1993	$4,000.00
10	Jabbar	Peon	Admin	Khulna	11/19/1993	$2,300.00
11	Sahadat	Director	Admin	Barisal	10/15/1992	$11,400.00

ফিল্ড

রেকর্ড

ডেটা

২. **রেকর্ড (Record)** ঃ অনেকগুলো ফিল্ডের সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি রেকর্ড। সাধারণভাবে পুরো একটি রো বা সারিকেই আমরা রেকর্ড হিসেবে বিবেচনা করি। যদি কোন টেবিলে গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা লিপিবদ্ধ থাকে তবে সে গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা মিলে হবে একটি রেকর্ড। এরকম যতজন গ্রাহকের নাম-ঠিকানা একটি টেবিলে লিপিবদ্ধ থাকবে সে টেবিলে ততগুলো রেকর্ড আছে বলে ধরা হবে।

৩. **ফিল্ড (Field)** ঃ রেকর্ডের ক্ষুদ্রতম অংশ হলো ফিল্ড। রেকর্ডের প্রতিটি উপাদান যেমন- নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর ইত্যাদিকে এক একটি ফিল্ড হিসেবে ধরা হয়। প্রতিটি ফিল্ড সাধারণত কলাম হেডিং হিসেবে থাকে। কলামের একটি সেলের ডেটাকে আমরা একটি ফিল্ড হিসেবে ধরি এবং পুরো কলামটিতে থাকে একই ধরনের ডেটা।

৪. **ডেটা টেবিল (Data Table)** ঃ সমজাতীয় সকল ডেটাকে এক একটি টেবিলে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। যেমন, ধরা যাক একটি অফিসের তিনটি শাখা আছে যথা– প্রশাসন শাখা, হিসাব শাখা ও বিক্রয় শাখা। প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের জন্য একটি টেবিল নির্দিষ্ট করা আছে যেখানে ঐ শাখার সকল উপাত্ত সংরক্ষিত আছে। হিসাব শাখার জন্য আবার আলাদা একটি টেবিলে অফিসের আয়-ব্যয় বা কর্মচারীদের বেতন-ভাতার হিসাব সংরক্ষিত আছে এবং বিক্রয় শাখার জন্য আর একটি টেবিলে দৈনন্দিন বিক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্র লিপিবদ্ধ আছে। তিনটি টেবিলই কিন্তু থাকবে একটি মূল ফাইল বা ডেটাবেজের অধীনে।

ডেটার এনটিটি এবং এট্রিবিউট (Data Entity and Attribute)

এনটিটি (Entity)

Entity হচ্ছে সত্তা যা দিয়ে অবজেক্টকে চিহ্নিত করা যায়। কোন ডেটা টেবিলকে চিহ্নিত করার জন্য টেবিলের জন্য যে নাম দেওয়া হয় তাই হচ্ছে ডেটার এনটিটি। এনটিটির বাস্তব উপস্থিতি থাকতে পারে অথবা এটি শুধুমাত্র ধারণার উপর ভিত্তি করে হতে পারে। নিচের চিত্রে একটি ডেটা টেবিলকে Employee data নামকরণ করা হয়েছে।

নাম	কাজে যোগদানের তারিখ	পদবি	বয়স	ঠিকানা
জাভেদ আহমেদ	৫/৩/০৯	অপারেটর	৩১	মালিবাগ
আতিকুর রহমান	২/৮/০৮	শ্রমিক	২৮	খিলগাঁও
আবুল হোসেন	৩/৪/০৮	সহকারী	২৭	গোরান
সিরাজ আহমেদ	১/২/০৯	সহকারী	২৬	রামপুরা

এ Employee data হচ্ছে টেবিলটির এনটিটি। এমনিভাবে ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের ফাইল, গ্রাহকদের ফাইল, উৎপাদিত পণ্যের ফাইল ইত্যাদি তৈরি করা যেতে পারে। প্রতিটি ক্ষেত্রে এগুলো এক একটি একক হিসেবে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ প্রতিটি এককই এক একটি এনটিটি। নিচের চিত্রে Employee data ফাইলটির এনটিটি ও এট্রিবিউট নির্দেশ করে দেখানো হলো।

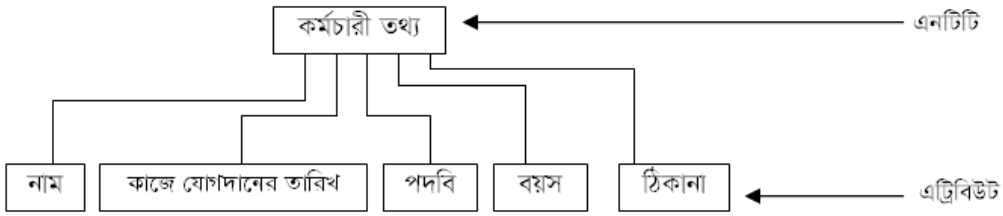

চিত্র ঃ এনটিটি ও এট্রিবিউট

এনটিটি সেট (Entity set)

একই জাতীয় এনটিটিকে এনটিটি সেট (Entity set) বলা হয়। একটি ডেটাবেজকে এনটিটি সেট বলা যেতে পারে।

এট্রিবিউট (Attribute)

একটি এনটিটি এর বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য যে সমস্ত ফিল্ড বা আইটেম বা উপাদান ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় এট্রিবিউট। Employee data এনটিটিতে পাঁচটি ফিল্ড রয়েছে। এগুলো হলো নাম, কাজে যোগদানের তারিখ, পদবি, বয়স এবং ঠিকানা। এর প্রত্যেকটি এক একটি এট্রিবিউট। কোন একজন কর্মচারীর উল্লিখিত পাঁচটি ফিল্ডের যে তথ্য পাওয়া যাবে, সেই পাঁচটি তথ্যের সমষ্টিকে বলা হয় এনটিটি সেট বা রেকর্ড। যেমন- জাভেদ আহমেদ, ৫/৩/০২, অপারেটর, ৩১, পরিবাগ এ পাঁচটি ফিল্ড একটি এনটিটি সেট।

ভ্যালু (Value)

প্রত্যেকটি এট্রিবিউট এর যে মান থাকে তাকে বলা হয় ভ্যালু । যেমন- নাম এট্রিবিউট এর ভ্যালু হচ্ছে জাভেদ আহমেদ, কাজে যোগদানের তারিখ এট্রিবিউট এর ভ্যালু হচ্ছে ০৫/০৩/০৯।

নাম	কাজে যোগদানের তারিখ	পদবি	বয়স	ঠিকানা
জাভেদ আহমেদ	৫/৩/০৯	অপারেটর	৩১	পরিবাগ
আতিকুর রহমান	২/৮/০৮	শ্রমিক	২৮	খিলগাঁও
আবুল হোসেন	৩/৪/০৮	সহকারী	২৭	গোরান
সিরাজ আহমেদ	১/২/০৯	সহকারী	২৬	রামপুরা

এখানে কর্মচারী তথ্য এনটিটি-এর এট্রিবিউট ও ভ্যালু দেখানো হলো ঃ

এট্রিবিউট		ভ্যালু
নাম	:	জাভেদ আহমেদ
কাজে যোগদানের তারিখ	:	০৫/০৩/০৯
পদবি	:	অপারেটর
বয়স	:	৩১
ঠিকানা	:	পরিবাগ

এনটিটি রিলেশনশীপ মডেল (E-R Model)

এনটিটি রিলেশনশীপ মডেল (E-R Model) হলো একটি এনটিটি সেটের বিভিন্ন এনটিটিগুলোর মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশের পদ্ধতি। ডেটাবেজ ডিজাইনে এনটিটি মডেল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ১৯৭০ সনে E.F. Codd প্রথম প্রাথমিক কী ব্যবহার করে দুটি ডেটাবেজের মাঝে সম্পর্ক তৈরির পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তার ধারণা অনুযায়ী বৃহৎ ডেটাবেজকে ভেঙ্গে আলাদা আলাদা ডেটা টেবিল তৈরি করে নিতে হবে, পরে কোন কমন (Common) ফিল্ডের ভিত্তিতে টেবিলসমূহের মধ্যে সম্পর্ক (Relation) তৈরি করা যাবে।

ধরা যাক, কোন একটি কোম্পানিতে কর্মচারীদের তথ্যভিত্তিক একটি ফাইল রয়েছে, যাতে ফিল্ড হিসেবে আছে কর্মচারী-কোড, নাম, ঠিকানা ইত্যাদি। অপর একটি ফাইলে ফিল্ড আছে কর্মচারী-কোড, ডিপার্টমেন্ট, পদবি ইত্যাদি। এবং অন্য আরেকটি ফাইল আছে কর্মচারীদের বেতনাদি সংক্রান্ত তথ্য। এতে ফিল্ড আছে মূল বেতন, বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, বোনাস, কর্মচারী কোড ইত্যাদি। তিনটি টেবিলেই কর্মচারী কোডটি বিদ্যমান। প্রত্যেক কর্মচারীকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্য এখানে একটি Unique নম্বর থাকবে। এ ফিল্ডটি হচ্ছে কমন ফিল্ড বা প্রাইমারি কী। এ প্রাইমারি কী ব্যবহার করে এ তিনটি ফাইলের মধ্যে রিলেশনশীপ বা সম্পর্ক তৈরি করা যাবে।

ধরা যাক, ছাত্র এবং কোর্স নামে দু'টি এনটিটি সেট রয়েছে। ছাত্র এনটিটি সেটে ছাত্র-আইডি, ভর্তির তারিখ, বয়স ও ঠিকানা এ চারটি এট্রিবিউট আছে। কোর্স এনটিটি সেটের আওতায় কোর্সের নাম, কোর্স ফি, ছাত্র-আইডি এবং বছর এ চারটি এট্রিবিউট আছে। এখন এট্রিবিউটসমূহের উপর ভিত্তি করে একটি এনটিটি রিলেশনশীপ ছক তৈরি করা যায়।

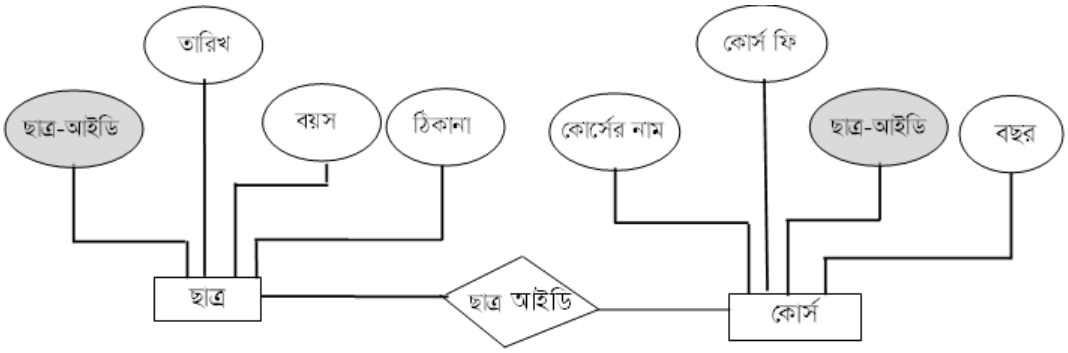

চিত্র ঃ ই-আর মডেল

উভয় এনটিটি সেটের মধ্যে **ছাত্র-আইডি** একটি কমন এট্রিবিউট। এ কমন এট্রিবিউটটির উপর ভিত্তি করে এনটিটি সেটদ্বয়ের মধ্যে রিলেশন প্রতিষ্ঠা করা যায়।

কী (Key)

যে ফিল্ডের উপর ভিত্তি করে ডেটাবেসের অপরাপর ফিল্ডের তথ্যাবলি শনাক্ত করা হয় তাকে কী বা কী-ফিল্ড বলা হয়। কী হচ্ছে একটি বিশেষ এট্রিবিউট যা দিয়ে কোন এনটিটির অন্য এক বা একাধিক এট্রিবিউটকে সহজেই শনাক্ত করা যায়। যেমন, যেকোন শ্রেণিকক্ষের ডেটাবেজ থেকে রোল নাম্বারের ভিত্তিতে তার অন্যান্য তথ্যাবলি খুঁজে বের করা যায়। কী হিসেবে এমন এক বা একাধিক এট্রিবিউটকে বিবেচনা করা হবে যা অন্যান্য এট্রিবিউটগুলোকে সনাক্ত করতে সক্ষম। কী-সমূহকে সাধারণত নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়।

- প্রাইমারি কী (Primary Key)
- কম্পোজিট প্রাইমারি কী (Composit Primary Key)
- ফরেন কী (Foreign Key)

প্রাইমারি কী (Primary Key)

ডেটা টেবিলের যে ফিল্ডের মানসমূহ দ্বারা একটি রেকর্ডকে অন্যান্য রেকর্ড থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করা যায় সেই ফিল্ডকে প্রাইমারি কী বলা হয়। এ জাতীয় ফিল্ডের প্রতিটি তথ্য ভিন্ন হতে হয় অর্থাৎ কোন ডুপ্লিকেট তথ্য থাকতে পারে না। নিচের টেবিলটি লক্ষ্য কর।

Student ID	Roll No	Name	Class
5001	010	Rakib	Ten
5002	015	Zawad	Nine

এখানে Student ID প্রাইমারি কী। এ ফিল্ডের প্রত্যেকটি ভ্যালু Unique বা অদ্বিতীয় হবে। রিলেশন প্রতিষ্ঠার জন্য এরকম ফিল্ড ব্যবহার করা যায়।

কম্পোজিট প্রাইমারি কী (Composit Primary Key)

অনেক ক্ষেত্রে কোন টেবিলে সুনির্দিষ্ট কোন প্রাইমারি কী নাও থাকতে পারে। তখন দুই বা ততোধিক এট্রিবিউট বা কী সমষ্টি সম্মিলিতভাবে কোন এনটিটি সেটকে সনাক্ত করতে পারলে তবে তাদেরকে বলা হবে কম্পোজিট প্রাইমারি কী। এ প্রাইমারি কী-গুলোর একটিকে প্রাথমিক কী বিবেচনা করে বাকিগুলোকে বলা হবে অল্টারনেট কী।

Roll No	Name	Class
010	Rakib	Ten
015	Zawad	Nine

Roll No	Name	Class
010	Rakib	Ten
015	Zawad	Nine

উপরিউক্ত টেবিলে Roll No এট্রিবিউটকে প্রাইমারি কী বলা যাবে না কারণ বিভিন্ন শ্রেণিতে একই রোল নম্বরবিশিষ্ট ছাত্র থাকতে পারে। তবে এক্ষেত্রে Roll No এট্রিবিউটের সাথে Class এট্রিবিউটকে যোগ করে কম্পোজিট প্রাইমারি কী হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফরেন কী (Foreign Key)

যদি ডেটাবেসের একটি টেবিলের প্রাইমারি কী অন্য ডেটা টেবিলে সাধারণ কী হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহলে প্রথম ফাইলের প্রাইমারি কী-কে দ্বিতীয় ফাইলের জন্য ফরেন কী বলা হয়। এখানে Customer table এ Customer ID ফিল্ডটি প্রাইমারি কী হিসেবে আছে কিন্তু Order table এ Customer ID ফিল্ডটি ফরেন কী হিসেবে আছে।

Primary Key

Cust ID	Name	Phone No	Address
1001	Sajjad Hossain	8978781	Uttara, Dhaka.
1002	Jafar Ahmed	7312309	Mirpur, Dhaka
1003	Rafiqul Islam	7344431	Motijheel, Dhaka
1004	Sakibur Rahman	807676	Kallanpur, Dhaka

Customer table

Foreign Key

Order No	CustID	Order Date
212204	1001	09/12/2011
212209	1002	12/04/2012
212208	1003	23/01/2012
212201	1004	01/01/2012

Order table

প্রাইমারি কী এবং ফরেন কী এর মধ্যেকার পার্থক্য (Difference between Primary Key and Foreign Key)

প্রাইমারি কী	ফরেন কী
১. যে কী দিয়ে কোন নির্দিষ্ট এনটিটির কোন এনটিটি সেটকে সম্পূর্ণরূপে শনাক্ত করা যায় তাকে প্রাইমারি কী বলা হয়।	১. একটি টেবিলের প্রাইমারি কী অন্য ডেটা টেবিলে সাধারণ কী হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে এ কী-কে ফরেন কী বলা হয়।
২. এ ফিল্ডের প্রত্যেকটি ভ্যালু Unique বা অদ্বিতীয়।	২. এটি সর্বদা প্রাইমারি কী-কে রেফার করে।
৩. এটি NULL নয়।	৩. এটি NULL।
৪. এটি Parent অর্থাৎ পিতা।	৪. এটি Child অর্থাৎ শিশু।
৫. ডেটা সনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়।	৫. দুটি টেবিলের মধ্যে রিলেশন তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।
৬. একটি টেবিলে একটিমাত্র প্রাইমারি কী থাকে।	৬. একটি টেবিলে বিভিন্ন টেবিলের একাধিক ফরেন কী থাকতে পারে।

ডেটাবেজ সফটওয়্যার (Database Software)

যে সফটওয়্যারের সাহায্যে কোন ডেটা সংরক্ষণ করে প্রয়োজনানুসারে ঐগুলো সাজানো বা কাজে লাগানো যায় তাকে ডেটাবেজ সফটওয়্যার বলা হয়।

২. ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Database Mangement System-DBMS)

ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ডিবিএমএস) হচ্ছে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তথ্য একসেস, সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামের সমষ্টি। ডেটাবেস রক্ষণাবেক্ষণ ও আধুনিকীকরণের কাজ ও করা হয় DBMS ব্যবহার করে। তথ্য ব্যবস্থাপনাকে সুন্দর ও কার্যোপযোগী করে তুলতে পারে DBMS। ডিবিএমএস-এর প্রধান তিনটি কাজ হচ্ছে—

১. ডেটাবেজ সৃজন
২. ডেটাবেজ ইন্টারোগেশন ও
৩. ডেটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ।

ডিবিএমএস ডেটাবেজ ও ডেটাবেজ ব্যবহারকারীর মধ্যে সমন্বয়কারী সফটওয়্যার হিসেবে কাজ করে।

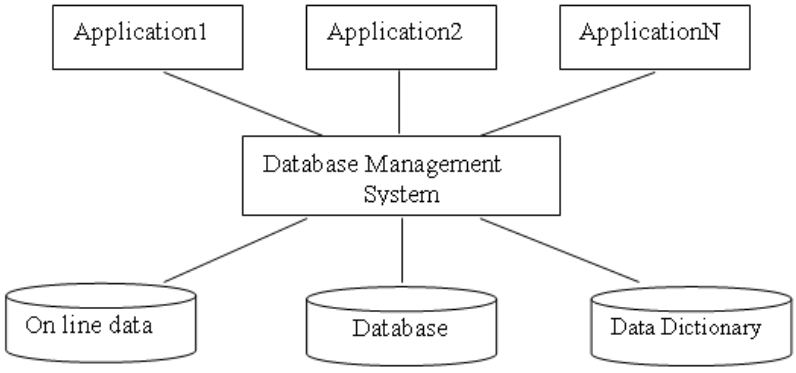

ডিবিএমএস ব্যবহারকারী এবং ডেটাবেজের মধ্যে সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কম্পিউটারে সফটওয়্যার ব্যবহার করে সম্পন্ন করা হয়। যেমন-ওরাকল (Oracle), মাইএসকিউএল (MySQL), মাইক্রোসফট একসিস (Microsoft Access) ইত্যাদি।

ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. ক্লায়েন্ট সার্ভার ডেটাবেজ (Client Server Database)
২. ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেজ (Distributed Database)
৩. ওয়েব এনাবল ডেটাবেজ (Web enable Database)

২.১. DBMS এর প্রাথমিক কাজসমূহ (Primary Functions of Database Management System)

ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের প্রাথমিক কাজগুলো হলো-

১. ডেটাবেজ তৈরি করা, ডেটা এন্ট্রি করা এবং ডেটা সংরক্ষণ করা।
২. ডেটার ভুল অনুসন্ধান ও সংশোধন করা
৩. অপ্রয়োজনীয় ডেটা/রেকর্ড ডিলিট করা
৪. নির্দিষ্ট ডেটা/রেকর্ড সার্চিং বা অনুসন্ধান এবং কুয়েরি করা
৫. রিপোর্ট তৈরি ও প্রিন্ট করা
৬. ডেটাবেজকে কোন ফিল্ডের ভিত্তিতে সাজানো
৭. ডেটা ডুপ্লিকেশন কমানো
৮. প্রয়োজনে সম্পূর্ণ ডেটাবেজ বা ডেটাবেজের অংশবিশেষ প্রিন্ট করা
৯. ডেটাবেজ আপডেট করা।
১০. ডেটার নিরাপত্তা বিধান করা এবং ব্যবহারকারী নিয়ন্ত্রণ করা
১১. ডেটার ব্যাকআপ ও রিকভারি করা

২.২ রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Relational Database Management System–RDBMS)

ডেটাবেজে একাধিক টেবিল একটি নির্দিষ্ট ফিল্ডের (প্রাইমারি কী ও ফরেন কী) উপর ভিত্তি করে সম্পর্ক স্থাপন করাই হলো রিলেশনশীপ। রিলেশন করা ডেটা টেবিলের সমন্বয়ে গঠিত ডেটাবেজকে রিলেশনাল ডেটাবেজ বলা হয়। আধুনিক ডেটাবেজ সফটওয়্যার বলতে সাধারণত রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকেই বুঝায়। কয়েকটি RDBMS হলো- মাইক্রোসফট একসিস, ওরাকল, মাইএসকিউএল ইত্যাদি।

২.৩ রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of RDBMS)

রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. সহজে টেবিল তৈরি করে ডেটা এন্ট্রি করা যায়।
২. একাধিক ডেটা টেবিলের মধ্যে রিলেশন তৈরি করা যায় এবং ডেটা আদান-প্রদান করা যায়।
৩. অসংখ্য ডেটার মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় ডেটাকে খুঁজে বের করা যায়।
৪. ডেটা ভ্যালিডেশনের সাহায্যে ডেটা এন্ট্রি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
৫. সংখ্যাবাচক ডেটাসমূহে সূক্ষ্ম গাণিতিক কাজ করা যায়।
৬. সহজে নানা ফরমেটের লেবেল, রিপোর্ট তৈরি করা যায়।
৭. প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে লেবেল তৈরি করা যায় এবং ছাপানো যায়।
৮. এন্ট্রি ফর্ম তৈরি করা যায়।
৯. একই ডেটা অনেক ব্যবহারকারী একই সাথে ব্যবহার করতে পারে।
১০. Executable (exe) ফাইল তৈরি করা যায়।
১১. আকর্ষণীয় ডেটা এন্ট্রি ফর্ম তৈরি করা যায় এবং ডেটা ব্যবহার করে চার্ট তৈরি করা যায়।
১২. অন্যান্য প্রোগ্রাম থেকে ডেটা ব্যবহার করা যায়।
১৩. এপ্লিকেশন সফটওয়্যার/প্রোগ্রাম তৈরি করা যায়।

এছাড়া আরও অনেক সুযোগ-সুবিধা বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে বুঝতে সুবিধা হবে।

২.৪ রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ব্যবহার (Applications of RDBMS)

রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম ব্যবহারের চাহিদা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্নে রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহারের কিছু সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো–

- ব্যাংক ও বীমার গ্রাহকদের হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে
- হাসপাতালে রোগীদের রেকর্ড সংরক্ষণে এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে
- রেলওয়েতে টিকিটিং ও রেলগাড়ির সিডিউলিং এর ক্ষেত্রে
- এয়ারলাইন্সে টিকিটিং ও ফ্লাইটের সিডিউলিং এর ক্ষেত্রে
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্টুডেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম তৈরি এবং পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে
- বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের রেকর্ড সংরক্ষণে
- ই-কমার্স ও ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেমে
- জনসংখ্যা তথ্য সংরক্ষণে এবং ভোটার তালিকা তৈরিতে
- সরকারি গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সংস্থা/মন্ত্রণালয়ের ডেটাবেজে
- বড় প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার কাজে

৩. ডেটাবেজ তৈরি করা (Creating a Database)

একই জাতীয় ডেটাসমূহ নিয়ে একটি ডেটাবেজ তৈরি করা হয়। রিলেশনাল ডেটাবেজ প্রোগ্রামে কতগুলো পরস্পর সম্পর্কিত অবজেক্টের সমন্বয়ে ডেটাবেজ গঠিত হয় এবং অবজেক্টগুলো হচ্ছে টেবিল, কুয়েরি, ফর্ম, রিপোর্ট, ম্যাক্রো এবং মডিউল। একটি ডেটাবেজ তৈরির জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত ডেটাবেজ প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করতে হয়। বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় ডেটাবেজ প্রোগ্রাম হলো মাইক্রোসফট একসিস। একসিস ডেটাবেজ প্রোগ্রামের মাধ্যমে তিনভাবে ডেটাবেজ তৈরি করা যায়। যথা-

১. Database Wizard থেকে ডেটাবেজ তৈরি করা।
২. মেনু থেকে ডেটাবেজ তৈরি করা।
৩. ডেটাবেজ ল্যাংগুয়েজ দিয়ে ডেটাবেজ তৈরি করা।

ডেটাবেজ উইন্ডো পরিচিতি (Introdution to Database Window)

ডেটাবেজ একটি কন্টেনার বা উইন্ডো আকারে থাকে, তাতে ডেটাবেজের একই জাতীয় অবজেক্টগুলো গ্রুপ ভিত্তিতে অবস্থান করে। নিচে বহুল ব্যবহৃত মাইক্রোসফট একসিস ডেটাবেজ উইন্ডোর চিত্র দেয়া হলো।

চিত্র ঃ ডেটাবেজ উইন্ডো

ডেটাবেজ উইন্ডোতে অনেকগুলো ট্যাব থাকে। বিভিন্ন ট্যাবের আওতায় ডেটাবেজ টেবিলসমূহ ও অন্যান্য অবজেক্টগুলো ধারণ করে যে জাতীয় অবজেক্ট তৈরি করা হবে, ডেটাবেজ উইন্ডো থেকে সে জাতীয় ট্যাব নির্বাচন করে নিতে হয়। নিচে ডেটাবেজ উইন্ডোর বিভিন্ন উপাদানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হলো।

Tables : এ ট্যাবের আওতায় টেবিলগুলো সংরক্ষিত থাকে। এখান থেকে কোন টেবিল পরিবর্তন, সংশোধন, কিংবা নতুন ডেটাবেজ তৈরি করা যায়।

Queries : এ ট্যাব থেকে বর্তমান ডেটাবেজের সকল কুয়েরির তালিকা পাওয়া যাবে। এখান থেকে কোন কুয়েরি পরিচালনা করা, কুয়েরি পরিবর্তন, সংশোধন বা নতুন কোন কুয়েরি তৈরি করা যায়।

Forms : এ ট্যাব থেকে বর্তমান ডেটাবেজের সকল রিপোর্ট ও ফর্ম পাওয়া যাবে। রিপোর্ট হচ্ছে ব্যবহারকারীর পছন্দ মতো ফর্মেট তথ্যাবলি প্রদর্শন বা মুদ্রণ করা। এখান থেকে কোন রিপোর্ট সংশোধন বা কোন নতুন রিপোর্ট তৈরি করা যায়।

Page : ইন্টারনেট বা ইন্ট্রানেট-এ মাইক্রোসফ্ট এ্যাকসেস বা SQL সার্ভারে সংরক্ষিত ডেটা নিয়ে কাজ করার জন্য ডেটাবেজ access page তৈরি করা যায়।

Macro : ম্যাক্রো হচ্ছে একধরনের ছোট প্রোগ্রাম। এ ট্যাবে ক্লিক করলে বর্তমান ডেটাবেজের সকল ম্যাক্রো প্রোগ্রামগুলোর তালিকা আসবে। এখান থেকে কোন ম্যাক্রো সংশোধন বা নতুন ম্যাক্রো তৈরি করা যায়।

Module : প্রোগ্রামের এক বা একাধিক প্রসিডিউরকে এক একটি মডিউল বলা হয়। Module ট্যাবে ক্লিক করলে বর্তমান ডেটাবেজের প্রোগ্রামিং মডিউলগুলোর তালিকা পাওয়া যাবে। এখান থেকে প্রয়োজনীয় কোড লিখা যায় বা সংশোধন করা যায়। কোড লিখার জন্য ভিজুয়্যাল বেসিক এডিটর ব্যবহৃত হয়।

ডেটা টেবিল তৈরি করা (Creating a Data table)

টেবিল হচ্ছে ডেটাবেজের একটি মৌলিক উপাদান। ইহা রো-এবং কলামের সমন্বয়ে গঠিত হয়। টেবিলে ডেটাবেজের তথ্যসমূহ ধারণ করে। টেবিলে এক বা একাধিক কলাম থাকে। প্রত্যেক টেবিলের একটি ইউনিক নাম থাকে এবং প্রতিটি কলামেরও আলাদা-আলাদা নাম এবং ডেটা টাইপ উল্লেখ করতে হয়।

empolyee : Table

ID	name	job title	department	address	join date	salary
1	Aminul	Accountant	admin	Norshingdi	9/9/1993	9500
2	Morshed	Manager	admin	Dhaka	12/11/1992	8500
3	Sahid	officer	finance	khulna	10/2/1997	7000
4	Ratan	officer	finance	barisal	12/2/1996	3455
5	Safiq	officer	admin	jessor	10/9/1993	5400
6	Hasan	sales rep	marketing	sylhet	12/11/1994	5500
7	Tareq	sales rep	marketing	dhaka	9/11/1994	4890
8	Zahid	sales rep	marketing	chittagong	11/21/1994	5400
9	rafiq	driver	admin	khulna	11/19/1993	4000
10	Jabbar	pieon	admin	dhaka	9/9/1993	2300
11	Shadat	director	admin	barisal	10/15/1992	30400

চিত্র ঃ ডেটা টেবিল

একাধিক টেবিলের মধ্যে ইউনিক কী ফিল্ডের উপর ভিত্তি করে সম্পর্ক স্থাপন করানো যায়।

ডেটা টাইপ (Data Type)

ডেটাবেজ ডিজাইন/তৈরি করার সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ডেটাবেজের ফিল্ডের টাইপ অর্থাৎ ফিল্ডে এন্ট্রিকৃত ডেটার ধরন। ডেটাবেজ ব্যবহারের উপর নির্ভর করে ডেটাবেজে অন্তর্ভুক্ত ফিল্ডের নাম, ডেটা টাইপ, ডেটার ফরমেট ও ফিল্ডের দৈর্ঘ্য। ডেটার টাইপ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে।

নিম্নে বিভিন্ন প্রকার ফিল্ড টাইপ বা ডেটা টাইপ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

Text/Character : সাধারণত বর্ণভিত্তিক ডেটার ক্ষেত্রে এ ডেটা টাইপ ব্যবহার করা যায়। এ ফিল্ডে বর্ণের সাথে সাথে সংখ্যাও লিখা যায়। এ ফিল্ডে সর্বোচ্চ ২৫৫টি বর্ণ লেখা যায়।

Number/Numeric : সংখ্যাভিত্তিক ডেটার ক্ষেত্রে এ ডেটাটাইপ ব্যবহার করা হয়। এ ফিল্ডে কোন বর্ণ লেখা যায় না।

Auto Number : এ ডেটা টাইপ সাধারণত সিরিজ জাতীয় ডেটার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। যেমন Sl.No, ID No, Roll No ইত্যাদি। এ ডেটা টাইপের সুবিধা হচ্ছে এই ফিল্ডে ডেটা এন্ট্রি করতে হয় না, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধারাবাহিক ডেটা এন্ট্রি হয়ে যায়।

Currency : মুদ্রা বা অর্থ জাতীয় ডেটার ক্ষেত্রে এ ডেটা টাইপ ব্যবহার করা হয়। যেমন : Tuition Fee, Salary, Exam Fee, Service Charge ইত্যাদি।

Data/Time : তারিখ ও সময় জাতীয় ডেটার ক্ষেত্রে এ ডেটা টাইপ ব্যবহার করা হয়। যেমন Date of Birth, Joining Date, Admission Date ইত্যাদি।

Logical : Yes/No, True/False, On/Off ডেটার ক্ষেত্রে এ ডেটা টাইপ ব্যবহার করা হয়। যেমন Present, Absent, Married-Unmarried , Skilled-Unskilled ইত্যাদি।

Memo : ইহা একটি Conditional Data টাইপ অর্থাৎ এ জাতীয় ফিল্ডে বর্ণ, সংখ্যা, চিহ্ন, তারিখ ইত্যাদি ৬৫,৫৩৬ সংখ্যা বর্ণ ব্যবহার করে লেখা যায়। সাধারণত মন্তব্য (Remark) ফিল্ডে এ ডেটা টাইপ ব্যবহার করা হয়।

OLE Object : ইহার পূর্ণরূপ হচ্ছে Object Linking and Embedding। যে সমস্ত তথ্য ডেটাবেজ নয় এমন সফটওয়্যারে ডেটা Link এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেগুলো ডেটাবেজে নেয়ার ক্ষেত্রে এ ডেটা টাইপ ব্যবহার করা হয়।

Hyperlink : ডেটাবেজ প্রোগ্রামের সাথে ওয়েব পেজের ফাইল লিংক করার জন্য এ ডেটা টাইপ ব্যবহার করা হয়।

Look up wizard : এ জাতীয় ফিল্ডে লিস্ট থেকে পছন্দকৃত ডেটা ইনপুট করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

ডেটা প্রোপার্টিজ (Data Properties)

ডেটা Type-এর উপর নির্ভর করে Field Properties প্রদর্শিত হয়। প্রোপার্টিজ থেকে ফিল্ডের আকৃতি, ডেটাসমূহ কীভাবে প্রদর্শিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে তা নির্ধারণ করা হয়। নিচের চিত্রে Text ডেটা টাইপের জন্যে প্রোপার্টিজসমূহ প্রদর্শিত হচ্ছে।

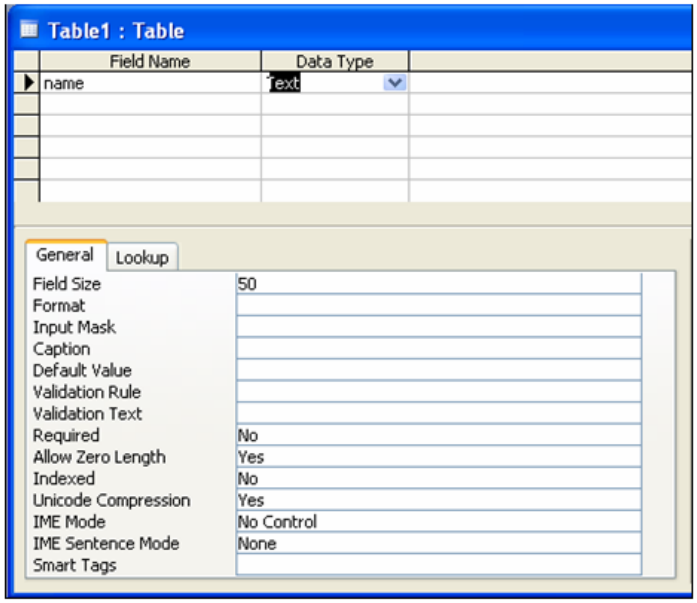

চিত্র ঃ ডেটা প্রোপার্টিজ

নিচে কতিপয় প্রোপার্টি নিয়ে আলোচনা করা হলো।

Field size : ফিল্ডের আকার কত ক্যারেক্টার হবে এখানে তা নির্ধারণ করা যায়।

Format : টেক্সট তথ্যাবলি কীভাবে, কী ফর্মেটে প্রদর্শিত হবে তা এখান থেকে নির্ধারণ করা যায়। নিচে টেক্সট ফর্মেটে ব্যবহারযোগ্য কয়েকটি সিম্বল উল্লেখ করা হলো।

সিম্বল	ফলাফল
@	শুধু ক্যারেক্টার ইনপুট গ্রহণ করে।
&	যেকোন সংখ্যা বা ক্যারেক্টার ইনপুট গ্রহণ করে।
<	অক্ষরকে লোয়ারকেস (ছোট হাতের অক্ষর) করে।
>	অক্ষরকে আপারকেস (বড় হাতের অক্ষর) করে।

Input Mask : Text, Number, Date/Time এবং Currency জাতীয় ডেটার জন্যে Input Mask প্রোপার্টি রয়েছে। এ সকল ফিল্ডে কীভাবে ডেটা ইনপুট করা হয়ে থাকে তা Input Mask দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

Caption : Datasheet view তে কোন ফিল্ডের জন্যে হেডিং প্রদর্শন করতে চাইলে এ প্রোপার্টি নির্ধারণ করতে হয়। হেডিং সর্বোচ্চ ২৫৫ ক্যারেক্টার পর্যন্ত হতে পারে।

Default Value : Auto number এবং OLE object ব্যতীত সকল ফিল্ডের জন্যে ডিফল্ট ভ্যালু নির্ধারণ করা যায়। কোন ফিল্ডের জন্যে কোন কমন ডেটা থাকলে তাকে Default Value হিসেবে উল্লেখ করে দেয়া যায় যাতে রেকর্ড ইনপুট করার সময় উক্ত ফিল্ডে Default Value নিজে থেকে ইনপুট হবে।

Validation Rule and Validation Text : প্রত্যেক ফিল্ডের জন্যে উহার নিজস্ব Validation Rule এবং Validation Text প্রোপার্টি রয়েছে। ফিল্ডে কোন ডেটা ইনপুট করার সময় Validation Rule ডেটা কনফার্ম করে। Validation Rule কোন ডেটা কনফার্ম না করলে তখন Validation Rule প্রদর্শিত হয়।

Required : এ প্রোপার্টি কোন ফিল্ডে ডেটা ইনপুট অত্যাবশ্যকীয় কিনা তা নির্ধারণ করে। ডেটা ইনপুট করার সময় এ ডেটাকে Blank রেখে অন্য ফিল্ডে যাওয়া যাবে না।

Allow Zero Length : জিরো Length স্ট্রিং ইনপুট করা যায়। জিরো Length স্ট্রিং " " (ডাবল কোটেশন) দ্বারা আবদ্ধ থাকে।

Index : ইন্ডেক্স করার জন্য এ প্রোপার্টি ব্যবহার করা হয়।

একক কাজ : তোমার কলেজের একটি ডেটাবেস তৈরি করার জন্য ফিল্ড স্ট্রাকচার লিখে দেখাও।

ডেটাবেজে ডেটা ঢুকানো (Inserting data into a Database)

ডেটাবেজ তৈরি করে এর অধীনে কোন ডেটা টেবিল তৈরি করে তাতে ডেটা এন্ট্রি করা যায়। ডেটা এন্ট্রি করে সেভ করে ডেটা টেবিল থেকে বের হয়ে পরবর্তীতে ইচ্ছে করলে ডেটা টেবিলে আবার ডেটা সন্নিবেশিত করা যায়। ডেটা সন্নিবেশিত করার জন্য নিচের পদক্ষেপ নিতে হবে ঃ

১. ডেটাবেজটি ওপেন করতে হবে।
২. Tables ট্যাবে ক্লিক করে প্রদর্শিত তালিকা থেকে ডেটা টেবিলটিতে ডাবল ক্লিক করে ওপেন করতে হবে।
৩. টেবিলটির সব শেষের রেকর্ডের নিচের সারির প্রথম ফিল্ডে ক্লিক করে নতুন ডেটা এন্ট্রি করতে হবে।
৪. ডেটা টেবিলটি ক্লোজ করে বের হয়ে গেলে এন্ট্রি করা ডেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত হবে।

এন্ট্রি সেভ করা (Save an Entry)

কোনো রেকর্ড ইনপুট বা সংশোধন করা সমাপ্ত হলেই রেকর্ডটি আপনাআপনি সেভ হয়ে যায়। এছাড়াও Record মেনু থেকে Save Record নির্বাচন করে অথবা টুল বার থেকে Save টুলস-এ ক্লিক করে সেভ করা যায়।

৩.১ কুয়েরি (Query)

ডেটাবেজের ব্যাপক তথ্যের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য/রেকর্ড/রেকর্ডসসমূহ দ্রুত ও সহজে খুঁজে বের করাকে কুয়েরি বলা হয়। কুয়েরি করার জন্য যুক্তিমূলক এক্সপ্রেশন (Logical Expression) দিতে হয়। যে সকল রেকর্ড শর্ত পূরণ করে সে রেকর্ডগুলোই কুয়েরির ফলাফল হিসেবে পাওয়া যাবে। যেমন : ধরা যাক, কোন ডেটা-টেবিলে City নামক একটি ফিল্ডে বিভিন্ন শহরের নাম আছে। এক্ষেত্রে যে সকল রেকর্ডের City ফিল্ডের মান "Dhaka" আছে, সে রেকর্ডগুলো কুয়েরি করার জন্য City = "Dhaka" এ রকম এক্সপ্রেশন তৈরি করা যায়। কুয়েরিতে এক্সপ্রেশন তৈরি করার জন্য বিভিন্ন অপারেটর ব্যবহার করতে হয়। কুয়েরির সাহায্যে ডেটাবেজে ডেটা এন্ট্রি করা, ডিলিট করা, ডেটা মডিফাই করা, ডেটা প্রদর্শন করা ইত্যাদি কাজ করা যায়। ডেটাবেজ ব্যবস্থাপনার কাজ কুয়েরির সাহায্যে সহজেই করা যায়। কুয়েরির জন্য ব্যবহৃত ভাষাই হলো কুয়েরি ল্যাংগুয়েজ।

SQL কুয়েরি

SQL একটি জনপ্রিয় কুয়েরি ল্যাংগুয়েজ। SQL এর পুরো নাম Structured Query Language। এটি শক্তিশালী ডেটা মেনিপুলেশন ও ডেফিনেশন ল্যাংগুয়েজ। রিলেশনাল ডেটাবেজে SQL হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কমান্ড। অতীতে SQL কেবল মেইনফ্রেম কম্পিউটারে ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে ডেস্কটপ কম্পিউটারেও রিলেশনাল ডেটাবেজ প্লাটফর্ম ব্যবহৃত হওয়ার ফলে SQL ব্যবহার শুরু হয়েছে। এগুলো এক বা একাধিক ডেটাবেজ, টেবিল, কলাম ইন্ডেক্স ইত্যাদিতে প্রয়োগ করা যায়। অধিকাংশ SQL স্টেটমেন্টই ফলাফল হিসেবে এক সেট রেকর্ড প্রদান করে। SQL কুয়েরি প্রয়োগ করার জন্য SQL উইন্ডো ওপেন করে নিতে হয়। SQL মূলত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা- SELECT, FROM, WHERE। এর সিনটেক্স (syntax) নিম্নরূপ :

```
SELECT a1,a2,a3, ....
FROM r1,r2,r3, ....
WHERE p;
```

SQL ফিচার

- SQL ইংরেজি ভাষার কাছাকাছি কুয়েরি ল্যাংগুয়েজ।
- SQL একটি non-procedural ল্যাংগুয়েজ।
- SQL বিভিন্ন শ্রেণির ব্যবহারকারী ব্যবহার করতে পারে।
- SQL বিভিন্ন শ্রেণির কার্যসম্পাদনের জন্য ব্যবহার করা যায়। যেমন –
  - ডেটা কুয়েরি করা।
  - ডেটা সন্নিবেশ, আপডেট বা মুছে ফেলা।
  - ডেটাবেজ অবজেক্ট তৈরি, সংশোধন বা মুছে ফেলা।
  - ডেটাবেজ অবজেক্ট এ্যাকসেস নিয়ন্ত্রণ।
  - ডেটাবেজ Consistency-এর নিশ্চয়তা প্রদান।

কুয়েরি এক্সপ্রেশন (Query Expression)

যেকোন কুয়েরি তৈরি করতে এক্সপ্রেশন ব্যবহার করতে হয়। এ এক্সপ্রেশনের উপর ভিত্তি করে কুয়েরি ফলাফল নির্বাচিত হয়। যেমন City = "Dhaka" একটি এক্সপ্রেশন। যে সকল রেকর্ডের City ফিল্ডের মান Dhaka আছে কেবল সে সকল রেকর্ডই নির্বাচিত হবে। এ এক্সপ্রেশন তৈরি করতে সাধারণত Literal, Constant এবং অপারেটর ব্যবহৃত হয়। নিচে এ সকল উপাদান আলোচনা করা হলো।

৩.২ ডেটাবেজ সাজানো (Sorting Database)/সর্টিং

Sorting হলো সাজানোর প্রক্রিয়া। ডেটাবেজের ডেটাকে নিম্নক্রম (Ascending) বা উর্ধ্বক্রম (Descending) অর্ডারে সাজানোই হলো SORT। SORT হলে ডেটাবেজ থেকে তথ্য সহজে অল্প সময়ে খুঁজে বের করা যায়। সর্টিং এর ফলে নতুন একটি সাজানো ফাইল তৈরি হয়। Sort আউটপুট ইন্ডেক্সিং আউটপুটের চেয়ে বেশি মেমোরি দখল করে এবং অপেক্ষাকৃত ধীরগতিসম্পন্ন বলে এ কমান্ডটির তেমন ব্যবহার নেই। উল্লেখ্য যে, Memo ডেটা, HyperLink ও OLE ফিল্ডের ডেটা সর্ট করা যায় না। নিচের চিত্রে Salary ফিল্ডের ডেটা Descending অর্ডারে সর্ট করা হয়েছে। তাই সবচেয়ে বেশি গুলো উপরের দিকে প্রদর্শিত হচ্ছে।

Name	Designation	Salary
Hasan Tareq	Accountant	13500
Abdur Rashid	Office Assis.	6700
Sakibur Rahman	Manager	35000
Mojibur Rahman	Pieon	3850
Raihan Miah	Driver	7500

চিত্র ঃ সর্টিং এর পূর্বের অবস্থা

Name	Designation	Salary
Sakibur Rahman	Manager	35000
Hasan Tareq	Accountant	13500
Raihan Miah	Driver	7500
Abdur Rashid	Office Assis.	6700
Mojibur Rahman	Pieon	3850

চিত্র ঃ সর্টিং এর পরের অবস্থা

৩.৩ ডেটাবেজ ইন্ডেক্স করা (Indexing Database)

ডেটাবেজের টেবিলের রেকর্ডসমূহের অ্যাড্রেসকে কোন লজিক্যাল অর্ডারে সাজিয়ে রাখাকেই ইনডেক্স বলা হয়। ইনডেক্স ফাইল মূল ডেটাবেজ ফাইলের কোনরূপ পরিবর্তন না করে রেকর্ডসমূহের অ্যাড্রেস বিভিন্নভাবে সাজাতে পারে। এক বা একাধিক ফিল্ডের উপর ভিত্তি করে ইনডেক্স করে Alphabetically বা Numerically সাজানো যায়। ইনডেক্স করার জন্য কোন কোন ভ্যালুকে বিবেচনা করা হবে তার জন্য ইনডেক্স এক্সপ্রেশন তৈরি করতে হয়।

ইনডেক্স করার সময় বিবেচ্য বিষয়সমূহ/শর্ত

১. সাধারণত কী ফিল্ডের উপর ইনডেক্স করা হয়।
২. যে ফিল্ডের উপর ইনডেক্স করা হয় তার অনুরূপ নাম দিতে হয়। তাতে ইনডেক্সসমূহ মনে রাখতে সুবিধা হয়।
৩. ইনডেক্স করার জন্য কোন কোন ভ্যালুকে বিবেচনা করা হবে তার জন্য ইনডেক্স এক্সপ্রেশন তৈরি করতে হয়।
৪. ডেটা টেবিলে এক বা একাধিক ইনডেক্স ফাইল থাকতে পারে কেবল একটি ইনডেক্স ফাইল সক্রিয় থাকে।

ইনডেক্সিং এর সুবিধা (Advantages of Indexing)

১. ইনডেক্স করা ফাইলের ডেটা সহজে খুঁজে বের করা যায়।
২. ইনডেক্সিং ফাইলে ডেটা/রেকর্ড এন্ট্রি করা হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়।
৩. কাজের গতি বৃদ্ধি পায়।
৪. ডেটা টেবিলে রেকর্ডসমূহে সার্চিং, সর্টিং, রিপোর্টিং, কুয়েরি ইত্যাদি দ্রুত করা যায়।
৫. মূল ফাইল অপরিবর্তিত থাকে।

ইনডেক্সিং এর অসুবিধা (Disadvantages of Indexing)

১. একাধিক ফিল্ডের উপর ইনডেক্স হলে বেশি মেমোরি লাগে।
২. ডেটা টেবিলে একাধিক ফিল্ডের উপর ইনডেক্স হলে আপডেট, ডিলিট করতে সময় বেশি লাগে।
৩. ডেটা এন্ট্রি করতে বেশি সময় লাগে।

ডেটা টেবিলের কোন ফিল্ডের উপর ইনডেক্স করা হলে ইনডেক্স ফাইলে রেফারেন্সসমূহ কীভাবে সজ্জিত থাকে তা নিচের চিত্রে দেখানো হলো।

Roll	Name	Age
1	Jahangir Alam	22
3	Shirin Sultana	21
7	Abbas Ali	19
4	Zakir Hossain	24
9	Firoz Rashid	17
5	Babul Khan	23

চিত্র ঃ ইনডেক্স এর পূর্ব অবস্থা

Roll	Name	Age
1	Jahangir Alam	22
3	Shirin Sultana	21
4	Zakir Hossain	24
5	Babul Khan	23
7	Abbas Ali	19
9	Firoz Rashid	17

চিত্র ঃ ইনডেক্স এর পরের অবস্থা

কোন ডেটা টেবিলে কোন ইনডেক্স অর্ডার নির্ধারণ করা হলে ডেটাবেজ সিস্টেম ইনডেক্স ফাইলটি খোঁজ করে এবং ইনডেক্স অর্ডার অনুসারে রেকর্ডসমূহ সাজায়। ইনডেক্স করার পরে ডেটাবেজ ফাইলে নতুন কোন রেকর্ড ইনপুট করা হলেও ইনডেক্স ফাইলগুলো আপনা-আপনি আপডেটেড হয়ে যায়। কোন ইনডেক্স তৈরি করার সাথে সাথে উহা সক্রিয় থাকে। অর্থাৎ, রেকর্ডসমূহ সে ইনডেক্স অর্ডার অনুসারে থাকে। ফলে List কমান্ডকে তখন উক্ত ইনডেক্স অর্ডার নিয়ন্ত্রণ করে।

ইনডেক্সিং ও সর্টিং এর পার্থক্য (Difference between Indexing and Sorting)

ইনডেক্সিং	সর্টিং
ইনডেক্সিং হলো মূল টেবিল অপরিবর্তিত রেখে এক বা একাধিক ফিল্ড অনুসারে রেকর্ডগুলোর সাজানোর প্রক্রিয়া।	সর্টিং হলো ডেটা টেবিলের রেকর্ডগুলোকে কোন নির্ধারিত ফিল্ড অনুসারে Ascending বা Descending অর্ডারে সাজানো।
মূল ডেটা ফাইলের রেকর্ডের ক্রমিক নাম্বার পরিবর্তিত হয় না।	মূল ডেটা ফাইলের রেকর্ডের ক্রমিক নাম্বার পরিবর্তিত হয়।
ডেটাবেজ ফাইলের এলোমেলো রেকর্ডগুলো তুলনামূলকভাবে দ্রুত সাজানো যায়।	ডেটাবেজ ফাইলের এলোমেলো রেকর্ডগুলো সাজানোর তুলনামূলকভাবে বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়।
ডেটাবেজ ফাইলের ইনডেক্স করলে নতুন ইনডেক্স ফাইল তৈরি হয় এবং মূল ডেটাবেজ ফাইল অপরিবর্তিত থাকে।	সর্টকৃত মূল ডেটাবেজ ফাইলটি বিন্যাসকৃত অবস্থায় মেমোরিতে সংরক্ষিত হয়।
ইনডেক্সকৃত ডেটাবেজে নতুন কোন রেকর্ড সন্নিবেশিত করলে অথবা সংশোধন করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়।	সর্টিং করা ডেটাবেজে নতুন কোন রেকর্ড সন্নিবেশিত করলে অথবা সংশোধন করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয় না। ফাইলটিকে আবার সর্ট করতে হয়।

৩.৪ ডেটাবেজ রিলেশন (Database Relation)

দু'টি ডেটাবেজের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করা (Creating Relationship Between Two Database)

একটি ডেটাবেজে একাধিক টেবিল থাকতে পারে। কোন একটি কমন ফিল্ডের উপর ভিত্তি করে দুই বা ততোধিক ডেটা টেবিলের/ডেটাবেজের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করাকে রিলেশনশীপ বলা হয়। রিলেশন করা ডেটা টেবিলের সমন্বয়ে গঠিত ডেটাবেজকে রিলেশনাল ডেটাবেজ বলা হয়। রিলেশনাল ডেটাবেজে সহজেই একাধিক ডেটাটেবিলে/ডেটাবেজে ডেটা ব্যবস্থাপনার কাজ করা যায়। বড় ডেটাবেজকে ভেঙ্গে আলাদা আলাদা ডেটাটেবিল তৈরি করে রিলেশনশীপের মাধ্যমে ডেটা নিয়ে কাজ করা যায়। ১৯৭০ সালে E-F Codd রিলেশনশীপ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন।

রিলেশন তৈরি করার শর্ত (Conditions for Making Database Relation)

১. কমপক্ষে একটি কমন ফিল্ড থাকতে হবে এবং কমন ফিল্ডের নাম, ডেটা টাইপ, ফিল্ড সাইজ ইত্যাদি একই হতে হবে।
২. একটি ফিল্ডকে প্রাইমারি কী ফিল্ড হিসেবে থাকতে হবে এবং ফিল্ডের তথ্য ইউনিক হতে হবে এবং একই থাকতে হয়।
৩. টেবিল/ফাইলগুলো একই সময় খোলা থাকতে হবে।

রিলেশনের প্রকারভেদ (Types of Database relationships)

ডেটা টেবিলের মধ্যে নিম্নলিখিত রিলেশন হতে পারে। যথা–

১. One to One রিলেশন
২. One to Many রিলেশন অথবা Many to One রিলেশন
৩. Many to Many রিলেশন

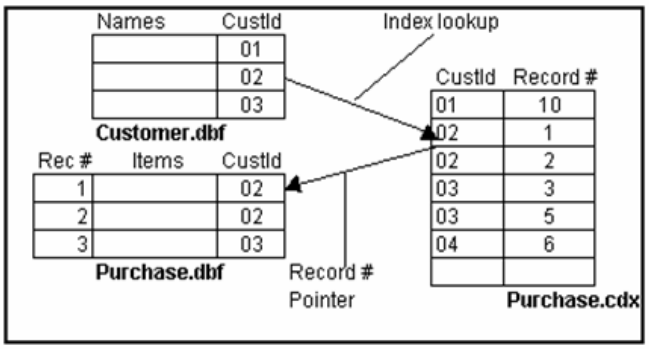

চিত্র ঃ একটি রিলেশনাল স্ট্রাকচার

Parents এবং Children ডেটাবেজ

রিলেশনাল ডেটাবেজের ক্ষেত্রে Parent এবং Children টার্মটি বহুলভাবে প্রচলিত। যে ডেটাবেজে সরাসরি কাজ করা হয় সে কন্ট্রোলার ডেটাবেজ হচ্ছে Parent এবং Parent ডেটাবেজের সাথে সম্পর্কিত ডেটাবেজকে Child এবং Children ডেটাবেজ বলা হয়।

One to One রিলেশন

এক্ষেত্রে কোন ডেটা টেবিলের একটি রেকর্ডের জন্য অন্য ডেটা টেবিলে কেবল একটি রেকর্ডের সম্পর্ক থাকে। কোন বেসিক ডেটাবেজকে ভেঙ্গে আলাদা আলাদা ডেটা টেবিলে সংরক্ষণ করা হয় তখন One to One রিলেশনে থাকতে হয়। যেমন- কোন অফিসের কর্মচারীদের নাম, ঠিকানা, পদবি একটি ডেটা টেবিলে এবং তাদের বেতন সংক্রান্ত তথ্যাবলি অন্য ডেটা টেবিলে সংরক্ষণ করা যায়। এক্ষেত্রে দুটি ডেটা টেবিলের একটি কমন ফিল্ডের (Emp_ID) ভিত্তিতে One to One রিলেশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

Emp_ID	Name	Designation	Address
101	Tareq	Accountant	Mirpur, Dhaka.
102	Hasan	Pieon	Raipura,Narsingdi
103	Jabbar	Driver	Uttara, Dhaka.
104	Rashid	Office Assit.	Asulia,Savar.

Emp_ID	Basic	Medical	Conveyence
101	7500	1500	2000
102	3500	1000	1000
103	4200	750	800
104	5500	850	1200

চিত্র ঃ One to One রিলেশনাল স্ট্রাকচার

One to many রিলেশন

এটি একটি বহুল ব্যবহৃত রিলেশন পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে কোন ডেটা টেবিলের একটি রেকর্ড অন্য ডেটা টেবিলের একাধিক রেকর্ডের সাথে সম্পর্ক থাকে। ধরা যাক, কোন অফিসে বিভিন্ন সাপ্লাইয়ার বিভিন্ন পণ্য সরবরাহ করে। এক্ষেত্রে সাপ্লাইয়ারদের জন্য Supplier নামে একটি ডেটা টেবিল রয়েছে এবং পণ্য সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্যাবলির জন্য Orders নামে আর একটি ডেটা টেবিল তৈরি করা আছে। সাধারণত একজন সাপ্লাইয়ার বিভিন্ন রকম পণ্য সরবরাহ করে থাকে। ফলে Supplier ডেটাবেজে একটি Supplier ID নম্বরের বিপরীতে Orders ডেটাবেজে একাধিক লেনদেন সংরক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে ডেটাটেবিল দু'টির মধ্যে রিলেশন প্রতিষ্ঠা করতে হলে তা হবে One to Many রিলেশন । এই পদ্ধতির বিপরীত রিলেশন হলো Many to One ।

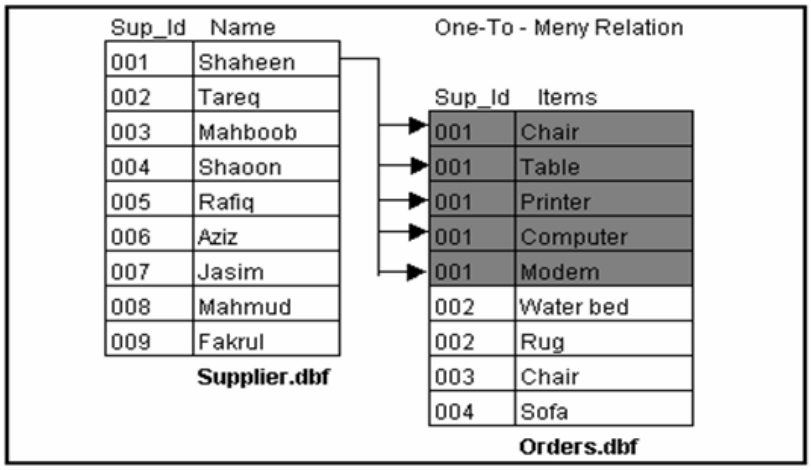

চিত্র : One to Many রিলেশনাল স্ট্রাকচার

Many to One রিলেশন

এটি One to Many রিলেশনশীপের বিপরীত। এক্ষেত্রে Parent ডেটা টেবিলের একাধিক রেকর্ডের বিপরীতে Child ডেটা টেবিলে কেবল একটি ম্যাচিং রেকর্ড থাকতে পারে। ধরা যাক, Phone.dbf এবং Officer.dbf নামক দু'টি ডেটাবেজ আছে, প্রত্যেক অফিসারের জন্য একাধিক ফোন নাম্বার আছে। এখন Phone.dbf-এর সাথে Officer.dbf-এর রিলেশনাল স্ট্রাকচারটি হবে একটি Many to One রিলেশন।

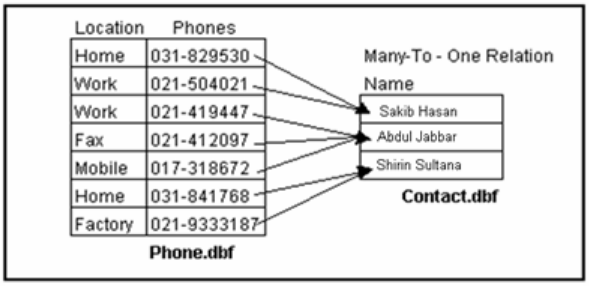

চিত্র ঃ Many to One রিলেশনাল স্ট্রাকচার

Many to Many রিলেশন

এক্ষেত্রে ডেটা টেবিলের মধ্যে রিলেশন থাকা অবস্থায় উভয় টেবিলের মধ্যে সম্পর্ক থাকে। এ রকম রিলেশন তৈরির ক্ষেত্রে একটি Third ডেটা টেবিল তৈরি করতে হয়। যা Junction ডেটা টেবিল নামে পরিচিত।

Order Table

Order_ID	Cust_Name
1001	Md.Jahid
1002	Abul Hasan
1003	Yunus Khan
1004	Tareq Zaman

Product Table

Product_ID	ProductName
3001	Computer
3002	Printer
3003	Scanner
3004	Keyboard

Order Details Table

Order_ID	Product_ID	ProductName	Cust_Name
1001	3001	Computer	Md.Jahid
1001	3003	Scanner	Md.Jahid
1001	3004	Keyboard	Md.Jahid
1002	3001	Computer	Abul Hasan
1002	3002	Printer	Abul Hasan
1002	3003	Scanner	Abul Hasan
1002	3004	Keyboard	Abul Hasan
1003	3002	Printer	Yunus Khan
1003	3003	Scanner	Yunus Khan
1003	3004	Keyboard	Yunus Khan

চিত্র ঃ Many to Many রিলেশনাল স্ট্রাকচার

ডেটা টেবিলের মধ্যে রিলেশন তৈরি করা (Creating Relationship Between Data Tables)

ধরা যাক, Employee 1 এবং Employee 2 দু'টি টেবিল। Employee 1 টেবিলে আছে Employee Number এবং Employee Salary নামে দু'টি ফিল্ড। অপরদিকে Employee 2 টেবিলে আছে Employee Number, Employee Name, Job Title এবং Address নামে চারটি ফিল্ড। Employee Number ফিল্ডটি উভয় টেবিলেই কমন রাখা হয়েছে। কারণ এ ফিল্ডের উপর ভিত্তি করেই টেবিল দু'টির মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করা হবে।

employee1 : Table

Employee num	Employee sala
1	5000
2	5500
3	3500
4	4000
5	7000
6	4575

চিত্র ঃ Empolyee 1 ডেটা টেবিল

Employee num	Employee nam	Job title	Address
1	Ahmed	Officer	Dhaka
2	Sattar	Driver	Khulna
3	Tareq	Officer	Jessore
4	Mahmood	Manager	Barisal
5	Jabbar	Operator	Sylhet
6	Kamrul	Pieon	Comilla

চিত্র ঃ Empolyee 2 ডেটা টেবিল

রিলেশন তৈরি (Creating relationships)

১. Tools মেনু থেকে Relationships নির্বাচন করতে হবে অথবা টুলবারের Relationships এ ক্লিক করতে হবে। পর্দায় Show Table ডায়ালগ বক্সটি প্রদর্শিত হবে।

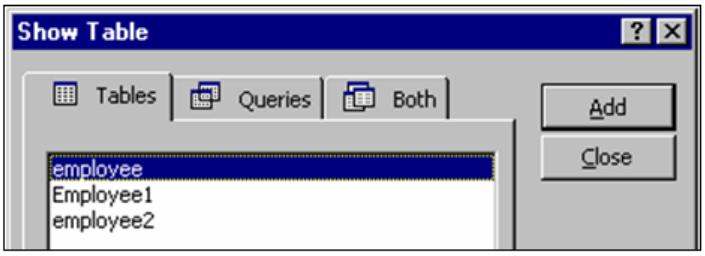

৩. Show Table ডায়ালগ বক্সে Employee1 টেবিলটি সিলেক্ট করে Add বাটনে ক্লিক করতে হবে। তারপর Employee 2 টেবিলটি সিলেক্ট করে Add বাটনে ক্লিক করতে হবে। উভয় টেবিল Relationships উইন্ডোতে সংযুক্ত হবে। Close বাটনে ক্লিক করলে পর্দায় Relationships উইন্ডো দেখা যাবে।

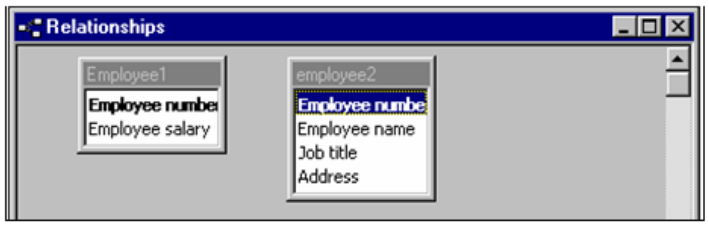

৫. Employee 1 টেবিলের Employee Number ফিল্ডটিকে Drag করে Employee 2 টেবিলের Employee Number এর উপর এনে ছেড়ে দিতে হবে। পর্দায় Relationships উইন্ডোর পরবর্তী অবস্থা প্রদর্শিত হবে।

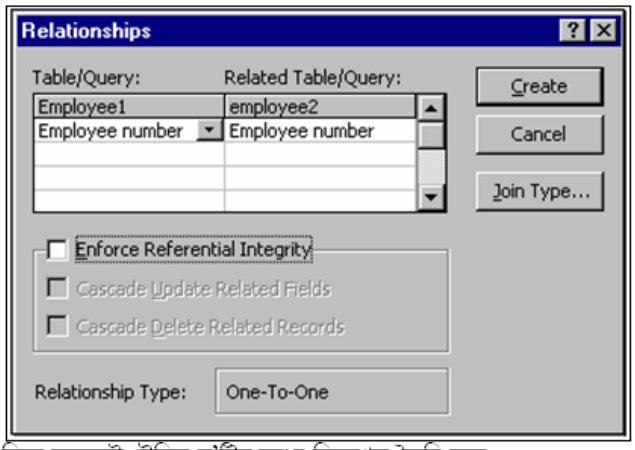

৬. এবার Create বাটনে ক্লিক্ করলেই টেবিল দু'টির মধ্যে রিলেশন তৈরি হবে।

৭. ক্লোজ বাটনে ক্লিক করে Yes বাটনে ক্লিক করে ডেটাবেজ উইন্ডোতে চলে আসতে হবে।

৮. File মেনু থেকে Save বাটনে ক্লিক করে রিলেশনটি একটি নাম দিয়ে সেভ করতে হবে।

রিপোর্ট তৈরি করা (Creating a Report)

রিপোর্ট অর্থ প্রতিবেদন। চাহিদামত তথ্য/রেকর্ডকে সুবিন্যস্ত করে উপস্থাপনাই হল রিপোর্ট। ডেটাবেজের অধীন এক বা একাধিক টেবিল থেকে প্রয়োজনীয় ফিল্ডের রেকর্ডসমূহ নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করা যায়। আবার কুয়েরি করে অথবা নতুন ক্যালকুলেটেড ফিল্ড তৈরি করে রিপোর্ট তৈরি করা যায়। রিপোর্ট তৈরির বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে।

রিপোর্টের ব্যবহার (Application of a Report)

যেসব কাজে রিপোর্ট ব্যবহার করা হয় তা হলো–

১. ডেটাবেজ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপনা।
২. হিসাব-নিকাশের ফলাফল প্রদর্শন করা।
৩. চার্টে ফলাফল প্রদর্শন করা।
৪. মেইলিং লেবেল প্রদর্শন করা।
৫. বিভিন্ন বছরের আয়-ব্যয় প্রদর্শন করা।

ফরমেটেড রিপোর্ট (Formatted Report)

ডেটাবেজের অধীন কয়েকটি টেবিল থেকে প্রয়োজনীয় ফিল্ডের রেকর্ডসমূহ নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করে প্রিন্ট করা যায়। রিপোর্টটিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য পেজ মার্জিন, হেডার, ফুটার ইত্যাদি নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয়। এসব নির্ধারণ করে তৈরিকৃত রিপোর্টটিকে ফরমেটেড রিপোর্ট বলা হয়। ফরমেটেড রিপোর্টে নিম্নলিখিত অংশগুলো থাকে।

১. Report Header
২. Page Header
৩. Group Header
৪. Detail
৫. Page Footer ও
৬. Report Footer

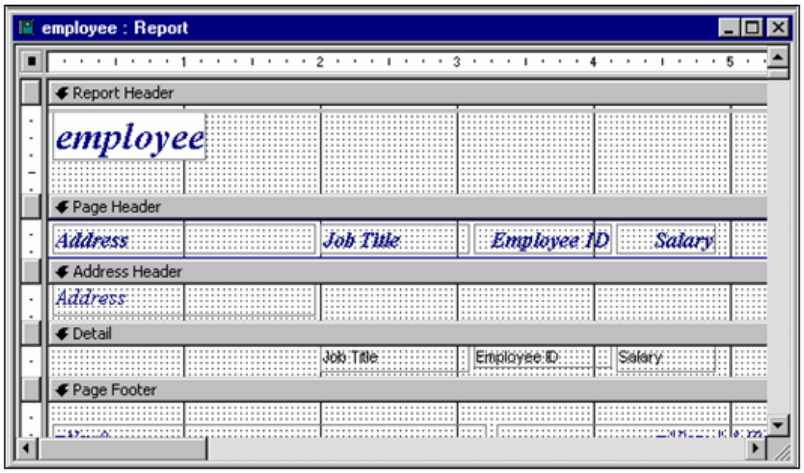

১. **Report Header** : রিপোর্ট সম্বন্ধে কোন তথ্য বা টাইটেল এই অংশে প্রদর্শিত হয়। এখানে যা কিছু লেখা হবে শুধুমাত্র প্রথম পাতার শীর্ষদেশে তা প্রদর্শিত হবে।

২. **Page Header** : এখানে যা কিছু লেখা হবে প্রত্যেক পাতার শীর্ষদেশে তা প্রদর্শিত হবে। যেমনঃ কোন ফিল্ডের হেডিং, পৃষ্ঠা নম্বর, মুদ্রণের সময় ইত্যাদি।

৩. **Group Header** : যদি কোন ফিল্ডের উপর গ্রুপিং নির্ধারণ করা থাকে তবে প্রত্যেক গ্রুপের শীর্ষে যা কিছু লেখার দরকার হয় এখানে তা লিখতে হয়। একাধিক গ্রুপিং লেবেলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লেখা সংযোজন করা যায়।

৪. **Detail** : যে টেবিল অথবা কুয়েরির উপর রিপোর্ট তৈরি করার জন্য নির্বাচন করা হয় সে টবিল অথবা কুয়েরির ডেটাগুলো এখানে প্রদর্শিত হয়।

৫. **Page Footer** : এখানে যা কিছু লেখা হবে প্রত্যেক পাতার নিম্নপ্রান্তে তা প্রদর্শিত হবে। যেমন– পৃষ্ঠা নম্বর, তারিখ ইত্যাদি।

৬. **Report Footer** : রিপোর্টের সর্বশেষ পাতার সর্বনিম্নপ্রান্তে এটি প্রদর্শিত হয়। যেমন– কোন নিউমেরিক ফিল্ডের চূড়ান্ত যোগফল, সর্বোচ্চ সংখ্যা, সর্বনিম্ন সংখ্যা, রেকর্ড সংখ্যা ইত্যাদি।

অটো রিপোর্ট তৈরি করা (Creating Auto Report)

নিচে অটো রিপোর্ট তৈরি করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো ঃ

১. যে ডেটাবেজের উপর রিপোর্ট তৈরি করা হবে সে ডেটাবেজটি Open করতে হবে।

২. Tables ট্যাবে ক্লিক্ করে ডেটাবেজ-এর অধীন টেবিলটি নির্বাচন করতে হবে।

৩. Reports ট্যাবে ক্লিক করতে হবে।

৪. New বাটনে ক্লিক করতে হবে। New Report ডায়ালগ বক্স সচল হবে।

৫. Auto Report : Columner অথবা Auto Report : Tabular এ দু'টির যে কোন একটিকে নির্বাচন করতে হবে।

৬. Choose The Table or Query where the object's data comes from: ড্রপ-ডাউন বাটনে ক্লিক্ করে লিস্ট থেকে ডেটাবেজ টেবিলটি নির্বাচন করতে হবে।

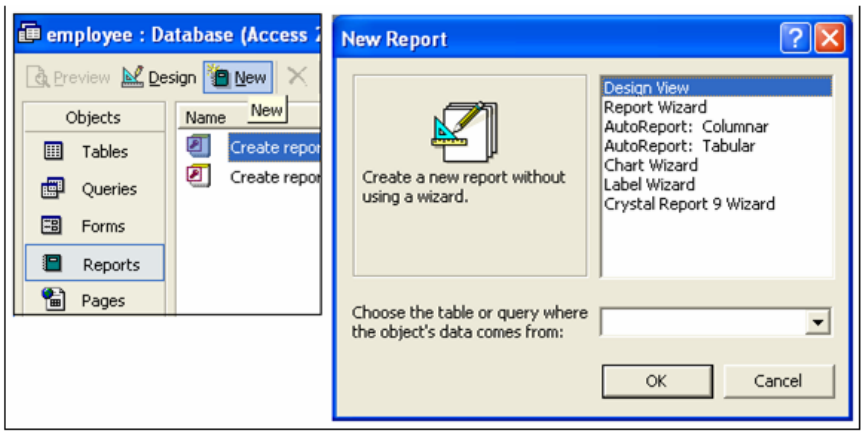

৭. OK বাটনে ক্লিক করতে হবে। নির্বাচিত ডেটাবেজ টেবিলের উপর দ্রুত রিপোর্ট তৈরি হবে।

ডেটাবেজের ব্যবহার (Applications of Database)

বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের ডেটাবেজ তৈরি করা হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী ডেটাবেজ তৈরি করার পর ডেটাবেজকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করাই হচ্ছে ডেটাবেজ সিস্টেমের প্রধান কাজ। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে ডেটাবেজের ব্যবহার হলো —

১. **সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান :** শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ব্যুরো, নির্বাচন কমিশন, শিক্ষা ব্যুরো, পর্যটন কর্পোরেশন, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ব্যানবেইস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনায় ডেটাবেজ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

২. **বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান :** বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ইনভেন্টরি, অর্ডার প্রসেসিং, পে-রোল, একাউন্টিং, শিপিং ইত্যাদি কাজে ডেটাবেজ ব্যবহৃত হয়।

৩. **বিলিং :** বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, টেলিফোন ইত্যাদি ব্যবহারের রেকর্ড, মাসিক বিল, প্রি-প্রেইড কলিং গ্রাহকের হিসাব, গ্রাহকের বিবিধ তথ্যাবলি সংরক্ষণে।

৪. **ব্যাংকিং :** গ্রাহকের বিবরণ, ব্যালেন্স, একাউন্ট স্টেটমেন্ট, লোন, ব্যাংকিং লেনদেন, ক্রেডিট কার্ড প্রভৃতি কাজে।

৫. **এয়ারলাইনস :** বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত টার্মিনালের সাথে টেলিফোন এবং অন্যান্য নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার মাধ্যমে বিমানের রিজার্ভেশন ও সিডিউলিং তৈরির ক্ষেত্রে।

৬. **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :** স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের বিবিধ তথ্য, রেজিস্ট্রেশন, রেজাল্ট প্রভৃতি কাজে।

৭. **অর্থ ব্যবস্থাপনা :** বিভিন্ন অর্থ লগ্নীকারক ও অর্থ ব্যবস্থাপনায় যেমন-হোল্ডিং, ক্রয়-বিক্রয়, স্টক, শেয়ার বা বন্ড ক্রয়, আর্থিক বিশ্লেষণ প্রভৃতি কাজে।

৮. **উৎপাদন ব্যবস্থাপনা :** বিভিন্ন কল-কারখানায় উৎপাদন, মজুদ পরিমাণ, চাহিদা, অর্ডার, স্টোর প্রভৃতি হিসাব বিশ্লেষণে।

৯. **মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা :** কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নথিপত্র, বেতন-ভাতাদি, ওভারটাইম, আয়কর, বোনাস প্রভৃতি হিসাব প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণে।

৩.৫ কর্পোরেট ডেটাবেজ (Corporate Database)

কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান বলতে মূলত বড় বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেমন-ব্যাংক, বীমা, মোবাইল কোম্পানি, সরকারি বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝানো হয়। কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেটভিত্তিক ব্যবস্থায় বড় বড় প্রতিষ্ঠান তাদের কেন্দ্রিয় অফিসের সাথে শাখা অফিসসমূহের সমন্বয়, বিভিন্ন ব্যবসায়িক কাজ এবং ডেটা আদান-প্রদানের জন্য যে বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহার করে তাকে কর্পোরেট ডেটাবেজ বলা হয়। কোনো কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ বা অনুবিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের ডেটা নিয়ে তৈরি হয় কর্পোরেট ডেটাবেজ। কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে এই ডেটাবেজ গড়ে তুলে প্রতিষ্ঠানের তথ্যসমূহ সংরক্ষিত রাখে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন কাজের জন্য এই ডেটাবেজকে ব্যবহার করে। কর্পোরেট ডেটাবেজ প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুসারে সেন্ট্রালাইজ বা ডিস্ট্রিবিউটেড হতে পারে।

- Simple Sequential Files
- Indexed Sequential & Random Access Files
- Hierarchic Database Management Systems (IMS)
- Network Database Management Systems (IDMS)
- Relational Database Management Systems (ORACLE)
- End-User Database Management Systems (DBASE, PARADOX, ACCESS)
- Spreadsheets (EXCEL, QUATTRO PRO)

কর্পোরেট ডেটাবেজ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান সম্পদ বিধায় এটিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তাবিধান করতে হয়। কর্পোরেট পর্যায়ে ব্যবহৃত জনপ্রিয় ডেটাবেজ সফটওয়্যার হলো-Oracle, SQL Server, Sybase, MySQL, FileMaker, Access ইত্যাদি।

৩.৬ সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডেটাবেজ (Database in Government Organization)

শক্তিশালী সরকার পরিচালনা ব্যবস্থায় ডেটাবেজ হলো গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। প্রতিটি সরকারের অধীনে থাকে অসংখ্য মন্ত্রণালয়। এসব মন্ত্রণালয় স্বতন্ত্রভাবে কিংবা অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বিত উপায়ে কাজ করে থাকে। এসব কাজে তথ্যের ব্যবহার অপরিহার্য। এই তথ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও সুন্দর ও কার্যোপযোগী করে তুলতে পারে ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। উন্নয়নমূলক নানা কর্মকাণ্ডে এসব তথ্যকে ব্যবহার করে আশাতীত ফলাফল পাওয়া যায়। যেমন– নির্দিষ্ট সময় পর পর দেশে আদমশুমারি পরিচালিত হয়। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেশের নাগরিকদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নানা তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত এসব তথ্য পরবর্তীতে ডেটাবেজে সংরক্ষণ করলে তা থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে এগুলোকে পৃথকভাবে কাজে লাগাতে পারে। এর ফলে যে অঞ্চলে যে ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন সেগুলো করার জন্য বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সরকারের জন্য সহজ হয়ে যায়। ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠানে উপাত্ত/তথ্য ব্যবস্থাপনার কাজ করা হয় ডেটাবেজ ব্যবহার করে।

সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডেটাবেজ এর ব্যবহার (Using Database in Government Organization)

সরকারি প্রতিষ্ঠানে যেসব কাজে ডেটাবেজ ব্যবহার করা হয়–

- তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করে নাগরিকদের ভোটার আইডি সংরক্ষণে।
- বাড়ির হোল্ডিং নম্বর, ভূমি ট্যাক্স, আয়কর প্রদানে।
- পাবলিক পরীক্ষাগুলোর ফলাফল ও তথ্য সংরক্ষণে।
- শিক্ষার হার, পাসের হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ইত্যাদি সংরক্ষণে।
- ভূমি জরিপ, নানা ধরনের রেকর্ডের তথ্য সংরক্ষণে।
- অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিবর্গের ছবিসহ ব্যক্তিগত নানা তথ্য, আঙুলের ছাপ ইত্যাদি সংরক্ষণে।
- সরকারি নানা গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট তথ্য সংরক্ষণে।
- পরিসংখ্যান ব্যুরো, নির্বাচন কমিশন, ব্যানবেইস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণে।
- আদমশুমারি, কৃষি শুমারি, অর্থনৈতিক সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণে।
- বিবাহ, তালাক প্রভৃতি রেজিস্ট্রেশন ও রেকর্ড সংরক্ষণে।
- জন্মহার ও মৃত্যুহার নির্ণয়, জন্ম-মৃত্যু রেকর্ড সংরক্ষণে।
- দুর্ঘটনার রেকর্ড সংরক্ষণে।
- আইন, আদালত, মামলা, অধ্যাদেশ ইত্যাদি সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণে।
- সরকারি বিভিন্ন নথিপত্র ও জরিপ সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণে।
- শহর বা গ্রামাঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন রেকর্ড সংরক্ষণে।
- জেলা, থানা বা এলাকাওয়ারি বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণে।
- সামরিক বাহিনীর ভূমি, সৈন্য, অপারেশন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণে।
- সরকারি-বেসরকারি আয়-ব্যয়, রাজস্ব বা উন্নয়ন বরাদ্দ, বাজেট প্রভৃতি কাজে।
- মোট উৎপাদন, বার্ষিক জিডিপি, গড় আয়, বিদেশি ঋণের পরিমাণ প্রভৃতি নিরূপণ ও সংরক্ষণে।
- স্টক মার্কেটে শেয়ার দর, কোম্পানি প্রোফাইল, কোম্পানি প্রসপেক্টাস, সূচক প্রভৃতি নির্ণয় ও সংরক্ষণে।
- আয়কর, কাস্টম, আমদানি-রপ্তানি, রেমিট্যান্স প্রভৃতি সংরক্ষণ ইত্যাদি।

অর্থাৎ সার্বিকভাবে সরকারি পর্যায়ে ডেটাবেজ ব্যবহারের কারণে রাষ্ট্রের কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা বাড়ে।

৩.৭ ডেটা সিকিউরিটি (Data Security)

ডেটাবেজে অ্যাকসেস ও নিয়ন্ত্রণ করাই হলো ডেটা সিকিউরিটি। ডেটা সিকিউরিটির ফলে কম্পিউটার, ডেটাবেজ এবং ওয়েবসাইটসমূহকে ধ্বংসাত্মক শক্তিসমূহ/অননুমোদিত/অবৈধ বিপজ্জনক ব্যবহারকারীদের অনাকাঙ্ক্ষিত কার্যক্রম থেকে রক্ষা পায়। ডেটা সিকিউরিটির কারণে একজনের ডেটার গোপন বিষয় অন্য ব্যবহারকারী দেখতে/পরিবর্তন করতে পারে না। যেকোনো আকার ও ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য ডেটা সিকিউরিটি হলো প্রধানতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ডেটা সিকিউরিটি 'ইনফরমেশন সিকিউরিটি (আইএস)' বা 'কম্পিউটার সিকিউরিটি' নামেও পরিচিত। ডেটাবেজ সিস্টেমে ডেটার নিরাপত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ডেটাবেজ সিকিউরিটি ফিচার দিয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করা হয় ঃ

১. অনুমোদন ব্যতীত ডেটা অ্যাকসেস না করা।
২. ব্যবহারকারীর ডেটা ব্যবহার করার অধিকার সংরক্ষণ করা।
৩. ডিস্ক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা।
৪. সিস্টেম রিসোর্স ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা।
৫. ইউজার অ্যাকশন অডিট ও নিয়ন্ত্রণ করা।

ডেটা সিকিউরিটির জন্য যা প্রয়োজন :

১. **গোপনীয়তা :** ডেটা কেবল অনুমোদিত পক্ষগুলোর দ্বারাই পড়া যাবে।
২. **সততা :** ডেটা কেবল অনুমোদিত পক্ষগুলোর দ্বারাই পরিবর্তন সাধন করা যাবে।
৩. **প্রাপ্যতা :** অনুমোদিত পক্ষগুলোর কাছে ডেটাগুলো সহজলভ্য হবে।

৩.৮ ডেটা এনক্রিপশন (Data Encryption)

ডেটা এনক্রিপশন হলো একটি প্রক্রিয়া, যেখানে প্লেইন টেক্সট (Plain text) ডেটাগুলো সাইফার টেক্সট (Cipher text) ডেটাতে রূপান্তরিত হয়– যাতে করে এটি সর্বসাধারণের পড়ার ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। যেসব অনুমোদিত ব্যক্তির কাছে এই ডেটা পড়ার কী রয়েছে কেবল তারাই এটি পড়তে পারবেন। ডেটা এনক্রিপশনের মাধ্যমে ডেটার গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়। এটি হলো কোন তথ্যে অবাঞ্ছিত প্রবেশ থেকে রক্ষা পাবার জন্য এনকোডিং-এর প্রক্রিয়া। তথ্য সঞ্চালনের ক্ষেত্রে এনক্রিপশন বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয়। এতে এক ধরনের ডেটা সিকুয়েন্স রাখা হয়। এই ডেটা সিকুয়েন্সকে বলা হয় এনক্রিপশন কী। ডেটাবেজে ডেটার নিরাপত্তা বিধান করার জন্য ডেটা এনক্রিপ্ট করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। উপযুক্ত ডিসাইফার কোড বা ডিক্রিপ্ট পদ্ধতি জানা না থাকলে ঐ ডেটা কেউ অ্যাকসেস করতে পারলেও ব্যবহার করতে পারবে না। এনক্রিপ্ট করা ডেটা ব্যবহারের পূর্বে তা ডিসাইফার কোড দিয়ে ডিক্রিপ্ট করে নিতে হবে।

অধিকারপ্রাপ্ত ব্যবহারকারী এনক্রিপশন পদ্ধতি অনুযায়ী ডেটা বুঝতে সমর্থ হবে। কেননা অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি জানে কোন পদ্ধতিতে এনক্রিপ্ট অর্থাৎ কোড করা হয়েছে। সে লিখিত তথ্য না পড়ে তার কোড ডিসাইফার করে অর্থাৎ ডিক্রিপ্ট করে মূল তথ্য পড়ে নিতে পারে। যেমন– এনক্রিপ্ট করে AZAD শব্দটিকে লেখা যায় BABE। এক্ষেত্রে 'পরবর্তী অক্ষর'কে কোডিং পদ্ধতি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। যেমন : A-এর পরবর্তী অক্ষর B, Z-এর পরবর্তী অক্ষর A এবং D-এর পরবর্তী অক্ষর E। কাজেই BABE থাকলে ডিক্রিপ্ট করে বুঝতে হবে সেটি আসলে AZAD। অধিকারবিহীন ব্যবহারকারী একে দেখবে BABE এবং পুরো ডেটাবেজ তার কাছে মনে হবে দুর্বোধ্য।

ডেটা এনক্রিপশনের ব্যবহার (Applications of Data Encryption)

১. গোপনীয় ডেটাকে সুরক্ষা দিয়ে অন্যের চোখে পড়া বা অন্যের অ্যাকসেসকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সাধারণত ডেটা এনক্রিপশন ব্যবহৃত হয়। এটি সর্বক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতে পারে।

২. ক্লায়েন্ট এবং অন্যান্য গোপনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক তথ্যাদি প্রেরণে ব্যাংকগুলোতে এনক্রিপশন ব্যবহৃত হয়।

৩. বিদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন দেশের দূতাবাসগুলোতে নিরাপদ মেসেজ প্রেরণে বিভিন্ন দেশের সরকার ডেটা এনক্রিপশন পদ্ধতি ব্যবহার করে।

৪. গোপন যোগাযোগের জন্য সামরিক বাহিনীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সংস্থাতে ডেটা এনক্রিপশন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

৫. অধিকাংশ ই-মেইল প্রোগ্রাম ডেটা প্রেরণ ও গ্রহণের ক্ষেত্রে ডেটা এনক্রিপশন প্রদান করে, যাতে করে তৃতীয় কোনো পক্ষের দ্বারা ই-মেইলগুলো পড়া সম্ভব না হয়।

৬. যে সমস্ত সাইটে ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্যাদি যেমন– ঠিকানা ও ক্রেডিট কার্ড নাম্বার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা হয় সাধারণত সেসব সাইটে ডেটা এনক্রিপশন ব্যবহৃত হয়।

এনক্রিপশন স্কিমের ধরন

বর্তমানে প্রধানত দুই ধরনের এনক্রিপশন স্কিম প্রচলিত রয়েছে। এগুলো হলো ঃ

১. সিমেট্রিক এনক্রিপশন (Symmetric Encryption) বা সিক্রেট-কী এনক্রিপশন (Secret-Key Encryption)
২. অ্যাসিমেট্রিক এনক্রিপশন (Asymmetric Encryption) বা পাবলিক কী এনক্রিপশন (Public-Key Encryption)

সিমেট্রিক এনক্রিপশন বা সিক্রেট-কী এনক্রিপশন

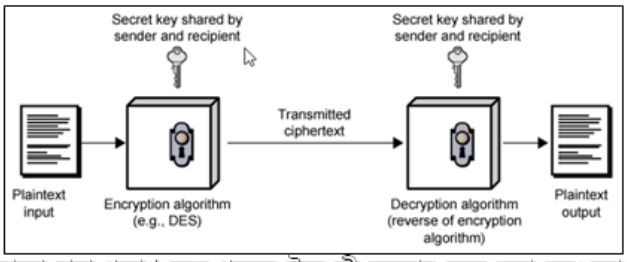

এই এনক্রিপশন স্কিমে এনক্রিপশন ও ডিক্রিপশন কী-গুলো একই। এক্ষেত্রে যোগাযোগের পূর্বে উভয় পক্ষকে অবশ্যই একটি গোপন কী-এর বিষয়ে সম্মতিতে আসতে হয়। এটি 'কনভেনশনাল এনক্রিপশন' নামেও পরিচিত। এক্ষেত্রে শক্ত এনক্রিপশন অ্যালগরিদম ব্যবহার করতে হয়। ডেটা প্রেরণ ও গ্রহণকারীকে অবশ্যই তাদের গোপন কী-টিকে নিরাপদে রাখতে হয়। নতুবা এই কী বাইরের কারো দ্বারা প্রকাশ হয়ে পড়লে উক্ত কী ব্যবহার করে করা সবগুলো যোগাযোগ পাঠযোগ্য হয়ে পড়ে।

সংশ্লিষ্ট উপাদানসমূহ ঃ

১. **প্লেইন টেক্সট :** ইনপুট ডেটা, যেটিকে এনক্রিপ্ট করা হবে। এটি পঠনযোগ্য।

২. **এনক্রিপশন অ্যালগরিদম :** একটি গাণিতিক ফরমুলা, যা প্লেইন টেক্সটকে সাইফার টেক্সটে রূপান্তরিত করে। এক্ষেত্রে ডেটা এনক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ড (DES), ট্রিপল ডিইএস (Triple DES), অ্যাডভান্সড এনক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ড (AES) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

৩. **সিক্রেট কী :** এটি একটি গোপন কোড, যা ডেটাকে এনক্রিপ্ট বা ডিক্রিপ্ট করার জন্য প্রয়োজন হয়।

৪. **সাইফার টেক্সট :** এনক্রিপ্টেড ডেটা। এটি আর সাধারণভাবে মানুষের পাঠযোগ্য অবস্থায় থাকে না।

৫. **ডিক্রিপশন অ্যালগরিদম :** পূর্বের মতোই একটি গাণিতিক ফরমুলা, যা সাইফার টেক্সটকে প্লেইন টেক্সটে রূপান্তরিত করে।

অ্যাসিমেট্রিক এনক্রিপশন বা পাবলিক-কী এনক্রিপশন

এই এনক্রিপশন স্কিমে এনক্রিপশন কী-টি যে কারও ব্যবহার ও মেসেজসমূহ এনক্রিপ্ট করার জন্য প্রকাশ করা হয়। তবে এক্ষেত্রে কেবল গ্রহণকারী পক্ষের কাছেই ডিক্রিপশন কী-এর অ্যাকসেস থাকে এবং সেই পক্ষটি এনক্রিপ্টেড মেসেজগুলো পড়তে পারে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দুটি কী ব্যবহৃত হয়। পাবলিক-কী এনক্রিপশন তুলনামূলকভাবে নতুন আবিষ্কার।

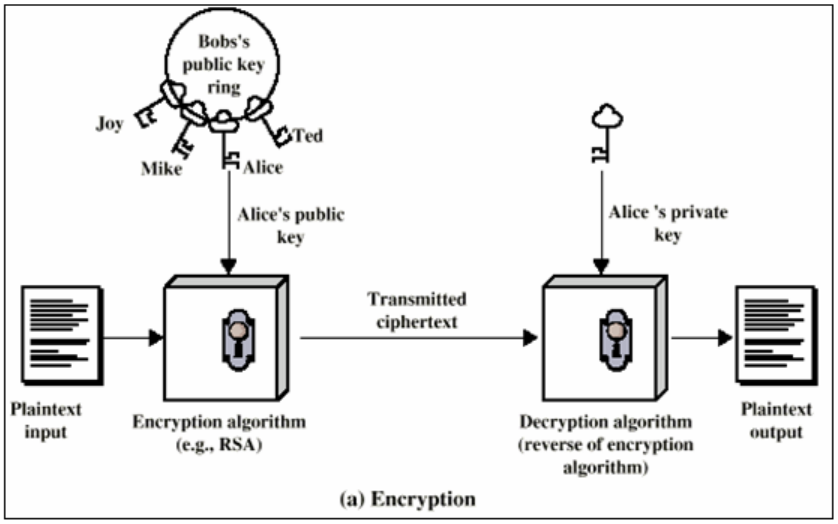

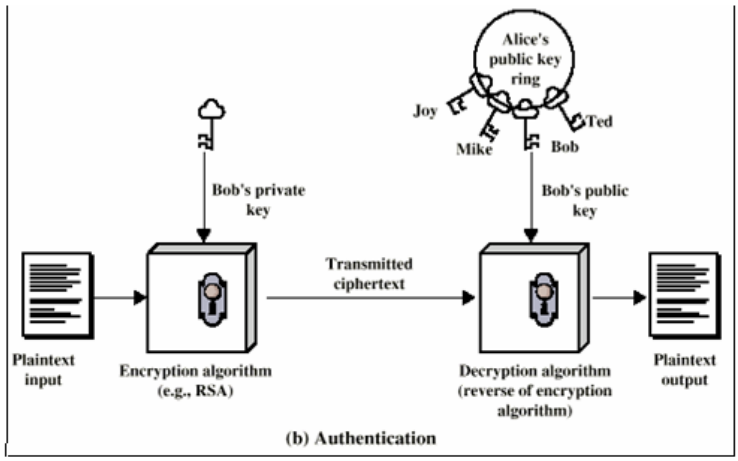

সংশ্লিষ্ট উপাদানসমূহ :

১. প্লেইন টেক্সট
২. এনক্রিপশন অ্যালগরিদম
৩. পাবলিক ও প্রাইভেট কী : পাবলিক কী-টি এনক্রিপশনের ক্ষেত্রে সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে আর প্রাইভেট কী-টি ডেটাকে ডিক্রিপ্ট করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে সংরক্ষণ করা হয়।
৪. সাইফার টেক্সট
৫. ডিক্রিপশন অ্যালগরিদম

ডেটা এনক্রিপশনের উপায়

ডেটা এনক্রিপ্ট করার জন্য অনেকগুলো পদ্ধতিই প্রচলিত আছে। যথা–

- সিজার কোড (Caesar Code)
- ডেটা এনক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ড (Data Encryption Standard - DES)
- ট্রিপল ডিইএস (Triple DES)
- অ্যাডভান্সড এনক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ড (Advanced Encryption Standard - AES)
- ইন্টারন্যাশনাল ডেটা এনক্রিপশন অ্যালগরিদম (International Data Encryption Algorithm - IDEA)

রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের সময় থেকে ডেটা এনক্রিপ্ট করার জন্য সিজার কোড ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমানে তা কম্পিউটারে ডেটা এনক্রিপ্ট করার জন্যও ব্যবহৃত হচ্ছে। কিছুদিন আগেও আমেরিকার ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেকনোলজি (প্রাক্তন ন্যাশনাল ব্যুরো অব স্ট্যান্ডার্ড) কর্তৃক আবিষ্কৃত Data Encryption Standard - DES বেশ জনপ্রিয় একটি পদ্ধতি ছিল। তবে নিরাপত্তা দুর্বলতার কারণে এখন Triple DES, AES, IDEA ইত্যাদি স্ট্যান্ডার্ডগুলো বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে।

সার-সংক্ষেপ

ডেটা **(Data)** : Data শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Datum-এর বহুবচন। Datum অর্থ হচ্ছে তথ্যের উপাদান (an item of information)। তথ্যের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্রতর অংশসমূহ হচ্ছে ডেটা বা উপাত্ত।

ডেটাবেজ **(Database)** : ডেটা (Data) শব্দের অর্থ হচ্ছে উপাত্ত এবং বেজ (Base) শব্দের অর্থ হচ্ছে ঘাঁটি বা সমাবেশ। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এক বা একাধিক ডেটা টেবিল বা ফাইলের সমষ্টি হচ্ছে ডেটাবেজ।

কী **(Key)** : যে ফিল্ডের উপর ভিত্তি করে ডেটাবেজের অপরাপর ফিল্ডের তথ্যাবলি শনাক্ত করা হয় তাকে কী বা কী-ফিল্ড বলা হয়।

প্রাইমারি কী (Primary Key) : যে এট্রিবিউট বা কী দিয়ে কোন নির্দিষ্ট এনটিটির কোন এনটিটি সেটকে সম্পূর্ণরূপে শনাক্ত করা যায়, তাকে বলা হয় প্রাথমিক বা প্রাইমারি কী।

ডেটাবেজ সফটওয়্যার (Database Software) : যে সফটওয়্যারের সাহায্যে কোন ডেটা সংরক্ষণ করে প্রয়োজনানুসারে ঐগুলো সাজানো বা কাজে লাগানো যায় তাকে ডেটাবেজ সফটওয়্যার বলা হয়।

রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম : একটি ডেটাবেজে একাধিক টেবিল থাকতে পারে। কোন একটি নির্দিষ্ট ফিল্ডের উপর ভিত্তি করে দুই বা ততোধিক টেবিলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করাকে রিলেশনশীপ বলা হয়। আধুনিক ডেটাবেজ সফটওয়্যার বলতে সাধারণত রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকেই বুঝায়।

কুয়েরি (Query) : ডেটাবেজে ব্যাপক তথ্য সংগৃহীত থাকতে পারে। এ ব্যাপক আয়তনের তথ্যের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় রেকর্ড বা রেকর্ডসমূহ খুঁজে বের করাকে কুয়েরি বলা হয়।

ডেটাবেজ ইন্ডেক্সিং (Indexing Database) : ডেটাবেজ থেকে তথ্য খোঁজ করার জন্য কোন ফিল্ডের ভ্যালু এবং রেকর্ড রেফারেন্স একটি অর্ডার অনুসারে সজ্জিত করে রাখা হয়। ডেটাবেজের টেবিলের রেকর্ডসমূহ এরূপ কোন লজিক্যাল অর্ডারে সাজিয়ে রাখাকেই ইনডেক্স বলা হয়।

ডেটাবেজ রিলেশন (Database Relation) : একটি ডেটাবেজে একাধিক টেবিল থাকতে পারে। কোন একটি নির্দিষ্ট ফিল্ডের উপর ভিত্তি করে দুই বা ততোধিক টেবিলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করাকে রিলেশনশীপ বলা হয়।

কর্পোরেট ডেটাবেজ (Corporate Database) : কর্পোরেট ডেটাবেজ হলো প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের সেই ডেটাবেজ, যা কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহৃত হয়।

অনুশীলনী–৬

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ডেটাবেজ মানে হল—
ক. উপাত্ত ঘাঁটি খ. উপাত্ত বিন্যাস
গ. উপাত্ত সার্টিং ঘ. উপাত্ত সার্চিং

২. ডেটাটেবিলে Numeric ফিল্ড কী ধরনের?
ক. সংখ্যা খ. টেক্সট
গ. বর্ণ ঘ. যুক্তিমূলক

৩. ডেটা টেবিলের মধ্যে ব্যক্তির 'নাম' কোন ধরনের ডেটা?
ক. Date/Time খ. Number
গ. Text ঘ. Currency

৪. বিপুল পরিমাণ তথ্য থেকে সহজে তথ্য খুঁজতে কোনটি ব্যবহার করা হয়?
ক. ডেটাবেজ সফটওয়্যার খ. স্প্রেডশিট সফটওয়্যার
গ. প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার ঘ. ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার

৫. ডেটা সমৃদ্ধ এক বা একাধিক ফাইলের সমষ্টিকে কী বলা হয়?
ক. ফিল্ড খ. রেকর্ড
গ. ডেটাবেজ ঘ. ফাইল

৬. Field Name–এর আকার নির্ধারণের জন্য কোনটি ব্যবহার করতে হবে?
ক. Create খ. Field name
গ. Field Size ঘ. Design View

৭. ডেটাবেজের হেডিং বা শিরোনামকে কী বলা হয়?
ক. কলাম খ. সারি
গ. ফিল্ড ঘ. রেকর্ড

৮. ডেটাবেজের একই সারিতে কয়েকটি ফিল্ড মিলে কী হয়?
ক. কলাম খ. সারি
গ. ফিল্ড ঘ. রেকর্ড

৯. Auto Number এর অন্তর্ভুক্ত কোনটি?
ক. Integer খ. Data/Time
গ. Double ঘ. Serial No

১০. নিচের কোনটি ডেটাবেজ প্রোগ্রাম?
ক. ওরাকল খ. পাইথন
গ. এ্যাডা ঘ. নোটপ্যাড

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১	ক	২	ক	৩	গ	৪	ক	৫	গ	৬	গ	৭	গ	৮	ঘ	৯	ঘ	১০	ক

১১. নিচের কোনটি DBMS এর উদাহরণ?
ক. MS DOS খ. MS EXCEL
গ. C++ ঘ. MS ACCESS

১২. বহুল ব্যবহৃত ওরাকল (ORACLE) কী?
ক. ডেটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার
খ. স্প্রেডসিট প্রোগ্রাম
গ. ডস অপারেটিং সিস্টেম ঘ. ওয়ার্ড প্রসেসিং

১৩. বহুল ব্যবহৃত MySQL একটি—
ক. ডেটাবেজ প্রোগ্রাম খ. স্প্রেডশীট প্রোগ্রাম
গ. সি++ প্রোগ্রাম ঘ. গ্রাফিক্স প্রোগ্রাম

১৪. ডেটাবেজ ডেটা এন্ট্রি করার জন্য ব্যবহৃত ইন্টারফেস বা মাধ্যমকে বলা হয়-
ক. প্রজেক্ট খ. রিপোর্ট
গ. ফর্মস ঘ. কুয়েরি

১৫. কোনটি ডেটাবেজের উপাদান নয়?
ক. রেকর্ড খ. সিনটেক্স
গ. ম্যাক্রো ঘ. মডিউল

১৬. ডেটাবেজে ডেটা এন্ট্রি করার জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ক. প্রজেক্ট খ. ফর্ম
গ. মডিউল ঘ. কুয়েরি

১৭. Memo ব্যবহৃত হয় কখন?
ক. সংখ্যা লিখতে খ. অক্ষর লিখতে
গ. বর্ণনামূলক লেখার জন্য ঘ. ছবি সংযোজনে

১৮. প্রাইমারি ফিল্ডের ডেটাগুলো কেমন হওয়া অত্যাবশ্যক?
ক. লজিক্যাল খ. অটোনাম্বার
গ. ইউনিক বা স্বতন্ত্র ঘ. ক্রমানুযায়ি সাজানো

১৯. রিলেশনাল ডেটা মডেলের প্রবর্তক কে?
ক. চার্লস ব্যাবেজ খ. E.F Gordon
গ. E.F Joscph ঘ. E.F Codd

২০. একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের ডেটাবেজে অ্যাট্রিবিউট হলো রোল, নাম, বিভাগ, ঠিকানা। এক্ষেত্রে প্রাইমারি কী কোনটি?
ক. ঠিকানা খ. রোল
গ. নাম ঘ. বিভাগ

২১. নিচের কোনটি ফরেন কী, যখন একটি টেবিলের অ্যাট্রিবিউট Roll, Academic, Year এবং অপর একটি টেবিলের অ্যাট্রিবিউট Roll, Marks, Grade?
ক. Marks খ. Academic Year
গ. Roll ঘ. Grade

২২. একটি টেবিলে প্রাইমারি কী কয়টি থাকতে পারে?
ক. একটি খ. দুটি
গ. তিনটি ঘ. পাঁচটি

২৩. ডেটাবেজ থেকে নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে তথ্য খোঁজ করার জন্য কী ব্যবহার করতে হয়?
ক. কুয়েরি খ. সার্চিং
গ. রিলেশন ঘ. ইন্ডেক্স

২৪. কোনটি ফরেন কী এর কাজ?
ক. দু'টি অ্যাট্রিবিউটকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা
খ. দু'টি টেবিলের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা
গ. দুটি টেবিলকে স্বনির্ভর করা
ঘ. অ্যাট্রিবিউট ও রেকর্ড শনাক্ত করা

২৫. নাম (Name) ফিল্ড প্রাইমারি কী নয় কেন?
ক. একাধিক ব্যক্তির একই নাম হতে পারে
খ. একই ব্যক্তির নাম মাত্র একটি
গ. নাম অ্যাট্রিবিউট বহির্ভূত
ঘ. ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নাম সবসময় ভিন্ন ভিন্ন

২৬. ডেটাবেজে কোন ধরনের প্রোগ্রাম থাকে?
ক. সিস্টেম প্রোগ্রাম খ. অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম
গ. C প্রোগ্রাম ঘ. সহকারী প্রোগ্রাম

২৭. RDBMS এর ধারণা আসে কত সালে?
ক. ১৯৬০ খ. ১৯৭০
গ. ১৯৮০ ঘ. ১৯৯০

২৮. RDBMS সফটওয়্যার কোনটি?
ক. Oracle খ. MS-Excel
গ. MS Word ঘ. Power Point
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৯. ডেটা টেবিলের মধ্যে কোনটি প্রাইমারি কী ফিল্ড?
ক. নাম খ. রোল নম্বর
গ. গ্রুপ ঘ. বয়স

৩০. রিলেশনাল ডেটাবেজে সর্বনিম্ন ফাইলের সংখ্যা কয়টি?
ক. দুটি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. ছয়টি

৩১. নিচের কোনটি আরডিএমএস এর কাজ নয়?
ক. ডেটা সংরক্ষণ করা খ. ডেটার নিরাপত্তা রক্ষা করা
গ. তথ্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা
ঘ. একই সময়ে একাধিক ব্যবহারকারী প্রতিরোধ করা

৩২. ভিন্ন ভিন্ন ডেটা টেবিলগুলোকে একত্র করে ডেটা সঞ্চালন করার জন্য কী প্রয়োজন?
ক. ভিন্ন ভিন্ন টেবিলে ডেটা এন্ট্রি করা
খ. টেবিলগুলোর মধ্যে রিলেশন তৈরি করা
গ. টেবিলের নিরাপত্তা বিধান করা
ঘ. টেবিলগুলোর মধ্যে কুয়েরি করা

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১১	ঘ	১২	ক	১৩	ক	১৪	গ	১৫	খ	১৬	খ	১৭	গ	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	খ	২১	গ
২২	গ	২৩	ক	২৪	খ	২৫	ক	২৬	খ	২৭	খ	২৮	খ	২৯	খ	৩০	ক	৩১	গ	৩২	খ

৩৩. কোনটি সর্বাধিক ব্যবহৃত অবাণিজ্যিক RDBMS সফটওয়্যার?
ক. DB-2 খ. MYSQL
গ. MS Access ঘ. SQL Server

৩৪. রিলেশনাল ডেটাবেজ ডেটাকে নিম্নলিখিত কোন উপায়ে সংরক্ষণ করা হয়?
ক. XML খ. FILE
গ. TABLE ঘ. HTML

৩৫. পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি ফাইল নিয়ে গঠিত ডেটাবেজকে বলা হয়-
ক. সম্পর্কযুক্ত ডেটাবেজ খ. নিরীক্ষিত ডেটাবেজ
গ. গুচ্ছ ডেটাবেজ ঘ. অনিয়ন্ত্রিত ডেটাবেজ

৩৬. কোন কারণে সর্ট-এর তেমন ব্যবহার নেই?
ক. এটি ইনডেক্সিং আউটপুটের চেয়ে কম মেমোরি দখল করে
খ. এটি ইনডেক্সিং আউটপুটের চেয়ে বেশি মেমোরি দখল করে
গ. সব ফিল্ড সর্ট করা যায় না
ঘ. ডেটা সর্ট করার প্রয়োজন হয়ে যায় না

৩৭. কোনটি RDBMS নয়?
ক. DB–2 খ. C++
গ. SQL ঘ. MySQL

৩৮. কুয়েরি হলো–
ক. ডেটাবেজ আপডেট রাখা
খ. ডেটাবেজ ফাইল সংরক্ষণ করা
গ. ডেটাবেজ থেকে কিছু খুঁজে বের করা
ঘ. কোনটিই নয়

৩৯. শর্তসাপেক্ষে ডেটাবেজ থেকে কোন ডেটা খুঁজে বের করাকে কী বলা হয়?
ক. সর্টিং খ. কুয়েরি
গ. সার্চিং ঘ. ইন্ডেক্সিং

৪০. ডেটাবেজের রিলেশনকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. চার খ. পাঁচ
গ. ছয় ঘ. সাত

৪১. একটি উপাদানের সাথে অনেকগুলো উপাদান সম্পর্কযুক্ত হয় কোন রিলেশনশীপে?
ক. One – to – One খ. Many – to – One
গ. One – to – Many ঘ. Many – to – Many

৪২. ডেটাবেজ প্রোগ্রামে সর্টিং-এর মাধ্যমে কী করা হয়?
ক. তথ্য ইনপুট দেওয়া হয় খ. তথ্য বাছাই করা হয়
গ. তথ্য মুছে ফেলা হয় ঘ. তথ্য বিন্যস্ত করা হয়

৪৩. রিপোর্ট কী?
ক. প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন
খ. অফিস ডকুমেন্ট
গ. এক প্রোগ্রাম
ঘ. প্রিন্ট করা

৪৪. নিচের কোনটি কুয়েরির ভাষা?
ক. SQL খ. Java
গ. C++ ঘ. HTML

৪৫. নিচের কোনটি ডেটা ব্যবস্থাপনার উপায়ের নাম?
ক. ডেটা এনক্রিপ্ট খ. ডেটা শিট
গ. ডেটা সিডিউল ঘ. ডেটা মডেল

৪৬. ডেটার গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য কী করা হয়?
ক. এনক্রিপশন অ্যালগরিদম
খ. সাইফারটেক্সট
গ. ডেটা এনক্রিপ্ট ঘ. প্লেইন টেক্সট

৪৭. পাবলিক কী এনক্রিপশনে কয় প্রকারের 'কী' ব্যবহার করা হয়?
ক. দুই প্রকার খ. তিন প্রকার
গ. চার প্রকার ঘ. পাঁচ প্রকার

৪৮. কে **Encryped** ডেটাকে **Decrypt** করতে পারে?
ক. সকল database ব্যবহারকারী খ. অবৈধ ব্যবহারকারী
গ. সকল কমপিউটার ব্যবহারকারী ঘ. বৈধ ব্যবহারকারী

৪৯. যদি **Encrypted** ডেটাকে **Decrypt** করার প্রয়োজন হয় তখন কী ব্যবহার করতে হবে?
ক. সার্চ কী খ. পাসওয়ার্ড
গ. একটি রেকর্ড ঘ. DBMS সফটওয়্যার

৫০. এনক্রিপ্টকৃত ডেটাকে মূল অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে কী করা হয়?
ক. ডিক্রিপ্টিং খ. কোডিং
গ. ডিবাগিং ঘ. মাইনিং

৫১. কর্পোরেট ডেটাবেজে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য কোথায় সংরক্ষণ করা হয়?
ক. একটি সার্ভার কম্পিউটারে
খ. দুই বা ততোধিক সার্ভারে
গ. কর্পোরেট শাখা অফিসগুলোর কম্পিউটারে
ঘ. ব্যক্তিগত কম্পিউটার

৫২. ডেটা এনক্রিপ্ট ও ডিক্রিপ্ট করার বিষয় হলো–
ক. ফটোগ্রাফি খ. ক্রিপ্টোগ্রাফি
গ. ইনফরমেটিক্স ঘ. টেলিগ্রাফি

৫৩. নিম্নের টেবিল দুটির মধ্যে কোন ধরনের ডেটাবেজ রিলেশন রয়েছে?

রোল	নাম	ফলাফল
১০১	রাসেল	এ+
১০২	রহমান	বি
১০৩	ইকবাল	এ

রোল	ঠিকানা	জন্ম তারিখ
১০১	মাদারীপুর	০৯/১১/২০০৪
১০২	বরিশাল	০৭/০১/২০০৫
১০৩	ঢাকা	১৯/১০/২০০৩

ক. One to One খ. Many to One
গ. One to Many ঘ. Many to Many

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

৩৩	খ	৩৪	গ	৩৫	ক	৩৬	খ	৩৭	খ	৩৮	গ	৩৯	খ	৪০	ক	৪১	গ	৪২	ঘ	৪৩	ক
৪৪	ক	৪৫	ঘ	৪৬	গ	৪৭	খ	৪৮	ঘ	৪৯	খ	৫০	ক	৫১	ক	৫২	খ	৫৩	ক		

৫৪. নিচের চিত্রটি কোনটি ধরনের রিলেশনশীপ প্রকাশ করে?

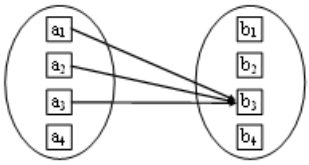

ক. One to one খ. One to many
গ. Many to one ঘ. Many to many

■ **বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

৫৫. ডেটাবেজ প্রোগ্রাম ব্যবহার করে–
i. শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক হিসাব ও উৎপাদনের তথ্য সহজে সংরক্ষণ করা যায়
ii. কাঙ্ক্ষিত তথ্য দ্রুত উপস্থাপন করা যায়
iii. প্রয়োজনীয় রেকর্ডসমূহ সহজে খুঁজে পাওয়া যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৬. কোনো ডেটাবেজের আওতায় থাকতে পারে –
i. এক বা একাধিক ডেটাটেবিল, কুয়েরি
ii. ফর্ম, রিপোর্ট
iii. ম্যাক্রো এবং মডিউল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৭. ডেটাবেজে **Field Property**-এর বিভিন্ন অংশ হলো—
i. Field Size ii. Format
iii. Caption
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৮. **Sorting** হলো—
i. মানের উর্ধ্বক্রমে সাজানো
ii. মানের নিম্নক্রমে সাজানো
iii. শব্দ বা সংখ্যার দৈর্ঘ্য অনুসারে সাজানো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৯. আধুনিক ডেটাবেজ সফটওয়্যার বলতে সাধারণত বুঝায়—
i. রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকে
ii. ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকে
iii. আধুনিক কম্পিউটারকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i
গ. ii ঘ. iii

৬০. **DBMS** হলো–
i. IBM DB–2 ii. Oracle
iii. Foxpro26
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬১. যে সব ফিল্ডের উপর সর্ট অপারেশন করা যায় না-
i. Memo ii. Currency
iii. OLE
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬২. ইনডেক্স করা যায়–
i. একটি ফিল্ডের উপর ii. দুটি ফিল্ডের উপর
iii. একাধিক ফিল্ডের উপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৩. ডেটা এনক্রিপ্ট করার জন্য জানার বিষয় হলো–
i. প্লেইনটেক্সট ii. সাইফার টেক্সট
iii. কী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৪. ডেটা এনক্রিপ্ট করার পদ্ধতি হলো–
i. সিজার কোড ii. DES
iii. IDEA
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৫. **RDBMS** ব্যবহৃত হয়—
i. ব্যবসাক্ষেত্রে ii. শিক্ষাক্ষেত্রে
iii. তথ্য অনুসন্ধানে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ঘ. i, ii ও iii

৬৬. ধরা যাক, তোমার কলেজের সকল ছাত্র-ছাত্রীর একটি ডেটাবেজ ফাইল আছে। উক্ত ফাইল থেকে সকল ছাত্রীর নাম পৃথক করতে হলে তুমি নিচের যে অপশন বাছাই করবে–
i. নতুন একটি টেবিল তৈরি
ii. কুয়েরি তৈরি iii. রিপোর্ট তৈরি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

৫৪	গ	৫৫	ঘ	৫৬	ঘ	৫৭	ঘ	৫৮	ক	৫৯	খ	৬০	খ	৬১	খ
৬২	ঘ	৬৩	ঘ	৬৪	ঘ	৬৫	ঘ	৬৬	খ						

৬৭. রিলেশন তৈরি করা টেবিল থেকে প্রয়োজনীয় ডেটা নিয়ে তৈরি করা যায়—
i. আলাদা ডেটা টেবিল ii. বর্ধিত ডেটা টেবিল
iii. রিলেশন টেবিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i
গ. ii ঘ. iii

৬৮. **Auto Number** টাইপের ডেটা দ্বারা—
i. ডেটাবেজকে অন্যান্য প্রোগ্রামে নেয়া যায়
ii. অন্যান্য প্রোগ্রামকে ডেটাবেজে আনা যায়
iii. স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধারাবাহিক ডেটা এন্ট্রি হয়ে যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. iii
গ. ii ঘ. i ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের টেবিলটি লক্ষ কর এবং ৬৯ ও ৭০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

Name	NID	Mobile	Address	Amount
Atiq	1000222345	01718239991	Tangail	23500.00
Mazhar	1002225892	01922363554	Faridpur	11400.00
Jabbar	1002228523	01556986556	Dhaka	21300.00
Salim	1002229875	01835696564	Pabna	26450.00

৬৯. টেবিলটির সাথে অপর কোন টেবিলের সম্পর্ক করতে হলে কোন ফিল্ডটিকে ভিত্তি বিবেচনা করতে হবে?
ক. Name খ. NID
গ. Address ঘ. Amount

৭০. এখানে ইন্টিজার টাইপ ডেটা আছে–
i. NID ফিল্ডে ii. Amount ফিল্ডে
iii. Mobile ফিল্ডে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭১ ও ৭২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
একটি ডেটাবেজে দুইশত ছাত্রের তথ্য সংরক্ষিত আছে। প্রতিটি ছাত্রের নাম, রোল নাম্বার, জন্ম তারিখ ও জিপিএ সংবলিত ৪টি করে ফিল্ড আছে।

৭১. উল্লিখিত ডেটাবেজে রেকর্ডের সংখ্যা কয়টি?
ক. ৪টি খ. ২৫টি
গ. ২০০টি ঘ. ৪০০টি

৭২. রোল নম্বর ফিল্ডটি হতে পারে—
i. Text type ii. Numeric type
iii. Logical
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii
গ. iii ঘ. সবগুলো

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭৩ ও ৭৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নাম	রোল নাম্বার	রেজিঃ নং	জিপিএ
মুসা	১০০১	৭১২০০৩	৫
আতিক	১০০২	৭১২০০৪	৪
সাকিব	১০০৩	৭১২০০৫	৫
হাসান	১০০৪	৭১২০০৬	৩

৭৩. উদ্দীপকের কোন ফিল্ডটি প্রাইমারি কী ফিল্ড হতে পারে—
i. রোল নাম্বার ii. নাম
iii. রেজিস্ট্রেশন নং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৪. উদ্দীপকের যে রোলগুলো জিপিএ ৫ পেয়েছে তাদের সহজে বের করার পদ্ধতি—
i. ইন্ডেক্সিং কমান্ড ii. সর্ট কমান্ড
iii. কুয়েরি কমান্ড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭৫ ও ৭৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
জহির সাহেব তার প্রতিষ্ঠানের প্রতিদিনের হিসাব-নিকাশ খাতা-কলমের মাধ্যমে সম্পন্ন করে। এতে করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে অনেক সমস্যা হয়। তাই তিনি ডেটাবেজ ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেন।

৭৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজ কম্পিউটারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে করতে হলে জহির সাহেবকে কোন সফটওয়্যারটি ব্যবহার করতে হবে?
ক. MS-Power point খ. MS-Excel
গ. MS-Access ঘ. MS-Word

৭৬. জহির সাহেব ডেটাবেস সফটওয়্যারটি ব্যবহার করলে যেসব সুবিধা পাবে–
i. রিপোর্ট তৈরি ii. রেকর্ড অনুসন্ধান
iii. বায়ো-ডেটা তৈরি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

৬৭	খ	৬৮	খ	৬৯	খ	৭০	খ	৭১	গ	৭২	খ	৭৩	খ	৭৪	ঘ	৭৫	গ	৭৬	ক

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
কসমোপলিটন কলেজের একটি স্টুডেন্ট ডেটাবেজ তৈরি করা হল। উক্ত ডেটাবেসে ছাত্র-ছাত্রীদের নাম, ক্রমিক নাম্বার, সেকশন, প্রাপ্ত নাম্বারের ফিল্ডের সমন্বয়ে তৈরি। ফিল্ডগুলোতে স্টুডেন্টদের তথ্যগুলো অগোছালো ভাবে সংরক্ষণ করা আছে। ডেটাবেজটি থেকে কিভাবে দ্রুত ডেটা খুঁজে বের করা যায় সেজন্য একজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ কিছু পরামর্শ দিয়েছে।
ক. রেকর্ড কী? ১
খ. দুইটি ডেটাবেজের মধ্যে রিলেশন তৈরি করতে কিছু শর্ত মেনে চলতে হয় কেন? ২
গ. ডেটাবেজটিতে সংরক্ষিত অগোছালো তথ্য সাজাতে গৃহীত ব্যবস্থা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ডেটাবেজ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলো মূল্যায়ন কর। ৪

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সিসটেক পাবলিক কলেজের অধ্যক্ষ পুরো কলেজের একটি ডেটাবেজ তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন। আইসিটির শিক্ষক মুনিরুল হাসানের সাথে এ ব্যাপারে তিনি পরামর্শ করেন।

ক. রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কী? ১

খ. ডেটাবেজ নিরাপত্তায় এনক্রিপশন জরুরি কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত কলেজের জন্য একটি ডেটাবেজ তৈরি কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত কর্মকাণ্ডে কলেজ কিভাবে উপকৃত হবে? সে সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শতদল কলেজের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ সকল স্তরে কম্পিউটার ব্যবহার উদ্যোগ নিয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ডেটাবেজ তৈরি করে তাতে নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, জন্মতারিখ, রোল নম্বর, সেকশন ইত্যাদি ফিল্ড সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

ক. ডেটাবেজ কী? ১

খ. ডেটাবেজ টেবিল ডিজাইনে ফিল্ড টাইপ নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ফিল্ড নিয়ে ডেটাবেজ তৈরি করার প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উক্ত ডেটাবেজ থেকে কলেজ যে সব সুবিধা পেতে পারে তা বিশ্লেষণপূর্বক তোমার মতামত দাও। ৪

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মি. ইলিয়াস একটি কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার। তিনি কয়েকজন কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে তাদের বেতন পুনঃনির্ধারণ করার জন্য নির্বাহী পরিচালকের কাছে একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করলেন। নির্বাহী পরিচালক বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দেন এবং এমপ্লয়িদের ব্যক্তিগত ও দৈনন্দিন কাজের রিপোর্ট সংক্রান্ত তথ্যগুলো চাইলেন। ইলিয়াস সাহেব অতঃপর কর্মীদের ব্যক্তিগত তথ্য ও ওয়ার্কিং রিপোর্টের ফাইল দুটো ডেটাবেজ প্রোগ্রামের সাহায্যে একটি সম্পর্কযুক্ত ফাইলে পরিণত করে নির্বাহী পরিচালকের নিকট প্রদান করলেন।

ক. ডেটাবেজ ফাইল কী? ১

খ. রিলেশনের জন্য টেবিলের মধ্যে অবশ্যই প্রাইমারি কী থাকতে হয় কেন? ২

গ. এমপ্লয়িদের ব্যক্তিগত তথ্য ও ওয়ার্কিং রিপোর্টের ফাইল দুটোর মধ্যে ডেটাবেজ সফটওয়্যার ব্যবহার করে সম্পর্ক তৈরি কর। ৩

ঘ. "সম্পর্কযুক্ত ফাইলটির কারণে নির্বাহী পরিচালক সহজেই যোগ্যতা অনুসারে এমপ্লয়িদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি মূল্যায়ন করতে পারবেন"– বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও। ৪

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ডেটাবেজ তৈরির জন্য উইজার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে। নতুন ব্যবহারকারীরা উইজার্ড ব্যবহার করে সহজেই ডেটাবেজ তৈরি করতে পারেন। কম্পিউটার ক্লাসে সাত্তার সবসময় একটি পদ্ধতি অবলম্বন করে ডেটা অনুসন্ধানের কাজ করে থাকে। কিন্তু সে পন্থায় ডেটা খুঁজে না পেয়ে শিক্ষকের কাছে জানতে চাইল কীভাবে তথ্যটি বের করা সম্ভব। তখন শিক্ষক তাকে ডেটাবেজকে ইনডেক্সিং করার পর তথ্যটি খোঁজার পরামর্শ দিলেন।

ক. কুয়েরি কী? ১

খ. ইন্ডেক্সিং ফাইল স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের নতুন ব্যবহারকারীদের দ্বারা একটি নতুন ডেটাবেজ তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে শিক্ষকের বর্ণিত পন্থা সাত্তারকে কীভাবে সাহায্য করবে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৬. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক নরসিংদী পৌরসভার জন্ম নিবন্ধনের জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে Computer Based অফিস স্থাপন করা হয়। জন্ম নিবন্ধনের জন্য যে আবশ্যকীয় তথ্যগুলো নিতে হবে তা হলো জন্ম তারিখ, লিংগ, পিতার নাম, মাতার নাম, ধর্ম ও জন্মস্থান।

ক. ফরমেটেড রিপোর্ট কী? ১

খ. ডেটাবেজ রিলেশনে প্রাইমারি কী এর প্রয়োজনীয়তা লেখ। ২

গ. উপরিউক্ত তথ্য নিয়ে ৫ জন শিশুর একটি নমুনা ডেটাবেজ তৈরি কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত পদ্ধতি থেকে নরসিংদী পৌরসভা কর্তৃক প্রাপ্ত সুবিধাগুলো আলোচনা কর। ৪

৭. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

গোয়েন্দা কর্মকর্তা ওসমান সাহেব একটি রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে পাঠাতে চান। তিনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে তথ্যটি তৈরির পর নিরাপত্তার জন্য ফাইলটিকে এমএস ওয়ার্ডের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে এনক্রিপ্ট করে তারপর তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠিয়ে দিলেন।

ক. ইনডেক্সিং কী? ১

খ. SQL কে অতি উচ্চ স্তরের ভাষা বলা হয় কেন? ২

গ. ওসমান সাহেব কীভাবে ফাইলটির গোপনীয়তা রক্ষা করলেন তা উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ফাইলটি নিরাপদে পাঠানোর জন্য ওসমান সাহেবের গৃহীত সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা আলোচনা কর। ৪

ব্যবহারিক

ডেটাবেজ (Database)

ডেটাবেজ তৈরি করা

মাইক্রোসফট একসিস প্রোগ্রাম দিয়ে ডেটাবেজ তৈরি করার জন্য ঃ

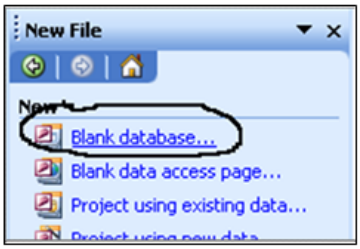

১. Start বাটনে ক্লিক্ করে Programs নির্বাচন করে Microsoft Access এ ক্লিক্ করতে হবে।

২. File মেনুতে ক্লিক করে New এ ক্লিক্ করলে পর্দার ডান অংশে নিউ ফাইল টাস্কপ্যান আসবে।

৩. Blank Database এ ক্লিক করতে হবে।

৪. File New Database ডায়ালগ বক্সটি প্রদর্শিত হবে। File name : টেক্সট বক্সে ডেটাবেজটি যে নামে সেভ করা দরকার সে নাম (যেমন-employee) টাইপ করতে হবে।

৫. Create বাটনে ক্লিক্ করলে একটি ডেটাবেজ তৈরি (employee নামে) হবে এবং Database Window প্রদর্শিত হবে।

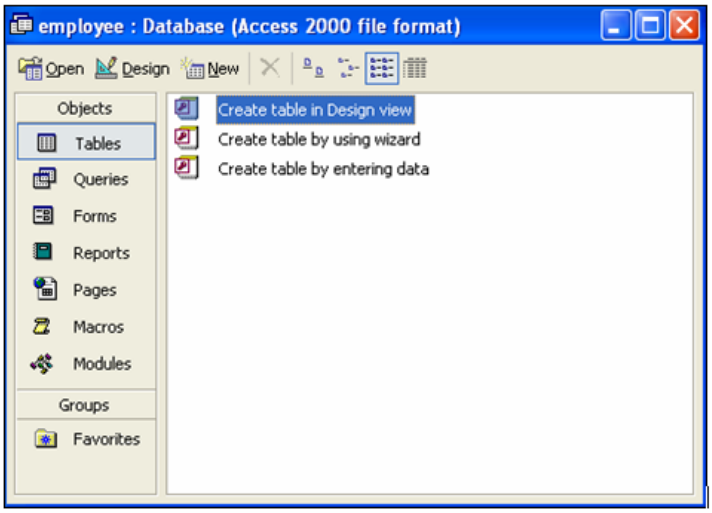

চিত্র ঃ ডেটাবেজ উইন্ডো

৬. এখন ডেটাবেজের অধীনে একটি টেবিল তৈরি করার জন্য Create table in design view এ ডাবল ক্লিক করতে হবে।

৭. Table Window Design View প্রদর্শিত হবে। উইন্ডোটির দু'টি অংশ। উপরের অংশে Field Name, Data Type এবং Description নামে তিনটি কলাম রয়েছে। নিচের অংশটি হলো ফিল্ড প্রোপার্টিজ। ফিল্ডের নাম লিখে ডেটা টাইপ নির্বাচন করলে এর উপর ভিত্তি করে প্রোপার্টিজ প্রদর্শিত হয়।

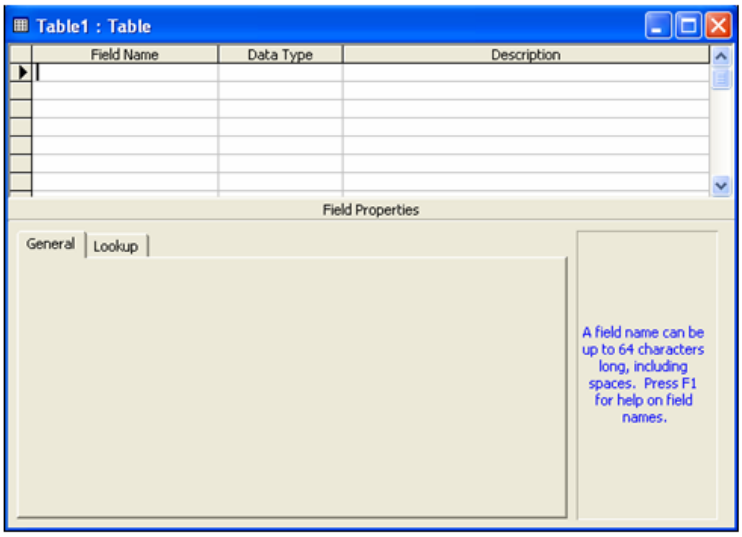

Field Name : Field Name হলো কলাম হেডিং। Name ফিল্ডের অধীনে নাম Father's Name : ফিল্ডে তাদের পিতার নাম, Address ফিল্ডে ঠিকানা থাকে।

Data Type : এক্সিস প্রোগ্রামে দশ ধরনের ডেটা এন্ট্রি করা যায়। কোন ফিল্ডে কি ধরনের ডেটা এন্ট্রি করা যাবে তা এ অপশন থেকে নির্বাচন করা হয়।

কোন ফিল্ডের বৈশিষ্ট্যকে সেই ফিল্ডের প্রোপার্টি বলা হয়। যেমন ফিল্ডের দৈর্ঘ্য, ক্যাপশন, ফরমেট ইত্যাদি। ডেটা এন্ট্রির সময় যতদূর সম্ভব ভুল-ত্রুটি এড়ানোর উদ্দেশ্যেই ফিল্ডের প্রোপার্টিজ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। কিছু কিছু প্রোপার্টিজ আছে যা সকল ফিল্ডেই বিদ্যমান এবং সবখানেই একই বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে। আবার কিছু কিছু প্রোপার্টিজ যাদেরকে সব ফিল্ডে দেখা যায় না এবং বিভিন্ন ফিল্ডে এদের কাজও ভিন্ন ভিন্ন। Field Name-এ কোন ফিল্ডের নাম টাইপ করলেই প্রোপার্টিজ লেখার জন্য স্ক্রিনের নিচের অংশে General প্রোপার্টিজ এন্ট্রি স্ক্রিনে প্রদর্শিত হবে।

ডেটা টেবিল তৈরি করা

ধরা যাক, employee নামে নিচের মতো ডেটা টেবিল তৈরি করা হবে।

employee : Table

Id	Name	Job Title	Department	Address	JoinDate	Salary
1	Aminul	Accountant	Admin	Norshingdi	9/9/90	9200
2	Morshed	Manager	Admin	Dhaka	11/12/99	9500
3	Sahid	Officer	Finance	Khulna	2/10/97	7000
4	Ratan	Officer	Finance	Barisal	12/12/96	6000
5	Safiq	Officer	Admin	Jessore	9/10/93	5400
6	Hasan	Sales Rep	Marketing	Sylhet	11/12/94	5500
7	Tareq	Sales Rep	Marketing	Dhaka	11/9/94	4890
8	Zahid	Sales Rep	Marketing	Chittagong	11/21/94	5400
9	Rafiq	Driver	Admin	Khulna	11/19/93	4000
10	Jabbar	Peon	Admin	Dhaka	9/9/93	2300
11	Sahadat	Director	Admin	Barisal	10/15/92	11400
12	Farhana	Operator	Admin	Dhaka	12/11/93	4300
13	Farid	Peon	Finance	Rajshahi	11/17/93	2400
14	Sahana	Receiptionist	Admin	Tangail	11/21/93	3500
15	Kasem	Officer	Marketing	Khulna	2/10/91	5200
16	Yusuf	Officer	Finance	Dhaka	12/11/92	4700

১. ডেটা টেবিল তৈরি করার জন্য প্রথমেই এর ফিল্ড স্ট্রাকচার তৈরি করতে হবে।

Field Name	Data Type	Field Properties
ID	Auto Number	---
Name	Text	Field Size = 15
JobTitle	Text	Field Size = 10
Department	Text	Field Size = 12
Address	Text	Field Size = 18
JoinDate	Date/Time	Format = Short Date
Salary	Currency	Format = General Number
Notes	Memo	

২. উপরের স্ট্রাকচার অনুযায়ী টেবিলটি তৈরি করার জন্য Field name : কলামের প্রথম সেলে ID টাইপ করে **Tab** কী চেপে অথবা মাউস দিয়ে ক্লিক্ করে Data Type কলামে চলে আসতে হবে। ফিল্ডে ক্রমিক নাম্বার স্বয়ংক্রিয়ভাবে আনার জন্য ফিল্ডটির ডেটা টাইপ হিসেবে Auto Number নির্বাচন করতে হবে। ড্রপ-ডাউন লিস্টে ক্লিক্ করে Auto Number নির্বাচন করতে হবে।

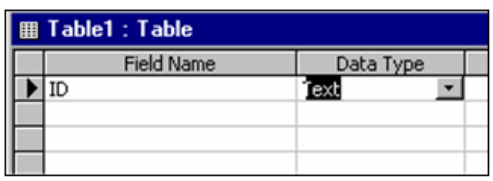

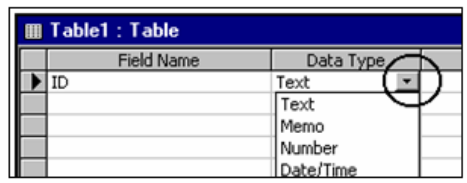

৩. F6 Press করে অথবা মাউস ক্লিক্ করে Field Properties প্যানেলে চলে আসতে হবে। Field Name কলামের দ্বিতীয় সেলে Name টাইপ করে Data Type কলামে Text নির্বাচন করতে হবে।

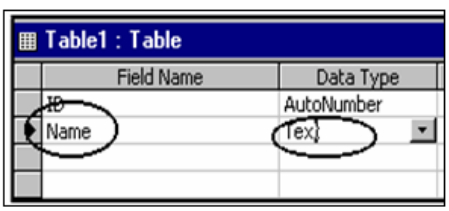

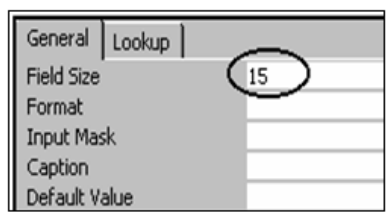

৪. Field Properties প্যানেলের Field Size বক্সে 15 লিখতে হবে। এভাবে অবশিষ্ট ফিল্ডের নাম, ডেটা টাইপ এবং Field Properties নির্ধারণ করতে হবে। সব ফিল্ড তৈরির পর ডিজাইন উইন্ডোটি নিচের চিত্রের মতো দেখাবে।

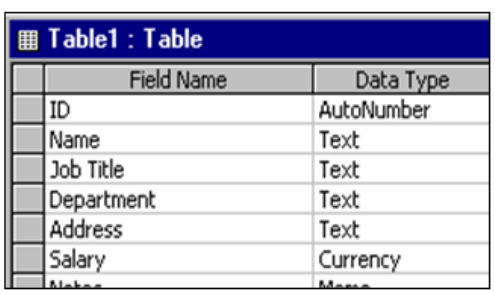

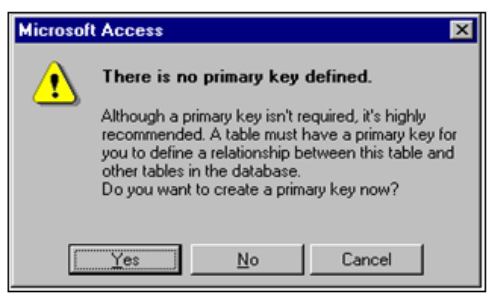

ডেটা টেবিল Save করা

টেবিলটি ডিজাইন করা শেষ হলে File মেনু থেকে Save নির্বাচন করলে সেভ অ্যাজ ডায়ালগ বক্স আসবে। ফাইলের একটি নাম (যেমন employee) টাইপ করে OK বাটনে ক্লিক করলে ডায়ালগ বক্স আসবে।

এ টেবিলের সাথে অন্য কোন টেবিলের সম্পর্ক সৃষ্টি করতে চাইলে উভয় টেবিলের একটি Unique ফিল্ডকে Primary Key হিসেবে নির্দিষ্ট করতে হয়। কোন নির্দিষ্ট ফিল্ডকে define করে না দিলে Access নিজ থেকেই ID নামের Auto number টাইপের একটি ফিল্ড তৈরি করে নেয়।

☒ বাটনে ক্লিক্ করে Close করলে ডেটাবেজ উইন্ডোতে ডেটা টেবিলের নাম (employee) দেখা যাবে।

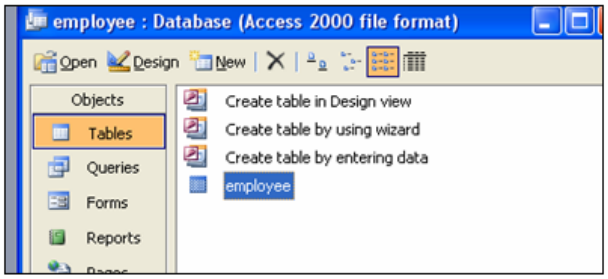

employee নামের একটি ডেটাবেজ তৈরি করে তার অধীনে employee নামের একটি ডেটা টেবিল তৈরি করা হয়েছে। এ অবস্থায় ডেটা টেবিলটি ওপেন করে তাতে ডেটা এন্ট্রি করা যাবে।

ডেটাবেজে ডেটা এন্ট্রি করা

১. এক্সিস প্রোগ্রামে ঢুকে File মেনুতে ক্লিক করে Open... এ ক্লিক করলে পর্দায় Open ডায়ালগ বক্স আসবে।
২. ডায়ালগ বক্স থেকে ডেটাবেজটি সিলেক্ট করে Open বাটনে ক্লিক করলে ডেটাবেজটি ওপেন হবে।

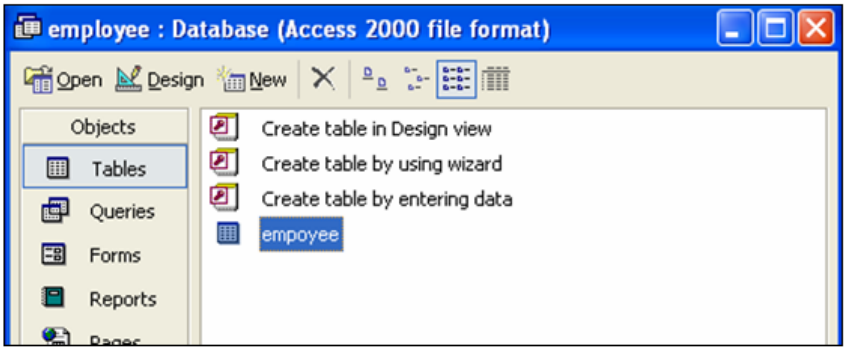

৩. Database Window থেকে টেবিলটির নামের (employee) উপর ডাবল ক্লিক করে টেবিলটি (employee) Datasheet View এ ওপেন করতে হবে।

৪. ট্যাব কী চেপে Name ফিল্ডে এসে নাম টাইপ করে ট্যাব কী চেপে পরবর্তী ফিল্ডে এসে ডেটা টাইপ করা যায়। এভাবে সব ফিল্ডে ডেটা এন্ট্রি করা যায়।

employee : Table

Id	Name	Job Title	Department	Address	JoinDate	Salary
1	Aminul	Accountant	Admin	Norshingdi	9/9/90	9200

৫. এভাবে বিভিন্ন ফিল্ডে ডেটা এন্ট্রি করে ট্যাব কী চেপে নিচের সারিতে এসে বিভিন্ন ফিল্ডে ডেটা এন্ট্রি করা যায়।

employee : Table

Id	Name	Job Title	Department	Address	JoinDate	Salary
1	Aminul	Accountant	Admin	Norshingdi	9/9/90	9200
2	Morshed	Manager	Admin	Dhaka	11/12/99	9500
3	Sahid	Officer	Finance	Khulna	2/10/97	7000
4	Ratan	Officer	Finance	Barisal	12/12/96	6000
5	Safiq	Officer	Admin	Jessore	9/10/93	5400
6	Hasan	Sales Rep	Marketing	Sylhet	11/12/94	5500
7	Tareq	Sales Rep	Marketing	Dhaka	11/9/94	4890
8	Zahid	Sales Rep	Marketing	Chittagong	11/21/94	5400
9	Rafiq	Driver	Admin	Khulna	11/19/93	4000
10	Jabbar	Peon	Admin	Dhaka	9/9/93	2300
11	Sahadat	Director	Admin	Barisal	10/15/92	11400
12	Farhana	Operator	Admin	Dhaka	12/11/93	4300
13	Farid	Peon	Finance	Rajshahi	11/17/93	2400
14	Sahana	Receiptionist	Admin	Tangail	11/21/93	3500
15	Kasem	Officer	Marketing	Khulna	2/10/91	5200
16	Yusuf	Officer	Finance	Dhaka	12/11/92	4700

চিত্র ঃ employee ডেটা টেবিল

রেকর্ড বাদ দেয়া (Delete করা)

ডেটা টেবিলে বিভিন্ন রেকর্ড থাকে। অপ্রয়োজনীয় কোন রেকর্ড বাদ দেয়ার জন্য নিচের পদক্ষেপ নিতে হবে।

১. ডেটাবেজটি ওপেন করে ডেটা টেবিলটি ওপেন করতে হবে।
২. যে রেকর্ড বা রেকর্ডসমূহ Delete করা দরকার তা সিলেক্ট করে Del কী চাপতে হবে অথবা Edit মেনু থেকে Delete নির্বাচন করতে হবে।
৩. Warning ডায়ালগ বক্স প্রদর্শিত হবে। Yes বাটনে ক্লিক করলে রেকর্ডটি মুছে যাবে।

ডেটা টেবিলের কাঠামো পরিবর্তন করা (Change the structure of data table)

ডেটাবেজে কাজ করার সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে উহার গঠন, কাঠামো পরিবর্তন করার প্রয়োজন হতে পারে। যেমন- ফিল্ডের যে সাইজ নির্ধারণ করা হয়েছে ডেটার দৈর্ঘ্য তার চেয়ে বেশি হলে ফিল্ডে তখন তা এন্ট্রি করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে ফিল্ডের আকার পুনরায় নির্ধারণ করতে হবে। এরূপ ডেটাবেজ কাঠামো পরিবর্তন করার জন্য নিচের পদক্ষেপ নিতে হবে।

১. যে ডেটাবেজের টেবিলের ফিল্ডের প্রোপার্টিজ পরিবর্তন করা দরকার সে ডেটাবেজটি ওপেন করে টেবিলটি সিলেক্ট করতে হবে।

২. Database Window প্রোপার্টিজ-এর Design বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৩. যে ফিল্ডের প্রোপার্টিজ পরিবর্তন করা দরকার সে ফিল্ডে ক্লিক করে সিলেক্ট করতে হবে।

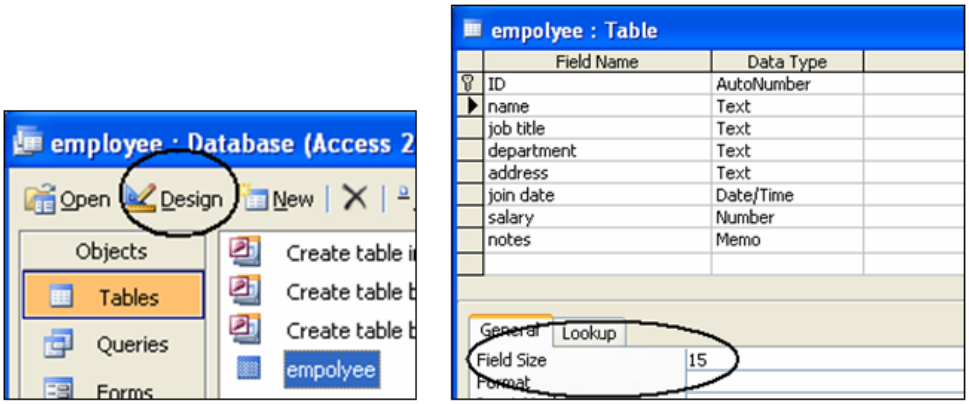

৪. প্রোপার্টিজ উইন্ডো থেকে যে ধরনের প্রোপার্টিজ পরিবর্তন করা দরকার তা করতে হবে। যেমন ফিল্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করার জন্য এর Field Size এ ক্লিক করে সাইজ সংখ্যা পরিবর্তন করতে হবে।

৫. এভাবে প্রোপার্টিজ পরিবর্তন করে ক্লোজ বাটনে ক্লিক করে বের হওয়ার নির্দেশ দিলে পর্দায় বার্তা আসবে। পরিবর্তনটি সংরক্ষণ করার জন্য Yes বাটনে ক্লিক করতে হবে।

কুয়েরি ফাইল তৈরি করা

কোন টেবিলে সংরক্ষিত ডেটা থেকে প্রয়োজনীয় যে কোন ডেটাকে অত্যন্ত দ্রুত এবং খুব সহজ উপায়ে খুঁজে বের করার কার্যকর ব্যবস্থাকে কুয়েরি বলা হয়। এক্সপ্রেশন, ফিল্টার, অপারেটর ইত্যাদির সাহায্যে কুয়েরির কাজ সম্পন্ন করা হয়।

১. Access এ ঢুকে ডেটাবেজটি (employee) ওপেন করতে হবে।

২. employee ডেটাবেজ উইন্ডো থেকে Queries নির্বাচন করতে হবে।

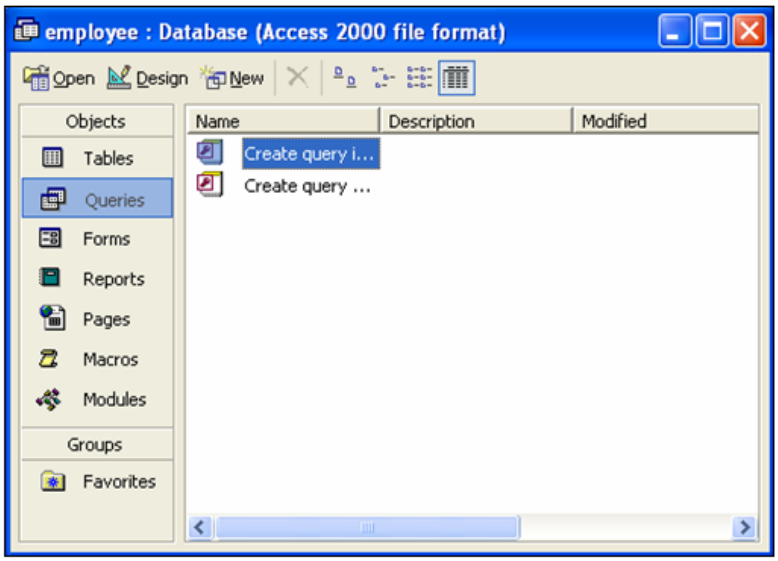

৩. New বাটনে ক্লিক্ করলে New Query নামে নিচের ডায়ালগ বক্সটি আসবে।

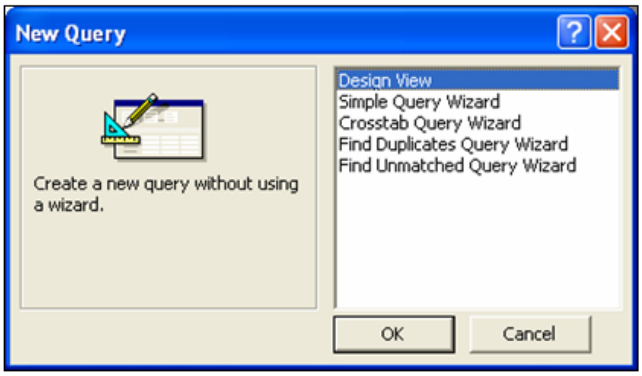

৪. Design View এ ডাবল ক্লিক করলে পর্দায় Show Table ডায়ালগ বক্স আসবে।

৫. ডেটা টেবিলটি (employee) সিলেক্ট করতে হবে।

৬. Add বাটনে ক্লিক্ করে Close বাটনে ক্লিক করতে হবে। Select Query উইন্ডোতে টেবিলটির ফিল্ডসমূহের তালিকা বক্স প্রদর্শিত হবে।

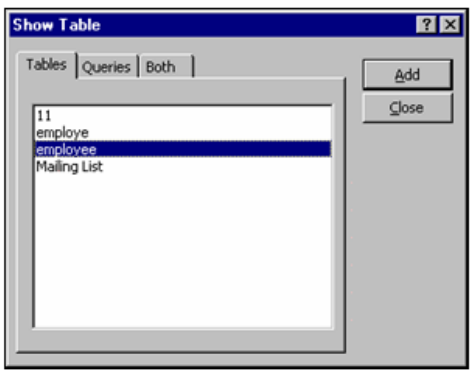

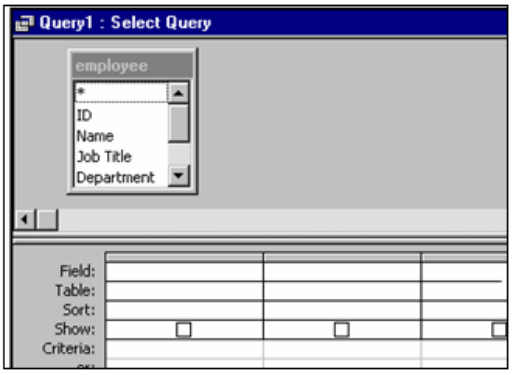

৭. Select Query উইন্ডোতে টেবিলটির ফিল্ডসমূহের তালিকা বক্সের কোন ফিল্ডে (যেমন- ID) ডাবল ক্লিক করলে এটি Select Query উইন্ডোর Field এর প্রথম রো-তে চলে আসবে। একইভাবে অন্যান্য ফিল্ডসমূহ (যেমন, Name এবং Salary ফিল্ড দু'টিও) Select Query উইন্ডোর Field এর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রো-তে নিয়ে আসতে হবে।

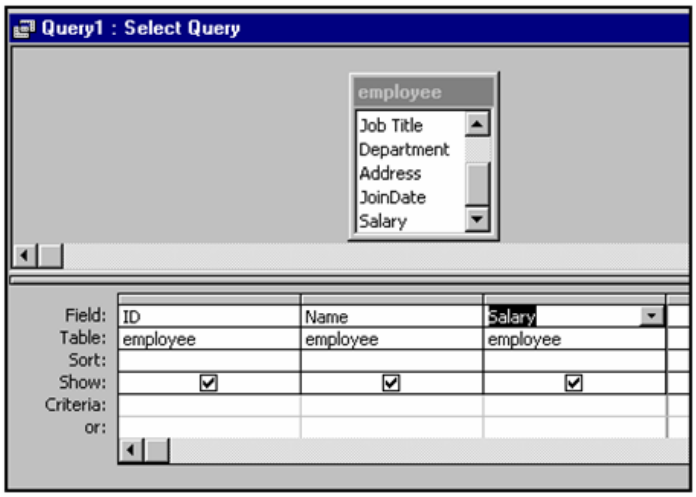

৮. যাদের বেতন 5000 টাকার উপরে শুধুমাত্র তাদের রেকর্ড ফিল্টার করার জন্য Salary ফিল্ডের নিচে Criteria তে >5000 টাইপ করতে হবে।

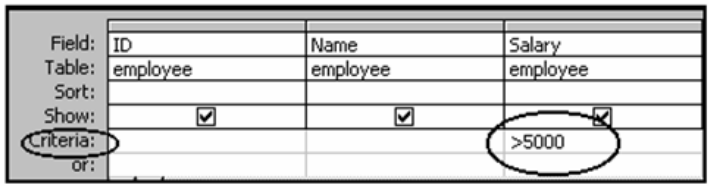

৯. ID ফিল্ডটি Ascending অর্ডারে সজ্জিত হয়ে প্রদর্শিত হওয়ার জন্য প্রথম কলামের Sort : এর পাশের টেক্সট বক্সে ক্লিক করে Ascending নির্বাচন করতে হবে।

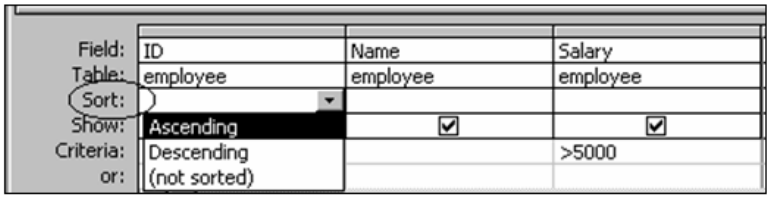

১০. এভাবে Field, Table, Sort, Show, Criteria উল্লেখ করা শেষ হলে কুয়েরিটিকে সেভ করার জন্য File মেনুতে ক্লিক করে Save as এ ক্লিক করতে হবে।

১১. Save as ডায়ালগ বক্সে একটি নাম (Test) টাইপ করে Enter (↵) কী চাপলে কুয়েরি উইন্ডোটি নিম্নরূপ ধারণ করবে।

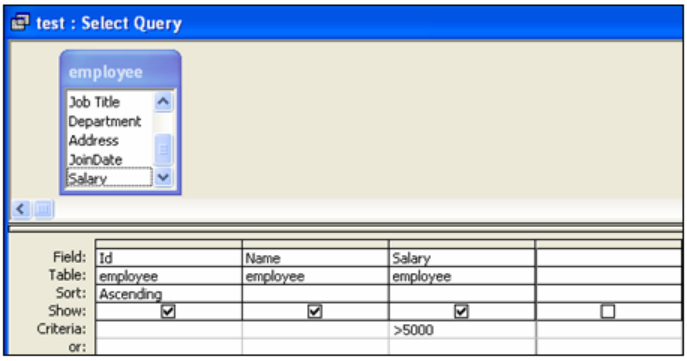

১২. এবার Query Design মেনু থেকে Run বাটনে ক্লিক করলে প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে রেকর্ডসমূহ অর্থাৎ যাদের বেতন 5000 টাকার উপরে শুধুমাত্র তাদের রেকর্ড ফিল্টার হয়ে প্রদর্শিত হবে। একসিসে একাধিক টেবিল থেকেও কুয়েরি করা যায়।

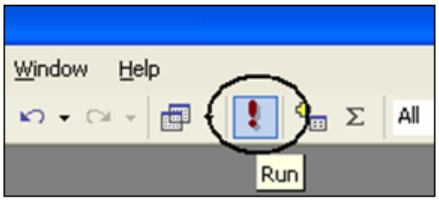

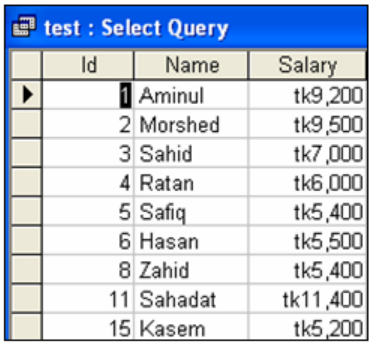

Id	Name	Salary
1	Aminul	tk9,200
2	Morshed	tk9,500
3	Sahid	tk7,000
4	Ratan	tk6,000
5	Safiq	tk5,400
6	Hasan	tk5,500
8	Zahid	tk5,400
11	Sahadat	tk11,400
15	Kasem	tk5,200

রিপোর্ট তৈরি করা (Creating a Report)

রিপোর্ট অর্থ প্রতিবেদন। ডেটাবেজের অধীন টেবিল থেকে প্রয়োজনীয় ফিল্ডের রেকর্ডসমূহ নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করে প্রিন্ট করা যায়।

অটো রিপোর্ট তৈরি করা

নিচে অটো রিপোর্ট তৈরি করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো ঃ

১. যে ডেটাবেজের উপর রিপোর্ট তৈরি করা হবে সে ডেটাবেজটি Open করতে হবে।
২. Tables ট্যাবে ক্লিক্ করে ডেটাবেজ এর অধীন টেবিলটি নির্বাচন করতে হবে।
৩. Reports ট্যাবে ক্লিক করতে হবে।
৪. New বাটনে ক্লিক করতে হবে। New Report ডায়ালগ বক্স সচল হবে।
৫. Auto Report : Columner অথবা Auto Report : Tabular এ দু'টির যে কোন একটিকে নির্বাচন করতে হবে।
৬. Choose The Table or Query where the object's data comes from: ড্রপ-ডাউন বাটনে ক্লিক্ করে লিস্ট থেকে ডেটাবেজ টেবিলটি নির্বাচন করতে হবে।

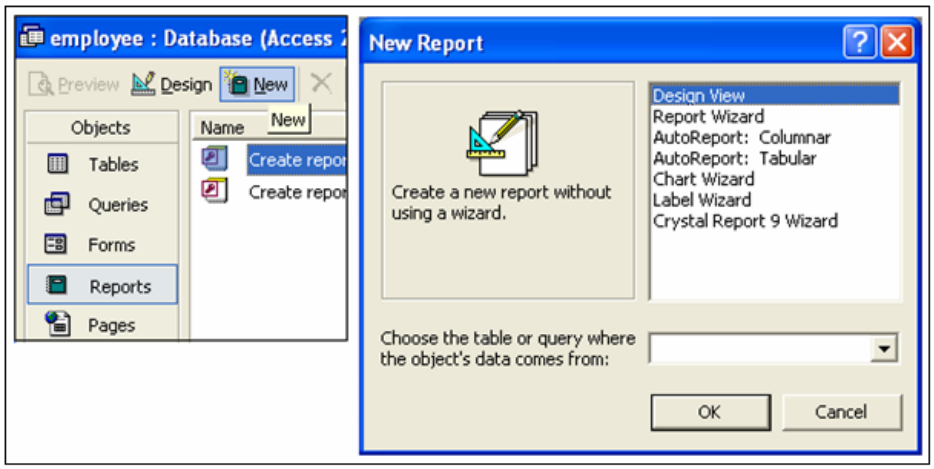

৭. OK বাটনে ক্লিক করতে হবে। নির্বাচিত ডেটাবেজ টেবিলের উপর দ্রুত রিপোর্ট তৈরি হবে।

Wizard ব্যবহার করে দ্রুত রিপোর্ট তৈরি করা

Wizard ব্যবহার করে কোন ডেটাবেজের উপর রিপোর্ট তৈরি করার জন্য নিচের পদক্ষেপ নিতে হবে ঃ

১. ডেটাবেজটি Open করে Tables ট্যাবে ক্লিক করে তারপর টেবিলটিতে ক্লিক করে সিলেক্ট করতে হবে।
২. Reports ট্যাবে ক্লিক করতে হবে।
৩. New বাটনে ক্লিক করতে হবে। New Report ডায়ালগ বক্স আসবে।
৪. Report Wizard নির্বাচন করে OK বাটনে ক্লিক করতে হবে। Report Wizard ডায়ালগ বক্স পর্দায় সচল হবে।

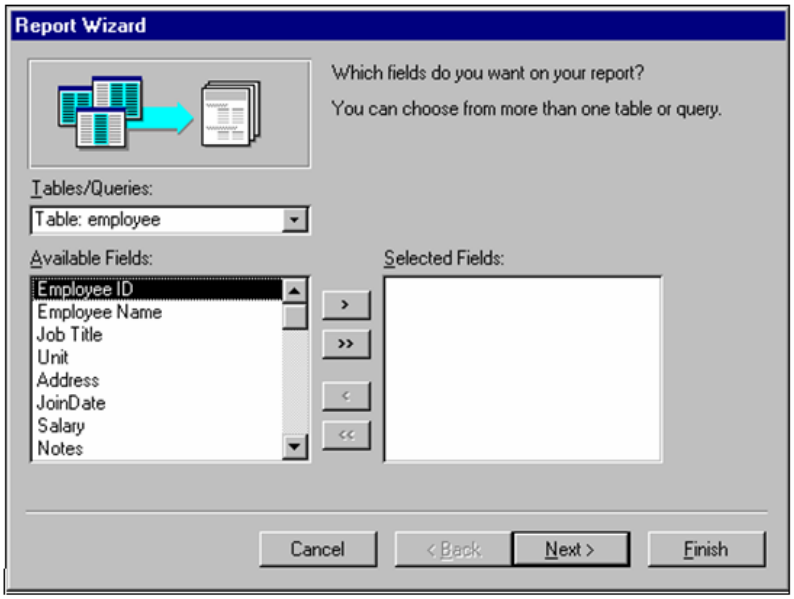

৫. Available Fields : বক্সে নির্বাচিত টেবিলের সকল ফিল্ড প্রদর্শিত হবে। এখান থেকে যে যে ফিল্ড রিপোর্টে সংযোজন করা দরকার সেসব ফিল্ড Selected Fields বক্সে আনতে হবে।

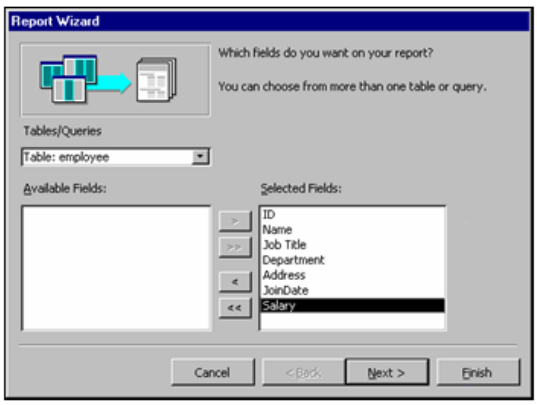

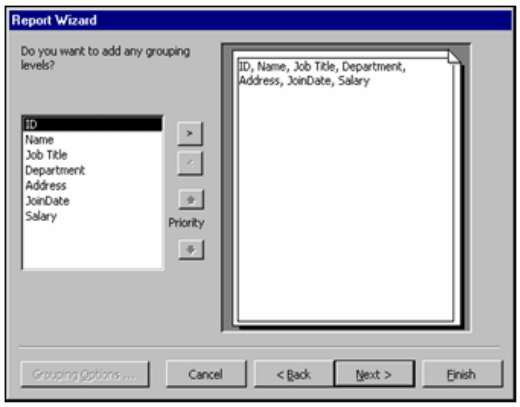

৬. Next> বাটনে ক্লিক করলে গ্রুপিং উইজার্ড উইন্ডো আসবে।

৭. কোন ফিল্ডকে গ্রুপিং করতে চাইলে সেই ফিল্ডকে নির্বাচন করার পর Next> বাটনে ক্লিক করতে হবে। পর্দায় রিপোর্ট উইজার্ড ডায়ালগ বক্স সচল হবে।

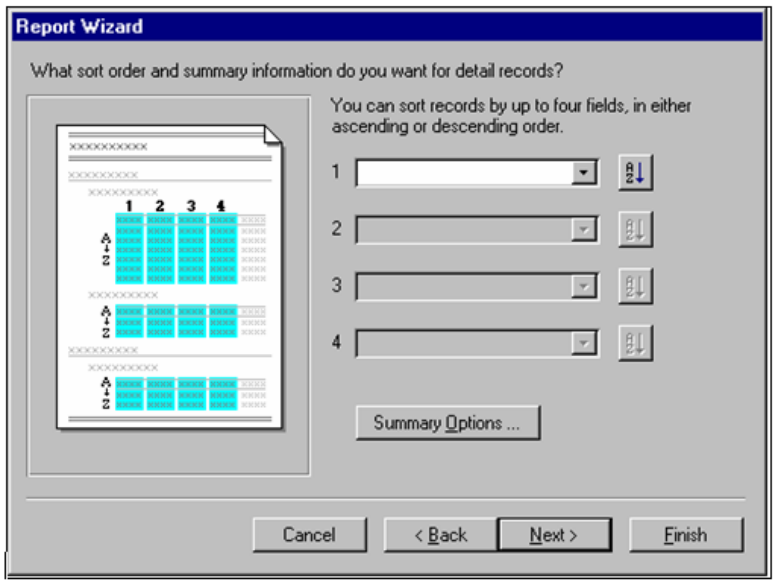

৮. রিপোর্টে ডেটাগুলো যে অর্ডারে প্রদর্শন করা দরকার এখান থেকে সে অর্ডার নির্বাচন করতে হবে। যে ফিল্ডের উপর সর্টিং করা দরকার ড্রপ-ডাউন লিস্টে ক্লিক করে সেই ফিল্ড নির্বাচন করে Next>বাটনে ক্লিক করতে হবে। পর্দায় আসবে -

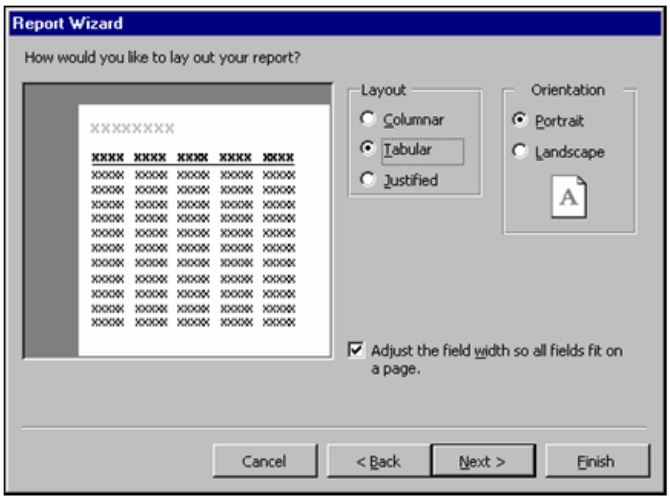

৯. Layout এবং Orientation নির্বাচন করা শেষ হলে Next> বাটনে ক্লিক করলে রিপোর্টের স্টাইল নির্বাচনের জন্য উইন্ডোটি প্রদর্শিত হবে।

১০. পছন্দনীয় Style নির্বাচন শেষ করে Next> বাটনে ক্লিক করতে হবে। পর্দায় রিপোর্ট উইজার্ডের পরবর্তী উইন্ডো প্রদর্শিত হবে।

১১. টেক্সট বক্সে রিপোর্টের জন্য একটি Title টাইপ করে Finish বাটনে ক্লিক করলে রিপোর্ট তৈরির কাজ শেষ হবে।

ফরমেটেড বা কাস্টমাইজড রিপোর্ট তৈরি করা

১. ডেটাবেজটি ওপেন করে Tables ট্যাবে ক্লিক করে টেবিলটিতে (যেমন- employee) ক্লিক করতে হবে।

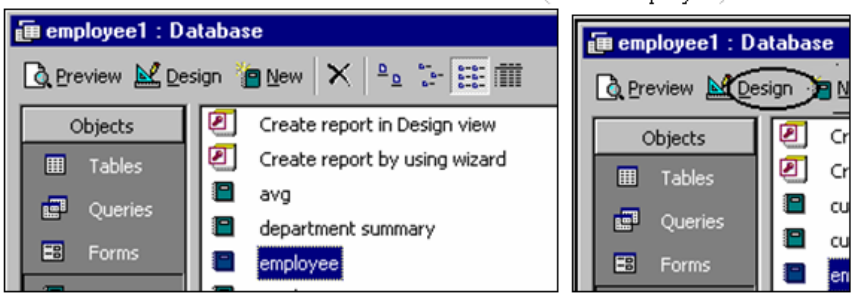

২. Reports ট্যাবে করতে হবে।

৩. New বাটনে ক্লিক করলে New Report ডায়ালগ বক্সটি প্রদর্শিত হবে। Design View সিলেক্ট করে Choose The Table or Query where the object's data comes from: ড্রপ-ডাউন বাটনে ক্লিক্ করে লিস্ট থেকে ডেটা টেবিলটিতে (যেমন- employee) ক্লিক করে এটি নির্বাচন করতে হবে।

৪. OK বাটনে ক্লিক করলে পর্দায় Report Design Window প্রদর্শিত হবে। ডেটা টেবিলের বিভিন্ন ফিল্ডসমূহের নামের তালিকা সংবলিত একটি তালিকা বক্স আসবে। এখান থেকে প্রয়োজনীয় ফিল্ড ড্র্যাগ করে ডিজাইন উইন্ডোতে সন্নিবেশিত করতে হবে।

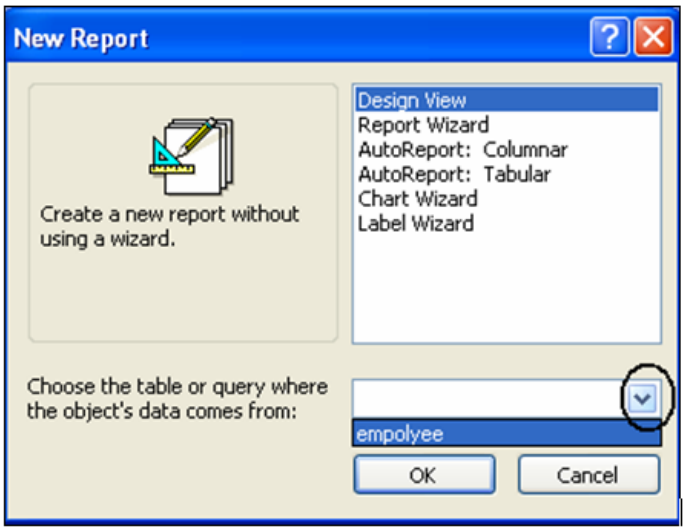

৫. রিপোর্টে টাইটেল সন্নিবেশিত করার জন্য View মেনুতে ক্লিক করে Header/Footer এ ক্লিক করলে রিপোর্টে Report Header এবং Report Footer ব্যান্ড আসবে। Page Header এবং Detail বারটিকে ড্র্যাগ করে প্রয়োজনমতো নিচের দিকে নামিয়ে আনতে হবে।

৬. টুল বক্স থেকে Label টুলে ক্লিক করে Report Header অংশে ক্লিক করে হেডার হিসেবে যা দরকার তা টাইপ করতে হবে।

৭. Insert মেনুতে ক্লিক করে Date and Time বা Page Numbers এ ক্লিক করে রিপোর্টে তারিখ এবং সময় ও পৃষ্ঠা নাম্বার সন্নিবেশিত করা যাবে। সবশেষে রিপোর্টটি সেভ করতে হবে।

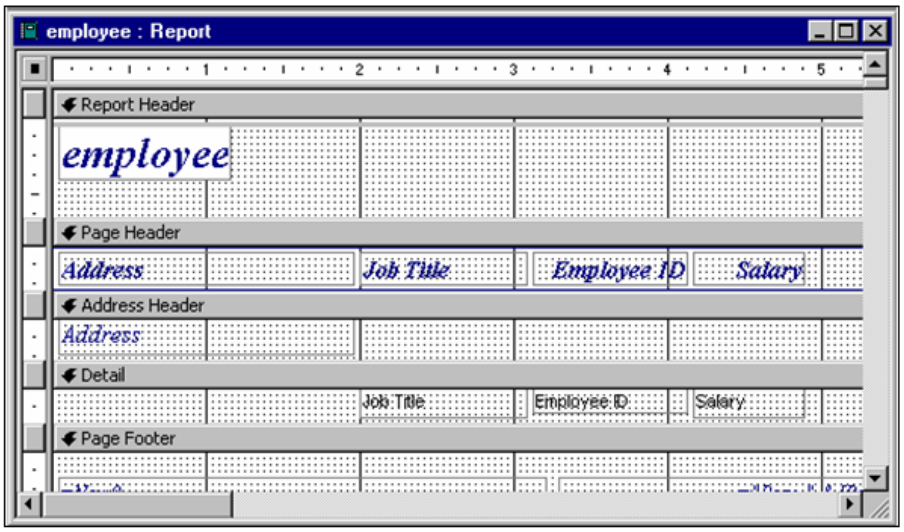

ফর্ম তৈরি করা (Creating Form)

ডেটাবেজের অধীনে বিভিন্ন টেবিল তৈরি করে তাতে ডেটা এন্ট্রি করা হয়। উইজার্ড ব্যবহার করে অথবা অটো ফর্ম তৈরির নির্দেশ দিলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এন্ট্রি ফর্ম তৈরি হয়। আবার নিজের ইচ্ছেমতো কাস্টম ফর্মও তৈরি করা যায়।

অটো ফর্ম (Auto Form)

ডেটাবেজের উপর ফর্ম তৈরির সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো অটোফর্ম। খুব সহজে অটোফর্ম তৈরি করা যায়। নিচে অটোফর্ম তৈরির পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

১. যে ডেটাবেজটির ফর্ম তৈরি করা দরকার সে ডেটাবেজটি Open করে Tables ট্যাবে ক্লিক করে ডেটাবেজটির টেবিলটি নির্বাচন করতে হবে।

২. Forms ট্যাবে ক্লিক করে New বাটনে ক্লিক করলে পর্দায় New Form ডায়ালগ বক্স আসবে।

৩. ডায়ালগ বক্সের তালিকা থেকে AutoForm : Column এ ক্লিক করে নির্বাচন করতে হবে।

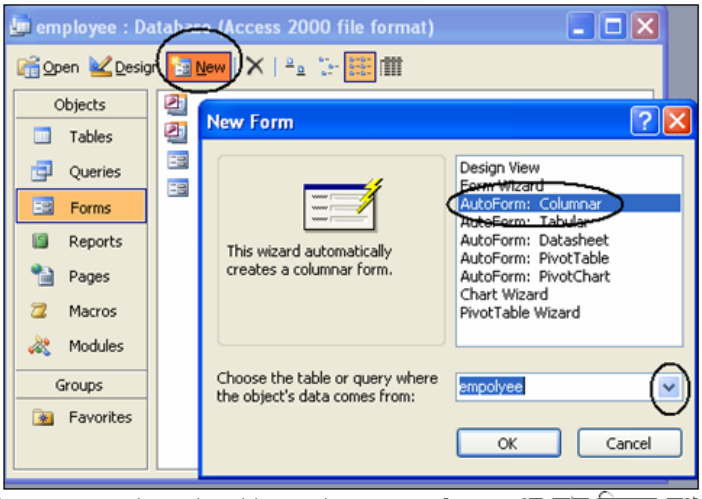

৪. Choose the table or query where the object's data comes from : এর ডান দিকের ড্রপ ডাউন বাটনে ক্লিক করে ডেটা টেবিলটি সিলেক্ট করে OK বাটনে ক্লিক করলে ডেটা টেবিলটির উপর অটোফর্ম তৈরি হবে।

৫. ক্লোজ বাটনে ক্লিক করে ফর্মটি কোন নামে সেভ করতে হবে।

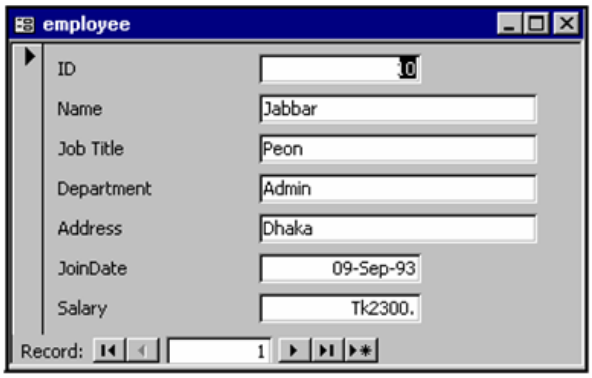

Wizard ব্যবহার করে Form তৈরি করা

উইজার্ড ব্যবহার করে ফর্ম তৈরি করার জন্য নিচের পদক্ষেপ নিতে হবে।

১. ডেটাবেজটি ওপেন করে Forms ট্যাবে ক্লিক করে New বাটনে ক্লিক করলে New Form ডায়ালগ বক্সটি প্রদর্শিত হবে।

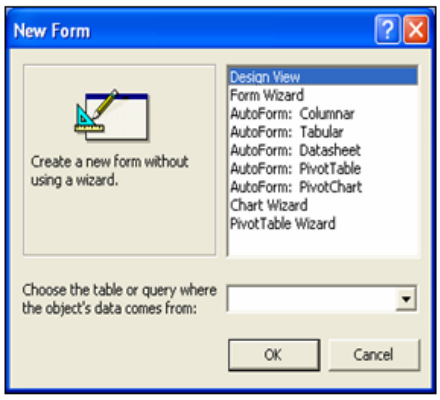

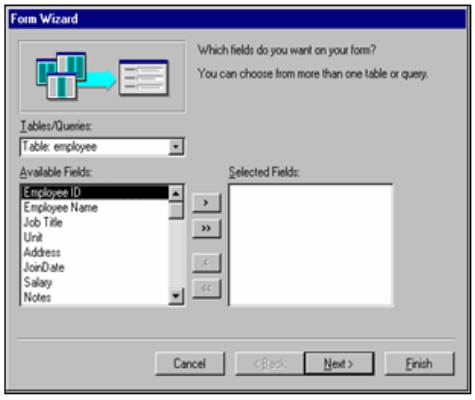

২. Form Wizard এ ক্লিক করে ডায়ালগ বক্সের নিচে ডান দিকের Choose the tables or query where the object's data comes from: এর পাশের ▼ বাটনে ক্লিক করে ডেটা টেবিলটি সিলেক্ট করতে হবে। পর্দায় Form Wizard ডায়ালগ বক্স আসবে। (উপরের ২য় চিত্র)

৩. Tables/Queries : এর ▼ বাটনে ক্লিক করে ডেটা টেবিলটি সিলেক্ট করতে হবে। Available Fields বক্সে ডেটা টেবিলটির সকল ফিল্ড প্রদর্শিত হবে। এখান থেকে যে যে ফিল্ড ফর্মে রাখা দরকার Selected বক্সে সেগুলো নিয়ে আসতে হবে।

৪. প্রয়োজনীয় ফিল্ড Selected Fields বক্সে নিয়ে আসার পর Next> বাটনে ক্লিক করলে ডায়ালগ বক্স আসবে।

৫. ডায়ালগ বক্স থেকে যে ধরনের লেআউট দরকার তা নির্বাচন করতে হবে। Columner রেডিও বাটনে ক্লিক করে Next> বাটনে ক্লিক করলে পর্দায় ফর্ম উইজার্ডের পরবর্তী উইন্ডো আসবে। এখানে থেকে যে কোন স্টাইল নির্বাচন করতে হবে।

৬. স্টাইল নির্বাচন শেষ করে Next> বাটনে ক্লিক করলে পর্দায় ফর্ম উইজার্ডের পরবর্তী উইন্ডো আসবে।

৭. What Title do you want for your form বক্সে ফর্মের টাইটেল লিখতে হবে।

৮. Open the form to view or enter information নির্বাচন করে ফর্ম তৈরির কাজ শেষ করার জন্য Finish বাটনে ক্লিক করতে হবে।

দুটি ডেটাবেজের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করা

একটি ডেটাবেজে একাধিক টেবিল থাকতে পারে। কোন একটি নির্দিষ্ট ফিল্ডের উপর ভিত্তি করে দুই বা ততোধিক টেবিলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করাকে রিলেশনশীপ বলা হয়।

রিলেশন তৈরি করার শর্ত

১. রিলেশন করা ডেটা টেবিলগুলোর মধ্যে কমপক্ষে একটি কমন ফিল্ড থাকতে হবে।
২. কমন ফিল্ডকে প্রাইমারি কী ফিল্ড হিসেবে নির্দিষ্ট করা থাকতে হবে।
৩. একাধিক ডেটা টেবিলের কমন ফিল্ডের নাম, ডেটা টাইপ, ফিল্ড সাইজ ইত্যাদি একই হতে হবে।
৪. প্রাইমারি কী ফিল্ড হিসেবে নির্দিষ্ট ফিল্ডের তথ্য ইউনিক হতে হবে।

রিলেশনের প্রকারভেদ

বিভিন্ন ডেটা টেবিলের মধ্যে কীভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা হবে তার উপর ভিত্তি করে রিলেশনকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

১. One to One রিলেশন
২. One to many রিলেশন
৩. Many to One রিলেশন
৪. Many to Many রিলেশন

একাধিক ডেটা টেবিলের মধ্যে রিলেশন তৈরি করা

ধরা যাক, Employee 1 এবং Employee 2 দুইটি টেবিল। Employee 1 টেবিলে আছে Employee Number এবং Employee Salary নামে দু'টি ফিল্ড। অপরদিকে Employee 2 টেবিলে আছে Employee Number, Employee Name, Job Title এবং Address নামে চারটি ফিল্ড। Employee Number ফিল্ডটি উভয় টেবিলেই কমন রাখা হয়েছে। কারণ এ ফিল্ডের উপর ভিত্তি করেই টেবিল দু'টির মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করা হবে।

employee1 : Table

Employee num	Employee sala
1	5000
2	5500
3	3500
4	4000
5	7000
6	4575

চিত্র ঃ Empolyee 2 ডেটা টেবিল

Employee num	Employee nam	Job title	Address
1	Ahmed	Officer	Dhaka
2	Sattar	Driver	Khulna
3	Tareq	Officer	Jessore
4	Mahmood	Manager	Barisal
5	Jabbar	Operator	Sylhet
6	Kamrul	Pieon	Comilla

চিত্র ঃ Empolyee 1 ডেটা টেবিল

রিলেশন তৈরি

১. Tools মেনু থেকে Relationships নির্বাচন করতে হবে অথবা টুলবারের Relationships বাটনে ক্লিক করতে হবে।

২. পর্দায় Show Table ডায়ালগ বক্সটি প্রদর্শিত হবে ।

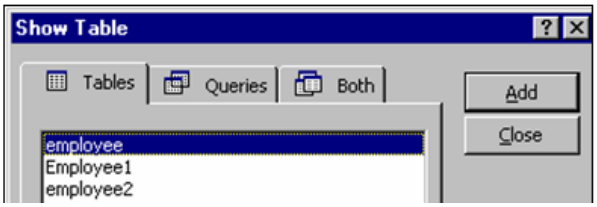

৩. Show Table ডায়ালগ বক্সে টেবিলের তালিকা থেকে টেবিলটি (employee 1) সিলেক্ট করে Add বাটনে ক্লিক করতে হবে। তারপর Employee 2 টেবিলটি সিলেক্ট করে Add বাটনে ক্লিক করতে হবে। উভয় টেবিল Relationships উইন্ডোতে সংযুক্ত হবে।

৪. Close বাটন ক্লিক করলে পর্দায় Relationships উইন্ডো দেখা যাবে।

৫. Employee 1 টেবিলের Employee Number ফিল্ডটিকে Drag করে Employee 2 টেবিলের Employee Number এর উপর এনে ছেড়ে দিতে হবে। পর্দায় Relationships উইন্ডোর পরবর্তী অবস্থা প্রদর্শিত হবে।

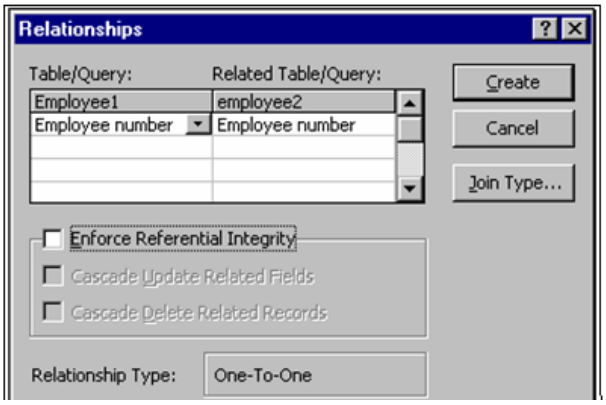

৬. এবার Create বাটনে ক্লিক্ করলেই টেবিল দু'টির মধ্যে রিলেশন তৈরি হবে।

৭. ক্লোজ বাটনে ক্লিক করে Yes বাটনে ক্লিক করে ডেটাবেজ উইন্ডোতে চলে আসতে হবে।

৮. File মেনু থেকে Save বাটনে ক্লিক করে রিলেশনটি একটি নাম দিয়ে সেভ করতে হবে।

ডেটা এনক্রিপ্ট করার প্রয়োজনীয়তা

ডেটাবেজ থেকে বিভিন্নভাবে ডেটা একসিস করে ডেটা ট্রান্সমিশন করা হয়। অনেক সময় অবৈধভাবে প্রবেশ করে হ্যাকাররা ডেটা পরিবর্তন করে বিরাট ক্ষতি করতে পারে। ডেটা পাঠানোর সময় মাঝপথে যাতে কেউ কোন পরিবর্তন করতে না পারে সেজন্য ডেটা এনক্রিপ্ট করা হয়। ডেটা এনক্রিপশনের মাধ্যমে ডেটার গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়। এটি হলো কোন তথ্যে অবাঞ্ছিত প্রবেশ থেকে রক্ষা পাবার জন্য এনকোডিং-এর প্রক্রিয়া। তথ্য সঞ্চালনের ক্ষেত্রে এনক্রিপশন বিশেষভাবে

প্রয়োগ করা হয়। ক্লায়েন্ট এবং অন্যান্য গোপনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক তথ্যাদি প্রেরণে ব্যাংকগুলোতে ডেটা এনক্রিপশন ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ ই-মেইল প্রোগ্রামগুলো ডেটা প্রেরণ ও গ্রহণের ক্ষেত্রে ডেটা এনক্রিপশন প্রদান করে যাতে করে তৃতীয় কোনো পক্ষের দ্বারা ইমেইলগুলো পড়া সম্ভব না হয়। গোপন যোগাযোগের জন্য সামরিক বাহিনীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোতে ডেটা এনক্রিপশন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। বিদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন দেশের দূতাবাসগুলোতে নিরাপদ মেসেজ প্রেরণে বিভিন্ন দেশের সরকার ডেটা এনক্রিপশন পদ্ধতি ব্যবহার করে।

ডেটা এনক্রিপশনের উপায়

ডেটা এনক্রিপ্ট করার জন্য অনেকগুলো পদ্ধতিই প্রচলিত আছে। যথা–

- সিজার কোড (Caesar Code)
- ডেটা এনক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ড (Data Encryption Standard - DES)
- ট্রিপল ডিইএস (Triple DES)
- অ্যাডভান্সড এনক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ড (Advanced Encryption Standard - AES)
- ইন্টারন্যাশনাল ডেটা এনক্রিপশন এ্যালগরিদম (International Data Encryption Algorithm - IDEA)

নিচে ডেটা এনক্রিপশনের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করা হলো।

সিজার কোড (Caesar Code)

সিজার কোড হলো এনক্রিপশন পদ্ধতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সহজ এবং বহুল পরিচিত একটি পদ্ধতি। এটি সিজার সাইফার, সিজার'স সাইফার, শিফট সাইফার, সিজার শিফট ইত্যাদি নামেও পরিচিত। এটি একটি বিকল্পরূপে ব্যবহৃত বা প্রতিকল্পন সাইফার যেটি গোপন মেসেজের প্লেইনটেক্সটের প্রতিটি বর্ণকে একটি বর্ণমালার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে যা বর্ণমালায় পজিশনগুলোর একটি নির্ধারিত সংখ্যা। জুলিয়াস সিজার তার ব্যক্তিগত যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। তার নামানুসারে এই পদ্ধতিটিকে সিজার কোড বলা হয়।

উদাহরণ ঃ

Plain: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Cipher: XYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW

Plaintext: This is a secret message

Ciphertext: wklv lv d vhfuhw phvvdjh

ডেটা এনক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ড (Data Encryption Standard - DES)

ডেটা এনক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ড (ডিইএস) হলো ডেটা এনক্রিপশনের বহুল ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি যা একটি প্রাইভেট (গোপন) কী ব্যবহার করে। এই এনক্রিপশন পদ্ধতিতে কী সাইজগুলো ৫৬ বিট ও ব্লক সাইজগুলো ৬৪ বিট এর হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়াটি বেশ কিছু মোডে চলতে পারে এবং ১৬টি রাউন্ড বা অপারেশনকে অন্তর্ভুক্ত করে। ১৯৭০ সালে আইবিএম কোম্পানি এর নকশা তৈরি করে। ১৯৭৭ সালে এটি প্রকাশিত হয় তবে ১৯৭৯ সালের জানুয়ারিতে এটিকে প্রমীতকরণ করা হয়। ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্স এই এনক্রিপশনের বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখে। এটিকে অত্যন্ত শক্ত এনক্রিপশন পদ্ধতি বলে মনে করা হলেও ১৯৯৯ সালে ডিস্ট্রিবিউটেড ডট নেট এবং ইলেকট্রনিক ফ্রন্টিয়ার ফাউন্ডেশন যৌথভাবে একটি DES কি কে ভেঙে ফেলে। এরপর থেকেই এই কী-টির উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

ট্রিপল ডিইএস (Triple DES)

ট্রিপল ডিইএস হলো বাড়তি কিছু নিরাপত্তা প্রদান করতে DES কে ব্যবহারের একটি পদ্ধতি। এটি প্রতিটি ডেটাকে ব্লক করতে তিনবার DES সাইফার অ্যালগরিদমকে প্রয়োগ করে। এটি দুটি বা তিনটি কী-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে। অ্যালগরিদমটি একটি এনক্রিপ্ট-ডিক্রিপ্ট-এনক্রিপ্ট সিকুয়েন্সকে সম্পাদন করে বলে অনেক সময় এটিকে EDE মোডও বলা হয়ে থাকে। এনক্রিপশন ও ডিক্রিপশনের জন্য যদি ভিন্ন ভিন্ন কী ব্যবহৃত হয় তাহলে অ্যালগরিদমটিকে একটি

অ্যাসিমেট্রিক অ্যালগরিদম বলা হয়। ট্রিপল ডিইএস একটি 'কী বান্ডেল' ব্যবহার করে যেটি তিনটি DES কী নিয়ে গঠিত (K_1, K_2 এবং K_3) যাদের প্রতিটি ৫৬ বিটের (প্যারিটি বিট ব্যতীত)। প্রতিটি ট্রিপল এনক্রিপশন ৬৪ বিট ডেটার একটি ব্লককে এনক্রিপ্ট করে।

এনক্রিপশন অ্যালগরিদমটি হলো— $ciphertext = E_{K3}(D_{K2}(E_{K1}(plaintext)))$

ডিক্রিপশন অ্যালগরিদমটি হলো— $plaintext = D_{K1}(E_{K2}(D_{K3}(ciphertext)))$

অ্যাডভান্সড এনক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ড (Advanced Encryption Standard - AES)

অ্যাডভান্সড এনক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ড হলো ইউএস ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেকনোলজি কর্তৃক ইলেকট্রনিক ডেটা প্রতিষ্ঠায় এনক্রিপশনের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন। দুই বেলজিয়ান ক্রিপ্টোগ্রাফার Joan Daemen এবং Vincent Rijmen কর্তৃক উদ্ভাবিত Rijndael সাইফার এর উপর ভিত্তি করে এই এনক্রিপশন তৈরি করা হয়েছে। এটি এখন বিশ্বজুড়ে ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে ১২৮, ১৯২ কিংবা ২৫৬ বিটের কী-সাইজ ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এর ব্লক সাইজ হলো ১২৮ বিট। কী সাইজের উপর নির্ভর করে এটিতে ১০, ১২ কিংবা ১৪টি রাউন্ড সম্পন্ন হয়।

ইন্টারন্যাশনাল ডেটা এনক্রিপশন অ্যালগরিদম (International Data Encryption Algorithm - IDEA)

ইন্টারন্যাশনাল ডেটা এনক্রিপশন অ্যালগরিদম হলো সুইজারল্যান্ডের জুরিখের ETH তে উদ্ভাবিত একটি এনক্রিপশন অ্যালগরিদম। এটি ১২৮ বিট কি-সম্পন্ন একটি ব্লক সাইফার ব্যবহার করে যার ব্লক সাইজ ৬৪ বিটের এবং এটিকে প্রচলিত বিভিন্ন এনক্রিপশন পদ্ধতির ভেতর তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি নিরাপদ একটি এনক্রিপশন পদ্ধতি বলে মনে করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র এবং অধিকাংশ ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে এটির প্যাটেন্ট করা রয়েছে। অবাণিজ্যিক কাজে বিনামূল্যেই IDEA কে ব্যবহার করা যায়। তবে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করার জন্য লাইসেন্স কিনতে হয়।

ফাইল এনক্রিপ্ট করার উদাহরণ

সাধারণভাবে কেউ তার কোন ডকুমেন্ট তৈরি করে নিজের দায়িত্বে সেভ করে রাখে। ফাইলটিতে যদি সেনসেটিভ ডেটা থাকে তাহলে ফাইলটিতে পাসওয়ার্ড দিয়ে এনক্রিপ্ট করে প্রটেক্ট করা উচিত। যদি ফাইলটি—

- শেয়ারড লোকেশন অথবা ফোল্ডারে সেভ করা হয়।
- ফাইলটি যদি ইমেইল করে পাঠানো হয়।
- ফাইলটি যদি ওয়ার্কস্টেশনে স্টোর করা হয় যেখান থেকে অন্যান্য মানুষের সাথে শেয়ার করা হয়।

মাইক্রোসফট অফিস ২০০৭ পাসওয়ার্ড এনক্রিপশনের জন্য 128 bit AES ব্যবহার করে। ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার শ্রেণীবদ্ধ তথ্যের জন্য এনক্রিপশন অ্যালগরিদম ব্যবহার করতে পারবে বলে ঘোষণা করে। থার্ড পার্টি এনক্রিপ্ট সফটওয়্যার (যেমন: Cryptainer, DiskCryptor, cryptoMill, CrossCrypt ইত্যাদি)

মাইক্রোসফট অফিস ২০০৭/২০১০ ভুক্ত মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল এবং পাওয়ার পয়েন্ট ফাইলকে সুরক্ষিত রাখার জন্য ডেটা প্রটেকশন ফিচার রয়েছে। এসব প্রটেকশন ফিচারে ডকুমেন্টকে পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রটেক্ট করা, ডকুমেন্টের ফর্মেটিং এবং এডিটিং প্রটেক্ট করা এবং ডিজিটাল সিগনেচার দিয়ে ডকুমেন্ট স্থানান্তরের সময় পরিবর্তন করা প্রটেক্ট করা যায়। অফিস ২০০৭/২০১০ এর চেয়ে ২০০৩/এক্সপি এর এনক্রিপশন ব্যবস্থা দুর্বল ছিল। অফিস ২০০৭ এ 128-bit কীসহ AES (Advanced Encryption Standard) এবং হেসিং ব্যবহার করা হয়েছে। রেজিস্ট্রি এডিটিং করে অথবা গ্রুপ পলিসি ব্যবহার করে কী লেংথকে 256 bits এ বৃদ্ধি করে পাসওয়ার্ড প্রটেক্টেড ফাইল এর সিকিউরিটিকে আরো শক্তিশালী করা যায়। লম্বা অথবা জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি পাসওয়ার্ড-প্রটেক্টেড ফাইলের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে উন্নীত করে।

অফিস ২০০৭ এ ফাইল এনক্রিপ্ট করা (Encrypt a file in Office 2007)

অফিস প্রোগ্রাম উইন্ডোর উর্দ্ধ বাম কোনার Microsoft Office বাটনে ক্লিক করতে হবে। Prepare অপশনটি সিলেক্ট করে Encrypt Document এ ক্লিক করতে হবে। নিচের উইন্ডোটি প্রদর্শিত হবে :

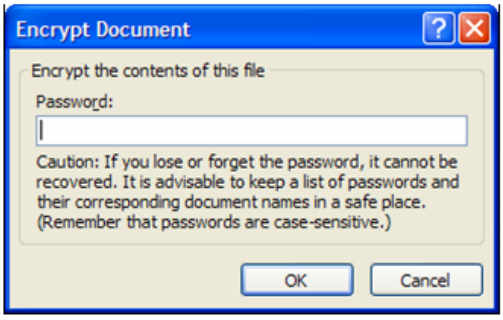

টেক্সট বক্সের ভেতর পাসওয়ার্ড টাইপ করে OK বাটনে ক্লিক করতে হবে। (পাসওয়ার্ড আপার-কেস, লোয়ার-কেস, সংখ্যা এবং চিহ্ন মিলিয়ে আট অক্ষরে হলে ভাল হয়। যেমন- M_rahman&96) Confirm password উইন্ডোটি প্রদর্শিত হবে। টেক্সট বক্সের ভেতর একই পাসওয়ার্ড টাইপ করে OK বাটনে ক্লিক করতে হবে। এখন ফাইলটি সেভ করতে হবে। Microsoft Office বাটনে ক্লিক করে তারপর Save As এ ক্লিক করে যদি Office 97-2003 Document format ক্লিক করা হয় অর্থাৎ (.doc, .xls, or .ppt) ফরমেটে সেভ করা হয় তাহলে আরো শক্তিশালী এনক্রিপশন করার জন্য XML formats এ সেভ করার পরামর্শমূলক মেসেজ উইন্ডোতে প্রদর্শিত হবে।

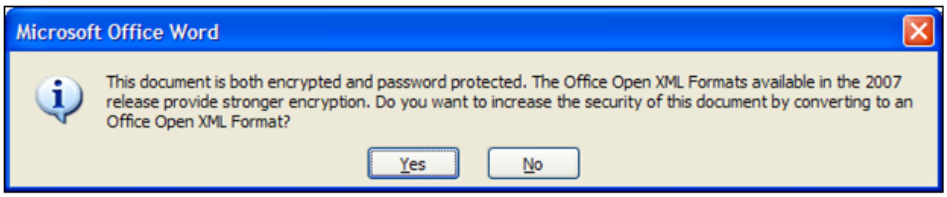

Yes বাটনে ক্লিক করলে Save As ডায়ালগ বক্স আসবে।

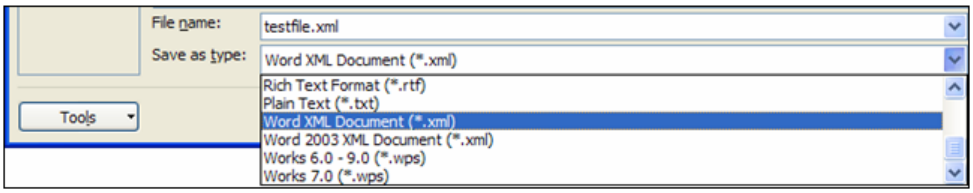

File name : বক্সে ফাইলের নাম টাইপ করে Save as type এর ডান পাশের ড্রপ-ডাউন বাটনে ক্লিক করে ফাইলের টাইপ হিসেবে Word XML Document (*.xml) নির্বাচন করে Save বাটনে ক্লিক করলে ফাইলটি সেভ হবে। পরবর্তীতে এ ফাইলটি ওপেন করতে চাইলে পাসওয়ার্ড চাইবে। টেক্সট বক্সের ভেতর পাসওয়ার্ড টাইপ করে OK বাটনে ক্লিক করলে ফাইলটি ওপেন হবে।

ডকুমেন্টের ফর্মেটিং এবং এডিটিং প্রটেক্ট করা

পাসওয়ার্ড দিয়ে ফাইল প্রটেক্ট (এনক্রিপ্ট) করা যায়। কিন্তু যদি এমন হয় যে ফাইলটি সবাই দেখতে পারবে কিন্তু এডিট করতে পারবে না অর্থাৎ এটিকে শুধুমাত্র রিডওনলি করে রাখা যায়। এরূপ করতে হলে ফাইলটি সেভ করার সময় Save as ডায়ালগ বক্সের Tools বাটনে ক্লিক করে এ ক্লিক করলে General Options ডায়ালগ বক্সটি প্রদর্শিত হবে। Password to modify টেক্সট বক্সের ভেতর পাসওয়ার্ড টাইপ করে OK বাটনে ক্লিক করে ফাইলটি সেভ করতে হবে। পরবর্তীতে ফাইলটি ওপেন করার সময় পাসওয়ার্ড দিয়ে অপশনে ক্লিক করে ফাইলটি ওপেন করলে ফাইলটি শুধুমাত্র দেখা যাবে কিন্তু কোন মডিফাই বা এডিটিং করা যাবে না।

সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা উত্তর

অধ্যায়-১

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার ড. রহমান তার অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরিতে আঙ্গুলের চাপ দিয়ে প্রবেশ করেন। একই ল্যাবরেটরির অন্য কক্ষে প্রবেশ করার সময় সেন্সরের দিকে তাকানোর ফলে দরজা খুলে গেল। একদিন তিনি বন্ধু চিকিৎসকের নিকট গালের আঁচিল অপারেশনের জন্য গেলেন। বন্ধু তাকে স্বল্প সময়ে –20°C তাপমাত্রায় রক্তপাতহীন অপারেশন করলেন।

ক. বায়োমেট্রিক্স কী? ১

খ. ডায়াবেটিস রোগীদের চিকিৎসায় তথ্য প্রযুক্তির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ড. রহমানের চিকিৎসায় চিকিৎসক কোন পদ্ধতি ব্যবহার করলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ড. রহমান ল্যাবরেটরিতে প্রবেশের প্রক্রিয়াদ্বয়ের মধ্যে কোনটি বহুল ব্যবহৃত? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বায়োমেট্রিক্স কী?

বায়োমেট্রিক্স হলো এমন একটি প্রযুক্তি, যেখানে কোন ব্যক্তির দেহের গঠন এবং আচরণগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তাকে অদ্বিতীয়ভাবে শনাক্ত করা হয়।

খ. ডায়াবেটিস রোগীদের চিকিৎসায় তথ্য প্রযুক্তির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রয়োগের ফলে আবিষ্কৃত ইনসুলিন ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়।

মেডিক্যাল সায়েন্স, ফার্মাসিটিক্যালস, কসমেটিক্স এবং মানবদেহের ডায়াবেটিস রোগের ইনসুলিনের ঘাটতি মেটাতে তথ্য প্রযুক্তি বিশেষ ভূমিকা রাখে। মানবদেহের ইনসুলিন তৈরির জিনকে ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবিষ্ট করে বাণিজ্যিকভাবে ইনসুলিন উৎপাদন হলো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বড় সুফল। এভাবে তথ্য প্রযুক্তি ডায়াবেটিস রোগীদের চিকিৎসায় অবদান রাখে।

গ. ড. রহমানের চিকিৎসায় চিকিৎসক কোন পদ্ধতি ব্যবহার করলেন? ব্যাখ্যা কর।

ড. রহমানের চিকিৎসায় চিকিৎসক ক্রায়োসার্জারি পদ্ধতি ব্যবহার করলেন।

ক্রায়োসার্জারি হচ্ছে এক প্রকার চিকিৎসা পদ্ধতি, যার মাধ্যমে অত্যধিক শীতল তাপমাত্রা প্রয়োগ করে ত্বকের অস্বাভাবিক এবং রোগাক্রান্ত টিস্যু ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে যে, চিকিৎসক -20°C তাপমাত্রায় শীতলতার মাধ্যমে ড. রহমানের গালের আঁচিল সফলভাবে অস্ত্রোপচার করতে সফল হন। যে তাপমাত্রায় বরফ জমাট বাঁধে, দেহকোষে তার চাইতেও নিম্ন তাপমাত্রার ধ্বংসাত্মক শক্তির সুবিধাকে গ্রহণ করে ক্রায়োসার্জারি বা ক্রায়োথেরাপি কাজ করে। এতে নিম্ন তাপমাত্রায় দেহকোষের অভ্যন্তরস্থ বরফ ক্রিস্টালগুলোর বিশেষ আকার বা বিন্যাসকে ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে দেয়া যায়। অতএব ড. রহমানের চিকিৎসায় চিকিৎসক ক্রায়োসার্জারি পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন।

ঘ. ড. রহমানের ল্যাবরেটরিতে প্রবেশের প্রক্রিয়াদ্বয়ের মধ্যে কোনটি বহুল ব্যবহৃত? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও।

ড. রহমান বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি ব্যবহার করে ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ করেন।

বায়োমেট্রিক্স সেই প্রযুক্তি, যা মানুষের দেহের বৈশিষ্ট্য (যেমন: ডিএনএ, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, চোখের রেটিনা এবং আইরিস, কণ্ঠস্বর, চেহারা এবং হাতের মাপ ইত্যাদি) মেপে এবং বিশ্লেষণ করে বৈধতা নির্ণয় বা ব্যক্তিকে শনাক্ত করে। আঙ্গুলের ছাঁপ ও আইরিশ কিংবা রেটিনা হলো বায়োমেট্রিক্সের উপাদান, যা দ্বারা ব্যক্তিকে শনাক্তকরণ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ড. রহমান আঙ্গুলের ছাঁপ দিয়ে সহজে ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। ল্যাবরেটরির অন্য কক্ষে প্রবেশের সময় তিনি সেন্সরের দিকে তাকানোর সাথে সাথে দরজা খুলে যায়। প্রথম কক্ষের দরজায় ফিঙ্গার প্রিন্টের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় কক্ষের দরজায় আইরিশ বা রেটিনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে কক্ষে প্রবেশ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

উভয় ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক্স প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। ডেটা গ্রহণকারী ডিভাইসদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটির দাম সস্তা, সহজলভ্য ও ব্যবহার সহজ বলে আঙ্গুলের ছাপ গ্রহণকারী প্রক্রিয়াটি বহুল ব্যবহৃত হয়।

অধ্যায়-২

২. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ক খ গ

ক. মাইক্রোওয়েভ কী? ১

খ. ডেটা ট্রান্সমিশনে দুর্বল সিগন্যালকে শক্তিশালী করার উপায়-ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের নেটওয়ার্কের টপোলজিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "খ" চিত্রের টপোলজির A চিহ্নিত নোড নষ্ট হয়ে গেলে নেটওয়ার্ক কীভাবে সচল রাখবে? তোমার মতামত দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মাইক্রোওয়েভ কী?

অতি উচ্চ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট সংকেত বাতাসের মধ্য দিয়ে এক স্থান হতে অন্য স্থানে পাঠানোর নাম মাইক্রোওয়েভ।

খ. ডেটা ট্রান্সমিশনে দুর্বল সিগন্যালকে শক্তিশালী করার উপায়-ব্যাখ্যা কর।

রিপিটার ব্যবহার করে ডেটা ট্রান্সমিশনে দুর্বল সিগন্যালকে শক্তিশালী করা যায়।

নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত কম্পিউটারের ভিতরে দূরত্ব বেড়ে গেলে প্রবাহিত সিগন্যালটি দুর্বল হয়ে পড়ে। দুর্বল সিগন্যালটিকে সবল করার জন্য ব্যবহৃত ডিভাইসকে রিপিটার বলে। এটি নেটওয়ার্কে ট্রাফিক বৃদ্ধি না করে ডেটা শক্তিশালী করে সামনের দিকে প্রেরণ করে। ডেটা তারের ভিতর দিয়ে বা ওয়ারলেস সিস্টেমে অধিক দূরত্ব অতিক্রম করার সময় দুর্বল হয়ে পড়ে। এ দুর্বল সংকেতকে ও নেটওয়ার্ক সংযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কম্পিউটারের মধ্যে দূরত্ব বাড়ানোর জন্য রিপিটার ব্যবহার করা হয়।

গ. উদ্দীপকের নেটওয়ার্কের টপোলজিটি ব্যাখ্যা কর।

উদ্দীপকের নেটওয়ার্কটি হলো হাইব্রিড টপোলজি।

বাস, স্টার, রিং ইত্যাদি টপোলজির সমন্বয়ে গঠিত নেটওয়ার্ক টপোলজিকে বলা হয় হাইব্রিড টপোলজি।

উদ্দীপকের নেটওয়ার্কটি বাস, রিং এবং স্টার টপোলজির সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছে। তাই উদ্দীপকের টপোলজিটি হলো হাইব্রিড। এ টপোলজিতে প্রয়োজনানুযায়ী নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে। কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব হয়। কোন এক অংশ নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক নষ্ট না হয়ে অংশবিশেষ নষ্ট হয়ে যায়। হাইব্রিড টপোলজি ব্যবহারে প্রতিটি টপোলজির সুবিধাগুলো পাওয়া যায়।

ঘ. "খ" চিত্রের টপোলজির A চিহ্নিত নোড নষ্ট হয়ে গেলে নেটওয়ার্ক কীভাবে সচল রাখবে? তোমার মতামত দাও।

'খ' চিত্রে A চিহ্নিত নোডটি রিং টপোলজি।

যে টপোলজিতে নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত কম্পিউটারগুলো রিং আকারে সজ্জিত থাকে তাকে রিং টপোলজি বলে। রিং টপোলজিতে প্রতিটি কম্পিউটার তার পার্শ্ববর্তী কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত থাকে। এভাবে রিংয়ের সর্বশেষ কম্পিউটারটি প্রথমটির সাথে যুক্ত থাকে। রিং টপোলজিতে একমুখী ডেটা প্রেরিত হয়।

উদ্দীপকে A চিহ্নিত অংশে কম্পিউটারগুলো বৃত্তাকার পথে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। তাই নেটওয়ার্কটি একটি রিং টপোলজি। এক্ষেত্রে নেটওয়ার্কটি সচল রাখতে হলে নষ্ট নোডটি অপসারণ করে পুনরায় সংযোগ সম্পন্ন করতে হবে। অর্থাৎ পুরো রিং ভেঙে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে দুটি পাশাপাশি নোডের সাথে যুক্ত করে দিলেই নেটওয়ার্কটি সচল হয়ে যাবে।

রিং টপোলজিতে রিং-এর মধ্যে দিয়ে ডেটা ঘুরতে থাকে। এ ধরনের সংগঠনে কম্পিউটারগুলো সরাসরি পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে না, বিধায় নেটওয়ার্কের কম্পিউটার অন্য যে কোনো কম্পিউটারে সরাসরি সংকেত পাঠাতে পারে না। এ জন্য নেটওয়ার্কের কোনো কম্পিউটার সংকেত প্রেরণের ক্ষমতা হারালে বা নষ্ট হয়ে গেলে পুরো নেটওয়ার্কটি অকেজো হয়ে পড়ে।

অধ্যায়-৩

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

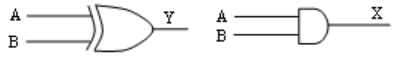

চিত্র : i চিত্র : ii

ক. মৌলিক গেইট কাকে বলে? ১

খ. কোন কোন মৌলিক গেইট ব্যবহার করে একটি X-OR গেট তৈরি করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র (i) ও (ii) লজিক গেইটের সাহায্যে কোন অ্যাডার তৈরি করা যায় তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্র (i) এর আউটপুট Y কে যদি (ii) এর ইনপুট A এর পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় তাহলে প্রাপ্ত সমীকরণের সরলীকৃত লজিক সার্কিট বিশ্লেষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মৌলিক গেইট কাকে বলে?

বুলিয়ান অ্যালজেবরার মৌলিক অপারেশনসমূহ বাস্তবায়নের জন্য যে সকল লজিক গেইট ব্যবহার করা হয় তাদেরকে মৌলিক গেইট বলা হয়।

খ. কোন কোন মৌলিক গেইট ব্যবহার করে একটি X-OR গেট তৈরি করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

মৌলিক গেইটগুলো হচ্ছে AND, OR ও NOT গেইট ।

আমরা জানি, X-OR গেইট অর্থাৎ X-OR $= A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$ ।

লজিক গেইট (মৌলিক গেইট দ্বারা) বাস্তবায়ন–

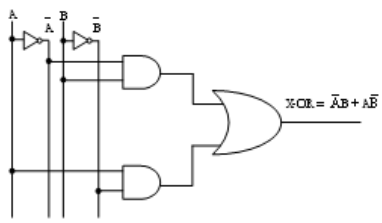

X–OR গেইটের লজিক সার্কিট (মৌলিক গেইট দ্বারা) থেকে আমরা দুইটি AND, দুইটি NOT এবং একটি OR গেইট-এর সমন্বয়ে X–OR গেইট তৈরি করতে পারি।

গ. চিত্র (i) ও (ii) লজিক গেইটের সাহায্যে কোন অ্যাডার তৈরি করা যায় তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

চিত্র (i) ও (ii) এর সাহায্যে প্রাপ্ত সার্কিটটি হলো–

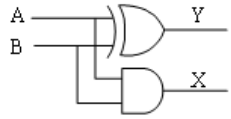

অর্থাৎ, হাফ অ্যাডার তৈরি করা যায়। যে লজিক সার্কিট দুটি বাইনারি বিট যোগ করে যোগফল (S) ও ক্যারি (C) বের করতে পারে তাকে হাফ অ্যাডার বলা হয়।

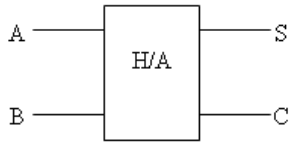

চিত্র : ব্লক ডায়াগ্রাম

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

চিত্র : সত্যক সারণি

উপরোক্ত সত্যক সারণি হতে আমরা পাই, $S = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$

$$C = AB$$

অর্থাৎ, Half Adder লজিক গেইট বাস্তবায়নে একটি X-OR এবং একটি AND গেইট লাগবে।

উদ্দীপকের মাধ্যমে তৈরিকৃত চিত্র ও হাফ অ্যাডারের চিত্র একই। অর্থাৎ হাফ অ্যাডার তৈরি হবে।

ঘ. চিত্র (i) এর আউটপুট Y কে যদি (ii) এর ইনপুট A এর পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় তাহলে প্রাপ্ত সমীকরণের সরলীকৃত লজিক সার্কিট বিশ্লেষণ কর।

চিত্রে (i) এর আউটপুট Y কে (ii) এর পরিবর্তে ব্যবহার করে প্রাপ্ত সার্কিট হলো-

প্রাপ্ত সার্কিটটির আউটপুট সমীকরণ হলো-

$Z = (A \oplus B)B$

সমীকরণটিকে সরলীকরণ করে পাই-

$Z = (A \oplus B).B$

$= (\bar{A}B + A\bar{B}).B \qquad [\because B.\bar{B} = 0]$

$= \bar{A}B.B + A\bar{B}.B$

$= \bar{A}B + 0 = \bar{A}B$

সরলীকৃত সার্কিটটি হলো-

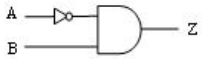

$Z = \bar{A}B$। A চলকের সাথে একটি NOT গেইট ব্যবহার করায় $\bar{A}$ ও B চলক থেকে B পাওয়া যায় । প্রাপ্ত এই ইনপুট দুইটিকে AND গেইটের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করায় ফলাফলে পাওয়া যায় $\bar{A}B$।

অধ্যায়-৪

৪. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

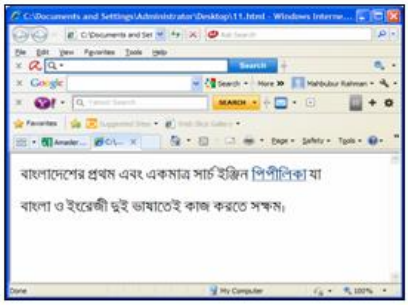

ক. হাইপারলিংক কী? ১

খ. ওয়েবসাইটের কাঠামো বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের পিপীলিকা লেখাতে বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র সার্চ ইঞ্জিন www.pipilika.comএর লিংক তৈরি করার জন্য কী নির্দেশ দিতে হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত হাইপারলিংক করলে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। বিশ্লেষণসহ তোমার মতামত দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. **হাইপারলিংক কী?**

ওয়েবসাইটের বিভিন্ন ধরনের তথ্যাবলির ভেতর ভার্চুয়াল সংযোগ স্থাপন করার ব্যবস্থাই হচ্ছে হাইপারলিংক। টেক্সট অথবা ইমেজকে লিংক হিসেবে নির্দিষ্ট করা যায়।

খ. **ওয়েবসাইটের কাঠামো বলতে কী বোঝায়?**

ওয়েবসাইটে বিভিন্ন পেজ থাকে। প্রতিটি পেজে বিভিন্ন উপাদান থাকে। ওয়েবসাইটের অন্তর্গত বিভিন্ন পেজগুলো সাজানোর লেআউটই হলো ওয়েবসাইটের কাঠামো।

ওয়েবসাইটের বিভিন্ন পেজগুলো লিংক করা থাকে। একটি ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলে প্রথম কোন পেজটি প্রদর্শিত হবে, সেখান থেকে অন্যান্য পেজে কীভাবে যাওয়া যাবে তা ওয়েবসাইটের কাঠামোতে ঠিক করা হয়।

গ. **উদ্দীপকের পিপীলিকা লেখাতে বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র সার্চ ইঞ্জিন www.pipilika.com এর লিংক তৈরি করার জন্য কী নির্দেশ দিতে হবে? ব্যাখ্যা কর।**

ওয়েবসাইটের বিভিন্ন ধরনের তথ্যাবলির ভেতর ভার্চুয়াল সংযোগ স্থাপন করার ব্যবস্থাই হচ্ছে লিংক বা হাইপারলিংক।

টেক্সট অথবা ইমেজকে লিংক হিসেবে নির্দিষ্ট করা যায়। লিংক করা লেখাতে ক্লিক করে সহজে লিংকে নির্দিষ্ট করে ওয়েবপেজে যাওয়া যায়। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব সহ সব হাইপারটেক্সট সিস্টেমে হাইপারলিংক হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান (ingredient)।

HTML লিঙ্কের সিনটেক্স হলো–

```
<a href="url">Link text</a>
```

উদ্দীপকের পিপীলিকা লেখাতে সার্চ ইঞ্জিন www.pipilika.com এর লিংক তৈরি করার জন্য নিচের মতো নির্দেশ দিতে হবে-

<a href="http:// www.pipilika.com"> পিপীলিকা </a>

লিংকের ঠিকানাটি <a> এর মধ্যেই href=" " লিখে কোটেশন চিহ্নের ভেতর বসিয়ে দিতে হয়। তারপর যথানিয়মে এ ট্যাগটি ক্লোজ করার জন্য </a> ব্যবহার করতে হয়। স্টার্টিং ও ক্লোজিং ট্যাগের মধ্যে যে লেখাতে ক্লিক করলে লিংকটি প্রদর্শিত হবে সে টেক্সটটি (যেমন : This is a link টেক্সটি) লিখতে হয়। ওয়েবপেজের কোন ইমেজকেও লিংক হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

ঘ. **উদ্দীপকে উল্লিখিত হাইপারলিংক করলে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়– বিশ্লেষণসহ তোমার মতামত দাও।**

ওয়েবসাইটের বিভিন্ন ধরনের তথ্যাবলির ভেতর ভার্চুয়াল সংযোগ স্থাপন করার ব্যবস্থাই হচ্ছে হাইপারলিংক।

টেক্সট অথবা ইমেজকে লিংক হিসেবে নির্দিষ্ট করা যায়। লিংক করা লেখাতে ক্লিক করে সহজে লিংকে নির্দিষ্ট করে ওয়েবপেজে যাওয়া যায়। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব সহ সব হাইপারটেক্সট সিস্টেমে হাইপারলিংক হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান **(ingredient)**।

হাইপারলিংকে ক্লিক করে একই ডকুমেন্টের ভিন্ন পেজে অথবা এক ডকুমেন্ট থেকে একই অবস্থানে অথবা ভিন্ন কোন অবস্থানের ভিন্ন কোন ডকুমেন্টের পেজে যাওয়া যায়। এভাবে এক পেজ থেকে বিশ্বের যে কোন লিংক করা ওয়েবপেজে যাওয়া যায়। ফলে সম্পর্কিত তথ্য দ্রুত প্রদর্শন করে জানা যায় এবং এতে করে ব্রাউজকারীর সময় বাঁচে।

অধ্যায়-৫

৫. **উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

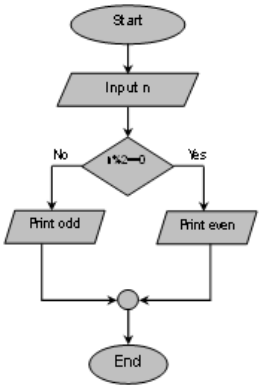

ক. অ্যারে কী? ১

খ. সি ভাষায় ব্যবহৃত পাঁচটি ফরমেট স্পেসিফায়ারের বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সমস্যাটির অ্যালগরিদম লিখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সমস্যাটি সি অর্থাৎ ফ্লোচার্ট দেখে সহজেই সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম লেখা যায়–বিশ্লেষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. অ্যারে কী?

একটি সাধারণ ভেরিয়েবলের নামের আওতায় মেমোরিতে পরপর সংরক্ষিত একই টাইপের কতগুলো ভেরিয়েবলের সেটকে অ্যারে বা বিন্যাস বলা হয়।

খ. সি ভাষায় ব্যবহৃত পাঁচটি ফরমেট স্পেসিফায়ারের কর্না দাও।

scanf () ফাংশনের সাথে ফরমেট স্পেসিফায়ার উল্লেখ করতে হয়।

নিচের টেবিলে বিভিন্ন ধরনের ফরমেট স্পেসিফায়ারের ব্যবহার উল্লেখ করা হলো ঃ

ফরমেট স্পেসিফাইয়ার	ব্যবহার
%c	single character প্রিন্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
%d	decimal integer টাইপের ডেটা ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
%f	floating point টাইপের ডেটা ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
%x	hexadecimal integer টাইপের ডেটা ইনপুট/আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
%s	string টাইপের ডেটা ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সমস্যাটির অ্যালগরিদম লিখ।

সমস্যা সমাধানের যুক্তিসম্মত ও পর্যায়ক্রমিক ধারা কর্নাকে অ্যালগরিদম বলা হয়।

সহজ ও যথার্থ উপায় নির্ধারণের জন্য অ্যালগরিদম অপরিহার্য। সমস্যাকে পর্যায়ক্রমিক ছোট ছোট ভাগ করে তা সমাধানের উদ্দেশ্যে একজন প্রোগ্রামার অ্যালগরিদম রচনায় প্রয়াসী হয়ে থাকেন। উদ্দীপকে উল্লেখিত সমস্যাটি হলো কোন সংখ্যা জোড় নাকি বেজোড় তা বের করার ফ্লোচার্ট। জোড় সংখ্যাকে ২ দিয়ে ভাগ করলে ০ হয় এবং বেজোড় সংখ্যাকে ২ দিয়ে ভাগ করলে ০ না হয়ে ভাগ শেষ থাকে।

সমস্যাটির অ্যালগরিদম হলো-

Step-1 : Start
Step-2 : Input n
Step-3 : is (n%2=0)?
Step-4 : (i) yes, print "even number"
(ii) no, print "odd number"
Step-5 : End

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটি সি অর্থাৎ ফ্লোচার্ট দেখে সহজেই সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম লেখা যায়–বিশ্লেষণ কর।

কোন সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পিউটারের ভাষায় ধারাবাহিকভাবে কতগুলো কমান্ড বা নির্দেশের সমষ্টিকে প্রোগ্রাম বলা হয়। প্রোগ্রাম লেখার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম ভাষা ব্যবহৃত হয়। প্রোগ্রামে লিখিত নির্দেশসমূহ সোর্স প্রোগ্রাম ফাইলে সারিবদ্ধভাবে লেখা হয়। কম্পিউটার এ নির্দেশসমূহকে পর্যায়ক্রমিকভাবে পালনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান করে।

কম্পিউটার সিস্টেমে প্রোগ্রাম রচনার জন্য ব্যবহৃত শব্দ, বর্ণ, অঙ্ক, সংকেত এবং এগুলো বিন্যাসের নিয়ম মিলিয়ে তৈরি হয় প্রোগ্রামের ভাষা বা প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ। বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম রচনার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম ভাষা ব্যবহৃত হয়। প্রোগ্রামিং-এর মাধ্যমে জটিল সমস্যা অল্প সময়ে এবং সহজে সমাধান করা যায়। প্রোগ্রাম রচনার জন্য উপযুক্ত প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ প্রয়োজন হয়। প্রতিটি প্রোগ্রামিং ভাষারই বিশেষ কিছু সিনটেক্স রয়েছে এবং সিনটেক্স অনুসারেই ঐ ভাষায় প্রোগ্রাম লিখতে হয়।

উদ্দীপকে উল্লেখিত সমস্যাটি হলো কোন সংখ্যা জোড় নাকি বেজোড় তা বের করার ফ্লোচার্ট। এই ফ্লোচার্ট দেখে সি ল্যাংগুয়েজে প্রোগ্রাম লেখা যায়। যেমন-

```
# include <stdio.h>
# include <conio.h>
void main ( )
{
int n;
scanf("%d",&n);
if(n%2==0)?
printf ("even number");
        else
printf ("odd number");
getch ();
}
```

অধ্যায়-৬

৬. **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

কসমোপলিটন কলেজের একটি স্টুডেন্ট ডেটাবেস তৈরি করা হল। উক্ত ডেটাবেসে ছাত্র-ছাত্রীদের নাম, ক্রমিক নাম্বার, সেকশন, প্রাপ্ত নাম্বারের ফিল্ডের সমন্বয়ে তৈরি। ফিল্ডগুলোতে স্টুডেন্টদের তথ্যগুলো অগোছালোভাবে সংরক্ষণ করা আছে। ডেটাবেসটি থেকে কীভাবে দ্রুত ডেটা খুঁজে বের করা যায় সেজন্য একজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ কিছু পরামর্শ দিয়েছে।

ক. প্রাইমারি কী? ১

খ. দুইটি ডেটাবেজের মধ্যে রিলেশন তৈরি করার শর্তসমূহ কী কী? ২

গ. ডেটাবেজটিতে সংরক্ষিত অগোছালো তথ্য সাজাতে কী ব্যবস্থা প্রয়োজন এবং কেন করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ডেটাবেজ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলো মূল্যায়ন কর। ৪

ক. প্রাইমারি কী?

ডেটা টেবিলের যে ফিল্ডের মানসমূহ দ্বারা একটি রেকর্ডকে অন্যান্য রেকর্ড থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করা যায় সেই ফিল্ডকে প্রাইমারি কী বলা হয়।

খ. দুইটি ডেটাবেজের মধ্যে রিলেশন তৈরি করার শর্তসমূহ কী কী?

দুইটি ডেটাবেজের মধ্যে রিলেশন তৈরি করার শর্তসমূহ হলো-

১. কমপক্ষে একটি কমন ফিল্ড থাকতে হবে এবং কমন ফিল্ডের নাম, ডেটা টাইপ, ফিল্ড সাইজ ইত্যাদি একই হতে হবে।

২. একটি ফিল্ডকে প্রাইমারি কী ফিল্ড হিসেবে থাকতে হবে এবং ফিল্ডের তথ্য ইউনিক হতে হবে এবং একই থাকতে হয়।

৩. টেবিল/ফাইলগুলো একই সময় খোলা থাকতে হবে।

গ. ডেটাবেজটিতে সংরক্ষিত অগোছালো তথ্য সাজাতে কী ব্যবস্থা প্রয়োজন এবং কেন করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ডেটাবেসটিতে সংরক্ষিত অগোছালো তথ্য সাজানোর জন্য ইন্ডেক্স করা প্রয়োজন। ডেটাবেজের টেবিলের রেকর্ডসমূহের অ্যাড্রেসকে কোন লজিক্যাল অর্ডারে সাজিয়ে রাখাকেই ইনডেক্স বলা হয়। ইনডেক্সিং হলো মূল টেবিল অপরিবর্তিত রেখে এক বা একাধিক ফিল্ড অনুসারে রেকর্ডগুলোর সাজানোর প্রক্রিয়া। ইনডেক্সিং করা থাকলে ডেটাবেজ ফাইলের এলোমেলো রেকর্ডগুলো তুলনামূলকভাবে দ্রুত সাজানো যায়। ইনডেক্স ফাইল মূল ডেটাবেজ ফাইলের কোনরূপ পরিবর্তন না করে রেকর্ডসমূহের অ্যাড্রেস বিভিন্নভাবে সাজাতে পারে। এক বা একাধিক ফিল্ডের উপর ভিত্তি করে ইনডেক্স করে Alphabetically বা Numerically সাজানো যায়। ইনডেক্স করার জন্য কোন কোন ভ্যালুকে বিবেচনা করা হবে তার জন্য ইনডেক্স এক্সপ্রেশন তৈরি করতে হয়। ইনডেক্সকৃত ডেটাবেজে নতুন কোন রেকর্ড সন্নিবেশিত করলে অথবা সংশোধন করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়। ইনডেক্স করা ফাইলের ডেটা সহজে খুঁজে বের করা যায়। ডেটাবেজ ফাইলের ইনডেক্স করলে নতুন ইনডেক্স ফাইল তৈরি হয় এবং মূল ডেটাবেজ ফাইল অপরিবর্তিত থাকে। ডেটা টেবিলে রেকর্ডসমূহে সার্চিং, সর্টিং, রিপোর্টিং, কুয়েরি ইত্যাদি দ্রুত করা যায়।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ডেটাবেজ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলো মূল্যায়ন কর।

উদ্দীপকে উল্লিখিত ডেটাবেস থেকে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন–

১. সহজে টেবিল তৈরি করে ডেটা এন্ট্রি করা যায়।
২. অসংখ্য ডেটাকে সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করা যায়।
৩. অসংখ্য ডেটার মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় ডেটাকে খুঁজে বের করা যায়।
৪. ডেটার ভুল অনুসন্ধান ও সংশোধন করা যায়।
৫. এন্ট্রি ফর্ম তৈরি করা যায়।
৬. অপ্রয়োজনীয় ডেটা/রেকর্ড ডিলিট করা।
৭. নির্দিষ্ট ডেটা/রেকর্ড সার্চিং বা অনুসন্ধান এবং কুয়েরি করা।
৮. রিপোর্ট তৈরি ও প্রিন্ট করা যায়।
৯. ডেটাবেজকে কোন ফিল্ডের ভিত্তিতে সাজানো যায়।
১০. ডেটা ডুপ্লিকেশন কমানো যায়।
১১. প্রয়োজনে সম্পূর্ণ ডেটাবেজ বা ডেটাবেজের অংশবিশেষ প্রিন্ট করা যায়।
১২. ডেটাবেজ আপডেট করা যায়।
১৩. ডেটার নিরাপত্তা বিধান করা এবং ব্যবহারকারী নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
১৪. ডেটার ব্যাকআপ ও রিকভারি করা যায়।

নমুনা প্রশ্ন

নমুনা প্রশ্ন—১

বিষয় : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সৃজনশীল)

বিষয় কোড : ২৭৫ পূর্ণমান : ৪০

[যে কোন ৪টি প্রশ্নের উত্তর দাও]

১. নরসিংদীর প্রত্যন্ত অঞ্চল দিলারপুর গ্রামে বিবিসি শ্রোতা সংঘ রয়েছে। প্রতিদিন রাত ৮টায় শ্রোতা সংঘের সবাই একসাথে বসে বিবিসি'র বাংলা অনুষ্ঠান শুনে। শুধু তাই নয় তারা বিবিসি'র বাংলা অনুষ্ঠানগুলোর প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করে অনেক কিছুই জেনে নেয়। বিবিসি'র কল্যাণে দিলারপুর গ্রামের যুবকরা যথেষ্ট অগ্রসর হয়ে উঠেছে।

ক. কম্পিউটিং কী? ১

খ. ইন্টারনেট বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে তথ্য প্রযুক্তির কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে দিলারপুর গ্রামে তথ্য প্রযুক্তির প্রভাব সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত কর। ৪

২. মারুফ সাহেবের অফিসের কম্পিউটারগুলো পরস্পরের সাথে সংযোগের জন্য যে ক্যাবল ব্যবহার করা হয়েছে তা অর্থ সাশ্রয়ী এবং সহজে স্থাপনযোগ্য। ফরহাদের অফিসের একটি কম্পিউটারের সংযোগ ক্যাবল নষ্ট হওয়ায় অন্যান্য কম্পিউটার কাজ করছে না। ফরহাদের বন্ধু হাসানের অফিসের সকল কম্পিউটারগুলো একটি কেন্দ্রীয় ডিভাইসের সাথে সংযুক্ত।

ক. মাইক্রোওয়েভ কী? ১

খ. কোন ট্রান্সমিশনে একই সঙ্গে উভয় দিকে ডেটা আদান-প্রদান করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মারুফ সাহেবের অফিসে ব্যবহৃত ক্যাবলটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ফরহাদ সাহেব ও হাসানের অফিসের নেটওয়ার্ক উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবস্থাদ্বয়ের মধ্যে কোনটি উত্তম? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৩. জনাব ইকবাল একাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আইসিটি বিষয়ের সংখ্যা পদ্ধতি বুঝাচ্ছেন। তিনি বললেন কম্পিউটার তার অভ্যন্তরীণ কার্যাবলি 0 ও 1 এর সাহায্যে করে। কম্পিউটার দশমিক সংখ্যা চিনে না। এ দু'টি প্রতীক নিয়ে কী যেকোনো সংখ্যা প্রকাশ করা যায়। তিনি ৭৩২.৬৭ সংখ্যাটিকে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করে দেখালেন।

ক. কাউন্টার কী? ১

খ. সংখ্যা পদ্ধতিতে 9AF কী ধরনের সংখ্যা? বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংখ্যাটিকে কম্পিউটারের বোধগম্য সংখ্যায় রূপান্তর কর এবং 10101এর সাথে যোগ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংখ্যা পদ্ধতিটি কম্পিউটারে ব্যবহারের কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৪. জাহিদ একটি সাধারণ ওয়েবসাইট তৈরি করবে। সে উইন্ডোজ এক্সপি ব্যবহার করে। ওয়েবসাইট ডিজাইন করার কোন প্রোগ্রাম বা টুলস তার কমপিউটারে নেই। সে এইচটিএমএল মোটামুটি জানে।

ক. সার্চ ইঞ্জিন কী? ১

খ. কয়েকটি ফরমেটিং ট্যাগের বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে জাহিদের জানা ভাষাটি ব্যবহার করে কোন লেখাতে ক্লিক করলে আরেকটি পেজ ওপেন হবে? এরূপ করার জন্য কি নির্দেশনা দিতে হবে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. জাহিদের কাঙ্ক্ষিত কাজটি কীভাবে তাকে সাহায্য করবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৫. মুসা একাদশ শ্রেণির ছাত্র। আইসিটি শিক্ষক জনাব মোঃ ইকবাল বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ে প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ সম্পর্কে লেকচার দিয়েছেন। কিন্তু মুসা বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারছে না, তাই সে বিষয়টি পুনরায় বুঝিয়ে দেয়ার অনুরোধ করায় স্যার ক্লাসের সবার উদ্দেশে বিষয়টি বিস্তারিত বুঝিয়ে দিলেন।

ক. ফ্লোচার্ট কী? ১

খ. মেশিন ল্যাংগুয়েজ ও হাইলেভেল ল্যাংগুয়েজের মধ্যে তুলনা কর। ২

গ. মুসা কীভাবে একটি প্রোগ্রাম উন্নয়ন করবে? উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রেটার হলো উদ্দীপকের শিক্ষকের বুঝিয়ে দেয়া ক্ষেত্রটির অনুবাদক"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬. কসমোপলিটন কলেজের একটি স্টুডেন্ট ডেটাবেজ তৈরি করা হল। উক্ত ডেটাবেসে ছাত্র-ছাত্রীদের নাম, ক্রমিক নাম্বার, সেকশন, প্রাপ্ত নাম্বারের ফিল্ডের সমন্বয়ে তৈরি। ফিল্ডগুলোতে স্টুডেন্টদের তথ্যগুলো অগোছালো ভাবে সংরক্ষণ করা আছে। ডেটাবেজটি থেকে কিভাবে দ্রুত ডেটা খুঁজে বের করা যায় সেজন্য একজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ কিছু পরামর্শ দিয়েছে।

ক. রেকর্ড কী? ১

খ. দুইটি ডেটাবেজের মধ্যে রিলেশন তৈরি করার শর্তসমূহ কী? ২

গ. ডেটাবেজটিতে সংরক্ষিত অগোছালো তথ্য সাজাতে কী ব্যবস্থা প্রয়োজন এবং কেন করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ডেটাবেজ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলো মূল্যায়ন কর। ৪

বিষয় : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (বহুনির্বাচনি)

বিষয় কোড : ২৭৫

[বি:দ্র: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীত প্রদত্তবর্ণ সম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান-১] প্রশ্নে কোনো দাগ/কাটাকাটি করা যাবে না।

১. তথ্য প্রযুক্তি বলতে মূলত কী বুঝায়?
ক. তথ্য রাখা ও ব্যবহার করার প্রযুক্তি
খ. তথ্য বিক্রির প্রযুক্তি
গ. তথ্য বিকৃতির প্রযুক্তি ঘ. তথ্য রাখার প্রযুক্তি

২. রোগী দূরের ডাক্তারের কাছে থেকে সেবা পেতে পারে কোনটির মাধ্যমে?
ক. ভিডিও কনফারেন্স খ. অনলাইন চ্যাটিং
গ. টেলিকনফারেন্স ঘ. ভয়েস কল

৩. টেলিভিশন একটি —
ক. প্রেরক যন্ত্র খ. একমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা
গ. দ্বিমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা ঘ. টেলিকমিউনিকেশন

৪. কৃত্রিম উপায়ে মানুষের চিন্তা–ভাবনাগুলো কম্পিউটারের মধ্যে রূপ দেয়াকে কী বলে?
ক. কৃত্রিম ভাবনা খ. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
গ. কৃত্রিম প্রোগ্রাম ঘ. কৃত্রিম তথ্য

৫. ক্রায়োসার্জারিতে নাইট্রোজেনের কোন অবস্থা প্রয়োগ করা হয়?
ক. কঠিন খ. বায়বীয়
গ. আয়নিত ঘ. তরল

৬. বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি হলো—
ক. ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিডার খ. ফিঙ্গার আইডেনটিটি
গ. ফিঙ্গার ইনপুট ডেটা ঘ. ফিঙ্গার বায়োলজিক্যাল ডেটা

৭. একটি চ্যানেল দিয়ে 3 সেকেন্ডে 8100 বিট স্থানান্তরিত হলে তার ব্যান্ডউইথ কত?
ক. 1800 bps খ. 2700 bps
গ. 5400 bps ঘ. 600 bps

৮. একই সাথে অনেকগুলো দেশের যোগাযোগের জন্য নিচের কোনটি ব্যবহার করতে হবে?
ক. স্যাটেলাইট খ. অপটিক্যাল ফাইবার
গ. টেরিস্ট্রিয়াল ঘ. ইনফ্রারেড

৯. Wi–Fi এর ক্ষেত্রে–
i. ফুল ডুপ্লেক্স মোড ব্যবহৃত হয়
ii. ক্যাবল এর প্রয়োজন নেই
iii. কভারেজ এরিয়া হচ্ছে ৩২ থেকে ৯৫ মিটার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i ,ii ও iii

১০. সর্ববৃহৎ এলাকা জুড়ে কোন নেটওয়ার্কটি তৈরি হয়?
ক. PAN খ. LAN
গ. MAN ঘ. WAN

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১১ এবং ১২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সামিহা তার কম্পিউটারে অনেক নতুন সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারে না। পরে সে এমন এক সার্ভিস গ্রহণ করলো যা দ্বারা সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়, উচ্চগতিসম্পন্ন, কম্পিউটারের সুবিধা পাওয়া যায় এবং খরচও কম হয়।

১১. উদ্দীপকের সার্ভিসটির নাম কী?
ক. Bluetooth খ. Wi–Fi
গ. Wi–max ঘ. Cloud Computing

১২. উদ্দীপকে ব্যবহৃত সার্ভিসটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–
i. কোন লাইসেন্স ফি প্রয়োজন হয় না
ii. ব্যবহারের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না
iii. রক্ষণাবেক্ষণ এর খরচ নেই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i ,ii ও iii

১৩. URL এর প্রথম অংশের নাম কী?
ক. হোস্টনেম খ. প্রোটোকল গ. পাথ ঘ. প্যারামিটার

১৪. টেবিলে প্রতিটি রো কোন ট্যাগ দ্বারা ডেটা সেলসমূহে বিভক্ত থাকে?
ক. <a> খ. <tr> গ. <td> ঘ. <link>

১৫. HTML এ ওয়েব পেজ তৈরির জন্য ফাইলের এক্সটেনশন হচ্ছে
i. .htm
ii. .doc iii. .html
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. i i ও iii ঘ. i ,ii ও iii

১৬. মানুষের ভাষার সাথে কোন ভাষার মিল আছে?
ক. উচ্চস্তরের খ. নিম্নস্তরের
গ. যান্ত্রিক ঘ. অ্যাসেম্বলি

১৭. C প্রোগ্রামের ভাষায় লেখা প্রোগ্রামকে কী বলা হয়?
ক. গন্তব্য প্রোগ্রাম খ. উৎস প্রোগ্রাম
গ. ইউনিকোড ঘ. আসকি কোড

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
প্রোগ্রামার ইকবাল তার কোম্পানির সিস্টেম এনালিস্ট হাসান চিত্রের মাধ্যমে একটি প্রোগ্রাম কীভাবে রচনা করা হবে তা দেখিয়ে দিল। ইকবাল এর আলোকে প্রোগ্রাম রচনা শুরু করল।

১৮. উদ্দীপকের চিত্রের সাহায্যে সমস্যা সমাধান করার পদ্ধতিকে কি বলা হয়?
ক. অ্যালগরিদম খ. ডিবাগিং
গ. সুডোকোড ঘ. ফ্লোচার্ট

উত্তরমালা

১	ক	২	ক	৩	খ	৪	খ	৫	ঘ	৬	ঘ	৭	খ	৮	ক	৯	ক	১০	ঘ
১১	ঘ	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	গ	১৫	খ	১৬	ক	১৭	খ	১৮	ঘ				

১৯. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টির বৈশিষ্ট্য হলো–
i. জ্যামিতিক বা সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে প্রোগ্রামের পরিকল্পনা
ii. প্রোগ্রাম প্রবাহের দিক অনুধাবন করা যায়
iii. ধাপে ধাপে সমস্যা সমাধান করার পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i ,ii ও iii

২০. $(27)_{10}$ সংখ্যাটির সমতুল্য বাইনারি মান–
ক. 10011 খ. 11011
গ. 11010 ঘ. 10101

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩০ ও ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মি. পার্থিব তার একজন ছাত্রকে রোল নম্বর জিজ্ঞাসা করায় সে বলল তার রোল বাইনারিতে 1101

২১. উদ্দীপকের বাইনারি নম্বরের সাথে $(1001)_2$ যোগ করলে তার যোগফল কত হবে?
ক. $(10110)_2$ খ. $(01100)_2$
গ. $(10010)_2$ ঘ. $(11110)_2$

২২. উদ্দীপকের বাইনারি মানটির সমতুল্য মান–
i. $(11)_{16}$
ii. $(13)_{10}$ iii. $(15)_8$
কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. ii ও iii ঘ. ii ও iii

২৩. AND গেইট আউটপুটে '১' পেতে হলে—
ক. সবগুলো ইনপুট ০ হবে
খ. যে কোনটি ইনপুট ০ হবে
গ. সবগুলো ইনপুট ১ হবে
ঘ. সর্বাবস্থাতেই আউটপুট ১ হবে

■ নিচের সারণিটি দেখ এবং ৩৭ ও ৩৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

২৪. সত্যক সারণিটি কোন গেইটকে নির্দেশ করে?
ক. NOR খ. AND
গ. OR ঘ. NOT

২৫. সত্যক সারণিটির বুলিয়ান সমীকরণ কোনটি?
ক. $X = AB$ খ. $X = A + B$
গ. $X = \overline{AB}$ ঘ. $X = \overline{A + B}$

২৬. **Auto Number** এর অন্তর্ভুক্ত কোনটি?
ক. Integer খ. Data/Time
গ. Double ঘ. Serial No

২৭. ডেটাবেজ থেকে নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে তথ্য খোঁজ করার জন্য কী ব্যবহার করতে হয়?
ক. কুয়েরি খ. সার্চিং
গ. রিলেশন ঘ. ইন্ডেক্স

২৮. ডেটাবেসের রিলেশনকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. চার খ. পাঁচ
গ. ছয় ঘ. সাত

২৯. কোনো ডেটাবেজের আওতায় যা যা থাকতে পারে–
i. এক বা একাধিক ডেটাটেবিল, কুয়েরি
ii. ফর্ম, রিপোর্ট
iii. ম্যাক্রো এবং মডিউল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩০. ব্যাংকে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় —
i. গ্রাহকের হিসাব সংরক্ষণে
ii. ঋণ প্রদানে iii. অর্থের লেনদেনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও iii খ. i ও ii
গ. i ঘ. i, ii ও iii

৩১. কোনটি আবিষ্কারের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়?
ক. কম্পিউটার খ. টেলিফোন
গ. কৃত্রিম উপগ্রহ ঘ. টেলিগ্রাফ

৩২. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বাণিজ্যিকভাবে কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে?
ক. শিল্পক্ষেত্রে খ. গবেষণা ক্ষেত্রে
গ. শিক্ষাক্ষেত্রে ঘ. কৃষিক্ষেত্রে

৩৩. রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে–
i. ডিএনএ অণু কাটা যায়
ii. এক জীবের কোষ থেকে DNA অংশ অন্য জীবে স্থানান্তর করা যায়
iii. এক জীবের DNA অংশ অন্য জীবের DNA অংশের সাথে লাগানো যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৪. 'কিউরিসিটি' নামক মহাকাশযান কোন গ্রহে পাঠানো হয়েছে?
ক. মঙ্গল খ. বুধ
গ. বৃহস্পতি ঘ. শনি

৩৫. কোথায় স্পেস স্টেশন স্থাপিত হয়েছে?
ক. সূর্যের কক্ষপথে খ. মঙ্গলগ্রহে
গ. পৃথিবীতে ঘ. পৃথিবীর কক্ষপথে

উত্তরমালা

১৯	ক	২০	খ	২১	ক	২২	খ	২৩	গ	২৪	গ	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	ঘ
৩১	ক	৩২	ঘ	৩৩	ক	৩৪	ক	৩৫	ঘ														

নমুনা প্রশ্ন–২

বিষয় : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সৃজনশীল)

বিষয় কোড : ২৭৫ পূর্ণমান : ৪০

[যে কোন ৪টি প্রশ্নের উত্তর দাও]

১. আসাদ এখন ঘরে বসেই নিজের প্রয়োজনীয় সকল তথ্য তার ল্যাপটপে পেয়ে যাচ্ছে। এই প্রযুক্তির সহায়তায় সে তার বাবাকে ধানক্ষেতের ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ দমনে করণীয় সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে। উক্ত এলাকার চেয়ারম্যান মঞ্জুর এলাহী প্রতিমাসে ঢাকায় থাকা তার কয়েকজন পরিচিত ডাক্তার বন্ধুদের থেকে গ্রামের মানুষের জন্য সরাসরি স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের ব্যবস্থা করে দেন।

ক. কম্পিউটার কী? ১

খ. ই-মেইলের সুবিধা লিখ। ২

গ. উদ্দীপকের আসাদ কোন ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের গৃহীত ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে কতটুকু সহায়ক? বিশ্লেষণ কর। ৪

২. হাসান আলোর গতিতে একটি বায়োডাটা কানাডায় পাঠায়। হাসানের বন্ধু ইদ্রিস বলল, "আমার বাড়িতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি দ্বারা পাশাপাশি অবস্থিত এক ল্যাপটপ থেকে অন্য ল্যাপটপে ছবি প্রেরণ করা যায়"। ইদ্রিসের মামাতো ভাই সুমন বলল, "আমার গ্রামের বাড়ি থেকে ল্যাপটপের সাহায্যে ডেটা বিশ্বের যেকোন স্থানে পাঠানো যায়। কিন্তু বাড়ির বাইরে গেলে নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না। এটি বাড়ির সবাই ব্যবহার করতে পারে।"

ক. মডেম কী? ১

খ. ডেটা ট্রান্সমিশনে দুর্বল সিগন্যালকে শক্তিশালী করার উপায়-ব্যাখ্যা কর। ২

গ. হাসানের বায়োডাটা প্রেরণের প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইদ্রিস এবং সুমনের বাড়িতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি দুটির মধ্যে কোনটি উত্তম? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৩. ফাহিমকে তার মামা ICT তে ১ম বর্ষ সমাপনী পরীক্ষায় ও নির্বাচনি পরীক্ষায় কত নম্বর পেয়েছে জানতে চাইলে সে লিখল যথাক্রমে $(1000000)_2$ ও $(111)_1$। তৎক্ষণাৎ ফাহিমকে তার মামা বলল, আমিতো $(4E)_{16}$ পেয়েছিলাম।

ক. সংখ্যা পদ্ধতি কী? ১

খ. বীট ও বাইটের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ২

গ. ফাহিম কোন পরীক্ষায় বেশি নম্বর পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মামা হতে ২ এর পরিপূরক ব্যবহার করে মামা ও ফাহিমের নাম্বারের পার্থক্য যুক্তিসহ নিরূপণ কর। ৪

৪. নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

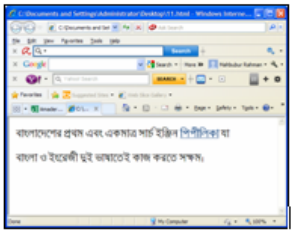

ক. ডোমেইন নেম কী? ১

খ. এইচটিএমএল এ ওয়েবপেজে কীভাবে বাংলা লিখবে? ২

গ. উদ্দীপকের পিপীলিকা লেখাতে বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র সার্চ ইঞ্জিন www.pipilika.com এর লিংক তৈরি করার জন্য কী নির্দেশ দিতে হবে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত লিংক করা থাকলে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়– বিশ্লেষণসহ তোমার মতামত দাও। ৪

৫. নিচের চিত্রটি পর্যবেক্ষণ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

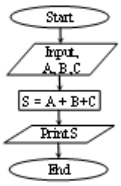

ক. অ্যালগরিদম কী নির্দেশ করে? ১

খ. প্রবাহচিত্রে ব্যবহৃত প্রতীকগুলো ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ব্যবহৃত S = A + B + C ঘরের কাজ বর্ণনা কর। যদি তিনটি সংখ্যার গড় বের করা হয় তাহলে এখানে কি পরিবর্তন করতে হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এ উদ্দীপকে দেখানো চিত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬. সিসটেক পাবলিক কলেজের অধ্যক্ষ পুরো কলেজের একটি ডেটাবেজ তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন। আইসিটির শিক্ষক মুনিরুল হাসানের সাথে এ ব্যাপারে তিনি পরামর্শ করেন।

ক. রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কী? ১

খ. রিপোর্ট এর ব্যবহার সম্পর্কে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত কলেজের জন্য কী ধরনের ডেটাবেজ তৈরি করা প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত তথ্যাবলি সাজানোর প্রক্রিয়া এবং এর ফলে যে সুবিধা পাওয়া যায় সেসম্পর্কে তোমার মন্তব্য লিখ। ৪

বিষয় : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (বহুনির্বাচনি)

বিষয় কোড : ২৭৫

[বি:দ্র: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীত প্রদত্তবর্ণ সম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান-১] প্রশ্নে কোনো দাগ/কাটাকাটি করা যাবে না।

১. বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের এগিয়ে আসার মূল কারণ—
ক. বেশি সময় ধরে কাজ করার মতো চাকরিজীবীর সহজলভ্যতা
খ. কম খরচে কাজ করার মতো চাকরিজীবীর সহজলভ্যতা
গ. অন্যান্য দেশের তুলনায় মানসম্মত কাজ করার মতো চাকরিজীবীদের সহজলভ্যতা
ঘ. কম পুঁজি বিনিয়োগ করে কাজ করার মতো চাকুরীজীবীর সহজলভ্যতা

২. আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি নতুন শিক্ষাব্যবস্থা হচ্ছে—
i. ওয়েবভিত্তিক ii. ইন্টারনেটভিত্তিক
iii. মাল্টিমিডিয়াভিত্তিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i, ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i ও ii

৩. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সফলভাবে প্রয়োগ হচ্ছে—
i. শিল্পক্ষেত্রে ii. চিকিৎসাক্ষেত্রে
iii. কৃষিক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

৪. কোথায় ভয়েস ব্যান্ড ব্যবহৃত হয়?
ক. টেলিগ্রাফিতে খ. ট্যালি প্যাথিতে
গ. টেলি কনফারেন্সে ঘ. টেলিফোনে

৫. ব্লুটুথ এর ক্ষেত্রে ডেটা ট্রান্সফারে—
i. উচ্চমানের নিরাপত্তা বজায় থাকে
ii. ১০ থেকে ১০০০ মিটার পর্যন্ত রেঞ্জ বজায় থাকে
iii. দেয়াল বা অন্য কিছু প্রতিবন্ধক হবে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

৬. একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী কম্পিউটারের সঙ্গে একাধিক কম্পিউটার সংযুক্ত হওয়ার সংগঠনের নাম কী?
ক. সংকর সংগঠন খ. রিং সংগঠন
গ. বাস সংগঠন ঘ. স্টার সংগঠন

৭. ওয়েবসাইট তৈরি হয় —
ক. একাধিক সফটওয়্যার নিয়ে
খ. একাধিক অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে
গ. একাধিক ডকুমেন্ট নিয়ে ঘ. একাধিক ওয়েবপেজ নিয়ে

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৯–২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
রনি হায়দার একটি কোম্পানির মালিক। তিনি সেই কোম্পানির একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে চান। এজন্য তিনি কয়েকজন ওয়েব প্রোগ্রামারের কাছে গেলেন এবং সবাইকে ওয়েব ডিজাইন করতে বললেন।

৮. HTML কোড লেখার জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি—
ক. নোটপ্যাড খ. এমএস ওয়ার্ড
গ. এমএস অফিস ঘ. পিএইচপি

৯. HTML এর ট্যাগগুলো কী দ্বারা বেষ্টিত থাকে?
ক. () খ. { }
গ. <> ঘ. উপরের কোনোটি নয়

১০. ইন্টারনেটে সুপারস্ক্রিপ্ট করতে ব্যবহৃত হয় —
ক. <sup> খ. <p>
গ. <sub> ঘ. <sb>

১১. Internet Explorer কে কী বলা হয়?
ক. Page খ. Program
গ. Browser ঘ. ওয়ার্কশ

১২. ইন্টারনেটে যেসব ঠিকানা ব্যবহৃত হয় সেগুলো সাধারণত —
i. আইপি অ্যাড্রেস
ii. টেক্সটনির্ভর ডোমেইন নেম সিস্টেম (DNS)
iii. লোকাল অ্যাড্রেস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮৭–৮৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ইউসুফ একটি ওয়েবসাইট তৈরি করে তাতে তার ব্যক্তিগত সকল তথ্যের সাথে প্রয়োজনীয় ছবি ও কার্টুন যুক্ত করল।

১৩. ইউসুফের কাজকে বলা যায় —
ক. ওয়েবহোস্টিং খ. ওয়েব লিঙ্ক
গ. ওয়েব ইনফো ঘ. ওয়েব ডিজাইন

১৪. ইউসুফ তার ওয়েবপেজে যুক্ত করতে পারে —
i. টেক্সট ii. ভিডিও iii. চিত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৫. সুডো শব্দের অর্থ কী?
ক. শৃঙ্খলা খ. পদ্ধতি
গ. ত্রুটি ঘ. ছদ্ম

উত্তরমালা

১	খ	২	খ	৩	খ	৪	ঘ	৫	ঘ	৬	ঘ	৭	ঘ	৮	ক	৯	গ	১০	ক	১১	গ	১২	ক	১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	ঘ

১৬. '%d'—কোন্ ধরনের উপাত্ত নিয়ে কাজ করে?
ক. দশমিক পূর্ণসংখ্যা খ. character
গ. string পূর্ণসংখ্যা ঘ. floating pint মান

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৮৯ ও ৯০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
ইব্রাহিম একটি সফটওয়্যার কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিতে এসেছে। কোন সংখ্যা জোড় না বিজোড় তা বের করার জন্য একটি প্রোগ্রাম লিখতে বলায় সে সি-ল্যাংগুয়েজে একটি প্রোগ্রাম রচনা করল।

১৭. সি ল্যাংগুয়েজে কী ওয়ার্ডের সংখ্যা কতটি?
ক. ১৫ খ. ২০ গ. ২২ ঘ. ৩৫

১৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত সি প্রোগ্রামিং ভাষায়—
i. শুরু হয় একটি ফাংশন main ( ) এর মাধ্যমে
ii. ডেটা ইনপুট নেয়ার জন্য Read() ফাংশান ব্যবহৃত হয়
iii. প্রতিটি Statement-এর শেষে সেমিকোলন (;) দিতে হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i ,ii ও iii

১৯. দশমিক সংখ্যা ৯১ এর বাইনারি রূপ কোনটি?
ক. ১০১১০১১ খ. ১১০১০১০
গ. ১১১০০১১ ঘ. ১১০১১০১

২০. কোন গেইটে একটি ইনপুট ও একটি আউটপুট থাকে?
ক. OR খ. AND গ. NOT ঘ. NAND

■ নিচের সারণিটি লক্ষ্য করে ৭১ ও ৭২নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

২১. সত্যক সারণিটি কোন গেইটের?
ক. AND খ. OR গ. Ex-OR ঘ. Ex-NOR

২২. সত্যক সারণিটির লজিক ফাংশন হলো—
ক. $\bar{A}B + A\bar{B}$ খ. $A \oplus B$
গ. $\overline{A \oplus B}$ ঘ. $\overline{A+B}$

২৩. **Field Name**—এর আকার নির্ধারণের জন্য কোনটি ব্যবহার করতে হবে?
ক. Create খ. Field name
গ. Field Size ঘ. Design View

২৪. **RDBMS** সফটওয়্যার হলো—
i. Oracle ii. MS-Excel iii. MySQL
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i ,ii ও iii

২৫. ডেটাবেজ প্রোগ্রামে সর্টিং-এর মাধ্যমে কী করা হয়?
ক. তথ্য ইনপুট দেওয়া হয় খ. তথ্য বাছাই করা হয়
গ. তথ্য মুছে ফেলা হয় ঘ. তথ্য বিন্যস্ত করা হয়

২৬. **Sorting** হলো—
i. মানের উর্ধ্বক্রমে সাজানো ii. মানের নিম্নক্রমে সাজানো
iii. শব্দ বা সংখ্যার দৈর্ঘ্য অনুসারে সাজানো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭৫ ও ৭৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নাম	রোল নাম্বার	রেজিস্টেশন	জিপিএ
মুসা	১০০১	৭১২০০৩	৫
আতিক	১০০২	৭১২০০৪	৪
সাকিব	১০০৩	৭১২০০৫	৫
হাসান	১০০৪	৭১২০০৬	৩

২৭. উদ্দীপকের কোন ফিল্ডটি প্রাইমারি কী ফিল্ড হতে পারে—
i. রোল নাম্বার ii. নাম iii. রেজিস্টেশন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৮. উদ্দীপকের যে রোলগুলো জিপিএ ৫ পেয়েছে তাদের সহজে বের করার পদ্ধতি—
i. ইন্ডেক্সিং কমান্ড ii. সর্ট কমান্ড
iii. কুয়েরি কমান্ড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৯. হাফ-ডুপ্লেক্স উদাহরণ কোনটি?
ক. রেডিও খ. মোবাইল
গ. টিভি ঘ. ওয়াকিটকি

৩০. ব্যান্ডউইথ কী?
ক. ডেটা প্রবাহের হার খ. ডেটা প্রবাহের মাধ্যম
গ. ডেটা প্রবাহের দিক ঘ. ডেটা প্রবাহের পদ্ধতি

৩১. কোনটি ট্রান্সমিশন সিস্টেমের উপাদান?
ক. ডিভাইস খ. জিপিএস
গ. রিসিভার ঘ. পার্সোনাল ডিজিটাল

৩২. ট্রান্সমিশন সিস্টেম থেকে ডেটা সিগন্যাল গ্রহণ করা কার কাজ?
ক. সেন্ডারের কাজ খ. রিসিভারের কাজ
গ. ডিভাইসের কাজ ঘ. সিগন্যালের কাজ

৩৩. ডেটা ট্রান্সমিশনের একককে নিচের কোনটি দ্বারা হিসেব করা হয়?
ক. Spb খ. Kbps গ. bps ঘ. Tbp

৩৪. কোন ক্যাবল যোগাযোগ ক্যাবল হিসেবে ব্যবহৃত হয়?
ক. ফাইবার অপটিক খ. টুইস্টেড পেয়্যার
গ. অপটিক্যাল ফাইবার ঘ. কো–এক্সিয়াল

৩৫. ওয়াই-ম্যাক্স হলো —
i. এক ধরনের তারবিহীন নেটওয়ার্ক
ii. বিনা তারে ব্রডব্যান্ড সেবা দেবার প্রযুক্তি
iii. একাধিক ডিজিটাল ডিভাইসে ডেটা স্থানান্তরের প্রযুক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i
গ. ii ঘ. ii

উত্তরমালা

১৬	ক	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ক	২০	গ	২১	ঘ	২২	গ	২৩	গ	২৪	খ	২৫	ঘ
২৬	ক	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	ঘ	৩০	ক	৩১	গ	৩২	খ	৩৩	ক	৩৪	গ	৩৫	ক

নমুনা প্রশ্ন–৩

বিষয় : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সৃজনশীল)

বিষয় কোড : ২৭৫ পূর্ণমান : ৪০

[যে কোন ৪টি প্রশ্নের উত্তর দাও]

১. সাব্বির সিঙ্গাপুরে বেড়াতে গেলে তার চাচা তাকে নিয়ে সায়েন্স পার্কে যায়। সেখানে প্রবেশের জন্য গেটে আঙ্গুল ব্যবহৃত হয়। এরপর তারা আরেকটি স্থানে গিয়ে দেখল, সেখানে প্রবেশের জন্য চোখ ব্যবহৃত হয়। অতঃপর তারা সায়েন্স পার্কের প্লে জোনে গিয়ে বিশেষ ধরনের হেলমেট ও চশমা পরে অনেক্ষণ মজা করে ড্রাইভিং করে।

ক. ন্যানোটেকনোলজি কী? ১

খ. তথ্য প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতায় ডায়াবেটিস রোগীরা উপকৃত হচ্ছে–ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের প্লে জোনে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের গেটে এবং আরেকটি স্থানে ব্যবহৃত প্রযুক্তির মধ্যে কোনটি অধিকতর ব্যবহৃত হচ্ছে–বিশ্লেষণপূর্বক তোমার মতামত দাও। ৪

২. নিচের চিত্রকল্পটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

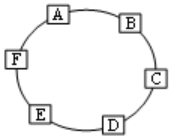

ক. রাউটার কী? ১

খ. ৫টি কম্পিউটারের মধ্যে নেটওয়ার্ক করার জন্য কী কী উপাদান প্রয়োজন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত টপোলজির বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. চিত্রকল্পের প্রতিটি কম্পিউটারকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করলে যে টপোলজি তৈরি হবে তার চিত্র অঙ্কন করে চিত্রকল্পের টপোলজি ও উক্ত নতুন টপোলজির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৩. নিচের চিত্রটি লক্ষ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

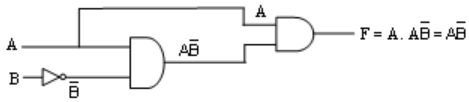

ক. লজিক গেইট কী? ১

খ. $(169)_{10}$ সংখ্যাকে কম্পিউটার সরাসরি গ্রহণ করে না-ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের বর্তনীটির সমীকরণ ও সত্যক সারণী লিখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বর্তনীটিতে কী ধরনের পরিবর্তন আনলে আউটপুট $F = A + A\bar{B}$ পাওয়া যাবে? ৪

৪. শতরূপা গার্মেন্টসের মালিক আবু তাহের তার প্রতিষ্ঠানের একটি ওয়েব সাইট তৈরির জন্য বাংলাদেশের একটি লিডিং সফটওয়্যার ডেভেলপ কোম্পানি সিসটেক ডিজিটাল লিমিটেডকে অনুরোধ করেন। তার অনুরোধের প্রেক্ষিতে সিসটেক ডিজিটাল লিমিটেড কোম্পানির একজন কর্মকর্তা জনাব আতিকুর রহমান তাকে বেশকিছু পরামর্শ দেন।

ক. আইপি এ্যাড্রেস কী? ১

খ. ওয়েব সার্ভার বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আতিকুর রহমানের ওয়েবসাইট তৈরির পরামর্শ কী হতে পারে আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ওয়েবসাইট তৈরির ধাপগুলো নিজের ভাষায় তুলে ধর। ৪

৫. C একটি জনপ্রিয় হাইলেভেল ল্যাংগুয়েজ। সি ভাষায় সহজেই অত্যন্ত জটিল সমস্যা সমাধান করা যায়। রায়হান একটি সাধারণ প্রোগ্রাম লেখার জন্য সি ভাষা ব্যবহার করেছে।

ক. হাইলেভেল ল্যাংগুয়েজ কী? ১

খ. সি–প্রোগ্রামিং গঠনগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জটিল ভাষাটির সুবিধা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. রায়হান কেন পছন্দের ভাষা হিসেবে সি ভাষাকে নির্বাচন করলো? পর্যালোচনা কর। ৪

৬. শতদল কলেজের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ সকল স্তরে কম্পিউটার ব্যবহার উদ্যোগ নিয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ডেটাবেজ তৈরি করে তাতে নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, জন্মতারিখ, রোল নম্বর, সেকশন ইত্যাদি ফিল্ড সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

ক. ডেটাবেজ কী? ১

খ. ফিল্ডের ডেটা টাইপ সম্পর্কে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ফিল্ড নিয়ে ডেটাবেজ তৈরি করার প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উক্ত ডেটাবেজ থেকে কলেজ কী কী সুবিধা পেতে পারে বলে তুমি মনে কর। বিশ্লেষণপূর্বক তোমার মতামত দাও। ৪

বিষয় : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (বহুনির্বাচনি)

বিষয় কোড : ২৭৫

[বি:দ্র: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীত প্রদত্তবর্ণ সম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান-১] প্রশ্নে কোনো দাগ/কাটাকাটি করা যাবে না।

১. গ্লোবাল ভিলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিচের কোন উপাদানটির ভূমিকা সবচেয়ে বেশি?
ক. ইন্টারনেট খ. রেডিও
গ. টেলিভিশন ঘ. টেলিফোন

২. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের প্রধান ক্ষেত্র—
i. ন্যাচারাল ইন্টারফেস ii. বুদ্ধিবৃত্তিক বিজ্ঞান
iii. ক্রায়োসার্জারি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. ক্রায়োসার্জারির ক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে ব্যবহৃত হয়—
i. প্রোপেন ii. অ্যালকোহল iii. ডাইমিথাইল ইথার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii খ. i ও iii
গ. i ও iii ঘ. iii

৪. কিসের মাধ্যমে DNA-সমূহ প্রাণীর কোষের নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করানো হয়?
ক. মিনি ইনজেকশন খ. সেমিমাইক্রো ইনজেকশন
গ. মাইক্রো ইনজেকশন ঘ. সেন্টিমাইক্রো ইনজেকশন

৫. ন্যারোব্যান্ড টেলিফোনের ক্ষেত্রে কত হার্টজফ্রিক্যুয়েন্সি প্রদান করে থাকে?
ক. ৩০০ – ৩৩০০ খ. ৩০০ – ৪৪০০
গ. ৩০০ – ৩৫০০ ঘ. ৩০০ – ৩৪০০

৬. WIMAX টাওয়ার চারদিকে সর্বোচ্চ কত মাইল পর্যন্ত সেবা দিতে পারে?
ক. ১০ খ. ২০ গ. ৪০ ঘ. ৬০

৭. কোন ওয়েবসাইটকে যেখানে হোস্ট করা হয় তার নাম কী?
ক. হোমপেজ খ. ওয়েব সার্ভার
গ. হোস্টার ঘ. মাদার কমপিউটার

৮. ইন্টারনেটকে সংক্ষেপে বলা হয় —
ক. nt খ. net গ. Inet ঘ. Int

৯. সবচেয়ে বড় হেডিং ট্যাগ কোনটি?
ক. <h6> খ. <h3> গ. <h2> ঘ. <h1>

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭৩ ও ৭৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সাকিব নতুন ওয়েব পেজ ডিজাইনার। সে HTML ব্যবহার করে কাজ করে। সম্প্রতি সে ওয়েব পেজে হাইপারলিংক ব্যবহার করার পদ্ধতিটি শিখেছে।

১০. সাকিব কোন ট্যাগটি ব্যবহার করে হাইপারলিংক করেছে?
ক. <caption> খ. <a>
গ. <head> ঘ. <html>

১১. সাকিব সম্প্রতি যে পদ্ধতিটি শিখেছে তার মাধ্যমে সে ওয়েব পেজ–
i. সমৃদ্ধ করতে পারবে ii. তথ্যবহুল করে তুলতে পারবে
iii. দৃষ্টিনন্দন করতে পারবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১২. ইন্টারপ্রিটার প্রোগ্রামকে–
ক. এক লাইন এক লাইন করে অনুবাদ করে
খ. একসাথে পুরো প্রোগ্রাম অনুবাদ করে
গ. একসাথে পাঁচ লাইন করে অনুবাদ করে
ঘ. অর্ধেক অর্ধেক লাইন অনুবাদ করে

১৩. কোনটি সি প্রোগ্রামের জন্য অত্যাবশ্যকীয়?
ক. printf() ফাংশন খ. main() ফাংশন
গ. getch() ফাংশন ঘ. scanf() ফাংশন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮১ ও ৮২নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সি প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ ডেটা টাইপের জন্য বেশ সমৃদ্ধ। সাধারণত ডেটা টাইপ মেশিনের উপর নির্ভরশীল। ANSI C তে চার ধরনের ডেটা ব্যবহৃত হয়।

১৪. C ভাষা **long integer** মেমরিতে কত বাইট জায়গা নেয়?
ক. ২ বাইট খ. ৪ বাইট
গ. ৮ বাইট ঘ. ১৬ বাইট

১৫. C ভাষায় কোন ধরনের অনুবাদক প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়?
i. Compiler ii. Interpreter iii. Assembler
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. সবগুলো

১৬. বাইনারিতে একটি বইয়ের দাম **1001011** হলে ডেসিমালে কত?
ক. 70 খ. 75
গ. 78 ঘ. 80

১৭. **3D** কোন ধরনের সংখ্যা?
ক. অকটাল খ. ডেসিমেল
গ. হেক্সাডেসিমেল ঘ. বাইনারী

১৮. **X = 1** পেতে হলে **A** ও **B** এর মান কত হবে?
ক. A = 0, B = 0 খ. A = 0, B = 1
গ. A = 1, B = 0 ঘ. A = 1, B = 1

১৯. **OR** গেইট ও **NOT** গেইট মিলে কোন গেইট হয়?
ক. NAND খ. NOR
গ. X-OR ঘ. X-NOR

উত্তরমালা

১	খ	২	ক	৩	খ	৪	গ	৫	ঘ	৬	ক	৭	খ	৮	খ	৯	ঘ	১০	খ
১১	ঘ	১২	ক	১৩	খ	১৪	খ	১৫	ক	১৬	খ	১৭	গ	১৮	ক	১৯	খ		

২০. বহুল ব্যবহৃত ওরাকল (ORACLE) কী?
ক. ডেটাবেস ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার
খ. স্প্রেডসিট প্রোগ্রাম
গ. ডস অপারেটিং সিস্টেম
ঘ. ওয়ার্ড প্রসেসিং

২১. ডেটা টেবিলের মধ্যে কোনটি প্রাইমারী কী ফিল্ড?
ক. নাম খ. রোল নম্বর
গ. শ্রেণি ঘ. বয়স

২২. ডেটার গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য কী করা হয়?
ক. এনক্রিপশন অ্যালগরিদম খ. সাইফারটেক্সট
গ. ডেটা এনক্রিপ্ট ঘ. প্লেইন টেক্সট

২৩. ইনডেক্স করা যায়–
i. একটি ফিল্ডের উপর
ii. দুটি ফিল্ডের উপর
iii. একাধিক ফিল্ডের উপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭৩ ও ৭৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
একটি ডেটাবেজে দুইশত ছাত্রের তথ্য সংরক্ষিত আছে। প্রতিটি ছাত্রের নাম, রোল নাম্বার, জন্ম তারিখ ও জিপিএ সম্বলিত ৪টি করে ফিল্ড আছে।

২৪. উল্লেখিত ডেটাবেজে রেকর্ডের সংখ্যা—
ক. ৪টি খ. ২৫টি
গ. ২০০টি ঘ. ৪০০টি

২৫. রোল নম্বর ফিল্ডটি হতে পারে—
i. Text type ii. Numeric type iii. Logical
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii
গ. iii ঘ. সবগুলো

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭৭ ও ৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
জহির সাহেব তার প্রতিষ্ঠানের প্রতিদিনের হিসাব-নিকাশ খাতা-কলমের মাধ্যমে সম্পন্ন করে। এতে করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে অনেক সমস্যা হয়। তাই তিনি ডেটাবেজ ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেন।

২৬. উদ্দীপকে উল্লেখিত কাজ কম্পিউটারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে করতে হলে জহির সাহেবকে কোন সফটওয়্যারটি ব্যবহার করতে হবে?
ক. MS-Power point খ. MS-Excel
গ. MS-Access ঘ. MS-Word

২৭. জহির সাহেব ডেটাবেস সফটওয়্যারটি ব্যবহার করলে যেসব সুবিধা পাবে–
i. রিপোর্ট তৈরি
ii. রেকর্ড অনুসন্ধান
iii. বায়ো-ডেটা তৈরি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৮. হেক্সাডেসিমাল F এর মান বাইনারিতে—
ক. ১০১০ খ. ১১১১
গ. ১১১০ ঘ. ১১০১

২৯. $(1101)_2 = (?)_{10}$
ক. 15 খ. 14
গ. 13 ঘ. 12

৩০. ৮বিট রেজিস্টারে "8" এর ২'র পরিপূরক হলো—
ক. 00101111 খ. 11111000
গ. 11010011 ঘ. 10011110

৩১. 2's Complement এর নির্ণয়ের সূত্র নিম্নরূপ—
ক. 1's Complement + 1
খ. 1's Complement–1
গ. 2"– সংখ্যাটি
ঘ. 2" + সংখ্যাটি

৩২. উদ্দীপকের Y এর মান $\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$ পেতে হলে NOR গেইট এর পরিবর্তে কোন গেইট ব্যবহার করতে পারি?
ক. NAND খ. XOR
গ. XNOR ঘ. OR

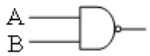

৩৩. উপরের চিত্রে Output কোনটি?
ক. $\overline{A + B}$ খ. $A + B$
গ. AB-A ঘ. $\overline{AB}$

৩৪. X-OR গেইটের আউটপুটের সমীকরণ কোনটি?
ক. $Y = \overline{A}\,\overline{B} + A$ খ. $Y = A\overline{B} + A$
গ. $Y = A\overline{B} + \overline{A}B$ ঘ. $Y = \overline{A}\,\overline{B} + AB$

৩৫. সার্বজনীন গেইট কোনটি?
ক. AND খ. OR
গ. NAND ঘ. NOT

উত্তরমালা

২০	ক	২১	খ	২২	গ	২৩	ঘ	২৪	গ	২৫	খ	২৬	গ	২৭	ক	২৮	খ	২৯	গ
৩০	খ	৩১	ক	৩২	ক	৩৩	ঘ	৩৪	গ	৩৫	গ								

নমুনা প্রশ্ন–৪

বিষয় : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সৃজনশীল)

বিষয় কোড : ২৭৫ পূর্ণমান : ৪০

[যে কোন ৪টি প্রশ্নের উত্তর দাও]

১. ১ম বর্ষের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে অধ্যক্ষ মহোদয় বললেন, "নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হতে হবে। একজনের উপস্থিতি যেন অন্য কেউ দিতে না পারে, তার জন্য বিশেষ যন্ত্র আছে। শুধু তাই নয়, ক্লাসে উপস্থিত না হলে অভিভাবক তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাথে সাথে জেনে যাবেন।"

ক. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কী? ১

খ. "প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদে প্রাক্ ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ সম্ভব"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কলেজে নিয়মিত উপস্থিতি নির্ণয়ের পদ্ধতিটি উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব"–উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

২. নিচের চিত্রকল্পগুলো লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

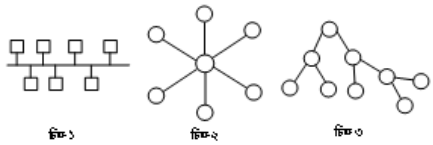

চিত্র-১ চিত্র-২ চিত্র-৩

ক. ব্যান্ড উইডথ কী? ১

খ. পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন পদ্ধতিতে ডেটা ট্রান্সমিশন ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র–১ ও চিত্র–২ সংযুক্ত করলে কোন ধরনের টপোলজি গঠিত হবে? ব্যাখ্যা কর ৩

ঘ. স্বল্প ব্যয়ে ল্যাবরেটরিতে ব্যবহারের জন্য উদ্দীপকের কোন টপোলজিটি অধিকতর উপযোগী? তুলনামূলক বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৩. নিচের চিত্রটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

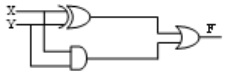

ক. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কী? ১

খ. 1 + 1 = 1 ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে F এর সরলীকৃত মান বের কর। ৩

ঘ. "শুধু NAND গেইট দ্বারা প্রাপ্ত সমীকরণ বাস্তবায়ন সম্ভব"– বিশ্লেষণপূর্বক উক্তিটির সত্যতা যাচাই কর। ৪

৪. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

```
<html>
<body>
<p>
An Ocean image:
<img src="boat.gif" alt="Big Boat" />|
</p>
<p>
</body>
</html>
```

ক. HTML কী? ১

খ. ফরমেটিং ট্যাগ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছবিটি যদি ব্রাউজারে প্রদর্শিত না হয় তাহলে ছবির পরিবর্তে Big Boat লেখা আসা এবং ছবিটির দৈর্ঘ্য ৪০০ এবং প্রস্থ ৩০০ পিক্সেল সাইজে প্রদর্শিত করার বিষয়টি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চিত্রের নিচে দুটি রো ও কলাম সংবলিত টেবিল সংযোজন করার জন্য কী কী পরিবর্তন আনতে হবে? ব্যাখ্যা কর। ৪

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জনাব লকিত উল্লাহ আশাশুনি হাই স্কুল এন্ড কলেজের কম্পিউটার শিক্ষক। তিনি যখন প্রোগ্রাম তৈরি করেন তখন তা ধাপে ধাপে করেন। কিন্তু তারপরও একটি সমস্যায় পড়তে হয়েছে তাকে। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর ওজন ও উচ্চতার তালিকা করার জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করতে গিয়ে দেখেন একই নাম বারবার এসেছে। অবশ্য সম্প্রতি তিনি এমন একটি প্রোগ্রাম ব্যবহার করছেন, যার ফলে কম্পিউটারে বারবার অনুবাদ করতে হয় না।

ক. অনুবাদক প্রোগ্রাম কী? ১

খ. হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজের সুবিধা লেখ। ২

গ. লকিত উল্লাহ সাহেব যদি ১৮ কেজি ওজনের সব ছাত্র-ছাত্রীর ওজন বের করতে চান, তাহলে তাকে কোন প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. লকিত উল্লাহ সাহেবের সম্প্রতি ব্যবহার করা প্রোগ্রামটি অত্যন্ত জনপ্রিয়– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মি. ইলিয়াস একটি কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার। তিনি কয়েকজন কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে তাদের বেতন পুনঃনির্ধারণ করার জন্য নির্বাহী পরিচালকের কাছে একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করলেন। নির্বাহী পরিচালক বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দেন এবং এমপ্লয়িদের ব্যক্তিগত ও দৈনন্দিন কাজের রিপোর্ট সংক্রান্ত তথ্যগুলো চাইলেন। ইলিয়াস সাহেব অতঃপর কর্মীদের ব্যক্তিগত তথ্য ও ওয়ার্কিং রিপোর্টের ফাইল দুটো ডেটাবেজ প্রোগ্রামের সাহায্যে একটি সম্পর্কযুক্ত ফাইলে পরিণত করে নির্বাহী পরিচালকের নিকট প্রদান করলেন।

ক. ডেটাবেজ ফাইল কী? ১

খ. ডেটাবেজ প্রোগ্রামে টেবিল বলতে কী বোঝ? ২

গ. কিভাবে এমপ্লয়িদের ব্যক্তিগত তথ্য ও ওয়ার্কিং রিপোর্টের ফাইল দুটোর মধ্যে ডেটাবেজ সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে সম্পর্ক তৈরি করা যায়– কল্পনা কর। ৩

ঘ. "সম্পর্কযুক্ত ফাইলটির কারণে নির্বাহী পরিচালক সহজেই যোগ্যতা অনুসারে এমপ্লয়িদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি মূল্যায়ন করতে পারবেন"– বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও। ৪

বিষয় : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (বহুনির্বাচনি)

বিষয় কোড : ২৭৫

[বি:দ্র: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীত প্রদত্তবর্ণ সম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান-১] প্রশ্নে কোনো দাগ/কাটাকাটি করা যাবে না।

১. কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় বেচাকেনাকে কী বলা হয়?
ক. ই–কমার্স খ. ই–মার্কেট
গ. ই–মেইল ঘ. ই–বিজনেস

২. ক্রায়োপ্রোব বলতে কী বুঝায়?
ক. বায়োসার্জারিতে ব্যবহৃত সুতার মতো যন্ত্র
খ. ক্রায়োসার্জারিতে ব্যবহৃত মোমের মতো যন্ত্র
গ. ক্রায়োসার্জারিতে ব্যবহৃত ছোট কাঠির মতো যন্ত্র
ঘ. ক্রায়োসার্জারিতে ব্যবহৃত পেন্সিলের মতো যন্ত্র

৩. বায়োইনফরমেটিক্স এর সঙ্গে জড়িত—
i. জীববিদ্যা ii. পরিসংখ্যান iii. কম্পিউটার বিজ্ঞান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii খ. i, ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. iii

৪. কাকে ন্যানো প্রযুক্তির জনক বলা হয়?
ক. জোহান্স মেন্ডেল খ. লুই পাস্তুর
গ. রিচার্ড ফাইনম্যান ঘ. মার্শাল ম্যাকলুহান

৫. কী দিয়ে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল তৈরি?
ক. কাঁচ তন্তু খ. ইস্পাত
গ. কপার ঘ. ফেরাস কোর

৬. হটস্পট কী?
ক. নির্দিষ্ট উত্তপ্ত এলাকা খ. তারযুক্ত ইন্টারনেট ব্যবস্থা
গ. তার বিহীন ইন্টারনেট ব্যবস্থা
ঘ. বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা

৭. কোন ওয়েবসাইটকে ইন্টারনেটে যে কমপিউটারে রাখা হয় তাকে কী বলা হয়?
ক. হোম কম্পিউটার খ. মাদার কম্পিউটার
গ. হাউট কম্পিউটার ঘ. হোস্ট কম্পিউটার

৮. কোনটি থেকে ওয়েবসাইটের ভেতরে থাকা বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়?
ক. ল্যাংগুয়েজ খ. হোমপেজ
গ. মেইন পেজ ঘ. সাবকনটেন্ট

৯. HTML এর ফর্মে ড্রপ-ডাউন বক্স তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত ট্যাগ —
ক. <option> খ. <drop> গ. <dd> ঘ. <dwon>

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮৩ ও ৮৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
ওয়েবসাইট তৈরি অর্থাৎ ওয়েব ডিজাইনের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে ওয়েবসাইট ডিজাইন করলে সেই ওয়েবসাইট ব্যবহারকারী, গ্রাহক বা ক্রেতার চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে।

১০. ওয়েবসাইট ডিজাইনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার কোন বিষয়টি জরুরী?
ক. গুণগতমান বজায় রাখা
খ. হ্যাকিং থেকে রক্ষা পাওয়া
গ. দৃষ্টিনন্দন সাইট তৈরি করা
ঘ. ব্যবসায় লাভবান হওয়া

১১. ওয়েবসাইট তৈরি ও পাবলিশিংয়ের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়—
i. ওয়েবসাইট ডিজাইন ii. ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন
iii. ডোমেইন হোস্টিং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

১২. কোন অনুবাদক দিয়ে সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটি একসাথে অনুবাদ করা সম্ভব?
ক. অ্যাসেম্বলার খ. কম্পাইলার
গ. ইন্টারপ্রিটার ঘ. উপরের সবকয়টি

১৩. সি ভাষায় নিচের কোন ফাংশন দ্বারা কার্মূল নির্ণয় করা যায়?
ক. printf() খ. abs()
গ. sqrt() ঘ. scanf()

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯১ ও ৯২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
সাকিব একটি প্রোগ্রাম রচনা করল এবং প্রোগ্রামটি নির্বাহ করার পর সব ভুল একসাথে দেখালো।

১৪. অনুবাদক প্রোগ্রামটি হলো–
ক. ইন্টারপ্রেটার খ. কম্পাইলার
গ. অ্যাসেম্বলার ঘ. লিংকার

১৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত অনুবাদক প্রোগ্রামটির বৈশিষ্ট্য হলো–
i. উৎস প্রোগ্রামকে বস্তু প্রোগ্রামে অনুবাদ করে
ii. সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটিকে একসাথে পড়ে এবং একসাথে অনুবাদ করে
iii. প্রোগ্রামে কোন ভুল থাকলে তা জানিয়ে দেয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i ,ii ও iii

উত্তরমালা

১	খ	২	ঘ	৩	খ	৪	গ	৫	ক	৬	গ	৭	ঘ	৮	খ	৯	ক	১০	খ	১১	ঘ	১২	খ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	ঘ

১৬. ১১০০ + ১০০০ এ বাইনারি সংখ্যার যোগফল কত?
ক. ১০১১০ খ. ১০১০০
গ. ১১০০ ঘ. ১০১০১

১৭. উদ্দীপক থেকে OR গেইটের পরিবর্তে কোন মৌলিক গেইট স্থাপন করলে Ex-NOR গেইট পাওয়া যাবে?
ক. NOR খ. AND
গ. NAND ঘ. NOT

১৮. ডেটাবেজের একই সারিতে কয়েকটি ফিল্ড মিলে কী হয়?
ক. কলাম খ. সারি
গ. ফিল্ড ঘ. রেকর্ড

১৯. নাম প্রাইমারি কী কেন নয়?
ক. একাধিক ব্যক্তির একই নাম হতে পারে
খ. একই ব্যক্তির নাম মাত্র একটি
গ. নাম অ্যাট্রিবিউট বহির্ভূত
ঘ. ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নাম সবসময় ভিন্ন ভিন্ন

২০. কে Encryped ডেটাকে Decrypt করতে পারে?
ক. সকল যথাযথ ব্যবহারকারী
খ. অবৈধ ব্যবহারকারী
গ. সকল কমপিউটার ব্যবহারকারী
ঘ. বৈধ ব্যবহারকারী

২১. DBMS হলো–
i. IBM DB–2 ii. Oracle iii. Foxpro26
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

২২. URL দ্বারা কোনটি প্রকাশ করা হয়?
ক. ইন্টারনেট খ. ডোমেইন নেম
গ. ইয়াহু ঘ. ফেসবুক

২৩. ওয়েবের তথ্যগুলো থাকে-
ক. ওয়েব সাইটে খ. ওয়েব পেইজে
গ. ওয়েব ব্রাউজারে ঘ. ওয়েব ক্লায়েন্টে

২৪. ইন্টারনেটে এক ওয়েব পেজ থেকে অন্য ওয়েবপেজে গমন করাকে বলা হয় —
ক. ব্রাউজিং খ. সার্চিং
গ. নেভিগেশন ঘ. আপলোডিং

২৫. কোন ব্রাউজারে Basefont ট্যাগ দেখা যায়?
ক. ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার খ. গুগল ক্রোম
গ. মজিলা ফায়ারফক্স ঘ. সাফারি

২৬. প্রতিটি সাইটের স্বতন্ত্র নামকে কী বলে?
ক. ফটোশপ খ. ডোমেইন
গ. HTML ঘ. সাইট ডিজাইন

২৭. কোনটি সঠিক URL?
ক. www.abc-com/xyz খ. www.abc.com\xyz
গ. www.abc-com\xyz ঘ. www.abc.com/xyz

২৮. টেবিলের হেডিং এর জন্য নিচের কোন ট্যাগটি ব্যবহৃত হয়?
ক. <TR> খ. <TD>
গ. <TH> ঘ.

২৯. ওয়েব ব্রাউজার হলো —
i. সাফারি
ii. অপেরা iii. গুগলক্রম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩০. ওয়েবসাইটের কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হলো —
i. Main Section
ii. Home Page
iii. Subsection
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩১. ওয়েবসাইট ডিজাইনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার কোন বিষয়টি জরুরী?
ক. গুণগতমান বজায় রাখা
খ. হ্যাকিং থেকে রক্ষা পাওয়া
গ. দৃষ্টিনন্দন সাইট তৈরি করা
ঘ. ব্যবসায় লাভবান হওয়া

৩২. ওয়েবসাইট তৈরি ও পাবলিশিংয়ের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়—
i. ওয়েবসাইট ডিজাইন
ii. ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন
iii. ডোমেইন হোস্টিং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৩. ওয়েবসাইটের টেবিলটিতে কয়টি কলাম ও কয়টি সারি রয়েছে?
ক. ৩ কলাম ৪ সারি খ. ৩ কলাম ৫ সারি
গ. ৩ কলাম ৩ সারি ঘ. কলাম ৪ সারি

৩৪. এইচটিএমএল হলো —
ক. ওয়েবব্রাউজার খ. মার্কআপ ল্যাংগুয়েজ
গ. মেশিন ল্যাংগুয়েজ ঘ. ওয়েবপেজ তৈরির টুলস

৩৫. বিশ্বব্যাপী কমপিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার নাম কী?
ক. কমপিউটার খ. ম্যান
গ. ইন্টারনেট ঘ. মাল্টিমিডিয়া

উত্তরমালা

১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	ঘ	২১	খ	২২	খ	২৩	ক	২৪	ক	২৫	খ
২৬	খ	২৭	ঘ	২৮	গ	২৯	ঘ	৩০	ঘ	৩১	খ	৩২	ঘ	৩৩	খ	৩৪	খ	৩৫	গ

নমুনা প্রশ্ন–৫

বিষয় : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সৃজনশীল)

বিষয় কোড : ২৭৫ পূর্ণমান : ৪০

[যে কোন ৪টি প্রশ্নের উত্তর দাও]

১. কৃষি গবেষক ড. ফয়সাল আবিস্কৃত বীজ চাষ করে একজন কৃষক পূর্বের ফলনের চেয়ে অধিক ফলন ঘরে তুলল। ড. ফয়সাল একবার ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হন এবং চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। ডাঃ জামিল ও তাঁর দল অপারেশনের পূর্বে বিশেষ ধরনের হেলমেট পরে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তির মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন। এই ধরনের জটিল ব্রেন টিউমার অপারেশন এ দেশে এর আগে আর হয়নি।

ক. ক্রায়োসার্জারি কী? ১

খ. বায়োইনফরম্যাটিক্সে ব্যবহৃত ডেটা কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ড. ফয়সালের গবেষণায় কোন ধরণের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ডাঃ জামিলের কার্যক্রমের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

২. একটি প্রতিষ্ঠানের 'এ', 'বি' এবং 'সি' শাখা তিনটির প্রতিটিতে অবস্থিত বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা রয়েছে। কর্তৃপক্ষ প্রতিটি শাখাকে একটি কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্কের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু শাখা অফিসগুলোর ভৌগোলিক দূরত্ব বেশি হওয়ার কারণে ক্যাবল ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

ক. কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কী? ১

খ. অপটিক্যাল ফাইবার তৈরিতে মাল্টিকম্পোনেন্ট কাচ ব্যবহার করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'এ' স্থানের নেটওয়ার্কের ধরন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে নেটওয়ার্ক মাধ্যম নির্বাচনে তোমার সুপারিশ ও তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩. নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

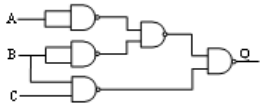

ক. সংখ্যা পদ্ধতির বেস কী? ১

খ. পৃথিবীর সকল ভাষাকে কোন কোডের মাধ্যমে কোডভুক্ত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সার্কিটের আউটপুট Q এর সমীকরণটি সরল কর। ৩

ঘ. মৌলিক গেইট দিয়ে উদ্দীপকের সার্কিটের সমতুল্য লজিক চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় কি? ব্যাখ্যা কর। ৪

৪. নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

Roll No	Name	Result
101	Sakib	A+
102	Raihan	B+
103	Ismail	A-
104	Ebad	A

ক. সার্চ ইঞ্জিন কী? ১

খ. ওয়েবসাইটের কাঠামো বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আউটপুটটি পাওয়ার জন্য এইচটিএমএল ভাষায় প্রোগ্রাম লেখ। ৩

ঘ. Result এর পাশে B_Date নামক একটি কলাম যুক্ত করে এতে জন্ম তারিখ এন্ট্রি করার জন্য প্রোগ্রামে পরিবর্তন আনতে হবে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৫. সাতনরী ওয়েল কোম্পানির শ্রমিকদের সপ্তাহিক মজুরি হিসাব করার জন্য কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাব কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিলেন। তিনি বলে দিলেন, যারা সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করবে তারা মজুরি ৪৫০ টাকা হারে পাবে, আর যারা ৪০ ঘণ্টার অতিরিক্ত কাজ করবে তারা অতিরিক্ত কাজের জন্য ঘণ্টা প্রতি ৬৫০ টাকা হারে মজুরি পাবে। হিসাব কর্মকর্তা মজুরি হিসাব করার জন্য একটি প্রোগ্রাম তৈরির অ্যালগরিদম লিখতে বললেন।

ক. সুডোকোড কী? ১

খ. কম্পাইলারের সুবিধাগুলো লিখ। ২

গ. উদ্দীপকের নিয়ম অনুযায়ী অ্যালগরিদম লিখ। ৩

ঘ. হিসাব কর্মকর্তার নির্দেশিত কাজে অ্যালগরিদম এবং ফ্লোচার্টের গুরুত্ব অনেক– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬. ডেটাবেজ তৈরির জন্য উইজার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে। নতুন ব্যবহারকারীরা উইজার্ড ব্যবহার করে সহজেই ডেটাবেজ তৈরি করতে পারেন। কম্পিউটার ক্লাসে সাত্তার সবসময় একটি পদ্ধতি অবলম্বন করে ডেটা অনুসন্ধানের কাজ করে থাকে। কিন্তু সে পন্থায় ডেটা খুঁজে না পেয়ে শিক্ষকের কাছে জানতে চাইল কীভাবে তথ্যটি বের করা সম্ভব। তখন শিক্ষক তাকে ডেটাবেজকে ইনডেক্সিং করার পর তথ্যটি খোঁজার পরামর্শ দিলেন।

ক. কুয়েরি কী? ১

খ. ডাটাবেজে সর্টিং বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের নতুন ব্যবহারকারী দ্বারা একটি নতুন ডেটাবেজ তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে শিক্ষকের বর্ণিত পন্থা সাত্তারকে কীভাবে সাহায্য করবে তা বর্ণনা কর। ৪

বিষয় : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (বহুনির্বাচনি)

বিষয় কোড : ২৭৫

[বি:দ্র: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীত প্রদত্তবর্ণ সম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান-১। প্রশ্নে কোনো দাগ/কাটাকাটি করা যাবে না।

১. কোন তত্ত্বের উপর ভার্চুয়াল রিয়েলিটি প্রতিষ্ঠিত?
ক. মরগানতত্ত্ব খ. সিমুলেশন তত্ত্ব
গ. কম্পিউটারতত্ত্ব ঘ. ভার্চুয়াল তত্ত্ব

২. নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা নেই কোনটির?
ক. ভাইরাস খ. পিঁপড়া
গ. রোবট ঘ. মানুষ

৩. অত্যধিক ঠাণ্ডায় অস্বাভাবিক বা রোগাক্রান্ত টিস্যুর উপর নিচের কোনপদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়?
ক. ক্রোমোসার্জারি খ. ক্রায়োসার্জারি
গ. হোমোসার্জারি ঘ. বায়োসার্জারি

৪. হাফ-ডুপ্লেক্স উদাহরণ কোনটি?
ক. রেডিও খ. মোবাইল
গ. টিভি ঘ. ওয়াকিটকি

৫. কোন প্রযুক্তি ওয়্যারলেস প্যান এর জন্য ব্যবহার করা যায়?
ক. Wi–Max খ. টেলেস্টোরিয়াল
গ. স্যাটেলাইট ঘ. ব্লু–টুথ

৬. ডেটা ট্রান্সফরমার এর হার 4G-নেটওয়ার্কে সর্বোচ্চ কত?
ক. 10 mbps খ. 100 mbps
গ. 50 mbps ঘ. 25 mbps

৭. ক্লাউড কম্পিউটিং বলতে বুঝায়—
i. ইন্টারনেট নির্ভর কম্পিউটিং
ii. ইন্টারনেট বিহীন কম্পিউটিং
iii. কম্পিউটিং এ দুইটি অবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ঘ. iii

৮. এইচটিএমএল এর উদ্ভাবক হলেন —
ক. টিম বার্নার্স লী খ. মাইকেল জুকারবার্গ
গ. স্টিভ জবস ঘ. কোনটি সঠিক নয়

৯. ওয়েবে ঢুকলে প্রথম যে পেজটি প্রদর্শিত হয় তাকে কী বলে?
ক. Web page খ. Home page
গ. Web presentation ঘ. HTTP

১০. টেবিলের রো এর জন্য নিচের কোন ট্যাগটি ব্যবহৃত হয়?
ক. <TR> খ. <TD>
গ. <TH> ঘ.

১১. কোন ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে?
ক. মেশিন ভাষা খ. হাই লেভেল ভাষা
গ. অ্যাসেম্বলি ভাষা ঘ. চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা

১২. 'C' প্রোগ্রামিং ভাষাটি কোন্ সময়ে উদ্ভাবিত হয়?
ক. ১৯৬০ সালে
খ. ১৯৭০ সালের শেষের দিকে
গ. ১৯৬০ সালে ঘ. ১৯৭১ সালে

১৩. হেডার ফাইল হলো–
i. stdio.h ii. math.h
iii. input.h
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৪. $(১০১১১)_২$ এর সমতুল্য দশমিক মান কত?
ক. ৪৩ খ. ৩১
গ. ২৩ ঘ. ২২

১৫. NOR গেইট কোন গেইটের আউটপুটের বিপরীত?
ক. OR খ. AND
গ. X-OR ঘ. X-NOR

১৬. যদি P, Q, R এবং S চারটি বুলিয়ান চলক হয় তবে এদের দ্বারা সর্বোচ্চ কয়টি কম্বিনেশন তৈরি করা সম্ভব?
ক. ৪ খ. ৮
গ. ১৬ ঘ. ৩২

■ উদ্দীপকের আলোকে ৫৪ এবং ৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

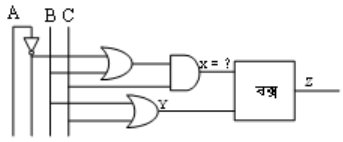

১৭. X এর মান কত?
ক. $(\bar{A} + \bar{B})\,C$ খ. $(\bar{A} + B)\,C$
গ. $(\bar{A} + B)\,\bar{C}$ ঘ. $\overline{(A+B)}\;C$

১৮. উদ্দীপকের বক্সে কোন গেইট যুক্ত করলে আউটপুট
$Z = \overline{(\bar{A} + B)+C+B+C}$
ক. AND খ. NOR
গ. X-OR ঘ. OR

১৯. কোনটি ডেটাবেজের উপাদান নয়?
ক. রেকর্ড খ. সিনটেক্স
গ. ম্যাক্রো ঘ. মডিউল

উত্তরমালা

১	খ	২	গ	৩	খ	৪	ঘ	৫	ঘ	৬	খ	৭	ক	৮	ক	৯	ক	১০	খ
১১	গ	১২	খ	১৩	ক	১৪	গ	১৫	ক	১৬	গ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	খ		

২০. ভিন্ন ভিন্ন ডেটা টেবিলগুলোকে একত্র করে ডেটা সঞ্চালন করার জন্য কী প্রয়োজন?
ক. ভিন্ন ভিন্ন টেবিলে ডেটা এন্ট্রি করা
খ. টেবিলগুলোর মধ্যে রিলেশন তৈরি করা
গ. টেবিলের নিরাপত্তা বিধান করা
ঘ. উপরের সবগুলো

২১. এনক্রিপ্টকৃত ডেটাকে মূল অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে কী করা হয়?
ক. ডিক্রিপ্টিং খ. কোডিং
গ. ডিবাগিং ঘ. মাইনিং

২২. ডেটা এনক্রিপ্ট করার পদ্ধতি হলো–
i. সিজার কোড ii. DES
iii. IDEA
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৩. কোনটি উচ্চস্তরের ভাষা?
ক. অ্যাডা খ. উইন্ডোজ
গ. পাইথন ঘ. এক্সেল

২৪. কোনটি নিম্নস্তরের ভাষা?
ক. Machine Language খ. BASIC
গ. Pascal ঘ. Fortran

২৫. ফ্লোচার্টের বিষয়কে কম্পিউটারের প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় রূপান্তর করাকে কী বলে?
ক. সুডোকোড খ. অ্যালগরিদম
গ. কোডিং ঘ. প্রিন্ট

২৬. প্রোগ্রামের কোন ভাষা যন্ত্রনির্ভর?
ক. উচ্চস্তরের ভাষা খ. যন্ত্রভাষা
গ. অ্যাসেম্বলি ভাষা ঘ. উপরের কোনটিই নয়

২৭. প্রোগ্রামের ভিত্তি কোনটি?
ক. কোডিং খ. ফ্লোচার্ট
গ. ডিবাগিং ঘ. প্রসিডিউ

২৮. কোনটি পুনরাবৃত্তিমূলক স্টেটমেন্ট? (অনুধাবন)
ক. IF – THEN খ. FOR – THEN
গ. DO – LOOP ঘ. FOR – LOOP

২৯. C প্রোগ্রামের ভাষায় উপাত্ত গ্রহণের কমান্ড কোনটি?
ক. clrscr খ. printf
গ. scanf ঘ. for

৩০. $y = a^2 + b^2$ একটি গাণিতিক রাশিমালা হলে C প্রোগ্রামের ভাষায় রাশিমালাটির সঠিক রূপান্তর কোনটি?
ক. $y = a^2 + b * b$ খ. $y = a^2 + b * 2$
গ. $y = a * a + b^2$ ঘ. $y = a * a + b * b$

৩১. নিচের কোনটি অ্যারে চলক?
ক. m(5) খ. m[5]
গ. m5 ঘ. m_5

৩২. নিচের কোনটি **Two dimensonal** অ্যারে চলক?
ক. m(4,5) খ. m(4)(5)
গ. m[4][5] ঘ. m[4,5]

৩৩. **Printf()** দ্বারা কী বুঝায়?
ক. ইনপুট মান ইনপুট মাধ্যমে পাঠায়
খ. আউটপুট মান আউটপুট মাধ্যমে পাঠায়
গ. ইনপুট মান আউটপুট মাধ্যমে পাঠায়
ঘ. আউটপুট মান ইনপুট মাধ্যমে পাঠায়

৩৪. যে কোনো প্রোগ্রাম রচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে—
i. সমস্যা নির্ধারণ ও বিশ্লেষণ
ii. অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট তৈরি
iii. প্রোগ্রাম কোডিং ডিবাগিং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৫. উচ্চস্তরের ভাষাকে মেশিনের ভাষায় পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত অনুবাদক প্রোগ্রামগুলো হলো–
i. অ্যাসেম্বলার
ii. কম্পাইলার
iii. ইন্টারপ্রেটার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii ও iii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

২০	খ	২১	ক	২২	ঘ	২৩	গ	২৪	ক	২৫	গ	২৬	গ	২৭	ক	২৮	ঘ	২৯	গ
৩০	ঘ	৩১	খ	৩২	ঘ	৩৩	গ	৩৪	গ	৩৫	খ								